নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

খণ্ড

(১)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

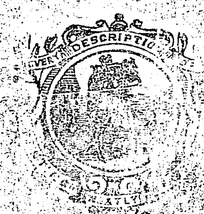

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত,
ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
নব্যভারত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড [illegible]রতের সূচিপত্র।

([illegible] সাল)

[illegible] অস্ত্র ও জয়।	([illegible]প্রসন্ন দত্ত)	১৮
২। অদৃষ্টবাদ ও কারণবাদ।	([illegible]পাল বন্দ্যোপাধ্যায়)	৪২
৩। অজ্ঞেয়তাবাদ ও নাস্তিকতা।	([illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়)	১৫২, ২৪১, ৩৫৮
৪। আস্তিকতা।	([illegible]নাথ দত্ত)	১২৯
[illegible]	([illegible]ক)	৫৪৬
[illegible]	(শ্রী[illegible]জয় বসু, এম, এ, বিএল)	৪০৭
[illegible]	(শ্রী[illegible]বিজয় বসু, এম, এ,)	৫২৬ ও ৫৫৫
৮। উৎসব-[illegible] (পদ্য)	(শ্রীবি[illegible]লাল দত্ত)	৫৪৪
৯। এরিয়েল [illegible]।	(শ্রীবিষ[illegible]রণ চট্টোপাধ্যায়)	২১০
১০। কলির হিন্দুধর্ম্ম।	(শ্রীচির[illegible]ব শর্ম্মা)	৩১৯
১১। কে তুমি চমকি যাও ? (পদ্য)	(শ্রীসরে[illegible]খোপাধ্যায়)	[illegible]নে ধৈর্য্য [illegible]ার
১২। কল্পনা-বিদায়। (পদ্য)	(শ্রীবি)	৪২৭
১৩। কেশবচরিত। ([illegible])	(সম্পাদক)	[illegible]
১৪। গতবর্ষ। (পদ্য)	(শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	[illegible]
১৫। চরিত্র শিক্ষা।	(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ)	[illegible]
১৬। জাতীয়ত্ব।		[illegible]৩৪
১৭। জাতীয় পতন।	(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়)	[illegible]
১৮। জাতীয় আন্দোলন।	(সম্পাদক)	৩২১
১৯। জাতীয় পতন—(কিঞ্চিৎ অনুধাবন।)	শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়)	[illegible]
২০। জড় পদার্থের বল	(শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন)	২৬১
২১। তুষার-প্রবাহ।	(শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়) বি, এ,)	৫২১ ও ৫৪১
২২। দুর্গ।	(ডাঃ শ্রীরামদাস সেন, এম, আর, এ, এস)	২৫
২৩। দুঃখিনী। (পদ্য)	(শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস	১২৪
২৪। দেবতত্ত্ব।	(শ্রীকিশোরীলাল রায়)	৩১৩ ও ৪৪৮
২৫। নাস্তিকতা।	(শ্রীসীতানাথ দত্ত)	১৩
২৬। নবলীলা—উপন্যাস।	(সম্পাদক)	৩৭, ৯১, ১৩৫, ১৮৫, ৩৩০, ৩৭১, ৪২৮, ৪৭৭, ৫৩০ ও ৫৬৯
২৭। নরবলি।	(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ)	৬২
২৮। নষ্টচন্দ্র। (পদ্য)	(শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	২২৬
২৯। নিরাকারের ধ্যান।	(সম্পাদক)	৪১৬
৩০। প্রজা ও ভূম্যধিকারীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)	২০৪
৩১। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,		২৩৮, ৪৩৪ ও ৫৭৭
৩২। প্রকৃতি।	(শ্রীজ্ঞানদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বি, এ)	২৯২
৩৩। প্রমদা। (পদ্য)	(শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	৩১২
৩৪। পৌরাণিক কোমত্ ধর্ম্ম।	(শ্রীকোমত্ শিষ্য)	৩৬৬
[illegible]বতার বা ম্যাট্ সিনি।	(সম্পাদক)	৩৮৮
৩৬। প্রকার ও পরিমাণ ভেদ।	(শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী [illegible])	[illegible]২৩ ও ৪৮৫
[illegible]। প্রাচীন আর্য্য সমাজ।	(শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী [illegible]	৪৩৭
[illegible]। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের একটী শি[illegible]	(শ্রীঅশ্বিনী কুমার [illegible]	৩০১

৪০। বিবর্ত্তন-বাদ।	(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ)	১, ৯৭
৪১। বুদ্ধ কি কল্পিত দেবতা?	(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ)	১৪৫
৪২। বঙ্গীয় প্রজা ও ভূম্যধিকারী।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)	১৬০
৪৩। বরষার বিল। (পদ্য)	(শ্রীগোবিন্দ দাস)	১৯১
৪৪। বাঙ্গলার কলঙ্ক (প্রতিবাদ)	(শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ)	২১৯
৪৫। বিপ্লব।	(শ্রীচণ্ডীচরণ সেন)	২৭২
৪৬। বঙ্গের ভূমি সংক্রান্ত স্বত্বের ইতিবৃত্ত।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)	৩৩৭, ৪০১
৪৭। বিশ্ব-সৃষ্টি।	(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)	৩৮৫
৪৮। বসন্ত সমীর। (পদ্য)	(শ্রীচন্দ্রকান্ত [illegible], এম, এ, বি, এল)	৪৬৯
৪৯। ভারত-পঞ্জিকা।	(শ্রীচণ্ডীচরণ [illegible])	১৩৯
৫০। ভারতের ভবিষ্যত্।	(শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু, এম, এ)	৩৪২
৫১। ভারতবর্ষের বাণিজ্য।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)	১১৫
৫২। ভূপৃষ্ঠে পরিবর্ত্তন।	(শ্রীনীলরতন সরকার, বি, এ)	৪৫৪
৫৩। [illegible]ভূতি।	(শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, বি, এ,)	৪৬৪, ৫১২ ও ৫৭৪
৫৪। মনের [illegible]নুষ।	(শ্রীসদানন্দ তর্কচঞ্চু)	১০
৫৫। মানব ও মানবের ক্রিয়া।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)	৮০
৫৬। মলয় শিশু ও নলিনী। (পদ্য)	(শ্রীবি)	৯৬
৫৭। মানব জন্ম।	(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ)	১৯৩
৫৮। মানব ও ইতরপ্রাণী।	ঐ ঐ	৩৭৯
৫৯। মনুষ্যের স্বাধীনতা ও অধীনতা।	(সম্পাদক)	৫৩৩
৬০। যোগী অমরসূনু।	(শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস)	৩৬৫
৬১। লর্ডরিপন।	(শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)	২৫২
৬২। শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।	(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ)	২৯, ৮৬
৬৩। শাক্যের সমাধিলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার।	(ঐ)	২৪৬
৬৪। শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম্ম।	(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ)	২২৮
৬৫। শোক।	(শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়)	৪৪৩
৬৬। সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়।	(শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)	৪৯ ও ১০৮
৬৭। সমাজ-সমন্বয়।	(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়)	৬৬
৬৮। সংস্কৃত শিক্ষা।	(পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ)	৭৬
৬৯। সমাজ সমন্বয়—প্রতিবাদ।	(শ্রীসদানন্দ তর্কচঞ্চু)	১২৬
৭০। সুন্দরবনের প্রজা।		৩০৫, ৩৪৯
৭১। সংস্কার।	(ডাঃ শ্রীরামদাস সেন, এম, আর, এ, এস্)	৩৫৪
৭২। সদ্যজাত শিশু।	(পদ্য) (শ্রীসদানন্দ তর্কবহ্নি)	৩৬৩
৭৩। সমাজ সংস্কার ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ।	(শ্রীদেবেন্দ্র নাথ পাকড়াশী)	৪৭১
৭৪। স্বারস্বত-উৎসব।	(পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	৫০৩
৭৫। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার।	(শ্রীসীতানাথ নন্দী, বি, এ)	৫০৬
৭৬। সিংহলযাত্রা—প্রতিবাদ।	(শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ)	৫১৮
৭৭। সিদ্ধার্থের শেষ কথা।	(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ)	৫৫২
৭৮। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।	(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম, এ)	১৭৮
৭৯। হতাশকামনা। (পদ্য)	(শ্রীসদানন্দ তর্কচঞ্চু)	১৯০
৮০। হদ্দজবাব।	(শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ)	৪৩২

নব্যভারত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিবর্ত্তন বাদ।

হুমবোলট্ বলেন, উদ্ভিদ জাতীয় তিন-লক্ষ বিংশতি সহস্র জীব পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্পেণ্টার সাহেবের মতে বিংশতি লক্ষ প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। অনন্যসহায় চক্ষুদ্বারা পরিমিত স্থানে আমরা যত বিচিত্র বিভিন্ন জীব দেখিতে পাই তাহার অনুপাত হিসাব করিলে, এই দুই জন বৈজ্ঞানিক জীবগণনায় অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইয়াছেন অনুমান হয়না। ইহাদের সহিত যে সকল জীব জাতির লয় হইয়াছে, তাহাদিগের হিসাব ধরিলে এককোটী জীবের পৃথিবীতে উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। এই সমস্ত জীব প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে কোটীবারে সৃষ্ট হইয়াছে; অথবা অবস্থা ভেদে একজীবের রূপান্তর হইয়া অন্যজীবের উৎপত্তি হয়? যাঁহারা দ্বিতীয় মতাবলম্বী তাঁহাদিগকে বিবর্ত্তবাদী বলে। অনেকে অনুমান করেন, বিবর্ত্তবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। নাস্তিকতা সাধারণলোকের পক্ষে ন্যক্কার-জনক। নাস্তিক হইলেই ঘৃণার পাত্র, সুতরাং কোন প্রকারের কোন কথা, কোনমত তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত বা তাহাদিগের সমাদৃত দেখিলেই সে মতটী সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিত্যজ্য, সেই মতের যৌক্তিকতা আলোচনা করিতে মনে ধৈর্য্য থাকেনা। যাহাকে ঘৃণা করি, তাহার আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা মত অমত সকলই ঘৃণিত, ইহা সাধারণভাব। কিন্তু সাধারণ হইলেই যুক্তিযুক্ত বা বিজ্ঞান-অনুমোদিত নহে।

যাহা হউক, বিবর্ত্তনবাদী মাত্রেই নাস্তিক নহে, বিবর্ত্তনবাদের আধুনিক প্রচারক ডারবিন নাস্তিক ছিলেন না। দুচারিজন বিবর্ত্তনবাদী নাস্তিক হইলেও বিবর্ত্তনবাদের যৌক্তিকতা নাস্তিকতায় পরিণত করে নাই। একটী জীব অবস্থাভেদে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে একথা স্বীকার করিলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় না। আমার মতে স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরে আরোপ করিলে ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র ও পরিমিত করা হয়। একএক সময়ে একএকটী ছিদ্র পরিলক্ষিত হইতেছে, আর গৃহকর্ত্তা সেই ছিদ্রটী পূর্ণ করিতেছেন। ইহা অদূরদর্শী মানবের পক্ষে সম্ভব। বিবর্ত্তনবাদীরা বলে, মূল সৃষ্টে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এমনি শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে, কোটীকোটীযুগে প্রত্যেক বিভিন্ন অবস্থায় তাহা স্বতন্ত্ররূপে বিকশিত হইয়া জগৎকে সুশোভিত এবং জগবাসীর নিত্য অভাব পরিপূর্ণ করিতেছে।

বিবর্ত্তনবাদীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর মতে অচেতন পদার্থের ক্রমবিবর্ত্তনে অচেতন পদার্থের এবং চেতনের বিবর্ত্তনে চেতনপদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। ডারবিন এই শ্রেণী ভুক্ত। বির্চো, বাশ্চিয়ান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মূল সৃষ্টি অচেতন পদার্থ; এক অচেতন পদার্থের বিবর্ত্তনে অচেতন ও চেতন জগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। চেতন ও অচেতন মূল সৃষ্টি দ্বিবিধ বা মূলে একমাত্র অচেতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, এপ্রশ্নের মীমাংসায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইব না। এখানে কেবল ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মাত্রেই মূল পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। যতদিন আধুনিক বৌদ্ধদিগের ন্যায় বিবর্ত্তনবাদীগণ না বলিতেছেন যে, শূন্যের বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগের নামান্তরে জগতের যাবতীয় পদার্থ কল্পনা করা হইতেছে, ততদিন সৃষ্টিকর্ত্তার সত্তায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। সুতরাং বিবর্ত্তনবাদের সমালোচনা করিলে নাস্তিকতার সাহায্য করা হইবে না। বস্তুতঃ কোন একটী সত্য আলোচনা করিবার সময় দেখিতে হইবে না যে, সে সত্যটী স্বীকার করিলে আমাদের বর্ত্তমান বিশ্বাস বা সংস্কার স্থানভ্রষ্ট হইবে কিনা। কোন একটী মত প্রস্তাবিত হইলে নিরপেক্ষ ভাবে তাহার যৌক্তিকতার অনুসরণ করিয়া চল, শেষে কোথায় দাঁড়াইবে ভাবিয়া ভীত হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ।

বিবর্ত্তনবাদ যুক্তিসিদ্ধ কি না? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এক জাতীয় জীব অবস্থাভেদে অন্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে কখন দেখিনাই, যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই তাহা তোমার কথায় অনুমান করিব কিরূপে? এই সকল লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁহারা কখন কোন জীব সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছেন কি না, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কখনও কোন জীব সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছেন কি না? সৃষ্টি কি রূপে হয়? আকাশ হইতে জীব মাটীতে পড়ে, না মাটী ফুঁড়িয়া উঠে? কতকগুলি মাটী লইয়া জীব উৎপাদন করা হয়, না চারিদিক হইতে মেদ মাংস অস্থি বুদ্ধি ছুটিয়া আসিয়া একত্র হইয়া জীব উৎপাদন করে? তখন তাঁহারা অবাক্ হইয়া থাকেন, বিশ্বাসের লক্ষণ এইরূপ যাহা বিশ্বাস করি, তাহা যুক্তিসিদ্ধ কিনা কখনও ভাবিয়া দেখি না; অথবা ভাবিলেও অতি অকিঞ্চিৎকর প্রমাণেই সন্তুষ্ট হই, কিন্তু বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কোন কথা কেহ বলিলেই অতি কঠোর ভাবে তাঁহার উদাহৃত প্রমাণ সকলের বিচার করি। এ কথাটী বিবর্ত্তনবাদীর কৃপাপ্রার্থনাসূচক নহে, বিশ্বাসের প্রকৃতি কিরূপ তাহাই দেখান হইল। নতুবা একটী ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে আর একটী ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বিবর্ত্তনবাদী কঠোর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অক্ষম হন, বিশ্বাস্য সহজ প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ না দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার স্থান আমাদের সমাজে নাই।

বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন, কোন জীব যে অবস্থায় উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন আর একটী অবস্থায় তাহাকে স্থাপন করিলে নূতন অবস্থায় টেঁকিয়া থাকিবার জন্য আপন পূর্ব্ব প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। তাহার সন্তান সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে পূর্ব্ব পুরুষের কিয়ৎপরিমাণে প্রাচীন ও কিয়ৎপরিমাণে নবীন প্রকৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়, এবং আপনারাও চেষ্টা

করিয়া প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন করে। উত্তরাধিকার যত অধিক হয়, প্রাচীন প্রকৃতির পরিমাণ তত হ্রাস হয় ও নূতন প্রকৃতির পরিমাণ তত অধিক হয়। শেষে সে জীব নূতন অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী এক পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি ধারণ করে। তখন তাহাকে তাহার পূর্ব্বজাতি হইতে বিভিন্ন, ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ভিন্ন জাতীয় বলিয়া গণ্য করা হয়। অবস্থা উপযোগী পরিবর্ত্তিত জাতির লক্ষণের ভিন্নতার পরিমাণ অনুসারে এই সকল জীবকে একজাতীয় কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীস্থ অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বিবর্ত্তনবাদীরা আরো বলেন যে, অঙ্গ বা যে বৃত্তিকে যত চালনা করা যায় সে অঙ্গ বা সে বৃত্তি তত প্রবল হয়; এবং পক্ষান্তরে যাহার চালনা যত অল্প হয়; তাহার কর্ম্মণ্যতার তত হ্রাস হয়; এবং বহুদিন নিশ্চলিত হইলে আর তাহার প্রবলতা থাকে না, ক্রমে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত অঙ্গ বা বৃত্তি চালনার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে একজাতীয় জীবের বিভিন্ন অবস্থা হেতু শারীরিক ও মানসিক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। জীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা ঘটিতেছে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন অতি ধীরে ধীরে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং লক্ষ্য করা দুষ্কর। কিন্তু বহুকালক্রমে যখন পরিবর্ত্তনের পরিমাণ খুব অধিক হয়, তখন সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের পরিমাণ এবং তাহার উপযোগী শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সময় অধিক হইলে পরিবর্ত্তনও খুব অধিক হয়। এই হিসাবে এক জাতীয় জীব সময়ান্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় হইয়া যাইতে পারে।

শ্বেত ও কৃষ্ণ বিপরীত বর্ণ, দেখিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝা যায়, এবং একটী ক্রম পরিবর্ত্তনে অন্যটীর রূপ ধারণ করিতে পারে বিশ্বাস হয় না, অথচ এই উভয়ের মধ্যে সারি সারি অনেক গুলি বর্ণ এমন সাজান যাইতে পারে যে, পাশাপাশি দুইটীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কেহ অনুভব করিতে পারে না। অথচ উহাদিগেরই ক্রম পরিবর্ত্তনে শ্বেত হইতে অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণবর্ণে চক্ষু উপস্থিত হয়। বৃত্ত ও হাইপারবোলার (Hyperbola) কত প্রভেদ অথচ বৃত্ত ক্রম পরিবর্ত্তনে হাইপারবোলার রূপ ধারণ করে, যে দিকে চাও দেখিবে অল্প অল্প পরিবর্ত্তনক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জীবরাজ্যেও এই রূপ।

বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় সকলেই জানে। বৃক্ষপত্র পরিবর্ত্তনক্রমে কুসুমে পরিণত হয়, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। অথচ বীজ ও বৃক্ষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আকৃতি প্রকৃতি বর্ণ গুরুত্ব গঠন সকলই বিভিন্ন, তথাপি বীজ যে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, একথা সকলেই বিশ্বাস করিবে। বীজ ও বৃক্ষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য এত যে কাহারও সাধ্য নাই বলিতে পারে যে, এইখানে বীজত্ব ঘুচিল ও বৃক্ষত্বের আরম্ভ হইল। অস্বচ্ছ তৈলবৎ পদার্থ শিশুরূপ ধারণ করে, এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তথাপি কোন বৈজ্ঞানিক জায়ায়ুবাসী ভ্রূণ অতিতীক্ষ্ণ অণুবীক্ষণ সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিতে পারে না, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভ্রূণের অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অথচ বীর্য্যবিন্দু অবস্থানুসারে ক্রম-বিকশিত হইয়া মনুষ্য

রূপ ধারণ করে, কে অবিশ্বাস করিবে? কয়েকটী বিন্দু সমষ্টি কয়েক মাসে মনুষ্যরূপ ধারণ করিতে পারে, এ বিশ্বাস যে করিতে পারে, কীটানুগণ কোটী কোটী বৎসরে ক্রম-বিবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিবে, সে কেন বিশ্বাস করিতে না পারিবে? একটীর অপেক্ষা অন্যটীর পরিবর্ত্তন অধিক একথা স্বীকার করি, কিন্তু দশমাসের সহিত যখন কোটী কোটী বৎসরের তুলনা করি, তখন এ ঘোর পরিবর্ত্তনেও আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ দেখিনা।

চালনা অনুসারে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কিরূপ ইতর বিশেষ হয়, আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি। যাহারা উভয় হস্ত সমানভাবে চালনা করে, তাহাদের দুই হাতে সমান বল। আমরা বামহস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্ত অধিকচালনা করি, অমা-দিগের বাম হস্ত অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অধিক পরিমাণে চরণ চালনা করে, তাহাদিগের চরণে অধিক বল, কামারদিগের হাত কত শক্ত, মুটিয়াদিগের স্কন্ধের বিকাশ কত। যে সকল জাতি চিবুকের অধিক চালনা করে, তাহাদিগের চিবুক দীর্ঘ, ব্রাহ্মণেরা বহুদিন মস্তিষ্কের চালনা করিয়া আসিয়াছে, সেজন্য ব্রাহ্মণ কুমারের বুদ্ধি শক্তি প্রখর। গাছে উঠিতে যে সকল জাতির হস্তের দীর্ঘতা প্রসারিত হয় তাহারা দীর্ঘ হস্ত, অন্য দিগের হস্ত ক্ষুদ্র। যাহাদিগের হস্ত পদ সমানভাবে প্রসারিত হয়, তাহাদিগের হস্ত পদ সম আয়তন। অন্যদিগের চালনার তারতম্যানুসারে কাহারও হস্ত অপেক্ষা পদ দীর্ঘতর, কাহারও পদ অপেক্ষা হস্ত দীর্ঘতর, কোন কোন জাতি হাতের ন্যায় পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা ধরিতে পারে, কেহ কেহ চারি হাত পায়ে অবাধে চলিতে পারে, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় কাহারও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্তাকারে ঘুরিতে পারে। আমরা করপত্র সম্মুখে পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে সরল রেখায় বা বৃত্তাকারে চালন করিতে পারি. কোন কোন জাতি তাহাদিগের পদপত্র এই রূপে চালান করিতে পারে। আবার বানরেরা তাহাদিগের অঙ্গুলি যেরূপ ঘুরাইতে পারে, কোন কোন বর্ব্বর জাতিও সেইরূপে ঘুরাইতে পারে, আমরা সেরূপ পারিনা। আমাদিগের মেরুদণ্ড ও চরণদ্বয় ঈষৎ ধনুরাকৃতি, বোধ হয়, পুরুষানুক্রমে আসন বদ্ধ হইয়া বসিবার এই ফল হইয়াছে।

একজাতীয় সহস্র বৃক্ষের মধ্যদিয়া বর্ব্বর-দিগকে বনমধ্যে চলিতে ফিরিতে হয়, সেখানে পশুব্যপথ অনুসরণ করিতে পশু পক্ষীর গতায়াত অনুসরণ করিতে মৃগয়া-কার্য্যে কেবল চক্ষুর চালনা করিতে হয়। কাযে কাযেই বর্ব্বরদিগের দৃষ্টিশক্তি এত বিকশিত হয় যে, যেখানে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, সেখানে তাহারা অনেক দ্রব্য দেখিতে পায় এবং সামান্য পদচিহ্ন দেখিয়া বলিয়া দিতে পারে, সে পদচিহ্ন কোনজাতীয় লোকের। এইরূপে আমরা যেখানে কিছুই শুনিতে পাই না, সেখানে কেহ শুনিতে পায়। যাহারা রাত্রিতে জাগিয়া থাকে, তাহারা বায়ুর শীতলতা স্পর্শ করিয়া বলিয়া দিতে পারে, রাত্রি কত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন।

"ন জাতু কামর কামানাং উপভোগেন
শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

যে যে রিপু পোষণ করে তাহার সেই রিপুর প্রাবল্য অধিক হয়। কামুকের কাম,

লোভীর লোভ বড় প্রখরশক্তি। আর যে যে রিপুর চালনা করে না, তাহার সে রিপু তত অপ্রখর বা অশক্ত হইয়া পড়ে। এই সত্য হেতু যতিগণ রিপুশূন্য হইতে সক্ষম হন। অপর পক্ষে যে কারুণ্য পরিচালন করে, কাহারও চরণে কণ্টকবিদ্ধ হইলে তাহার চক্ষে জলধারা বাহিত হয়, পথচারণক্রমে কোন ক্ষুদ্র কীটের জীবন নাশ না ঘটে এজন্য সাধু জৈন সম্মার্জ্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া ভবে পাদক্ষেপ করে, পক্ষান্তরে ব্যাধ ও কশাইগণ রুদন্তী পশুপক্ষীর কাতরতায় ব্যথিত হয় না; ঠগেরা মনুষ্যহত্যা করিতে কষ্ট অনুভব করে না, রাজপুত পিতা বারা-ণসী গনেশমন্দিরে ঘাতুকের লগুড়াঘাতে আপন সন্তানের মস্তক চূর্ণিত দেখিতে শিহ-রিত হয় না, রাজপুত রমণী স্বহস্তে কুসুম ললাম দুহিতার কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তনে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, তবে পরি-বর্ত্তনের পরিমাণ খুব অধিক হইতে পারে, যাহাতে একজাতীয় জীবকে ভিন্নজাতীয় বলিয়া অনুমান করিতে হয়, জাতীয় লক্ষণ এত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, একথা বিশ্বাস করিতে অনেকের ইচ্ছা হয় না। অপরিষ্কৃত বারিকুম্ভ কিছুদিন পর্য্যবেক্ষণ কর দেখিবে. তন্মধ্যে সূত্রের ন্যায় কতকগুলি কীটের উৎ-পত্তি হইয়াছে। এই কীটগুলি কখন বা নিশ্চল থাকে, কখন অগ্র ও পশ্চাৎভাগের সাহায্যে জলের উপরে উঠে, কখন নীচে নামিয়া যায়। আর কিছু সময় ধৈর্য্য সহ-কারে লক্ষ্য কর, দেখিবে, যে সূত্রাকার আব-রণ পরিত্যাগ করিয়া চরণ ও পত্র বিশিষ্ট মশক হইয়া তোমার শয়নগৃহমুখে উড়িয়া চলিবে, রাত্রিতে তোমাকে শিক্ষা দিবে তাহার ক্ষমতা কত। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কে বিশ্বাস করিবে যে, সূত্রাকার কীট মশকে পরিণত হয়। বোল্‌তা, ভিমরুল প্রভৃ-তির প্রথম আবির্ভাব হইতে উড়িবার ক্ষমতা হওয়া পর্য্যন্ত চারিটী বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া-ছেন। অপরিস্কৃত নদী বা তড়াগজলে কৃষ্ণ-বর্ণ লাঙ্গুলবিশিষ্ট টেঁসা বা কটকটে মাছের ছানার ন্যায় কতকগুলি জীব দেখিতে পাইবে। তাহারা লাঙ্গুল সাহায্যে সাঁতার দেয়। ইহা-দিগকে একপ্রকার মাছ বলিয়া তোমার ভ্রম হইতেছে, কিন্তু অপেক্ষা কর দেখিতে পাইবে অবস্থার পরিবর্ত্তনে শারীরিক প্রকৃতি পরি-বর্ত্তিত হইয়া ইহারাই চতুষ্পদ বিশিষ্ট ভেক-রূপ ধারণ করিবে। প্রথমতঃ ইহাদের উদর ও মস্তকের মধ্যে কোন ব্যবধান লক্ষ্য করিতে পারিবে না, ক্রমে ক্রমে উদর হইতে মস্তক স্বতন্ত্র হইবে। প্রথম হইতেই ইহাদের লাঙ্গুল জন্মে। তাহার পর সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় পশ্চাতের পা দুখানি দেখা দেয়। পশ্চাতের পা সম্পূর্ণ কার্য্যকর হইলে ইহারা লাঙ্গুল ও পদ সাহায্যে সাঁতার দেয়। তাহার পর সম্মুখের পা দুখানি দেখা দেয়। সম্মুখের পা সম্পূর্ণ হইলে ইহারা আর জলে থাকিতে ভালবাসে না। আবশ্যক হইলে চারি পা ও লাঙ্গুল সাহায্যে পূর্ব্বের মত সাঁতার দেয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বে জলের মধ্যে অবাধে যেমন ডুবিয়া থাকিত, এখন আর তেমন ডুবিয়া থাকিতে পারে না। শিশি মধ্যে রাখিয়া দেখ, যাহাদের সম্মুখের পা হয় নাই, তাহারা জলের মধ্যে ডুবিয়া সাঁতার খাইতেছে, কিন্তু যাহাদের সম্মুখের পা হইয়াছে তাহাদের ডুবিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হয়, তাহারা মাথা

তুলিয়া ভাসিয়া বেড়াইবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তরণ ক্ষমতার হ্রাস হওয়াতে পদশূন্যগুলির অগ্রে মরিয়া যাইবে। বেঙ্গাচি ও ভেকদিগের সম্মুখের পদ অপেক্ষা পশ্চাতের পদ দীর্ঘতর ও স্বতন্ত্র আকারে গঠিত। তাহার ও কারণ এই যে, পশ্চাতের পদগুলি দ্বারা তাহারা সন্তরণ করে, সম্মুখের পদগুলি হইলে তাহারা জল ছাড়িয়া মাটীতে উঠে। যখন চারিটী পা হইয়াছে তখনও দেখিবে বেঙ্গাচিগুলির লাঙ্গুল আছে, যত অধিক দিন তাহারা মাটীর উপরে থাকে এবং নদীতট ছাড়িয়া উপরে উঠিতে থাকে, একদিকে ঢালনার অভাবে অন্যদিকে মৃত্তিকার ঘর্ষণে লাঙ্গুলটী সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর, শেষে একবারে অদৃশ্য হইবে। জল ছাড়িয়া যখন শীতল নদীতটে ইহারা বাস করে, তখন দেখিলেই ইহাদিগকে ভেক-শিশু বলিয়া বোধ হইবে, পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য-শিশু বলিয়া ভ্রম হইবে না, কিন্তু হাতে তুলিয়া দেখ তখনও ইহারা সলাঙ্গুল ভেক। বয়স্ক ভেকের লাঙ্গুল নাই, একথা সকলেই জানেন। কিছু পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় স্থাপিত হইলে টিকিয়া থাকিবার জন্য নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সকলে ইহা পারে না। যাহারা পারে তাহারা টিকিয়া যায়, যাহারা পারে না তাহাদের মৃত্যু হয়। ডার্‌বিন ইহাকেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল ক্ষমতাশালী জীবগণ নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। অক্ষমেরা যুদ্ধে পরাস্ত ও হত হয়, সুতরাং ক্ষমতাশালী জীবগণই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এবং ক্ষমতাশালীর সন্তানগণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিত প্রকৃতি পরিবর্ত্তনক্রমে যে সকল সুভলক্ষণ দেখা দেয়, সেগুলি সযত্নে পোষিত হয়, দুর্লক্ষণ গুলির অপমৃত্যু সাধিত হয়। সুতরাং একদিকে যেমন জীবের উন্নতি ঘটে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইতে থাকে। সকলেই দেখিতে পান, উদ্যানপাল কত যত্নের সহিত আগাছাগুলি উৎপাটন ও সুবৃক্ষগুলি পোষণ করে। যদি কোন কারণে কোন বৃক্ষে কিছু নূতন প্রকারের একটী ফুল ফুটিতে দেখে, তবে চেষ্টা করিয়া সেই সকল কারণ ঘটাইয়া সেইরূপে তজ্জাতীয় অন্য বৃক্ষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া সেইরূপ নূতন ফুল আরো ফুটাইতে থাকে। এইরূপে বৃক্ষগুলির শ্রীবৃদ্ধি ও নূতন নূতন বৃক্ষশ্রেণীর উৎপত্তি উদ্যানপালের হস্তে সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

উদ্যানপালের ন্যায় পশুপাল যত্ন করিয়া পশুগণের উন্নতি ও বিভিন্নতা সাধন করে, যাহারা পারাবত প্রতিপালন করিয়াছে তাহারা জানে, দুইশ্রেণীর দুইটী পারাবত জোড় বাঁধিয়া নূতন পারাবত উৎপন্ন করে। উদ্যানপাল বা পশুপাল অল্প পরিমাণে যাহা করে, প্রকৃতিবশত জগতে বহুল পরিমাণ তাহা সাধিত হয়। এই জন্য ইহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অবস্থা পরিবর্ত্তন সাধিত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকে আমরা অতঃপর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। ইতিপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কেবল ক্ষমতাশালীদিগের পক্ষেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ঘটিয়া থাকে, এজন্য ইহার অপর নাম ভাগ্য নির্ব্বাচন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ভাগ্যনির্ব্বাচন একই কথা, একটী নিয়মের দুইটী মূর্ত্তি। যখন দেখি একটী মিথুন বহুসন্তান উৎপাদান

করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশ সংসার-সংগ্রামে হত হইতেছে, কেবল ক্ষমতাশালী কয়েকটী রক্ষা পাইতেছে, তখন বলি ইহা ভাগ্য-নির্ব্বাচন। আবার যখন দেখি, অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন বলি এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

বলাগিয়াছে, পিতা অপেক্ষা পুত্র পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অধিক পরিমাণে সাধন করে। জীব নিরন্তর আপনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতেছে, পিতা অপেক্ষা পুত্র, পুত্র অপেক্ষা পৌত্র পরিবর্ত্তিত অবস্থার অধিকতর উপযোগী হইতেছে, এতদ্বারা কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, সময়ে একদিন নূতন অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখন আর পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে না। তখন আর নূতন জাতি নূতন শ্রেণী গঠিত হইবেনা, জীব সৃষ্টি সমাপ্ত হইবে।

এ প্রকার অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে। যদি অবস্থার পরিবর্ত্তন পরিমিত হইত, তবে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অতি মন্দগতি হইলেও একদিন তাহার নাগাল পাইত। কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্তন অপরিমিত। ভূস্তরে, ভূপৃষ্ঠে প্রতিবেশ মধ্যে বোমমার্গে ভৌতিক, নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন নিরন্তর ঘটিতেছে, সুতরাং জীব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কোন দিন সমাপ্ত হইবে না, অনন্তকাল নূতন সৃষ্টি চলিতে থাকিবে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহস্র সুন্দর প্রতিমা ধরণী বক্ষমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন—সুসন্তান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দর্শন সুখলাভ কর। যুগে যুগে ধরণী বক্ষে নূতন স্তর সংযোজিত হইয়াছে, যুগে যুগে ধরণী বক্ষে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন উত্তীর্ণ হইয়াছে। যে যুগে যে পশু পক্ষী ধরণী উপরে বিচরণ করিত, যুগ পরিবর্ত্তন সময়ে অক্ষমদিগের কঙ্কাল রাশি তৎযুগস্তরে নিহিত রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন যুগের যাহারা ভাগ্যক্রমে নবীন যুগে পৌঁছিয়াছিল, নবীনতর যুগে তাহাগের সকলে পৌঁছিতে পারে নাই. কতকগুলি সে পারেই রহিয়া গিয়াছিল, এইরূপে ক্রমনির্ব্বাচনে বলবান হইতে বলবত্তরগণ নির্ব্বাচিত হইয়া বর্ত্তমান জীব রাজ্য সংঘটিত হইয়াছে। স্তর নিহিত কঙ্কাল রাশি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধি অটল ভাবে চিরদিন কেমন জীব জগৎকে শাসিত করিয়াছে।

ধরণী বক্ষমধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের যে দৃষ্টান্ত জ্বলন্তভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ধরণীর পৃষ্ঠদেশেও সেই দৃষ্টান্ত অন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। একদেশবাসী এক জাতীয় পশু পক্ষী বা উদ্ভিদ অন্য দেশবাসী তজ্জাতীয় জীবের সহিত তুলনা কর, দেখিবে পর্ব্বত বা প্রান্তর, শীত বা গ্রীষ্ম, কানন বা জনপদ ধীরে ধীরে তাহাদিগের প্রকৃতি কেমন পরিবর্ত্তন করিয়াছে। গৃহপালিত পশুর সহিত একজাতীয় বন্য পশুর প্রভেদ আছে, পার্ব্বতীয় জীবের সহিত প্রান্তরবাসী জীবের পার্থক্য আছে, শীত প্রধান দেশবাসীর সহিত গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থাগত পার্থক্যের পরিমান অনুসারে প্রাকৃতিক পার্থক্য অল্প বা গুরুতর হইয়াছে। তিমি মৎস্য পশুজাতীয় জীব; যখন স্থলে বাস করিত চারি হাত পায়ে চলিত। এখন জলবাসী হইয়াছে। বলের

প্রকৃতি এই,যেখানে বাধা অল্প সেখানে অগ্রে প্রকাশিত হয়। পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে চর্ম্ম, থাবা, দন্ত ইত্যাদি দুর্ব্বল লক্ষণ সকলে প্রতিভাত হয়, ক্রমে অস্থিপেশী বিকৃত করে। তিমির মস্তকাস্থি অদ্যাপি স্তন্যপায়ীদিগের মত, কিন্তু জলে সাঁতার দিতে অধিক বাধা না পায় এজন্য আকৃতিতে মাছের মত হইয়াছে। এখন আবশ্যক নাই তথাপি পূর্ব্বতন স্তন্যপায়ী অবস্থার দন্ত কয়েকটী অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে, সময়ান্তরে লোপ হইবে। পূর্ব্বের সে হস্তপদ এখন নাই; থলিয়ার মত স্থান অধিকার করিয়া মাছের সন্তরণ উপযোগী ডানার কার্য্য করিতেছে! এই থলিয়া কাটিয়া দেখ তাহার মধ্যে কাঁধ, বাহু, কব্জি, হাত, পা অঙ্গুলির অস্থিগুলি পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় তিমির দন্তের কোন আবশ্যক নাই, সুতরাং মাড়ি ফুটিয়া দন্ত প্রকাশিত হয় না। তিমির ভ্রূণ পরীক্ষা করিলে যেমন পূর্ব্বাবস্থার দন্তগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি নর ভ্রূণের পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বাবস্থার লাঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় মনুষ্যের লাঙ্গুলের কোন আবশ্যক নাই, এজন্য তিমির দন্তের ন্যায় মনুষ্যের লাঙ্গুল প্রকাশিত হয় না। অস্থি সকল সত্বেও তিমির বাহু যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন্তরণ উপযোগী মাছের ডানার মত হইয়াছে, সেইরূপ অস্থি সকলসত্বে বাদুড়ের বাহু উড়িবার উপযোগী পাখার আকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদিগের ন্যায় পশুদিগের হাত পায়ে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গুলি আছে। নখীদিগের নখ গণনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু অশ্বের পায়ে কোন অঙ্গুলি নাই। অঙ্গুলি কোথায় গেল? আমরা যাহাকে ঘোড়ার খুর বলি মধ্যমা পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ আকার ধারণ করিয়াছে। এই খুরের উভয় পার্শ্বে কাটিয়া দেখ চর্ম্মের ভিতর আর দুইটী অঙ্গুলি লুক্কায়িত আছে। তিমির বাহুও মনুষ্যের লাঙ্গুলের ন্যায় চালনার আবশ্যক না থাকাতে উহারা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু এত তিনটী অঙ্গুলির হিসাব হইল, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার তিন কি পাঁচ? আর দুইটী অঙ্গুলি কোথায় গেল?

পাঠক ভূস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। স্তরে স্তরে অশ্বকঙ্কাল নিহিত রহিয়াছে, পরীক্ষা কর বুঝিতে পারিবে, অশ্বের শারীরিক প্রকৃতি যুগপর্য্যায়ে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন স্তরে—যে অশ্বকঙ্কাল পাওয়া যায় তাহার পায়ে পাঁচটী অঙ্গুলি সমাবিষ্ট আছে, চারিটী পূর্ণ বিকশিত, একটী অস্ফুট। তাহার ঊর্দ্ধস্তরে চারিটী অঙ্গুলি, পূর্ব্বতন অস্ফুটটী অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধস্তরে তিনটী, পূর্ব্বস্তরের অস্ফুটটী এবার অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে একটী স্ফুট আর দুইটী অস্ফুট, আমাদিগের ভবিষ্য বংশীয়েরা দেখিবে বর্ত্তমান অস্ফুট দুইটী তখন অন্তর্দ্ধান করিবে। গরুর পায়ে এক একটী অঙ্গুলি আছে, সকলেই দেখিতে পায়। এই অঙ্গুলিটী এখনও স্ফুট কিন্তু অকর্ম্মণ্য, সময়ে উহা অস্ফুট হইবে। তাহার পর আর চর্ম্ম তলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

একই জাতীয় বন্য ও গৃহপালিত জীবের মধ্যে অবস্থা বৈষম্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য ঘটিয়াছে, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বন্যহংসের দেহভারের সহিত পাখা ও পায়ের ভার তুলনা করিলে দেখা যায়,পায়ের অপেক্ষা পাখার ভার অধিক। কিন্তু গৃহপালিত হংসের পাখা অপেক্ষা পায়ের ভার অধিক হয়। বন্য হংস পা অপেক্ষা পাখা অধিক চালনা করে, এজন্য তাহার পা অপেক্ষা পাখা অধিক বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে এইরূপ কারণেই গৃহপালিত হংসের পায়ের ভার অধিকতর হইয়া থাকে।

যে সকল দেশে গাভী ও ছাগী দোহন করা হয়,সে সকল দেশের গাভী ও ছাগবৎসের বাঁট, যে সকল দেশে দুগ্ধ দোহন করা হয় না—যে সকল দেশে গাভী ও ছাগবৎসের বাঁট অপেক্ষা স্থূলতর দেখিতে পাওয়া যায়। বন্যপশুদিগের কর্ণদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত থাকে, শব্দ শুনিবার জন্য "কাণ খাড়া" করিয়া রাখা তাহাদের নিতান্ত আবশ্যক। গৃহপালিতপশুর বন্যপশুর ন্যায় বিপদের ভয় নাই, এজন্য কোন না কোন দেশে গৃহপালিত পশুমাত্রেরই কাণ ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে।

সভ্য মানবের শিশুর মনোবিকাশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়,শিশু প্রথমে বর্ব্বরের মানসিক অবস্থা অনুকরণ করে, ক্রমে তদপেক্ষা সভ্যতর অসভ্যের অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমে পিতা মাতার সভ্য অবস্থা সমুচিত মনোবিকাশ প্রাপ্ত হয়। জরায়ুবাসী ভ্রূণ এইরূপে পূর্ব্বতন শারীরিক প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া ক্রমে পিতা মাতার আকৃতি ধারণ করে। জরায়ুবাসী ভ্রূণের আকৃতি-পর্য্যায়প-র্য্যবেক্ষণ করিলে যে সকল জীবপ্রকৃতি ক্রম-পরিবর্ত্তনে জীবের শ্রেষ্ঠতম মনুষ্যমূর্ত্তি উৎপাদন করিয়াছে, কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। গোধা নানাশ্রেণী, অনেকেই দেখিয়াছেন, যেশ্রেণী গোধা জলমধ্যে বাস করে অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় তাহারা কাণকুয়া (কর্ণ কুহর?) দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। যে শ্রেণী গোধা স্থলচর তাহাদিগের কাণকুয়ার কোন প্রয়োজন নাই। অথচ অস্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাদিগেরও স্কন্ধের উভয় পার্শ্বে কাণ কুয়ার ছিদ্র দুইটী পরিলক্ষিত হইবে। যেরূপ ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র বিন্দু হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য ভ্রূণ আদৌ সেইরূপ অতিক্ষুদ্র একটী বিন্দুমাত্র। তাহার পর যখন সে বিন্দুটী জীবরূপে পরিণত হয়, তখন দেখিতে একটী শ্যানমৎস্যের (Jelly fish) আকার। অনন্তর তাহার দেহে মেরুদণ্ড দেখা দেয়। কিন্তু তখনও কেহ বলিতে পারে না যে জীবিত পদার্থটী মৎস্য, সর্প, পক্ষী বা পশু কাহার আকার ধারণ করিবে। আরো কিছুদিন পরে বুঝা যায়, সে কোন শ্রেণীর স্তন্যপায়ী হইবে। আরো কিছুদিন না যাইলে নরভ্রূণ নর আকার ধারণ করে না। মৎস্যের ন্যায় নরভ্রূণের স্কন্ধের উভয় পার্শ্বে দুই কাণকুয়ার ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, অষ্ট্রেলিয়াবাসী দু এক প্রকার স্তন্যপায়ী ভিন্ন আর সকল প্রকার স্তন্যপায়ীর মলমূত্র নিঃসরণ ও জননী-শক্তি পরিচালন ভিন্ন ভিন্ন নালী দ্বারা সম্পন্ন হয়। মাছের মত নিম্নশ্রেণী মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের উক্ত ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার একটী মাত্র নালী আছে (Cloacal passage)। জরায়ুবাসী নরভ্রূণকেও মৎস্যের ন্যায় একইমাত্র নালীদ্বারা মলমূত্র নিঃসরণ করিতে হয়। আবার নরভ্রূণের হৃৎপিণ্ড মৎস্যের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় একটী ভস্ত্রামাত্র। মৎস্যাবস্থা অতিক্রম করিলে নরভ্রূণের একটী লাঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়। দেহের পরিমাণের সহিত তুলনা করিলে নরভ্রূণের লাঙ্গুল পরিমাণ নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে সময়ে ভ্রূণের পা

তুখানি যত বড়, লাঙ্গুল তাহা অপেক্ষা দীর্ঘতর। অন্য জন্তুর লাঙ্গুলে যে সকল পেশী (Extensor) থাকে, নরভ্রূণের লাঙ্গুলেও সে সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূণের ছয়মাস বয়সে সমস্ত দেহ লোমে আচ্ছাদিত হয়, কপাল ও কর্ণ পর্য্যন্ত লোমে ঢাকিয়া যায়, কেবল তুই হাত ও পায়ের তলায় কোন লোম দেখা যায় না। আমাদের নিম্নগত অনেক জাতীয় জীবের ঐ সকল স্থানে লোম জন্মে না। যখন ভ্রূণের দেহ পরিমাণ এক ইঞ্চ মাত্র, আচার্য্য ওয়াইমান বলেন, তখন তাহার পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি অন্যান্য অঙ্গুলি অপেক্ষা ছোট থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গুলির সমান্তরাল না হইয়া বানরের মত একটী কোণ করিয়া পাতার একপার্শ্ব দিকে উদ্গত হয়।

অবস্থা পরিবর্ত্তনে শারীরিক প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখান হইল, ইহার দ্বারা কেহ মনে করিবেন না যে, অবস্থা পরিবর্ত্তন কেবল শরীর বিকৃত করিয়া ক্ষান্ত হয়, মানসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু ঘটিয়া থাকে, ইহা পণ্ডিত সমাজ স্বীকার করিয়াছেন। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের কতকগুলি দৃষ্টান্ত "মানবপ্রকৃতি" নামক গ্রন্থে দেখান হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিবার আবশ্যক নাই।

মনের মানুষ।

কখনও পাইয়াছ? কেহ কখনও পাইয়াছে?—যাহা আদর্শ, যাহা সুন্দর যাহার জন্য নিস্তব্ধ নিশীথের শূন্যময়, আঁধারময় দিগন্তের মত নিরাশে, বিষাদে কত দিন তোমার হৃদয় হাঁই তুলিয়াছে, তাহাকে কখনও পাইয়াছ? অভাব কখনও ঘুচিয়াছে, চোখের জল কখনও শুকাইয়াছে? যিনিই যাহা বলিয়া পরকে শান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করুন, সকলেই একবার অনুসন্ধান করিলে জানিবেন যে, এ সংসারে অভাব প্রকৃত, ভাব বিদ্যুৎ চমক, হাসিই বিকৃতি এবং কান্নাই প্রকৃতি। কেনা জানে যে, শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিষ্ঠ হয়, আবার বৃদ্ধ কি এক অব্যক্ত, অজ্ঞাত, অসহ্য যন্ত্রণায় তুই চক্ষুর জল ফেলিয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে অন্তর্হিত হয়! জন্ম কাঁদিতে কাঁদিতে, মৃত্যু কাঁদিতে কাঁদিতে। এ সংসারের কোন্ নিনাদ আর্ত্তনিনাদ নয়? বিধাতা আর কিছু মুক্ত হস্তে দিন্ আর না দিন, অমিত হস্তে মানুষের চক্ষে জল দিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত। আবার এমন তুর্ভাগাও সংসারে আছে যে, সে সকলেরই মত তুঃখী কিন্তু অধিকন্তু সে বিচারার চোখে জল নাই। আর হাসি? হাসির মত বিড়ম্বনা এ সংসারে আর কি আছে? অমন বিকৃত পদার্থ আর কি আছে? মানুষ যখন প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, তাহার তুই পংক্তিতেই দন্তশ্রেণী আছে, বলদেখি তখন তাহার মন বিকৃত না প্রকৃত? আমি বলিব এবং প্রমাণ করিব যে, মানুষের মনে বিকার না জন্মিলে সে প্রায় হাসে না। আমি দেখিতে পাই যে, লোকে হয় অহঙ্কার আছে বলিয়া হাসে, না হয় ঈর্ষ্যায় হাসে,

আর না হয় আরও নীচ অবস্থা পাইয়া হাসে। তুমি পাগলের পাগলামী দেখিয়া হাসিতেছ, কেননা তুমি প্রকৃতিস্থ, অর্থাৎ তোমার এমন কিছু আছে যাহা তাহার নাই। আর তুমি রসিকতার ফাঁদ পাতিয়া হাসিতেছ, কেননা তুমি মনে করিতেছ তোমার কি ক্ষমতা, আর যাহার প্রতি বাণ বর্ষণ করিতেছ সে কেমন অপ্রতিভ হইতেছে। এইরূপে বিশেষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সকল হাসিই এইরূপ বিকৃত মনের বহিঃপ্রকাশ। তবে মানি যে, একরকম হাসি আছে যাহাকে হাসিও বলিতে পারিনা, কান্নাও বলিতে পারিনা, যাহা প্রফুল্লতার প্রকাশক—এমন কিছু আছে। লোকে ভ্রমে পড়িয়া তাহাকে হাসি বলিয়াছে, কেননা সে অবস্থায় মুখচোখের ভাব প্রায় তেমন হয়, হাসির সময় যেরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া এইস্বর্গীয় জ্যোৎস্নাকে হাসি বলিলে, তোমাদের শাস্ত্রে যাহা কিছু চক্ চক্ করিয়া জ্বলে, তাহাই স্বর্ণ নয় কেন? আর সেই প্রফুল্লতাই বা কত টুকু? কোন্ হাসিতে তুঃখের স্মৃতি স্ফূরিত হয় না? খাটী প্রফুল্লতা কোথায়? কবি ঠিকই বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রতি হাসিই তুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত; সেই সঙ্গীতই উৎকৃষ্ট, যাহাতে গভীর যাতনার কথা কীর্ত্তিত হয়। দূর হোক ছাই; আসল কথা,—কেহ কাহারও মনের মানুষ পাইয়াছে? যাহা যেমন চাও, তাহা তেমনি পাইয়াছ? ভোগসুখ মিলিয়াছে? আকাঙ্ক্ষা পুরিয়াছে? বন্ধুত্ব, প্রণয়, ভালবাসা, স্নেহ ইহার কিছু কখনও লাভ করিয়াছ? কাহারও যদি মিলিয়া থাকে বল ভাই, আমার এই কলঙ্কিত মস্তকে, এই অগ্নিদগ্ধ বক্ষস্থলে তাঁহার পদধূলি লইয়া মাখিব। শ্রীরাধা হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত—সকলেরই সাধের বাঁধা ঘর আগুনে পুড়িয়া যায়, সকলেরই আশার আরাধ্য অমিয় সাগর গরলময় হইয়া উঠে। সংসারে যখন প্রবেশ করি নাই, তখন ছিলাম ভাল। তখন কেবল সব খাটী জিনিসের স্বপ্ন দেখিতাম, এ গিল্টি কত দূরে ছিল!! মনে আছে, একবার এক গোয়ালিনী—তুধে জল মিশাইয়াছিল শুনিয়া তাহার জুয়াচুরীর কথা ভাবিয়া তাহাকে কতই ঘৃণা করিয়াছিলাম, এখন দেখি এ সংসারে সকল তুধেই জল মিশ্রিত, কোথাও বা গোমূত্র সকল তুগ্ধই নষ্ট করিয়াছে; আর মানুষ তাহাই ক্ষীর করিয়া গুড় মাখিয়া বড় মিষ্ট বলিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে। কোথায় বন্ধুত্ব, সকলেই স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত। কোথায় প্রণয়, কোথায় ভালবাসা, কোথায় স্নেহ, সকলেই আপনার সুখ খোজে। কোথায় ভোগ সুখ, সবই যে হলাহলময়। এ সংসারে আসিলাম কেন? যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলাম, সে ছুরিকাঘাত করিয়াছে, কি করিব তবুও বন্ধু বন্ধু বলিয়া তাহাকেই ডাকিতেছি। বুঝিয়াছি যে, ঐ যে প্রণয়ের হাসি—ভালবাসার সোহাগ, উহা কপটতা, বৃথা মন ভুলাইবার চেষ্টা, বুদ্ধিমানকে ভেড়া করিবার বাসনা, একটী কৃতদাস পাইবার অভিসন্ধি; সবই বুঝিয়াছি, তবুও জানিয়া শুনিয়া উহাকেই পবিত্র প্রণয় বলিয়া শত চুম্বনদিয়া বুকে মাথায় করিতেছি। একবার সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, কোন দেশে নাকি স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য একরকম কি বিষ খাইতে অভ্যাস করিতেছে; অভ্যাসটাও নাকি অনেক হইয়া আসিয়াছে। অভ্যাসে সকলি হয়;

আমরাও তাই এই ভালবাসার নামে ও পবিত্রতার নামে রাত্রিদিন হলাহল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা মানুষের বিকৃত অবস্থা প্রাপ্তির পরিচয়ের জন্য আর কি প্রমাণ চাই? এই জন্যেই সংসারের পরিতৃপ্ত লোকদিগকে জ্ঞানীগণ মায়াপাশ বদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বুঝা গেল, এসংসারে মনের মানুষ মেলে না। কাহারও মেলে নাই, কখনও মিলিবে না। এসংসারের অতি অভিলষিত পদার্থগুলির মধ্যে কেহই ত মনের মানুষ নয়, আবার তাহাদের এমনি প্রকৃতি যে, তাহারা মানুষের হাড়ে হাড়ে এমনি দুঃখ প্রবেশ করাইয়া দেয় যে, সেই দুঃখ জর্জ্জরিত কৃপাপাত্র, আর কোথাও আপনার মনের মানুষ আছে কি না,ইহারও অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা হারায়। বিরহিনী মরিবার সময় পুনর্জ্জন্ম চাহিয়া মরে, কেন না তাহার আকাঙ্ক্ষা পোরে নাই। বৃদ্ধ যখন সকল সাধের সামগ্রী রাখিয়া মৃত্যুর মুখে যাইতে থাকে, যখন শেষ যন্ত্রণায় শরীর মন মহা অভিভূত হইয়া আসিতে থাকে, সে তখনও উইল করে, টাকা গণে, ছেলের চাঁদমুখ দেখে, পরিবারের কান্নারস্বরে আপনার যন্ত্রণাময় রোদনস্বর যোগ করে; ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দুর্ঘটনা মানুষের প্রকৃতিতে আর কি ঘটিতে পারে! ইতিহাসে লেখে যে, সুলতান মামুদ মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বলুণ্ঠিত ধনরাশি আপনার মৃত্যুশয্যার চতুষ্পার্শ্বে আনিয়া রক্ষা করাইয়াছিলেন। এমন কত শত ঘটনা লিখিত অলিখিত, দৃষ্ট অদৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। মানুষ এত ভ্রান্ত কেন? অন্ততপক্ষে অভিমানে, রাগে ও ক্ষোভে ঐ সকল অসার অপদার্থগুলিকে, অসুখ উৎপাদক—জীবনের কণ্টক, মরণের বিষগুলিকে কেন লোকে পরিত্যক্ত মলমূত্রের মত পরিহার করে না? বোধ হয় এইটুকু হইলেও, এই মহা কঠোরতা এবং হৃদয়হীনতার সংসার-যুদ্ধে একটুকু ক্ষণিকতৃপ্তি লাভ করা একটা সম্ভবপর ব্যাপার হইত। হায় হায়, তবুও ত কেহ বুঝিল না।

যিনি এই মহা ভ্রান্তির জালে আপনাকে জড়াইয়া সুখী করিতে চান করুণ, আমি করিব না। আমার আজিও আশা আছে, আজিও চক্ষুর জল ফুরায় নাই; আমি আমার রোদন ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া বলিব, আমার মনের মানুষ মেলে নাই, বন্ধুত্ব মেলে নাই, ভালবাসা মেলে নাই। আশা কি পুরিবে না? এ জগতের অন্তরালে কি সমদুঃখী কর্ণ নাই? না সকলি পাষাণ? হিন্দু, তুমি যে তোমার দেবতাকে পাষাণে গড়, সে কি এই নিষ্পত্তি করিয়াছ বলিয়া? বল দেখি, যদি তিনি পাষাণ, তবে সে পাষাণের চরণে ফুল ফেলিয়া কি সুখ পাও? আমি পাষণের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিব না।

তবে এ প্রাণ কোথায় রাখিব? হে অনন্ত প্রকৃতি, হে বহুদূর প্রসারিত শূন্য সাগর, আমার এ প্রাণ—ক্ষুদ্র প্রাণ—রাখিবার স্থান কি তোমরা যোগাইতে পার না? এ পৃথিবীর কঠোর মৃত্তিকায় আছাড় খাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হইয়া গেল; অত শূন্য, অত স্থান, অত রাজ্য, আর আমার ক্ষুদ্র প্রাণ রাখিবার স্থান নাই? অকর্ণ শূন্য রাজ্য, অচেতন অনন্ত প্রদেশ আমার কথা শুনিবে কেন!

কিন্তু হায় এ হৃদয় যে প্রবোধ মানে না; তবুও যে মনের মানুষ চায়!! এ হৃদয়ে এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অথচ কি মনের মানুষ মিলিবে না? ক্ষুধায় অন্ন পাই, পিপাসায় জল পাই, নিশ্বাসে বায়ু পাই; আর আকাঙ্ক্ষায় অনুরাগ পাইব না, যাতনায় সহানুভূতি পাইব না? যে যাহা বলুক, হে জগৎকর্ণ, হে সমদুঃখী হৃদয়, তুমি আমার মনের মানুষ হও! দেখ, আমার ভাঙা প্রাণ, তাপদগ্ধ হৃদয়, বিষময় আশা, তুমি আমার মনের মানুষ না হইলে আমার কি গতি হইবে?

অপরাধ কাহার, তাহা ত জানি না। কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। ভোগ সুখ অসার, বাসনাময় হৃদয় পাইয়াছিলাম, আপাতমধুর ভোগ সুখ পাইয়াছিলাম। কেহ বাধা দেয় নাই, বরং সকলকেই সেই পথের পথিক দেখিয়াছিলাম। বলদেখি এখন যে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, এ কাহার অপরাধে? আমি কলঙ্কিত বলিয়া লোকসমাজে ঘৃণ্য। আমার এ সাধের আশায়, সাধের আকাঙ্ক্ষায় কে কলঙ্ক ঢালিল, ও কে বিষ পুরিয়া দিল? আজি যে আমি পশ্চাৎবর্ত্তী পথিকদিগকে উপদেশ দিবার বা বড়াইপানা করিবার ছলে আপনার কান্না কাঁদিয়া লইতেছি, বল দেখি, এ চক্ষুর ধারা কে বহাইল। অসার সংসার? কে করিল তাহা ভাবিয়া কি করিব? কষ্ট ত আমিই পাইতেছি; তবে আমিই করিয়াছি। অসারকে কোলে তুলিয়া আমার সুখ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে; আর আমার কলঙ্কিত মস্তক রাখিবার স্থান কোথাও নাই। হে আদি কর্ণ, তুমি যদি বধির না হও, পাষাণ না হও, তবে বলদেখি কে আমাকে কাঁদাইল, কে আমায় এ ভবসাগরে নিরাশ্রয় করিল? আর দেখ, আমি আজি বুঝিয়াছি সংসার অসার, ভালবাসা আত্মপ্রতারণা, তবে তুমি আমার মনের মানুষ হইবে না কেন? ভাই রে, যদি জন্মিয়াছ, যদি আশা পাইয়াছ; তবে বিশ্বাস কর, মনের মানুষ মিলিবে!

নাস্তিকতা।

আমাদের "পাশ্চাত্য মায়াবাদ" বিষয়ক প্রস্তাব এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের যাহা বলিতে অবশিষ্ট আছে তাহা বিষয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে প্রকাশ করিব। আমাদের পঞ্চম সংখ্যক প্রস্তাবে দার্শনিক প্রকৃতবাদের "ইন্দ্রিয়াতীত জড়ের" মত ব্যাখ্যা করিয়া আমরা উপসংহারে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এতদ্বিষয়ে নাস্তিক ও আস্তিক মায়াবাদের মত কি, তাহা ব্যাখ্যা করিব। অদ্য নাস্তিক মায়াবাদের কার্য্যকারণমত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া নাস্তিক মায়াবাদ জড় ও ঈশ্বর উভয়েরই অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অদ্য তাহাই দেখাইব। আমরা মায়াবাদের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া নাস্তিকতা ব্যাখ্যা করিতেছি; কিন্তু পাঠক এই প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রকার নাস্তিকতার দার্শনিক যুক্তি দেখিতে পাইবেন।

কার্য্য কাহাকে বলি? যাহা পূর্ব্বে ছিল না, নূতন সংঘটিত হইল, তাহাই কার্য্য। এই জগৎ কার্য্যময়; যাহা ছিল না নূতন সংঘটিত হইল, এরূপ ঘটনা জগতে প্রতি

মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে; কার্য্য কি তাহা আর বহুলরূপে বুঝাইতে হইবে না। এই বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু কারণ কি? প্রত্যেক কার্য্যেরই কি কারণ আছে? কারণ-শূন্য কার্য্য কি হইতে পারে না? যদি তাহাই হয়, এই কার্য্য-কারণ-ঘটিত বিশ্বাস আমরা কোথায় পাইলাম? এই সব প্রশ্ন লইয়াই যত মতভেদ।' দেখা যাক্ নাস্তিকতা এ সম্বন্ধে কি বলে।

ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা দ্বারা আমরা কি জানিতেছি? আমরা জানিতেছি, এই জগৎ পূর্ব্ব-পর-সংঘটিত ইন্দ্রিয়ব্যাপারসমষ্টি মাত্র; প্রতি-নিয়ত উচ্ছ্বসিত ইন্দ্রিয়ব্যাপারতরঙ্গময় একটী প্রকাণ্ড সাগর মাত্র। এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা, তার পর আরো সহস্র ঘটনা, এইরূপে অসংখ্য ইন্দ্রিয়-ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। এই সমুদায় ইন্দ্রিয়ব্যাপারের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি? ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, একটী আর একটীর পূর্ব্ববর্ত্তী একটী আর একটীর পরবর্ত্তী, এই পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব (Antecedence) এবং পরবর্ত্তিত্ব (Sequence) ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে আমরা একটী ঘটনাকে আর একটীর কারণ বলি, একটী ঘটনাকে আর একটী ঘটনার কার্য্য বলি, এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কোথা হইতে আসিল? যদি ঘটনাসমূহের মধ্যে পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাইলাম? আমাদের সমালোচ্য কারণবাদের এই বিষয়ে উত্তর এইঃ—এই পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধই যখন গাঢ়তর হয়, যখন একটী বিশেষ অবস্থা ধারণ করে, তখন তাহাকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বলি। তখন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে কারণ বলি, আর পরবর্ত্তী ঘটনাকে কার্য্য বলি। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। আমি প্রদীপে একখণ্ড কাগজ ধরিলাম, ধরিবামাত্রই কাগজখানা পুড়িয়া গেল। এস্থলে আমার কাগজ খানাকে কোন বিশেষভাবে ধরা আর কাগজখানা পুড়িয়া যাওয়া, এই দুই ঘটনার মধ্যে পূর্ব্ব-পরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে, অথচ ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে আমরা এরূপ মনে করি না; পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনামাত্রই কারণ নহে। আবার দেখি কাগজখানার অগ্নি সংস্পর্শ হওয়া, আর পুড়িয়া যাওয়া এই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে ও পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধই রহিয়াছে; কিন্তু এস্থলে সম্বন্ধটীকে কেবল পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব না বলিয়া আমরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বলিতেছি। বাস্তবিক কি এই দুই স্থলে ঘটনাবলীর সম্বন্ধের কোন পার্থক্য আছে? অগ্নিস্পর্শ এবং কাগজখানা দগ্ধ হওয়া এই দুই ঘটনার মধ্যে কি পূর্ব্বপর-বর্ত্তিত্ব ছাড়া আর কোন- সম্বন্ধ আছে? প্রকৃতবাদ এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা আমরা জানি। প্রকৃতবাদ এস্থলে দহন-কার্য্যের কারণরূপী একটী ইন্দ্রিয়াতীত দাহিকাশক্তিতে বিশ্বাস করে। সমালোচ্য কারণবাদ বলে এই বিশ্বাস কল্পনামাত্র। ইন্দ্রিয়জ্ঞান এই বিষয় আমাদিগকে কিছুই বলে না, আর কার্য্যগত জীবনের পক্ষে এই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। অগ্নিস্পর্শ এবং কাগজ-খণ্ড দহন এই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বপর-বর্ত্তিত্ব ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধই নাই; তবে এই পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্বকে এখানে কার্য্যকারণত্ব বলিবার কারণ এই যে, এস্থলে এই সম্বন্ধ বিশেষ গাঢ়তা ধারণ করিয়াছে। হস্ত

দ্বারা কাগজখণ্ডকে কত স্থানে কত ভাবে ধরিয়াছি, অথচ কাগজখণ্ড দগ্ধ হয় নাই; কিন্তু জ্বলন্ত প্রদীপে ধরিবামাত্রই, দেখিয়াছি, নিয়তই কাগজখণ্ড পুড়িয়া যায়; দহনকার্য্য অগ্নিস্পর্শের নিয়ত-পরবর্ত্তী ঘটনা, (invariable consequence) আর অগ্নিস্পর্শ দহন-কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা (invariable antecedent.) দুটী ঘটনা অথবা ঘটনাবলীর মধ্যে এই নিয়ত পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব-(invariable antecedence and sequence *) কেই আমরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বলি। নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা ঘটনাবলীকে কারণ বলি, আর নিয়ত-পরবর্ত্তী ঘটনা বা ঘটনাবলীকে কার্য্য বলি। অগ্নি দহনকার্য্যের কারণ, ইহার অর্থ এই যে, কোন দহনযোগ্য বস্তুর অগ্নি-সংস্পর্শ আর দহনকার্য্য এই দুই ঘটনার মধ্যে নিয়ত-পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে; অগ্নিসংস্পর্শ দহনকার্য্যের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। পুষ্প ঘ্রাণোৎপাদনের কারণ ইহার অর্থ নাসিকারন্ধ্রে পুষ্পরেণু প্রবেশ ঘ্রাণোৎপাদন কার্য্যের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। ঔষধ রোগ নিবারণের কারণ ইহার অর্থ শরীরের উপর ঔষধের প্রক্রিয়া এই ঘটনা রোগ নিবারণের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, একটী কার্য্যের একাধিক কারণ থাকিতে পারে। কার্য্যমাত্রেরই সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল আনুষঙ্গিক ঘটনা অনেক থাকে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে; অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুসংখ্যক নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বা অবস্থার সংযোগ ব্যতীত একটী কার্য্য সংঘটিত হয় না। কোন বিশেষ ঔষধ সেবন দ্বারা কোন বিশেষ রোগ আরোগ্য হইবার পক্ষে বহুল ঘটনার সংযোগ আবশ্যক, যথা, সেই ঔষধ প্রস্তুত, ঔষধ সেবন, শরীরের পূর্ব্বাবস্থা, সেবনের পর রোগীর আচরণ ইত্যাদি। এই সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলির নিয়তই প্রয়োজন; এই নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহের সমুদায়কে সচরাচর কারণ বলে না; সচরাচর বাক্যালাপের সময় কারণের উল্লেখ করিতে গিয়া অনেক সময়েই আমরা ২।১ টীর মাত্র উল্লেখ করিয়া থাকি, যথা, কোন রোগ নিবারণের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়া থাকি, অমুক ঔষধ সেবন দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়াছে। এইরূপ উক্তি দৈনন্দিন ব্যবহারে মার্জ্জনীয়; কিন্তু কেবল ঔষধ সেবনই রোগমুক্তির এক-মাত্র কারণ নহে; বিজ্ঞানের চক্ষে নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় ঘটনাই কারণ পদাভিষিক্ত।

এস্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে, কোন কার্য্যের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থাই যদি ইহার কারণ হয়, তবে কি দিবাকে রাত্রির কারণ বলিতে হইবে, কিম্বা রাত্রিকে দিবার কারণ বলিতে হইবে? দিবা রাত্রি পরস্পরের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, অথচ কেহই বিশ্বাস করেনা যে, রাত্রির কারণ দিবা, কিম্বা দিবার কারণ রাত্রি। এই বিষয়ের মীমাংসা এইঃ—"নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী" বাক্যটী আমরা একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের ব্যবহৃত "নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী" অর্থ কেবল এই নহে যে "যাহা অতীত সময়ে কার্য্য বিশেষের পূর্ব্বে নিয়ত সংঘটিত হইয়াছে"; আমাদিগের গৃহীত নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তীর অর্থ—"যাহা অতীত সময়ে কার্য্য বিশেষের পূর্ব্বে

*See J. S. Mill's *System of logic* Vol. I, Book II. Chap. V. Of the Law of Universal Causation.

নিয়ত সংঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে নিয়তই ঐ ঘটনার পূর্ব্বে সংঘটিত হইবে"। [ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস অসম্ভব ; আমরা কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম-জনিত আশা ও বিশ্বাসের কথাই বলিতেছি] এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের এই অর্থে দিবা ও রাত্রি পরস্পরের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে। সকল অবস্থাতেই দিবা রাত্রির কিম্বা রাত্রি দিবার পূর্ব্বে সমুপস্থিত হইবে আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। আমরা এই বিশ্বাস করি যে, যতদিন দিবাবসানে সূর্য্যাস্ত হইবে তত দিনই দিবা রাত্রির নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিবে, এবং যতদিন রাত্রি অবসানে সূর্য্যোদয় হইবে তত দিনই রাত্রি দিবার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিবে। সুতরাং আমাদের গৃহীত অর্থে দিবা এবং রাত্রি পরস্পরের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে। সুতরাং পরস্পরের কারণ নামেও উচ্য নহে। যাহা হউক "নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী" বাক্যটীকে আমাদের বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করাতে যদি কেহ আপত্তি করেন,তবে আমরা ইহাতে আর একটী বিশেষণ যোগ করিতে পারি। কোন কার্য্যের কারণকে কেবল ইহার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা না বলিয়া ইহার নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনা (invariable and nconditional antecedent) বলিতে পারি। নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনার অর্থ এই যে, যে ঘটনা কার্য্য বিশেষের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী হইবার পক্ষে অন্য কোন ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। রাত্রির সম্বন্ধে দিবা কিম্বা দিবার সম্বন্ধে রাত্রি এই শ্রেণীস্থ ঘটনা নহে। রাত্রির নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনা হইবার পক্ষে দিবা সূর্য্যাস্তের অপেক্ষা রাখে ; আমরা জানি সূর্য্যাস্ত না হইলে দিবার পর রাত্রি আসিত না, দিবা চিরস্থায়ী হইত। তেমনি, দিবার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা হইবার পক্ষে রাত্রি সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা রাখে ; সূর্য্যোদয় না হইলে রাত্রির পর দিবা আসিত না, রাত্রি চিরস্থায়ী হইত। সুতরাং দিবা ও রাত্রি পরস্পরের নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে, সুতরাং পরস্পরের কারণ নামেও উচ্য হইতে পারে না। কার্য্যের নিয়ত-নিরপেক্ষ-ঘটনা বা ঘটনাবলীই কারণ নামে উচ্য। আমাদের সমালোচ্য কারণবাদের মতে এই নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ব্যতীত কারণের আর কোন লক্ষণ নাই। লোকে কারণ বলিতে ইহাই বুঝে এবং এরূপ লক্ষণাক্রান্ত কারণ ভিন্ন অন্যবিধ কারণ কল্পনা অনর্থক মাত্র। কার্য্যকারণত্বে আমাদের যে বিশ্বাস তাহা এই কারণবাদ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপেই পরিতৃপ্ত হয় ; সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত কারণ কল্পনার প্রয়োজন কি? জগতে যে অসংখ্য কার্য্য পরম্পরা সংঘটিত হইতেছে, তন্মধ্যে যদি কোন কার্য্যের কারণ জানিতে চাও তবে "কার্য্যের নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনাই ইহার কারণ" এই বৈজ্ঞানিক মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, জ্ঞান-কৌতুহল পরিতৃপ্ত হইবে। তোমার হস্তস্থিত কাগজখণ্ড দগ্ধ হইবার কারণ কি জানিতে চাও? "কারণ কি"ইহার অর্থই এই যে"ইহার নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা কি অথবা কি কি ?" কাগজখণ্ড এবং কাগজের দহন-কার্য্য মায়াবাদের মতে এই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, ইন্দ্রিয়বোধ-সমষ্টি, তাহা পাঠক অবশ্যই জানেন। দহনকার্য্যের কারণ যে অগ্নি, মায়াবাদ তাহা অস্বীকার করে না, কিন্তু অগ্নির অর্থ কি ? কারণের অর্থ কি ? অগ্নির অর্থ বর্ণ, উত্তাপবোধ প্রভৃতি কতিপয় বাস্তবিক অথবা নিত্যসম্ভবনীয় ইন্দ্রিয়বোধ

সমষ্টি * (a group of actual sensations or possibilities of sensation.) আর কারণ অর্থ কোন অথবা কতিপয় নিত্য-নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ; সুতরাং কাগজ খণ্ড দহনকার্য্যের কারণ অগ্নি, ইহার অর্থ এই যে, অগ্নি নামক কতিপয় ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টি কাগজদহনরূপ ইন্দ্রিয়বোধের নিত্য-নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। এইরূপে আবার যদি এই কারণরূপী ইন্দ্রিয়বোধসমষ্টির কারণান্বেষণ কর, তবে বিজ্ঞান (অর্থাৎ সৎপ্রণালী-সঙ্গত ইন্দ্রিয় পরীক্ষা) এমন কতকগুলি ঘটনা দেখাইয়া দিবে, যাহারা আবার এই ইন্দ্রিয় বোধ সমষ্টির নিত্য নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। আর উদাহরণ বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন। আবশ্যক বোধ হইলে পাঠক অন্যান্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এই বৈজ্ঞানিক কারণগত মূলসূত্রের সত্যাসত্যতার পরীক্ষা করিবেন। কার্য্যমাত্রই ইন্দ্রিয়বোধ বা ইন্দ্রিয়বোধসমষ্টি ; কোন কার্য্যের কারণ ইহার নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এবং ঘটনা বা ঘটনাবলী মাত্রই ইন্দ্রিয়বোধ বা ইন্দ্রিয়বোধসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তবে আর কার্য্যের কারণান্বেষণার্থ ইন্দ্রিয়াতীত প্রদেশে যাইবার প্রয়োজন কি ? ইন্দ্রিয়াতীত জড়শক্তি বা ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজন কি ? কারণ অর্থ যদি নিত্য-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনাই হয়, তবে ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই কার্য্যসমূহের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটী কার্য্যের কারণ আর একটী, বা আর কয়েকটী ; উহার বা উহাদিগের কারণ আর একটী বা আর কয়েকটী ইত্যাদি। এইরূপে এই কার্য্যময় জগতের কার্য্যসমূহ পরস্পরের সহিত কার্য্যকারণ-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে, স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়াতীত কারণ কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কার্য্যের কারণ যদি পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যই হইল, তবে জগতের প্রথম কার্য্যের কারণ কি ? যদি বল কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, আর কারণ অর্থ নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে এই জগৎকে একটী অনাদি কার্য্যপরম্পরা বলিয়া কল্পনা করিতে হয় ; এই কল্পনায় মানব মন তৃপ্তিলাভ করে না, সুতরাং একটী আদি কারণ কল্পনার আবশ্যক। এই বিষয়ে নাস্তিক মায়াবাদের উত্তর এইঃ—এই আদিকারণ কল্পনার কিছুই প্রয়োজন নাই, এবং দেখান যাইতে পারে যে, এই আদিকারণ কল্পনাতে কল্পিত তৃপ্তি পাওয়া যায় না। আদি কারণ অর্থ এমন কিছু যাহার কারণ নাই। যাহার কারণ নাই এমন কিছুই যদি কল্পনা করিতে হইল, তবে কোন কার্য্যবিশেষকেই কেন কারণ-শূন্য বলিয়া কল্পনা করা যাক্ না। 'প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে' ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে ; পরিদৃশ্যমান জগতে দেখিতে পাই, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করি প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে ; ইহা একটী সাধারণ (General) সত্য, প্রকৃতার্থে সার্ব্বভৌমিক (Universal) সত্য নহে। এমন কার্য্য কল্পনা করা যাইতে পারে যাহার কারণ নাই, অর্থাৎ নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য নাই ; সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, জগতের প্রথম কার্য্য অকারণ (Uncaused) এবং তাহাই পরবর্ত্তী সমুদয় কার্য্যের আদি

* "পাশ্চাত্য মায়াবাদ" শীর্ষক পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধ, বিশেষতঃ চতুর্থ প্রবন্ধ দেখ।

কারণ। অতএব ইন্দ্রিয়াতীত কারণ কল্পনা অনর্থক, অমূলক; ইন্দ্রিয়াতীত জড়শক্তি অসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরও অসিদ্ধ।

নাস্তিকতার মীমাংসা সযুক্তি প্রদর্শিত হইল; অতঃপর দেখাইব এই বিষয়ে আস্তিকতার কি বলিবার আছে।

অস্ত্র এবং জয়।

বাল্যাবধি ইতিহাসে পড়ি, এক রাজা আর এক রাজাকে জয় করিলেন, একজাতি আর এক জাতি দ্বারা জিত হইল; কিন্তু প্রকৃত জয় পরাজয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুইটী একটীর অধিক দেখিতে পাই না। আলেক্‌জাণ্ডার সৈন্য সামন্ত লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন, অসংখ্য যূনানী এবং ভারতবাসীর রক্তে ভারতবক্ষ সিক্ত হইল; তাঁহার বলবতী অসির প্রতিদ্বন্দ্বী অসি সে সময় আর কেহ উত্থিত করিল না সত্য, কিন্তু তাঁহার রক্তসিক্ত পদচিহ্ন মুছিয়া যাইতে না যাইতেই যূনানী বিজয়ের প্রায় সমুদয় চিহ্ন ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল। ইতিহাসলেখকগণ ইহাকে আলেক্‌জাণ্ডারের জয় বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহার নাম জয়? প্রকৃত বিজয়শীল পুরুষ লৌহ অস্ত্রে জয়লাভ করেন না; নরকষ্ট, নরহত্যা, অত্যাচারের পূর্ব্বগামী দূতমাত্র; প্রকৃত বিজয়—আত্মার উপর আত্মার আধিপত্য,—হৃদয়ের উপর হৃদয়ের আধিপত্য, কেবলমাত্র দয়া দাক্ষিণ্য, স্নেহ, প্রেম, উদারতা, ত্যাগ স্বীকার এবং ভালবাসার দ্বারাই স্থাপিত হইয়া থাকে; এ স্বর্গের পুষ্প নরকের সারে কখনও বর্দ্ধিত হয় না।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাস বাহির করিয়া দেখ, বারুদ গোলার জয়, তরবারি বন্দুকের জয় কত দিন কোন্ দেশে স্থায়ী হইয়াছে; বিজয়ী রোম, বিজয়ী গ্রীস, বিজয়ী কার্থেজ, নিজ নিজ বিজয় গৌরব কতদিন উপভোগ করিয়াছেন; ভারতবিজয়ী মুসলমান সিংহাসনে আজ কাহার পদ শোভা পাইতেছে? গ্রীসদেশ মুসলমানের অস্ত্রবলে তাহাদের পদানত হইয়াছিল; ইটালী অষ্ট্রেলিয়ার অত্যাচারে শ্রী-শূন্য হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার স্বাধীনতার মধুর হাসিতে উভয় দেশই উজ্জ্বল হইতেছে।

এই সমুদয় অবস্থা দেখিয়াই লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, পাপের দ্বারা অর্জ্জিত ধন অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না, আর পুণ্যের সম্পত্তি চিরদিনই স্থায়ী হয়। পাপের দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিলেই যে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহা নষ্ট হইবে, কিম্বা পাপকার্য্যের নিজেরই এরূপ কোন সম্পত্তি-নাশক শক্তি আছে যে তাহার সংস্রবে ধনগৌরব আর অধিক কাল রক্ষা পাইতে পারে না; আবার পক্ষান্তরে পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ পুণ্যার্জ্জিত ধন রক্ষিত হইবে, কিম্বা পুণ্যকার্য্যের মধ্যে এরূপ কোন বল নিহিত রহিয়াছে যাহার সংশ্রবে ধনরাশির বিনাশ অসম্ভব; আমরা এরূপ কিছুই বিশ্বাস করি না; অথচ পূর্ব্বোল্লিখিত কথার মধ্যে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার আর প্রতিবাদ করিবার কাহারও অধিকার নাই। তবে এই সত্যের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে যে স্থলে অনুসন্ধান করিয়া থাকে,

সে স্থান ছাড়িয়া স্থানান্তরে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অত্যন্ত লোভ না জন্মিলে, এবং মানুষের জ্ঞান প্রকৃতিস্থ থাকিলে কেহ পাপ করিতে পারে না; পাপকারীর মন অপ্রকৃতিস্থ, সুতরাং অর্থের প্রকৃত ব্যবহার তাহা দ্বারা সম্ভবে না। আর যদিই অপব্যবহারের সুযোগ হইবার পূর্ব্বেই সে এসংসার ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি—তাহার অনুকরণে গঠিত—সে ধন প্রায়ই হারাইয়া বসে; ইহার ব্যতিরেকী বিধি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যার্জ্জিত ধন সম্বন্ধে ইহার বিপরীত যুক্তি দিলেই সাধারণ লোকের কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা করা হইল।

সেইরূপ নরহত্যা নরকষ্ট প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জিত জয়গৌরব অধিক দিন যে ভোগ করা যায় না, তাহারও একইরূপ কারণ। এক পুরুষের পাপ দ্বারা অর্জ্জিত রাজ্য যদি পরাগত পুরুষেরা ন্যায় সাম্য প্রভৃতি উদারনীতি দ্বারা শাসিত করেন, তাহা হইলে তাহার ধ্বংস হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু মানুষের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যে স্বার্থ ত্যাগ করা বড় সহজে ঘটিয়া উঠে না। কতগুলি স্বার্থময় সঙ্কীর্ণ ভাব ক্রিয়া পরম্পরায় ও কাল ব্যবহারে লোকে নিজের অধিকার বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে, পরে অপরকে নিজের প্রকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত করাও তাহার অধিকার শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়া পড়ে। আইন সংগঠন, বিচারকার্য্য নিষ্পাদন সমুদয়ই এই ভাব হইতে পরিচালিত হয়, পরে শাসনাধীন জাতি উত্যক্ত হইয়া অত্যাচারীর শাসন দণ্ড চূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু জগতের একজাতি যখন নিজের স্বার্থ ভুলিয়া অপরজাতির হিতের নিমিত্ত অগ্রসর হন, অপরের অধিকারের সীমা অস্পৃশ্য পবিত্র স্থল বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তখন সে জাতির বিজয়-গৌরবের প্রতি দৃষ্টি থাকুক আর নাই থাকুক. তাঁহাদের গৌরব তাঁহাদের অজ্ঞাতে পুষ্প সৌরভের ন্যায় বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে।

ইংরাজ ভারত জয় করিয়াছেন, কিন্তু সে জয় কিসের বলে? কামানের বলে, তরবারির বলে, একথা যদি কেহ মনে করেন, তবে তাহার একান্ত ভ্রান্তি। মুসলমান অত্যাচার যখন শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় ইংরেজ এদেশে প্রথম পদার্পণ করেন; তখন তাঁহারা এদেশের রাজা নহেন, সামান্য বণিক মাত্র; সুতরাং দেশীয় লোক আর নিগার, অস্পৃশ্য জাতি ছিল না। ব্যবসায়ী সাহেব ভারত-বাসীর সহিত আত্মীয়তা করিতেন, মুসলমানের মজ্‌লিসে মুসলমানি কায়দায়, হিন্দুর মজ্‌লিসে হিন্দুর কায়দায় চলিতেন, বাঙ্গালীর বাড়ীতে আসিয়া চন্দ্রপুলি খাইয়া প্রশংসা করিতেন, দুঃখী দরিদ্রের সহায়তা করিতেন, সামান্য প্রজাকে ভালবাসিতেন, ভদ্রলোকের সম্মান করিতেন। যখন ভারতবাসী এই স্বভাবের ইংরাজের সঙ্গে মুসলমান পুরুষদিগের স্বভাব তুলনা করিল, তখন স্বর্গের চিত্রের সম্মুখে নরকের চিত্রের প্রায় তাহারা মনে করিতে লাগিলেন। সেই অত্যাচারী যবনের স্থলে সচ্চরিত্র সদাশয় ইংরেজকে স্থাপন করিতে ভারতবাসী একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভও এ মন্ত্রণায় সায় দিলেন; সেইদিনে ইংরাজ প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করিলেন; পরে ক্লাইবের শস্ত্র যুদ্ধ কেবল জয়ের অভিনয় মাত্র। সেই সময় ভারতবাসী যদি জানিত যে ইংরেজ দায়িত্বশূন্য, ক্ষমতাদণ্ড হাতে পাইলে,

এবং ভারতবর্ষের ঘি দুগ্ধ পটে গেলে তাহার এ মেজাজ থাকিবে না, লণ্ডননিবাসী মেথরেরপুত্র হাড়ি ডম কসায়ের ছেলে, চন্দ্রসূর্য্য বংশীয়ের উন্নত মস্তকে পদক্ষেপণ করিতে ভীত হইবে না, তাহা হইলে ইংরেজের ভারত জয় করা তত সহজ হইত না। বস্তুতঃ ইংরেজ নিজের চরিত্রের দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন।

১৭৫৬খ্রীঃ অঃ ইংরেজ দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইলেন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, ইংরেজের চরিত্রেও কালিমা রেখা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কতিপয় দিবসের মধ্যেই ধনলুব্ধ দস্যুর ন্যায় পরের স্বত্ব অকারণ লোপ করিয়া নিজের স্বার্থ স্থাপনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, আর লোকের প্রতি সে সম্মান রহিল না; দেশীয়দিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন, অকারণ লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিলেন। লর্ড ডালহৌসির রাজত্ব সময় প্রত্যেক রাজা, প্রত্যেক রহিঁস কম্পিত শরীরে শর্য্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেন, কেজানে পর দিন ভাগ্যে কি লেখা আছে! এই সময় ভারতবর্ষ, অত্যাচার, অসন্তোষ এবং বিদ্বেষের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিল, ইংরেজের গৌরব সূর্য্য কালিমা মেঘে আচ্ছন্ন হইল।

১৮৫৭ সাল অনেক ভারতবাসীরই স্মরণ আছে; সে বিষম কাণ্ড পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারগুলির ফল মাত্র। তখন ইংরেজের জয় পতাকা আমূল কম্পিত হইতে আরম্ভ করিল, প্রতি মুহূর্ত্তে উগাড়িয়া পড়ে। যদি বিদ্রোহের নেতৃগণ প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, কিম্বা মানবের স্বত্বরক্ষা প্রভৃতি উদারভাব হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তবে ইংরেজ যে বণিক ভাবে এ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, আজ তাহাকে আবার সেই বণিক ভাবেই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সিপাহি যুদ্ধের নেতৃদিগের মধ্যে অনেকেই স্বার্থকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কাযেই পাপের অস্ত্রে পাপ নিবারিত হইল না; ইংরেজ পরাজিত হইয়াও আবার জয়ী হইলেন; আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নৈতিক সত্যের আরো একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিল।

বিজয়ী সিপাহী সৈন্য যেস্থানে উপস্থিত হয়, সে স্থানের লোক অত্যাচারে আকুল হইয়া উঠে, গৃহস্থেরা স্ত্রী পুত্র লইয়া পলায়ন করে, বিনামূল্যে লোকের গরু ঘোড়া হাতি সিপাহীরা কাড়িয়া লয়, আহার্য্য দ্রব্যাদি লুটিয়া নেয়, সুতরাং সিপাহীরা দেশীয় লোক হইলেও দেশীয়দিগের সহানুভূতি পাইল না, অসুরের হস্তে দেবকার্য্য সাধিত হইল না; ইংরেজ পুনরায় ভারত সিংহাসন অধিকার করিলেন।

কিন্তু সে অধিকার পূর্ব্ববৎ অত্যাচার দ্বারা কখনই রক্ষিত হইত না; ইংরেজ চতুর, তখন আবার দেশের লোকের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন আরম্ভ করিলেন, নানা প্রকার আশা ভরসা দিতে আরম্ভ করিলেন; কয়েক বৎসর ইংরেজ রাজ্য নিষ্কণ্টকে চলিতে চলিতে এই বর্ত্তমান আন্দোলনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে চারি শ্রেণীর লোক আছে; প্রথম রাজা—ইংরাজ, দ্বিতীয় দেশীয় রাজগণ, তৃতীয় সর্দ্দার, রহিঁস, জমিদার প্রভৃতি, চতুর্থ প্রজা। এইচারি শ্রেণীর লোকই সম্প্রতি এক একটী বিষয় নিজের স্বত্ব বলিয়া মনে করে, অপর শ্রেণী তাহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে। ইংরেজ মনে করেন, তাহারা

ভারতের এক ছত্র অধীশ্বর, ইহার ভূমি শস্য, জল বায়ু, আলোক, পশু পক্ষী মানুষ, সমুদয় তাহাদের; যাহার সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাকে তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে; আর ইংরেজ-রক্তের একোনশততম ডাহলিউসন ফিরিঙ্গি, তিনিও মহারাণীর শ্বেতদ্বীপ-সঞ্জাতপ্রজা, সুতরাং তাঁহারও উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ভারতবর্ষের প্রতি এ অধিকার জন্মিয়াছে, তিনিই বা সহজে কিরূপে এ দাবি ছাড়িয়া দেন। দেশীয় রাজারা মনে করেন, ইংরেজ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ মিত্র রাজা মাত্র; তাঁহার সম্রাটের আসন গ্রহণ করা জবরদস্তি; নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে আপনারা সমুদয় লোক এক কোপে কাটিয়া ফেলি, অনাহারে মারি বা সুখে রাখি, তাহাতে ইংরেজ হস্তক্ষেপ করিবার কে? যে যে স্থলে রাজা নাই, সেই সেই স্থলের ভূম্যধিকারী জমিদারেরা মনে করেন, স্থানীয় জল বায়ু ভূমি শস্য গাছ মাছ পশু পক্ষী সমুদয় তাহাদের; দশসালা পঞ্চসালা বন্দোবস্ত সন্ধিপত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইংরেজ এখন প্রজার জীবন এবং অর্থরক্ষা ব্যতীত যদি প্রজার সহিত অপর কোন সংশ্রব রাখিতে চাহেন, তবে তিনি সন্ধিভঙ্গ দোষে দোষী; প্রজাকে জমিদারিতে রাখি বা উৎসন্ন করিয়া দেই, তাহার নিমিত্ত কথা বলে কে? প্রজারা মনে করে, জমিদার আবার কেন, ইংরেজের রাজ্যে বাস করিয়া ইংরেজকে কর দিব, আবার মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণী লোকের উদর পোষণ করিবার দরকার? তাহাদের দেশের প্রতি যে অধিকার, আমাদেরও দেশের প্রতি সেই অধিকার, ইংরেজ আমাদিগকে এরূপভাবে জমিদারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ভাল করেন নাই। এখন দেখুন যে এক শ্রেণীর লোক যাহা নিজের অধিকার বলিয়া মনে করেন, অপর শ্রেণীর লোক সেটীকে তাহার অধিকার বহির্ভূত বা জবরদস্তি বলিয়া আপত্তি করে। জগতের সমুদয় দেশেই এই কারণ হইতে আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষও আজ উল্লিখিত ভাবপ্রসূত আন্দোলনের সাগরে ভাসিতেছে। মহারাজ্ঞীর সম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণের অর্থ কি?—জগৎকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়া দেওয়া যে, আমি ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। দেশীয় রাজগণকে পৈত্রিক সিংহাসনে আসীন করিতে কোন ফর্ম্মান দেওয়া হয় না সত্য, কিন্তু ইংরেজ পুরোহিত গিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া আইসেন; ইহার অর্থ কি? ইংরেজ ভারতে রাজার রাজা, যাহাকে অভিষেক করিবেন তিনিই রাজা। রেণ্টবিলের অর্থ কি? ভূমির সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ, জমিদার তহশীলদার মাত্র। অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইন, মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় আইন দ্বারা স্পষ্টতঃ দেশকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যখন যে ভাবে রাখিব সেই ভাবে থকিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাময়িক নির্দ্দিষ্ট সীমাই তোমার অধিকারের সীমা। ইলবার্টবিলের শেষ মীমাংসায় ইংরেজ দেশের লোককে দেখাইলেন, যতই কেন বল না, সমানভাবে কখনও চলিতে পাইবে না; আমরা জয়ী তোমাদিগকে পদতলে রাখা আমাদের অধিকার। আর দিল্লির রাজসূয় উপলক্ষে দেশীয় রাজগণের অসন্তোষ প্রকাশ, কর সম্বন্ধীয় আইনে জমিদার সমিতির আবেদন, আর তার পরবর্ত্তী বিধান তিনটী সম্বন্ধে দেশশুদ্ধ লোকের আবেদন, ক্রন্দন, চাটুকারিতা, গালাগালি প্রভৃতি

উল্লিখিত ইংরেজাধিকারের প্রতিবাদ মাত্র।

ইংরেজ এ আন্দোলনে ভীত নহেন; তাঁহার দুর্গ আছে, সেনা আছে, অশ্ব গজ অস্ত্র শস্ত্র ধন অর্থ সমুদয় আছে। তারপর আবার দেশের মাঠে ঘাটে ঝোপে জঙ্গলে ভলাণ্টিয়ার সেনা স্থাপন করিয়াছেন; ভারতবক্ষ রেলওয়ের জালে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে দশ সহস্র সেনা দ্বারা যত লোকের মাথা কাটা যাইত, এমন এক সহস্র সেনা দ্বারা তাহার দ্বিগুণ মাথা কাটিয়া লওয়া যায়। তারপর আবার দেশীয় রাজারা কখনও ইংরেজকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে দিতে পারেন না; যে প্রজা কর্ত্তৃক ইংরেজের শাসন দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, সে প্রজা কখনও দেশীয় রাজাদিগের শাসন স্বীকার করিবে না, ভারতবাসী রাজগণের এ ভয় আছে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহা বেশ জানেন, এবং ১৮৫৭ সালে অনেক রাজগণই তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ইংরেজ এই সমুদয় সহায় সম্পত্তি ও অস্ত্রবল ভরসায় নির্ভয়ে বসিয়া আছেন।

ইংরেজের এত অস্ত্র, এত বল, তবে দেশীয় লোকেরা তাহাদের প্রতিবাদ করে কোন্ সাহসে? তাহাদের কোন্ অস্ত্রবল আছে? দেশীয়েরা একান্ত নিরস্ত্র নহে, তবে ইংরেজের অস্ত্র আর ইহাদের অস্ত্র এক নয়, এবং উভয় অস্ত্রের ক্ষমতাতেও অনেক প্রভেদ। দেশীয়দিগের সৈন্যসামন্তেরও অভাব নাই। বল দেখি অসহায় নিগ্রোগণ কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিল? যীশুশিষ্য কোন অস্ত্রে য়িহুদীরাজ্যের সৈন্যগণ পরাস্ত করিলেন? জগতে জগদীশ্বরের এক অত্যাশ্চর্য্য মহিমা এই যে, যখন কোন ব্যক্তি প্রকৃত ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে, তখন ন্যায়বান যত লোক যেখানে থাকে তাহার আহ্বানে উত্তর প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না; এবং ন্যায়ের ধ্বজা একবার কোন দেশে উত্থিত হইলে, তাহার সেনার তালিকা অধিক দিন অপূর্ণ থাকিতে পারে না।

ভারতবাসী যখন নিজের অধিকার বুঝিতে পারিবেন, নিজের অধিকার রক্ষা করিতে পারিবেন, এবং দৃঢ়তা ও সত্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, তখন শত্রুর শিবিরেও তাহার মিত্রের অভাব থাকিবে না। ইংলণ্ড তখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নিজের একার্দ্ধের সহিত অপরার্দ্ধ যুদ্ধ করিবে; তখন নিরস্ত্র ভারত সশস্ত্র ইংলণ্ডকে যে জয় করিবে, সে বিষয়ে আর আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

লেফেয়টী সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আমেরিকার সাহায্যে গিয়াছিলেন কেন? আমেরিকা অত্যাচার নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছিল, অত্যাচার করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিল না। সেইরূপ ভারতবাসী যদি প্রকৃত অভাব সমুদয় পূরণ করিয়া নিজেরা যথার্থরূপে এক জাতিত্বে একত্রিত হইতে পারে, তবে ভারতবর্ষে যে বল সৃজিত হইবে, সত্য সহায় থাকিলে সে বল আর কাহারও নিকট পরাস্ত হইবার নহে। এইরূপ গঠিত জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয় বলকেই আমরা প্রধান অস্ত্র বলিয়া মনে করি, অপর বলের, অপর অস্ত্রের মূল্য অতি কম।

যখন কোন জাতি কোন বিষয়ে উদ্যম করিতে পারে, তখন সে জাতি সে বিষয় রক্ষাও করিতে পারে; এটী অখণ্ডনীয় সত্য। আজ ভারতবর্ষ জাতীয় অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্যম করিতে প্রস্তুত হয় নাই, সুতরাং আজ এ অধিকার তাহার রক্ষা করিবার ক্ষমতাও হয় নাই; এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। একজন দুইজন লোক গলাবাজি করিলেন, দেশহিতৈষিতা প্রচার করিলেন, গাড়ী ফেইটনে চড়িয়া ত্যাগস্বীকার দেখাইলেন, তাহাতে দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না; আর পরের নিকট হইতে বল ভিক্ষা করিয়াও কেহ কোন দিন কোন জাতিকে বলবান করিতে পারে না। ইংলণ্ডের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেছ, মিমোরিএল লিখিতেছ, আবেদন করিতেছ, পাঁচ সাত জন একত্র হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের দরজায় গিয়া দ্বারবানের মুখ প্রতীক্ষা করিতেছ; তোমাদের মত তোমরা ঢের করিতেছ বুঝিলাম; কিন্তু যে রত্ন চাহিতেছ, তাহা তোমাদের হাতে দিলে যে জলে ছুড়িয়া ফেলিবে না, এ কথার কোন প্রমাণ কি আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে দেখাইয়াছ? জাতীয় একতা দ্বারা দেশে কি একটা কাজও আজ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছ? তবে ইংলণ্ড তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে কেন? ইংলণ্ড ত পরের দেশ, তোমরা পাঁচ জন যে হইচই করিয়া বেড়াইতেছ, তোমাদের দেশের লোকে তোমাদিগকে বিশ্বাস করে কি? আজ সমুদয় ভার তোমাদের ভদ্র পরিবারের দশটী লোকের হাতে পড়িলে, কাল যে হরে চাঁড়াল, বা বলা হাড়ি, বা গরিব সুকুর মাহামুদ নিষ্কণ্টকে নিজের স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে, এ কথা তাহারা এখন পর্য্যন্ত কি বিশ্বাস করে? তোমার চেষ্টা তোমার একার হিতের নিমিত্ত, কি দশ জনের হিতের নিমিত্ত, এ কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছ, অথবা এ কথা বুঝিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে শক্তির উদ্রেক করিয়াছ? কথনই না। তবে তুমি ঘরের কর্ম্ম লইয়া পরের দুয়ারে ফিরিয়া বেড়াইলে যে কি ফল হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

যদি প্রকৃত পক্ষে ভারতের হিতৈষী কেহ থাকেন, তবে ভারতবর্ষের লোকদিগের চরিত্র গঠন করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় পরমাণুগুলিকে একত্র করিয়া, এক সত্যে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে তাহাদের চেষ্টা করা উচিত। এই ভাবে যে জাতীয় শক্তির সৃষ্টি হয়, সে শক্তি জগতে দুর্দ্দমনীয়, এবং চরিত্রের অস্ত্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণতম অস্ত্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, ভারতবাসী যখন নিজের অধিকার বুঝিয়া লইতে পারিবে, এবং পরের অধিকার স্পর্শ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত না হইবে, যখন—জমিদার প্রজার মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইবে, এবং রাজা প্রজা এক ব্রতে ব্রতী, এক মনুষ্যত্বের স্বত্ব রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিবে, তখন ইংরেজও নিজের ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। যে জাতির মধ্যে কে সুইক, ব্রাণ্ডসন্ এবং ইভান্‌স্, সেই জাতির মধ্যেই আবার রিপনের ন্যায় মহানুভব লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাইট সেই জাতিরই একজন লোক। সুতরাং ভারতবাসী যখন জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তাহা পাইবার নিমিত্ত উদ্যম করিতে শিখিবে, সত্যের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, এবং জাতীয় চরিত্রকে সত্য এবং দৃঢ়তা দ্বারা বেষ্টন করিবে; তখন ইংলণ্ডের সহিত যে আর তাহার অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। তখন ভারতবাসী যে জয়লাভ করিবেন সেই জয়ই প্রকৃত জয়।

ইটালী যে দিন যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাভব করিলেন, সে দিন ইটালীর প্রকৃত

জয়ের দিন নহে, কেবল অভিনয়ের দিন মাত্র। যে দিন যোজেফ্ ম্যাট্‌সিনি সেই বিশ্ববিস্তৃত উদারভাবের মহামন্ত্রে ইটালীকে দীক্ষিত করিলেন, যেদিন দেশের নিমিত্ত মরিয়া ইটালীবাসী স্বর্গসুখ ভোগ করিতে শিখিল; সেই দিনই ইটালীর প্রকৃত জয়ের দিন। লৌহ বা আগ্নেয় অস্ত্রে সে দিন কেহ জয়লাভ করে নাই; জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ, ও অশ্রুতপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা বলে ইটালী জয়ী। ভারতবর্ষ যে দিন এই মহাস্ত্র ধরিতে শিখিবে, সেই দিনই তাহার প্রকৃত জয়ের দিন। অভিনয় দুই দিন অগ্রেই হউক আর পরেই হউক, সে জন্য আমরা তত চিন্তিত নহি।

দিন দিন জগৎ সভ্যতার পথে যেরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অত্যাচারিত জাতিকে অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করিতে যে পুনরায় অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে হইবে, আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। নরখাদক-দিগের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত নরহত্যা আবশ্যক করেনা। বোধ হয় যুদ্ধদ্বারা জয়লাভ করার প্রথা অতি সত্বরই এ সংসারকে পরিত্যাগ করিবে। মানব যখন পশু ছিল, তখন পাশব বলে পশুত্ব বিজিত হইত; এখন সামাজিক মানব দিন দিন পশুত্ব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিতেছে; এখন মনুষ্যত্বদ্বারা অমনুষ্যত্বকে, সত্যদ্বারা অস-ত্যকে, ত্যাগস্বীকার দ্বারা স্বার্থকে এবং সৎ-সাহসের দ্বারা অত্যাচারকে পরাজয় করিতে হইবে। যদি অপর অস্ত্র কখন কেহ ব্যবহার করেন, তবে কখনও সিদ্ধকাম হইবেন না।

আমরা ভলেণ্টিয়ার সৈন্য চাহিনা, কারণ জগৎবাসী সমুদায় সদাত্মা ভারতযুদ্ধে ভলাণ্টিয়ার। অত্যাচার-তপ্ত ভারতবর্ষ যদি প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডকে দেখাইতে পারেন যে, তাহার নিজের অধিকার নিজে রক্ষা করিতে সমর্থ, তবে ইংলণ্ডেও তাহার সহা-য়ের অভাব হইবেনা। আর যদিই ইংলণ্ডে এরূপ বিস্তৃত-হৃদয় কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকেন, তাহা হইলেও আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। ইংলণ্ড নীতি-কুশল বলিয়া চিরদিন জগতে বিখ্যাত; বিক্রম, ভেদ, মৈত্রী কোন্ সময়ে কোন্ নীতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা ইংলণ্ড বুঝিতে বিলক্ষণ চতুর। কাজেই আমরা বলিতেছি যে, ভারতবাসী যদি সত্য এবং দৃঢ়তা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় অণুগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিতে পারে, তবে অত্যাচার বায়ু-সম্মুখস্থ তৃণ-গুচ্ছের ন্যায় যে তিরোহিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহারা প্রকৃত পথ ছাড়িয়া কেবল হৈ চৈ করিয়া কাল কাটান, তাহাদের পণ্ডশ্রম মাত্র। বলত জাতীয় ধনভাণ্ডারে লোক টাকা দেয় না কেন? জাতীয় ধনভাণ্ডার কি, তাহা কেহ বুঝেনা; তোমরা কেহকে বুঝাইয়া দেও না; সুতরাং তোমরা নিজেরা কিছু বুঝ কি না, সে সম্বন্ধেও লোকে সন্দেহ করিয়া থাকে। তাহা হইলে এরূপ বিষয়ে সহানুভূতি পাইবে কেন? তোমরা এখন শত্রুর দুর্গে গিয়া শত্রু আক্রমণ না করিয়া, একবার নিজের জীর্ণ দুর্গটীর সংস্কার কর; এবং অপরের মূল্যবান্ অস্ত্র, শস্ত্র ভিক্ষা না করিয়া নিজদিগের সামান্য অস্ত্রগুলি একবার একত্রিত কর।

দুর্গ।

রাজাদিগের বহু শত্রু, পররাজ্যের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভব, এনিমিত্ত তাঁহাদের এক একটী অন্যের দুর্গম্য স্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। সেই সকল দুর্গম্য ও দুর্ভেদ্য স্থানের নাম "দুর্গ"। ইহা তাঁহাদের একটী প্রধান সম্পদ, এনিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা রাজাদিগের ষষ্ঠ সম্পদের মধ্যে দুর্গকে সম্পত্তি বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কামন্দক, ভোজ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ-শাস্ত্র-উপদেষ্টৃগণ দুর্গ সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া তাহার নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও প্রকারভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্ম সংহিতা ও রাজবল্লভ প্রভৃতি সমুদায় বাস্ত-শাস্ত্রে ইহার নির্ম্মাণ বিধি ও স্থান পরীক্ষা লিখিত আছে। রাজ্য, রাজধানী ও দুর্গ-স্থাপন বিষয়ে কামন্দকোক্ত স্থান পরীক্ষা এতৎ প্রস্তাবের প্রথমে গ্রহণ করা হইল।

১ম, স্থান পরীক্ষা।

"ভূগুণৈর্বর্দ্ধতে রাষ্ট্রং তদ্বৃদ্ধি র্নৃপবৃদ্ধয়ে।
তস্মাৎ গুণবতীং ভূমিং ভূতৈন ভূপস্তু কারয়েৎ॥"
"সস্যাকরবতী পুণ্যা খনিদ্রব্য সমন্বিতা।
গোহিতা ভূরি সলিলা পুনৈর্জনপদৈর্বৃতা॥"
"রম্যা সৎকঞ্জরবনা বারিস্থল পথান্বিতা।
অদেব মাতৃকাচেতি শস্যতে ভূর্বিভূতয়ে॥"
[কামন্দক।

স্থানের গুণে রাজ্যসম্পত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং রাজ্যসম্পত্তির বৃদ্ধিতেই রাজার উন্নতি হয়। এজন্য রাজা আপনার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রথমতঃ গুণবতী ভূমি গ্রহণ করিবেন কিরূপ ভূমি গুণবতী? তাহা বলা যাইতেছে।

যে স্থান শস্যশালিনী, যে স্থানে আকর আছে, যে স্থান অতি পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র (স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য), যে স্থানে খনি আছে, যে স্থানে ব্যবহার্য্য দ্রব্য সুলভ, যে স্থান গো ও অশ্ব প্রভৃতি পশু রাখিবার উপযুক্ত, যে স্থানে জলকষ্ট নাই, যাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ আছে, যে স্থান সুন্দর অর্থাৎ রমণীয়, যে স্থানে বা যাহার নিকটস্থ বনে হস্তী পাওয়া যায়, ও যাহার নিকটে বন আছে, যে প্রদেশে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই বিদ্যমান, যে দেশ দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ যে দেশের শস্য উৎপাদন করিতে কেবল বৃষ্টির জলের নির্ভর করিতে হয় না, এরূপ দেশে উক্তবিধ স্থানই রাজা-দিগের পক্ষে প্রশস্ত।

২য়, নিষিদ্ধদেশ ও স্থান।

"স শর্করা সপাষাণা সাটবী নিত্যতস্করা।
রূক্ষা সকণ্টক বনা সব্যালাচেতি ভুর ভূঃ॥"

যে স্থানে অত্যন্ত কাঁকর, অত্যন্ত প্রস্তর, নিবিড় বন, সর্ব্বদাই দস্যুভয়,—সে স্থান উত্তম নহে। যে স্থান রূক্ষ অর্থাৎ ৮ গুণ জলসেক করিলেও উত্তম শস্য হয় না, যে স্থানে কণ্টকবন নিবারিত হয় না, যে প্রদেশে অধিক সবিষ সর্প জন্মে, সে স্থানও বাসের ও দুর্গের অযোগ্য।

কামন্দকি আরও বলিয়াছেন যে,—

"সাজীব্যো ভূগুণৈর্যুক্তঃ সানূপঃ পর্ব্বতাশ্রয়ঃ।
শূদ্র কারু বণিক্ প্রায়ো মহারম্ভ কৃষীবলঃ॥
সানুরাগো রিপুদ্বেষী পীড়াকর সহঃ পৃথুঃ।
নানাদেশ্যৈঃ সমাকীর্ণো ধার্ম্মিকঃ পশুমান্ধনী॥
তং বর্দ্ধয়েৎ প্রযত্নেন তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥"

যে দেশে কন্দ (শূরণ ও আলু প্রভৃতি)

মূল ও ফল প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যে দেশ পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, যে দেশ অনূপ অর্থাৎ যে দেশে-প্রচুর জল আছে, যে দেশ পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত, যে দেশে দাস, দাসী, শিল্পি ও বাণিজ্যকারী লোক অধিক, যে দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও মহা উদ্যোগী, যে দেশের লোক সকল স্বভাবতঃই প্রভুর প্রতি অনুরাগী ও শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ্টা, যে দেশের লোকেরা কষ্টসহ ও করভার বহনে কষ্টবোধ করে না, যে দেশের লোকেরা বলবান্, যে দেশে নানাদেশীয় লোকে সমাকীর্ণ, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, পশুপোষণকারী ও ধনশালী, রাজা এরূপ দেশ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। যে হেতু তাদৃশ দেশ হইতেই রাজার সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

৩য়, রাজপুরী ও দুর্গবাস।

পৃথুসীম মহাখাত মুচ্চ প্রাকার গোপুরম্।
সমাবসেৎ পুরং শৈলং সরিন্মরু বনাশ্রয়ম্॥"

চতুঃপার্শ্বে মহাখাত (গড়কাটা), অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, বিস্তীর্ণ দ্বার,—রাজা এরূপ পুরে বাস করিবেন। নিকটে কোন পর্ব্বত কি নদী, বন অথবা মরুভূমি থাকিলে ভাল হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন যে,—

"রম্যং পশব্য যাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দূর্গানি কুর্ব্বীত জনকোশাত্ম গুপ্তয়ে॥"

রমণীয়, পশু পোষণের উপযুক্ত, বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ভূমি, জল ও পর্ব্বতশালী,—রাজা এরূপ দেশে বাস করিবেন। এবং তাদৃশ স্থানে স্বজন বর্গ, ধনাগার ও আত্ম রক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন।

মহর্ষি মনু দুর্গবাসের অন্য উপকারিতা বর্ণন করিয়াছেন।

যথা—"একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থোধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশ সহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং সমাশ্রয়েৎ॥"

যে হেতু এক যোদ্ধা দুর্গ প্রাকারে অবস্থিত থাকিয়া শত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এবং শত যোদ্ধা, দশ সহস্র যোদ্ধাকে পরাভব করিতে পারে, এই হেতু রাজারা দুর্গ আশ্রয় করত বাস করেন।

৪র্থ, দুর্গের সংখ্যা ও প্রকার ভেদ।

দুর্গ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে মনুর মতে, কামন্দকীর মতে ৯ নববিধ দুর্গই প্রধান। মহর্ষি মনু প্রাধান্য ক্রমে ৭ প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু কামন্দকি ও মহর্ষি ব্যাস তদপেক্ষা দুইটী অধিক দুর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনু মতানুযায়ী সপ্ত দুর্গ এই—

"ধন্ব দুর্গং মহীদুর্গ মবদুর্গং বার্ক্ষমেবচ।
নৃদুর্গং গিরি দুর্গঞ্চ সমাশ্রিত্যা বাসৎ পুরম্॥,,

যাহার নিকটবর্ত্তী দিক্ সমূহে জলবর্জিত স্থান অর্থাৎ মরু ভূমি বিদ্যমান আছে, তাদৃশ দুর্গের নাম ধন্ব দুর্গ। মহীদুর্গ অর্থাৎ মৃত্তিকার দ্বারা সম্পাদিত দুর্গ। অবদুর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ। যাহার নিকটবর্ত্তী দিক্ সমূহে মহাজল বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জল দুর্গ। বৃক্ষের দ্বারা রচিত দুর্গ বিশেষের নাম বার্ক্ষ দুর্গ; যাহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় দুশ্ছেদ্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত। নৃদুর্গ অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে বহুতর বীর মনুষ্য বাস করে। গিরি দুর্গ অর্থাৎ দুর্গম পর্ব্বত যাহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে। মনু এই ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু

কামন্দকি এতদপেক্ষা ঐরিণ নামক আর একটী অতিরিক্ত দুর্গের কথা বলিয়াছেন। যথা—

"ঔদকং পর্ব্বতং বার্ক্ষং মৈরিণং ধন্ব মানবম।
প্রশস্তং শাস্ত্র মতিভি র্দুর্গং দুর্গোপচিন্তকৈঃ॥"

ঔদক অর্থাৎ জলদুর্গ। পর্ব্বত অর্থাৎ গিরিদুর্গ। বার্ক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষ রচিত দুর্গ। ঐরিণ অর্থাৎ ঊষর স্থানরূপ দুর্গ। ধন্ব অর্থাৎ জলবর্জিত দুর্গ। মানব অর্থাৎ বীর মনুষ্য বেষ্টিত দুর্গ। মহাভারতেও ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মহীদুর্গ ও মৃদুর্গ এই দুইটীর ভিন্নতা প্রতিপাদিত আছে। যথা—

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং গিরিদুর্গং তথৈবচ।
মনুষ্যদুর্গং মৃদুর্গং বন্ধুদুর্গঞ্চ তানি ষট্॥"

এই শ্লোকে মহীদুর্গ ও মৃদুর্গ এইটী পৃথক্ শব্দের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, যাহা স্বাভাবিক মৃত্তিকাচিত স্থান—তাহাই মহীদুর্গ এবং যাহা মৃত্তিকার দ্বারা, ইষ্টকের দ্বারা কি প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গম স্থান—তাহাই মৃদুর্গ। নীতি ময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "মৃদুর্গমিতি মাত্তিকং পাষাণং ঐষ্টকং বা" মৃদুর্গ ৩ প্রকার। মৃত্তিকা নির্ম্মিত, পাষাণ রচিত ও ইষ্টক গ্রথিত। লিখিত বচনগুলির দ্বারা সর্ব্ব সমেত নববিধ (৯ প্রকার) দুর্গের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। যথা—

ধন্বদুর্গ	১	ইহা অকৃত্রিম মৃত্তিকাচিত ও
মহীদুর্গ	২	...কৃত্রিম মৃত্তিত্তি নির্ম্মিত। এত
জলদুর্গ	১	দ্রুপে দ্বিবিধ মৃত্তিত্তি দুর্গের
বৃক্ষ দুর্গ	১	আবার প্রস্তর নির্ম্মিত ও
	—	ইষ্টক নির্ম্মিত এই দুই
	৫	প্রকার প্রভেদ আছে॥
নৃদুর্গ	১	...ইহা বীরগণের দ্বারা বেষ্টিত
গিরিদুর্গ	১	থাকা এবং সৈন্য রচনার দ্বারা বেষ্টিত থাকা, এই দুই প্রকার।
বন্ধুদুর্গ	১	...শূর ও আত্মীয়গণের গৃহের
ঐরিণ দুর্গ	১	দ্বারা বেষ্টিত থাকা।
	৯	

এই নববিধ দুর্গের মধ্যে মহীদুর্গের দ্বিতীয়টী অর্থাৎ মৃদুর্গটী আবার ৩ প্রকার। স্তূপীকৃত, মৃত্তিকা বেষ্টিত, প্রস্তর প্রাকার বেষ্টিত, এবং ইষ্টক প্রাকার বেষ্টিত। নৃদুর্গ অর্থাৎ মনুষ্য দুর্গটীও দ্বিবিধ। বন্ধু দুর্গ ও ইতর মনুষ্য দুর্গ। নীতি-ময়ূখে এই মনুষ্য দুর্গের এইরূপ লক্ষণ ও ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

"বন্ধুদুর্গং নাম সোদরাদি বন্ধূনাং রাজগৃহস্য পরিতঃ স্থানানি। এবং বন্ধু দুর্গ সম্ভবে ইতর মনুষ্য দুর্গং ন কুর্ব্বীত।"

ভ্রাতৃ প্রভৃতি বীর ও অন্তরঙ্গ স্বজনগণের দ্বারা বেষ্টিত রাজ পুরীর নাম বন্ধু দুর্গ। বন্ধু বান্ধব না থাকিলে বীর পুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজ পুরীকে সামান্যতঃ মনুষ্য দুর্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। পরন্তু যে স্থলে বন্ধু দুর্গের সম্ভাবনা থাকে—সে স্থলে ইতর মনুষ্য দুর্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

অসুরাচার্য্য উশনা স্বকৃত নীতিসার গ্রন্থে উল্লিখিত দুর্গ সমূহের পৃথক্ নাম ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"ষষ্ঠং দুর্গপ্রকরণং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
খাত কণ্টক পাষাণৈর্দুষ্পথং দুর্গমৈরিগম্॥
পরিতস্তু মহাখাতং পারিখং দুর্গমেব তৎ।
ইষ্টকোপল মৃত্তিতি প্রাকারং পারিঘং স্মৃতম্॥
মহাকণ্টক বৃক্ষৌঘৈ র্ব্যাপ্তং তদ্বন দুর্গমম্।
জলাভাবস্তু পরিতা ধন্ব দুর্গং প্রকীর্ত্তিতম্॥
জল দুর্গং স্মৃতং তজ্জ্ঞৈ রাসমন্তাৎ মহাজলম্।
সবারি পৃষ্ঠোচ্চ গৃহং বিবিক্তে গিরিদুর্গমম্॥
অভেদ্যং ব্যূহবি স্বীয় ব্যাপ্তং তৎ সৈন্য দুর্গমম্।

সহায় দুর্গং তজ্জ্ঞেয়াং শূরানুকূল বান্ধবম্॥"

আমি তোমাদিগকে দুর্গনামক ষষ্ঠ প্রকরণ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর। খাত, কণ্টক ও পাষাণাদির দ্বারা দুর্গম স্থানের নাম ঐরিণ দুর্গ। যাহার চতুর্দ্দিকে মহাখাত, তাদৃশ দুর্গের নাম পারিখ দুর্গ। ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকায় ভিতের প্রাচীর দিলে তাহার নাম পারিখ দুর্গ। মহাকণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দ্বারা (বেউড় বাঁস প্রভৃতির দ্বারা) চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত থাকিলে তাহা বনদুর্গ বা বৃক্ষদুর্গ। দুর্গের চতুর্দ্দিকে অধিক দূর পর্য্যন্ত জলবর্জ্জিত স্থান থাকিলে তাহা ধন্বদুর্গ হইবে। চতুর্দ্দিকে মহাজল (বৃহৎনদী কি সমুদ্র), তন্মধ্যে দুর্গ, এরূপ হইলে তাহা জলদুর্গ। মনুষ্যাবাস বর্জ্জিত সজল প্রদেশে অথবা পর্ব্বত পৃষ্ঠোপরি অত্যুচ্চ গৃহ সমূহকে গিরিদুর্গ বলা যায়। ব্যূহ (সৈন্য বিন্যাস) বেত্তা বীর সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকিলে তাহাকে সৈন্য দুর্গ বলা যায়। বীর বন্ধু বান্ধব অনুকূল থাকিলে তাহা সহায় দুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ ও সহায় দুর্গই শ্রেষ্ঠ। দুর্গের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনু ও কামন্দক বলিয়াছেন যে,—

"সর্ব্বেন তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এতেষাং বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥"

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গই বহুগুণে উৎকৃষ্ট। অতএব রাজা প্রযত্নের সহিত গিরিদুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিবেন। এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, যে,—

"পারিখা দৈরিণং শ্রেষ্ঠং পারিঘন্তু ততোবনম্।
ততোধন্ব জলং তস্মাদ্গিরিদুর্গং ততঃ স্মৃতম্॥
সহায় সৈন্য দুর্গেতু সর্ব্ব দুর্গ প্রসাধকে।
তাভ্যাং বিনান্য দুর্গানি নিষ্ফলানি মহীভুজাম্॥
শ্রেষ্ঠঞ্চ সর্ব্ব দুর্গেভ্যঃ সেনা দুর্গং স্মৃতং বুধৈঃ।
তৎসাধকানি চান্যানি তদ্রক্ষন্নৃপতিঃ সদা॥
সেনা দুর্গন্তু যস্য স্যাৎ তস্য বশ্যা তু ভূরিয়ম্।
বিনা তু সৈন্য দুর্গেন দুর্গ মন্যত্তু বন্ধনম্॥
আপৎ কালেঽন্য দুর্গা নামাশ্রয় শ্চোত্তমোমতঃ।"

পারিখ দুর্গ অপেক্ষা ঐরিণ দুর্গ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা পারিঘ দুর্গ উত্তম। পারিঘ অপেক্ষা বন অর্থাৎ বৃক্ষ দুর্গ ভাল। বৃক্ষদুর্গ হইতে ধন্ব দুর্গ এবং ধন্ব অপেক্ষা জলদুর্গ উৎকৃষ্ট। জলদুর্গ অপেক্ষা গিরিদুর্গ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সহায়দুর্গ ও সৈন্যদুর্গ—এই দুই দুর্গ সকল দুর্গের সাধক। ঐ দুর্গের মধ্যে সৈন্যদুর্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যে কোন দুর্গ সমস্তই সৈন্যদুর্গের দ্বারা সাধিত হয়। একারণ রাজা যত্নপূর্ব্বক, সদা সর্ব্বদা সৈন্যদুর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যে রাজার সৈন্যদুর্গ উৎকৃষ্ট থাকে—এই পৃথিবী তাঁহারই বশীভূতা হন। সৈন্যদুর্গ না থাকিলে, অন্যান্য সমস্ত দুর্গই বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে। অন্যান্য দুর্গ কেবল বিপদকালের আশ্রয়, এজন্য তাহাও উত্তম বলিয়া গণ্য। দুর্গ সম্বন্ধে মনু অন্য এক কথা বলিয়াছেন। যথা—

"তৎস্যাদায়ুধ সম্পন্ন ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈ র্যবসেনোদকেন্ধনৈঃ॥"

সেই দুর্গ অস্ত্র সম্পন্ন থাকা আবশ্যক। ধনধান্য (আহারীয় দ্রব্য) ও অশ্বাদি বাহন তাহাতে রক্ষা করিবেক। ব্রাহ্মণ (শাস্ত্রবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মন্ত্রী সমূহ), শিল্পী, বিবিধ যন্ত্র, যবস অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি পশুর ভক্ষ্য, জল (পুষ্করণী প্রভৃতি), ও কাষ্ঠ থাকা অত্যাবশ্যক।

মহাভারতেও প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"শূরান্ত জলসম্পন্নং ব্রহ্মা ঘোষানু নাদিতম্।
বশ্যামাত্য বলো রাজা তৎপুরং স্বয়মাবিশেৎ॥"

শূর অর্থাৎ বীরপুরুষ পরিপূর্ণ, বেদশব্দ নিনাদিত, বশীভূত অমাত্য ও সৈন্য সমূহে পরিপূর্ণ তাদৃশ পুরে রাজাও বাস করিবেন।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি দুর্গের উল্লেখ করা হইল, তৎসমস্তের মধ্যে মৃদুর্গই প্রায় প্রচলিত ও বিশেষ কৃত্রিম। আজিপর্য্যন্ত মৃত্তিকা ভিত্তির দ্বারা, প্রস্তর ভিত্তির দ্বারা ও ইষ্টক ভিত্তির দ্বারা দুর্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণকার সেই সকল দুর্গ কিরূপ কৌশল সম্পন্ন তাহা আমরা উত্তমরূপ জানি না। পরন্তু পুরাতন কালের দুর্গ নির্ম্মাণ বিধি পর্য্যালোচনা করিলে আধুনিক দুর্গগুলির ব্যবস্থা কৌশল অল্প পরিমাণে বোধগম্য করা যায়। রাজবল্লভ নামক বাস্তুশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্গ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ জন্য তাহার কতক অংশ আমরা প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত করিব।

শ্রীরামদাস সেন।

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

(প্রথম খণ্ড ৫২৫ পৃষ্ঠার পর।)

ফরাসী প্রত্নবিৎ মুসো এমিলি সেনার্ট মহাবস্তু অবদান প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে মৌদ্গল্যায়ণের স্বর্গ ও নরক দর্শন, বৌদ্ধসূত্র, দশভূমি, দীপঙ্কর, মঙ্গল মালিনী ঘটিকার ও জ্যোতিপালের উপাখ্যান (ব্যাকরণ) শাক্য ও কোল্যবংশের ইতিবৃত্ত এবং ঋষিপত্তন মৃগদাবের আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। সংজীব, কালসূত্র, সংঘাত রৌরব, মহা রৌরব মহাবীচি, তপন ও প্রতাপন নরকে কত প্রকার যন্ত্রণা এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দ্বারা কিরূপে এই সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, চতুর্ভিক্ষু সমিতি সমক্ষে মৌদ্গল্যায়ণের ব্যাখ্যা; দুরারোহা, বর্দ্ধমানা, পুষ্পমণ্ডিতা, রুচিরা, চিত্রবিচিত্রা, রূপবতী, দুর্দ্ধয়া, জখান্নুদেশা, জৌবরা এবং অভিষেকা নামে দশভূমি বা সমাধি সোপান; দীপঙ্কর দীপবতী নগরের রাজা অচ্ছিষ্টের পত্নী সুশীলা, বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর তুষিত লোক পরিত্যাগ করিয়া সুশীলার গর্ভে আবির্ভূত হন। প্রসব সময়ে সুশীলা পদ্ম সরোবর পার্শ্বে গমন করিলে সহসা তড়াগ মধ্যে একটী দ্বীপ উত্থিত হয়, সে দ্বীপ মধ্যে দীপাঙ্করের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম মুহূর্ত্তে সহসা কতকগুলি অপার্থিব দ্বীপ উঠায় তাঁহার নাম দীপাঙ্কর হইয়াছিল। জন্মিবার পর দিবস দীপাঙ্কর পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন, কিছুকাল পরে আশিহাজার ভিক্ষু সঙ্গে তিনি দীপবতী নগরে ফিরিয়া আইসেন। মেঘ নামে একজন অধ্যেতা দীপাঙ্করকে পাঁচটী পদ্ম উপহার দিয়া জন্মান্তরে দীপাঙ্করের তুল্য হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। কপিলবস্তুর শাক্যমুনি সেই মেঘ নামে অধ্যেতা; মঙ্গল-শাক্য সিংহ পূর্ব্ব জন্মে উত্তর নাম নগরে অতুল নামে হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মঙ্গল নামে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। মঙ্গলের পিতার নাম সুন্দর, মাতার নাম শ্রী, মঙ্গলের তিনটী মণ্ডলী

ছিল, একটীতে একলক্ষ, দ্বিতীয়ে নবতি সহস্র ও তৃতীয় সমিতিতে অশিতি সহস্র শ্রাবক ছিল; চ্ছত্রকুণ্ডলা নামে এক যক্ষিনীর সহস্র পুত্র বৈশালীবাসীদিগের ওজহরণ করিয়াছিল। নানা প্রকার চেষ্টায় রোগ সারিল না দেখিয়া বৈশালীবাসী লেচ্ছবদিগের মুখপাত্র তোমর বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলে তিনি ব্যাধি নির্মোচনার্থে বৈশালী যাত্রা করিয়া অধিবাসীদিগকে রোগ বিমুক্ত করেন; মালিনীর প্রত্যেক বুদ্ধ বারাণসী নগরে ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া যান, এমন সময় একটী বালিকা তাঁহাকে লইয়া গিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছিল ও তাঁহার মৃত্যু পরে প্রতিদিন তাঁহার সমাধি স্তম্ভে নব কুসুম মালা পরাইয়া দিত সেই গুণে বালিকা বারাণসী রাজা কুকির কন্যা রূপে জন্মিয়াছিল এবং [illegible] তাহার গলায় একটী মালা ছিল [illegible] কাশ্যপ নামে বুদ্ধ শিষ্যকে [illegible] করিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা [illegible] নির্ব্বাসিত করিবার জন্য রাজাকে [illegible] করিয়াছিল। মালিনী পিতার [illegible] সপ্তাহ অবসর ভিক্ষা করেন [illegible] সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার পাঁচশত ভ্রাতা [illegible] লোক সকল বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible] কাশ্যপকে দণ্ড দিবার জন্য [illegible] তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি[illegible] ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং তাঁহাকে শা[illegible] কিন্তু সকলেই হত হইয়াছিল। জ্যোতিপাল কোশল রাজ্যে মারকরন্ত গ্রামে ঘটিকার নামে একজন কুম্ভকার বাস করিত, ঘটিকার কাশ্যপের শিষ্য। তাহার পুত্র জ্যোতিপাল অতি দুর্দ্দান্ত ছিল, কিন্তু কাশ্যপের নিকট উপদেশ পাইয়া শেষে জ্যোতিপাল সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কাশ্যপের বরে জ্যোতিপাল ভদ্রকল্পে কপিলবস্তু নগরে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, তুষিত লোকে শ্বেতকেতু নামে দেবপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং শাক্যসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়। শাক্য ও কোলিয়বংশের উৎপত্তি, সখতের পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র রব, রবের পুত্র উপোষধ, তাঁহার পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার সহস্র পুত্র পৌত্র জন্মিয়াছিল। শাকেত মহানগরে ইক্ষাকুবংশীয় সুজাত নামে রাজা ছিল। ঔপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ নামে তাঁহার পাঁচটী পুত্র এবং শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্যা ছিল, এবং বিলাসিকা জেণ্ডির গর্ভে জেণ্ড নামে এক জারজ পুত্র জন্মে। জেণ্ডকের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া সুজাতা পুত্র কন্যাদিগকে তাড়াইয়া দেন। তাহারা কাশী কোশল রাজার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কপিল ঋষির শাকোট বনখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। কপিলঋষির অনুমতি ক্রমে তাহারা এই খানে কপিলবস্তু নগর স্থাপন করিয়াছিল। এখানে প্রথমে ঔপুর, তাহার পর তাহার পুত্র নিপুর, তাহার পুত্র করকণ্ড, তাহার পুত্র উল্কামুখ, তাহার পুত্র হস্তিশীর্ষ, তাহার পুত্র সিংহহনু ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহহনুর চারি পুত্র শুদ্ধোদন, ধৌতদন, শুক্লোদন এবং অমৃতোদন এবং অমিতা নামে দারিকা। অমিতার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল, কোন প্রকারে আরোগ্য না হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ উৎসদ্ধ পর্ব্বতের গহ্বরে অমিতাকে রাখিয়া আইসে। এখানে কোপ নামে একঋষি তাহার পাণিগ্রহণ করেন। কোপের ঔরসে অমিতার

কয়েকটী পুত্র হয়। তাহারা কৌল বা কৌলিয় নামে খ্যাত। সুতরাং শাক্য ও কৌলবংশের সম্বন্ধ অতি নিকট। সুভূতির সাতকন্যা, মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া চুলীয়া, কোলোসোবা এবং মহাপ্রজাপতি। সিংহহনুর মরণান্তে শুদ্ধোধন রাজা হইয়া মায়া ও মহাপ্রজাপতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠেরা অন্য কয়টী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন; বিবাহ সময়ে দৈববাণী হইয়াছিল যে, দ্বাদশ বৎসর পরে বোধিসত্ব অবতীর্ণ হইবেন। মৃগদাবঋষিপতনবাসী মৃগযুথ বারাণশীর রাজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, রাজা তাহাদিগকে শীকারে বধ করিবেন না, তাহারা তাঁহার ভোজনার্থে প্রতিদিন একটী উপহার পাঠাইবে। বহুকাল সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হইলে একটী গর্ভিনী মৃগীর রাজাহারার্থে যাইবার সময় হয়; তাহার সঙ্গে তাহার গর্ভস্থ সন্তান দুটী বিনষ্ট হইবে, এই ভয়ে সে কাহাকেও তাহার পরিবর্ত্তে যাইতে বারম্বার প্রার্থনা করে। শেষে যুথপতি ন্যশ্রোধ স্বয়ং যাইয়া রাজার নিকট সকল কথা নিবেদন করিলে তিনি মৃগযুথকে নিষ্কৃতি দান করেন।”

এইখানে মুসো সেনার্ট প্রকাশিত মহাবস্তু শেষ হইয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র Nepalese Buddhist Literature নামক গ্রন্থে যে মহাবস্তু অবদানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের জীবনচরিতও লিখা আছে। ললিতবিস্তরের ও এই মহাবস্তুর বুদ্ধ আখ্যায়িকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই মাত্র, ললিত-বিস্তরকে বৈপুল্য গ্রন্থ বলিতে হইলে মহাবস্তুকে মহাবৈপুল্য বলিতে হইবে। পশ্চাৎ উল্লিখিত অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত কাব্যে যেখানে তিনটী দেবতার উল্লেখ আছে, ললিত-বিস্তরে সেখানে তিনকোটী এবং মহাবস্তু অবদানে তেত্রিশকোটী দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ললিত-বিস্তরে যেখানে লেখা আছে, যশোধরা শাক্যকে দেখিয়া লজ্জায় অবনতমুখ হইলেন, মহাবস্তুতে সেখানে সেরূপ লজ্জিত হইবার কারণ কি, পৌরাণিক ইতিবৃত্তের মত তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জন্মান্তরে নারদকে দেখিয়া ইন্দ্রের কন্যা হিরী বড় লজ্জা পাইয়াছিলেন, শাক্য সেই নারদ এবং যশোধরা সেই হিরী ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহাবস্তু অবদানে ধর্ম্মপাল মহৌষধ, অমরা, শিরী, সুচন্দ্রিম, শ্যামা, বজ্রসেন প্রভৃতির আখ্যায়িকা গ্রথিত হইয়াছে। মহাবস্তু মতে সুজাতা শাক্যের পাঁচশত পূর্ব্বজন্মের জননী, তাই তাঁহাকে পায়স খাইতে দিয়াছিলেন। শাক্যের হরিণ অবতারে যশোধরা গিরী-প্রভা নামে কুরঙ্গী ছিলেন, তিনি ব্যাধ হস্ত হইতে স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাই যখন শাক্য উরুবিল্ব গ্রামে কৃচ্ছসাধন করিতেছিলেন, যশোধরা রাজপ্রাসাদেও সেইরূপ করিতেন। এইরূপে কয়েকটী জাতক মহাবস্তু মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে! ধর্ম্মপ্রচার ক্রমে দ্বিতীয় বার বিম্বিসারের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মহাবস্তু অবদানে লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অত্যুক্তি বা বহুভাষিতা হইতে গ্রন্থ রচনার সময় নির্ণয় করা সহজ নহে। করিতে পারিলে আমরা মহাবস্তু অবদানকে ললিতবিস্তরের পরকাল রচিত বলিয়া নির্ণয় করিতাম। অঙ্গুত্তর নিকায় প্রভৃতি যে সকল পালি বৌদ্ধ গ্রন্থ

অতি প্রাচীন বলিয়া কোন কোন পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, তাহাতেও অত্যুক্তির সীমা নাই, একথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। মহাবস্তু অবদানে লিখিত আছে, এখানি মহা-সাঙ্ঘিকদিগের গ্রন্থ "আর্য্যমহা-সাংঘিকানাং লোকোত্তর বাদিনাং মধ্য দেশি-কানাং পাঠেন বিনয় পিটকস্য মহাবস্তুয়ে আদি" বৈশালী নগরে বৌদ্ধ সমিতিতে বৌদ্ধদিগের গৃহ বিচ্ছেদ হইয়া মহাস্থবির ও মহাসাংঙ্ঘিক দুইটী সম্প্রদায় গঠিত হয়। বৈশালী সংঙ্ঘ কবে সমাহূত হয়, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ওলডেনবর্গের মতে খৃঃ পূঃ অব্দে এই সমিতি হইয়াছিল। কিন্তু মহা-বস্তুকে ইহার অব্যবহিত পরকাল রচিত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

ললিতবিস্তর ও মহাবস্তুর ভাষা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। মহাবস্তুকে সংস্কৃত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। পাঠকগণের বিচারার্থ আমরা ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমাদের বোধ হয়, নেপাল বা রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী অন্য কোন প্রদেশে প্রদেশীয় সংস্কৃত (সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্রিত সংস্কৃত) ভাষায় মহাবস্তু রচিত হইয়া-ছিল।

"অথ খলু ভিক্ষবো বোধিসত্বো মগধেষু চর্য্যাঞ্চরন্ যেন মাগধকানাং গয়া তামনুস্মৃত্য তামনুপ্রাপ্তোভূৎ। তত্র খল্বপি ভিক্ষবো বোধিসত্বঃ প্রহাণার্থী বিহরতিস্ম গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে। তত্রাস্য বিহরত স্তিস্রঃ উপমাঃ প্রতিভান্তিস্ম অশ্রুতপূর্ব্বাঃ অবিজ্ঞাত পূর্ব্বাঃ। কতমাস্তিস্রঃ। যে কেচিত্তে খল্বপি শ্রমণ ব্রাহ্মণাঃ কামেভ্যোঽনবকৃষ্ট কায়া বিহরন্তিস্ম। কামেভ্যোঽনবকৃষ্ট চিত্তাশ্চ বিহরন্তিস্ম। যাঽপি চৈষাং কামেষু নন্দীকামেষু রাগঃ কামেষুচ্ছন্দঃ কামেষু তৃষ্ণাকামেষুপিপাসা কামেষু পরিদাহাঃ কামেষু অধ্যবসনতা সা ব্যবশান্তো।" ললিতবিস্তর সপ্তদশাধ্যায়, ৩০৯ পৃষ্ঠা।

"তেনদানি কাশিরাজ্ঞা মালিনী পরি-ত্যক্তা। যথা ব্রাহ্মণ পরিষায়ে অভিপ্রায়-স্তথা ভবতু। তেদানি ব্রহ্মণা আহন্সু। যদি পরিত্যক্তা মালিনী আনাপিয়তু রাজ্ঞা। ততো তেন বাহিরে নগরাতো ব্রাহ্মণাণাং মূলে স্থিতকেন দূতো প্রেষিতো। আগচ্ছথ মালিনী মানেথত্তি। রাজ বচনেন দূতো রাজকূল মনুপ্রাপ্তঃ। আগচ্ছমালিনী পরি-ত্যক্তাসি পিতরি ব্রাহ্মণাণাং। ব্রাহ্মণেহি জীবিতাদ্য পরোপ্যসি। মালিনীয়ে মাতরং আগত্বা আর বোমুক্তো সর্ব্বেণচ অন্তঃপুরেণ। নগরে সর্ব্বজনো তেন আরাব শব্দেন উৎক ঠিতো আকুলী ভূতো। মহং আসি রোদনং। মালিনীবারাণসীতো দূতেন নিষ্কাস্যতি পিতুঃ সকাশং। সা দানি দূতেহি নিষ্কাসিতা পিতঃ অল্লোপিতা।" Le.. Mahavastu. P. 31I.

এই সঙ্গে আরো কয়েকখানি বুদ্ধচরিতের পরিচয় দেওয়া যাউক। এ পর্য্যন্ত যতগুলি বুদ্ধচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠক সেগুলি একত্র পড়িতে ও তুলনা করিতে পারিবেন। আখ্যায়িকা ভাগ ক্রমে কেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, এবং সকলগুলি তুলনা করিয়া আখ্যায়িকার কোন অংশ বিশ্বাস্য ও কোন অংশ পরিত্যজ্য বিবেচনা করিতে পারিবেন। চৈনিক বুদ্ধচরিত সকল কোন্ সময়ে কাহা কর্ত্তৃক কোন্ ভাষা হইতে অনু-বাদিত হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাহাদিগের আখ্যায়িকার সহিত ললিতবিস্তর ও মহাবস্তুর আখ্যায়িকার

তুলনা করিলে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল অনুমান করা যাইতে পারিবে।

আচার্য্য সামুয়েল বিল এ পর্য্যন্ত চীন-ভাষায় সপ্তদশ খণ্ড বুদ্ধচরিত দেখিয়াছেন। তাহাদিগের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলেনঃ—

(১) "গোভরণ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের ৬৮—৭০ অব্দে অনুবাদিত কোপেন-হিঙ্গ-কিঙ্গ। এখানি এখন আর পাওয়া যায় না। গ্রন্থ-খানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ অন্যান্য গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা এখানিকেও প্রকৃত জীবনচরিত না বলিয়া অবদান বা আখ্যায়িকা বলিতে ইচ্ছা হয়। বুদ্ধের জন্মস্থান সম্বন্ধে পরামর্শ, মায়াদেবীর স্বপ্ন, দৈবজ্ঞ অসিতের জন্মকোষ্ঠী প্রণয়ন, যুবকগণের সহিত মল্লযুদ্ধ, দশ বৎসর পিতৃগৃহে বিলাস ভোগ, নগর ভ্রমণ ও জরামৃত্যুর পরিচয় লাভ, অভি-নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বে সাক্ষাৎ, কেশমুণ্ডন, ব্যাধের সহিত পরিধেয় পরিবর্ত্তন, হিমালয়ে ঋষি সাক্ষাৎ, ছয় বৎসর গয়াবাস, কালিক ও মুচি-লিন্দ নাগ, সুজাতার কন্যাদ্বয়ের পায়স দান ইত্যাদি উদ্ধৃতাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় শাক্যের সম্যক সম্বোধি লাভ এবং মার পরাজয়ও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছিল। সুতরাং যে আখ্যায়িকার উপর ভিত্তি করিয়া ললিতবিস্তরাদি বুদ্ধচরিত রচিত হইয়াছে, সেই আখ্যায়িকা পূর্ণ একখানি বুদ্ধচরিত খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এই-খানিকেই ললিতবিস্তর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

(২) সু-হিঙ্গ-পেন-কি কিঙ্গ নামে আর একখানি বুদ্ধচরিত খ্রীষ্টের ১৯৪ অব্দে মহা-বাল ও কোঙ্গ মঙ্গ সিয়াঙ্গ নামে দুই জন ভারতবর্ষীয় শ্রমণ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকল নামে একজন শ্রমণ কপিলবস্তু হইতে এই গ্রন্থখানি চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। দুই খণ্ডে ও শত বর্গে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। এখানি অদ্যাপি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে মার পরাজয় পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। ললিতবিস্তরাদি বৈপুল্য গ্রন্থের ন্যায় এখানিও বহুভাষিতা দোষে কলঙ্কিত। প্রথম বর্গে জন্মজন্মান্তরে বুদ্ধের বিভিন্ন যোণী ভ্রমণ, শেষে বেশান্তর-রূপে তুষিত নাম স্বর্গে বাস, এবং মর্ত্ত্য-লোকে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিতে অবতরণ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্গে মায়াদেবীর স্বপ্নে শ্বেতহস্তী দর্শন, দৈবজ্ঞগণের স্বপ্নার্থ নিরূপণ, চারি মাস আট দিন গর্ভবাস, পরে অশোকমূলে বুদ্ধের জন্মগ্রহণ, দ্বাত্রিংশৎ অদ্ভুত ঘটনা, অসিতের আগমন ও ভবিষ্য নিরূপণ, এবং গুরু অপেক্ষা শিষ্যের অভি-জ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বর্গে মল্লযুদ্ধ ধনুর্ব্বিদ্যাদি পরীক্ষা, গোপার সহিত বিবাহ ও ষাট হাজার পরিচারিকা সঙ্গে রাজ-ভবনে বাস, তথাচ মনে অশান্তি ভোগ বর্ণিত রহিয়াছে। চতুর্থ বর্গে সহস্র রথ ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে নগর ভ্রমণ, বৃদ্ধ পীড়িত ও মৃত দর্শন, শ্রমণ সাক্ষাৎ, সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষ, জম্বুমূলে ধ্যান ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চমবর্গে ঊনবিংশ বর্ষ বয়সে অভিনিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বে গোপার স্বপ্ন দেখিয়া জাগরণ, বুদ্ধ কর্ত্তৃক গোপার সান্ত্বনা, দেবগণ কর্ত্তৃক নগর-বাসীদিগের নিদ্রিত করণ ও সখিগণের ঘৃণার্হ বেশে শয়ন, ছন্দককে লইয়া প্রস্থান, অনোমা-তটে ছন্দকের নিকট বিদায়, কেশমুণ্ডন,

মগধ প্রবেশ, বিম্বিসর সাক্ষাৎ, অরাড় ও কালামের নিকট শিক্ষা লাভাশায় গমন এবং অসন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ বর্গে ছয় বৎসর তপস্যা, সেনার দুহিতৃ দ্বয়ের স্বপ্নদর্শন,—যেন একটী পদ্ম শুকাইতেছিল, একজন জল সিঞ্চনে তাহাকে সজীব করিল; ব্রহ্মচারিবেশে শক্র কর্ত্তৃক স্বপ্নার্থ বর্ণন, সেনার দুহিতৃদ্বয়ের নিকট পায়স গ্রহণ, বোধিমূলে গমন বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম বর্গে মার ও তাহার দুহিতৃগণের পরাভব।

(৩) সৌ-পেন-কি-কিঙ্গ এখানি খ্রীষ্টের ১৯৬ অব্দে কিয়ৌ নামে এক শ্রমণ কর্ত্তৃক দুইখণ্ডে চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এখানি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

(৪) তা সৌ-সু-য়িঙ্গ-পেন-কি-কিঙ্গ এই গ্রন্থখানি বুরাজ বংশের (২২২-২৬৪) একজন উপাসক কর্ত্তৃক লিখিত বা অনুবাদিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথমখণ্ডে মার পরাজয় পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চ ভদ্রবর্গীয় ও তিন ভাই কাশ্যপের দীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বুদ্ধের বারাণসী যাত্রার কোন উল্লেখ নাই, ইহাতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ বোধিমূলে পঞ্চ ভদ্রবর্গীয়কে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাতে যশ সারিপুত্র বা মৌদ্গল্যায়ণেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(৫) কঙ্গ-পেন-কি-কিঙ্গ খ্রীষ্টের ২০৮ অব্দে শ্রমণ ধর্ম্মকল কপিলবস্তু হইতে এই গ্রন্থখানি চীনদেশে আনিয়া অনুবাদিত করেন। দীর্ঘাগম নামক প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। অনুবাদ দুই খণ্ডে ও পঞ্চদশ বর্গে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, উপাসকের সহিত সাক্ষাৎ ও পঞ্চ ভদ্র বর্গীয়ের দীক্ষা; দ্বিতীয় বর্গে যশের আখ্যায়িকা, পুণ্যজিৎ বিমল, গবাম্পতি ও সুবাহুর দীক্ষা; তৃতীয় বর্গে কাশ্যপের দীক্ষা, চতুর্থে রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা; পঞ্চমে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণের দীক্ষা, ষষ্ঠে কপিলবস্তু যাত্রা, সপ্তমে সুদত্ত বা অনাথ পিণ্ডদের আখ্যায়িকা, অষ্টমে কৌসাম্বী রাজ্ঞী উদ্যানের আখ্যান, নবমে গৌতমীর ভিক্ষুনী হওয়া, দশমে প্রশেনজিতের সহিত সাক্ষাৎ, একাদশে প্রশেনজিতের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্মগরিমা সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ; দ্বাদশে মহাকাশ্যপ অগ্নিদত্তের দীক্ষা; ত্রয়োদশে অম্বপালির দীক্ষা; চতুর্দ্দশে নির্গ্রন্থদিগের সহিত বিতর্ক এবং পঞ্চদশে বুদ্ধের অযোগ্য আহার্য্য গ্রহণ।

(৬) ফু-যৌ-কিঙ্গ এখানি ললিতবিস্তরের ন্যায় আর একখানি বৈপুল্য গ্রন্থ, অত্যুক্তি পরিপূর্ণ। খ্রীষ্টের ৩০০ অব্দে ধর্ম্মরক্ষ এখানির অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) কৌ-হু-য়িন-কো-কিঙ্গ খ্রীষ্টের ৪২০ অব্দে শাক্যের খুল্লতাত অমৃতোদানের বংশধর বুদ্ধভদ্র এই খানি অনুবাদিত করিয়াছিলেন। এখানি চারিভাগে সম্পূর্ণ। এই অনুবাদ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই; কিন্তু যে মূলগ্রন্থ হইতে এখানি অনুবাদিত হইয়াছিল সেই মূল গ্রন্থ।

(৮) কৌ-হু-হেন সৈ-যিন-কো-কিঙ্গ নামে গুণভদ্র কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের ৪৩৬ অব্দে আর এক বার অনুবাদিত হয়। এ গ্রন্থখানি অদ্যাপি প্রচারিত আছে। প্রথম ভাগে বুদ্ধের গর্ভবাস, জন্ম ও দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যলীলা, দ্বিতীয় ভাগে মল্লযুদ্ধ হইতে উনবিংশ

বয়সে অভিনিষ্ক্রমণ পর্য্যন্ত, তৃতীয়ে ঋষি সাক্ষাৎ হইতে পঞ্চভদ্র বর্গীয়ের দীক্ষা পর্য্যন্ত, এবং চতুর্থে যশও কাশ্যপদিগের দীক্ষা হইতে অনাথপিণ্ডদ কর্ত্তৃক জেতবান বিহার দান পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

(৯) ফাহিয়ান পাটনা হইতে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের একখানি এবং সিংহল হইতে মহিশাসিক সম্প্রদায়ের একখানি, এই দুই খানি বিনয় গ্রন্থ চীন দেশে লইয়া গিয়াছেন। মহিশাসিক বিনয়ের পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে বুদ্ধের জীবনচরিত বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টের ৪২৩ অব্দে বুদ্ধজীব এই জীবনচরিত চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। মহাসাঙ্ঘিক বিনয়ে বুদ্ধের জীবনচরিত নাই। বুদ্ধজীবের জীবনচরিত শাক্য বংশের উৎপত্তি বর্ণনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শাক্যের সমাধি লাভ, উপকের সহিত সাক্ষাৎ, যশ ও তাঁহার সহচরগণের দীক্ষা, উরুবিল্বযাত্রা, কাশ্যপ সাক্ষাৎ, উপতিস্স ও কোলিতের দীক্ষা; পালি মহাবর্গে যেরূপ আছে ইহাতেও সেইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মহিশাসিক সম্প্রদায় সিংহলীয় আর্য্য স্থবির সম্প্রদায়ের শাখা মাত্র, সুতরাং তাহাদিগের বিনয়ের সহিত পালি মহাবর্গের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

(১০) কো-পেন-হিঙ্গ-কিঙ্গ খ্রীষ্টের ৪২০ অব্দে পাচুন নামে ফাহিয়ানের একজন চৈনিক সহচর এখানির অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সাত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে তথাগত গুণ বর্ণন, তথাগত জন্ম, কোষ্ঠীলিখন, অসিতের ভবিষ্যবাণী, বিদ্যারম্ভ। দ্বিতীয়ে বিলাস ভোগ, জম্বুমূলে সমাধি, অভিনিষ্ক্রমণ, বিম্বিসর সাক্ষাৎ; তৃতীয়ে বিম্বিসর সাক্ষাত ধর্ম্মব্যাখ্যা, অলাড়ের শিক্ষায় অসন্তুষ্টি, মার পরাজয়, চতুর্থে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন, যশদের ও অন্যান্যের দীক্ষা, পঞ্চমে ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে যাত্রা ও মায়ার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা, বৈশালী যাত্রা, হস্তীদমন, জীবনত্যাগের জন্য মারের প্রলোভন, ষষ্ঠে দেবদত্তের নরক গমন, এবং সপ্তমে মহানির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ গুণ বর্ণন, এবং অষ্ট রাজের শরীর ভাগ বর্ণিত হইয়াছে।

(১১) সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে দিবাকর নামে একজন শ্রমণ ললিতবিস্তর চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। এ গ্রন্থখানির বাহুল্যভাবে বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই, চীন অনুবাদের নাম ফঙ্গ-ফাঙ্গ-তৈ-ফাঙ্গ-যান-কিঙ্গ। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

(১২) কনিষ্কের সম সাময়িক সঙ্ঘরক্ষ আর একখানি বুদ্ধচরিত রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্ঘভদ্র (?) এখানি খ্রীষ্টের ৪৪৫ অব্দে চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্ম হইতে মৃত্যু পরে শরীর বিভাগ পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহার চৈনিক নাম সং-ক্যা-লো-চ (সঙ্ঘরক্ষ?) মো-সি-কো-হিঙ্গ-কিঙ্গ।

(১৩) ফো-পেন-সি-হিঙ্গ-কিঙ্গ, এখানি জ্ঞানকূট কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের ৫৮৮ অব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বিলসাহেব Romantic History of Buddha নামে এখানি ইংরাজিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহাতে বুদ্ধের জন্ম হইতে কাশ্যপদিগের দীক্ষা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) ফো-সো-কুঙ্গ-হু-যো-হো-তি-কিঙ্গ এখানি সম্মতীয় সম্প্রদায়ের কাহারো রচিত,

গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বোধ হয় এখানি পালিভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়া থাকিবে। বিগাণ্ডো ও হার্ভি সাহেবের অনুবাদিত বুদ্ধচরিতের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

(১৫) শিন-তুঙ্গ-যৌ হি-কিঙ্গ-এখানি বৈপুল্য গ্রন্থ, অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

(১৬) অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত কাব্য খ্রীষ্টের ৪২০ অব্দে ধর্ম্মরক্ষ কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। অশ্বঘোষের রচিত মূল গ্রন্থও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। চীন গ্রন্থখানি বিলসাহেব সম্প্রতি ইংরাজিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ। কোন অধ্যায়ে কি লিখিত হইয়াছে, আমরা সংস্কৃত মূল চৈনীক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) ইতি শ্রীবুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে ভগবৎ প্রসূতির্নাম প্রথমঃ সর্গঃ Birth.

(২) অতঃপর বিহারো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ Living in the Palace.

(৩) সংবেগোৎ পত্তির্নাম তৃতীয় সর্গঃ Disgust at sorrow.

(৪) স্ত্রীবিঘাতনো নাম চতুর্থ সর্গঃ Give up a life of pleasure.

(৫) অভিনিষ্ক্রমণা নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ Leaves the city.

(৬) ছন্দক নিবর্ত্তনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ Return of Khandake.

(৭) তপোবন প্রবেশো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ Enters the forest of penance.

(৮) অন্তঃপুর বিলাপ নামাষ্টমঃ সর্গঃ The general grief of the palace.

(৯) কুমারান্বেষণ নাম নবমঃ সর্গঃ Mission dispatched to search for the Royal prince.

(১০) অশ্বঘোষ কৃতে শ্রেণ্যভিগনো নাম দশমঃ সর্গঃ Bimbisara Raja goes to visit the Royal prince.

(১১) অশ্বঘোষ কৃত কামবিগর্হণো নাম একাদশঃ সর্গঃ The prince's reply to Bimbisara.

(১২) অশ্বঘোষ কৃত অরাড় দর্শনো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ Interview with Arara and Udrarama.

(১৩) অশ্বঘোষ কৃত মার-বিজয়ো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ Defeats Mara.

(১৪) অশ্বঘোষ কৃতঽভি সম্বোধন সংস্তবো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ Abhisam-bodhi.

(১৫) অশ্বঘোষ কৃত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনাধ্যেষণং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ Turns the wheel of the law.

(১৬) অশ্বঘোষ কৃত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ Bimbisara Raja becomes a disciple.

(১৭) অশ্বঘোষ কৃত লুম্বিনী যাত্রিকা নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ The great disciple quits his home.

ক্রমশঃ।

নবলীলা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশত্যাগের একটী কারণ।

বিনোদ বাবু যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন হইতেই দেশ-ভ্রমণের প্রবল বাসনা হৃদয়ের এক কোণে মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই বাসনা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের সকল স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বয়স বাড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনাও বাড়িল। যশমান সঞ্চয় করিব, ধনী হইব, বিদ্বান হইব, বিনোদ বাবুর সে ইচ্ছা বড় একটা ছিল না; কিন্তু তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে ভাসিব, গগনস্পর্শী মেঘের লীলাভূমি পর্ব্বতে উঠিব, গহন অরণ্যে যাইব, সে ইচ্ছাটী বিনোদকে ক্রমেই জাগাইয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে সকলে তাহা জানিল। প্রতিবন্ধকও জুটিল। অনন্তদেবী ভালবাসার অনন্ত ফাঁদ পাতিয়া বিনোদকে বাঁধিলেন। বিনোদের স্কুলের পড়া বন্ধ করিলেন, বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ দিলেন। সাধারণ লোকদিগের ধারণা, বিবাহ দিলে বালকেরা সংযত হয়। এই জন্য, প্রায় বালকেরই বাল্যকালে বিবাহ হয়। বিবাহ হইলেও তাহাতে বিনোদের মন বসিল না। বিনোদের বিবাহে মন ছিল না, সুতরাং স্ত্রীকে তেমন ভালবাসিতে পারিলেন না। অনন্তদেবী অমৃতের আশায় গৃহে গরল তুলিলেন। নরস্বামীকে নবস্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত করিতে অনেক চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহার ফল বড় ভাল হইল না। তারপর আরো চেষ্টা হইল। সে সকল কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। ক্রমে ক্রমে কুসংসর্গ বিনোদকে ঘেরিয়া ফেলিল। প্রলোভনের মধুর আকর্ষণ বিনোদকে ধরিল। বিনোদ কুসংসর্গ-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। হাস্য পরিহাসে, তাস পাশা ক্রীড়ায়, ও বৃথা গল্পে সময় যাইতে লাগিল। বিনোদের হৃদয় ভাল ছিল, মদ ধরিলেন না—রিপু-ক্রীড়ায় মাতিলেন না।

স্ত্রীকে না ভালবাসার যে কুফল ফলিবার তাহা ফলিল। যৌবনের প্রারম্ভেই স্ত্রীর হৃদয়ে গাঢ় চিন্তার মেঘ উঠিল। কি প্রকারে ক্রমে বাল্যবিবাহের কুফল ফলিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব না, বলিতে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। বিনোদের পশ্চাতে যে সকল লোক লাগিয়াছিল, তাঁহারা ক্রমে বিনোদকে কমলমণিদের বাড়ীতে লইয়া গেল, ক্রমে বিনোদ এতটুকু অগ্রসর হইলেন! সেখানে রূপের সাগর খেলিতেছে, ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ তুলিতেছে। সে রূপ-সাগর দেখিয়া বিনোদ মোহিত হইলেন। এমন দ্রব্যে এমন কীট, এমন সৌন্দর্য্যে এমন কদর্য্য কালিমা, তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন—গোপনে কাঁদিলেন। সুলোচনা তখন বালিকা, কুলকামিনী তখন যুবতী। সুলোচনা তখন অস্ফুট কলিকা, কুলকামিনী তখন প্রস্ফুটিত—নব তেজ, নব কান্তি, নবভাব যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। প্রফুল্ল মুখে হাসি ভাসিতেছে, তাহাতে অমৃত, তাহাতে মধুরতা। সুলোচনা জড়সড়—বিনয়ে যেন আর সকল গুণ ঢাকা। সুলো-

চনার হৃদয়ে তখনই চিন্তা উঠিয়াছে, সে চিন্তা বিনয়ের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া মলিন মুখে ভাসিতেছে। বিনীত মুখ চিন্তায় মলিন,—তাহাতে হাসি নাই—তাহাতে সুখের রেখা মাত্র নাই। প্রথম দিবসেই বিনোদ বাবু সুলোচনাকে চিনিয়া ফেলিলেন,—সুলোচনাকে বলিলেন—'তুমি কি স্কুলে পড় ?'

বিনীত স্বরে সুলোচনা বলিল,—স্কুলে পড়িতাম বটে, কিন্তু আর পড়া হবে না, মা বলেছেন আর স্কুলে যেতে দিবেন না।

বিনোদ বাবু বলিলেন—কেন ?

সুলোচনা—স্কুলে দিতে পূর্ব্বেই মায়ের ইচ্ছা ছিল না, দিদি তখন অনেক বুঝায়ে স্কুলে দিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণ মা ঠিক করেছেন, আর স্কুলে যেতে দিবেন না।

বিনোদ বাবু—মা কি বলেন ?

সুলোচনা।—মা বলেন, স্কুলে দিলে আমি খ্রীষ্টানি মত শিখিব, আপন ব্যবসা রাখিব না ; মেমের চক্রান্তে খারাপ হয়ে যাব।

বিনোদ বাবু—আপন-ব্যবসা কি, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?

সুলোচনা মস্তক অবনত করিল, চক্ষু হইতে দুই তিন ফোঁটা জল পড়িল, পরে ধীরে ধীরে বলিল,—সকলই বুঝিতে পারিয়াছি, স্কুলের মেম আমাকে সকল কথা বুঝায়ে দিয়াছেন।

বিনোদ বাবুর চক্ষু হইতেও দুফোঁটা জল পড়িল, ভাবিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা দেশের কি মহৎ উপকার করিতেছেন ! পুনঃ বলিলেন—তুমি কি করিবে ?

সুলোচনা।—তাহা জানি না। মেম বলেছেন, তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। সেই আশায় আছি।

বিনোদ বাবু।—তুমি তাঁহার সহিত যাইবে ?

সুলোচনা—অন্য উপায় যদি না পাই, তবে যাইব। কিন্তু দিদির কয়েকটী বন্ধু বলেছেন, আমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইবেন। তাঁহারা যদি কোন উপায় করেন, তবে তাঁহাদের সহিতই যাইব, মেমের পথ ধরিব না।

বিনোদ বাবু—তুমি কি মনে কর হিন্দু সমাজে কেহ তোমাকে স্থান দিবে ?

সুলোচনা—না দিবারই সম্ভব। কিন্তু তাহাদিগের কথা অবিশ্বাস করি না।

বিনোদ বাবু সুলোচনার অবস্থা কতক জ্ঞাত হইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা ভাব উপস্থিত হইল ; তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহিরে আসিলেন। পরদিন হইতে প্রত্যহ সেখানে যাইতে লাগিলেন। কমলমণি গোপনে অনেক টাকা লইতে লাগিল, বাহিরের লোকেরা কেহ কেহ বুঝিল, বিনোদ ফাঁদে পড়িয়াছেন। সুলোচনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বিনোদ বাবু রীতিমত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। ক্রমে অনেকে বুঝিল, বিনোদ আর সুলোচনার ভালবাসা পঙ্কিল নহে। কিন্তু সকলে তাহা বিশ্বাস করিল না। সুলোচনার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই বিনোদ কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন, হাসি তামাসা তখন হইতে আর ভাল লাগিত না। কোন প্রকার ক্রীড়ায়ও আর আসক্তি রহিল না। সেই সময়কার বন্ধু বান্ধবেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল, কিন্তু তাহাতে বিনোদ ভুলিলেন না। ক্রমে কমলমণি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিনোদের চেষ্টায় কুলকামিনীও তখন ব্যবসা ছাড়িয়াছে। কমলমণি ষড়যন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, বিনোদের দোষ প্রচার করিতে লাগিল, কিন্তু মেয়েরা তাহাতে ভুলিল না। পরে বিনোদের স্ত্রীকে হাত করিল—তাঁহাকে ডুবাইল। কমলমণির আয় একেবারেই কমিয়া গেল। অনন্তদেবী সকলই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হইল। বিনোদ সৎপথে থাকিয়াই দেশে রহিল, এ সুখ অনন্তদেবীর হৃদয়ে ধরিল না। বিনোদ যেন একটী নূতন সংসার পাতিলেন, তাহার চিন্তাতেই বিভোর, তাহার চিন্তাতেই মাত্র দেশভ্রমণের ইচ্ছা তখন নিবিয়া গিয়াছে। অনন্তদেবী সন্তানের হৃদয়ে আরো ভাল ভাব ঢালিতে লাগিলেন, সৎকার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রতি তাঁহারও ক্ষমতা জন্মিল, তিনি বিনোদের মনরক্ষার্থ ইহাদিগের জন্য গোপনে২ কিছু অর্থ পর্য্যন্ত ব্যয় করিলেন। চেষ্টার পরিণাম কি হইল, তাহা প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। বিনোদ বাবু যে দিন সুলোচনাদের অন্বেষণার্থ মাতার নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলেন, সে দিনও কত আশা ছিল, ইহাদিগকে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। বিনোদ বাবু অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সুলোচনাদের কোন সন্ধান পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বাসিত দেশভ্রমণের বাসনাটী প্রবল হইয়া উঠিল। সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে না পারায় তাঁহার হৃদয়ে একপ্রকার সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ফিরিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশত্যাগের আর একটী কারণ। অনন্তদেবীর স্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যবান

লোক ছিলেন। ঐশ্বর্য্যে বীর্য্য ছিল, বীর্য্যে ধর্ম্মনীতি জড়িত ছিল, তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপে গোপালপুর কাঁপিত। "বম্‌ভোলানাথ বম্‌ভোলানাথ" বলিয়া সদাই ভক্তিভরে ডাকিতেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা শোভা পাইত। সুরেশচন্দ্র পিতার কোন গুণই পান নাই বলিয়া, হরেন্দ্রকিশোর চৌধুরী তাহার প্রতি বড়ই বিরক্ত ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের চরিত্র বড় ভাল ছিল না,—মদ্ খাইতেন, প্রবঞ্চনা জীবনের ভূষণ ছিল। সুরেশচন্দ্রের একটী গুণ ছিল, ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। সুরেশ বিনোদকে ভালবাসিতেন, বিনোদের হৃদয় ভালবাসাময়, তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন। বিনোদ যখন ছোট, তখন সুরেশ পাপের কীট, সুতরাং ভক্ত হরেন্দ্রকিশোরের পুত্রবাৎসল্য বিনোদের উপরে পড়িল। বিনোদ পিতার বড় ভালাবাসার পাত্র হইলেন। বিনোদের কচিকণ্ঠের মধুর স্বরে হরেন্দ্রকিশোর ভোলানাথের নাম শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। পিতৃআজ্ঞায় শিশু বিনোদ নাচিতে নাচিতে হরগৌরীর কত গুণ কীর্ত্তন করিত! হরেন্দ্রকিশোর তাহা শুনিতেন, এবং আরো নূতন নূতন গান শিখাইতেন। গৃহের সম্মুখে প্রশান্ত, ধ্যানমগ্ন, নিমীলিত-নেত্র মহাদেবের মূর্ত্তি, শৈশব সময় হইতে সেই মূর্ত্তিকে বিনোদ ভক্তি করিত, পিতার আজ্ঞায় সাষ্টাঙ্গে প্রত্যহ প্রণিপাত করিত। ঐ প্রশান্তমূর্ত্তি বিনোদের বাল্যকালের একটী প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। পিতার জ্বলন্ত বিশ্বাস বিনোদের প্রাণে অবতীর্ণ হইল, শিশুভক্তিকে প্রাণে মাখিয়া সংসারে নামিল। বয়স যতই বাড়িল, ততই সেই ভক্তি ঘনীভূত হইল। হরেন্দ্রকিশোর বিনোদের ভক্তিভাব দেখিয়া সুখী হইলেন,

প্রাণের সহিত বিনোদকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বিনোদ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই হরেন্দ্রকিশোর ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর সময়ে বিষয় সম্পত্তি সকলই বিনোদের নামে লিখিয়া দিলেন। বিষয় দিলেন, এবং নগদ সম্পত্তি সমস্ত বিনোদের জন্য অনন্তদেবীর নিকট রাখিলেন। উইলপত্রে লিখিলেন, বিনোদ পিতৃধর্ম্ম ও কুলরক্ষা না করিলে কিছুই পাইবে না। পিতার মৃত্যুর পর অনন্তদেবী বিনোদকে স্কুলে পাঠাইলেন। সুরেশচন্দ্র বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেশের হাতে বিষয়ের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। নগদ সম্পত্তি অনন্তদেবী গোপনে রাখিলেন। বিনোদ যে ভক্তি বিশ্বাস লইয়া স্কুলে গেল, জ্ঞানলাভের সহিত তাহা ক্রমে হৃদয়ে অটল হইল। কুসংস্কার আর জ্ঞান, এ দুটী পরস্পর চিরশত্রু। জ্ঞানের অভ্যুদয়ে কুসংস্কার ক্রমেই বিনোদের হৃদয় মনকে পরিত্যাগ করিল, বিনোদ মহাদেবের উপাসকই রহিলেন, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ স্থানকে অতিক্রম করিল। গৃহের মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেন, কৈলাস পর্ব্বত হইতে অনন্ত আকাশে। পিতার ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বিনোদ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন,—হর আর গৌরী, পুরুষ আর প্রকৃতি, জ্ঞান আর প্রেম, ধর্ম্ম আর সংসার। হর মহাযোগী—কেবল জ্ঞানোন্মত্ত, কেবল বৈরাগী, কেবল অনাসক্ত; গৌরী প্রেমরূপিনী—কেবল শান্তিময়ী, কেবল অনুরাগিনী, কেবল আসক্তিময়ী। হর লালায়িত অপার্থিব বস্তুর জন্য; গৌরী অন্নপূর্ণা, ব্যস্ত কেবলই সংসারের জন্য। মহাযোগী মহাধ্যাননিমগ্ন, মহামায়া মায়ানিমগ্ন। দুই মিলিয়া পূর্ণধর্ম্ম। সংসার-প্রেমরূপিনীকে বামঊরুতে স্থাপন করিয়া মহাযোগী জ্ঞান স্বর্গকে আকর্ষণ করিতেছেন! কি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম। বিনোদবাবু স্কুলে জ্ঞানলাভ করিয়া পিতার ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব উত্তম রূপ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। বিনোদ পিতার ধর্ম্ম লইয়াই সংসারপথে চলিলেন। বিনোদের কুসংস্কার-বর্জ্জিত ধর্ম্মের অনাবিল প্রতিবিম্ব অলক্ষিতভাবে মাতার হৃদয়ে পড়িল। সন্তানের সহিত মাতাও ধর্ম্মসম্বন্ধে উন্নত হইতে লাগিলেন। অনন্তদেবী গুপ্ত সম্পত্তির কথা এই সময়ে বিনোদকে বলিলেন। বিনোদ পিতার উইলের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না, এই সময়ে শুনিলেন। সুলোচনার সহিত যখন আলাপ ঘনীভূত হইল, তখন হইতে বিনোদের একটু ভাবান্তর হয়। কেন ভাবান্তর হয়, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। যাহারা বিনোদের স্বভাবে কলঙ্ক আরোপ করিত, তাহারাও জানে নাই, যাহারা ভাল বলিত তাহারাও জানে নাই। এই সময় হইতে বিনোদ ভাবিতেন, কেন বিবাহ করিয়াছি!! যাহার সহিত মন মিলে না, হৃদয় মিলে না, তাহার সহিত কেন মিলিয়াছি! এই চিন্তার সহিত ক্রমে ক্রমে মাতার প্রতি একটু অশ্রদ্ধা জন্মিল! লোকে তাহা জানিত না, লোকে তাহা বুঝিত না। মাতা পূজ্য, মাতা আরাধ্য, সেই মাতার প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ জন্মিল, ইহা বিনোদের প্রাণে সহিত না। যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লোক যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, ততদূর বিনোদ অগ্রসর হইয়াছিলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এক বোটায় দুটী ফুল, এক শাখায় দুটী পাখী, এক নদীতে দুটী তরঙ্গ ফুটিতেছিল, খেলিতেছিল, হাসিতেছিল; অসময়ে তাহা বৃন্তচ্যুত হইল, অসময়ে তাহা বিচ্ছিন্ন হইল। মিলনের শাস্ত্র বিনোদ পাইলেন না, বুঝিলেন না, ধরিতে পারিলেন না, তাই তিনি দেশত্যাগী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুলোচনা ও বিনোদ।

কলঙ্ক আরোপ করিতে চাও, কর। কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, অমৃতে বিষ, নিঃস্বার্থে স্বার্থ দুঃখের স্বপ্ন, বিষাদের সঙ্গীত সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা সত্য তাহাকে কে প্রচ্ছন্ন রাখিবে? ধর্ম্মের জটা দৃঢ়রূপে বাঁধিতে না বাঁধিতে সংসারমায়া সে জটা ভাঙ্গিল; চরিত্রের বাঁধ দৃঢ় হইতে না হইতে প্রবল বন্যা সে বাঁধ তুলিয়া ফেলিল। বিনোদবাবুর নিঃস্বার্থ হৃদয়ে স্বার্থচিন্তা ক্রমে ক্রমে জমিল। যে সময় হইতে সুলোচনার চক্ষের জলে বিনোদের চক্ষের জল মিশিতে লাগিল, সেই সময় হইতে এই দারুণ চিন্তা উপস্থিত হইল—সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে পারিলেও কি সমাজে ইহার জন্য স্থান পাইব?—এ ফুলের আদর কি সমাজে হইবে?—এ কুসুমকে যত্ন করিয়া কেহ কি হৃদয়ে স্থান দিবে? চিন্তায় কত চিন্তা মিশাইল, কিন্তু বিনোদের মন সুস্থ হয় না। একদিকে নিরাশ্রয়া ভগ্নীদিগকে কত উৎসাহের কথা বলিয়া আশ্বস্থ করেন, অন্যদিকে প্রাণের মধ্যে অদম্য চিন্তার স্রোত প্রবাহিত। মুখের কথা মুখে, প্রাণের ভাব প্রাণে, মুখে প্রাণে মিল হয় না। সে কথা জমিবে কেন?—বিনোদ মনে করেন, খুব উৎসাহ দিতেছেন; কিন্তু কাজে কিছুই হয় না। মুখ যে কথা কয়, প্রাণ তাহাতে সায় দেয় না;—প্রাণ চিন্তায় কাতর। এ কপটতায় বিনোদ কিছুদিন দারুণ যাতনা পাইলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া ঊর্দ্ধে স্থান না পাইয়া এক সিঁড়ি নিম্নে নামিলেন, মনে করিলেন, আর কাহাকেও না পাই, আমিই এ ফুলের যত্ন করিব। নিঃস্বার্থ আকাশে স্বার্থ মেঘ জমিল। জমিল—কিন্তু এ স্বার্থেও গৌরব মিশিয়া রহিল। বিনোদ বিবাহিত, সে চিন্তা প্রথমে করিলেন না, সে বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন না, করিলেই বা কি, হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ তত দূষণীয় নয়। বিনোদের মুখ ও প্রাণ যখন মিলিয়া এক হইয়া ভগ্নীদিগকে উৎসাহ দিল, তখন সুলোচনা ও কুলকামিনী মাতিয়া উঠিলেন। কত তেজ, কত বল, কত উৎসাহ শুষ্কবৃক্ষে যেন সঞ্চারিত হইল। কয়েক দিবসের মধ্যেই সুলোচনা বিনোদবাবুর মন বুঝিলেন। সুলোচনা এই সময়ে যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। প্রকৃতি রূপভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, অলক্ষিত গুপ্ত স্থান হইতে কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য, কত অমৃত, কত মধুরতা ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কখন ফুটে তাহা কেহ জানে না, তাহা কেহ দেখে না, অথচ সুলোচনা কাল যেমন ছিল, আজ আর তেমনটী নয়, দু মাস পূর্ব্বের সহিত অদ্যকার সুলোচনার তুলনাও হয় না। সুলোচনার রূপ বিনোদের প্রাণে, বিনোদের রূপ সুলোচনার প্রাণে ভাসিল। যে বিনিময় হইল, তাহা অন্য কেহ বুঝিল না; বিনোদের চোক্ মুখ দেখিয়া সুলোচনা বুঝিল, সুলোচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিনোদ বুঝিলেন। আচার ব্যবহার তেমনি পূর্ব্ববৎ, কথাবার্ত্তা তেমনই পূর্ব্ববৎ,—সকলই পবিত্রতাময়।

দুই জনই পবিত্র, সুতরাং পদস্খলনের সম্ভাবনা রহিল না। ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিল, নীতি অক্ষুণ্ণ রহিল। বিনোদ সুলোচনাকে উদ্ধার করিলেন, আর স্থান না পাইয়া গৃহে আনিলেন। বিনোদের স্ত্রী পূর্ব্বেই বিরক্ত ছিল, এই ঘটনার পর উন্মত্তের ন্যায় হইল, যে উপায় পাইল, সেই উপায়ই ধরিল; শত্রুকে ঘরে আনিল—বিপদকে আহ্বান করিল। সুলোচনা সকলি বুঝিল। সে তখনি বুঝিল—সুধা কেবলই সুধা নহে, তাহা গরল মিশ্রিত। বিনোদের গৃহকে অল্প সময়ের মধ্যেই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য বলিয়া সুলোচনা বুঝিল। তাহার মন ঐ গৃহে বসিল না। বিনোদ পূর্ব্বে তত বুঝিতে পারেন নাই; সেই রজনীতে সকলি বুঝিলেন। কি কষ্ট, কি যাতনা পাইলেন, তাহা পৃথিবীর কোন লোক বুঝিতে পারিল না। যখন জানিলেন, সুলোচনা ও কুলকামিনী গৃহে নাই, তখনই সংসার সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু আসক্তি সে বৈরাগ্য-উপদেশ শুনিল না, সে বিনোদকে অনুসন্ধানে বাহির করিল। অনুসন্ধানে যখন মিলিল না, তখন হঠাৎ বিনোদের মনে হইল, যাহা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। মনপাখী সংসার-শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িতে চেষ্টা করিল। এদিকে সংসারে হই-চই পড়িয়া গেল।

অদৃষ্টবাদ ও কারণবাদ।

মনুষ্যের মন সাধারণতঃ বহির্বিষয় দ্বারা এরূপ সমাকৃষ্ট যে, যাহা কিছু নিগূঢ় অন্তর্জ্ঞানসাপেক্ষ তৎপ্রতি তাহার কদাচিৎ লক্ষ্য হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা সাধারণের অপেক্ষা সমধিক ধ্যানপরায়ণ বলিয়া জগতে বিখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যেও এ বিষয়ের ত্রুটির অসদ্ভাব নাই। যে সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি দ্বারা এই প্রকাণ্ড বিশ্বকাণ্ড অনাদিকাল হইতে অলঙ্ঘনীয়, চমৎকারজনক ও অচিন্তনীয় এক নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ভ্রমেও যাহার স্খলন নাই, সেই আশ্চর্য্য শক্তি কি, তাহার মূল কোথায়, সেই শক্তি কোন চৈতন্যসমুত্থিত কি এক অচেতন জড়-পদার্থ মাত্র, যখন স্থিরচিত্তে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা যায়, তখনও মানবমন আপনার আভ্যন্তরিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হয় কল্পনাপথে উড্ডীন হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য জগতে উপস্থিত হয়, না হয় আপনার শক্তির সীমা বুঝিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রথমোক্ত প্রণালী অবলম্বনে মনুষ্যজাতি নানাবিধ ভ্রমপূর্ণ উপধর্ম্মে উপনীত হইয়াছে, শেষোক্ত প্রণালী দ্বারা তাহার জ্ঞান ঘোর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে, উভয় পথেই অনুসন্ধিৎসা বিফল হইয়াছে। ফলতঃ যত দিন না আমরা আমাদিগের আভ্যন্তরিক শক্তির প্রকৃতি ও সীমানিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছি, তত দিন এই বিশ্ব ব্যাপারের মূলানুসন্ধানে কৃতকার্য্য হওয়া আমাদিগের সাধ্যাতীত কি সাধ্যায়ত্ত, তাহা স্থির করা কঠিন।

এরূপ অবস্থায় প্রচলিত ঈশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ এতদুভয়ের কোন মতেরই সমর্থন করা যায় না। তাহা যেমনই হউক, অগ্রে মনোজগতের নিয়ম নির্দ্ধারণ ও বহির্বিষয়ের সহিত তুলনায় তাহার প্রকৃত অবস্থা

কি, তাহা স্থির করায় সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা। ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টা প্রথমাবধি যদি এই পথে চালিত হইত, তাহা হইলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা না হওয়ায় মনস্তত্ত্বের এই দুর্ভেদ্য জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধে কোনরূপ মতের পৃষ্ঠপোষণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই; কেবল আমাদিগের জ্ঞান কি প্রণালীতে ব্যবহৃত হইলে আমাদিগের গভীরানুসন্ধানের সহায় হইতে পারে, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিছুকাল হইল, বঙ্গদর্শনের কোন এক সংখ্যায় "কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখক উত্থাপিত তর্কের সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া অন্য লেখককে তদ্বিষয়ে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমার এইরূপ মনে হইতেছে। তাঁহার অনুরোধ পালনে আমি সক্ষম কি না, জানি না, কিন্তু তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিলে যদি কিছু পরিষ্কার হয়, এ জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইবে।

লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ উভয়প্রকার মতের মূলই এক। আমরাও তাহাই স্বীকার করি। কিন্তু উক্ত মতদ্বয়ের প্রবর্ত্তনায় সমাজের যে কোনপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, আমরা লেখকের এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখি না। জ্ঞানের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত উক্ত মতদ্বয়ের অন্যতরের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু আমরা ইচ্ছা করি আর না করি, জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক দিন না এক দিন আমাদিগকে অবশ্যই কারণবাদের পক্ষপাতী হইতে হইবে। কার্য্যকারণের অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খল দেখিয়া কে কারণবাদের মতাবলম্বী না হইয়া থাকিতে পারে? আর সেই মতাবলম্বী হইলেই যে লোকে এক পক্ষে উদ্যমশীলতা ও অন্য পক্ষে অনুশোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া এককালীন যন্ত্রবৎ হইয়া উঠিবে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যে যে কার্য্য করে, তাহা স্বাধীন নহে; উহার কারণ ইচ্ছা, ইচ্ছার কারণ বাসনা; বাসনার কারণ একপক্ষে অন্তঃপ্রকৃতির উপর বহির্বিষয়ের প্রভাব, অন্য পক্ষে ঘটনাসমষ্টি-প্রসূত মানবস্বভাব। তাহা হইলে মানবীয় কার্য্যের নিদানস্বরূপ বহির্বিষয়ের প্রভাব সম্বলিত মানবস্বভাব এইটীই প্রাপ্ত হওয়া গেল। এখন দেখা আবশ্যক, এই বহির্বিষয়ই বা কি, আর মানবস্বভাবই বা কি। আমরা ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি যে, আমাদের স্বভাব অনেক পরিমাণে বাহ্য বস্তুর প্রভাব দ্বারা সংগঠিত হয়। কিন্তু তাহাই বলিয়া উহা যে একেবারেই সেই প্রভাবের অধীন, কখনই স্বাধীন নহে, অর্থাৎ ঐ প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া কখনও কোন কার্য্য করিতে পারে না, এমত বলা যায় না। বস্তুতঃ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি কখন কখন বহির্বিষয়ের প্রভাবকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ। তাহা না হইলে, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিতে হয়।

যখন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য প্রয়োজন ব্যতিরেকেও শুদ্ধ অন্তর্জ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করে, তখন বাহ্যপ্রকৃ-

তির উপর অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাব নাই, এ কথা আদৌ বলা যাইতে পারে না। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম এইপ্রকার অন্তর্জ্ঞান দ্বারাই সূচিত হয়। এ সংসারে আমরা যতপ্রকার কার্য্য করি, অথবা করিতে ইচ্ছা বা বাসনা করি, তাহার প্রায় সমস্তই হয় আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান, না হয় দুঃখনিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান উদ্দেশ্যেই সূচিত হইয়া থাকে। ইহা সকলেরই নিরাপত্তিতে স্বীকার্য্য যে, বিনা অভিসন্ধিতে কেহ কোন কার্য্য করে না। সেই অভিসন্ধি সকল অধিকাংশ স্থলেই উপরিউক্ত মত স্বার্থমূলক। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়া শিবিরে আনীত হইলে পিপাসায় মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিতে পাইয়াও, অন্য এক ব্যক্তি তাদৃশ অবস্থায় তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে দেখিয়া তিনি "আমা অপেক্ষা তোমার তৃষ্ণা অধিক" এই বলিয়া আনীত জলপাত্র তাহাকে দিয়া অবলীলাক্রমে তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার এই কার্য্য কোন্ স্বার্থমূলক অভিসন্ধিতে সিদ্ধ হইল বলিতে হইবে? কোন্ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া মুমূর্ষু আপন পানীয় পরিত্যাগ করিলেন? আমরা স্বীকার করি যে পুণ্যকার্য্য সম্পাদনে মনের যে বিমল সুখ, সেই সুখের জন্যই মনুষ্য অনেক সময়ে কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিবেন, ইহাও একপ্রকার স্বার্থ; কিন্তু বিষয়ভোগজনিত স্বার্থ, অর্থাৎ বহির্বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখিলে যে স্বার্থ সিদ্ধ হয় না, সে স্বার্থ হইতে এরূপ স্বার্থ কত বিভিন্ন! বিষয়ভোগজনিত স্বার্থ বাহ্য বস্তু লইয়া, কিন্তু এরূপ স্বার্থে বাহ্যবস্তুর কোন সংশ্রব নাই। সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ অন্তঃপ্রকৃতিজাত বলিতে হইবে। অতএব এরূপ কার্য্যকে স্বাধীন কার্য্য কেন না বলা যাইবে?

তবে এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই অন্তঃপ্রকৃতি কি? তাহাও কি বহিঃপ্রকৃতির একাংশ নহে? হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় না। বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অন্তঃপ্রকৃতির মূলে বহিঃপ্রকৃতি ও জড়জগৎ দৃষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বব্যাপারের এমনি চমৎকারজনক ব্যবস্থা যে, স্থূলদৃষ্টিতে যাহা পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া ভেদজ্ঞান জন্মে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আবার তাহাই অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়।

মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি যে শারীরিক প্রক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহা অধুনা বিজ্ঞান দ্বারা কতক কতক উপলব্ধ হইতেছে। বোধ হয়, বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতিসহ এ বিষয় আরও পরিস্ফুট হইয়া মানবদেহ ও মানবপ্রকৃতির অনেক গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সম্প্রতি মানসিক প্রক্রিয়া যে—অনেকাংশে শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা একপ্রকার পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে। মন এবং শরীরের মধ্যে পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ—এত নিকট যে, একের ব্যতিক্রমে তৎক্ষণাৎ অন্যেরও ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনের চিন্তা, স্মৃতি, আশা, বাসনা প্রভৃতি কার্য্য অনেক সময়ে দৈহিক কার্য্য বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে মন বলি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঐ সকল কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই কার্য্যের জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানেরই বা অর্থ কি? বহির্বিষয়ের জ্ঞান বলিতে আমরা

ইহাই বুঝি, বাহিরের বস্তুর অবস্থা ও ক্রিয়াদি ইন্দ্রিয় পথ দ্বারা আমাদের অন্তরে বিম্বিত হয়। কিন্তু অন্তরে বিম্বিত হইলেই যে আমরা তাহা বুঝিতে পারি, তাহা কোন্ শক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়? অবশ্য বলিতে হইবে যে, চৈতন্যই সেই শক্তি। এই শক্তি অথবা অবস্থার মূল কোথায়? তাহা মানব বুদ্ধির অতীত; সুতরাং এইখানেই আমাদের কথা শেষ হইতেছে। কিন্তু মূল যাহাই হউক, শারীরিক নিয়মানুসারেই যে উহা সিদ্ধ হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। শরীরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উহা বর্ত্তমান থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন আর একপ্রকার চৈতন্য—কিন্তু এই চৈতন্য আংশিক মাত্র, কেবল অন্তর্বিষয়েই সমাহিত, সুতরাং অসম্পূর্ণ। আন্তরিক ক্রিয়ায় কোন কোনটী উহা দ্বারা অনুভূত হয়—কল্পনা ইহার অবলম্বন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যই আমাদের সমুদায় জ্ঞানের মূল। চৈতন্য দৈহিকক্রিয়ার ফল কি না, তাহা এখনও জানিতে বাকী আছে। কিন্তু ফল হউক, না হউক, উহা যে শারীরিক এবং আন্তরিক অন্যান্য ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র বিষয়, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। কেন না, চৈতন্য স্বাধীন হওয়াতেই আমরা যখনই মনে করি আন্তরিক কার্য্য সকলের উপর দৃষ্টি, এবং যুক্তি নামক আর এক প্রকার মানসিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে প্রত্যেকের সমালোচনা করিতে পারি। আন্তরিক সমুদায় ক্রিয়ার উপরেই চৈতন্যের একাধিপত্য আছে। এই চৈতন্যের অধিপতি স্বরূপ আমরা আত্মার কল্পনা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এই চৈতন্য ব্যতীত আত্মা আর কিছুই নহে। 'আমি' এই জ্ঞানই আত্মা; চৈতন্যই সেই জ্ঞান।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহা প্রতীত হইতেছে যে, যদিও আমরা ইচ্ছা সৃজনে অসমর্থ, তথাপি কোন বিশেষ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হওয়া না হওয়া, ও তাহার উপর নির্ভর করিয়া মন ও শরীরকে কার্য্যে নিয়োজিত করা না করা, সম্পূর্ণরূপেই চৈতন্যের অধিকার। তবে কথা এই যে চৈতন্য অবস্থার নাম, শক্তির নাম নহে। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, চৈতন্যকেই আমরা শক্তিতে পরিণত করিতে পারি, এবং শিক্ষা, অভ্যাস ও তদুভয় জাত উৎকর্ষের বলে তাহাই করিয়া থাকি। দেহ ও মনের উপর যদি চৈতন্য অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব না থাকিবে, তবে জগতে আত্মশাসন, আত্মদমন প্রভৃতি কথার নামও থাকিত না। বস্তুতঃ আত্মশাসনের অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল আন্তরিক প্রক্রিয়ার উপর চৈতন্যের তত্ত্বাবধান ও আধিপত্য।

এক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যদিও আমরা চৈতন্যের মূল নিরূপণে অসমর্থ, তথাপি চৈতন্যই যে আমাদের অস্তিত্বের সার, এবং চৈতন্যের বলেই যে আমরা আত্মসংযম রক্ষা করিতে পারিয়া থাকি, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। সুতরাং যতক্ষণ আমাদের চৈতন্য আছে, ততক্ষণ আমরা আমাদিগের কৃতকার্য্যের জন্য অবশ্য দায়ী আছি। কার্য্যের ফল কে ভোগ করে? সেই চৈতন্য, যাহাকে আমরা আত্মা বলি। চৈতন্য না থাকিলে আমাদিগকে ফলভোগী হইতে হয় না; সুতরাং চৈতন্য না থাকিলে আমরা কোন কার্য্যের নিমিত্ত দায়ীও নহি। কেবল চৈতন্য থাকিলেই আমাদিগকে সকল কার্য্যের ফল গণনা করিতে ও অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে হয়।

মৃত্যুর পরে এই চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব কি না, তাহার মীমাংসা করা বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব, কিন্তু সেইরূপ অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াই যে পরলোক কল্পিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সে যাহা হউক, যাঁহারা মনে করেন যে পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে মনুষ্যের দায়ীত্ব বোধ থাকিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্ম-সাধন অসম্ভব হইয়া উঠে, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা দায়ী কাহার নিকট? অনেকেই বলিবেন, ঈশ্বরের নিকট। কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা মনুষ্যের অসাধ্য। এই জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী আছি, এ জ্ঞানেও কার্য্যগত কোন বিশেষ ফলোপলব্ধি হয় না। ঈশ্বর অথবা আদি শক্তি বা চৈতন্য সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান এক্ষণ যেরূপ অপরিস্ফুট, তাহাতে ঐ প্রকার দায়ীত্ববোধ মনুষ্যের কার্য্যের স্থির অভিসন্ধি হইতে পারে না। যতদিন না ঈশ্বর অথবা আদিশক্তিকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হয়, ততদিন এই রূপ দায়ীত্ব, দায়ীত্বই নহে। এই কথার সত্যতা প্রমাণ জন্য অধিক তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারেন যে, এই প্রকার দায়ীত্ববোধ সত্ত্বেও শত শত লোকে পাপ কার্য্যে নিবৃত্ত নহে। সমাজের চক্ষু হইতে দুষ্কৃতি ঢাকিয়া রাখিতে পারিলেই গোল মিটিল। তবে পরলোকের কথা, তাহাও ঐ প্রকারে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ইহলোকে পাপের প্রতিফল না পাইলেও পরলোকে পাইতে হইবে, এ বিশ্বাসেও পাপ নিবারিত হইবার নহে। সুতরাং সে দায়ীত্ববোধের ফল কি হইল?

কিন্তু যদি বুঝা যায় যে,—আমরা স্বকৃত কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগের আত্মার নিকট এবং বহির্জগতের নিকট দায়ী, তাহা হইলে আমাদিগকে সেই বোধ দ্বারা নিশ্চয়ই চালিত হইতে হইবে। আমরা কখনই তাহা উপেক্ষা করিতে পারিব না; কেন না আমাদিগকে প্রত্যক্ষ ফলভোগ করিতে হইবে। কারণবাদী ঈশ্বরের নিকট এরূপ উক্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে, হে ঈশ্বর, আমি যাহা করি, সে সকলই তোমার সৃষ্ট ও নিয়োজিত কারণ সমূহের ফল, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু জগতের নিকট ও আপনার নিকট তাহা পারেন না। তিনি পাপকার্য্য করিলে হয় তাঁহাকে তজ্জন্য আপনার নিকট, না হয় জগতের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইবেই হইবে, এবং তাঁহার চৈতন্যের ভাব বিবেচনায় হয় তাঁহাকে অন্তঃশাস্তি (অনুতাপ) না হয় বহিঃশাস্তি (মন্দফল) ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং ইচ্ছাধীন নহে বলিয়া তাঁহার পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

গত বর্ষ।

পৃথিবি!
কত দিন কত দণ্ড মাস পক্ষ বার,
ভ্রমি নিত্য অবিরত, বৎসর করিলে গত
আপনার কক্ষপূর্ণ করিলে তোমার!
কত শক্র অহরহ, কত গ্রহ উপগ্রহ
শক্রতা করিয়াছিল, সংখ্যা নাহি তার!
তুমি তাহা তৃণ জ্ঞানে, না চাহি পশ্চাত পানে,
চলিয়াছ আপনার পথে অনিবার!

নিত্য বুকে উল্কাপাত, নিত্য বুকে বজ্রাঘাত
পুড়েছে ভেঙ্গেছে বুক বটে শতবার,
তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি তোমার!

১

অনন্ত গগন শূন্য অবলম্বহীন,
আপনি আপনাপরি, নিত্য আবর্ত্তন করি
ভ্রমিয়া করিলে পূর্ণ সে পথ অসীম;
কেবলি—কেবলি হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায়
আপনি আপন বলে থাকিয়া স্বাধীন,
ভ্রমিলে গগন শূন্য অবলম্বহীন।

২

কালের অনন্ততম পাষাণের স্তর,
পড়ে'ছে প্রকৃতি রাজ্যে বিগত বৎসর!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হায়, ছাইয়াছে সমুদায়,
নাহিক একটু ছিদ্র—নাহি অবসর!
পৃথিবি, তোমারে ছাড়া, সৌরবিশ্বে কোটী তারা
এমনি মণ্ডিত গিরি কানন সাগর,
কত নদী কত হ্রদ, কত দেশ জনপদ,
কত সৌধ শিরশোভী সুন্দর নগর;
যাহা ক্ষুদ্র যাহা উচ্চ, যাহা নীচ যাহা তুচ্ছ,
যাহা কিছু ভাল মন্দ কুৎসিত সুন্দর,
জীবজন্তু প্রাণীভরা, হেন শত বসুন্ধরা,
ব্যাপিয়া অনন্ত নীল নভ কলেবর,—
প্রকাণ্ড প্রকৃতি রাজ্য মহান্ কবর!

৩

পড়ে'ছে প্রকৃতিরাজ্যে মহা আবরণ,—
সুখের সুবর্ণ হাসি, আনন্দের সুধারাশি,
জননী জায়ার অতি প্রিয় সম্ভাষণ,
বিধবার অশ্রুজল, সৈকত শ্মশান স্থল,
আকুল বিলাপে নৈশ করুণ ক্রন্দন!
দয়াময়ী তটিনীর, বুকের তরল নীর
শত চিতা প্রতিবিম্বে ভীষণ দাহন,
সমস্ত—সমস্ত হায়, একস্থানে সমুদায়,
একই সমাধিতলে করিয়া শয়ন,
প্রকাণ্ড প্রকৃতি রাজ্যে এক আচ্ছাদন!

৪

দূরে যাও মুক্তিকাম মহামূর্খ নর,
চাহি না শুনিতে তব যোগশাস্ত্র আর,
যাও ভীরু পৃষ্ঠভঙ্গ সংসার সমর,
ভূতপূর্ব্ব দেবভাগ্য স্মরিব আমার!
সরযূতে আত্মহত্যা হিমাদ্রি প্রস্থান,
ভুলি নাই তবকৃত মহা সর্ব্বনাশ,
অবিস্মৃত বঙ্গে চির দিবা অবসান,
তব কুমন্ত্রণা হায় করিয়ে বিশ্বাস!
যাও দূরে মহামূর্খ—শুনিব না আর,
ভূতপূর্ব্ব দেবভাগ্য স্মরিব আমার!

৫

জীবনের ওই এক বিন্দুমাত্র সুখ,
দয়া মায়া ভক্তি স্নেহ প্রীতি মমতায়,
এ জীবনে এজনমে ভরিল না বুক,
অপূর্ণ পরাণ পূর্ণ শুধু "হায় হায়!"
সোদরের প্রাণ পূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ,
শুষ্ক শত সাহারায় একবিন্দু জল,
মানবে দেবের দয়া ভোগে যে কেমন,
জানি না সে জননীর স্নেহ সুবিমল।
জায়ার যন্ত্রণাময় প্রেম জ্বালামুখী,
এ জীবনে এ জনমে করিল না সুখী!

৬

কেবল,
একবিন্দু সুখ ওই জীবনে আমার,
জীবনের লক্ষ্য ওই, ওই মোর আশা,
সময়ের ভূতবক্ষ করিয়ে বিদার
উত্তোলিয়ে ভোগবতী মিটাব পিপাসা!

ভারতের দগ্ধচিতা করিতে দর্শন
একান্ত যদ্যপি কেহ হয় হে কাতর,
দেখিতে সে কুরুক্ষেত্র রক্ত প্রস্রবণ,
অস্তগত অযোধ্যায় শেষ দিবাকর,
হৌক তবে চিত্তে তার মহা আচ্ছাদন
গতবর্ষ—পৃথিবীর শেষ সংক্রমণ!

৭

অন্তল্লার ভগ্নদুর্গ কমলমিয়র,
চিহ্নহীন চিতোরের দগ্ধচিতা স্থল,
আরাবল্লি পর্ব্বতের উন্নত শিখর,
সুপবিত্র কাগারের পুলিন শ্যামল!
পতিত প্রাণের ওই একই সান্ত্বনা,
স্মৃতির সহস্র কণ্ঠে গভীর চীৎকার,
মৃতপ্রাণে ঢালে কি যে ঘোর উদ্দীপনা,
ভূতপূর্ব্ব দেবভাগ্য জাগায় আমার!
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে বিগত বৎসর,
করিয়াছে উৎসাহিত চিত্ত নিরন্তর!

৮

কত যে সুশিক্ষা দিয়ে গিয়াছে আমায়,
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে পতিত জীবনে,
চৈত্রের তৃষিত চিত্ত মরু বালুকায়
স্থাপিয়া ক'রেছে ক্ষিপ্ত নীর অন্বেষণে!
জড়চিত্তে জন্মায়েছে চেতনা গভীর,
সম্মুখে ভবিষ্যসিন্ধু দেখায়ে আমার,
অতীতের উদ্দীপনা বদ্ধ ধমনীর
করিয়াছে প্রবাহিত শোণিত তাহার!
বুঝে'ছি জাতীয় স্বত্ব আত্ম অধিকার,
পুণ্যযোগ গত বর্ষ জীবনে আমার!

৯

পুণ্যযোগ গতবর্ষ আমার জীবনে,
আমি ভারতের পুত্র আর্য্য কুলাঙ্গার,
স্বদেশ স্বজাতিপ্রেম মৃত সঞ্জীবনে
এত দিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার!
জন্মিয়াছে ব্যথাবোধ জাতীয় পীড়নে,
পক্ষাঘাত বক্ষ আজ হতেছে স্পন্দিত,
আমূল স্নায়বযন্ত্র ঘোর বিকম্পনে
কি এক দৈবীয় বলে হ'তেছে কম্পিত!
জাতীয় শকতি প্রাণে হয়েছে সঞ্চার,
পুণ্যযোগ গতবর্ষ জীবনে আমার!

১০

পুণ্যযোগ গত বর্ষ জীবনে আমার,
জীবনের এক অংশ তব সঙ্গে হায়,
যদ্যপিও কালসিন্ধু অনন্ত অপার
গ্রাসিয়াছে, ক্ষতিবোধ করিনা তাহায়!
যে জাতীয় উদ্দীপনা জাতীয় সম্মান,
মহান্ জাতীয়স্বত্ব শিক্ষা দি'ছ তুমি,
ভুলিব না সেই আত্ম অধিকার জ্ঞান,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রিয় জন্মভূমি!
নহে যোগ্য পূর্ণপ্রাণ বিনিময় তার,
পূণ্যযোগ গতবর্ষ জীবনে আমার!

১১

পৃথিবি!
আমিও তোমার মত, জীবন করিব গত
ভ্রমিব সংসারশূন্য অবলম্বহীন,
তোমারি মতন হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায়
আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন!
বিপদেরে তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাত পানে,
সাধিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাঁচি যত দিন,
হৌক্ না সংসারশূন্য অবলম্বহীন?
করিয়াছে নবশক্তি হৃদয়ে সঞ্চার,
পুণ্যযোগ গত বর্ষ জীবনে আমার!

সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়।

এক্ষণে জনসমাজের পরিবর্ত্তনের অবস্থা। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে প্রাচীন কুসংস্কার স্থান পাইতেছে না। পিতৃপুরুষেরা আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এক্ষণে নব্যদল তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমের নূতন আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া চিরপূজিত তেত্রিশ-কোটী দেবতা তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

কেবল আমাদের দেশেই এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে, এমন নহে। সমগ্র সভ্য জগতেরই এই অবস্থা। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিসম্বাদ। যাহা এতকাল পরমারাধ্য দেবতা ছিল, জ্ঞানের উজ্জ্বল দণ্ডস্পর্শে, এখন তাহা মনুষ্য, জড় বা জড়ীয় শক্তিরূপে পরিণত হইতেছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র বা অভ্রান্ত মহাপুরুষের ভ্রান্তি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। প্রচলিত ধর্ম্ম সকল, ভ্রমপ্রমাদের সহিত জড়িত দেখিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধর্ম্মেরই উপর অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। সকল ধর্ম্মের ভিত্তিমূলস্বরূপ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি সত্যে অনেক বুদ্ধিমান্ লোক সংশয় প্রকাশ করিতেছেন।

ইংলণ্ডে কোন কোন প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি গ্রন্থাদিতে সংশয়বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত এক্ষণে ভারতবর্ষের যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহাতে ইংলণ্ডে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, ভারতবর্ষে তাহার প্রতিধ্বনি হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে যে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা প্রকাশ পাইতেছে, সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া তাহা নব্যদলে প্রবেশ করিতেছে।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, এদেশে এখন এমন লোক বিরল নহে। এ জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, কে বলিল? তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? পরমেশ্বরের সত্তার যে কোন প্রমাণ নাই, এ কথা যে কেবল সংশয়বাদীরাই বলেন, এমন নহে। অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তিও বলেন, "বিশ্বাস করি ভগবান্ আছেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই।" "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু; তর্কে বহুদূর।"

কিন্তু বাস্তবিক কি পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই? আমরা এরূপ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি।

কিন্তু সন্দেহবাদী বলিবেন, "জড়পরমাণুর সংযোগ বিয়োগে জগৎ সংগঠিত হইয়াছে, বলিলেই হয়। একজন জ্ঞানসম্পন্ন স্রষ্টা আছেন, ইহা বলিবার প্রয়োজন কি?"

এই পরমাশ্চর্য্য কৌশল পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কি অন্ধ জড়পরমাণু বা জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? কৌশলে জ্ঞান প্রকাশ পায়। বুদ্ধিশূন্য, চেতনাবিহীন জড়-পরমাণু কি এই দুরবগাহ্য কৌশলপরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে?

এ জগৎ কৌশলময় একটী অদ্ভুত যন্ত্র; সুতরাং কৌশলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার

জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল সকল ব্যাখ্যা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন যন্ত্রের প্রত্যেক অংশের সহিত যেমন প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ, সেইরূপ এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রেরও প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের যোগ রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, যে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের কিরণ সৃষ্টিকাল হইতে অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াও অদ্যাবধি পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই,—, তাহারও সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে। সমগ্রভাবে সমুদায় বিশ্বের বিষয় আলোচনা কর, অথবা ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব চিন্তা কর, যে ভাবে কেন দেখ না, ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র পরমাশ্চর্য্য কৌশল নিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়া থাকিবে *। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, সামান্য তৃণখণ্ড হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত, অদৃশ্যপ্রায় বালুকণা হইতে, অত্যুঙ্গ হিমাচল পর্য্যন্ত, সামান্য শিশিরবিন্দু হইতে সুবিশাল সমুদ্র পর্য্যন্ত, সমুদায় পৃথিবী এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। নিম্নে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী যে জ্ঞানময় পুরুষের মহিমা সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, ঊর্দ্ধে অনন্তলোকমণ্ডলে সেই পবিত্র সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি হইতেছে।

বিজ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অসংখ্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান প্রদর্শিত কৌশলরাশির আলোচনা ভিন্ন যে, এ বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় না, এমন নহে। সর্ব্বদা সহজে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে সকল পদার্থ ও ঘটনা উপস্থিত হয়, অভিনিবিষ্টচিত্তে সেই সকলের বিষয় আলোচনা করিলেই পরমেশ্বরের পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজন। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ"।

এই যে দেহ আমরা ধারণ করিতেছি, ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার! বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া অথবা সহজ বুদ্ধিতে, যেরূপেই হউক আলোচনা কর, মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ তোমার নিকট তাহার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবে। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তর (ডাক্তর বেলি) বলিয়াছিলেন, "আমি মনুষ্যদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, আমাদের জীবন এক অলৌকিক ব্যাপার। †

* তর্কশাস্ত্র ও কঠোর দর্শনের আলোচনা করিয়া অনেকের হৃদয় এমনি বিকৃত হইয়া যায় যে, এই অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয় আশ্চর্য্যরসে বিগলিত হয় না। মহাত্মা কার্লাইল এই প্রকার লোকের বিষয়ে বলিয়াছেন;—"The man who cannot wonder, who does not habitually wonder (and worship), were he president of innumerable Royal Societies and carried the whole *Mecanique Celeste* and *Hegel's Philosophy* and the epitome of all Laboratories and Observatories with their results, in his single head,—is but a Pair of Spectacles behind which there is no Eye. Let those that have Eyes look through him, then he may be useful."

† "I have examined the human frame through and through, and I see it is a miracle we live."

বর্ত্তমান সময়ের সন্দেহবাদীদিগের শিরোভূষণ জনষ্টুয়ার্টমিল বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তি যেমন অনেকস্থলে সামান্য, সেইরূপ আবার অন্যান্যস্থলে, বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল কৌশলসম্বন্ধে ইহার বল অত্যন্ত অধিক। ‡

বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার জ্ঞান প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্বদা সকলের নয়নপথে যে সকল প্রাকৃতিককার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে, অভিনিবিষ্টচিত্তে সে সকলের আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরমেশ্বরের দেদীপ্যমান জ্ঞানসঙ্কল্প হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। সহজ বুদ্ধিতে যাহা অনুভব করিতে পারি, বিজ্ঞান তাহা শতগুণে দৃঢ়ীকৃত করিয়া দেয়।

ভাব দেখি, কেমন করিয়া মাতৃগর্ভে জীবের সঞ্চার হয়। কেমন করিয়া সেখানে সে পরিপুষ্ট ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভূষিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়! ভাবিলে কি আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হও না? যে অদ্ভুত কৌশলে তুমি আমি এ সংসারে আসিয়াছি, তাহা কি অন্ধ জড়পরমাণুর কার্য্য?

ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়ন করিলে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হওয়া যায়, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কবিবার প্রয়োজন নাই। কেবল প্রসবসম্বন্ধীয় একটী বিষয় বলিব।

মনে কর একটী জঙ্গলময় সংকীর্ণ পথ দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে, পথের অবস্থা যেখানে যেমন, তোমার শরীরকেও সেখানে সেই ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। মনে কর, একস্থানে একটা বৃক্ষের শাখা নিম্নেরদিকে নত হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থানে তুমি কখনই মস্তক উচ্চ করিয়া গমন করিতে পারনা; অবনত মস্তকে যাইতে হইবে। মনে কর, আর একস্থানে দুই দিক্ হইতে বৃক্ষশাখা সকল পতিত হইয়া পথ এরূপ সংকীর্ণ করিয়াছে, যে সোজা চলিতে হইলে তোমার দুই স্কন্ধে বাধিবে। সেখানে তুমি কি করিবে? তোমার মুখ ও সমস্ত শরীর ফিরাইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিতে হইবে।

মাতৃগর্ভে প্রসবকালে অবিকল তাহাই ঘটে। প্রসব পথের যে স্থান যে প্রকারে সংগঠিত, মাতৃগর্ভস্থ অদৃশ্য শক্তি দ্বারাই শিশুশরীর সেখানে সেই ভাবে সংস্থিত হয়; নতুবা প্রসব কার্য্য অসম্ভব হইত। প্রসবপথে স্থানবিশেষে যখনই শিশুর স্কন্ধদ্বয় আটকাইয়া যায়, তখনই গর্ভস্থ শক্তি দ্বারা উহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন (rotation) হয়, এবং শিশু সহজে গম্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মাতৃগর্ভস্থ শক্তি যদি অন্ধ শক্তি হয়, তাহা হইলে উহা কেমন করিয়া জানিল যে, শিশুর পক্ষে প্রসূত হওয়া আবশ্যক? উহা কেমন করিয়া জানিতে পারে যে, প্রসব পথের স্থান বিশেষে শিশুর শরীর আটকাইয়া যায়? কেমন করিয়াই বা জানিতে পারে যে, শিশুর শরীরকে বিশেষ ভাবে সংস্থাপন করিলে উহা সহজে নির্গত হইতে পারিবে? ইহাই কি জ্ঞানচৈতন্যবিহীন অন্ধ শক্তির কার্য্য?

‡ "An argument which is in many cases slight, but in others and chiefly in the nice and intricate combinations of vegetable and animal life, is of considerable strength." Three Essays on Religion. J. S. Mill.

এক জ্ঞানময়ী শক্তি যে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের কারণ, একটী বিষয় আলোচনা করিলে তাহাতে আর লেশমাত্র সংশয়ের সম্ভাবনা থাকেনা। উপস্থিত অভাব জ্ঞাত হইয়া তাহার পূরণ করিলে, সে কার্য্যে আমরা বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু যখন কেহ ভাবী অভাবের বিষয় পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য উপযুক্ত আয়োজন করেন, তাঁহার কার্য্যে আমরা অনেক গুণে অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রকৃতির মধ্যে এই শেষোক্ত প্রকার কার্য্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ কুলায়স্থিত ডিম্বটীর বিষয় ভাব দেখি। ঐ ডিম্বের অভ্যন্তরে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, উহা কি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতেছে না? যাহাতে ভবিষ্যতে একটী পক্ষীশাবক উৎপন্ন হইতে পারে, উহার পরমাণুসকল কি এখন হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে না? তুমি একটী সুস্বাদ সুপক্ক আম্রফল পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলে। কিন্তু উহার সকল অংশ আহার কর, তোমার এমন সাধ্য নাই, ইচ্ছাও নাই। ফলের ভিতরে একটী আঁটি রহিয়াছে। উহা কেন? প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, উহা কেবল তোমার আমার জন্য, বর্ত্তমান বংশের জন্য কার্য্য করিতেছে না; ভাবীবংশীয়দের জন্যও কার্য্য করিতেছে। তুমি আমি আম্র ফল ভোজন করিয়া সুখী হই, প্রকৃতির অন্তর্ভূতা শক্তি কেবল ইহাই চাহে না। আমাদের পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি ভাবীবংশীয়েরা যাহাতে সুমিষ্ট রসাল সেবন করিয়া রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি পূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতেছে। ফলের যে অংশটুকু তুমি আহার করিলে উহা কেমন সুস্বাদু; কিন্তু আঁটিতে কোন স্বাদ নাই কেন? স্বাদ থাকিলে কি রক্ষা ছিল? নিশ্চয় সে শস্য ও বীজ সমুদয় একত্রে আহার করিয়া ফেলিতে। আবার দেখ, ঐ আঁটিটী এত কঠিন কেন? যদি উহা গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা কর, পারিবে না; বাল্মীকিবর্ণিত ত্রেতাযুগের ব্যাপার সংঘটিত হইবে। যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা কেবল তোমার আমার জন্য ভাবেনা; আমাদের ভাবী বংশধরেরা যাহাতে সুস্বাদু ফল ভোজন করিতে পায়, তাহারও আয়োজন করে।

এইস্থলে আনুষঙ্গিকরূপে আর একটী কথা বলি। কোন ব্যক্তি তোমাকে একটী পাত্রে করিয়া মিষ্টান্ন আহার করিতে দিল। তুমি মিষ্টান্নগুলি সব খাইয়া ফেলিলে। কিন্তু কিছু কাল পরে দেখ যে, কেহ রাখিয়া যায় নাই, অথচ পাত্রটী মিষ্টান্নে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে গুলিও তুমি আহার করিলে। কিছুকাল পরে আবার দেখ, পাত্রটি মিষ্টান্নপূর্ণ হইয়াছে। তুমি সে গুলিও নিঃশেষ করিলে। এইরূপে মহাদেবের ঝুলির গল্পের ন্যায়, যত খাও, ততই আবার মিষ্টান্ন। যে শিল্পকর এমন আশ্চর্য্য পাত্র সৃষ্টি করিতে পারে, তুমি তাহার প্রশংসা কর না? এ প্রকার পাত্র নির্ম্মাণে কি জ্ঞানকৌশল প্রকাশ পায় না?

তবে ভাবদেখি, এ জগতে সর্ব্বদাই কি হইতেছে! ধরণীরূপ সুবিস্তৃত পাত্রে আম, যাম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল সকল সাজাইয়া জীবদিগের সম্মুখে কে ধরিয়া দিল? সকল জীব পরমানন্দে আহার

করিল; সব ফল ফুরাইয়া গেল, পাত্রে আর কিছু রহিল না। কিন্তু কিছু কাল পরে আম, যাম, কাঁঠাল প্রভৃতি অশেষ প্রকার সুস্বাদু ফলে কে আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল? আবার জীবগণ আহার করিল, আবার পাত্র পূর্ণ হইল। এই যে ধরিত্রীপাত্র অচিন্তনীয় কাল হইতে অসংখ্য জীবশ্রেণীকে অগণ্য বংশ পরম্পরায় আহার দান করিতেছে, ইহাতে কি এক অদ্ভুত জ্ঞান কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হওনা! মহাদেবের ঝুলি গল্প নয়; মহাদেবের ঝুলি চিরদিন আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান।

যে আশ্চর্য্য কৌশলে সমুদয় প্রাণী আহার লাভ করিতেছে, চিন্তা করিলে যথার্থই হৃদয় বিগলিত হয়। গ্রীষ্মকালে এক দিবস বলিলাম, "আজ বড় গরম;" এক-জন ভদ্র মহিলা বলিলেন, "ইহা রান্না-ঘরের গরম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথার অর্থ কি? তিনি বলিলেন "জগতের মাতা তাঁহার সন্তানদিগের জন্য রন্ধন করিতেছেন। এই গরমে আম, যাম, কাঁঠাল প্রভৃতি পাকিয়া উঠিবে।"

ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবিষয়ে আর একটী কথা। যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন তো চলিবার প্রয়োজন ছিলনা, তবে সেখানে এই চরণ-যুগল উৎপন্ন হইল কেন? সেখানে তো কিছু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিলনা, তবে এই হস্তদ্বয় হইল কেন? সেখানে দর্শনের প্রয়োজন ছিলনা, তবে সেই নিবিড় অন্ধকারে নয়নদ্বয় সৃষ্ট হইল কেন? সেখানে তো শ্রবণের আবশ্যক ছিলনা, তবে কর্ণের উৎপত্তি হইল কেন? সেখানে তো আস্বাদনের প্রয়োজন ছিলনা, তবে সেখানে রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল কেন? আঘ্রাণের প্রয়োজন ছিলনা, তবে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল কেন?

তোমার পুত্র দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিতে যাইবে। তাহার ইচ্ছা যে শান্তিপুরে ফিন্-ফিনে ধুতি ও ঢাকাই চাদর পরিধান করিয়া সেখানে যায়। তুমি জান যে, সেরূপ পরিচ্ছদে গমন করিলে সে শীতে মারা যাইবে। তুমি তাহাকে উত্তম গরম পোষাক দিয়া দার্জ্জিলিং প্রেরণ করিলে। এস্থলে কয়েকটী বিষয়ে তোমার জ্ঞানপ্রকাশ পাইতেছে। প্রথম, তুমি জান যে দার্জ্জিলিং কি প্রকার স্থান। দ্বিতীয়তঃ তুমি জান যে, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া সেখানে গমন করিলে ক্লেশ পাইতে হয়। তৃতীয়তঃ তুমি জান যে, বনাত প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া গমন করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এই কয়েক বিষয়ে জ্ঞান ভিন্ন তুমি কখনই তোমার পুত্রকে উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত করিয়া দার্জ্জিলিং পাঠাইতে পার না।

যে শক্তি শিশুকে মাতৃগর্ভ হইতে সংসারে প্রেরণ করে, তাহা কি অন্ধশক্তি? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া পূর্ব্বহইতে জানিল যে, শিশু কয়েকমাস পরে এমন একস্থানে যাইবে, যেখানে তাহার দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া জানিল যে, সংসারে গিয়া সেই জরায়ুশায়ী শিশুর কি কি প্রয়োজন উপস্থিত হইবে? অন্ধশক্তি কেমন করিয়া জানিল যে, কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে, কি প্রকার যন্ত্রসকলের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে সে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গিয়া স্বচ্ছন্দে আপনার জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে? অন্ধশক্তির ভাবীজ্ঞান কেমন

করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? মাতৃগর্ভস্থ শক্তির অবশ্য এ জ্ঞান আছে যে, শিশু কয়েকমাস পরে স্থানান্তরে গমন করিবে। সেই স্থানের অবস্থা কি প্রকার, সেখানে গমন করিলে গর্ভস্থ জীবের কি কি প্রয়োজন ও অভাব হইবে, কি কি উপকরণ ও যন্ত্র থাকিলে সেই সকল অভাব মোচন হইতে পারে, এই সমুদয় বিষয়ে, অবশ্য, গর্ভস্থ শক্তির জ্ঞান আছে। কে বলে অন্ধশক্তি? জ্ঞানময়ী মঙ্গলময়ী আদ্যাশক্তি, মাতৃগর্ভে জীবের প্রকৃত জননীরূপে বর্ত্তমান। যিনি বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী, তিনিই প্রত্যেক জীবের "প্রসবকালে ধাত্রী"।

এই বিষয়টী যতই চিন্তা করা যায়, ততই অতি অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। ভাবী-জ্ঞানের পরিচয় পদে পদে। মাতৃগর্ভেই চক্ষুর উপর পাতাটী সৃষ্টি হইল কেন? পাতার উপরে পক্ষ্মগুলি বিন্যস্ত হইল কেন? গর্ভস্থ শিশুর চরণাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় শরীর ভাবীজ্ঞানের অখণ্ডনীয় দৃষ্টান্ত। আবার দেখ, শিশু সংসারে আসিয়া তো কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে পারিবে না; পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য উপযুক্ত আহার প্রস্তুত হইল। মাতৃদেহের শোণিত, দুগ্ধরূপে পরিণত হইল। * ইহা কি অন্ধশক্তির কার্য্য? যে শক্তি বলিল, "সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ সকল! আকাশমণ্ডলে ভ্রাম্যমান হও;" অমনি সকলে অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে ধাবমান হইল! যে শক্তি বলিল, "সৌরজগৎ সকল! স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হও," অমনি কোটী কোটী সৌরজগৎ আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় অনন্ত আকাশে দৌড়িতে লাগিল! যে শক্তি জড়-পরমাণু সকলকে বলিল "অগণ্য অসংখ্য বৃক্ষ লতারূপে পরিণত হও" তাহারা বৃক্ষ লতারূপ ধারণ করিল! যে শক্তি প্রতিনিয়ত গর্ভস্থ শোণিতকে বলিতেছ, "জীবরূপে পরিণত হও" আজ্ঞামাত্র কোটী কোটী জীব উৎপন্ন হইতেছে! সেই শক্তি মাতৃস্তন-নিহিত রক্তকে বলিল "আমার সন্তান সংসারে আসিয়া আহার করিবে, শোণিত! তুমি দুগ্ধ হও" অমনি শোণিত দুগ্ধ হইল! "শোণিত! তুমি বাল্মীকি হও, কালিদাস হও, ভবভূতি হও, আর্য্যভট্ট হও, বেকন হও, নিউটন হও, সেক্সপিয়র হও, মিল্টন হও;" শোণিত বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, আর্য্যভট্ট, বেকন, নিউটন হইল। যে শক্তি রক্তবিন্দু হইতে কালিদাস, সেক্সপিয়র, বেকন, নিউটন উৎপন্ন করিতে পারে, সেই শক্তি রক্তস্থানে দুগ্ধ সঞ্চার করিবে, বিচিত্র কি? একমুষ্টি ধূলি হস্তে লইয়া একজন বাজিওয়ালা বলিল, "একটা পক্ষী হও," অমনি ধূলিমুষ্টি পক্ষী হইল। ইহা দেখিলে কি আশ্চর্য্য হও না? তবে যে শক্তির আজ্ঞামাত্রে রক্তবিন্দু হইতে কালিদাস, ও সেক্সপিয়র, আর্য্যভট্ট ও বেকন উৎপন্ন হয়, সে কেমন আশ্চর্য্য জ্ঞানময়ী শক্তি!

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টির কার্য্য চলিতে থাকে। ঐ দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলি বাহির হইতেছে কেন? ও এখন দুগ্ধপান করে, উহার দন্তের

* রাসায়নিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানব দেহ রক্ষা ও পোষণের জন্য যে যে পদার্থ আবশ্যক, কেবলমাত্র দুগ্ধে সেই সকল গুলিই আছে। দুগ্ধের ন্যায় এ প্রকার আর দ্বিতীয় সামগ্রী নাই। কেবল দুগ্ধপান করিয়া মনুষ্য যাবজ্জীবন সুস্থ শরীরে অতিবাহিত করিতে পারে। এরূপ কেন হইল? ক্ষুদ্র শিশু তো দুগ্ধভিন্ন আর কিছু খাইতে পারে না।

প্রয়োজন কি? সে কথা বলিলে চলিবে কেন? আর কিছু দিন পরেই কঠিন দ্রব্য আহার করিবে। এখন তাহার আয়োজন হইতেছে। সম্মুখে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, উহাতে খাদ্যদ্রব্য কর্ত্তিত হইবে। দুই পার্শ্বে যাঁতা বসান হইতেছে; উহাতে খাদ্য পেষিত হইবে। পেষিত হইবার পর, যে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ খাদ্যের অসার অংশ নিষ্কাসিত করিয়া উহার সার অংশদ্বারা দেহের অভাবপূরণ ও পুষ্টিসাধন হইবে, তাহা জন্মের পূর্ব্বহইতেই শিশুর শরীরাভ্যন্তরে নির্ম্মিত রহিয়াছে! ইহাই কি অন্ধশক্তির কার্য্য?

যাঁহারা সৃষ্টিকৌশল হইতে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান, সন্দেহবাদীদিগের একটী আপত্তি তাঁহাদের খণ্ডন করা আবশ্যক। স্বর্গ মর্ত্য ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টিকৌশলের রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কেন সংগ্রহ কর না, প্রখরবুদ্ধি সন্দেহবাদী তাহাতে ভুলিবার লোক নহেন।

সন্দেহবাদী বলিবেন যে, প্রকৃতির মধ্যে "কৌশল দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ যে, উহা অবশ্য কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সৃষ্টি। তুমি সর্ব্বদা দেখিতে পাও যে, মানুষ আপনার জ্ঞানবলে অনেক প্রকার কল কৌশল উৎপন্ন করে; সেইজন্য তুমি মনে কর যে, প্রকৃতির ভিতরে যে সকল কল কৌশল রহিয়াছে, তাহাও অবশ্য কোন জ্ঞানবান পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিসম্বন্ধে তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছ, উহা কেবল মানুষের তুলনায়। তুমি দেখিতে পাও যে, মানুষ আপনার জ্ঞানবলে অনেক প্রকার কৌশল উৎপন্ন করে। প্রকৃতির মধ্যেও কতক পরিমাণে তদনুরূপ কৌশল দেখিতে পাও, কিন্তু তাহার কারণ দেখিতে পাও না। তুমি দেখিয়াছ যে, মানুষ যে সকল কৌশল সৃষ্টি করে, তাহার কারণ মানুষের জ্ঞান; সুতরাং তুমি মনে কর যে, প্রকৃতির অন্তর্গত কৌশল সকলও কোন প্রকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

সন্দেহবাদী বা নাস্তিকদিগের মতে এপ্রকার যুক্তি কেবল উপমিতি মাত্র। ইহাতে নিশ্চিতরূপে কিছুই প্রমাণ হয় না। মানুষের জ্ঞান হইতে কল কৌশল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। হঠাৎ কোন নির্জ্জন স্থানে একটা ঘড়ি দেখিয়া মনে করি যে, উহা অবশ্য কোন মানুষের বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন; কেন না মনুষ্যবুদ্ধি হইতে যে ঘড়ি উৎপন্ন হয়, ইহা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু কোন ব্যক্তির বুদ্ধি বা জ্ঞান হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, ইহা তো কখন দেখিনাই। সুতরাং মানুষের দৃষ্টান্তে প্রাকৃতিক কৌশলের জ্ঞানময় কারণ সিদ্ধান্ত করা কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি হইতে যে কল কৌশল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা কি বাস্তবিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ? আমার নিজের যে টুকু জ্ঞান আছে, তাহা অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুভব করি। কিন্তু অপর মনুষ্যের জ্ঞান কি কখন দেখিয়াছি? দেখার অর্থ যদি চক্ষে দেখা হয়, তাহা হইলে কাহারও জ্ঞান, মন বা বুদ্ধি কখনও দেখি নাই। অপর মনুষ্যের কি দেখিতে পাই? তাহাদের শরীর ও শারীরিক কার্য্য। মন কিম্বা মানসিক কার্য্য, কখন কাহারও দেখি নাই।

তবে অন্য মানুষের যে মন আছে, কে বলিল? তাহাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি যে আছে, স্বীকার করি;

কেন না তাহা দেখিতে পাই। অন্য লোকের মন তো কখন দেখি নাই; তবে মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব কেন? তাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাব কিছুই কখন দেখি নাই। যদি "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ" হয়, তবে অন্য লোকের যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি আছে, এ জ্ঞান তো কখন সে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে নাই।

মানুষ অর্থ কি? হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কি মানুষ? মানুষ বলিলে যে কেবল অস্থি মাংস বুঝায়, ইহা কখন হইতে পারে না। মানুষ বলিলে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা, ঘৃণা, লজ্জা এই সকল মনে হয়। এক কথায় মন বা আত্মা যাহাই বল, মানুষ শব্দের অর্থ যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমি আপনি ভিন্ন অন্য মানুষকে কখন দেখি নাই। আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি কাহাকেও কখন দেখি নাই। প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী, জগদ্বাসী কাহাকেও কখন দেখি নাই। দেখা অর্থ যদি চক্ষের দেখা হয়, তাহা হইলে কোন মানুষ কখন কোন মানুষকে দেখে নাই।

তবে যাহাদিগকে মানুষ বলি, তাহাদিগের যে শরীর ভিন্ন আবার একটী একটী মন আছে, ইহা বিশ্বাস করি কেন? কার্য্য দেখিয়া। মৃত শরীরকে মানুষ বলি না, কেন না তাহাতে মনের কার্য্য দেখিতে পাই না। সকল স্থলেই কার্য্য দেখিয়া মন বা জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। সে কার্য্য কি? কৌশল। বাহ্যপদার্থের সংযোগ বিয়োগ, ভাষা বা অঙ্গ ভঙ্গি যে প্রকারেই হউক, কৌশল প্রকাশ পায় বলিয়াই মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। যেখানে যে পরিমাণে কৌশল, সেখানে সেই পরিমাণ বুদ্ধির সত্তা সিদ্ধান্ত করি। বুদ্ধির বাহ্যচিহ্নদ্বারা বুদ্ধির সত্তা প্রতিপন্ন হয়। মৃত শরীরে কোন চিহ্ন দেখিনা, সুতরাং সেখানে বুদ্ধির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কোন মনুষ্যের বুদ্ধির কার্য্য অল্প দেখিলে, তাহাকে অল্পবুদ্ধি বা নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করি। সচরাচর লোকের যে প্রকার বুদ্ধির কার্য্য হইয়া থাকে, কাহারও সেই প্রকার কার্য্য দেখিলে, তাহার বুদ্ধি মধ্যম শ্রেণীর বলিয়া স্থির করি। আবার যাঁহার কার্য্য অসাধারণ, যিনি আপনার বাক্যে ও কার্য্যে জ্ঞানের অসামান্য চিহ্ন সকল প্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রতিভাশালী লোক বলিয়া গণ্য করি।

এখন একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, যদি কৌশলের পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বরং বলিব যে মানুষের কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু এই পরমাশ্চর্য্য কৌশলজালজড়িত ব্রহ্মাণ্ডে যে কোন জ্ঞান কার্য্য করিতেছে না, ইহা যে কেবল অন্ধশক্তির ক্রীড়া মাত্র, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না।

এমন আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্যক্তি কোন প্রকার জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও আশ্চর্য্য! যদি কোন বুদ্ধিগর্ব্বিত নাস্তিক আমার নিকট বলেন যে, "এই জগৎ যে কোন প্রকার জ্ঞানময় শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বলিব," বলুন দেখি আপনার যে বুদ্ধি আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? যদি এই দুরবগাহ্য কৌশল-

পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কোন প্রকার জ্ঞানের চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে আপনার যে জ্ঞান আছে, আপনি যে অস্থি চর্ম্ম নির্ম্মিত একটী পুত্তলিকা নহেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?" কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, অন্য মনুষ্যের যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি আছে, ইহা কেবল শারীরিক সাদৃশ্যে বুঝিতে পারি। আমার যেমন শরীর ও শারীরিক কার্য্য আছে, অন্যেরও সেইরূপ শরীর ও শারীরিক কার্য্য দেখিতেছি; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আমার ন্যায় তাহার মন ও মানসিক কার্য্য আছে। অর্দ্ধেক মিলিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, অপরার্দ্ধও অবশ্য মিলিবে।

ইহাই কি সুযুক্তি হইল? সংসারে আমরা সর্ব্বদা কি দেখিতে পাই? বার আনা মিলে, সিকি মিলে না; আট আনা মিলে, আট আনা মিলে না; সিকি মিলে, বার আনা মিলে না। যখন এইরূপ আংশিক ঐক্য ও অনৈক্য কেবল দুই একটী স্থলে নয়, কোটী কোটী স্থলে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, যখন শরীর ও শারীরিক কার্য্য মিলিতেছে, তখন অপরার্দ্ধ মন ও মানসিক কার্য্যও অবশ্য মিলিবে। ইহাই কি সুযুক্তি-সঙ্গত বাক্য হইল?

এস্থলে আর একটী যুক্তির বিষয় আলোচনা করিব। আমার জ্ঞান আছে, ইহা সহজ জ্ঞানে জানিতেছি; আমার জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যখন অন্য মানুষের সেইরূপ কার্য্য দেখি, তখন সিদ্ধান্ত করি যে, তাহার কার্য্য যখন আমার কার্য্যের অনুরূপ, তখন সেই কার্য্যের কারণও অবশ্য আমার কার্য্যের কারণের তুল্য। অর্থাৎ আমার ন্যায় তাহারও মন বা জ্ঞান আছে।

এই যুক্তিতে দুটী গুরুতর ভ্রম রহিয়াছে। প্রথম, কার্য্য এক প্রকার হইলে যে সকলস্থলে কারণও এক প্রকার হয়, এমন নহে। কার্য্য এক, কিন্তু কারণ ভিন্ন, জগতে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। পাঁচজনের জ্বর হইল; কাহারও রাত্রি জাগরণে, কাহারও অভিভোজনে, কাহারও অতিরিক্ত পরিশ্রমে, কাহারও ম্যালেরিয়া স্থানে বাস করিয়া, এবং কাহারও বা বৃষ্টিতে ভিজিয়া। পাঁচশত লোকের মৃত্যু হইল। পাঁচশত লোকের পাঁচশত প্রকার কারণে মৃত্যু হইতে পারে। আবার বিপরীত কারণ হইতে সমান কার্য্য উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত উত্তাপ ও অত্যন্ত হিমের এক প্রকার কার্য্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিপ্রসূত কার্য্যের সহিত, অপরের কার্য্যের সাদৃশ্য দেখিয়া কখনও সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, এই শেষোক্ত প্রকার কার্য্যের কারণ বুদ্ধি।

এ যুক্তিতে আর একটী ভুল এই যে, একটী মাত্র স্থল হইতে বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হইতেছে। সে একটী মাত্র স্থল আমি নিজে। আমার পক্ষে যাহা সত্য, সমগ্র জগতের পক্ষে তাহা সত্য, ইহা তর্কশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা। একটী বোম্বাই আম্র আহার করিয়া যদি মনে কর যে, আম্র ফল মাত্রই সেইরূপ সুমিষ্ট, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার ভুল হইল। কলিকাতার কমলালেবুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তুমি মনে করিতে পার যে, কমলালেবু মাত্রই অম্লরসযুক্ত; কিন্তু শ্রীহট্টের কমলা সেবন করিলে নিশ্চ-

য়ই তোমার ভ্রম দূর হইবে। আমার কার্য্যের কারণ আমার মন, সুতরাং যেখানে সেই প্রকার কার্য্য, সেখানেই কারণ স্বরূপ মন বর্ত্তমান, এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই তর্কশাস্ত্র বিরুদ্ধ। কেন না ইহাতে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বিশ্বজনীন মীমাংসায় উপনীত হইতেছি।

বাস্তবিক কথা এই যে, আমার যেমন মন আছে, অপরেরও সেইরূপ মন আছে, তর্ক করিয়া ইহা মীমাংসা করা অসম্ভব। তর্কশাস্ত্র এখানে পরাভব স্বীকার করিতেছে।

প্রাকৃতিক কৌশল সকল যে, কোন জ্ঞানময় কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তর্কশাস্ত্রের প্রণালী অনুসারে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করা যায় কি না? জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, যায় না। কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলেন যে, যদিও নিশ্চয় হয় না, কিন্তু বিলক্ষণ সম্ভবপর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

"In the present state of our knowledge, the adaptations in nature afford a large balance of Probability, in favour of creation by intelligence." Three Essays on Religion. By J. S. Mill.

তর্কশাস্ত্র প্রাকৃতিক কৌশল নিচয়ের জ্ঞানময় কারণ নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে অক্ষম। আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, প্রতিবাসীগণের যে মন আছে, তাঁহারা যে এক একটী অস্থি মাংসময় কল নহেন, তর্কশাস্ত্র তাহা কি সাব্যস্ত করিয়া দিতে পারে? কখনই না। কি জড়জগৎ, কি মনুষ্য, উভয় সম্বন্ধেই তর্কশাস্ত্র কতকদূর গিয়া আর যাইতে পারে না। এখানেও সম্ভবপর, ওখানেও সম্ভবপর। তর্ক এই উভয়ের মধ্যে কোন স্থানেই নিশ্চয়তাতে উপনীত করিতে পারে না।

কিন্তু তর্কে প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া কি যথার্থই মনে করিতে হইবে যে, আমি ভিন্ন অপর মনুষ্যের, আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলের যে মন আছে, ইহা সম্ভবপর মাত্র? ইহাতো হাস্যের কথা। আমরা এমনি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে, কি মনুষ্যের মধ্যে, কি জড়ের মধ্যে, যেখানে দেখিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিব। এখানে তর্কশাস্ত্রের কোন হাত নাই। স্বভাব এই বিশ্বাস আমাদের মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু স্বভাবের ঠিক্ প্রণালী কি, তাহা হয় তো এখনও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

এস্থলে নাস্তিক বলিবেন যে, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে চলিবে কেন? প্রকৃতির ভিতরে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধিজন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সত্য; কিন্তু কে বলিল যে, প্রাকৃতিক কার্য্যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে? কে বলিল, দেখিবার জন্য চক্ষু হইয়াছে, শুনিবার জন্য কর্ণ হইয়াছে, আস্বাদনের জন্য রসনা হইয়াছে? কে বলিল, জীবগণ আহার করিবে বলিয়া বৃক্ষে সুস্বাদু ফল ফলিতেছে? কে বলিল, জীবগণ আহার করিবে বলিয়া শরীরে ক্ষুধার সঞ্চার হইতেছে? যদি বল, কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে উদ্দেশ্যসিদ্ধি জন্য উপায় অবলম্বিত

হইতেছে, এ কথা বলিবার আবশ্যক কি? সকলেই আপনা আপনি হইয়াছে; উপায় উদ্দেশ্য কিছুই নাই। তুমি তোমার মনের ভাব অনুসারে একটাকে উদ্দেশ্য ও আর একটাকে উপায় ভাবিতেছ। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি; একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু দেখিবার জন্য চক্ষু হইয়াছে, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি? আম্র ফল আহার করি, সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু আহার করিবার জন্য আম্রের উৎপত্তি, ইহা বলিবার আবশ্যক কি?

স্থলপথে ভ্রমণের জন্য শকট হইয়াছে; নদী দিয়া যাইবার জন্য নৌকা হইয়াছে, সমুদ্র পার হইবার জন্য জাহাজ হইয়াছে, শীঘ্র গমনের জন্য রেলের গাড়ী হইয়াছে, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি? সময় জানিবার জন্য ঘড়ি হইরাছে, সংবাদ পাইবার জন্য তাড়িতবার্ত্তাবহ হইয়াছে, বাস করিবার জন্য গৃহ হইয়াছে, লিখিবার জন্য কাগজ হইয়াছে, এমন কথা বল কেন? শকট ও নৌকাদিতে আরোহণ করি, ঘড়িতে সময় জানি, টেলিগ্রাফের তারে সংবাদ পাই, গৃহে বাস করি, কাগজে লিখি। এসকল কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আরোহণ করিবার জন্য শকট ও নৌকার উৎপত্তি, সময় জানিবার জন্য ঘড়ির সৃষ্টি, সংবাদ জানিবার জন্য টেলিগ্রাফের তার, বাস করিবার জন্য গৃহ, লিখিবার জন্য কাগজ, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

মানুষের কার্য্যে যেমন স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, প্রকৃতির কার্য্যেও সেইরূপ স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। ঘটিকাযন্ত্রে কি অভিপ্রায় প্রকাশ পায়? সময় জানা। মানব দেহে যে পাক যন্ত্র রহিয়াছে, উহাতে কি অভিপ্রায় প্রকাশ পায়? খাদ্য পরিপাক করা। একটী মানুষের যন্ত্র, আর একটী প্রকৃতির যন্ত্র। এই উভয়স্থলেই কি সমান স্পষ্টরূপে অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে না?

কিন্তু অভিপ্রায় কি কখন চক্ষে দেখা যায়? অভিপ্রায় জড়ের ধর্ম্ম নহে; মন বা জ্ঞানের ধর্ম্ম। অভিপ্রায় ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ। জড় জগতে কি মনুষ্যের মধ্যে উভয়স্থলেই কার্য্য দেখিয়া অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করি; চক্ষু কর্ণাদিদ্বারা কোনস্থলেই অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এখানেও কার্য্য দেখিয়া কারণ, ওখানেও কার্য্য দেখিয়া কারণ। এখানেও কার্য্য দেখি, ওখানেও কার্য্য দেখি, কিন্তু কারণ উভয় স্থলেই অদৃশ্য।

এখন দেখুন, আমরা কোথায় উপনীত হইলাম। যে প্রণালীতে জানি যে, আমি ভিন্ন অপর মনুষ্য আছে, সেই প্রণালীতে জানিবে, এই জগতের একজন জ্ঞানময় স্রষ্টা আছেন। যে প্রণালীতে জানি যে, আমার পার্থিব পিতা আছেন, সেই প্রণালীতে জানি যে, আমার স্বর্গীয় পিতা আছেন। যে প্রণালীতে জানি যে, আমার গর্ভধারিণী মাতা আছেন, সেই প্রণালীতে জানি যে, জগতের মাতা জগদ্ধাত্রী আছেন। যে প্রণালীতে সংসারের বন্ধুকে জানি, সেই প্রণালীতেই সংসারাতীত পরম বন্ধুকে জানিতে পারি।

তবে কি কোন বিষয়ে ভিন্নতা নাই? আছে। মানুষের শরীর আছে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার শরীর নাই। মানুষের শরীর আছে বলিয়াই কি আমরা তাহার কার্য্যের অভি-

প্রায়ে বিশ্বাস করি? কখনই না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উহাতে দুটী ভ্রম হয়। প্রথমতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, কার্য্য এক প্রকার হইলে কারণও এক প্রকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ একটীমাত্র স্থল হইতে সার্ব্বভৌমিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যে শক্তি প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা অশরীরী বলিয়া কোন কোন অনীশ্বরবাদী তাহাকে জ্ঞানময়ী বলিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, যেখানে শরীর দেখিয়াছি, সেখানেই জ্ঞানের সত্তা অনুভব করিয়াছি; মস্তিষ্কের সহিত জ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ। সুতরাং যখন প্রকৃতি-গত শক্তির শরীর নাই, তখন তাহাকে জ্ঞানময়ী শক্তি বলা কখনও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

জ্ঞানী মার্টিনো এই কথার উত্তরে বলিয়াছেন;—"I say, first of all, that this demand for a divine brain and nerves and arteries comes strangely from those who reproach the Theist with a "anthropomorphism." Inorder to believe in God, they must be assured that the plates in "Quain's Anatomy" truly represent him. If it be a disgrace to religion, to take the human as measure of the Divine, what place in the scale of honour can we assign to this stipulation? Next I ask my questioner, whether he suspends belief in his friends' mental powers, till he has made sure of the contents of their crania? And whether, in the case of ages beyond reach, there are other adequate vestiges of intellectual and moral life, in which he places a ready trust? *Immediate* knowledge of mind other than his own he can never have: its existence in other cases is gathered from the signs of its activity; whether in personal lineaments or in products stamped with thought: and to stop this process of inference with the discovery of *human* beings, is altogether arbitrary, till it is shown that the grounds for extending it are inadequate. Further, I would submit that, in dealing with the problem of the Universal Mind, this demand for organic centralization is strangely inappropriate. It is when mental power has to be localized, bounded, lent out to individual natures and assigned to a scene of definite relations, that a focus must be found for it and a molecular structure with determinate periphery be built for its lodgment."

Religion as affected by modern materialism. P. 66-67

মার্টিনোর কথার সারমর্ম্ম এই যে, মানুষ আপনার মনকে আপনি সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে। কিন্তু অন্যলোকের যে মন আছে, ইহা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না; কার্য্য দেখিয়া জানা যায়। যাহাতে মানসিক ভাব প্রকাশ পায় এমন কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারি যে, আমার ন্যায় অপর মনুষ্যেরও মন আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি জানিতে পার যে, তোমার বন্ধুর মস্তকের ভিতর মস্তিষ্ক আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে তুমি তাহার মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না, এমন নহে। মার্টিনোর দ্বিতীয় কথা এই যে, যে মন বা জ্ঞান দেশ কালে বদ্ধ, তাহার পক্ষেই শরীর সম্ভব। কিন্তু যে জ্ঞান বিশ্বব্যাপী তাহার পক্ষে শরীর সম্ভব নহে।

প্রাকৃতিক শক্তি ও মনুষ্যের মধ্যে আর একটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। মানুষ কথা বলিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তি কথা কহে না। কিন্তু মানুষের ভাষা ও কার্য্য বাস্তবিক একই। ভাষা ও কার্য্য উভয়ই মানুষের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। একজন একটী ঘড়ি নির্ম্মাণ করিল; এবং কোন বিষয়ে কথা বলিল। ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টিতে কি হইল? কতকগুলি জড়পদার্থের বিশেষ বিন্যাসে একটী অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল। কথা বলাতে কি হইল? কতকগুলি শব্দের বিশেষ বিন্যাসে একটী অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল। ভাষাও এক প্রকার কল। অভিপ্রায় অন্তরের বস্তু। যন্ত্র বা ভাষা বাহ্যপদার্থ হইলেও, সঙ্কেতস্বরূপ হইয়া অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দেয়।

প্রকৃতি কি মনুষ্য উভয় স্থলেই কার্য্য দেখিয়া জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এখন কেহ বলিতে পারেন যে, যখন উভয় স্থলে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই;—মানুষের শরীর আছে, প্রাকৃতিক শক্তির শরীর দেখিতে পাই না, মানুষের ভাষা আছে, প্রকৃতিগত শক্তি কথা কহে না;—তখন এক প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত?

যুক্তিবিরুদ্ধ কেন হইবে? ভাষা জ্ঞান প্রকাশক কার্য্যমাত্র। শারীরিক সাদৃশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেবল সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা পরস্পরকে জ্ঞানসম্পন্ন জীব বলিয়া বিশ্বাস করি না। জ্ঞানের চিহ্ন দেখিয়া জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি।

তবে কি শারীরিক সাদৃশ্যের কোন কার্য্যকারিতা নাই? শারীরিক সাদৃশ্য পরস্পরের ভাবগ্রহণে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মানুষের সে প্রকার কোন সাদৃশ্য নাই; সুতরাং সেরূপ সাহায্যও সেখানে নাই। সেইজন্যই স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা মানুষের কার্য্যে যে প্রকার জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পায়, প্রকৃতির ভিতরে সে প্রকার দেখিতে পায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রকৃতির রাজ্যে যে অতলস্পর্শ অসীম জ্ঞানসাগর দেখিতে পান, তাহার তুলনায় মনুষ্যের জ্ঞান সামান্য গোষ্পদ বলিয়াও অনুভূত হয় না।

মানুষ যে মানুষের জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট রূপে অনুভব করে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। মানুষ পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ। মানুষের জ্ঞান, ভাব সকলই অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। সুতরাং মানুষ, মানুষের জ্ঞানকে সহজে বুঝিবে, মানুষের ভাবকে সহজে ধারণা করিবে, ইহাই তো সম্ভব। যে জ্ঞানময়ী অসীমশক্তি এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছে, তাহাকে ধারণা করা যে কঠিন হইবে, তাহা তো সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু অনুরাগ থাকিলে, চিন্তা থাকিলে প্রকৃতির মধ্যে স্পষ্ট, উজ্জ্বল সর্ব্বত্রব্যাপী জ্ঞানালোক দেখিয়া জীব কৃতার্থ হইয়া যায়।

একদিকে যেমন সাদৃশ্য অধিক, অপরদিকে জ্ঞানকৌশল অনন্তগুণে অধিক। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে দুরবগাহ্য জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহার সহিত তুলনা করিলে মনুষ্যের জ্ঞান কিছুই নহে। বরং বলিব মানুষের কোন বুদ্ধি, কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু এই বিশ্বকার্য্যে যে জ্ঞানময়ীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না। সামান্য একটী তৃণকণা, একটী জলবিন্দুতে যে জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে, মনুষ্যবিরচিত রাশি রাশি সাহিত্যদর্শন তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়।

"কে জানে মহিমা বিভু তোমার। বলিব কিবা, বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।" শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নরবলি।

আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আমরা আমাদের দেবতায় আরোপ করি। আমরা যাহা খাইতে ও পান করিতে ভালবাসি, আমাদের দেবগণও তাহা খাইতে ও পান করিতে ভালবাসেন, আমাদের অনুমান। আমরা যখন নরমাংস ভালবাসিতাম, তখন আমাদের দেবতাদিগকে নরমাংস উপহার দিতাম, এবং দেবতার ভোজন সমাপ্ত হইলে দেবোচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইতাম। নানা কারণে যখন আমরা নরমাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তখনও কিছুদিন দেবতার উদ্দেশে নরবলি দিয়াছি। আরও কিছুদিন অতীত হইলে অন্য মাংস, অন্য ফল, অন্য পদার্থ উৎসর্গ করিতে শিখিয়াছিলাম। আমাদের চরিত্র উন্নত অগ্রে হয়, দেবতা চরিত্রের উন্নতি মানব চরিত্রের অনুসরণ করে। এজন্য আগে আমরা নরমাংস-ভুক, তাহার পর আমাদের দেবতা। আগে আমরা ফলাহারী, তাহার পর আমাদের দেবতা। আমাদিগের প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র আমাদিগের দেবতা। নরবলির উৎপত্তি এইরূপ।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে নরবলি প্রচলিত ছিল, আমরা বিগত বৎসর আশ্বিন মাসের নব্যভারতে তাহার আলোচনা করিয়াছি। একমাত্র ভারতবর্ষ এই বিভৎস কার্য্যে ব্রতী ছিলনা। সকল দেশই ক্রম-পর্য্যায়ে বর্ব্বরতা ও অসভ্যতা অতিক্রম করিয়া সভ্যপদবীতে আরোহণ করে। রাক্ষসাচার নরমাংস ভক্ষণ সকল দেশেই এক সময়ে প্রচলিত ছিল। সকল জাতিই কোন না কোন সময়ে নরমাংস উপহার দিয়া দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করিয়াছে। অমানিশার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যাহাদিগের মুখ চিরদিনের জন্য আবৃত রহিয়াছে, তাহারাই ভাগ্যবান, তাহাদিগের ললাট-লিখিত এই কলঙ্ক রেখা কেহ জানিতে পারিল না, কবিগাথা যাহাদিগের দুষ্কৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহারাই ধরা পড়িল। ভারতের ন্যায় দুর্ভাগ্য অনেক দেশ। মানুষে মানুষের মাংস আহার করে, দেখিলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু নিতান্ত শোচনীয় হইলেও, এক সময়ে মানব সন্তান বানর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অতি ঘৃণিত রাক্ষস ছিল। এবং সেই নিকৃষ্ট অবস্থা অতিক্রম করিয়া মনুষ্য আজ যে এত সভ্য হইয়াছে, ইহা তাহার গৌরবের বিষয়। হোমর, হিরদোতস, স্ত্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ অনেক দেশে রাক্ষসাচার প্রচলিত থাকিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে সাইক্লপ, লেষ্ট্রোগণ, শিথিয় ও মাসাগেটী জাতি নরমাংস ভক্ষণ করিত। প্রাচীন ব্রিটনেরা নর-কপালে শত্রু শোণিত অতীব তৃপ্তি সহকারে পান করিত। নবজিলণ্ড, নবকালিডোনিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপে একসময়ে রাক্ষসগণের অধিবাস ছিল। আফরিকা ও আসিয়ার কোন কোন স্থানে অদ্যাপি নরমাংসাশী মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফিজি বাসী কোন কোন জাতি অদ্যাপি এই বিভৎস আচরণ করিয়া থাকে। আফরিকার পশ্চিম তটবর্ত্তী কঙ্গেল দেশে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মাছ ও মেষ মাংসের ন্যায় নরমাংস বাজারে বিক্রয় হইত, এবং মাঝে মাঝে এক একটী প্রজা কাটিয়া রাজা আপন রসনা পরিতৃপ্ত করিতেন। ডাক্তার স্প্রাই সাহেব বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রামবাসী কুকি জাতি বানরের ন্যায় বৃক্ষ শাখায় বাস করিত, এবং রাক্ষসের ন্যায় নরমাংস ভক্ষণ করিত। আণ্টিলিস দ্বীপের বর্ব্বরেরা এত নর মাংসপ্রিয় ছিল যে, স্প্যানিয়ার্ডেরা আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেণ্ট বিন্সেণ্ট দ্বীপবাসী রাক্ষসদিগের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিভৎস আচরণ পরিহার করিয়াছে। কারিবদিগের রাক্ষসাচার ভুবন বিখ্যাত।

নরমাংসের সুস্বাদুতার তারতম্য আছে বলিয়া বোধ হয়। উত্তর আমেরিকা ও চীন বাসী কোন কোন জাতি যকৃত্‌কে বড় সুস্বাদু বিবেচনা করে। দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপবাসীগণ যুবতী রমণীর কর পত্র অতীব প্রীতিকর আহার্য্য বলিয়া উল্লেখ করে। নবজিলণ্ড-বাসীগণ সর্ব্বাপেক্ষা পদপত্রের আদর করে। ফিজিবাসীগণ সাহেবের মাংস খাইতে চায় না, বলে, উহাদের মাংসে বড় তামাকের গন্ধ বাহির হয়, এবং উহা অতিশয় লোণা। মোগলেরা কাণ, বর্ণিয়োবাসী দামাকেরা মাথা, চীনেরা রক্ত এবং জাপান-বাসীরা মাংস খাইতে অতি পছন্দ করে। এই সকল জাতি দেবতার নিকট মনুষ্য বলিদান করিত বলিয়া বোধ হয় না। উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য ইহারা এইরূপ বিভৎস আচরণ করিত। তাতার, ভিব্বৎ, জাবা, সুমাত্রা ও আণ্ডামানবাসীরা এক সময়ে নরমাংসাশী ছিল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে মহা ফরাসী-বিদ্রোহের সময় এক জন ফরাসী রাজকুমারী লাম্বানের ফুস ফুস লইয়া রন্ধন করিয়া খাইয়াছিল। ফরাসীরা জগতের সভ্যতম জাতি।

ইহাদিগের অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি দেবতাকে আহার দিতে হয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহাদিগের মধ্যে দেবতাকে নরমাংস উৎসর্গ করিয়া প্রসাদ পাইবার রীতি পরিলক্ষিত হয়। নাগপুর গণ্ডশৈলবাসী গোন্দ জাতি কুকিদিগের অপেক্ষা উন্নত। তাহারা দেশান্তর হইতে লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য ক্রয় করিয়া আনিয়া কিছু দিন রীতিমত প্রতিপালন করিয়া তাহার পর তাহাকে ভূদেবী তারিপেন্নুর নিকট বলিদান দিয়া প্রসাদ পাইত। উড়িষ্যার প্রান্তবর্ত্তী বড় খেমটী প্রদেশে বোধ হয় মেরিয়া-প্রথা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ নিবারিত হয় নাই। সুমাত্রা বাসী বাট্টা জাতি যুদ্ধের বন্দীদিগকে এবং গুরু দোষে দুষ্ট অপরাধীদিগকে দেবতার নিকট বলিদান করিয়া প্রসাদ পায়। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যেও বন্দীদিগকে দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া তাহার রক্ত পান ও মাংস ভোজনের রীতি প্রচলিত ছিল।

কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্য নরমাংস-প্রিয়তা পরিহার করিলেও মনুষ্যের দেবতা আরো কিছু দিন পূর্ব্ব প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া থাকেন। যখন আমরা নিজে কোন কার্য্য অনাবশ্যক বা অন্যায় বলিয়া অনুমান করি, তখনও পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্মানিত প্রাচীন রীতি বলিয়া যতদিন বিশেষ কষ্টকর না হয়, ততদিন তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করি না। কদাকার হইলেও বৃদ্ধ ধবল কেশ ও লোল চর্ম্ম গুণে যুবকের চপলতা শাসন করেন। আপনারা নরমাংস আহার

করে না; অথচ দেবতার নিকট নরবলি দিয়া থাকে, ইতিহাসে এমন অনেক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ইহুদা জাতি জীবন্ত পুত্র কন্যা অগ্নিস্মাৎ করিয়া মোলক ও বেয়াল দেবতার মনোরঞ্জন করিত। কেনেয়াল-বাসীগণ দেবতার উদ্দেশে আপন পুত্রকন্যা বলিদান করিত। ক্রীট, মিসর ও আরাবের অধিবাসীগণ বিভিন্ন দেব দেবীর সমক্ষে নরবলি দিত। মেক্সিকোর আদিম নিবাসীগণ বিবেচনা করিত, নরমাংস উপহার পাইলে দেবতা যেমন প্রসন্ন হন, এমন আর কিছুতেই নহে। পূর্ব্বকালে জর্ম্মান দেশে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ফিনিসিয়া, সাইপ্রস ও রোড্স দ্বীপের লোকেরাও এই দোষে দূষিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে রোম সম্রাটদিগের পদানত হইবার সময় পর্য্যন্ত, স্বভাব সুন্দরী বিজ্ঞান-গরিয়সী সুসভ্য গ্রীস ভূমীর নানাখণ্ডে নরবলি প্রচলিত ছিল। আর্কেডিয়ার লিসিয়ণ ইন্দ্র নরমাংস না পাইলে পরিতৃপ্ত হইতেন না। লুকাশ নগরে প্রতিবৎসরে আপলো দেবতার উৎসব উপলক্ষে গিরিশৃঙ্গ হইতে একটী জীবন্ত মনুষ্য সাগর গর্ভে উৎপ্রেক্ষিত হইত। আথেন্স নগরে থার্জিলিয়ার মহামেলায় পুরুষদিগের মঙ্গলার্থ আপলোর উদ্দেশে এবং রমণীগণের মঙ্গলার্থ আর্টিমিস দেবীর প্রসন্নতা কামনায় দুইটী লোকের জীবন্ত দেহ অনলে ভস্মসাৎ করা হইত।

গ্রীকদিগের ন্যায় রোমকেরাও এই মহাপাপের পাতকী। দেশের মঙ্গলার্থ দেবতার সম্মুখে যাহারা আপন মস্তক আপন হস্তে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কর্সিয়স ও ভিসিয়াইর নাম চিরদিন জগতে সম্মানের সহিত ঘোষিত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমক দেবতার নরমাংসাশীতা জগদ্বাসীর স্মৃতি পথে উদ্দীপিত হইবে। রোমান্স সনৈশ্বর দেবতার নিকট নরবলি দিতে হইত। সাবাইন প্রভৃতি ইতালি-বাসী নানা প্রাচীন জাতির মধ্যে এই নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জুলিয়স সিজারের শাসন কালে মারস্ দেবতার মনোরঞ্জনার্থ দুইদিন সৈনিককে বলি দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্ব্বে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ড্রুইদ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ড্রুইদেরা দেবতার উদ্দেশ্যে মনুষ্য বলিদান করিত। ড্রুইদ ধর্ম্মাবলম্বী কেহ কোন প্রকারে বিপন্ন হইলে নরবলি দিবার মনন করিয়া বিপন্মুক্তির প্রার্থনা করিত, এবং কোন প্রকারে উদ্ধার হইলে আপনার পরিবর্ত্তে আর কাহাকে বলিদান দিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিত।

অগ্রনস দেবতার উদ্দেশে সাইপ্রস বাসীগণ সনৈশ্বরের নিকট, রোডস্-বাসীগণ বাকসের নিকট, কিয়স, লেসবন ও টেনিডাস-বাসীগণ ডায়েনার নিকট, ফোশিয়-বাসীগণ এবং স্পার্টা নগরের লোকেরা মারশ্ দেবতার নিকট নরবলি দিত। ইহুদা কানেবান ও ফিলিসিয়া বাসীদিগের ন্যায় আপন পুত্র কন্যা বলিদান দিবার প্রথা, সাইপ্রস, ক্রীট ইজিয় তটবর্ত্তী দেশ সমূহে, কার্থেজ, সিসিলি এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপেও প্রচলিত ছিল। মোয়াবাইট, আমোনাইট, সিরিয়াবাসী আডোনিস দেবীর উপাসক লিভিয়ার উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী এবং আরব দেশের দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী জাতি সমূহের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। ফ্লোরিডা, পেরু, মেক্সিকো এবং স্কাণ্ডেনিবায়ার অধিবাসীগণও একদিন দেবতার নিকট আপন পুত্র

কন্যা বলিদান দিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিসর, সিরিয়া, সিথিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মনি, স্লাবোনিয়া, গ্রীস, রোম, পারশ্য, এবং আসিরিয়া দেশের লোকেরা, বৃদ্ধ বন্দী, দাস ও অপরাধীদিগকে দেবতার নিকট বলিদান করিত। মেক্সিকো ও পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীগণ এক একদিন সহস্র বন্দীর প্রাণসংহার করিয়া জয়কালীর মনোরঞ্জন করিত। পেরু দেশে কোন বড় লোকের পীড়া হইলে সে দেবতার নিকট আপন পুত্রকে বলিদান করিয়া রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত।

দেব সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রেতসৃষ্টি। মানব সন্তান যখন দেবতা পূজা শিক্ষা করে নাই, তখন প্রেতাত্মার পূজা করিত। দেব-দেবতা ও প্রেত-দেবতার মধ্যে পার্থক্য এইরূপ,—দেব-দেবতা অপেক্ষা প্রেত-দেবতার সহিত মনুষ্যের সাদৃশ্য অধিকতর এবং দেব-দেবতা অপেক্ষা প্রেত-দেবতার সংখ্যাও অধিক। সে যাহা হউক, প্রেত-দেবতার সন্তোষার্থ কেহ মরিলে পরলোকে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য বা অন্য নানা কারণে প্রেতাত্মার উদ্দেশে নরবলি দিবার প্রথা নানা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।

হোমর বলেন, ট্রোজানদিগের হস্তে পাট্রকলসের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রেতাত্মার জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গ্রীক সেনাপতি পাট্রকলসের সমাধি ক্ষেত্রে দ্বাদশটী ট্রোজনকে বলিদান করিয়াছিলেন। পেরুসিয়ার তিন শত অধিবাসীকে বলিদান করিয়া রোম সম্রাট আগষ্টস্ জুলিয়সের প্রেতাত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতির মধ্যে যে রীতি প্রচলিত ছিল, অসভ্য ও বর্ব্বরদিগের মধ্যে সে রীতি কত বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকিতে পারে, অনুমান করা যাইতে পারে। অরকাসীয়ানে যুদ্ধ-ধৃত বন্দীদিগকে বলিদান করিয়া যুদ্ধ হত সৈন্যদিগের জিঘাংসার শান্তি করিত। বন্দীকে সুসজ্জিত করিয়া কিছুক্ষণ অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করাইয়া একজন এক লগুড়াঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিত এবং তাহার ফুস ফুস লইয়া সেনাপতিকে উপহার দিলে তিনি উষ্ণ রক্ত তৃপ্তির সহিত পান করিতেন। অনন্তর সেনাপতির প্রসাদ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। হিরোদতস বলেন, ক্রেষ্টনীয়দিগের কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে তাহার কবরের উপর বলিদান করা হইত। আমাদের দেশে সতী দাহ এইরূপ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে। অসভ্যদিগের মধ্যে এই কদাচারের অনেক গুলি দৃষ্টান্ত মানব প্রকৃতি নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে তাহার কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল। পোলিনেসিয়া, নবকালিডোনিয়া, ফিজি ও টঙ্গা দ্বীপে এবং চিলুক, কারিব, দাফোটা, নিগ্রো ও দাহোমি জাতির মধ্যে কেহ মরিলে তাহার স্ত্রীকেও হত্যা করিয়া সঙ্গে পাঠান হয়। কারিব, দাফোটা, চিলুক, কীয়ান, মিলানা, জুলু ও নিগ্রো প্রভৃতি নানা অসভ্য জাতির মধ্যে দাস দাসীকে এইরূপ সঙ্গে পাঠাইবার প্রথা দেখা যায়। ফিজি দ্বীপে এবং মধ্য আফ্রিকার বন্ধুদিগকে সঙ্গে পাঠান হয়। মেক্সিকো দেশে পুরোহিত এবং বিদূষকদিগকে পাঠান হইত। পেরু দেশে উপপত্নীরাও সঙ্গে যাইত। পুত্রের মৃত্যু হইলে চিলুকেরা মাতাকে সঙ্গে দেয় এবং আনিটিয়ম দেশে মাতা, খুল্লমাতা

ও পিতামহী প্রভৃতিকেও পাঠাইতে দেখা গিয়াছে। নরবলি প্রবন্ধের সূচনায় গত আশ্বিনমাসে তাই বলিয়াছিলাম, মনুষ্য রাক্ষস, না মনুষ্য দেবতা? রাক্ষস ছিল, দেবতা হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সমাজ সমন্বয়।

সমাজ-সৃষ্টির দিবস হইতে জগতে সকল জাতির মধ্যে রমণীগণ চিরকাল পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে এবং পুরুষগণও তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত রাখিবার জন্য নানা প্রকারে প্রয়াস পাইতেছে। বস্তুতঃ রমণীগণ শরীর ও মানস-দৌর্ব্বল্য বশতঃ পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে কি না, এবং পুরুষেরা শারীর ও মানস বলে বলবান বলিয়া তাহাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কোন কোন শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নারী জাতির সৃষ্টিগত হীনতা সপ্রমাণ করিয়াছেন; আবার পক্ষান্তরে অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। নারী জাতির অবস্থা যে মানস-দৌর্ব্বল্য হেতু পুরুষের অধম, এ পর্য্যন্ত কোন মনোবিজ্ঞানবেত্তাই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, যিনি মানস বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তিনিই তাদৃশ শরীর-তত্ত্ববিদ্ নহেন।

সত্য বটে শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি নিকট, কিন্তু তাহাতে যে একের সৃষ্টিগত হীনতায় অন্য পুষ্ট হইতে পারে না, তাহা কোন বিজ্ঞানে লেখে না। শরীরের ও মনের নিজ নিজ ক্ষমতা ও অবস্থানুসারে তাহাদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে, সে অবস্থা চিরকাল অক্ষুণ্ণ হইয়া সমান ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—কেবল একের চর্চ্চার হ্রাস বৃদ্ধিতে অন্যের অবস্থার তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। একের উন্নতিতে বা অবনতিতে অন্যের অবস্থান্তর তাহাদিগের উভয়ের সম্বন্ধগত অবস্থাবিধায়ক নহে। শরীর ও মনের যে প্রকৃতি কেবল তাহারই উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয় মাত্র। যদি শরীর প্রকাণ্ড বা বলবান হইলে চিন্তাশক্তি প্রখর হইত, তাহা হইলে হস্তী ও ব্যাঘ্রের সমান কেহই সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ না হইবার পক্ষে কোন যুক্তিপ্রদর্শিত হইতে পারিত না। শ্রমজীবী লোক সাধারণের অপেক্ষা অধিক বলবান; কিন্তু তাহারা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নহে। ফলতঃ শরীর দৌর্ব্বল্য হেতু যে মনের অবস্থা উন্নত হইতে পারে না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু যাঁহারা কেবল মনের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহাদিগের শরীর সঞ্চালন করিবার সময় অতি অল্প, সুতরাং বিস্তর স্থলে দুর্ব্বল শরীরে সবল মনের সন্নিবেশ দেখা গিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকে বঙ্গবাসী অপেক্ষা শরীরে সবল, কিন্তু বুদ্ধি বলে তাহারা বঙ্গবাসীদিগের বিস্তর নিম্ন স্থানীয়। এবম্প্রকার না হইবার পক্ষে বিস্তর তর্ক নাই, কারণ জগতে সর্ব্বদা একের বিনিময়েই অন্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং রমণীগণ শরীরে দুর্ব্বল হইলে যে মনে পুরুষের অপেক্ষা বলবতী, অন্ততঃ তাহাদিগের সমান হইতে পারে না, তাহার কোন

প্রমাণ নাই। সৃষ্টিগত প্রভেদ বশতঃ তাহারা যে পুরুষের অধীন হইয়া আছে, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক ও অযৌক্তিক।

প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার জন্য যাঁহারা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অনেকেই সুস্থ ও সবল ছিলেন না। পরন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কোন কোন কঠিন রোগে চিররুগ্ন ছিলেন। গভীর চিন্তা-শক্তি সম্পন্ন হইলেই যে শরীর দৌর্ব্বল্য অনিবার্য্য, তাহাও বলি না, তবে যাঁহার যে দিকে অধিক আস্থা তিনি তাহার আলোচনাতেই দিনরাত্রি নিযুক্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহার আর অপরের দিকে লক্ষ্য রাখা ঘটিয়া উঠে না।

বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে শরীরের বল বৃদ্ধি সহজেই হইতে পারে। অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিও আহার ও ব্যায়ামের সাহায্যে বলবান হইতে পারে। অসভ্য অবস্থায় যখন বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা ছিল না, তৎকালে প্রায় সকলেই শরীরের বলকে শ্রেষ্ঠ বল বলিয়া বিবেচনা করিত, এবং আপন আপন সত্ব বজায় রাখিবার জন্য সকল সময়েই অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকিত। ফলতঃ প্রয়োজন অনুসারে সকলকেই বলবান হইতে হইত এবং ব্যায়াম প্রভৃতি কতিপয় শরীর-রক্ষিণী কার্য্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইত। স্পার্টা দেশে এক সময়ে সকলেই বলবান ছিল; এমন কি জননীগণ সন্তানকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখা অপেক্ষা তাহার মৃত শরীর দেখা আনন্দের বিষয় বিবেচনা করিতেন। বস্তুতঃ যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষ শারীর বলের বৃদ্ধি করিয়াছে। আবার অপ্রয়োজন বিবেচনায় যখন শরীরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিলাসে আসক্ত হইয়াছে, তখনই ফ্রান্সের ন্যায় অধঃপাতে গিয়াছে। ইতিহাস ইহার প্রধান সাক্ষ্য। ইতিহাস ব্যতিরেকে অতি অল্প ভূয়োদর্শনেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বল যে প্রকার সামগ্রী তাহা যে ইচ্ছায় হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত কিছু মাত্র বিরল নহে। যিনি প্রত্যহ ব্যায়াম করিয়া থাকেন, এক দিবস বিরত হইলেই তিনি এই সত্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন, এবং যিনি বিলাসপ্রিয় নহেন, এক দিবসের বিলাসেই তিনি দুর্ব্বল হইয়া যাইতে পারেন। এই জন্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার বিধি দিয়াছেন এবং তাহার আলোচনায় যে দুর্ব্বল ব্যক্তিও সবল হইতে পারেন, তাহা স্থির সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগতে এমন কোন বৃত্তি নাই, যাহা পরিচালনায় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না।

সমাজের অসভ্য অবস্থায় শরীরের বল পরিচালনা বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এক্ষণে সমাজের সভ্য অবস্থায় মানসিক বৃত্তির প্রাধান্য। অনেকের বিশ্বাস যে মনের বল বৃদ্ধি হইলেই চলিবে, শরীরের বল তত প্রয়োজনীয় নহে—এই বিশ্বাসই বিশেষ সর্ব্বনাশের সোপান। এক্ষণে জগতে যে জ্ঞানের চর্চ্চা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু অসভ্য অবস্থাতে এ প্রকার জ্ঞানের বৃদ্ধি লক্ষিত হয় নাই। তাহার কারণ কি? জগতে যাহার আলোচনা অধিক হইবে,

সেই বৃদ্ধি পাইবে ও পুষ্ট হইবে। অসভ্য অবস্থায় সকলে আপন আপন আহারের জন্য, বাসের গৃহের জন্য, সত্ব বজায় করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দী হিংস্রক পশুদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য ও আর আর নানা প্রয়োজন বশতঃ সর্ব্বদা শরীরের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিত, এবং মনের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিত না; এই জন্য তখন কেবল তাহারা বলবানই ছিল, বুদ্ধিমান হইতে পারে নাই। ক্রমে যখন দুর্গম অরণ্য পশুদিগের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, আহার্য্য দ্রব্য উৎকর্ষ লাভ করিল, সহজ উপায়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল, শাসন প্রণালী প্রচলিত হইল, তখন কেবলই শরীরের আলোচনায় আর প্রয়োজন রহিল না; শরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানসিক বৃত্তি সকলের পুষ্টি সাধনে মনুষ্য যত্নবান হইল। জ্ঞান আলোচনার সামগ্রী। সকল সামগ্রীরই আলোচনা করিলে যেমন বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রয়োজনই মূলাধার; প্রয়োজন হইলে সকলই মিলাইবার উপায় হয়। সভ্য সমাজে যখন পরস্পরের সহিত ও জাগতিক ক্ষমতার সহিত যুদ্ধ প্রয়োজন উঠিয়া গেল, তখন আর বলের প্রয়োজন রহিল না, কাজেই লোকে মানস বৃত্তির চর্চ্চায় নিযুক্ত হইল।

শারীর বলের ন্যায় মানস বলও আলোচনার সামগ্রী। যেমন লোকের অভাব বৃদ্ধি হইল, তেমনই মনুষ্যও সহজ উপায়ে সুখ সৌকর্য্যের অনুসন্ধানে দীক্ষিত হইল; চিন্তা তাহাদিগের একমাত্র জীবনরূপে পরিণত হইল। কেহ বা সেই চিন্তাশক্তির চিন্তায় অর্থাৎ মানস বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য ব্রতী হইলেন। এইরূপে দিন দিন দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিষয় সকলের আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়া আজি প্রায় জগতের দশ আনা অংশ সভ্য জগৎ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, এবং যদি শাস্ত্রালোচনা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ইহার যে চরমে কি সুখের অবস্থা বা উন্নতির অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা চিন্তা করা যায় না।

এই সর্ব্বসাধারণের উন্নতিকর ও সুখকর বিষয়ে কোন দেশে কোন কালেই দুই চারি জন ব্যতিরেকে সাধারণ নারী-জাতির কোন হাত নাই। যেমন জ্ঞানালোচনার সময় আরম্ভ হইল, অমনি তাহাদিগের জীবনের কর্ম্ম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল। অতি সামান্য বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া পুরুষেরা রমণীগণকে পৃথক্ করিয়া দিলেন, আর তাহারা যে সকল গৃহকর্ম্ম ও শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে সমাজের প্রথম দিবসে নিযুক্ত ছিল, চিরকাল তাহাই তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া রহিল। অনেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রমণীগণ এই শাসন অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু পুরুষের এমনই একাধিপত্য যে, তাহাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে যে সকল বিশেষ বিশেষ রমণীগণ সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎমান্য হইয়া গিয়াছেন, বিশেষ অসুবিধা এবং অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে পালিতা হইয়াও যে প্রকার বুদ্ধি ও বলে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, সকল প্রকার সুবিধা উপভোগ ও আজীবন জ্ঞানালোচনা করিয়াও অনেক পুরুষ তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সুতরাং রমণীগণ যে কোন বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হইলে তাহাতে

কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহারা এমনই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আছে যে, তাহাদিগের কিছুমাত্র অবসর নাই, অবসর থাকিলেও প্রতিবন্ধকের সীমা নাই। জগতের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের জীবন মরুভূমি হইয়া গেল—কেবল পুরুষের একাধিপত্যই ইহার কারণ। পাপ পুণ্যের কথা রাখিয়া দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, পুরুষ আইনকর্ত্তা বলিয়া জগতের অর্দ্ধেক সুখ-সৌকর্য্য তাহাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

চিরকাল পুরুষের অধীন থাকিয়া থাকিয়া স্ত্রীজাতির মনের স্বাধীনতা নাই। তাহারা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিবার অধিকারিণী নহে। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, দেড় কাঠা প্রাঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং উঠিতে বসিতে পুরুষের ভারে আক্রান্ত হইয়া রমণীগণও তদ্রূপ মানসিক বলে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি থাকিতেও রাজপুতনার দুই একজন পুরন্ধ্রী ও বিদেশীয় রাজ্ঞী এলিজাবেথ, রাজ্ঞী অ্যান, ও জুয়ান অব আর্ক যে প্রকার মনের স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচিৎ কোন পুরুষের সাধ্যায়ত্ব। ক্রীড়ার স্থান পাইলে রমণীগণের বৃত্তি সকল যে পুরুষের বৃত্তি সকলের মত কার্য্য করিতে পারে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন—একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, সৃষ্টিগত কোন হীনতা রমণীতে বিদ্যমান নাই। যে যে ধাতুতে বিধাতা পুরুষ সৃজন করিয়াছেন, সেই সেই পদার্থে রমণীজাতিও সৃষ্ট হইয়াছে। কোন বিষয়ে রমণীগণকে পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া তিনি কখনই পক্ষপাত দোষে দোষী নহেন। বরং তাহাদিগের অবস্থার হীনতা জন্য আমরা পাপভাগী, কারণ পুরুষের দ্বারাই তাহাদিগের অবনতি সম্ভাবিত হইয়াছে। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে দাস ব্যবসায়কে যে প্রকার জঘন্য প্রথা বলিয়া উইলবারফোর্স তাহা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই প্রকার সমগ্র স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের আধিপত্যও অতি জঘন্য প্রথা। তথাপি ইহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এখানে উইলবারফোর্স নাই, কারণ ইহাতে জগতের সমস্ত পুরুষ মাত্রেরই লাভ ব্যতিরেকে অলাভ নাই, বরং স্ত্রীজাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহাদিগের বিবেচনায় ক্ষতি আছে। বস্তুতঃ কোন ক্ষতি আছে কি না, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া রমণীজাতির উপর আধিপত্য ত্যাগ করিলে তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগের ও তাহাদিগের, সুতরাং সমস্ত জগতের মঙ্গল ব্যতিরেকে অমঙ্গল নাই।

পুরুষে ও রমণীতে একেবারে যে সৃষ্টিগত পার্থক্য নাই, তাহা নহে—অবশ্য কিছু আছে, নহিলে স্ত্রী পুরুষ পৃথক্ নামও থাকিত না। উভয়েই মনুষ্য, যেমন কলস ও ভাণ্ড উভয়ই মৃৎপাত্র, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে বলিয়াই তাহারা পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভিন্নতা দুই প্রকার যথা আকৃতিগত ও শক্তিগত *। তাহাদিগের

* স্ত্রীলোকের স্তনের আধিক্য ও শ্মশ্রু ইত্যাদির অভাব লইয়া তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। স্তনের কথা এই প্রবন্ধেই মিলিবে, কিন্তু শ্মশ্রু প্রভৃতির অভাবের কথা ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করা সঙ্গত

জননেন্দ্রিয় পুরুষের ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন প্রকারের এবং তাহারা উৎপাদিকা শক্তিশালী।

স্ত্রীজাতির বাহ্যিক জননেন্দ্রিয় কেবল পুরুষের মত নহে; কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্যান্য অনেক যন্ত্র পুরুষের ন্যায়—আর পুরুষের জরায়ুর প্রয়োজন নাই, সুতরাং স্ত্রীজাতির ন্যায় তাহাদিগের জরায়ু নাই। শরীর-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে জানা যায় যে, জননেন্দ্রিয়ের গঠন প্রায় নরনারীতে সমান এবং সন্তান যৎকালে জঠর মধ্যে অবস্থিতি করে, তাহার প্রথমাবস্থায় কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। সন্তান উৎপাদন করিতে হইলে, তাহার অবস্থান স্থান অর্থাৎ জরায়ুর প্রয়োজন। সংসারে সকল প্রাণীর স্ত্রীজাতিতেই সন্তান উৎপাদন করে, সুতরাং তাহাদিগেরই জরায়ু আছে, এবং সন্তান প্রসব করিবার জন্য জননেন্দ্রিয়ের আকৃতিও তদুপযোগী করিয়া সৃজন করা হইয়াছে। বংশ বৃদ্ধি করা সংসারের উদ্দেশ্য, সুতরাং এক জাতিকে অবশ্যই তাহার আধার হইতে হইবে, ইহা অনিবার্য্য। যদিও উপায়ান্তরে এক জাতিতে উভয় ইন্দ্রিয়ের যোজনা করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়কে সকল বিষয়ে সমান করিয়া সৃজন করা যাইত, কিন্তু তাহাতে বিস্তর অভাব থাকিত এবং হয় ত সংসার চলিত না। যখন সে প্রণালীতে মনুষ্য সৃজিত হয় নাই, তখন বর্ত্তমান অবস্থাই আমাদিগের আলোচনার সামগ্রী, কল্পিত বিষয়ে প্রয়োজন নাই।

যাহারা বীজোৎপাদিকা শক্তিশালী ক্ষেত্র হইয়াছে, তাহারাই স্ত্রীজাতি। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপন শক্তিতে পুরুষাপেক্ষা ন্যূন নহে। হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মা স্বয়ং দ্বিধা হওয়াতে নরনারী উৎপন্ন হইয়াছে এবং মতান্তরে এই শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই পুরুষের জন্ম। সুতরাং ইহাদিগের মতে নারী জাতি কোন মতেই পুরুষাপেক্ষা শক্তিহীনা নহে, বরং পুরুষই তাহাদিগের অপেক্ষা অল্প শক্তি সম্পন্ন। যাহা হউক, উৎপাদন জন্য পুরুষের যেমন প্রয়োজন, রমণীরও তদ্রূপ; সুতরাং উভয়ের শক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লক্ষিত হইলেও আমরা উভয় জাতিকে সকল প্রকারে সমান বলিতে ও সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত আছি।

স্ত্রীজাতি সন্তান প্রসব করে বলিয়া এবং কয়েক দিবস সূতিকাগারে বদ্ধ থাকে, এই জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, তাহাদিগকে পুরুষের অপেক্ষা অবশ্যই দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কত দূর সত্য? যদি একবার মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় যে, স্ত্রীজাতি কেবল সন্তান প্রসব করে বলিয়া তাহারা পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে, বরং যে সময়ে ইতর জন্তুগণ শাবক প্রসব করে, সে সময়ে কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহারা পুরুষের অপেক্ষা সাহসী ও ভয়ানক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে রমণীগণ কিছু দিন পর্য্যন্ত সন্তানের লালন পালন ও আপন শরীরের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য আবদ্ধ থাকে এবং প্রসব বেদনায় কিঞ্চিৎকাল কাতর হয়, ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাহারা পুরুষাপেক্ষা দুর্ব্বল।

ইংরাজ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, তাহাদিগের রমণীগণ সূতিকাগার কি

বিবেচনা না করায় আরিসতোতলের গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

সামগ্রী তাহা জানে না, এবং এক দিনের জন্যও অবরুদ্ধ থাকে না। যে দেশে স্ত্রীজাতি এই সময়ে অবরুদ্ধ থাকে, সে দেশে সন্তান পালন তাহাদিগের হস্তে এবং কেবল শিশু সন্তানের অনুরোধেই তাহাদিগকে অবরুদ্ধ থাকিতে হয়। যদি পুরুষের উপর শিশু সন্তান পালনের ভার অর্পিত হইত, তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, রমণীগণ যে কারণে অবলা আখ্যা পাইয়াছে, পুরুষেও সেই কারণ বর্ত্তিত। আর যদি রমণীগণ সুস্থ ও সবল থাকিয়া অন্তঃসত্তাবস্থায় রীতিমত শরীর চালনা ও পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রসব কালে কোন প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও গর্ভের শেষ সময়ে আমাদিগের স্ত্রীগণের ন্যায় জড়বৎ হইতে হয় না। যে দেশে স্ত্রীগণ অধিক পরিশ্রম করে, তথায় সূতিকা-প্রথা দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম প্রদেশীয় কুলীদিগের বিস্তর গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রাতঃকালে কর্ম্ম করিতে যাইতে ও সন্ধ্যাকালে সন্তান প্রসব করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা প্রসব বেদনা কিছু মাত্র ভোগ করে না, এবং সূতিকাগারেও অবরুদ্ধ থাকে না, আবার পর দিবস সেই শিশুকে লইয়া কর্ম্ম স্থলে উপস্থিত হয়। ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্যের কিছু ক্ষতি হইতে পারে এবং শিশু পালনের নিয়ম তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে জানা যায় যে, সন্তান প্রসব করিতে হয় বলিয়া তাহারা পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

আমাদিগের ও ইংরাজ প্রভৃতি সভ্য দেশে, স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করে না। তাহারা বিলাসপ্রিয় ও অস্মদ্দেশে একেবারে স্বাধীনতা-বিবর্জ্জিত। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় আমাদিগের রমণীগণ একেবারে পরিশ্রম রহিত হয় এবং কদাপি এক বিন্দু পরিষ্কার বায়ু সেবন করিতে পায় না। অনেক ভাগ্যবন্তের পুরস্ত্রীগণ নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও প্রসবকালে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং পীড়াগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেন ও সন্তান ধনেও কখন কখন বঞ্চিতা হন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দিন রাত্র দূষিত বায়ু সেবন করেন ও একেবারে পরিশ্রম বিবর্জ্জিতা হইয়া বিলাস পুত্রী হইয়া থাকেন। এই সময়ে পরিশ্রমের ও বাহিরের নির্ম্মল বায়ু সেবনের প্রয়োজন হয়, এবং মনের অবস্থাও ভাল রাখিবার আবশ্যকতা থাকে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে এমন কিছুই লক্ষিত হয় না যাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান নহে। যদি এই অবস্থাকে পীড়ার মধ্যে গণনা করা যায়, তাহা হইলে যেমন পুরুষের পীড়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী, রমণীগণের গর্ভবতী হওয়াও তদ্রূপ বলাতে ক্ষতি কি?

স্ত্রীজাতি প্রতিমাসে ঋতুবতী হয় বলিয়া কেহ কেহ তাহাদিগের বিশেষত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্তান প্রসব করিতে হইলে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইতর প্রাণীগণ এ প্রকার রীতিমত সময়ে ঋতুবতী হয় না, যে সময়ে তাহারা গর্ভবতী হয় কেবল তাহারই পূর্ব্বে ঋতুবতী * হয়, এবং কেবল এই সময়েই তাহারা পুরুষ সহবাস বাঞ্ছা করিয়া থাকে। মনুষ্য সামা-

* ইহাকে ইংরাজিতে Heat or Rut কহিয়া থাকে।

জিক জীব এবং তাহারা সর্ব্বদা পুরুষ সহবাস ইচ্ছা করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের সন্তান প্রসব করিবার অবস্থা অর্থাৎ গর্ভবতী হইবার সম্ভাবনাও সেই কারণে অধিক হওয়া আবশ্যক। এই প্রয়োজন নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ প্রতিমাসে যাহাতে সংসাধিত হয়, এই জন্য তাহারা প্রতিমাসে ঋতুবতী হয়। প্রয়োজন সংসাধিত হইলে, অর্থাৎ স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে আর তাহারা ঋতুবতী হয় না।

স্ত্রীজাতির স্তন থাকা বশতঃ যাঁহারা তাঁহাদিগের আকৃতিগত বৈষম্য দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সন্তানের পালন জন্য অবশ্য পয়োধারী-স্তনের প্রয়োজন। স্তন-যুগ যে কেবল সন্তান পালনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলেই কেবল তাহাতে দুগ্ধের সমাবেশ হয়। আরও, স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধের সমাবেশ হয় বলিয়া এবং তাহার গঠন সন্তানের পালনোপযোগী বলিয়া সন্তান পালন যে কেবল স্ত্রীজাতিরই কার্য্য, তাহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়। এই সন্তান পালন করিতে কিছু পার্থক্য ঘটে বলিয়া তাহারা যে পুরুষ হইতে ভিন্ন প্রকারে সৃষ্ট, তাহা স্থির করিবার কোন পূর্ব্বপক্ষ নাই।

যে যে বিষয়ের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, তাহাতে এমন কোন কথা নাই যাহাতে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতির মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য নির্ণয় করা যাইতে পারে, —যে দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন তাহারা অবশ্য পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে। উভয় জাতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু সে টুকু না থাকিলে সংসার কখনই চলিতে পারিত না, এবং তাহাতে এমন কোন সামগ্রীর অভাব নাই, যাহার জন্য নারী-জাতি অবশ্য পুরুষের অধীন থাকিবে। সমাজের অনুরোধে গৃহযাত্রা নির্ব্বাহের সৌকর্য্যার্থে ও বংশ রক্ষার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে উভয় জাতিই পরস্পরের অধীন। কিন্তু তাহা বলিয়া পুরুষেরা তাহাদিগের উপর একাধিপত্য করিবে, আর স্ত্রীজাতি দাসানুদাসের ন্যায় তাঁহাদিগের সেবা করিবে, তাহার তাৎপর্য্য কি? যে পার্থক্যটুকুর কথা বলা হইল, তাহাতে উভয়েই উভয়ের অধীন সুতরাং যে কারণে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য করেন, নারীজাতিও সেই কারণে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ সমান আধিপত্য করিতে অধিকারিণী। তথাপি কেন যে মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে কোন কোন দেশে স্ত্রীগণ পুরুষের অস্থি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে,* এই প্রকার বিশ্বাস চিরপ্রচলিত, তাহা অনুমান করা সুকঠিন।

যে প্রণালীতে সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পার্থক্য অনিবার্য্য। সকল বিষয়ে বৈষম্য না থাকিলে অর্থাৎ সকল সৃষ্ট পদার্থ সমান হইলে হয় ত এত বড় প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্যাপার রচনার প্রয়োজন হইত না। বোধ হয়, জগতে এমন সামগ্রী নাই, যাহারা পরস্পর একেবারে সর্ব্ববিধায়ে সমান ও সর্ব্ব প্রকার পার্থক্য বিবর্জ্জিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অর্থ এপ্রকার নহে যে, সেই বৈষম্য নিবন্ধন কেহ কাহারও উপর আধিপত্য

* বাইবেলের মতে পরমেশ্বর আদি পুরুষ আদমের পঞ্জর হইতে একখানি অস্থি লইয়া আদিনারী ইভ্‌কে সৃষ্ট করেন এবং আদমের সুখসৌকর্য্যের নিমিত্তই তাঁহার জন্ম।

করিবে। সকলের অধিকার সংসারে সমান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপন অধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য কাহারও স্বাধীনতা ইত্যাদি হরণ করা মহাপাপ। সভ্য ইউরোপীয়গণ প্রত্যেক মনুষ্যের অধিকার বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা যত্নবান হইয়া দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন, এবং জগদ্বিখ্যাত উইলবারফোর্স, ওয়ালপোল প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কিন্তু আক্ষেপের মধ্যে এই যে, সংসারের অর্দ্ধেক লোক যে দাসত্বে নিয়োজিত, তাহার অপনোদনে এপর্য্যন্ত পুরুষের নিদ্রা ভাঙ্গিল না;—বোধ হয় তাঁহারা স্বার্থ ত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। পুরুষেরা যে রমণীজাতির উপর অন্যায় আধিপত্য করিতেছে, ও তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে আপনার করতলে রাখিয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কেবল যাহাতে আপনার অধিকার, তাহাতে অন্যকে অধিকারী করিতে অনিচ্ছা বশতঃ সংসারের আজ এরূপ দুরবস্থা। আপনার অধিকার ত্যাগ যে কি কষ্টকর, তাহা সভ্যমাত্রেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই অন্যকে দূরীত করিয়া কেবল আপন অধিকার বিস্তারে যত্নবান আছেন। কিন্তু প্রকাণ্ড ভ্রম এই যে, আপনার অধিকারভুক্ত বলিয়া লোকে যাহা বিবেচনা করে, বাস্তবিক পুরুষকে কেহ কখন তাহা দেয় নাই, ও স্ত্রীজাতির উপর আধিপত্য, কি ন্যায়তঃ কি ধর্ম্মতঃ, কখনই তহাদিগের অধিকারভুক্ত নহে। সুতরাং যাহা নিজের নহে, তাহা আপন কর কবলে রক্ষা করা অবশ্যই গর্হিত ও নিন্দনীয়। পরন্তু যাহাতে যাহাতে পুরুষের অধিকার, তাহাতে তাহাতেই যদি স্ত্রীজাতি অধিকারিণী হয়, তাহা হইলে জগতের বিস্তর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; এবং পুরুষেরও বিস্তর পরিমাণে চিন্তা ও পরিশ্রমের হ্রাস হইয়া নানাপ্রকার সুখসৌকর্য্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু চিরকালের অভ্যাস দোষে পুরুষের স্বভাব এমনই চমৎকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সংসারক্ষেত্রে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পারে না, এবং আপন মঙ্গলের জন্য অন্যে তাহার সমান হইলে সে মঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখে নাই। যাহা একা সম্পন্ন করিতে কষ্টবোধ হয়, তাহাতে অন্যে সহায়তা করিলে যে সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এক্ষণে যে সকল কার্য্য পুরুষকে একা করিতে হয়, তাহা যদি নরনারী উভয়ে মিলিয়া করে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। বিখ্যাত দার্শনিক মিল যৎকালে স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন, তৎকালে তাঁহার ভার্য্যা বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি তাঁহার ভার্য্যা সে সাহায্য দানে অধিকারিণী না হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই পুস্তকখানি এখনকার মত সুন্দর হইত না। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে সংসারের যে বিস্তর উপকার হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন, কারণ আজ কালি প্রায় বিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে, উভয়ে সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে যেমন সুন্দর হয়, একা তদ্রূপ হয় না, এবং উভয়ে কোন কার্য্য করিলে এক জনের অবিরত চিন্তা ও শ্রমের লাঘব হইয়া উভয়েরই স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়।

যত দিন না স্ত্রীজাতিকে সকল বিষয়ে

পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়, ততদিন মনুষ্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাবৎকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল কার্য্য স্বাধীন ভাবে সম্পাদিত না হয়, ততদিন মনুষ্য সমাজ সুন্দররূপে গঠিত হইতে পারে না। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন যে, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সে সমাজের অধঃপতনের বিস্তর বিলম্ব নাই। সমগ্র মনুষ্য সমাজে অর্দ্ধেক লোক একেবারে কার্য্য করিতে পায় না—স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার কথা একেবারে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মমাত্রেই তাহারা বঞ্চিত। সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণে কার্য্যের উৎকর্ষ সাধনের আশা করা যাইতে পারে, সমাজ তাহাতে বঞ্চিত হইয়া আছে। যদি সমগ্র নরনারীতে এই সমাজ রচিত হইত, তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম, দিন ও রাত্রে প্রয়োজন কি, দারিদ্র্য ও সম্পদে প্রভেদ কি, পশু ও মনুষ্যে কতদূর সম্পর্ক।

মনুষ্য মাত্রেই সমাজের নিকট দায়ী; কেন না মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজ ভিন্ন তাহার অন্য রঙ্গভূমি নাই। যেমন ফল দেখিলে বৃক্ষের নির্ণয় হয়, তেমনই ব্যক্তি বিশেষকে পর্য্যালোচনা করিলে তিনি কোন্ সমাজে কি প্রকারে শিক্ষিত, তাহা সহজে স্থির করা যাইতে পারে। জলাশয় অতিক্রম করিবার সময় যেমন কোন এক সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে রাঢ়ীয়কে বাছিয়া লওয়া সহজ হইয়াছিল, সেই রূপ এক সমাজের লোককে অন্য সমাজ হইতে বাছিয়া লওয়াও সহজ। সমাজ হস্তীও নহে অশ্বও নহে—তোমাকে আমাকে শ্যামকে রামকে লইয়া সমাজ। তুমি যাহা করিবে, তাহাতে আমি বা তিনি কোন কথা না কহিলেই তোমার সেই কার্য্য সামাজিক কার্য্য হইল, এবং তাহাতে তোমার আমার তাঁহার ও অন্য সকলের সুখ দুঃখ কিছু দিনের জন্য নির্ভর করিতে চলিল। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন আমরা, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সকলেই অল্প বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিতেছি। এই ক্ষতি কেবল তুমি বলিয়া নহে, বাঙ্গালী বলিয়া নহে, সমগ্র জগতের লোকেই স্বীকার করিতেছে। সমস্ত জগতের লোকে মিলিত হইয়া বিষয় বিশেষের সাম্য হেতু যে এক মনুষ্য সমাজ রচিত হইয়াছে, সেই মনুষ্য সমাজ এই বিষয় ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। কিন্তু কি করিব? আমি সামাজিক জীব—সমাজকে ভয় করিয়া, মান্য করিয়া, পূজা করিয়া আমার দিন যাইতেছে? দেবতাকে যত না ভয় করি, সমাজকে তাহার সহস্র গুণ অধিক ভয় করিয়া আমার দিন যাইতেছে। সুতরাং এই জীবনে, এই সামাজিক জীবনে আমার যাহা কার্য্য, আমার যাহা করণীয়, তাহা কামিনীর সহিত ভাগ করিয়া করিতে পারি না, এবং এই সমাজের ভয়েই আবার তাহার কার্য্যেরও অংশ লইতে পারি না। পক্ষান্তরে কামিনীও সমাজের ভয়ে আমার কার্য্যের অংশ লইতে ও আপন কার্য্যের অংশ দিতে পারে না এবং এই অংশের আদান প্রদানে যে উভয়ের অবস্থার সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা, তাহারও শিরে কুঠার পড়িয়াছে। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ নারী জাতি। পক্ষাঘাতে যেমন মনুষ্যের অর্দ্ধেক অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া

থাকে, সেই প্রকার লোক সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ নির্জ্জীব হইয়া পক্ষাঘাত-প্রপীড়িত হইয়া আছে। যে অর্দ্ধাঙ্গ নির্জ্জীব হইয়া রহিয়াছে, সে অঙ্গে যদি ঔষধি লেপন করা হয়, তাহা হইলে সমাজ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইতে পারে এবং সমাজের উন্নতিতে মনুষ্য বিশেষেরও উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীজাতির উন্নতি ও তাহাদিগের মনুষ্য মধ্যে পরিণতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমাদিগের নিজের সুবিধার জন্য তাহাদিগকে আমাদিগের কার্য্যের অংশ দেওয়া যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহাতে বোধ হয় এই ঊনবিংশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আর কেহ সন্দেহ করেন না। তবে কি উপায়ে স্ত্রীজাতির অবস্থা উন্নত করিয়া পুরুষের ন্যায় করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। একেবারে শারদীয় সপ্তমী পূজার দিবস তাহাদিগকে পুরুষের সহিত সমান সত্ব প্রদান করিলে চলিবে না। যেমন বহুদিনের উপবাসের পরে গুরু আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত বিঘ্নজনক, তদ্রূপ অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে একেবারে প্রোজ্জ্বল হুতাশন সমক্ষে আনয়ন করিলে তাহাদিগের চক্ষের মাথা খাওয়া হইবে এবং সহস্রাধিক বৎসরের আবদ্ধা বিহঙ্গিনীকে একেবারে কাননে ছাড়িয়া দিলে অনায়াসে হস্তে পিঞ্জর দিয়া উড়িয়া যাইবে। কিছু দিবস তাহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, যেখানে যাইবে সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় যাইতে হইবে, যে চিন্তায় ভ্রান্ত হইবে, তাহা সংশোধন করিয়া দিতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে শিশুর ন্যায় রাখিয়া অতি যত্নে তাহাদিগের মনোবৃত্তি সকলের সংস্কার ও পুষ্টি সাধন করিতে হইবে। বালককে সন্তরণ শিখাইতে হইলে যেমন অল্প জলে তাহাকে ধরিয়া ভাসাইতে হয়, সন্তরণ-পটু হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, তদ্রূপ অশিক্ষিতা রমণী জাতিকে জলে আনিয়া অল্প অল্প করিয়া অঙ্গ চালনা করিতে শিখাইতে হইবে, ও সংসার সাগরে সন্তরণ দিতে শিখিলেও কিছু কাল তাহার সঙ্গে আপনাকেও সাঁতার দিতে হইবে, কারণ সংসার-সাগর অতল ও বিস্তর হাঙ্গর কুম্ভীর পূর্ণ—এখানে একবার ডুবিলে আর তুলিতে পারা যায় না।

উষ্ণশোণিত নব্য সম্প্রদায় অধীর হইয়া বহুদিবসের পীড়া একদিনে আরোগ্য করিতে চাহেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সন্তরণ শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া অনেক সাধের, অনেক যত্নের জগতের সার রত্নটী একেবারে অগাধ জলে ছাড়িয়া দেন, আর রত্নটী ডুবিয়া যায়। অবশেষে তাঁহাকে কুলে দাঁড়াইয়া কপোলে করবিন্যাস করিয়া ভাবিতে ভাবিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

সমাজ সংস্থাপনের দিবস হইতে যে কুপ্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অপনোদন করা এবং উৎপাটন করিয়া এক দিবসে সমাজ সংস্কৃত করিবার আশা নিতান্ত দুরশা মাত্র। এমন আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। এখন হইতে সমাজ গঠন আরম্ভ হইলে, অদ্য হইতে স্ত্রী পুরুষের সত্ব সমান করিতে প্রয়াস পাইলে, যদি শত বৎসরের মধ্যে তারতম্য রহিত হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। আদিম অবস্থা হইতে সমাজের শরীরের যে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাটন করা যাইতে

পারে না। যাঁহারা একদিনে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এপ্রকার করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত বলিতে হইবে। কোন না কোন সময়ে এক এক করিয়া এক এক বিষয়ে স্ত্রীপুরুষকে সমান সত্বাধিকারী হইয়া কার্য্য করিতে দেখিলে আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইব। ব্যাকরণ অভিধানে পর্য্যন্ত যাহারা পৃথকপ্রাণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য উচ্ছেদ করিতে অনেক সময় লাগিবে—তাহাতে আমরা অধীর নহি; সামঞ্জস্যের স্রোত মৃদু মন্দ চলিতে দেখিলেও তাহার প্রতিকূলে কেহ না দাঁড়াইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

সংস্কৃত শিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব—টোলশিক্ষা)

বাঙ্গালায় সংস্কৃত শিক্ষার চারি প্রকার উপায় আছে। টোল, সংস্কৃতকলেজ, মূলাজোড় সংস্কৃতকলেজ ও ইউনিবর্সিটি। এই চারি উপায়ের কোনটীতে কিরূপ সংস্কৃত শিক্ষা হয়, এরূপ সংস্কৃত শিক্ষিত লোক দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার হয়, ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি? এবং পরিণামে সংস্কৃত শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগের কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা; সংস্কৃত চর্চ্চা বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হওয়ার উপায় কি; লাভ কি; ও অন্তরায় কি? নির্ণয় করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বিষয় নিতান্ত গুরুতর, এ প্রস্তাব লিখিতে হইলে যতদূর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, প্রস্তাব-লেখকের তাহা নাই, তথাপি এ সকল কথা আর কেহ কয় না বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কোন অকাট্য সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন। তবে সংস্কৃত চর্চ্চা বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

টোলশিক্ষা। গত ১৫।১৬ বৎসর মধ্যে টোলের শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে বাল্যকালে ব্যাকরণ-অভ্যাস অর্থাৎ মুখস্থ করিতে ৮ বৎসর বয়স হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত লাগিত। ব্যাকরণের অর্দ্ধেকের অধিক মুখস্থ হইলে ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত, সমগ্র ব্যাকরণ ব্যাখ্যায় ১৬। ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত লাগিত। অধিকাংশ ছাত্রই ব্যাকরণ শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনভাগের দুইভাগ পড়িয়াই শাস্ত্রান্তর আরম্ভ করিতেন। যাঁহারা ব্যাকরণ শেষ পর্য্যন্ত পড়িতেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বড় পণ্ডিত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস হইত। ব্যাকরণের পর ভট্টী চারি পাঁচ সর্গ, ব্যাকরণের উদাহরণ স্বরূপ পড়িতে ১ বৎসর লাগিত। তাহার পর অমরকোষ মুখস্থ ও ব্যাখ্যা ২।৩ বৎসর, কাহারও অমরকোষ শেষ হইত, কাহারও হইত না। অমরকোষের পরই কে কোন্ শাস্ত্র পাঠ করিবে, তাহা নির্ণয় হইত। যদিও অনেক নৈয়ায়িক ব্যাকরণ সমাপ্তির পূর্ব্বেই ন্যায় আরম্ভ করিতেন এবং ভট্টী ও অভিধানে উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু উহা প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না। অভিধানের পরই হয় কাব্য, নয়

তি, না হয় ন্যায় পাঠ আরম্ভ করা প্রশস্ত ছিল। যাঁহারা কাব্য পড়িতেন, তাঁহারা রঘু ৫ সর্গ, কুমার ৪ সর্গ, মাঘ ২ সর্গ, ভারবি ২ সর্গ, শকুন্তলার ২ অঙ্ক ও নৈষধের ষষ্ঠ পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন। ইহার অধিক কাব্য কোথাওই পড়া হইত না। কাব্য পাঠেও দ্ব্যর্থ নির্ণয়, কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অন্যরূপ অর্থ করা, যে শ্লোকের অর্থ সহজ ও সুগম তাহার ভিতর ন্যায়শাস্ত্রের কথা ঘটান প্রভৃতিই বাহাদুরী বলিয়া বোধ হইত। যে শ্লোকের ললিত পদাবলীবদ্ধ সেই গুলির প্রতিই অধিক লক্ষ্য থাকিত; ভাব, কল্পনা, রুচি বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। যাঁহারা কাব্য পড়াইতেন, তাঁহারাই ব্যাকরণ পড়াইতেন, সুতরাং কাব্যের স্বতন্ত্র টোল ছিল না; ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে কাব্য ও ব্যাকরণের পণ্ডিত হেয় ছিলেন। নিজ সমাজ ভিন্ন তাঁহাদের পত্র হইত না, হইলেও বিদায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পাইতেন, বিদেশী ছাত্র প্রায় রাখিতে পারিতেন না। অধিকাংশ ছাত্রই দেশী হইত। উদরান্নের সংস্থান না থাকিলে ব্যাকরণের টোলে কখনই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুজরান হইত না। যাঁহারা স্মৃতি পড়িতেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের উদ্বাহ তত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব, এই পাঁচ সাত খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াই পাঠ সমাপন করিতেন। যাঁহারা অধিক জ্ঞানার্থী হইতেন, তাঁহারা শূলপাণি প্রণীত কয়েকখানি স্মৃতি বিবেক দায়ভাগ দত্তক মীমাংসাও পাঠ করিতেন। স্মৃতির ছাত্রেরা ৩০ বৎসরের নীচে পাঠ সমাপন করিতে পারিতেন না, একজন স্মৃতির ছাত্র এবার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার বয়স ৩৯ বৎসর, এখন তিনি টোল করার ইচ্ছা করিতেছেন। স্মৃতির পণ্ডিতদিগের মান ব্যাকরণওয়ালাদিগের অপেক্ষা অধিক ও নৈয়ায়িকদিগের অপেক্ষা অল্প ছিল, তাঁহারা দ্বিতীয়শ্রেণীর বিদায় পাইতেন। কিন্তু ব্যবস্থা দেওয়া তাঁহাদের আর এক ব্যবসায় ছিল, উহাতে যে তৌলবট্ পাইতেন তাহাতে তাঁহাদের লাভও হইত। স্বসমাজ ও ভিন্ন সমাজ সর্ব্বত্রই স্মৃতির অধ্যাপকদিগের পত্র হইত।

ন্যায়শাস্ত্র যাঁহারা পড়িতেন, তাঁহাদের অনেকে ব্যাকরণও সমাপন করিতেন না, অধিকাংশই অভিধান সমাপন করিয়াই ন্যায়ের টোলে যাইতেন। প্রথম ভাষা পরিচ্ছেদ; সকলে ভাষা পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্তও পড়িতেন না, অনুমানের কথা পড়িবামাত্র ভাষা ত্যাগ করিতেন। তাহার পর ব্যাপ্তি পঞ্চক, সিদ্ধান্ত লক্ষণ, অনবচ্ছেদক স্মরণ অবয়ব, সামান্য নিরুক্তি সব্যভিচার কেবলান্বয়ী প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় পড়িয়া অনুমান খণ্ড সমাপ্ত করিতেন। "কয়েকখানি গ্রন্থ" না বলিয়া "কয়েকটী বিষয়" বলার তাৎপর্য্য আছে। ব্যাপ্তি পঞ্চক প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, একখানি গ্রন্থের অধ্যায় মাত্র। মূল গ্রন্থ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সংগ্রহ গ্রন্থ তাহার নাম তত্ত্ব চিন্তামণি, তাহার অনেকরূপ টীকা আছে। এ গ্রন্থ প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে চারিখণ্ডে বিভক্ত। ইহার মধ্যে অনুমান খণ্ডই পাঠ্য, অনুমান খণ্ডের বঙ্গদেশ প্রচলিত টীকার নাম অনুমানচিন্তামণিদীধীতি, ঐ টীকার প্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি। নিবাস নবদ্বীপ, দীধীতির আবার জগদীশ প্রণীত টীকা আছে। এখন যে ভাষা পরিচ্ছেদ সাঙ্গ করিয়া বা ত্যাগ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ করিলেন,

তাহাকে, মূল, শিরোমণি, জগদীশ তিনখানি পুঁথি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথম গুরুকে অভিবাদন করিয়া মূল খুলিলেন, ইংরেজী-ওয়ালা মনে করিবেন যে, মূল বুঝি গোড়া হইতে পড়া হইবে, তাহা একেবারে নহে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২।৩ পাত বাদ দিয়া মূল পুঁথিতে ব্যাপ্তি পঞ্চকের যে কয়টী কথা আছে, তাহাই পড়াইলেন। তাহার পরে বলিলেন শিরোমণি খোল। তাহাতে অবশ্য মূল হইতে অনেক অধিক কথা আছে। তাহা পড়া হইল; এই দুই পড়াইতে ১৫ দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, জগদীশ খোল, তাহার পর সেই মূলের কয়টী কথা ও শিরোমণির কয়েক পৃষ্ঠার উপর জগদীশ যে এক গঙ্গা লিখিয়াছেন, তাহা পড়াইতে ছয় মাস কাটিয়া গেল, তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুখে মুখে জগদীশের উপর আবার যেখানে যে ফাঁকি হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা তাহা শিখাইয়া দিলেন। সিদ্ধান্ত লক্ষণটী মূলে ২ ছত্র শিরোমণিতে ৯ পাতা ও জগদীশে ৩০ পাতা, অথচ শিরোমণির পাত মূলের পাতের দ্বিগুণ এবং জগদীশের পাত শিরোমণির পাতের দ্বিগুণ, এইরূপ পড়িতে পড়িতেও ফাঁকি শিখিতে শিখিতে অনুমান খণ্ড শেষ হইল, অনেকের পাঠও এইখানে শেষ হয়, কিন্তু অনেকে আবার শব্দ খণ্ড পাঠ করেন এবং তৎপরে কয়েকখানি বাদ গ্রন্থ অর্থাৎ (Dessertation) পড়িয়া পাঠ সমাপন করেন। শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ ও কুসুমাঞ্জলি প্রায় এশ্রেণীর সকলেই পড়েন। পাঠশেষ করিতে তাহাদের বয়স ৩৫।৩৬ হয় কখনও আরও অধিক হয়। এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই অধ্যাপক হইয়া ব্যবসায় করিতে বসেন। ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে অনেকে আরও পাঠ করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকদিগের এদেশে বড় মান্য, তাঁহারা অত্যন্ত দাম্ভিক। আর কাহাকেও পণ্ডিত বলিয়া গ্রাহ্যই করেন না। ইহাদের বিদায় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। নবদ্বীপ বাদীয় ন্যায়ের মূলক্ষেত্র, এই জন্য নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক অন্য নৈয়ায়িক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হউন আর নাই হউন, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিদায় পান; ১০০ টাকা প্রধান বিদায় হইলে, নবদ্বীপের প্রধান বিদায় ১০১ টাকা হইবে।

এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষী এবং পৌরাণিক নামক দুই শ্রেণীর ভট্টাচার্য্য আছেন, তাঁহাদের অধ্যাপক বলা যায় না, তাঁহারা বিদায় পাইতে অধিকারী নহেন। জ্যোতিষীদিগের কিরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবন্ধলেখক সবিশেষ অবগত নহেন। পৌরাণিকেরা কেহ ব্যাকরণ, কেহ বা কাব্য পাঠ সমাপন করিয়াই পুরাণ পাঠ আরম্ভ করেন। পাঠ করাই ইহাদের ব্যবসায়, পুরাণ হইলেই তিন জন পৌরাণিক চাহি; একজন ধারক, একজন পাঠক ও একজন শ্রোতা। রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ পাঠই ইঁহাদের কার্য্য, তজ্জন্য ইহারা পারিশ্রমিক স্বরূপ দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

আমরা টোল সম্বন্ধে এখন যে সকল কথা বলিতে ছিলাম, তাহা ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ব্যাকরণ শেষ করিতে ১৭।১৮ বৎসর বয়স হইত। স্মৃতি শেষ করিতে ২৭।২৮ ও ন্যায় শেষ করিতে ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স হইত, কিন্তু এই ১৫।১৬ বৎসর বয়সে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন আর তত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে গ্রন্থ গুলি পাঠ করার প্রবৃত্তি নাই।

অল্প সময়ে অনেক বিষয় পাঠ করার প্রবৃত্তি অধিক হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ ইংরাজীবিদ্যার বহুল প্রচার। টোলে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাকরণ শেষ হইল না, অথচ স্কুলে লোকে ঝুড়ি ঝুড়ি পুঁথি পড়িয়া ফেলিল। দেখিয়া শুনিয়া সহ্য করা যায় না। ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন টোলে পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায়ও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যে নানাস্থানে টোলের পরীক্ষা চলিতেছে। কলিকাতার ১ম সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষিণী সভার পরীক্ষা ও তৎপরে গবর্ণমেণ্টের টাইটেল পরীক্ষা এবং ঢাকার স্বারস্বত সমাজের পরীক্ষা, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও ছোট ছোট পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাটপাড়ার ব্যাকরণ পাঠীদিগের একটী ত্রৈমাসিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে পরীক্ষা ছিল না, অধ্যাপক পাঠ সমাপন হইলেই ছাড়িয়া দিতেন, উপাধিও তিনিই দিতেন। বিচার সভাই পরীক্ষাস্থল ছিল। বিচারস্থলে হারুক আর জিতুক, যে ছাত্র আপন বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিতে পারিল, তাহার নাম বাহির হইয়া পড়িল। এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ পড়িয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষার সহজ ও কঠিন দুই প্রকারের প্রশ্নই থাকে, সহজ প্রশ্ন কয়টা লিখিতে পারিলেই পাশ হইল। বিচারের অতি দুরূহ কথার জবাব দিতে হইত, সুতরাং অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইত। বাস্তবিক একটুকু গভীরতার প্রয়োজন হইত, এখন একটুকু চালাকী থাকিলে ২।৩ মাস পড়িয়া সকল পরীক্ষাই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বাস্তবিক ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের যেরূপ অবস্থা, টোলেও প্রায়ই তাহাই হইয়া আসিতেছে। তখনকার টোলের ছাত্রদিগের সংস্কার আজন্ম স্থায়ী হইত। এখনকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় যে দিন পরীক্ষা দিয়া বাহির হইল, সেই দিন হইতেই ভুলিতে আরম্ভ করিল। এখন ন্যায় শাস্ত্র দুঃসাধ্য বলিয়া প্রায় পড়ে না। ন্যায়ের টোলে ছাত্র মিলে না। প্রাচীন জনকত নৈয়ায়িকের এখনও আদর আছে, কিন্তু ন্যায়ের উপর পূর্ব্ব শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়াছে। স্মৃতির টোলে ছাত্র অধিক। ক্রমে স্মৃতির আদরও অধিক হইতেছে, প্রাচীন স্মৃতি অধিক পরিমাণে পঠিত হইতেছে। স্মৃতির মান ও বাড়িয়াছে। কাব্যটোলে ছাত্র ধরে না। ৫।৭ খানা কাব্য ভাল করিয়া না পড়া থাকিলে পণ্ডিত সমাজে মুখ দেখান ভার হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যের পণ্ডিত ব্যাকরণের পণ্ডিত হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। ও তাহার মান্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক কাব্যের টোলে অলঙ্কার, যাহা ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে আদৌ ছিল না, পঠিত হইতেছে ও স্মৃতির সংহিতা গীতা প্রভৃতিও পাঠ করা হয়। ব্যাকরণের টোলে ছাত্র অনেক হইয়াছে, কিন্তু তত যত্ন করিয়া ও তত অধিক দিন ধরিয়া কেহই আর ব্যাকরণ পড়ে না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মানব এবং মানবের ক্রিয়া।

এই ঘটনাময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ কোন পদার্থ নাই, যাহা কোন না কোন নিয়মের অনুবর্ত্তন না করে। তুমি আমি অনেক বিষয় আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিতে পারি না, আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অনেক দূরস্থিত পদার্থ কেবল গাঢ় অন্ধকার বলিয়া মনে করে, প্রকৃত পক্ষে আমরা কোন পদার্থ জানি আর নাই জানি, দেখি আর নাই দেখি, সত্বাশীল পদার্থের অস্তিত্ব সকল অবস্থাতেই রহিয়াছে।

কালের এক স্রোতের পর আর একটী স্রোত গড়াইয়া গিয়া অনন্তকাল-সাগরে মিশিতেছে, পৃথিবী নূতন অলঙ্কারে, নূতন সজ্জায়, নূতন পরিবর্ত্তনে সজ্জিত হইতেছেন; কোন স্থল বালুকাময় মরু ছিল, সুমিষ্ট জল পূর্ণ তড়াগে পরিণত হইল; কোন নিম্নতম সাগরতল উচ্চ শেখর পর্ব্বত রূপ ধারণ করিল, এ সমুদয়ই কোন না কোন প্রাকৃতিক নিয়মবলে ঘটিয়া থাকে।

অসভ্য আম মাংসভোজী, বৃক্ষ কোটরবাসী, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, পশুবৎ আচরণ বিশিষ্ট জাতি আজ সভ্য জগতের আদর্শ; আর সেই উচ্চ হৃদয়, বিশ্ববিস্তৃত প্রেম, আর্য্যদিগেরই বংশধর, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হৃদয়, শুষ্ক এবং প্রায় অজ্ঞান আমরা; ওদিকেও যে পরিবর্ত্তন এদিকেও সেই পরিবর্ত্তন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড়শক্তির সহিত জড়শক্তির যোগে বা জড়শক্তির সহিত জড়শক্তির বিয়োগে যেরূপ নূতন শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চৈতন্য বিশিষ্ট জীবদিগের ও শক্তিনিচয়ের বিকাশ, সঙ্কোচ বা একেবারে তিরোভাব, যোগ এবং বিয়োগ দ্বারা হইয়া থাকে। তাম্রকায় আমেরিকাবাসীর জিঘাংসা অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, আমেরিকা সদ্যজয়ের পরেই ইহাদের জিঘাংসা বৃত্তির যত প্রাবল্য দেখিয়াছিলেন; আজ তাহার অনেক অংশই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্য্যজাতি জগতে ক্ষমা এবং সত্য-প্রিয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, আজ তাঁহাদের সে উভয়গুণেরই অনেক হ্রাসতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে মানব শক্তিও বিশ্বব্যাপী কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তন করে।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভব, কিন্তু এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় বিষয় রহিয়াছে; এই সমুদয় অবস্থা প্রথম যে কারণ হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, এখন যে আবার তাহা পুনরায় রূপান্তরিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা মাত্রেই নাই। মানবের সামাজিক অবস্থা ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রথম কি কারণে মানুষ সমাজে বদ্ধ হইল, সে বিষয় নিয়া আমরা আজ তর্ক করিতে চাহি না, কিন্তু যে কারণেই হউক না কেন, পৃথিবীতে মানুষ আজ সামাজিক জীব, এবং যত দিন পৃথিবী আছে, তত দিন তাহার ঐ অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়ই থাকিবে। যে দিন হইতে সে এ অবস্থায় আসিয়াছে, ঘটনাস্রোত মুখে তাহার কোন একটী প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কোন একটী বা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পঞ্চ

শতাব্দীর এক জন মানুষ আর আজিকার এক জন মানুষ এক প্রকৃতির লোক নহেন।

মানবের শক্তি নিচয় যে কেবল শতাব্দী শতাব্দীতে, কিম্বা পুরুষে২ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নহে; জীবনের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব জন্ম, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন, আজ তুমি বিলাসের সংসারে ভাসিয়া চলিয়াছ, ইন্দ্রিয়-সুখ ব্যতীত অপর লক্ষ্যে তোমার দৃষ্টি নাই, হঠাৎ তুমি একটী মৃত দেহ দেখিলে কিম্বা এরূপ একটী ঘটনা তোমার সম্মুখে পড়িল যে, তোমার বিলাস বাসনা তোমাকে পরিত্যাগ করিল; সে মুহূর্ত্তে তুমি উদাসীন, জগৎ সংসার তোমার চক্ষে কিছুই নহে, ভোগ বাসনা আত্মার অজ্ঞানতা মাত্র; হয়ত বা ঘটনা পরম্পরায়, বা চিন্তা পরম্পরায় এই ভাবই তোমার মনে দীর্ঘ কালের নিমিত্ত স্থায়ী হইল, অথবা আবার পর মুহূর্ত্তেই তোমার অস্থির মনে অপর ভাব প্রবেশ করিল, তোমাকে আবার আর এক প্রকার করিয়া তুলিল। কিন্তু এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের একটী না একটী কারণ আছে; আমরা মানব জীবনের সেই নিয়ম তন্ত্রীর একবার অনুসন্ধান করিব।

জীবন বলিলে সাধারণতঃ দুইটী অর্থ বুঝায়; ১ম, কোন ব্যক্তি বিশেষের এই পৃথিবীর অবস্থিতি কাল; ২য় এই অবস্থিতি কাল মধ্যে তাহার সম্বন্ধীয় ঘটনা সমষ্টি। এই দ্বিতীয় বিষয়টী আমাদের আলোচনার বিষয়।

মানুষ অনন্ত শক্তি সম্পন্ন পদার্থ; এই শক্তি নিচয় তাহার ক্রিয়া হইতে আমরা জানিতে পাই। কবিতা কবির হৃদয়ের ফটোগ্রাফ মাত্র; এক খানি অর্ণবযান, একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মাতার মানসিক লিপির অনুলিপি মাত্র,—কল্পনা এবং ধারণার প্রসব। অপরকে দুঃখিত দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করা, হৃদয়ে দুঃখের পরিচায়ক।—সহানুভূতির প্রসব। এইরূপ মানবের ক্রিয়ায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দেখিতে পাই। এই সমুদয় শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিলে তাহাদের আলোচনার পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ইহার এক শ্রেণীকে জ্ঞান শক্তি, অপর শ্রেণীকে নৈতিক শক্তি আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার মধ্যে নৈতিক শক্তিই মানব জীবনের প্রধান অবলম্বন; দয়া দাক্ষিণ্য, সহৃদয়তা, বন্ধুতা, সত্যপ্রিয়তা, প্রভৃতি নৈতিক শক্তির প্রসব; এই শক্তি দ্বারাই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, এবং এই শক্তিবলেই এক-জন পৃথিবীর মানুষ স্বর্গের দেবতা অপেক্ষাও আরাধ্য হইয়া থাকেন। এ সংসারে পণ্ডিত প্রধান শঙ্করাচার্য্য, জ্ঞানযোগী গৌতম, যোদ্ধৃমধ্যে খ্যাতনামা নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরপুরুষগণ যেখানে সেখানে কিম্বা যখন তখনই জন্ম গ্রহণ করেন না; চতুর্দ্দিকে সমশক্তিমান পদার্থ কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিয়া, অগণিত সহযোগী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শির অধিকতর উন্নীত করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। প্রাধান্য অভ্রভেদী হিমাচল শিখরের ন্যায় দুরারোহ, সাধারণ লোকের দৃষ্টির অতীত, অনেকে তাহার উচ্চতা দেখিয়াই উদ্যমে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে।

কিন্তু চরিত্র গঠন করা এত দুরূহ ব্যাপার নহে; সংসারে পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, তাপিত হৃদয়কে দুটী শীতল কথা বলিয়া শীতল করা, পরকে তাহার অধিকার

হইতে বঞ্চিত না করা, এবং সকলকে তাহার নিজ অধিকারে নির্ব্বিবাদে অধিকারী হইতে দেওয়া তত অসাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে; এ সমুদয় কার্য্য মানব মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত, সুতরাং অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। যাঁহারা চরিত্র গঠনে অবহেলা করেন, তাঁহারা জীবনের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য অবহেলা করেন।

জ্ঞানশক্তিতে মানুষকে জয় করা বড় কঠিন কথা, পাপীকে পাপের কুফল বুঝাইয়া দিয়া অতি অল্পজ্ঞানীই পাপীকে পাপমুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু হৃদয়বান ব্যক্তি যখন পাপীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তখন পাপী সে অশ্রুতে গলিয়া যায়, তাহার কঠিন হৃদয় আর সে দ্রবত্বের নিকট কঠিন থাকিতে পারে না। জগতে বেদব্যাস অধিক কায করিয়াছেন, না চৈতন্যদেব অধিক কাজ করিয়াছেন? ব্যাসদেবের জ্ঞানময় গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বা কতলোক শান্তিলাভ করিয়াছে, আর চৈতন্যদেবের ভাবময় হৃদয় কাহিনীতে বা কত লোক উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে? ইহার একটী তালিকা ধরিয়া দেখুন, এপৃথিবীতে জ্ঞানশক্তির মাহাত্ম্য আছে, প্রাধান্য আছে, কিন্তু আকর্ষণ নাই, বিমোহিত করিবার ক্ষমতা নাই; আমরা চিরকাল এই পৃথিবীতে নৈতিক শক্তিরই জয় দেখিলাম।

এই সংসারে এরূপ লোক নাই যে, ইহাকে কোন না কোন কারণে বড় দুঃখের বলিয়া মনে না করে; কিন্তু আবার এরূপ লোক একটীও দেখিতে পাই না, যে এই দুঃখের সংসারকে সহজে ছাড়িয়া যাইতে পারে; সংসারের দুঃখ কষ্ট নিরাশা প্রভৃতি অপ্রিয় কণ্টকবৎ হইলেও এ উদ্যানে কতকগুলি সুখের ফুল প্রস্ফুটিত হয়, যে একবার সে সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছে, সে আর এ কণ্টকে ভীত হয় না। প্রায় সকলের জীবনেই এরূপ সময় উপস্থিত হয়, যখন এ জীবন ভার বহন করা বড় কষ্টকর হইয়া উঠে; এ সংসারকে ছাড়িয়া গিয়া অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে বাস করিতে বাসনা হয়; কিন্তু যখন আত্মীয় বান্ধবের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসা মনে পড়ে, তখন মন আবার আসিয়া এ সংসারের দাস হয়, দশগুণ বলে নিজের শিকল আরো শক্ত করিয়া পায়ে পরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে যদি কিছু আকর্ষণ থাকে, তবে সে হৃদয় শক্তির আকর্ষণ, যদি এ মরুকে কিছুতে ক্ষণকালের নিমিত্তও আকাঙ্ক্ষার স্থান করিয়া দেয়, সে সহযোগীদিগের দয়া দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, একতা প্রভৃতি গুণ। যদি এই পৃথিবীতে সকল লোক কেবল স্বার্থের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইত, এবং পরের দুঃখে কেহই দুঃখ প্রকাশ না করিত, তবে এ পৃথিবী কল্পিত নরকাপেক্ষাও ভয়ানক স্থান হইত। সমাজ মানুষের দুঃখ, আবার সমাজই মানুষের সুখ; কোন সময়ে মানুষ মানুষের, ব্যক্তি বিশেষের বা সমষ্টির ঔদাসিন্য, অসদভিপ্রায়, বা মূর্খতা হইতে কষ্ট পায় সত্য, আবার কোন সময়ে সেই সমাজেরই ব্যক্তিবিশেষের বা সমষ্টির, সম্মান, ভালবাসা, সহানুভূতি, ও সাহায্য প্রভৃতি পাইয়া সুখী হয়।

মানুষ মাত্রেই দুই শ্রেণী কার্য্যের কর্ত্তা, এক শ্রেণী সমাজের হিতকর, অপর শ্রেণী অহিতকর; এতদ্ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীর কোন কার্য্য এই পৃথিবীতে থাকিতেই পারে না। আবার প্রত্যেক সদসৎ কার্য্যই ত্রিবিধ, কোন স্থলে বা দ্বিবিধ ফলদায়ী; তুমি পরোপকারী, একজন দরিদ্রকে অর্থ দানে

সাহায্য করিলে; তোমার এই কার্য্যটী দ্বারা ১মতঃ উপকৃত ব্যক্তি সুখী হইল, দ্বিতীয়তঃ তুমি নিজে সুখী এবং উন্নত হইলে, তৃতীয়তঃ সমাজে একজন লোকের দরিদ্রতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত, আর একজনের হৃদয় উন্নত এবং অপর সহস্র লোকের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত সংস্থাপিত হইল। আর এক শ্রেণীর সৎকার্য্য,—যেমন ঈশ্বরারাধনা, বিদ্যা শিক্ষা; এই সমুদয় কার্য্যে আত্মোন্নতি দ্বারা নিজের উপকার এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ও সমাজের একজন লোকের উন্নত ভাব দ্বারা সমাজের উপকার হয়; এস্থলেও গৌণফল ত্রিবিধ, আমাদের প্রত্যক্ষ ফল দ্বিবিধ বলিয়া শেষোক্ত কার্য্য সমূহকে দ্বিবিধ ফলদায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। কর্ম্মযোগী এজগৎকে ত্রিবিধ ফলে এবং জ্ঞানযোগী এসংসারকে দ্বিবিধ ফলে উপকৃত করেন, এই জন্যে পৌরাণিক আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানযোগাপেক্ষা কর্ম্মযোগের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

অসৎ কার্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সে দিকেও এই কথা, এই নিয়ম; তোমা কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি অপকৃত হইলে তুমি অপকৃত ব্যক্তির অপকার করিলে, নিজের অপকার করিলে. এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজের অপকার করিলে; আর যদি নিজের অপকার কর, তবে তুমি নিজে অপকৃত হইলে এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ অপকৃত হইল। আর তোমার এরূপ কোন কার্য্য আছে যাহা এই শ্রেণীমধ্যে গণনা করা যায় না? অন্যায় ভোজন, অন্যায় পান, অনর্থক সময় ব্যয়, এ সমুদয় কার্য্যকে তুমি জগতের অনিষ্টকর মনে কর না, কিন্তু তোমার দৃষ্টি যদি তোমাকে ছাড়িয়া একপদ দূরের বস্তুও দর্শন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও তুমি দেখিতে পাইবে যে, তোমার মতের কত ভ্রান্তি; অসৎ সংসর্গে না পড়িয়া কত লোককে তুমি অসৎ হইতে দেখিয়াছ? মাদক এ পৃথিবীতে না থাকিলে কে মাতাল হইত? তুমি লোককে শিক্ষা দিয়া যে অনিষ্ট করিতে না পার, তোমার দৃষ্টান্তে তাহার দশ গুণ অনিষ্ট হয়।

স্বভাবে একটীর বেশী দুইটী নিয়ম নাই; এই অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যই প্রাকৃতিক নিয়মের গৌরব। দিন দিন জগতের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতেছে, বৈজ্ঞানিক জগতে যত নূতন সত্য দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই মানুষ দেখিতে পাইতেছে যে, অনবচ্ছিন্ন নিয়ম তন্ত্রীতে এবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আবদ্ধ। তোমার সুবিধা হউক আর অসুবিধা হউক, সে নিয়ম সূত্রে তোমার স্বেচ্ছাচারী পদযুগল আবদ্ধ হউক আর নাই হউক; বিশ্ব নিয়ন্তার নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, কোন কারণে, কোন অবস্থায় সে নিয়মের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইবার নহে।

বিষপানে মানুষকে কোন অবস্থায় মৃত কখনও বা জীবিত হইতে দেখিয়াছ, মাধ্যাকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও বেলুণ যন্ত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ব্যায়াম স্বাস্থ্যকর হইলেও, অসুস্থব্যক্তির পক্ষে অনিষ্টকারক। এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া তুমি বলিতে পার যে, স্বভাবের নিয়মেরও ব্যভিচার আছে; কিন্তু এই সমুদয় ব্যভিচার প্রকৃত ব্যভিচার নহে, কেবল তোমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের নিকট ব্যভিচার বলিয়া বোধ হয়। তুমি যাহাকে স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম বলিতেছে, তাহা দ্বারা এই মাত্র প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হয় তুমি স্বভাবের নিয়ম আজও প্রকৃতরূপে

বুঝিতে পার নাই, অথবা তুমি যে ভাষায় সে নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছ, সে ব্যাখ্যা সে ভাষায় বিশদরূপে পরিষ্কার হয় নাই।

বিষের যে উত্তেজনা শক্তির ক্রিয়া বলে বিষ প্রাণদায়ক, সেই বলেই আবার লোকের প্রাণহরণকারী। যে মাধ্যাকর্ষণ বলে ভারী বস্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, সেই বলের ক্রিয়াতেই আবার লঘু বেলুণ তাহাপেক্ষা গুরু পদার্থের নিমিত্ত স্থান ছাড়িয়া দিয়া বায়ু পৃষ্ঠে আরোহণ করে। যে ক্ষয় এবং পূরণের সমতা দ্বারা শরীর বলবান হয়, সেই ক্ষয় এবং পূরণের অসমতা হেতুই আবার অসুস্থ শরীর ব্যায়াম কর্ত্তৃক আরো অসুস্থ হইয়া পড়ে। যেরূপ আশু বিষম ফলদায়ক এই তিনটী বিষয়ে একই শক্তির ক্রিয়া দেখিলে, সেরূপ জগতের প্রত্যেক কার্য্যে এই অপরিবর্ত্তনীয় ক্ষমতা দেখিতে পাইবে। দেবগৃহ বিনষ্ট হউক, উপাসনালয় চূর্ণ বিচূর্ণ হউক, আর স্নেহময় পিতামাতা পুত্রশোকেই আকুল হউন, বা প্রেমময়ী স্ত্রী স্বামী শোকে অধীরা হউন, বজ্রাগ্নি চিরদিনই তাহার অত্যল্প প্রতি রুদ্ধ পথ অনুসরণ করিবে; সুন্দর বন, ধনশালী গ্রাম, সুদৃশ্যনগরও উপবন বিনষ্টই হউক আর নাই হউক, ভূগর্ভস্থ তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে তাহা ভূপৃষ্ঠ চিরিয়া বহির্গত হইবেই; যে নিয়ম হইতে যাহা ঘটিবার তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, এখন লোকের তাহাতে সুবিধা হউক আর অসুবিধা হউক, প্রকৃতি তাহা দেখিবেন না। এ বিশ্বজননীর দয়া বল মায়া বল সব এক, হয় কথা শুন না হয় ফলভোগ কর; এখানে ক্ষমা নাই, এবার করিলাম আর করিব না; এ স্কুলের শিক্ষকেরা সে কথায় ছাড়িয়া দিবে না।

তুমি বলিতে পার, "এক সময় একটু চাতুরী না করিলে অভীষ্টসিদ্ধ হয় না; অবোধ বালককে ঔষধ খাও বলিলে সে কখনও খাইবে না; কাজেই তাহাকে দুগ্ধ খাও বা জল খাও বলিয়া খাওয়াইতে হইবে। নির্ব্বোধ সমাজকে সরল কথায় অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত করান যায় না, কাজেই রাজনৈতিকগণ সময় সময় অসরলতা দ্বারা তাহাদিগকে অভীষ্ট পথে আনয়ন করিতে বাধ্য হন; তুমি এ চাতুরী দোষের বলিলে চলিবে কেন?" প্রথমতঃ তুমি যে উদ্দেশ্যে চাতুরী খেলিবে সে উদ্দেশ্যই যে তোমার সে উপায়ে সাধিত হইবে, আমরা আদৌ তাহাই বিশ্বাস করিতে পারি না; পরে বালক একবার তোমার কথায় প্রতারিত হইলে, পুনরায় তোমার হাত হইতে জলও খাইবে না; লোকে একবার তোমার অসরলতা বুঝিতে পারিলে, তোমার সরল কার্য্যকেও অসরল বলিয়া মনে করিবে। তারপর যদি সত্য সত্যই কোন সময় অসরলতা অবলম্বনে বা সত্যের অবহেলনে কোন অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সে উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; প্রত্যেক অসৎ কার্য্যের দুই প্রকার ফল আছে, একটী বিশেষ আর একটী সাধারণ; বিশেষ কোন একটী বিষয়ে তুমি অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ কোন ফল পাইলে সত্য, কিন্তু একটী সাধারণ বৃহত্তর অপকার সমাজে বপন করিয়া রাখিলে। সকল কার্য্যে যদি গৌণ মুখ্য হিসাব করিয়া কাজ কর, দেখিতে পাইবে, মানবের কাজ হয় সৎ, না হয় অসৎ; হয় হিতকর, না হয় অহিতকর; এবং যেটী এক অবস্থায় হিতকর সেটী অপর অবস্থায়ও হিতকর, যেটী এক অবস্থায় অহিতকর সেটী অপর অবস্থায়ও অহিতকর। এটী অখণ্ডনীয় সত্য, তুমি যতই চেষ্টা কর বিশ্বনিয়ন্তার এ নিয়ম হইতে তোমার ছাড়াইয়া যাইবার সাধ্য নাই।

তুমি অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল মানুষ, তোমার পক্ষে এ নিয়ম কাকের উপর কামানের চোট; কিন্তু কামানের চোটই হউক আর সুগন্ধি পুষ্প বৃষ্টিই হউক, নিয়মের অনুবর্ত্তী হও, আর না হয় ফল ভোগ কর; তোমার অনুবর্ত্তন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। মধ্য বিন্দু স্বভাবে নাই; হয় উন্নতি না হয় অবনতি, হয় উত্থান না হয় অধোপতন, গতিশীলত্ব এ গতিশীল স্বভাবের নিয়ম, অবস্থিতি এজগতে নাই। যাহাকে তুমি অবস্থিতি বল সে কেবল দুই বিরুদ্ধ গতির ফল মাত্র।

এই আমার অভীষ্ট পদার্থ, ইহাকে সহজে প্রাপ্ত হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণ সত্য ছাড়িতে হয়, সুতরাং আমি ছাড়িয়া যাইতে পারি; এনিয়মে কোথায় কে ফল পাইয়াছে বলত? আমরা এখন তর্ক ছাড়িয়া একবার দৃষ্টান্তে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি; ভারতবর্ষে যখন জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন কি অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? কোন একটী কাজ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কোন শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকিলে সে কার্য্যটীর ঔৎকর্ষ্য নিশ্চয় সাধিত হইবে, যদিও জাতিভেদে ব্যক্তিগত অসুবিধা হইতে পারে এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে ধর্ম্ম বিরুদ্ধও হয়, তথাপি পরিণামে জাতীয় বল সমষ্টি অপর জাতির বল অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে, এই সে সময়ের বিশ্বাস ছিল; কিছু কালের নিমিত্ত এ আশা তাহাদের আংশিক সফলও হইয়াছিল; কিন্তু জলবিন্দু অধিকক্ষণ ললাটে থাকিতে পারে না; গুরু পুত্র যখন লেখা পড়া না শিখিয়াও গুরু হইতে পারিলেন, সেনাপতি পুত্র যখন ধনু ধরিতে না জানিয়াও সেনাপতি হইতে পারিলেন, বৈশ্যপুত্র যখন কৃষি রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও উদরান্ন করিয়া খাইতে পারিলেন, তখন সকলেই পৈত্রিক বিষয়ের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিল, এবং যে কার্য্য হইতে দেশের মঙ্গল আশা করা হইয়াছিল, সেই কার্য্য হইতেই দেশের অমঙ্গল বৃদ্ধি হইল।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ নিবারিত হইল। কিন্তু অতি অল্প দিনেই সমাজ দেখিতে পাইল যে, বিধবা জীবিতা থাকিলে আর অসতীত্বের স্রোত ইচ্ছানুরূপ প্রতিরুদ্ধ হয় না; তখন সতীদাহ প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইলেন; জগৎকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে গিয়া সংস্কারক মহম্মদের ন্যায় একেবারে পাপকারীর নির্ম্মূলন সঙ্কল্প করিলেন, পরে সেই সতীদাহের সময়েই বা মানব সমাজে কত হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; আজও অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী লোক জীবিতা আছে, যাহাদিগকে গ্রাম্য লোকে সহমরণী বলিয়া আখ্যা দিয়াছে; অর্থাৎ হতভাগিনীকে যখন স্বামীর সঙ্গে চিতাগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া ছিল, তখন কোনরূপে দস্যুদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। এইরূপ সত্য পথ ভ্রষ্ট নিয়ম দ্বারা জগতে কোন দিন অভীষ্ট সাধিত হয় নাই, তাহার উদাহরণ আমরা শত শত দিতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাসে যত বিপ্লব, যত বিসম্বাদ, সমুদয়ই প্রায় ইহারই উদাহরণ।

সেই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, মানবের ক্রিয়ার কোনটী সুখসাধ্য, তাহা না দেখিয়া, কোন্ পথ সত্যানুমোদিত তাহাই দেখা উচিত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

(প্রথম অধ্যায় শেষ।)

অতঃপর পালি বৌদ্ধগ্রন্থের রচনা কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আচার্য্য ওলডেনবার্গ পালি বিনয়পিটক মুদ্রিত করিয়াছেন। এবং রিসডেভিসের সাহায্যে কিয়দংশের অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। রিসডেভিস ভিন্ন আর কেহই তেমন অতুল গবেষণায় প্রাচীন পালি গ্রন্থাবলির আলোচনা করেন নাই, সুতরাং ওলডেনবার্গ যাহা বলেন, ভক্তির সহিত আমরা শুনিতে উৎসুক হই।

ওলডেনবার্গ বলেন, এখন ত্রিপিটক সর্ব্ববাদী সম্মত হইলেও প্রাচীনকালে কেবল দ্বিপিটক প্রামাণ্য বলিয়া বৌদ্ধসমাজে সমাদৃত হইত—সে বিনয় ও ধর্ম্ম। অভিধর্ম্ম পিটকের তখনও উৎপত্তি হয় নাই, বা হইয়া থাকিলেও তখন গৌরব জন্মে নাই। কুল্লবর্গে রাজগৃহ সংঘে কেবল ধর্ম্ম ও বিনয়পিটক অধীত ও অনুমোদিত হইয়া থাকিবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজগৃহে কোন সমিতি ঘটিয়াছিল কি না পশ্চাৎ বিচার করা যাইবে। কিন্তু কুল্লবর্গ মতে প্রাচীনকালে যে কেবল দ্বিপিটক বর্ত্তমান ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এখন ধর্ম্মপিটকে অনেকগুলি সূত্র দৃষ্ট হয়, সূত্রান্ত সকল যে সূত্র হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সন্দেহ নাই—কুল্লবর্গমতে সূত্রপিটকের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল সূত্রাদি পঞ্চনিকায় প্রাচীনতম সূত্র গ্রন্থ। পাতিমোক্ষ বিনয়পিটকের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং মহাবর্গ ও কুল্লবর্গের পূর্ব্বতন। প্রাচীন পাতিমোক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহার এক খানি বিশদটীকা বা অর্থকথা রচিত হয়। সময়ান্তরে এই অর্থ-কথা সূত্রাবলীর সহিত একীভূত হইয়া একখানি টীকাশূন্য বৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করে। আবার নূতন অর্থ-কথা রচনা করিবার আবশ্যক হয়। পূর্ব্বতন অর্থ-কথা নিরলঙ্কৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ, এই নূতন অর্থ-কথা অলঙ্কারে সুশোভিত। এই সময়ে টীকাকার, কোন্ সূত্র কোথায় কি উপলক্ষে বুদ্ধদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন, আপন মস্তিষ্ক হইতে তাহার উদ্ভাবন করেন। আধুনিক গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যতা প্রতিপন্ন করিতে এরূপ অলঙ্কার সমাবেশ সাহিত্য জগতে নূতন নহে। সে যাহা হউক, এইরূপে নিরলঙ্কৃত সূত্র সকল প্রথম অর্থ-কথায় জড়িত ও তাহার পরে পূর্ণালঙ্কৃত নূতন কথা সংমিশ্রিত হইয়া কালক্রমে বৃহদায়তন গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই বৃক্ষ লতা সমাকীর্ণ সুনীল শৈল মধ্যে প্রাকৃতিক তীক্ষ্ণ চক্ষে ভূস্তর সকল নির্ণয় করিতে পরাস্ত নহেন। এই বৃহতীকৃত পাতিমোক্ষ বিনয়পিটকের বিভঙ্গ ভাগ। যে সময় বিভঙ্গ রচিত হয়, সেই সময়েই সেই প্রাচীন পাতিমোক্ষ নূতন নিয়মমালা, ও কোথায় কি কারণে সেই নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্তের সংযোজনে নূতন প্রকারে বৃহদায়তন হইয়া খণ্ডক আকার ধারণ করে। রচনা প্রণালী ও আখ্যায়িকার প্রকৃতি পরীক্ষা করিলে বিভঙ্গ ও খণ্ডক যে এক সময়ে গঠিত হইয়াছিল, অনুমান হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিনয়পিটককে পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া পারাজিক ও পাচিত্তিয়কে বিভঙ্গ, মহাবগ্গও কুল্লবগ্গকে খণ্ডক বলে। পঞ্চম অংশ পরিবার পাঠ আধুনিক গ্রন্থ। বিভঙ্গ ও খণ্ডক প্রাচীন পাতিমোক্ষ অপেক্ষা নবীনতর হইলেও বিভঙ্গ ও খণ্ডক মহাবৈপুল্য গ্রন্থ সকলের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

যে ভাবে প্রাচীন পাতিমোক্ষের উপর স্তরের পর স্তর সংযোজিত করিয়া বিনয় পিটক গঠিত হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপে প্রাচীন চতুর আর্য্যশক্র ও দ্বাদশ নিদানের উপর সূত্র-গ্রন্থ ও তাহাদিগের উপর নূতন স্তর সংযোজিত করিয়া সূত্রান্ত সকল গঠিত হইয়া থাকিবে। এইরূপে সূত্রপিটকের উৎপত্তি সম্ভব। বিভঙ্গ ও খণ্ডক গ্রন্থে যেমন কল্পিত ইতিবৃত্ত সকল দেখিতে পাওয়া যায়, অমুক স্থানে অমুক সময়ে অমুক ঘটনা উপলক্ষে বুদ্ধ এইরূপ বলিয়াছিলেন, সূত্রপিটকেও সেইরূপ কল্পিত ইতিবৃত্ত প্রত্যেক সূত্রের সহিত সংযোজিত আছে এবং এই উভয় প্রকার ইতিবৃত্তের ভাষা ও রচনা প্রণালী একই রূপ। সে জন্য বোধ হয় বিভঙ্গ ও খণ্ডকের অনেক পূর্ব্বে বা পরে সূত্র-পিটক রচিত হয় নাই। এই দুই প্রকার গ্রন্থ সম-সাময়িক।

কে কাহার পূর্ব্বে বা পরে রচিত, এক প্রকার স্থির হইল। কিন্তু কে কোন্ সময়ে রচিত, নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণ্যে প্রচার আছে, প্রথম বৌদ্ধসমিতিতে বৌদ্ধধর্ম্মের আদি পুস্তক সকল নির্দ্ধারিত হয় এবং অন্যান্য সংঘে সে সকল পুনরনুমোদিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কিম্বদন্তী কতদূর গ্রাহ্য, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

সকলেই বলে, তিনটী মহাসমিতি বিভিন্ন সময়ে আহূত হইয়াছিল। সিংহলের বৌদ্ধেরা বলেন সে তিনটী রাজগৃহ, বৈশালী ও পাটলি পুত্র সমিতি, উত্তর দেশীয়দিগের মতে সে তিনটী রাজগৃহ, বৈশালী ও কনিষ্ক-আহূত সমিতি, সুতরাং প্রথম দুইটী সমিতি বিবদমান উভয় পক্ষের অনুমোদিত সমিতি। কুল্লবর্গে লিখিত আছে, শাক্যের মৃত্যু হইলে যখন শিষ্যগণ হাহাকার রবে রোদন করিতেছিল, তখন তাঁহার মুমূর্ষু-সময়-দীক্ষিত-শিষ্য সুভদ্র রুদন্তী শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "গুরুর মৃত্যু হেতু শোক করিবার কোন কারণ নাই। জীবদ্দশায় তিনি আমাদিগকে ইহা করিও উহা করিও না, ইত্যাদি আদেশ করিয়া বড় পীড়িত করিতেন। অতঃপর আমরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিব।" শাক্যের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ এই ধর্ম্ম-বিগর্হিত উক্তি শ্রবণ করিয়া, প্রভুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, রাজগৃহে পঞ্চশত সমিতি আহ্বান করিয়া উপালির সাহায্যে বিনয়, ও আনন্দের সাহায্যে ধর্ম্মপিটক নির্দ্ধারিত করেন। কুল্লবর্গের এই আখ্যায়িকা ওলডেনবার্গর মতে গ্রন্থকারের কপোলকল্পিত। বৈশালীতে প্রকৃত সমিতি সমাহূত হইবার পরে এই আখ্যায়িকা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে রাজগৃহে কোন সংঘ সমবেত হয় নাই। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র কুল্লবর্গ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কুল্লবর্গ প্রচারিত আর সকল কথা আছে, কেবল পঞ্চশত সমিতির কোন উল্লেখ নাই। বৈশালী সমিতির পরে কুল্লবর্গ রচিত হয়, উহাতে বৈশালী সমিতির উল্লেখ আছে। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র বৈশালী সমিতির পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে।

আচার্য্য রিস্ ডেবিসের মত মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র খ্রীঃ পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। রাজগৃহ সমিতি বৈশালী সমিতির ছায়ামাত্র, বৈশালী সমিতি ঘটিবার পরে উহা কল্পিত হইয়াছিল। বৈশালী সমিতিতে কেবল বিনয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়,এজন্য বোধ হয় কল্পিত রাজগৃহ সমিতির বিনয় সন্ধিতি আখ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ভিক্ষুদিগের মধ্যে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে দশটী বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল,বৈশালী সমিতিতে তাহার আলোচনা হয়। বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ সেই দশটী বিষয় শাক্যের উপদেশ মত কঠোর মীমাংসা করেন, কিন্তু ধর্ম্ম সমাজে যুবকদিগের সংখ্যা প্রায়ই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা স্থবিরদিগের কঠোর শাসন অনুমোদন করে নাই, তজ্জন্য বৌদ্ধগণ দুইসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, মহাস্থবির ও মহাসাংঘিক। বৈশালী সমিতি প্রকৃত ঘটনা, কিন্তু দীপবংশে যে লিখিত আছে, যশ রেবত প্রভৃতি অষ্ট মহা স্থবির সাতশত অর্হৎসঙ্গে পূর্ব্ব কথিত দশটী শাসন অনুশাসিত হইবার পরে বৈশালী নগরে কূটাগার মন্দিরে আট মাস কাল ধর্ম্মপিটক আলোচনা ও অনুমোদন করেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পাটলিপুত্র সমিতির কথা কূল্লবর্গে উল্লিখিত নাই, কূল্লবর্গ উহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। দীপবংশ মহাবংশ এবং বুদ্ধঘোষ প্রণীত সমন্তপাষাদিকা গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। অনেক অধার্ম্মিকের ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন উৎপাদন করায়, রাজা ধর্ম্মাশোকের আহ্বানক্রমে মোগ্গলিপুত্র দশ শত ভিক্ষু লইয়া পাটলিপুত্র সমিতিতে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করেন, অধার্ম্মিকেরা পরাস্ত হয়, দীপবংশে পাটলিপুত্র সমিতির বিবরণ এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথাবত্তু গ্রন্থ লিখিয়া মোগ্গলিপুত্র আপন মত প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তর দেশীয় কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই সমিতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহারা উহাকে আপনাদিগের সম্মত বলিয়া স্বীকার করে না। না করিবারই কথা, বৈশালী ও পাটলিপুত্র সমিতির মধ্যে বৌদ্ধগণ অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

মোগ্গলিপুত্র ইহার অন্যতমের অধিনায়ক, সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণের সমিতি অন্য সপ্তদশ সম্প্রদায়ে স্বীকার করিতে পারে না। এই জন্য পাটলিপুত্র সমিতি অন্য বৌদ্ধেরা স্বীকার করে নাই, নতুবা পাটলিপুত্র নগরে ধর্ম্মাশোকের রাজত্বকালে যে একটী সমিতি আহূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধেরা মোগ্গলিপুত্রের শিষ্য এবং ধর্ম্মাশোক মোগ্গলিপুত্রের সমাদর করিতেন, এইজন্য পাটলিপুত্র সমিতি ও অশোকের কথা সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সকলে এত অধিক দৃষ্ট হয়।

কূল্লবর্গ বৈশালী সমিতির পরে এবং পাটলিপুত্র সমিতির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই উভয় সমিতির ব্যবহিত সময় অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের বিবাদ কালে অভিধর্ম্ম পিটকের উৎপত্তি হয়, তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম পিটক অল্প বা অধিক বিভিন্ন, পাটলিপুত্র সমিতিতে প্রচারিত কথাবত্তু সিংহলীয় অভিধর্ম্ম পিটকের শেষ গ্রন্থ। বিনয়সূত্রের উৎপত্তি শাক্যের পূর্ব্বতন, পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তী অন্যধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার শাক্য একেবারে উপেক্ষা করেন নাই, পাতিমোক্ষ তাঁহার অনুশাসিত মূল পিটক, তাহার উপর স্তর স্তর সংযোজিত হইয়া সমগ্র বিনয়-

পিটক রচিত শেষ হইয়াছে; বৈশালী সমিতি আহূত হইবার পূর্ব্বেই বিনয়-পিটকের রচনা শেষ হইয়াছিল, কেবল বৈশালী সমিতির বিবরণ ও বিবাদিত দশবত্তুর কথা পরিশিষ্ট-রূপে বৈশালী সমিতির পরে সংযোজিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু বৈশালী সমিতির বহু পূর্ব্বে সমগ্র পিটকের রচনা শেষ হয় নাই। যে কালাশোক বৈশালী সমিতি আহ্বান করেন, তিনিই মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই ঘটনা বিনয় পিটকে লেখা আছে। সুতরাং কালাশোকের সম সময়ে বিনয় পিটক সম্পূর্ণ হইয়াছিল, অনুমান করিতে হইবে।

পালি বৌদ্ধ-গ্রন্থের রচনা কাল অনুসারে একটী তালিকা করিতে হইলে এইরূপ হইবে।

(১) পাতিমোক্ষের উৎপত্তি, ধর্ম্ম পিটকের আরম্ভ।

(২) বিভাঙ্গভাগে সংগৃহীত পাতিমোক্ষের প্রাচীন অর্থ কথা।

(৩) বিভাঙ্গ সংগৃহীত মহাবগ্গ ও কূল্লবগ্গ রচনা, সূত্রান্ত গ্রন্থ সকলের আরম্ভ।

(৪) বৈশালী-সমিতি।

(৫) রাজগৃহ সমিতি আখ্যায়িকার উৎপত্তি, বিনয় পিটকের পরিশিষ্ট রচনা।

(৬) বৌদ্ধ সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, অভিধর্ম্ম পিটকের আরম্ভ।

(৭) পাটলিপুত্র-সমিতি, কথাবত্তু রচনা।

বৈশালী ও পাটলিপুত্র সমিতি কোন সময়ে আহূত হইয়াছিল, তৎ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। আচার্য্য ওলডেনবার্গের মতে খ্রীঃ পূঃ ২৮৫ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়, দীপবংশ মতে তাহার ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে বৈশালী সমিতি আহূত হইয়াছিল—খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩৮৩ বৎসর হইল। সুতরাং খ্রীঃ পূর্ব্ব প্রায় চারিশত বৎসরে বিনয় পিটকের শেষ সংস্করণ সমাপ্ত হইয়াছিল। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে কনিষ্কের রাজত্ব কালে বসুমিত্রের অধিনায়কত্বে তমস-বন-বিহারে এক মহাসমিতি হইয়া তৃতীয় বার বৌদ্ধ-গ্রন্থাবলীর পুনঃসংস্করণ হয়। যে কারণে পাটলি পুত্র-সমিতির উল্লেখ উত্তর দেশীয় গ্রন্থ সকলে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না, সেই কারণে তমসবন সমিতির উল্লেখ দক্ষিণ দেশীয় গ্রন্থ সকলে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধের জন্ম, নির্ব্বাণ ও মৃত্যু এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ সন্ধিতি কোন সময়ে আহূত হইয়াছিল, আমরা ক্রমে সবিস্তর আলোচনা করিব।

পালি ত্রিপিটকের সংগ্রহ কাল সম্বন্ধে আচার্য্য রিস্‌ডেবিস বলেন "It is already certain they were all put into their present form within a very limited period, probably extending to less than a century and a half—about B. C. 400—250."

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিনয় পিটক দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও মূল সূত্রে সকলেই এক! আচার্য্য ওলডেনবার্গ ভিন্ন ভিন্ন বিনয় পিটকের তুলনা করিয়া স্থবির সম্প্রদায় সম্মানিত সিংহলীয় পালি বিনয় পিটককে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সকল গ্রন্থ অপেক্ষা বিনয় পিটক প্রাচীনতম; এবং যে সকল ভাষার বিনয় পিটক অদ্যাপি পাওয়া গিয়াছে বা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পালি বিনয় পিটক প্রাচীনতম। যত দিন কোন প্রত্নবিৎ সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় প্রাচীনতর গ্রন্থ দেখাইতে না পারিবেন, তত দিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সূত্র

বা প্রাচীনতম রীতি পদ্ধতি পরীক্ষা করিবার জন্য পালি বিনয় পিটকের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।

কিন্তু আমরা একথা বলি না যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ সকল আদৌ পালি ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। সংস্কতে হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যাবধি এমন কোন সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে আমরা এরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে পারি। এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্বারা ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের সহিত আমরা অনুমান করিয়া বলি, বিনষ্ট প্রাচীনতম বৌদ্ধ সূত্র গাথা ভাষায় রচিত হইয়াছিল—তাহাদিগেরই ভগ্নাবশেষ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। আচার্য্য ওলডেনবার্গ পালি বিনয় পিটক প্রাপ্ত গ্রন্থ সকলের মধ্যে প্রাচীনতম প্রমাণ করিয়াই বলিয়াছেন ;—

"With regard to the contents and the style of representation, the Pali version has hitherto shown itself to be the most original, if not *the* original version. But it may with certainty be maintained that in one respect, in reference to the *dialect*, it differs from the original text. No one acquainted with the earliest history of Buddhism will entertain any doubt that the fundamental constituent parts of its sacred texts were first fixed in the kingdom of Mogodha and in the Magodhi languages. It is certain that the Pali language is not Mogodhi language."

কুল্লবর্গে লিখিত আছে, সকলে আপন আপন ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস করিবে। সুতরাং কুল্লবর্গ রচিত হইবার পূর্ব্বে অন্য ভাষায় যে বৌদ্ধসূত্র রচিত ছিল, সন্দেহ নাই। সে কোন্ ভাষা?—আচার্য্য ওলডেনবার্গ প্রভৃতি বলেন, সে মাগধী ভাষা। কোন্ মাগধী, কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। আমরা বলি গাথা ভাষাকেই বিভিন্ন প্রত্নবিৎ বিভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, গাথা ভাষা বর্ত্তমান আর্য্য ভাষা সকলের উৎস, বৈদিক ভাষার পরন্তন, প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা মিশ্রণে উৎপাদিত। ওলডেনবার্গের মত, পালি ভাষা দক্ষিণাপথে কলিন্দ বা অন্ধ্র-রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

আমরা এই অধ্যায়ে যে যে বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এই খানে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি।

১। সংস্কৃত এক সময়ে আর্য্যজাতির কথিত ভাষা ছিল।

২। প্রাকৃত বর্ণের সহিত আর্য্যবর্ণের সম্মিলন হেতু প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

৩। পানিনী শাক্য সিংহের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, পানিনীর পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

৪। প্রাকৃত ভাষার প্রথমস্তরে গাথা, দ্বিতীয় স্তরে পালি, তৃতীয় স্তরে শাসন ভাষা, তাহার পরে বররুচি-উক্ত সৌরশেনী মাগধী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হয়। বররুচির উল্লিখিত ভাষা চতুষ্টয়ের পরে আর্য্যাবর্ত্তে নানা ভাষার উৎপত্তি হয়, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণ সকলে তাহাদিগের উল্লেখ আছে। তাহাদের পরে বাঙ্গালা, উড়িয়া, গুরুমুখী, হিন্দী, গুর্জ্জরী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি বর্ত্তমান ভাষা সকলের উৎপত্তি হইয়াছে।

৫। শাক্যের মৃত্যুর কত দিন পরে বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, বলা যায় না। কোন্ ভাষায় গ্রন্থ সকল প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, বলা যায় না; সংস্কৃত ভাষায় হইয়া থাকিতে পারে, নাও পারে। এখন যে সকল লিপিবদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহারা প্রধানতঃ ভারতবর্ষে রচিত হইয়াছিল। তিব্বত, চীন, ও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে কতকগুলি গ্রন্থ দেশীয় লোকেরা রচনা করিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলের অনুবাদ। তিব্বত দেশীয় গ্রন্থ সকল সংস্কৃত মূলক, চীন দেশীয় গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ও পালি মূলক, দুই তৃতীয়াংশের অধিক সংস্কৃত হইতে, অল্প-সংখ্যা পালি হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল; ব্রহ্ম দেশীয় গ্রন্থ সকলের অধিকাংশ পালি এবং কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল।

৬। লিপিবদ্ধ গ্রন্থ সকলের প্রাচীনতম গুলি গাথা ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ গাথা গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাধারণ্যে ব্যবহৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সকলের মধ্যে পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী প্রাচীনতর, সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই; যে গুলি পাওয়া গিয়াছে তাহারা সকলেই আধুনিক।

৭। যে সকল বুদ্ধচরিত এখন পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত, ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু অবদান এবং পালি মালালঙ্কার বস্তু প্রধান। ললিতবিস্তর, মহাবস্তু ও মালালঙ্কার অতি আধুনিক। অশ্বঘোষ প্রণীত গ্রন্থ খ্রীষ্টের শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাচীন মতাদি সংগ্রহ করিতে হইলে ইহাদিগের উপর নির্ভর করা যায় না। পালি ত্রিপিটক হইতে যে সকল সংগ্রহ করিতে হইবে।

নবলীলা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের নূতন সংসার।

মানুষ নিতান্ত অদূরদর্শী, পরিণাম ইহার নিকট গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারে ঢাকা না থাকিলে, কেহ জীবন পথে চলিতে পারিত না। ভবিষ্যতে যে সকল বিপদকে বুক পাতিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, তাহা যদি মানুষ পূর্ব্বেই স্থির নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিত, তবে তাহার পা ভাঙ্গিয়া পড়িত, সংসার লীলাখেলা তাহার দ্বারা হইত না। "কার্য্য কারণ" সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ মানবেরা কিছু কিছু পরিণাম ঠিক করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ থাকে, ঠিক যাহা ঘটিবে তাহা বলিতে পারা অসম্ভব। মানুষ যে স্বাধীন, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ। মানুষ ভবিষ্যতে কি করিবে, তাহা জানে না। আজ যে পথকে ভাল বুঝিয়া ধরিয়াছি, দশদিন পরে যে ঠিক সেই পথ ধরিয়াই থাকিব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। মানুষ যখন যাহা ভাল বুঝে, তখন তাহাই করে। মানুষ যাহা সুধা বলিয়া ধরে, তাহাতেও গরল ভাসে; যাহাকে আলো বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়, তাহাতেও আঁধার

ফোটে। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে কাহার ইচ্ছা নয়? কিন্তু তাহার অধিকারী কে? মোট কথা, মানুষ ভবিষ্যত জানে না, সে চিন্তাও করে না, পরিণাম বুঝিয়া মানুষ চলিলে সংসার বাসের অযোগ্য হইত। যখন যাহা ভাল বুঝে, মানুষ তখন তাহাই করে। এই জন্য একজন যাহা করে, অন্যজনের নিকট তাহা ভাল না লাগিলে কখনও সে তাহা করে না। পরিণাম কে ভাবিতে পারে?—তুমি পরিণামদর্শী, সন্তান সন্ততির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছ; নিশ্চয় কি তুমি বলিতে পার, সঞ্চিত অর্থ তোমার সন্তানের উপকারে আসিবে? নেপোলিয়ন সেণ্ট-হেলেনায় বন্দী হইলেন, পূর্ব্বে জানেন নাই; সিজর্ বন্ধুর হস্তে মরিবেন, পূর্ব্বে জানেন নাই, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে মরিবেন, পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই; বিমল জ্যোৎস্না-মাখা হ্রদ তরঙ্গ চৈতন্যের প্রাণ কাড়িয়া লইবে, তিনি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মানুষের প্রাণের অপূর্ণ পিপাসা মিটিতে না মিটিতে কোন্ লুক্কায়িত স্থান হইতে বিপদ উঠিয়া গ্রাস করে, তাহা মানুষ চিন্তা করিতেও অক্ষম। এই জন্য পরমার্থ চিন্তায়-উন্নত জ্ঞানী মানবেরা জীবনের সকল ভার অলক্ষিত প্রকৃতিরাজ্যের গুপ্ত শক্তির উপর সমর্পণ করিয়া বলেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করমি।" দুঃখ বুঝি না, সুখও বুঝি না, বিপদও বুঝি না, সম্পদও বুঝি না, আলোও বুঝি না, আঁধারও বুঝি না, যাহা ঘটে ঘটুক, অবিচলিতভাবে তাহাকেই আলিঙ্গন কবির।" এই বলিয়া অবিচলিত ভাবে ভ্রূক্ষেপ-বিরহিত হইয়া ভগবানের সংসার-স্কুলে মানব শিক্ষা করে, লীলা খেলে।

বিনোদ বাবু ধনীর সন্তান, সুখবিলাসের দাস, মায়ের কত আদরের ধন, যখন বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তখন আর পরিণাম চিন্তা করিলেন না। যাইতে যাইতে, হাটিতে হাটিতে, কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা হইল অমনি কুলি আফিসের প্রলোভনে পড়িলেন। আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে চা ক্ষেত্রে গেলেন। সাহেবদিগের অনুগ্রহে কুলির কার্য্য অধিক দিন তাঁহাকে করিতে হইল না, কেরাণী হইলেন। পরে চার কার্য্য ভালরূপ শিখিলেন, বেতন বাড়িল, বন্ধু জুটিল। এ সকল খাটুনি কেন খাটিলেন, তিনিও তাহা জানেন না। ইচ্ছা হয় না, দেশে যান না; ইচ্ছা হয়, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ান, আর আফিসের কার্য্য করেন। মনের অবস্থা কি প্রকার, কি ভাবেন, তাহা একটী বন্ধু জানে। বিনোদের একটী বন্ধু সেখানে একজন সাহেব, আর একটী বন্ধু একজন কুলি। বাঙ্গালীর বন্ধু সাহেব, সাহেবের বন্ধু বাঙ্গালী; আজ কাল ইহা চিন্তা করিতেও অনেকে অক্ষম। আজ কাল সাহেবেরা বাঙ্গালীর ঘৃণার জিনিস্, বাঙ্গালী সাহেবের ঘৃণার জিনিস্। তখন উভয় জাতির মধ্যে এত ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল না। তখন সাহেবেরা বাঙ্গালীর সহিত মিশিবার জন্য সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর বেশ ধরিত। বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অনুকরণ করিত। এক্ষণ সাহেব-ঘেষা একদল বাঙ্গালী দেখা যায়, তখন বাঙ্গালী-ঘেষা সাহেব অনেক দেখা যাইত। কালের পরিবর্ত্তনে এক্ষণ সাহেবের সাজ ধরিয়া অনেক বাঙ্গালী সাহেব মারিতে প্রস্তুত হইয়াছে। মোট কথা, তখন বাঙ্গালী সাহেবের বেশ ধরিত না, সাহেবের অনুকরণ করিত না, ঘৃণাও করিত না। যে কুলি বিনোদকে ভালবাসিত, সে কুলির নাম জিতন, জিতন পাহাড়ী। যে সাহেব বিনোদকে ভাল বাসিত, তাহার নাম এণ্ডারসন্। জিতন বীরপুরুষ, বলবান, ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, কোন কারণে চা-বাগানে কাজ করিতেছে। জিতন বিনোদকে প্রাণের মত ভালবাসিত, কিয়দ্দিবসের মধ্যে এরূপ ভাব হইয়াছে, জিতন একদিনও বিনোদকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। জিতন বিনোদকে লইয়া পাহাড়ে বেড়াইত, কত কি দেখাইত, কত কি শুনাইত, কত কি বলিত! জিতন বিনোদকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত; বিনোদও জিতনকে স্নেহ করিতেন। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে বিনোদ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, জিতন তখন বিনোদকে কোলে করিয়া সুস্থ করিত; সময়ে সময়ে পাহাড়ের ফল পাড়িয়া খাওয়াইত, ঝর্ণার জল পান করাইত। জিতনের প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা, বুক ভরা ভালবাসা। বিনোদের দুটী পরিবার—এণ্ডারসনের ও জিতনের। জিতনের স্ত্রী বর্ত্তমান নাই, একটী কন্যা আর একটী পুত্র আছে। বিনোদ যে কয়েকটী টাকা পান, তাহা জিতনকে দেন, কারণ জিতনের আয় অল্প, এণ্ডারসন যাহা পান, তাহাতেই বিনোদের চলে। এই প্রকারে আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বিনোদ বাবু নূতন সংসার পাতিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। কি উদ্দেশ্যে, কি মঙ্গলসাধনের জন্য, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ, এণ্ডারসন ও জিতন।

এণ্ডারসন বিনোদের গৃহের সকল কথা জানে। বাঙ্গালী পরিবারের কাহিনী শুনিতে

এণ্ডারসন বড়ই ভালবাসিত। এণ্ডারসন বিনোদকে ভালবাসিত, সুতরাং বিনোদের ভালবাসার জিনিষগুলিও এণ্ডারসনের প্রিয়। এই প্রকারেই প্রেম বিস্তৃত হয়। এণ্ডারসন ভালবাসেন বিনোদকে, বিনোদ ভালবাসেন জিতনকে, সুতরাং এণ্ডারসন জিতনকেও ভালবাসেন। এণ্ডারসন বিনোদের বাড়ীর কাহাকেও দেখেন নাই, তবুও অনন্তদেবীকে ভালবাসেন, শান্তময়ীকে ঘৃণা করেন, সুলোচনার জন্য অশ্রু ফেলেন। কল্পনায় বিনোদের মায়ের ছবি, সুলোচনার ছবি কত সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া এণ্ডারসন চিন্তা করেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্বে সুখ পাইতেন, আজকাল সে ভাব গিয়াছে, আজ কাল কেবল চিন্তায় সুখ পান না, বিনোদের দেশে যাইতে সাহেবের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে! এণ্ডারসন বিনোদকে একদিন বলিলেন,—'বিনোদ, চল আমরা বাড়ী যাই, মাকে দেখিব, সুলোচনাকে দেখিব।'

অনেকদিন হইল বিনোদ বিদেশে আসিয়াছেন, কিন্তু দেশের কোন সংবাদ রাখেন না, রাখিতে ইচ্ছাও হয় না।

বিনোদ এণ্ডারসনকে বলিলেন,—যেখানে থাকি সেই বাড়ী, যাহাদিগকে ভালবাসি তাহারাই পরিবার; সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রাণকে কেন আবদ্ধ করিয়া রাখিব?

এণ্ডারসন বলিলেন,— সঙ্কীর্ণ স্থানে আরম্ভ না করিলে অনন্তকে মানুষ বুঝিতে পারে না, ক্ষুদ্র মানুষ-সোপান ধরিয়া তবে লোক ঈশ্বরকে বুঝিতে পারে; সীমাবদ্ধ ভাব লইয়াই সংসার, সমাজ, মানুষ।

বিনোদ।—সঙ্কীর্ণ স্থানে আরম্ভ করিয়াছি; চিরকাল কেন তাহা লইয়াই থাকিব?

এণ্ডারসন।—মানুষের ধর্ম্ম কে অতিক্রম করিতে পারে?

বিনোদ।—চেষ্টা করিলে সকলেই পারে।

এণ্ডারসন।—ভুল কথা। তুমি তোমাকে যেমন ভালবাস, এমন কি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পার? তোমার মাকে যে প্রকার ভালবাস, এ প্রকার কি জগতের সকলকে ভালবাসিতে পার?

বিনোদ।—আজও পারিতেছি না বটে, কারণ আজও সিদ্ধ হই নাই, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন সকলকেই সমভাবে ভালবাসিতে পারিব।

এণ্ডারসন।— যখন পারিবে, তখন তাহাই করিও। এক্ষণ যাহাদিগকে ভাল বাসিতেছ, তাহাদিগের ভালবাসা ছিন্ন করিবে কেন?

বিনোদ।—ছিন্ন করি নাই, ছিন্ন করাকে পাপ মনে করি।

এণ্ডারসন।—তবে মাতার কথা ভাবিবে না কেন? তবে সুলোচনার জন্য চিন্তা করিবে না কেন?

বিনোদের মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, চিন্তা করিব কেন? বাল্যকালে পিতার মুখে শুনেছি—ভক্তের জীবনে কখনও অমঙ্গল ঘটে না।

এণ্ডারসন —একটু স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলোচনার সহিত কখনও মিলিবে, বাসনা আছে কি?

বিনোদ। বাসনা আছে, তাহাও বলি না; নাই, তাহাও ঠিক নহে। এই মাত্র জানি—যাঁহার ইচ্ছায় মানুষ মিলিত হয়, তাঁহার ইচ্ছা হইলে মিলিব।

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর প্রায় প্রত্যহই হইত। বিনোদের মন উন্নত বুঝিয়াই এণ্ডারসন ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এণ্ডারসন কিছু সংসারী, বিনোদ কিছু কিছু বৈরাগী। সংসারে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে সংসার মিলিয়া উভয়েরই উন্নতির কারণ হইল। উভয়ে উভয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। প্রত্যহ যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, উভয়ে তাহাই আবার নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন। সে চিন্তায় উভয়েই উভয়ের মনের ভাব বুঝিতেন; উভয়ের জীবনের আংশিক সত্য যখন মিলিয়া আসিত, তখন সেই সত্য উভয়েই গ্রহণ করিতেন।

উভয়ের জীবনেরই উন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু দুইজন দুই ভিন্ন পথে চলিতে লাগিলেন। দুটী ঝরণা বহিয়া একটী নদী—সে নদী আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে চলিল। এক নদী যায় সংসারের দিকে, আর এক নদী যায় বৈরাগ্যের দিকে। এক নদী যায় জ্ঞানের রাজ্যে, আর নদী যায় প্রেমের রাজ্যে। একটী চায়, বহির্দেশ ভ্রমণ করিয়া অপার-জলধিতে মিলিতে; আর একটী চায়, অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নীরবে সাগরে মিশিতে। একটী চায়, বাহির দিয়া ভিতরে যাইতে; আর একটী চায়, ভিতর দিয়া বাহিরে যাইতে। স্বীয় স্বীয় পথে ভ্রমণ করিয়া কিয়দ্দিবস পরে উভয়েই উভয়ের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিল। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়—আর বিনোদের প্রকৃতিতে কেমনই এক আশ্চর্য্য কোমল, মধুর প্রেমের আবরণ পড়ে—সে প্রেম স্বার্থের শৃঙ্খলে আর বদ্ধ থাকিতে চায় না। লোকে বলে,—নদীর জলস্রোতের বৈচিত্র্যময়ী গতিতে স্তরে স্তরে বালুকা রাশি নদী গর্ভে স্থিত হয়। বিনোদের জীবনেও তাহাই হইল। স্তরের উপরে স্তর, তাহার উপরে স্তর, কাল-

প্রবাহ এই প্রকার স্তর সাজাইয়া বিনোদের পূর্ব্বের প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিল—জ্ঞান ঢাকা পড়িল,—সংসার-বুদ্ধি ঢাকা পড়িল। পূর্ব্বে বিনোদ কাঁদিত মায়ের জন্য, সুলোচনার জন্য;—দ্বিতীয় স্তরে প্রাণ ব্যাকুল হইত জিতন ও এণ্ডারসনের জন্য; এক্ষণ ব্যাকুল-প্রাণ চায় যেন জগৎকে ধরিতে। বিনোদের মুখে যে ভাব, প্রাণে সেই ভাব—এক প্রেমে জগৎকে ধরিব, এক প্রেমে জগৎকে তুলিব। পূর্ব্বে যেখানে জ্ঞান ছিল, আজ কাল সেখানে কেবলই প্রেমের রাজত্ব,—মহাজ্ঞানকে মহামায়া ধরিয়া বশ করিয়াছে। আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশের সুরম্য মন-বিমোহন প্রকৃতি সাজিয়া সাজিয়া কাল-প্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে কত ভাব জমাইয়া দিল। তীর ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে চর পড়ে; অগণিত পাহাড় পর্ব্বত, প্রপাত নির্ঝরণী, বন উপবন, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য এই সকল বুক চিরিয়া ভাব ঢালিল, সেই ভাব রাশি সময়-প্রবাহ জমাট করিয়া বিনোদের প্রাণে স্তর সাজাইল! জড় ভাঙ্গিয়া জড় হয়, এবার জড় ভাঙ্গিয়া অজড় হইল। কল-কণ্ঠের মধুর গীতি বায়ুতে মিশিল, বায়ু সেই মধুর স্বর লইয়া বৃক্ষপত্র ফুল ফলের সহিত কোলাকুলি করিয়া আসিয়া বিনোদের কর্ণে প্রবেশ করিল,—অমনি সেখানে তাহা জমাট বান্ধিয়া রহিল। পাহাড় পর্ব্বতগুলি বন উপবনকে বুকে করিয়া, সূর্য্যের প্রখর রশ্মিকে শিরে ধরিয়া, দর্পে দাঁড়াইয়া যে গম্ভীর, যে নিস্তব্ধ ভাব প্রচার করিল, তাহা বিনোদের প্রাণে জমাট বাঁধিল। ভাব-রাজ্যের দাস কেবল ভাব লইয়াই রহিলেন। কার্য্য জগতে, জ্ঞান জগতে বিনোদের নাম আর রহিল না, সে সকল রাজ্যে বিনোদ মৃত। বিনোদ ক্রমে এমনি হইয়া উঠিলেন, কেবল ভাব লইয়া অলস ভাবে থাকিতে চাহেন। ভাব-প্রবল অপার্থিব প্রেম-বিহ্বল বিনোদ চায় সকলি, কিন্তু সে জন্য নিজে আর কিছুই করিতে চাহেন না। এণ্ডারসনের এসকল বুঝিতে বাকী নাই। তিনি বিনোদকে জানেন, বিনোদ তাঁহাকে জানেন। উভয়েই জানেন, উভয়ে দুই ভিন্ন সীমায় রহিয়াছেন। অথচ দুইয়েতে মিল রহিয়াছে। মিলন একই রকম রহিল। কি গুপ্তমন্ত্রে উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট রহিলেন, সংসারের দর্শন তাহা বুঝিতে পারিল না। সংসার-দর্শন বলে, জ্ঞানে জ্ঞানের মিল, প্রেমে প্রেমের মিল। এস্থলে সে শাস্ত্র উল্টাইয়া গেল। উভয়ের সকল অভাব পূরণ করিবার জন্য যেন এক দৈব শক্তিতে উভয়ে আবদ্ধ। এণ্ডারসন জ্ঞান বিজ্ঞান-লালায়িত, কার্য্যের উপাসক, কেবল সংসার পূজক। তাঁহার নিকট পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী, বন উপবন, পশুপক্ষী সকলে জ্ঞানের কথাই প্রচার করে; ভাব তিনি কোথাও দেখেন না; সঙ্গীত তাহার হৃদয়ে অমৃত ঢালে না, ক্রন্দনে তাহার হৃদয়ে উচ্ছাস খেলে না।

জিতন মধ্যস্থলে। বিনোদের মধ্যে যাহা ভাল তাহাও জিতন গ্রহণ করে, এণ্ডারসনের যাহা ভাল তাহাও গ্রহণ করে। জিতন উভয়কেই ভালবাসে। জিতন বিনোদের নিকট পায় প্রেম, এণ্ডারসনের নিকটে পায় জ্ঞান। জিতন মধ্যস্থলে। জিতন পাহাড়ী, তাই বলিয়া, পাঠক, তুমি জিত-নকে বোকা ভাবিও না। জিতন পাহাড়ী বলিয়া জিতনকে মূর্খ ভাবিও না। জিতনের হৃদয় আছে, জিতনের মস্তিষ্ক আছে, জিত-

নের সংসার আছে, জিতনের ধর্ম্ম আছে। বিনোদ, জিতন এবং এণ্ডারসন তিনে এক হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনের গতিই অবিচলিত, তিনের গতিই অলক্ষিত।

মলয়শিশু।

(১)

নবজাত মলয়-হিল্লোল
জনমিয়া বসন্ত প্রভাতে,
খেলিতেছে আনন্দে বিভোল,
কুসুম-বালিকাদের সাথে।

(২)

দোলনায় দিতেছে দোলায়ে
নবজাতা শাখা-কুমারীরে;
গোলাপেরে আদরে ভুলায়ে
চুমে তার রাঙা মুখ ধীরে।

(৩)

হোথা কূলে সাগর বালিকা
খল খল করি হাসিতেছে,
অমনি সে বালক ছুটিয়া
বালিকার কাছে চলে গেছে।

(৪)

"কোথা গেল প্রভাতের খেলা—
বালক বালিকা মিলিমিলি?"
বলি কবি কাঁদিছে একেলা,
হতাসে বসিয়া নিরিবিলি।

নলিনী।

(১)

নলিনিরে, নলিনিরে, ভাল কি বাসিস্ মোরে,
বল বোন্ যাহা মনে আছে।
পড়ি সন্দেহের ফাঁদে, আকাঙ্ক্ষা ফুকারি কাঁদে,
সুখ মোর বাঁচে কি না বাঁচে।
না কহিয়া কোন কথা, কাঁধে মোর রাখি মাথা
নলিনী সে হাসিতে লাগিল;
কিন্তু হায় কিছু না কহিল!

(২)

রাঙা রাঙা ঠোঁট্ ধরে, কত না আদর করে'
আর বার বলিনু কাতরে,
আমার মাথাটি খাও, নলিনিরে কথা কও,
বল দিদি ভালবাস মোরে।
কোমল বাহুর ডোরে, জড়ায়ে ধরিয়ে মোরে,
আরও সে যে হাসিতে লাগিল,
চোখ্ তার কি যেন কহিল।

(৩)

কথা শূন্য হাসি বালা, হৃদয়ে দিতেছে জ্বালা,
কেন তুই এত নিরদয়?
সুধু হাসি বড় বিষময়।

(৪)

হাস্যময়ী কুসুম সুন্দর
শিশির সিঞ্চিত হয় যদি,
হাস্যময়ী জ্যোৎস্না সুন্দর
যদি সে গো চুমে হ্রদ নদী।
তাই বলি সাধের নলিনি,
অশ্রু ফেল হসিত কপোলে;
অত হাসি শোভে না ভগিনি
কথা-শূন্য অধরের কোলে।

(৫)

(অথবা)

এহৃদয় মরুভূমি, তপ্ত আলো চুমি চুমি,
বাঁচিতে গো পারে না কো আর,
চাহে সে যে বরিষার ধার।

বিবর্ত্তনবাদ।

(২)

আমরা গত পূর্ব্ববারে বলিয়াছি, বিবর্ত্তনবাদের মূল সূত্র প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অবস্থা ভেদে প্রকৃতি ভিন্নতা জন্মে। ডারবিন্ যাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়াছেন, হারবার্ট স্পেন্সার তাহাকেই ভাগ্য নির্ব্বাচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গতপূর্ব্ববারে আমরা সাধারণ ভাবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সূত্র আলোচনা করিয়াছি। এবার একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

কবি জগতের শোভায় মুগ্ধ; রত্নখচিত নীল মেঘ, তরঙ্গায়িত সফেন সমুদ্র, নির্জ্জন নির্ঝরিণী, বিশাল কান্তার, কুসুমের সুরভি, কামিনীর কোমলতা, বীণা ঝঙ্কারে সপ্তমস্বরে গান করিয়া তাঁহার আশা মিটেনা। বৈজ্ঞানিক বিচিত্র যবনিকার অন্তরালে অনুসন্ধানে তৎপর। তাঁহার নিকট বিশাল পৃথিবী বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্র, দিবা-নিশি আত্মীয় স্বজনের কণ্ঠচ্ছেদনে নির্ম্মম জগদ্বাসী নিয়ত প্রবৃত্ত। ঊর্দ্ধে ব্যোম-মণ্ডলে, নিম্নে ভূমিতলে, বায়ু জলে, সর্ব্বত্র জীব অন্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া আপনার স্বার্থ সাধনে কটিবদ্ধ। সংসারে যে পরিমাণে আহার্য্য মিলে, জীব সংখ্যার অনুপাতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আহার্য্যের আবশ্যক। অথচ জীব সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সকলেই তৎপর। বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বৎসরে এক এক দেশের জন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়—অথচ মনুষ্যের সন্তানোৎপাদন শক্তি নানা জীব অপেক্ষা অপ্রখর। একটী হস্তী মিথুনের পুত্র পৌত্র ৭৫০ বৎসরে (১৯,০০০,০০০) প্রায় দুই কোটী হয়—আবার ইহাদিগের সকলেই জীবিত থাকিবে। এই বর্দ্ধমান জীব সংখ্যার উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য চাই। অথচ আহার্য্যের পরিমাণ সংখ্যার উপযুক্ত নহে। আহার্য্য অভাবে মৃত্যু ঘটিবে, সুতরাং কেবল প্রাণধারণের উপযোগী আহার্য্যের জন্য অন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাণান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রত্যেকেই অন্যের শত্রু—প্রতিদ্বন্দ্বী যত হত হইবে, আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা তত অধিক হইবে। আবার আমার এক জাতীয় জীব, আমার সমাবস্থ আমার আত্মীয় কুটুম্ব আমার যত প্রতিদ্বন্দ্বী, এত অসমাবস্থ অন্য জীবে নহে। আমার যাহা চাই—ইহাদিগেরও ঠিক্ তাহাই চাই—সুতরাং সংগ্রাম আত্মীয় কুটুম্বের সহিত অধিক পরিমাণে করিতে হয়। যে যত ভ্রাতৃহত্যা সাধন করিতে সক্ষম, তাহার আত্মোন্নতির সম্ভাবনা তত অধিক। প্রত্যেকের হস্ত আমাকে বধ করিতে উদ্যত, আমার খড়্গ জগদ্বাসী যাবতীয় জীবের বিরুদ্ধে উত্তোলিত, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, এই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা ভীষণ সংসার সংগ্রামে কে বিজয়ী হইবে। যাহার বল অন্যের অপেক্ষা অধিক, যাহার এমন কোন অস্ত্র, এমন কোন গুণ আছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দিগের তাহা নাই—জীবন সংগ্রামে তাহা-

রই বিজয় লাভের সম্ভাবনা অধিক। যাহাদিগের উপায় ক্ষমতা অধিক, যাহারা ভাগ্যবান,—তাহারাই রক্ষা পাইবে—আর এই অনন্ত সংগ্রামের অনুপযুক্ত যাহারা তাহারই নির্ব্বংশ হইবে। এই মহাসত্যের নাম ভাগ্যনির্ব্বাচন। ফলে কি ঘটিতেছে, বিবেচনা কর। প্রাকৃতিক পার্থক্য হেতু স্বজাতীয় অন্যের অপেক্ষা যাহাদিগের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা অধিক, তাহারাই বাঁচিয়া যায় এবং তাহাদিগের সেই প্রাকৃতিক পার্থক্য তাহাদিগের সন্তানগণ পিতা অপেক্ষা উন্নততর আকারে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। সুতরাং সন্তান পিতার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হইয়া অল্পতর আয়াসে প্রতিদ্বন্দীদিগকে পরাভূত করে। এই রূপে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রাকৃতিক পার্থক্য দিন দিন উন্নততর হইয়া যায়; ক্রমে এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যে জীব সর্ব্ব প্রথমে সেই বিশেষণত্বের অঙ্কুর উদ্গত করিয়াছিল, সময়ান্তরে তাহারই বংশধরগণের সহিত তাহার সাদৃশ্য অনুভব করা দুরুহ হইয়া উঠে। তাহার বংশধরগণকে তখন তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। ইহাকেই ডারবিন্ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞাতি বন্ধু সমাবস্থ, আমার যাহা কিছু অভাব তাহাদিগের ও অভাব তাহাই, সুতরাং তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা অধিক। কিন্তু জীবন রক্ষার্থ কেবল স্বজাতির সহিত বিবাদ করিতে হয়, এরূপ নহে। বিভিন্ন জীবের পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় জটিল। স্ত্রী কুসুমে পুরুষ পুষ্পের পরাগ সঞ্চার করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে মক্ষিকা প্রধান সহায়। অতি অল্পজাতীয় কুসুমের প্রত্যেকে স্ত্রী ও পুং যোনির যুগপৎ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ জাতির বিভিন্ন পুষ্পে বিভিন্ন যোনি বিদ্যমান। বায়ু কোথায়ও পুরুষ পুষ্পের পরাগ স্ত্রী কুসুমে সঞ্চালিত করে; সাধারণতঃ এ কার্য্যে মক্ষিকা প্রধান দূতী। মক্ষিকার শত্রু মূষিক, মূষিকের শত্রু মার্জ্জার। সুতরাং কোন্ জাতীয় বৃক্ষে কত ফল উৎপন্ন হইবে, তাহার গণনায় তৎপ্রতিবাসে কতগুলি মার্জ্জার বাস করে, তাহার হিসাব লইতে হয়। জল বায়ু রোগ মৃত্যু আবাস নিবাস প্রান্তর জঙ্গল আহার্য্য বা প্রতিদ্বন্দীতা সকলেরই প্রাধান্য সাপেক্ষ। আবার প্রতিদ্বন্দীর প্রত্যেক বিশেষণত্ব আকৃতি আয়ুধ বল প্রখরতা বিজয় সম্ভাবনা পরিচালিত করে। সেই বিশেষণত্বের সূচনা জীবনের এক অংশে আবদ্ধ নহে। জীবনসংগ্রামে বিজয় লাভের উপযোগী বিশেষণত্ব অতি শৈশবে সূচিত, যৌবনে উৎকর্ষিত, বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতে পারে। অবস্থা পরিবর্ত্তন, সংগ্রাম আবশ্যকতা স্থান কাল পরিমিত নহে; সুতরাং কোন শত্রু কখন নূতন আয়ুধ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করিবে বলিয়া গণনা করা যায় না।

জীবন সংগ্রামের কঠোরতা উপশম করিতে শ্রম বিভাগের স্থাপনা হইয়াছে। যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে সেই কার্য্যের অনুসন্ধিৎসু হইলে প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সকলকে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তথাপি শ্রমবিভাগ ক্রমবিবর্ত্তনের অননুকূল নহে। যে জাতির মধ্যে শ্রমবিভাগ যত অধিক পরিমাণে স্থাপিত হয়, অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে শ্রমবিভাগ সম্পন্ন, অন্য জাতির

অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। এক শ্রেণীর মক্ষিকার ডিম্ব অবস্থানুসারে পুরুষ স্ত্রী বা দাসরূপে পরিণত হয়, অন্য শ্রেণীর মক্ষিকা কেবল পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করে। সুতরাং দাস সহায় মক্ষিকা শ্রেণী দাসশূন্য মক্ষিকাদিগের উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে, সহজে বুঝা যায়। আবার শ্রমবিভাগের মূলসূত্র প্রাকৃতিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষতা, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। সকলে সমগুণ বিশিষ্ট হইলে শ্রমবিভাগ স্থাপিত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক ভিন্নতা অনুসারে কার্য্যকুশলতা ভিন্ন হয়, বিভিন্ন কার্য্যকুশলতা হেতু একশ্রেণীর বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কার্য্য পরায়ণ হইয়া উঠে। সুতরাং শ্রমবিভাগের মূলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন; ফলেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের একটী প্রধান সহায় বিভিন্ন প্রকৃতি স্ত্রী ও পুরুষের সহযোগে সন্তানোৎপাদন। ইহাকে মিশ্র সংযোগ বলা যায়। মিশ্রসংযোগ জীব উৎপত্তির সাধারণ নিয়ম। একদেহ হইতে অন্যদেহের উৎপত্তি অতি অল্প পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। যে সকল পুষ্পে স্ত্রী ও পুং যোনি যুগপৎ আবির্ভূত হয়, তাহাদিগের ও উভয় সংযোগে সন্তানোৎপাদন নিবারণার্থ নানা প্রাকৃতিক বিধান বিহিত আছে। যে সকল জীবের পক্ষে এরূপ কোন বিধান নাই, তাহারাও মিশ্রসংযোগ লাভ করিলে বলবত্তর সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে। পিতা মাতা ভিন্ন প্রকৃতি, সন্তান উভয়ের প্রকৃতি অনুসরণ করে, সে মিশ্র প্রকৃতি পিতা মাতা কাহারও প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। ফলে নিত্য নূতন প্রকৃতির অভ্যুদয় হইতেছে।

অবস্থা পরিবর্ত্তনে প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা রক্ষিত, অপকৃষ্টগুলি পরিত্যক্ত হইতেছে। উৎকৃষ্ট প্রকৃতি উৎকৃষ্টতররূপে পুত্র পৌত্র উত্তরাধিকার করিতেছে, ইহা সাধারণ নিয়ম, তথাপি পরিবর্ত্তন অনুরূপ নহে। পরিবর্ত্তন যে প্রকৃতির উপর আপন প্রাধান্য পরিচালিত করিতেছে, সে প্রকৃতি ভিন্ন, যে অবস্থায় সে প্রকৃতি অবস্থিত, অন্য প্রকৃতির অবস্থা হইতে তাহা ভিন্ন। সুতরাং উত্তরাধিকারীগণ একপক্ষে যেমন পূর্ব্বপুরুষ হইতে ভিন্ন প্রাকৃতিক হইয়া পড়ে, অন্য পক্ষে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসদৃশ্য ঘটিয়া থাকে। আবার বৈসদৃশ্য যত অধিক হয়, জীবনরক্ষার সম্ভাবনা তত অধিক হইতে থাকে। আমার যাহা অভাব তোমার তাহার অভাব না হইলে, তোমার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দীতার কারণ থাকে না। জগতে ভিন্নাবস্থ অনেক স্থান অপূর্ণ রহিয়াছে, আমার উপযোগী একটী স্থান অনুসন্ধান করিয়া তাহারই আশ্রয়ে জীবনপাত করিতে পারি। দুর্ব্বলের বিনাশ ও প্রবলের প্রাধান্য বিবর্ত্তনবাদের মূলসূত্র। তথাপি নানা শ্রেণী দুর্ব্বল নিকৃষ্ট জীব জগতে অদ্যাপি বিদ্যমান, উৎসন্ন হয় নাই। বিশাল বটবৃক্ষের পার্শ্বদেশে বায়ু তাড়িত তৃণগুচ্ছ, দেবোপম মনুষ্যের আবাস সান্নিধ্যে নিকৃষ্ট অন্ধ কীটাণু, যে বনে কেশরী গর্জ্জন করে, সে বনে মূষিকের অভাব নাই। যদি ক্রমবিকাশ সৃষ্টির নিয়ম, নিত্য উন্নতি, উন্নত হইতে উন্নততর, অনন্তকাল শ্রীবৃদ্ধিমান ভুবন, তবে উন্নতের পার্শ্বে অবনত, উচ্চের পার্শ্বে নীচ, মনুষ্যের পার্শ্বে বানর, সিংহের আবাসে শৃগাল কেন? ইহার কারণ এই যে তাহারা আপনাদিগের উপযোগী যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার প্রতি-

দ্বন্দ্বী নাই। অথচ সে স্থান তাহাদের উপযোগী, তাহাদিগের অভাব মোচন করে, বিনাশ হইবার কারণ ঘটে নাই। কি বৈসদৃশ্য, কি উৎকর্ষাপকর্ষ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সূত্রে অতি গূহ্য কূট প্রশ্নের সহজে মীমাংসা হয়। যাহারা আপন উপযোগী আবাস স্থান সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং যাহারা হইয়াছিল তাহারাই যে আছে, তাহাও নহে। জীব পর্য্যায়-ক্রমানুশরণ এজন্য তুরুহ হইয়াছে, যাহারা ছিল তাহারা থাকিলে জীববৃক্ষ মূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত চিত্রিত করিতে বৈজ্ঞানিকগণকে তত কষ্ট পাইতে হইত না।

বিবর্ত্তনবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার নাই, আমরা বলি না। ডারবিন্ বর্ত্তমান বিবর্ত্তনবাদের প্রধান আচার্য্য। সত্যপ্রিয়তা তাঁহাকে বিবর্ত্তনবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। বিবর্ত্তনবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি বলিবার আছে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তিনি তুলা দণ্ডে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে বিবর্ত্তনবাদের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ প্রতীত হইলে তিনি আপন মত ঘোষণা করেন। বিবর্ত্তনবাদের প্রতিবাদীগণ যে সকল কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং সে গুলি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিজেই তাহার মীমাংসা করিয়া যান।

ক্রমবিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিকৃষ্ট জীব এক লম্ফে উৎকৃষ্ট পদবী আরোহণ করে নাই, সহস্র সহস্র মধ্যবিধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীব শ্রেণী উভয়ের ব্যবধানে আবির্ভূত হইয়াছিল, এই সহস্রের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যা এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবহিত অপরশ্রেণী সকল কোথায় গেল? তাহারা পরিলক্ষিত হইলে বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি না হইতে পারিত। কিন্তু সে গুলির অবর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে না। বিবর্ত্তনবাদের সূত্র সম্পূর্ণ প্রতীত হইলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়। ইতিপূর্ব্বে যে ভয়ঙ্কর সংসার সংগ্রামের নিত্য ও অনন্ত অবস্থিতি আমরা প্রমাণ করিয়াছি, সেই সংসার সংগ্রামে বলবত্তর বিশেষণ সম্পন্ন ভাগ্যবান জীবের হস্তে দুর্ব্বলতর আয়ুধ শূন্য দুর্ভাগ্যদিগের সম্পূর্ণ বিলয় হয়, তাহাদিগের কঙ্কালরাশি সোপান রূপে ভাগ্যবান জীবের ঊর্দ্ধগতির সাহায্য করে, এ কথাও বলা গিয়াছে। বিজীগিষা ও জীঘাংসা আত্মীয় স্বজন সমাবস্থ বা প্রায় সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট জীবের বিরুদ্ধে অধিকতর প্রখরভাবে প্রয়োজিত হয়, সেই জন্যই প্রত্যেক শ্রেণী হইতে ঈষৎ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট অন্যান্য শ্রেণীর সম্পূর্ণ লোপ হইয়াছে। তবে এখনও যে অল্পসংখ্যক মধ্যব্যবহিত শ্রেণীর উদ্দেশ পাওয়া যায়, মধ্যবিৎ শ্রেণী সকল একবারে উৎসন্ন হয় নাই, দিগন্তব্যাপী বাহু সম্পন্ন, সহস্র পথিকের আশ্রয়ভূমি বিশাল বিটপী পার্শ্বে শ্যামল শিশিরসিক্ত দুর্ব্বারাশি এখনও নয়ন মন রঞ্জন করে,সে কেবল প্রাকৃতিক পার্থক্যের আধিক্য হেতু, প্রতিদ্বন্দ্বীর অল্পতা প্রযুক্ত, বিবাদশূন্য আশ্রয় ভূমির উপযোগীতার ফল, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। বিবর্ত্তনবাদ বুঝিতে হইলে, আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কোন একটী নূতন শ্রেণীর উৎপত্তি হেতু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেণীর সকলেরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেণীর একটী জীব

পরিবর্ত্তিত হইলে পরিবর্ত্তিত নূতন শ্রেণী উৎপাদন করিতে পারে। সেই শ্রেণীর অন্যান্য জীব অপরিবর্ত্তিত স্বজাতীয়ের উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, কিন্তু তাহার একের অভাব মোচনার্থ তজ্জাতীয় সকলের বিনাশ সাধন আবশ্যক হয় না। তাহার সন্তান সন্ততি পরিবর্ত্তিত নবশ্রেণী অপরিবর্ত্তিত পূর্ব্বতন শ্রেণীর সহিত বিবাদ করে, বিবাদে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, তথাপিও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনতা হেতু তাহাদিগের অভাব পূর্ব্বতন শ্রেণীর অভাব হইতে কিছু ভিন্ন এবং সেই ভিন্নতা হেতু পূর্ব্বতন শ্রেণীর সকলের বিনাশ সাধন করিবার আবশ্যক না হইতেও পারে। অপরপক্ষে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন না ঘটায় তাহারা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থার উপযোগীই থাকিয়া যায়, অচেতন জগতের নূতন শত্রুতা সহ্য করিতে হয় না। এইরূপেও দু একটী প্রাচীন শ্রেণী রক্ষা পায়। কিন্তু তাই বলিয়া পিতা ও পুত্র, কারণ ও কার্য্য, উৎপন্ন ও উৎপাদক সকল শ্রেণী যুগপৎ আবির্ভূত থাকিবে, বিবর্ত্তনবাদে বিশ্বাস করিয়া সংসার সংগ্রামের কঠোরতা প্রত্যক্ষ করিয়া এরূপ আশা করা উপযুক্ত নহে। ভাগ্যবান জীবের আয়ুধ সকলের উৎকর্ষতা দিন দিন যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার বলে ততই সে দুর্ব্বলতর আত্মীয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, অপর পক্ষে পূর্ব্ব কথিত প্রাচীন শ্রেণী সকলেও মধ্যবিধ শ্রেণীর উপর অত্যাচার করে, এইরূপে মধ্যবিধ জীব শ্রেণী সহস্রে সহস্রে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে আর একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। একশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তন হেতু একটী শ্রেণী দুই তিনটী বা ততোধিক শ্রেণী উৎপাদন করিতে পারে। এই সকল নূতন শ্রেণীর মধ্যে অন্য মধ্যবিধ শ্রেণী বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং এরূপ দুইটী শ্রেণীর মধ্য ব্যবহিত অন্য শ্রেণীর উদ্দেশ করিলে বিফলযত্ন হইতে হইবে। অনেকে মনে করেন, আচার্য্য ডারবিনের মতে মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তজ্জন্য মনুষ্য ও বানরের মধ্যব্যবহিত শ্রেণীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন; কেহ বা সেরূপ শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াও কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ডারবিন্ মনুষ্যকে বানরের অপত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে পূর্ব্বতন একশ্রেণীর বিভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্য দিয়া একপক্ষে বানর ও অপর পক্ষে মনুষ্য উভয় শ্রেণী উৎপাদন করিয়াছে, সুতরাং বানরও মনুষ্যের মধ্যে ব্যবহিত "লুপ্ত" শ্রেণীর অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র।

তথাপিও যে দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহিত অন্যশ্রেণী সকল এক সময়ে বিদ্যমান ছিল, সংসার সংগ্রামে বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের পূর্ব্বতন সত্বার জাজ্বল্য প্রমান ধরণী বক্ষে বিরাজিত থাকিবার সম্ভাবনা। ভূপৃষ্ঠ হইতে যাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে, ভূস্তরে তাহাদিগের কঙ্কালরাশী না মিলিবে কেন? বিবর্ত্তনবাদের সত্যানুসন্ধায়ী অক্লান্ত পরিশ্রমে ভূস্তর পরীক্ষা করিতেছেন, কিয়ৎপরিমাণে লুপ্ত শৃঙ্খল পুনরুদ্ধৃত হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কঙ্কালরাশী পাঠগৃহে পারিপার্শ্বিক সুসজ্জিত করিয়া যখন তাহাদিগের সাদৃশ্য ও বৈসদৃশ্য পরীক্ষা করিতে উপবিষ্ট হন, তাঁহার হৃদয় পুলকে পূর্ণিত হয়। তথাপি সে কঙ্কাল প্রমাণিত লুপ্ত শ্রেণী সকলের

ব্যবহিত শত শত অন্য শ্রেণীর সত্বার কোন প্রমাণ অদ্যাপিও মিলে নাই। যাহা মিলিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ হইলেও যাহা মিলে নাই তাহার তুলনায় যাহা মিলিয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। বিবর্ত্তনের প্রতিবাদীগণ একথা সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিবর্ত্তনবাদের বিরুদ্ধে একথা গুরুতর হইলেও বিবর্ত্তনবাদীর সাপেক্ষ অনেক কথা বলিবার আছে। যে বিশাল বিস্তৃত ধরণী বক্ষে পর্ব্বত কান্তার নদ নদী দ্বীপ সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার কোটী অংশের একাংশ ভূতত্ত্ববিদ অদ্যাপি পরীক্ষা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, যে কোটী কোটী বৎসরে স্তরে স্তরে পৃথিবী উৎপন্ন ও স্তরে স্তরে জীবকঙ্কাল সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, মুহূর্ত্তমাত্র পরমাণু পরীক্ষায় নিয়োজিত করিয়া বিশাল ধরণীবক্ষে কি অমূল্যরত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার পরীক্ষা শেষ হইল কে বলিবে? নিউটনের মত ভূতত্ত্ববিদ্ বলিতে পারেন, বেলাভূমে উপলখণ্ড সংগ্রহে এত দিন অতিবাহিত হইল, বিশাল বারিধি পুরোভাগে পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ বিরাজ করিতেছে। যে সামান্য পরীক্ষা সাধিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের যৌক্তিকতার যাহা সহায়তা সাধিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রামাণিকতা প্রতীত হইতেছে, ভূস্তর বিস্তীর্ণও বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চল, পরিণামে লুপ্তশ্রেণীর পূর্ব্ব সত্বার প্রমাণ না পাইলে অবিশ্বাস করিতে পারিবে। পরীক্ষা না করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিও না। এক কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। লক্ষ লক্ষ বৎসর কঙ্কাল রক্ষা হেতু অবস্থা বিশেষের আবশ্যক। সর্ব্বত্র যে সে সুবিধা ঘটিয়াছে, অনুমান করিবার কারণ নাই। আমরা কত যত্ন করিয়া গৃহপালিত বা মৃগয়া-হত পশুপক্ষীর চর্ম্মকঙ্কাল রক্ষা করিতে পারিতেছি না। ধরণীবক্ষে সেই কারণেও কত জীবের কঙ্কাল মৃত্তিকা মধ্যে মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে কিরূপে বলিব? সহস্র সহস্র বৎসরে ভূতত্ত্ববিদ্ লুপ্ত শ্রেণীর সহস্র প্রমাণ ভূস্তরে আবিষ্কার করিবেন, কিন্তু সকলগুলিই যে পাইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের প্রমাণ ভূপৃষ্ঠে ও ভূস্তরে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজের কঙ্কাল নাই; সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রমাণ ধাতু ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদিরূপে ভূস্তরে এবং বিভিন্ন পরিমাণে উন্নত জাতির বর্ত্তমান সমাজে ভূপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে অতি অল্প দিনের ইতিবৃত্ত মিলে। কোন একটী জাতি কিরূপে বর্ত্তমান সভ্য অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিচার করিতে হইলে বর্ব্বর ও সভ্য সমাজের ব্যবহিত যে সকল বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা করিতে হয়। নতুবা কোন এক জাতির বর্ত্তমান ও প্রাচীন সমাজের মধ্য ব্যবহিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কোথায় কিছু পাওয়া যাইলে তাহাও যথেষ্ট হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ সাধারণী সম্পাদক মানব প্রকৃতি সমালোচন কালে বলিয়াছিলেন, কোথায় একটী শিশু ভূমিষ্ঠ, কোথায়ও বাললীলা-পরায়ণ, কোথায় ও যৌবন-বিলাসে প্রমত্ত, কোথায় ও বার্দ্ধক্যে প্রব্রাজিত দেখিলে একই মনুষ্য যে এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে, ইহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু জাতি বিশেষের সামাজিক সহস্র

পরিবর্ত্তন নিদর্শন অভাব স্মরণ করিলে এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিতেন বোধ হয় না।

অবস্থা পরিবর্ত্তনে শারীরিক পরিবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও অবস্থা পরিবর্ত্তনে মানসিক পরিবর্ত্তন হয়, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ক্রমে মানসিক ক্রমোন্নতি হইয়া পশু বুদ্ধি ক্রমে মানবীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। এক দিকে পশু বুদ্ধি হইতে নরবুদ্ধি কত্ত বিভিন্ন। না হয় বুঝিলাম, কীটাণু হইতে মনুষ্য আকার যদি এত বিভিন্ন হইতে পারে পশুবুদ্ধি হইতে নরবুদ্ধি ও সেইরূপ আকাশ পাতাল ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অন্য পক্ষে পশুবুদ্ধি স্বভাবতঃ সম্পূর্ণ; তাহাতে নূন্যাধিক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ পশুবুদ্ধি ভূয়োদর্শনের অতীত, মনুষ্য বহু দর্শনে যে জ্ঞান লাভ করে, পশু পক্ষী জন্মাবধি সেই জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং পশুবুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয় বা ক্রমবিকাশ হয়; একথা সাধারণ লোকে স্বীকার করিবে না। বিবর্ত্তনবাদের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত যতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, পশুবুদ্ধির সম্পূর্ণতার আপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, কিন্তু এ আপত্তিও বিবর্ত্তনবাদী খণ্ডণ করিতে প্রস্তুত। কিরূপে বুদ্ধির উৎপত্তি হয়, সে রহস্যের মীমাংসা করিতে এখানে আমরা অপেক্ষা করিব না। আদৌ কি রূপে আকৃতির উৎপত্তি হয়, তাহাও আমরা বিচার করি নাই। আকৃতির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া অবস্থা পরিবর্ত্তনে কিরূপে আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, আমরা এতক্ষণ বিচার করিয়াছি। এখনও বুদ্ধির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া পশু বুদ্ধির পরিবর্ত্তনশীলতা প্রতিপন্ন করিব, পশু বুদ্ধির অপূর্ণতা দেখাইব, এবং একই কার্য্যে বিভিন্ন পশু পক্ষী কিরূপে উচ্চানুচ্চ বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাহারও প্রমাণ দিব। বিবর্ত্তনবাদের মূল সূত্র, সকলেই আপনার স্বার্থ অনুসন্ধান করে—পরার্থে কেহ আপন ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, বরং পরক্ষমতা আপন স্বার্থ সাধনে প্রণোদিত করে। পশুবুদ্ধিরও এই লক্ষণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কেহ কোন দিন দেখে নাই, কোন পশু বা কোন পক্ষী আপন বুদ্ধি পরোপকার সাধনে নিয়োজিত করিয়াছে। অন্য পক্ষে পরদ্বারা আপন কার্য্য সাধন করাইবার দৃষ্টান্ত ভূরী ভূরী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের পরভৃত কোকিলের ন্যায় য়ুরোপ আমেরিকা ও আফরিকায় অনেক পক্ষী (cuckoo, Molothrus)—দেখা যায়, যাহারা আপনাদিগের সচ্ছন্দতার জন্য অন্য পক্ষীর দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়। কেহ কেহ নীড় নির্ম্মাণের পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অন্য শ্রেণীর পক্ষী বিশেষের বাসস্থান বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লয়। কাকুর শিশু সন্তান যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের সহিত বিমাতা কর্ত্তৃক এক নীড়ে প্রতিপালিত হয়, আপন চক্ষু ফুটিবার পূর্ব্বেই বল পূর্ব্বক বাসস্থান হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করে। সে পিতার পুত্র সে বাসস্থান বিচ্যুত হইয়া তরুমূলে জীবন সম্বরণ করে—আর মায়ান্ধ পিতা অবিরত পরিশ্রম করিয়া বহুজনের খাদ্য এক জনকে খাওয়াইয়া পরের সন্তান প্রতিপালন করে। দুদিন পরে ক্ষমতা জন্মিলে সেই পোষ্যপুত্র পালক পিতাকে "ছোট লোক" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া

স্বজাতি সঙ্গতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক শ্রেণীর পিপীলিকা দুর্ব্বলতর শ্রেণীর পিপীলিকাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও গোলাম করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া গোলামের দ্বারা কিরূপে সকল কার্য্য করাইয়া লইয়া দিনপাত করে, অনেকেই বোধ হয় বিদিত আছেন। অন্য পক্ষে যাহাতে আপনার স্বার্থ নাই, অন্যের উপকারার্থ সেরূপ কার্য্য করিতে কে কবে কোন পশুপক্ষীকে দেখিয়াছেন? উচ্চতর পশুপক্ষীর মধ্যে মানসিক বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের, সকলেই অবগত আছেন। শালিকার অপেক্ষা কাকের বুদ্ধি অধিক, একথা সকলেই বলিবে। আবার একই শ্রেণীর কুকুরের ভিন্ন ভিন্ন মেলে বুদ্ধির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। টেরিয়ারের বুদ্ধি এক রকম, পইণ্টারের বুদ্ধি অন্যরূপ, হাউণ্ডের বুদ্ধি যে পক্ষে প্রচালিত, পুডুলের বুদ্ধি সে পক্ষে নহে। এক মেলের বিড়াল কেবল বড় ইঁদুর মারিয়া থাকে, আর এক মেলের বিড়াল কেবল নেংটী ইদুঁর বধ করিতে পটু—বড় ইদুঁর মারিতে কিছু মাত্র যত্ন করে না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এক এক শ্রেণীর জীবের বুদ্ধি এক এক প্রকার বিকশিত হইয়াছে। উচ্চতর পশুপক্ষীর মধ্যে যে বুদ্ধির পর্য্যায় দৃষ্টি হয়, নিম্নতর পশুপক্ষীর মধ্যে তাহা নাই, অনুমান করা অসঙ্গত।

পশুবুদ্ধি সম্পূর্ণ নহে—অর্থাৎ সকল অবস্থার উপযোগী নহে। যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় তাহার বুদ্ধি অনেক সাহায্য করে বটে, কিন্তু অবস্থান্তর ঘটিলে সে বুদ্ধি কার্য্যকারী হয় না—হয় বহুদর্শনে সে বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত, নয়ত অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাহার প্রাণান্ত ঘটে। বন্য কপোত পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছি, তরুশাখে বাস কালে সে কি খাইত জানি না, কপোতেরা যাহা যাহা খায় তাহা জানি, সেই জাতীয় পক্ষী যাহা খায় তাহা জনি। যত্নে আহার পানীয় দিয়া সাবধানে প্রতিপালন করিলাম, পানীয় জল সর্ব্বত্র সমান; পিঞ্জরবাসী বন্দী কেবল জলপান করিয়া কয়েকদিন প্রাণধারণ করিল, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্য কিছুই গ্রহণ করিল না। রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া কপোত মিথুন আমাকে অভিসম্পাৎ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। স্বাধীনতার অভাবজনিত বিষাদে তাহাদের মৃত্যু হয় নাই, তাহাদের ব্যবহারে তাহা জানিয়াছিলাম। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত বুদ্ধির পরিবর্ত্তন ঘটিল না, সম্পূর্ণ বুদ্ধি অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইল। আবার যে বুদ্ধি প্রতারিত হয়, সে বুদ্ধিকে কিরূপে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। পক্ষী বা পশুবিশেষ তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের অনুরূপে নির্ম্মিত অখাদ্যে কতবার প্রতারিত হয়, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। জলভ্রমে কাচে প্রতারিত হইয়া নানা জাতীয় কীট জানালার শাসীতে মস্তক চূর্ণীত করে, হরিণের মরিচিকায় জলভ্রম কবিকল্পনা নহে। যে মাঠে যে পশুযুথ নিরন্তর চরিয়া থাকে, সে মাঠে আপন খাদ্যের অনুরূপ যে যে বিষতৃণ জন্মিয়া থাকে, তাহারা তাহা চিনে, কিন্তু সে মাঠে নূতন পশু চরিতে আসিলে তাহারা বিষতৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ হারায়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, গতিশীল অচেতনে চেতন ভ্রম, পশুপক্ষীর সদাই ঘটিয়া থাকে। মাছিরা পচা মাংসের উপর ডিম্ব প্রসব করে, পচা পাতের দুর্গন্ধে পচামাংস অনুমান করিয়া তাহার উপর ডিম্ব প্রসব করিতে নানা

মেলের মাছীকে দেখা গিয়াছে। (Stapelia hersuta) নামক গাছের পাতার বড় দুর্গন্ধ, পচামাংস ভ্রমে তাহারও উপর (Flesh fly) কোন কোন মেলের মাছী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। পাইন পত্র ভ্রমে প্রতিবাসী ওকপত্রে পাইন কীট ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। পক্ষীরা অনেক সময়ে একটী নীড় নির্ম্মাণ করিতে করিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন নীড় নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হয়—প্রথম নীড় নির্ম্মাণকালে তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, বাসস্থান আপনাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে না। যে সকল পক্ষী কাদা দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে, কখন কখন রাস্তার কাদা সুরকী তুলিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে তাহাদিগকে দেখা গিয়াছে, কাদার নির্ম্মিত ঘর যত দিন টেঁকে, সুরকী কাদার ঘর তত দিন টেঁকে না। কয়েক দিন পরে ভাঙ্গিয়া গেলে আবার নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণের কষ্ট তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। নদীতটে যে সকল কচ্ছপ বাস করে, তাহারাও নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু বারম্বার বাসস্থান নূতন নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হয়।

আবার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশু বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। লেমনেড্ বোতলের তার কুড়াইয়া কলিকাতার একটী বায়স কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম। পত্রের অভাবে গাভীগণ কাগজ ও কাপড় খাইতে শিখে; যে সকল পক্ষী কেবল ধান খায়, তাহাদিগের ধানের সহিত ছোলা মিশাইয়া দিলে প্রথমতঃ তাহারা ছোলা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধানই খাইয়া থাকে, ক্রমে ছোলা খাইতে এত ভালবাসে যে, ছোলা পাইলে ধান খায় না। একটী কাকাতুয়া স্বাধীন অবস্থায় কেবল ফুল ফল ও কীট খাইয়া প্রাণ-ধারণ করিত, গৃহবাসী হইয়া সে এত মাংস খাইতে শিখিয়াছিল যে, জীবন্ত মেষের দেহ হইতে আমমাংস ভক্ষণ করিতে অনেক সময় চেষ্টা করিত। একজন কাকাতুয়ার দ্বারা মাছ ধরাইতেন। একটী দ্বীপে গাভীগণ তৃণ অভাবে মৎস্য খাইয়া প্রাণধারণ করে, আফগনিস্তানে গাভীগণ শুষ্ক মৎস্য আহার করে, এবং নরওয়ের উত্তর ভাগে গাভীগণ সিদ্ধ মৎস্য খাইয়া থাকে। চিলিদেশে একটী ঘোড়া পারাবাত ও কুক্কুট ধরিয়া ভক্ষণ করিত। ভীতিশক্তিও অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে পশুপক্ষী মনুষ্যকে তত ভয় করিত না, কিন্তু শিকারীর বন্দুকে আত্মীয় স্বজনকে হত হইতে দেখিয়া তাহারা এক্ষণে মনুষ্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। বড় বড় পশুপক্ষী শিকারীর হস্তে অধিক পরিমাণে হত হয়, এজন্য সেখানে ছোট ছোট পশু পক্ষী অপেক্ষা বৃহত্তরগণ মনুষ্য হইতে দূরে থাকিতে অধিক চেষ্টা করে। তুমি তোমার কুকুরের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিয়া দেখ সে কিছু মাত্র ভীত হইবে না, কিন্তু শিকারী কুকুরের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করে, বন্দুক লক্ষ্যের কি ফল সে শিখিয়াছে, বন্দুক তুলিবা মাত্র সে সহস্র হস্ত দূরে পলায়ন করিবে, নতুবা ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া তোমার চরণতলে শরণ লইবে। বিবরের গৃহ নির্ম্মাণের কথা সকলেই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু শিকারীর অত্যাচারে ফ্রান্স ও জর্ম্মান দেশে বিবর গৃহ নির্ম্মাণ পরিত্যাগ করিয়া এখন বিবরে বাস করিতে শিখিয়াছে। নীলনদের পার্শ্ববাসী পারাবতগণ বাৎসরিক প্লাবনে গৃহচ্যুত হইয়া এখন হংসের ন্যায় নদীজলে সন্তরণ দিতে শিখিয়াছে, সমুদ্রতটে

দ্বীপের বিবরে যে সকল পক্ষী বাস করে, স্থানান্তরে বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকেই বাস করিতে দেখা গিয়াছে। সাগরতটে ডিম্বান্বেষীর অত্যাচারে তাহারা এই নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

একইশ্রেণী পক্ষীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়, ইংলণ্ডে ককু বিজাতীয় পক্ষীর কুলায় ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়, কিন্তু আমেরিকায় সেই একই ককু আপন কুলায় ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার পর আপনি তাহা পোষণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। যে দেশে সূর্য্যকিরণের প্রখরতা অত্যন্ত অধিক, সে দেশে অষ্ট্রিচ্ দিবসে সূর্য্যোত্তাপে ডিম্ব ছাড়িয়া দিয়া কেবল রাত্রিতে দেহের উত্তাপে পোষণ করে, কিন্তু যে দেশে সূর্য্যোত্তাপের প্রখরতা অধিক নহে, সে দেশে দিবানিশি সেই একই পক্ষী ডিম্বের উপর বসিয়া থাকে। আমাদের দেশে হংসগণ মাঝে মাঝে ডিম্ব ছাড়িয়া আহার অন্বেষণ করিতে বহির্গত হয়। কিন্তু শীত প্রধান মণ্ডলে তাহারা মুহূর্ত্ত মাত্র ডিম্ব পরিত্যাগ করিয়া যায় না। এক শ্রেণী পিপীলিকা সুইজারলণ্ডে অনেক গুলি গোলাম সংগ্রহ করিতে পারে। সে দেশে গৃহকর্ত্তা নিশ্চিন্ত হইয়া দিনপাত করেন--গৃহদ্বার উদ্ঘাটন ও বন্ধন গোলাম করিবে, আহারান্বেষণ কার্য্য গোলাম করিবে, নূতন বাসস্থান অন্বেষণ গোলাম করিবে—নূতন বাসস্থানে যাইতে হইলে গোলাম মুখে করিয়া কর্ত্তাকে বহিয়া লইয়া যাইবে। সেই একই শ্রেণী পিপীলিকা ইংলণ্ডে তত-গুলি গোলাম সংগ্রহ করিতে পারে না—ইংলণ্ডে গোলামেরা জামাই আদরে রক্ষিত হয়, সামান্য গৃহ কার্য্য করিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়—গৃহের বাহিরে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সুইজারলণ্ডে গোলাম যাহা করে, ইংলণ্ডে কর্ত্তাকে তাহার সকলি করিতে হয়; পরন্তু নূতন বাসস্থানে যাইবার সময় কর্ত্তা গোলামকে বহিয়া লইয়া যান!

এইরূপে মধুচক্র, পক্ষীকুলায়, পিপীলিকার গৃহনির্ম্মাণ, দাস রক্ষা, সকল কার্য্যেই এক জাতির মধ্যে অবস্থানুসারে বুদ্ধি বিভিন্নতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কি শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র অবস্থা-পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। বিবর্ত্তনবাদ বিবিধ গূঢ় রহস্যের মন্ত্রোদ্ভেদী।

যাবতীয় জীব বিবর্ত্তনক্রমে জীবান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সাধারণতঃ এ সত্যের আমরা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম; বারান্তরে মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাইবে। গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বাগ্রে আত্ম পরিচয় লও।"

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়।

(শেষ প্রস্তাব।)

অনীশ্বরবাদী তার্কিক বলিলেন যে, জ্ঞান ভিন্ন কি কৌশল উৎপন্ন হইতে পারে না? ঘটনাক্রমে কি কৌশল হইতে পারে না?

ঘটনাক্রমে কৌশল উৎপত্তি কি প্রকার? গত রাত্রে আমি শয্যায় গমন করিবার সময় একটা দোয়াত, কলম ও কাগজ বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, ঐ তিনের সহযোগে একটী প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এ কথায় কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? যদি জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কেবল মাত্র জড় পরমাণুর সংযোগে এমন অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কেবল দোয়াত, কলম, কাগজের সংযোগে একটী প্রবন্ধ রচিত হইবে. আশ্চর্য্য কি?

মহাত্মা থিওডোর পার্কার এই কথাটী বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানব্যাপী বায়ুতে যে জ্ঞান কৌশল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে জগতের সমুদয় সাহিত্যদর্শন কিছুই নহে।

ছাপাখানার টাইপ সকল ঘটনাক্রমে বিশেষ ভাবে বিন্যস্ত হইল, ঘটনাক্রমে তাহাতে কালি সংযুক্ত হইল, ঘটনাক্রমে তাহার উপর কাগজ আসিয়া পড়িল; ঘটনাক্রমে এক আশ্চর্য্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। ইহা কি অসম্ভব? ইহা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দুরবগাহ্য জ্ঞানপূর্ণ এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ডবেদ জড় পরমাণু হইতে সংরচিত হইয়াছে, একথা কি অনন্তগুণে অধিক অসম্ভব নয়?

রন্ধনশালায় চিনি, ছানা, কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিলাম, কিছু কাল পর গিয়া দেখি, ঘটনাক্রমে সামগ্রী গুলির উপযুক্ত সংযোগ হইয়া অতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা কি অসম্ভব? ইহা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে যে ব্রহ্মাণ্ডের এককণা মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে নিউটন, বেকন, আরিষ্টটল, আর্য্যভট্টের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়, তাহা অন্ধ জড়শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি হাস্যের কথা নহে?

কখন কোন কৌশল কি ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে না? এমন সামান্য প্রকার কৌশল ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে যাহাকে কৌশল বলিলে হয়, নাও বলিলে হয়। মনে কর, তুমি একস্থানে দেখিলে যে, একঘটি জল ও এক জোড়া খড়ম রহিয়াছে। এখানে তুমি মনে করিতে পার যে, কোন ব্যক্তি পদধৌত করিয়া খড়ম পরিবে বলিয়া ঐরূপ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে,বিভিন্ন অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তি জলপাত্র এবং অপর এক ব্যাক্তি খড়ম রাখিয়া গিয়াছে। জলপাত্র ও খড়মের একত্র সমাবেশে ব্যক্তিবিশেষের অভিপ্রায় থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে।

কিন্তু এই ঘটি ও খড়ম সম্বন্ধে যেমন মনে করিতে পার যে, উহা ঘটনাক্রমে হইয়াছে, অন্যান্য সকল স্থলে কি সেই রূপ মনে করিতে পার? চক্র, কাঁটা, স্প্রিং প্রভৃতি ঘটনাক্রমে এমনি সংযুক্ত হইয়া গেল যে, একটী সুন্দর ঘটিকাযন্ত্র চলিতে লাগিল, ঠিক্ সময় বলিয়া দিতে লাগিল। কোন বুদ্ধি-

জীবী ব্যক্তির কর্তৃত্ব ব্যতীত কেবল জড়পদার্থের সংযোগ বিয়োগে একখানিবাষ্পীয়যন্ত্র প্রস্তুত হইল, স্থলপথে ও জলপথে মনুষ্যের কার্য্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেক কিছু জানেনা; কেবল অন্ধ জড়শক্তি হইতে ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত হইল। এ প্রকার ঘটনা কি সম্ভব? এপ্রকার ঘটনাহ কি কেহ কখন দেখিয়াছেন?

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। একদিন ঘটনাক্রমে ঘটি ও খড়ম একত্র হইতে পারে, দুই দিন বা তিন দিন হইতে পারে; কিন্তু যদি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে চিরদিন ঐরূপ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে পার যে, উহা ঘটনাক্রমে ঘটিতেছে? অপরিবর্ত্তনীয় রূপে চিরদিন (invariably) যাহা সংঘটিত হয়, এরূপ ঘটনাকে কেহ কখন অনিচ্ছা-সম্ভূত আকস্মিক ঘটনা বলে না; বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

মনে কর, এমন একজন লোক আছে যে, সে যখন তাস খেলিতে বসিয়া তাস কাটাইয়া দেয়, প্রতিবারে প্রত্যেকের হস্তে ঠিক্ এক প্রকার কাগজ পড়ে। সে ব্যক্তি যখন যেখানে তাস খেলিতে বসিয়া তাস কাটাইয়া দেয়, তখনই সেখানে ঠিক্ এক কাগজ সকলের হাতে পড়িবেই পড়িবে। এরূপ দেখিলে কি তুমি বলিবে যে, উহা ঘটনাক্রমে হইতেছে? দুই একবার হইলে বলিতে পার, ঘটনাক্রমে হইল। কিন্তু যদি দেখ যে, অপরিবর্ত্তনীয় রূপে চিরদিন ঐ প্রকার ঘটিতেছে, তাহা হইলে ঘটনাক্রমে হইতেছে এমন কথা বলিবার পথ থাকে না।

মনে কর একজন পাসা খেলিতে বসিয়া যখনই পাসা ফেলে, তখনই 'কচেবারো' হইয়া যায়; একবার নয়, দুইবার নয়, যখন, যেখানে যায়, যাহাদের সঙ্গে সে ব্যক্তি পাসা খলিতে বসে, তখনই সেখানে পাসা ফেলিবামাত্র 'কচেবারো' হইয়া যায়। এরূপ হইলে কি বলিতে পার যে, উহা ঘটনাক্রমে হইতেছে। নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, সেই লোকটী এমন নিপুণ খেলোয়াড়, তাহার হাতের কস্ত এমন চমৎকার যে, যখনই সে পাসা ফেলে তখনই 'কচেবারো' হইয়া যায়।

এখন দেখ, এই সুবিশাল প্রকৃতিরাজ্যে যে শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার কার্য্য কি প্রকার? সে শক্তি যখনই পাসা ফেলিতেছে, তখনই কি 'কচেবারো' হইতেছে না? জড়রাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য, প্রাণীরাজ্য যেখানে কেন দেখ না, সর্ব্বত্রই 'কচেবোরা'।

পঞ্চভূতের মধ্যে দেখ। অচিন্তনীয় কাল হইতে বিশেষ পরিমাণ হাইড্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত হইতেছে, আর জলের সৃষ্টি হইতেছে। চিরদিন এ প্রণালী চলিতেছে; সংসারে কখনই জলের অভাব হয় না। প্রতিবারেই বা 'কচেবারো' বিশেষ পরিমাণ নাইট্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন মিশ্রিত হইতেছে, আর বায়ুর উৎপত্তি হইতেছে। কখনই বায়ুর অভাব হয় না। প্রতিবারেই 'কচেবারো'।

তরুলতার মধ্যে দেখ। প্রতিবৎসর বৃক্ষপত্র স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আবার যে বৃক্ষের যেমন পত্র, অবিকল সেইরূপ পত্র উদ্ভিন্ন হইতেছে। প্রতি বারেই 'কচেবারো'। দার্জ্জিলিঙের এক প্রকার পত্র, (Fern) 'ফারণ,' কখন দেখিয়াছেন? উহা এমন সুন্দর, এমন সুচিত্রিত যে, দেখিলে প্রাণ মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। ফারণ নানা প্রকার। প্রত্যেক প্রকার ফারণে এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য যে, দেখিলে হৃদয় আপনা

আপনি বলিয়া উঠে, "ধন্য সেই শিল্পকর, যিনি বিরলে বসিয়া এমন মনোরম শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন!" এই সকল সুন্দর ফারণ খসিয়া পড়িতেছে, আবার যে জাতীয় ফারণ যেমন, অবিকল সেইরূপ ফারণ উৎপন্ন হইতেছে। পাতার শিরগুলি, যেখানে যেমন দাগ্‌টী, ঠিক্ সেইরূপ উৎপন্ন হইতেছে। প্রতিবারেই 'কচেবারো'। জগতে যত প্রকার ফলবান্ বৃক্ষ আছে, বর্ষে বর্ষে যে বৃক্ষের যেমন ফল, অবিকল সেইরূপ জন্মিতেছে। প্রতিবারেই 'কচেবারো' প্রাণী জগতে দেখ, কোটী কোটী প্রকার প্রাণীর মধ্যে যে জাতীয় প্রাণী যেমন, তাহাদের বংশে সেই প্রকার প্রাণীই উৎপন্ন হইতেছে। প্রতিবারেই 'কচেবারো'। পাঁচপাগরু প্রভৃতি অদ্ভুত প্রাণী কখন কখন জন্মগ্রহণ করে, সত্য; কিন্তু তাহাও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ফল। সেখানেও 'কচেবারো'।

প্রকৃতির অন্তর্গত আশ্চর্য্য কৌশল নিচয় ঘটনাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। জগদ্বিখ্যাত ডার্‌উইনের উদ্বিদ্ বিদ্যা বিষয়ক একখানি পুস্তক আছে। প্রাণী জগতে যেমন স্ত্রীপুরুষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি হয়, বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও সেই প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে। অরকিড্ নামক উদ্ভিজ্জের মধ্যে এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইয়া যে আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার বিষয় বর্ণনা করিয়া ডারউইন বলিতেছেন যে, এপ্রকার কৌশল কি ঘটনাক্রমে হইতে পারে? ঘটনাক্রমে যে উহা কখনই হইতে পারে না; এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডার্‌উইন্ বলিতেছেন;—

"If not accidental, and I cannot believe it to be accidental, what a singular case of adaptation."

Fertilization of Orchids.

সৃষ্টিকৌশলের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সময়ের অনীশ্বরবাদীগণ একটী নূতন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তুমি বিশ্বকার্য্যে যে সকল কৌশল দেখিতেছ, উহা কোন জ্ঞানময় পুরুষের অভিপ্রায়সম্ভূত নহে। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদের নিয়মানুসারে ঐ সকল আপনা আপনি হইয়াছে। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদ কাহাকে বলে, এস্থলে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে।* বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে, এমন নহে। একটী বস্তু বা প্রাণীর ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়া তাহা হইতে আর একটী বস্তু বা প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। একটী হইতে আর একটি, সেটী হইতে আর একটী এইরূপে ক্রমে ক্রমে জগতের সমুদয় বস্তু ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদীগণ দুই শ্রেণী-ভুক্ত। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, মূল জড়পরমাণু হইতে জগতের সমুদয় জড়, উদ্ভিদ্, ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। জড়পরমাণু হইতে যাবতীয় জড়পদার্থ হইয়াছে। তারপর জড়ের বিকাশে এমন এক প্রকার উদ্ভিজ্জ হইয়াছে, যাহা কতক জড় কতক্ উদ্ভিজ্জের মত। ক্রমে উহা হইতে উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ হইতে এমন এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কতক্ উদ্ভিদ্ কতক্ প্রাণীর মত। এই

* নব্যভারতে প্রকাশিত উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধ দেখ।

শেষোক্ত প্রকার পদার্থের ক্রমবিকাশে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। পরে একপ্রকার প্রাণী হইতে অন্য প্রকার প্রাণী; এইরূপে অতি সামান্য কোনরূপ প্রাণী হইতে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য পর্য্যন্ত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর বিবর্ত্তনবাদীরা বলেন যে, জড় হইতে জীব হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। জড় হইতে জড়, জীব হইতে জীব উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই তাঁহাদের মত। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিবর্ত্তনবাদ সমর্থন করিতেন।

এখন কেহ মনে করিবেন না যে, বিবর্ত্তনবাদী হইলেই নাস্তিক হইতে হয়। ডারউইন নিজে ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তবে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিলে, জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না।

উপরিউক্ত দুই প্রকার বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা নাস্তিকতা সমর্পণ করেন, তাঁহাদের যুক্তির অসারত্ব প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। উহা কঠিন কর্ম্মও নহে। যাঁহাদের মতে জড় পরমাণু হইতে যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা বলেন যে, মূল জড়ে এমন শক্তি ও গুণ আছে, যাহার বিকাশে সংসারের সমুদয় বস্তু ও প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের যত কৌশল দেখিতেছ, সে সকল জড়ীয় শক্তির বিকাশে উৎপন্ন হইয়াছে। জড়ীয় গুণ স্বীকার করিলেই হয়; একজন জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

সৃষ্টিকৌশল বুঝাইবার জন্য যদি বল যে, মূল জড়পরমাণুতে এমন শক্তি আছে যাহা হইতে এই সকল কৌশল হইয়াছে, তাহা হইলে কিছুই বুঝান হইল না। আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ পক্ষীদেহ কেমন করিয়া হইল? ডিম্ব হইতে। কেবল এই কথা বলিলে কি সদুত্তর হয়? জটিল কৌশলময় তরুরাজি কেমন করিয়া হইল? বীজ হইতে। এ কথাতেই কি সব বুঝা গেল? কিছুই না।

পক্ষীদেহের কৌশল ডিম্ব হইতে আসিয়াছে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, ডিম্বের মধ্যে কৌশল অব্যক্তভাবে (potentially) স্থিতি করিতেছিল। বৃক্ষে যে কৌশল আছে তাহা বীজ হইতে আসিয়াছে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, বৃক্ষে যে কৌশল প্রকাশিত, বীজশক্তির মধ্যে তাহাই অদৃশ্যভাবে অবস্থিত। সেইরূপ এজগতে যত কৌশল দেখিতেছি, সমুদয় জড়পরমাণু হইতে আসিয়াছে বলিলে ইহাই বলা হয় যে, প্রাকৃতিক কার্য্যে যে সকল কৌশল প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই অব্যক্তভাবে পরমাণুর মধ্যে স্থিতি করিতেছে। যদি বল, পরমাণুর গুণে কৌশল হইয়াছে, তাহা হইলে কিছুই বলা হইল না; কেবল তুমি একপদ পশ্চাতে লইয়া গেলে, এইমাত্র।

জড়ীয় শক্তি ও যে নিয়মানুসারে উক্ত শক্তি কার্য্য করিতেছে, এই উভয়ের মধ্যেই কৌশল বর্ত্তমান। সুতরাং ঐ দুটী স্বীকার করিয়া লইলেই যে কৌশল বুঝান হয়, এমন নহে।

জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন অসীম আকাশে পরমাণুরাশি বিঘূর্ণিত হইতেছিল, তখন যদি তুমি বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা দর্শন করিতে, পরমাণুর মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তি নিহিত ছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে

পারিতে, যে সকল নিয়মে সেই পরমাণুরাশি নিয়মিত হইতেছিল তাহাও সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে, তাহা হইলে কি, ডিম্বের মধ্যে পক্ষীর ন্যায়, বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায়, সেই আদিম অন্ধকার নিমজ্জিত, আন্দোলিত পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে এই সুবিশাল, সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্তসত্তা অনুভব করিতে সক্ষম হইতে না? সেই আদিম বিশৃঙ্খলা ও আন্দোলনের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অভিপ্রায় ও আয়োজন উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইতে না?

মূল পরমাণুর মধ্যেই যে অভিপ্রায় বর্ত্তমান, সে বিষয়ে আর একটী কথা বলিব। পরমাণুর সংগঠনেই অভিপ্রায় রহিয়াছে। যদি সকল পরমাণু এক প্রকার গুণবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে পরমাণু হইতে জগৎ হইত না। কেন না, তাহা হইলে রাসায়নিক সংযোগ অভাবে 'পঞ্চভূত' ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি অসম্ভব হইত। কেবল চিনিতে সন্দেস হয় না, কেবল ছানাতেও সন্দেস হয় না, ছানা চিনি উভয়ের সহযোগ আবশ্যক।

আবার যদি পরমাণু সকল বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইত, অর্থাৎ যদি এমন হইত যে, কোন পরমাণুর সহিত কোন পরমাণু মিশে না; তাহা হইলেও জগতের বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারিত না। কেন না, যাবতীয় পদার্থ, মূল পরমাণু নিচয়ের সংযোগ বিয়োগের ফল।

আবার যদি এমন হইত যে, সকল পরমাণু সকল পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইত; তাহা হইলেও জগৎ হইত না। কেন না তাহা হইলে বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব হইত। সমুদয় পরমাণু সূত্রে মিশ্রিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড সমষ্টি উৎপন্ন হইত মাত্র।

আবার দেখ, বিশেষ বিশেষ পরিমাণ ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হয় না। হাইড্রজিন ও অক্সিজিন মিলিলেই যে জল হয়, এমন নহে। বিশেষ পরিমাণ হাইড্রজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন মিলিত হইলেই জল উৎপন্ন হয়। নাইট্রজিন ও অক্সিজিন একত্র হইলেই বায়ু হয়, এমন নহে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের এদিক্ ওদিক্ হইলে হইবে না।

কিন্তু চেতনাবিহীন অন্ধ জড় পরমাণুর মধ্যে পরিমাণ জ্ঞান ও সম্বন্ধবোধ কেমন করিয়া আসিল? সম্বন্ধ ও পরিমাণবোধ জ্ঞানের ধর্ম্ম, জড়ের ধর্ম্ম নহে।

এই সকল বিচার করিলে বুঝা যায় যে, কেবল যে পরমাণু হইতে বিশ্বকৌশল উৎপন্ন হইয়াছে, এমন নহে। মূল পরমাণুতেই কৌশল ও অভিপ্রায় রহিয়াছে। সুতরাং মূল পরমাণুতেই জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় প্রকার বিবর্ত্তনবাদীগণ বলেন যে, জড় হইতে জড় ও প্রাণী হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। এক প্রকার আদিম জীব হইতে কোটী প্রকার জীব কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল? কোন জীব যে সকল অবস্থার মধ্যে জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা যে সকল অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়াছে, কোন কারণ বশতঃ সে সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। সে নূতন অবস্থার উপযোগী শরীর ও মন লাভ করিতে থাকে। পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক গুণ সন্তান লাভ করে, ইহা স্বভাবের একটী

নিয়ম। সুতরাং পিতামাতার পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি তাহাদের সন্তানেরা লাভ করিয়া থাকে। ক্রমে বংশ পরম্পরায় নূতন অবস্থার অনুপযোগী পুরাতন প্রকৃতি নষ্ট হইতে থাকে এবং তাহার উপযোগী নূতন প্রকৃতির উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া জীবের শরীর মন সম্পূর্ণরূপে নূতন অবস্থার উপযুক্ত হয়। অথবা ইহা বলিলেও হয় যে, ক্রমে একটী নূতন প্রকার জীব হইয়া দাঁড়ায়।

শরীরের যে অঙ্গ বা মনের যে বৃত্তিকে অধিক চালনা করা হয়, সেই অঙ্গ ও বৃত্তি ক্রমে ততই প্রবল ও কার্য্যক্ষম হয়। আবার যে অঙ্গ বা বৃত্তির চালনা যে পরিমাণে অল্প হয়, সেই অঙ্গ বা বৃত্তি সেই পরিমাণে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই দ্বিতীয় প্রকার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, নূতন অবস্থায় সমাগত প্রাণীর কোন কোন অঙ্গ বা বৃত্তির চালনা হ্রাস হওয়াতে সেগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এমন কি, নষ্ট হইয়াও যায়। এইরূপে কোন কোন অঙ্গ ও বৃত্তির বিনাশ এবং অপর কতকগুলি অঙ্গ ও বৃত্তির উন্নতি বশতঃ কালে একপ্রকার জীবের বংশে নূতনবিধ লক্ষণাক্রান্ত জীব উৎপন্ন হয়।

এই বিবর্ত্তনবাদের মত সম্পূর্ণরূপে ও সকলস্থলে সত্য কিনা, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। এস্থলে কেবল ইহাই বলা আবশ্যক যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডিউক অব আর্গাইলের রচিত পুস্তক বিশেষে * তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হমিংবার্ড (humming bird) নামক এক পক্ষীজাতির মধ্যে বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম কার্য্য করে নাই।

সে যাহা হউক, যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদের দোহাই দিয়া বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমি তাঁহাদের বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহারা বলেন যে, কোন জ্ঞানসম্পন্ন কারণব্যতীত জগতের কৌশল সকল কেবল বিবর্ত্তনবাদের নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের কথা নিতান্তই অযুক্ত।

একটী পরমাশ্চর্য্য কৌশলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনের নিয়ম কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে। সে কৌশল স্ত্রীপুরুষ সহযোগে সন্তান উৎপত্তি। যে প্রাকৃতিক কৌশলে সংসারে জীব প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কি সামান্য আশ্চর্য্য! স্ত্রী ও পুরুষজাতির দেহ মনের সম্বন্ধ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! উভয় জাতির শরীর পরস্পরের উপযোগী; উভয় জাতির মন পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং সেই আকর্ষণ জনিত সম্মিলনের ফল সেই জাতীয় নূতন প্রাণীসৃষ্টি!

এই অদ্ভুত কৌশলটী না থাকিলে বিবর্ত্তনবাদ কোথায় থাকিত? যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদের নিয়মদ্বারা সমুদয় সৃষ্টি কৌশল ব্যাখ্যা করিতে চান, তাঁহাদের জানা উচিত যে, একটী অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল অবলম্বন করিয়াই বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম প্রকৃতি রাজ্যে কার্য্য করিতেছে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই কৌশল। বিবর্ত্তনবাদ কয়টা কৌশল ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছে? ঐ যে পক্ষীটী আকাশে উড়িতেছে, উহার পক্ষের বিষয়

*"Reign of Law" by Duke of Argyle.

একবার ভাব দেখি। মনুষ্য যাহা করিতে পারে না, পক্ষের সাহায্যে পক্ষী তাহাই করিতেছে। স্থিরচিত্তে ঐ পক্ষের রচনাকৌশল আলোচনা করিলে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইতে হয়। পাখীর শরীর যদি আর একটু ভারি হইত, তবে পাখী উড়িতে পারিত না। যদি আর একটু লঘু হইত, তাহা হইলেও পাখী উড়িতে পারিত না; বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যাইত। পাখীর পাখা উদ্‌ঘাটিত ছাতার মত কেন? তাহা না হইলে উপরিস্থ বায়ুর চাপে পাখী উড়িতে পারিত না। পশ্চাতের দিকে ঐ কর্ণটী (হাল) কেন? বায়ুসাগরে পক্ষীর দেহরূপ তরণী চালাইবার জন্য। *

বৃক্ষ পল্লবের মধ্যে বসিয়া ঐ পাখীটী ডিম্বে তা দিতেছে কেন? উত্তাপ দ্বারা ডিম্ব ফুটাইবে? সে তো পদার্থবিদ্যা পাঠ করে নাই, তবে এ তত্ত্ব কেমন করিয়া জানিল? কে তাহাকে শিখাইল? ডিম্ব হইতে শাবক বাহির হইবে বলিয়া তাহার এত আগ্রহ? শাবক বাহির হইলে তাহার লাভ কি? শাবক কি তাহাকে রাজা করিবে? শাবকের সহিত তাহার কয় দিনের সম্বন্ধ? পক্ষী কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় পক্ষপুটে ডিম্ব ঢাকিয়া বসিয়া আছে? যে শক্তি এই সুবিশাল প্রকৃতি রাজ্য শাসন করিতেছে, সেই শক্তি ঐ অবোধ পক্ষীকে তাহার ডিম্বের উপর নিরন্তর বসাইয়া রাখিয়াছে।

আবার যখন সময়ক্রমে ডিম্ব ফুটিয়া শাবক বাহির হয়, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষীমাতার কত আগ্রহ ও যত্ন! কত কষ্টে কত স্থান হইতে আহার অন্বেষণ করিয়া শাবকগুলিকে মুখে মুখে খাওয়াইয়া দেয়! শত্রু হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য কত সতর্কতা! কুলায় নির্ম্মাণ হইতে শাবকগণকে শূন্যে উড়াইবার সময় পর্য্যন্ত পক্ষীর কার্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পক্ষীমাতা এত করে কেন? পক্ষীমাতা কিছুই করে না। যিনি জগতের মাতা আদ্যাশক্তি ভগবতী, তিনিই জগতের শিশুগণকে সুকৌশলে রক্ষা করিতেছেন।

গাভী সদ্যপ্রসূত বৎসের শরীর কেমন প্রগাঢ় স্নেহের সহিত লেহন করে! কেহ বৎসের নিকট অগ্রসর হউক দেখি, অমনি দুটি শৃঙ্গ আন্দোলিত করিয়া গাভী ফোস্ করিয়া উঠিবে। বৎসকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন? মানুষ বংশ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়, গরুর তো সে ভাবনা নাই।

এক প্রকার বোল্‌তা আছে, তাহাদের গর্ভ সঞ্চার হইলেই ভাবী সন্তানের জন্য আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। নানা স্থান হইতে উপযুক্ত খাদ্য আনিয়া জমা করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির কেমন চমৎকার নিয়ম! ডিম্ব প্রসব করিয়াই বোল্‌তা মরিয়া গেল। এখন সেই সংগৃহীত খাদ্য রহিল, আর ডিম্বগুলি রহিল। ক্রমে ডিম্ব হইতে শাবক বহির্গত হইল; তাহাদের জন্য সংগৃহীত খাদ্য তাহাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। সেই খাদ্য আহার করিয়া তাহারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখ দেখি, কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার! বোল্‌তা যখন আহার

* পাখীর পাখায় কত গূঢ় কৌশল আছে, বুঝিতে হইলে, Reign of Law নামক পুস্তকে উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধটী পাঠ করা আবশ্যক। অধ্যাপক Flint উক্ত অধ্যায়টীকে masterly বলিয়াছেন।

সংগ্রহ করিতেছে, সে জানে না যে সে কাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। এমন এক জনের জন্য সে পরিশ্রম করিতেছে, যাহাকে সে কখন দেখে নাই। আবার সেই খাদ্য যে খাইতেছে, সেও জানে না যে কে তাহার জন্য উহা আহরণ করিল। আহরণকারী কখন তাহার ইন্দ্রিয়-বোধের বিষয় হয় নাই।

ইতর প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের অনেক কার্য্যে সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, অথচ সে অভিপ্রায় তাহাদের নিজের নহে। পক্ষী, গাভী ও বোল্‌তার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল, উহাতে এ কথাটী সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ যে বোল্‌তার কার্য্য বর্ণিত হইল, উহা শতকণ্ঠে প্রকৃতির অন্তর্ভূতা জ্ঞানময়ী শক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

কেবল ইতর প্রাণী কেন? মনুষ্যও অনেক বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, অথচ তাহাতে আপনা আপনি একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়।

ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দুগ্ধ পান করিতেছে। শারীরিক অভাব মোচনের জন্য আহার আবশ্যক, একথা সে বড় হইয়া শিক্ষা করিবে। এখন প্রকৃতি তাহাকে বলপূর্ব্বক আহার করাইতেছে। কেবল শিশু কেন? প্রকৃতি মনুষ্য মাত্রকেই বলপূর্ব্বক আহার করাইতেছে। ক্ষুধা একটী স্বাভাবিক বিষয়; উহাতে স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। সে অভিপ্রায় মানুষের নিজের নহে। তবে কাহার? অভিপ্রায় জড়ের ধর্ম্ম নহে; জ্ঞানের ধর্ম্ম।

এক একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ে এক একটী মাতব্বর সাক্ষী। প্রত্যেক প্রবৃত্তির মধ্যে এক একটী অভিপ্রায় রহিয়াছে; অথচ মনুষ্য বা অপর জীব বিচার বিতর্ক করিয়া সে অভিপ্রায় সৃষ্টি করে নাই। তবে উহা কাহার?

পল্লীগ্রামে অনেকে দেখিয়াছেন যে, কৃষকের গরু মাঠে পলাইয়া যায়। অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়াও গরুটাকে ধরা যায় না। তখন কৃষক এক আটি খড় হস্তে লইয়া "আয় আয়" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে, গরু খড়ের লোভে ক্রমে নিকটে আসে, কৃষকও অল্পে অল্পে পশ্চাৎপদ হইতে থাকে। পরিশেষে গরু খড় খাইতে পায় বটে, কিন্তু কৃষক তাহাকে গোয়ালে বদ্ধ করে।

প্রকৃতির অন্তর্ভূতা শক্তি জীবদিগকে লইয়াও অনেক বিষয়ে এইরূপ কার্য্য করিতেছে। জীবগণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ লাভের জন্য কত কার্য্য করিতেছে, অথচ তাহাতে বিশ্বব্যাপিনী শক্তির গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক প্রবৃত্তি, এবং কাম, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি এ-কথার অখণ্ডনীয় প্রমাণ স্থল।

যতই আলোচনা করিবে, ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডপতির উজ্জ্বল সত্তা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে। বেকন বলিয়াছেন, "I should rather believe in all the fables of the Talmud and the Alkoran, than that this universal frame is without a mind." "আমি তালমদ ও কোরাণের উপন্যাস সকল বরং বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এই বিশ্বব্যাপারে যে কোন জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছেনা, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

মহাত্মা কার্লাইল বলিয়াছেন; "যাহারা তর্ক করিয়া পরমেশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন করিতে যায়, তাহারা সূর্য্য দেখিবার জন্য লণ্ঠন জ্বালে।" কি সুন্দর কথা! কেহ যদি যথার্থই বলে, ভাইরে সূর্য্য দেখিতে হইবে, ঝাড়, লণ্ঠন, গ্যাসলাইট, তাড়িতালোক সব জ্বালিয়া দেও, আমরা তাহাকে বাতুল মনে করি। বাস্তবিক যে ব্যক্তি তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে চায় যে, এক জ্ঞানময়ী শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ; নতুবা বুঝিতে পারে না, তাহার হৃদয় মন নিশ্চয়ই বিকৃত অবস্থাপন্ন।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহাই

কেন হউক না, মানব জাতি কখনই ভগবানকে ছাড়িতে পারিবে না। উহা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাঁহাকে ছাড়িলে, কি থাকে? ইহ সংসার কি ভয়াবহ শ্মশান ভূমি হইয়া যায় না? যাহার তিন কুলে কেহ নাই, লোকে তাহাকে দুর্ভাগ্য বলে। সে নিজেও আপনাকে ভাগ্যহীন মনে করিয়া ম্রিয়মান্ হয়। তবে নাস্তিকের তুল্য দুর্ভাগ্য কে আছে? তিন কুল কেন? নাস্তিকের ত্রিজগতে কেহ নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

ভারতবর্ষ হুজুগের দেশ, যখন যে বিষয়ের হুজুগ পড়ে, যুবা, বৃদ্ধ, বালক, সকলেই তাহাই নিয়া ব্যস্ত হয়। যখন চাকরির হুজুগ পড়িল তখন দেশ শুদ্ধ লোক চাকরিয়া, বাঙ্গালী তার মধ্যে বোল ধরিল, "যেন তেন চাকরি, দুদ্ আর ভাত"! আজ কাল সে হুজুগ কমিয়াছে; এক্ষণে ব্যবসায়ের কিছু গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছে; পুরুত-ঠাকুর, ঠাকুরপুত্র, পৈত্রিক কায ছাড়িয়া এখন চামরার দোকান খুলিয়াছেন; রাম নারায়ণ সেন জুতা বিক্রয় করিতেছেন, হর সুন্দর ঘোষ মুদির দোকানে বসিয়া ডাল চাউল মাপিতেছে; সকলেই ব্যবসায়ী। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" কথায় কথায়; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ কাল অনেকেই এ লক্ষ্মীর অন্বেষণ করিতে গিয়া, লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া পড়িল! আমরা অনেক সময়ই দেখিতে পাই, যে আজ কাল ভারতবর্ষের বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাসনা হইয়া অলক্ষ্মীর পায়ের ধূলার ভাগই বেশী।

আমাদিগের সুপরিচিত বম্বেবাসী দাদা ভাই নারাণ্‌জি বলেন,—বিদেশীয় বাণিজ্যে দেশ উৎসন্নে যাইতেছে; আর একশত বৎসর এই হিসাবে বাণিজ্য চলিলে, সমুদয় দেশ শুদ্ধ লোককে দেউলিয়া হইতে হইবে। নারণজির কথায় আমরা সায় দেই আর নাই দেই; কিন্তু শাসন বিভাগের রিপোর্টে দেশের যে উন্নতির চিত্র দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের এক অংশও আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দুই রাজ্যের বাণিজ্য বিভাগের লাভ লোকসান কিরূপে হিসাব করেন, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা

পাঠকগণকে আমরা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে করুন, কোন এক বৎসর কলিকাতার কাষ্টম্ হৌসের যাচাই অনুসারে ভারতবর্ষ বিলাতে ১০ লক্ষ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য পাঠাইল; আর বিলাত হইতে ৮ লক্ষ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আনিল; সুতরাং ভারতবর্ষ বিলাতের নিকট হইতে এবার দুই লক্ষ টাকা বেশী পাইল; ভারতবর্ষের লাভ হইল। এরূপ হিসাব শুনিয়া যদিও স্কুলের ছাত্রেরাও না হাসিয়া থাকিতে পারে না, তথাপি প্রতি বৎসর এইরূপ হিসাবেই আমাদের লাভ লোকসান ঠিক করা হয়। মনে করুন ভারতবর্ষ পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা বিলাত ভারতবর্ষের নিকট হইতে চারিলক্ষ টাকায় খরিদ করিল; আর বিলাত ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিল, ভারতবর্ষ সেই দ্রব্য একলক্ষ টাকায় বিলাত হইতে খরিদ করিল; এখন বলুন দেখি, এ ব্যবসায় লোকসান বা কার, লাভ বা কার? ক এবং খ দুইজন ব্যবসায়ী, একজন অপরের নিকট দ্রব্যাদি বিক্রয় করে, এখন ইহাদের ব্যবসার লাভ লোকসান তুলনা করিতে হইলে, একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখা আবশ্যক। সে বিষয়টী এই; ক খয়ের নিকট যে বাণিজ্য দ্রব্যটীর বিনিময় করিল; তাহার উৎপাদনের নিমিত্ত কয়ের কত মূলধন ব্যয় হইয়াছে; আর তাহার বিনিময়ে ক যাহা পাইল, তাহা ঐ মূলধন হইতে কত কম বা কত বেশী। খয়ের কর সহিত ব্যবসায়ের লাভ লোকসান হিসাব করিতে হইলেও ঐ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক; কর নিকট হইছে খ কত টাকা লইল, এবং খর নিকট হইতে ক কত টাকা পাইল, তাহা ধরিয়া হিসাব চলে না।

একশ্রেণীর বিলাতি ওভুরা বলিবেন, আচ্ছা লাভের কথা স্বীকার কর আর নাই কর; কিন্তু প্রতি বৎসর যত টাকা তোমাদের দেশ হইতে বাহিরে যাইতেছে, তাহাপেক্ষা বেশী টাকা যে তোমাদের দেশে আসিতেছে, তাহাতো আর অস্বীকার করিতে পার না; তাহা হইলে মুদ্রার ভাগ দিন দিন তোমাদের দেশে বেশী জমা হইতেছে। এখন দেখা যাউক এই কথায়ই বা কত সারবান? এই বিষয়টী সম্বন্ধে প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে ভারতবর্ষের বণিক সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থা পাঠক মহাশয়ের বিশেষরূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১মতঃ। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী কৃষকের নিকট হইতে কিম্বা অপর প্রকারের উৎপাদকের নিকট হইতে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করেন; তাহাকে পাইকার বলে।

২য়তঃ। পাইকারের নিকট হইতে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী খরিদ করিয়া বাণিজ্য প্রধান স্থানে চালান দেয়, ইহাদিগকে চালানী মহাজন বলে।

৩য়তঃ। এই চালানী মহাজনদিগের নিকট হইতে আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা খরিদ করিয়া, পণ্যদ্রব্যকে বিদেশীয় রপ্তানির অবস্থায় পরিণত করে, যেমন পাটের, চটের তুলার গাটওয়ালা; সর্ষপ তিসি প্রভৃতির ঝাড়াইওয়ালা ইত্যাদি; ইহাদিগকে ফড়ে বলে।

৪র্থতঃ। এই ফড়েদিগের নিকট হইতে এবং কখন কখন মহাজনদিগের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া, আর একশ্রেণীর ব্যবসায়ী বিলাতে মাল চালান করিল।

এখন এই চতুর্থশ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে অনেকেই ভিন্ন দেশীয়, ইহারা অপরদেশের প্রতিনিধি হইয়া, ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষবাসীর নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া ইহাদের যে লাভ হয়, সে টাকার অধিকাংশই শেষে বিদেশের কবলস্থ হয়, এ বিষয়টী পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত।

তারপর কষ্টমহৌস্ হইতে দ্রব্যের যে মূল্য ধরা হয়; তাহাতেও গোলযোগ আছে; ভারতবর্ষের যে পণ্য দ্রব্য যখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিলাত যায়, তখনই তাহার প্রকৃত মূল্য ধরিয়া প্রায়ই হিসাব করা হয় না; ভারতবর্ষ হইতে যে সমুদয় পণ্য দ্রব্য বিলাতে যায়, তাহার অধিকাংশ মালে টাকার হিসাবে মাস্থল দিতে হয় না, কেবল পরিমাণের হিসাবে রপ্তানি মাস্থল লাগে। তাহার মূল্য কত ধরা হইল না হইল, তাহার নিমিত্ত অনেকে বিশেষ হিসাব রাখে না; সুতরাং ভারতবর্ষীয় রপ্তানি মালের যে প্রকৃত মূল্য কষ্টম হৌসের তালিকায় পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করাই অন্যায়। কাষ্টম আইনের ২৯ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর যদিও চালান দেখিবার অধিকার আছে; সেরূপ বণিককেও আবার চালান না দেখাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তারপর মাল যখন জাহাজে উঠে, তখন কোন হৌসেরই চালান প্রস্তুত হয় না; কাজেই কাষ্টম হৌসের কর্ম্মচারী উপরোক্ত আইনের ৩০ ধারা অনুসারে পণ্য দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া লন। উক্ত ধারায় লেখা আছে,—এই আইনের মর্ম্মানুসারে কোন পণ্য দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য বলিলে এই বুঝা যাইবে:—

(ক) যে স্থান হইতে কোন মাল আমদানি বা রপ্তানি হয়, অবস্থানুসারে, সেই সময়ে সেই প্রকারের মাল পাইকারি হিসাবে নগদ মূল্যে যত টাকা বিক্রয় হইবে, এবং ব্যবসায়ের রীত্যনুসারে তাহা হইতে যে টাকা বাদ দেওয়া আবশ্যক, মূল্য হইতে তাহা বাদ দিয়া যাহা থাকিবে, তাহা হইতে আর কিছু ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না; কেবল আমদানি মালে মাস্থল থাকিলে, মাস্থল বাদে হিসাব ধরিতে হইবে।

(খ) যখন এরূপ মূল্য ঠিক করা যায় না, তখন যে মূল্যে ক স্থানে উক্ত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ধরিবে?—

ইহা হইতেই বোধ হয় পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, কাষ্টম হৌসের রপ্তানি মালের নির্দ্ধারিত মূল্যের প্রতি কত দূর নির্ভর করা যাইতে পারে। কিন্তু আমদানি মালের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক কথা, আমদানি মাল এখানে পৌঁছার পূর্ব্বেই চালান পৌঁছে; এবং কাষ্টম হৌসে আমদানি মালের যে মূল্য ধরা হয়, তাহা চালানি মূল্য, সুতরাং সে মূল্য কোন কোন বিশেষ অবস্থা ব্যতীত, সকল সময়ই প্রায় ঠিক। এখন যে চালানি মূল্য ধরিয়া আমরা বিদেশীয় পণ্য দ্রব্যের বিষয় হিসাব করি, সে মূল্যের কত গুণে ভারতবাসী সে সমুদয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়? এবং ঐ অতিরিক্ত মূল্যের কত ভাগের এক ভাগ ভারতবর্ষের মূল ধন চিরস্থায়ীরূপে বৃদ্ধি করে? মনে করুন, স্মিড্‌থ্ এণ্ড কোঃ আসিয়া কলিকাতায় এক এজেন্সি কারবার খুলিলেন;

জারমানি হইতে ঘড়ী, ল্যাম্প প্রভৃতি যে দরে এ দেশে আসিল, তাহার তিন গুণ দরে তিনি বাজারে বিক্রয় করিলেন। তিনি বিদেশীয় বণিক, যে দিন তিনি এ দেশ ছাড়িবেন, সে দিন তাহার কিছু তিনি এদেশে রাখিয়া যাইবেন না, বরং পারিলে কিছু বেশীই লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন; সুতরাং তাহার মুনফার টাকা প্রকৃত পক্ষে আমদানি দ্রব্যের মূল্য ধরাই উচিত; কারণ উক্ত টাকার অধিকাংশই বিদেশের, ভারতবর্ষের নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্য দ্রব্যের এরূপ অবস্থা নহে; বিদেশী ব্যবসায়ীই প্রায় বিদেশে চালান দেন, সুতরাং তাহার লাভের ভাগ বিদেশের, ভারত-বাসীর নহে। পাঠকগণ এ কথাটীও ভুলিবেন না।

তারপর যাহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ বিলাত হইতে ১লক্ষ টাকার দ্রব্য লইল, সুতরাং লক্ষ টাকা নগদ ইংলণ্ডকে পাঠাইয়া দিল, তাহাদের একান্ত ভুল। সাধারণতঃ ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে যে প্রকারের কার্য্য হয়, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি। ক ইংলণ্ডের একজন ব্যবসায়ী, খ ভারতবর্ষের একজন ব্যবসায়ী; ক ভারতবর্ষে খর নিকট ৫০০০০ টাকার কোন দ্রব্য পাঠাইল; এবং খর উপর হুকুম (হুণ্ডী) লিখিল তুমি তিন মাস পরে অমুক ব্যাঙ্ককে ৫০০০০ টাকা দিবে; খ এ দায়িত্ব স্বীকার করিল; ক ইংলণ্ডে বসিয়া ইংলণ্ডের কোন এক ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০ টাকা লইল। ইংলণ্ডের উক্ত ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডী তাহার ভারতবর্ষের সহযোগী কোন এক ব্যাঙ্কে পাঠাইল; তাহারা উক্ত টাকা আদায় করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের নামে জমা দিয়া রাখিল; আবার হয় ত ঐ ব্যাঙ্কের কোন ভারতবর্ষের দেনা হুণ্ডী ঐ টাকার দ্বারা সোদ্ দিয়া ঋণ হইতে অব্যাহতি লইবে; এইরূপ একদেশ হইতে অপরদেশে টাকা পাঠান প্রায় ঘটিয়া উঠে না, এবং কাগজপত্রের দেনা লেনাতেই প্রায় সমস্ত দেনা পাওনা নির্ব্বাহ হয়।

আমরা বঙ্গ দেশের ১৮৮২—৮৩ সালের বাণিজ্য বিবরণ হইতে পাঠকগণকে ইহার একটী উদাহরণ দিতেছি। বঙ্গদেশ হইতে উক্ত সালে ৪২,৪৬,৬৫,১৯৯ টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে, এবং ২৮,৩৪,৬১,৯৩৭ টাকার দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। আমদানি হইতে রপ্তানি১৪,১২,০৩,২৬২ টাকার বেশী। এখন কেহ যদি মনে করেন যে, বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ১৪ক্রোড় লক্ষ টাকা সোণায় রূপায় প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তাঁহার একান্ত ভুল; কারণ ১৮৮২—৮৩ সনে বঙ্গদেশে সোণা রূপার মোট আমদানীও তত টাকা হইবে না।

আমদানি।

রূপা	...	...	১,৩০,৫০,৬৫০
সোণা	...	...	৯৯,১২,২৩৩
মোট	...	...	২,২৯,৬২,৮৮৩

রপ্তানি।

রূপা	...	...	২৮,৭৫,০০০
সোণা	...	...	১,৭৩৪
মোট	...	...	২৮,৭৬,৭৩৪
আমদানি হইতে রপ্তানি বাদে যাহা দেশে ছিল			২,০০,৮৬,১৪৯

এখন দেখুন যে স্থলে আমরা সোণায় রূপায় ১৪ ক্রোড় ১২ লক্ষ টাকা পাইব, সে স্থলে কেবল ২ দুই ক্রোড় ছিয়াশি হাজার টাকা পাইতেছি, তারপর এই দুই ক্রোড় ছিয়াশী হাজারই কি ভারতবর্ষ পাইল? সমুদয়ই ভারতবর্ষবাসী ইংরেজ ব্যবসায়ীর, মূলধন পরিভ্রমণ এবং দক্ষতার আয় ভারতবর্ষের কি? এখন বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য হইতে এই ভাগ বাদ দিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, দেশের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে সোণা রূপার অতি অল্প ভাগই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যাহাদের অর্থ শাস্ত্রের সঙ্গে সামান্যরূপও পরিচয় আছে, তাঁহারা পর্য্যন্ত অবগত আছেন যে, কাগজের মুদ্রা প্রচলিত হইলেই ধাতু মুদ্রা আস্তে আস্তে বাজার হইতে অপসৃত হয়। ভারতবর্ষে যে এ সাধারণ নিয়ম কার্য্য করে নাই, এ কথা বলিতে পারেন না। যদি সমুদয় ভারতবাসী ধনীর ঘরের মজুদ টাকার একটা হিসাব লন, তবে দেখিতে পাইবেন, ধাতু মুদ্রাপেক্ষা কাগজের মুদ্রা শতগুণ বেশী; দেশে এখন কেবল সাউকরি লইয়া কেনা বেচা; গবর্ণমেণ্ট সাউকর, কলার পাতে দিব বলিয়া (Promise to pay) এক সুদ খৎ করিলেন, দেশ হইতে কতকটা ধন সংগ্রহ করিলেন, বিলাতে, আবিসিনিয়ায়, কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন; ভারতবর্ষে তাহার পরিবর্ত্তে কি রহিল? "তিনি দিবেন," এই প্রতিজ্ঞাই বাজারে মুদ্রারূপে চলিতে আরম্ভ করিল। বিলাতী ব্যবসায়ীও সাউকর, তিনিও এক হুণ্ডীতে (Promise to pay) লিখিয়া ক্রোড় টাকার মাল লইলেন; দেশের অর্থ বিদেশে গেল, তাহার বিনিময়ে দেশ এই প্রতিজ্ঞাপত্র খানি পাইলেন; যদি তিনি সিঙ্গা ফুকেন, তবে দেশের অর্থ আজও গেল, কালও গেল, তাহার কাগজের প্রতিজ্ঞার মূল্য তিন কড়া ফুটাকড়িও নয়, কেহ তদ্দ্বারা জুতাও পরিষ্কার করিবে না। এই জন্যই পাঠকগণকে বলিতেছিলাম, যে আমদানি রপ্তানির যত প্রভেদ, তত টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে এ দেশে আইসে না, তারপর সোণা রূপার এ দেশে যে টাকা প্রতিবৎসর জমা হয়, তাহারও অল্প অংশই দেশীয় ধন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বিলাতের ব্যবসা পৃথক, সে বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিলাতী মালে বিলাতের যে মুনফা, ভারতবাসীর তাহার সহিত কপর্দ্দক সম্বন্ধও নাই; কারণ ভারতবর্ষের প্রায় কোন ব্যবসায়ী বিলাতে ব্যবসায় করেন না; দুই এক জন সামান্য সিপমেণ্ট করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি কম; এত কম যে আমদানি রপ্তানি তালিকায় তাহার কোন হিসাব পাওয়াও কঠিন।

বিলাতী মাল যেরূপ ভারতবর্ষে বিলাতী এজেণ্টের হাতে বিলাতী মূল ধনের অবলম্বনে আসিয়া বিক্রীত হয়, ভারতবর্ষীয় মাল যদি সেইরূপ ভারতবর্ষীয় এজেণ্টের হাতে এবং ভারতবর্ষীয় মূল ধন অবলম্বনে বিলাতে বিক্রীত হইত, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের পৃথক শ্রী দেখিতে পাইতাম। ভারতবর্ষের যত রাজ্যের সহিত কারবার আছে, সে সমুদয় দেশের বণিক, বণিক্-প্রতিনিধি ভারতবর্ষের বাণিজ্য প্রধান স্থান সমূহে দেখিতে পাই; কিন্তু ভারতবর্ষের কয় জন বণিক্, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও ইউনাইটেড্-ষ্টেটে আছে? বম্বে মাঝে মাঝে দুই এক জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। যদি ভারতবর্ষীয় হৌস, বিদেশে বসিয়া ভারতবাসী বণিকদিগের প্রতিনিধি হইয়া, সেই স্থানে ভারতবর্ষের মাল বিক্রয় করেন, তবে বিদেশীয়

বাণিজ্যে আমাদের অসুবিধা কতক পরিমাণে কমিতে পারে।

তারপর বিদেশীয় বাজারে ভারতবাসী বণিকের আরো কতকগুলি অসুবিধা আছে। যে যে দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ, সে সমুদয় দেশেই স্বর্ণ মুদ্রা বহুল প্রচলিত। ভারতবর্ষে রূপা লইয়া কেনা বেচা; এখন ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বশতঃ রূপার মূল্য কমিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ১৬ তোলা রূপা দিলে ১ তোলা সোণা পাওয়া যাইত, এখন আর ৪ তোলা রূপা বেশী না দিলে এক তোলা সোণা পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের টাকার দাম কমিল, কিন্তু বিদেশীয় দ্রব্যের দাম ত কমিল না; সে দেশে সোণার হিসাবে মাল বিক্রয় হয়, সোণার মূল্য বাড়ে নাই, কেবল রূপার মূল্য কমিয়া গিয়াছে; কাযেই ভারতবর্ষ বাটা না দিলে তাহার টাকা কেহ লইতে চাহে না। এই বাটা সময় সময় শতকরা ১২॥ টাকা হিসাবে পর্য্যন্ত দিতে হয়। বণিকগণ এ বাটায় কতক পরিমাণে ক্লিষ্ট না হইয়াই পারেন না। আমদানি মাল যত সুলভ হয়, তাহার কাট্‌তি তত বেশী হয়, মূল্যবান মালের কাট্‌তি সাধারণতঃ কম; তাহাতে দেশ অকারণ বাজারে কতকগুলি টাকা বেশী দিয়া কষ্ট পাইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসনয়নে সমুদয় দেখিয়াও যেন দেখিতেছেন না।

এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটী অসুবিধা আছে; ভারতবর্ষ পুরাকালে যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার শ্রীমন্ত সওদাগর, চাঁদ সওদাগর যেখানেই বাণিজ্য করিতে যাউন না কেন, ফিনিসিয়াদেশেই ভারতবর্ষীয় বণিকের চিহ্ন পাওয়া যাউক, আর তুরুস্কের হেরামে এবং রোমের মহিলাদিগের গৌরাঙ্গেই ঢাকাই তঞ্চেব দেখিতে পাওয়া যাউক, সে পুরাতন গৌরব যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান বণিক সমাজে ভারতবর্ষের স্থান তত উচ্চ নহে; ভারতবাসী এখন কেবল ব্যবসায়ের ক,খ, ছাড়িয়া ফলা বানান ধরিয়াছেন; এসময় মহা মহোপাধ্যায় লোকের সহিত ঘটত্ব পটত্ব লইয়া তর্ক করিতে দিলে চলিবে কেন? কিছু দিন শিখাইয়া পড়াইয়া, সাবধানে সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, পরে ছাড়িয়া দেও দেখি, কে পায় ঠেলিয়া যায়? আমেরিকায় যখন কাপড়ের কল প্রথম নীত হয়, তখন ইংলণ্ড নির্ব্বিবাদে আমেরিকায় নিজের প্রস্তুত করা কাপড় পাঠাইতেছিলেন; লোকে সস্তাদরের ভাল জিনিস রাখিয়া মন্দ জিনিস লইবে কেন? আমেরিকায় প্রায় সাতটী আটটী কাপড়ের কল ফেল হইয়া গেল; পরে অনেক কাণ্ড কারখানার পর ইংলণ্ডের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া আমেরিকা স্থির হইতে পারিলেন। যদি ইংলণ্ডের আমদানি অনিবারিত থাকিত, তবে আজিও বোধ হয় আমেরিকার কাপড়ের কল সমূহকে, ভারতবর্ষস্থ ঐ শ্রেণীর কলের অবস্থায় দেখিতাম। আমরা রক্ষণশীল নীতির পক্ষপাতী নহি; আমরা শুদ্ধ এই বলিতে চাহি যে, ব্যবসায় স্বাধীনতা দিতে হয় ত সাধারণ ভাবে স্বাধীনতার দ্বার খুলিয়া দাও, ভারতবর্ষের যে লাইনে ক্ষমতা থাকে, সেই লাইনে অপরের সঙ্গে সমকক্ষতা করুক; কিন্তু তাহা না করিয়া যে বিষয়ে ভারতবর্ষের হাত চালাইবার ক্ষমতা আছে, সেই বিষয়টীকে জঞ্জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, আর যে বিষয়ে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল, কেবল সেই বিষয়ে স্বাধীনতার দ্বার খুলিয়া দিবে, আমরা এরূপ একদেশদর্শী নীতির পক্ষপাতী নহি। ১৮৮২ সনের মাসুল সম্বন্ধীয় আইনে (Tariff Act) অস্ত্র, মদ, অহিফেন, এবং লবণ ব্যতীত, এদেশের আমদানি অপর সমুদয় মালের মাসুল রহিত করা হইয়াছে; কিন্তু বিলাত কোন্ ২ মালের মাসুল রহিত করিয়াছেন? ভামাকের প্রতি শতকরা ৩৲ হইতে ৫০০ টাকার হিসাবে মাসুল আজও আছে; রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্যের প্রতি মাসুল ছিল, প্রদর্শনীর সুবিধার নিমিত্ত সে মাসুল নাকি ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। (খোসখবরের ঝুটাও ভাল) বারাণসী জরি, ভারতবর্ষের শাল আজও মাসুল দাখিল না করিয়া ইংলণ্ডের ভূমি স্পর্শ করিতে পায় না; তবে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে মাসুল মাপ করিলেন কিসে? যে জিনিষ তাহার না হইলে হয় না, সেই জিনিষে; আহা কি উদারতা! এই উদারতার বিনিময়ে আমার কার্পাস দ্রব্যের মাসুল ছাড়িয়া দিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছি, এবং বম্বের মিল গুলির মাথা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এখন ঐ উদারতাকে যদি কেহ মূর্খতা বলে, তবে সে কি নিন্দনীয়? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলি যে, এরূপ একদেশ-দর্শী নিয়ম দেখিলেই আমরা স্বার্থময় বলিয়া মনে করি।

আমাদের এ সম্বন্ধে প্রস্তাব এই যে, যে যে দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য আছে, সেই সেই দেশের যে যে জিনিষের মাসুল আমাদের দেশে লাগে না, আমরাও তাহার অনুরূপ জিনিষের মাসুল তাহাদের দেশে দিতে স্বীকার করিব না, কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই, যে একথা কে বলে, আর কাহাকেই বা বলে; বলিলে কেহ কর্ণপাতও করিবে না। তথাপি লোকের উচিত যে, একবার গোলযোগটা তুলিয়া নিদেন নিঃস্বার্থ উদারতাগুলিকে লোকের সম্মুখে আনিয়া ফেলে। দেশের লোক রাজনীতির বড় বড় কথা লইয়া ব্যস্ত, কারণ সে সম্বন্ধে কথা বলিতে বড় পরিশ্রম করিয়া কিছু জানা শুনা আবশ্যক হয় না, এবং সে সমুদয় বিষয়ে দুই এক গদ ঝাড়িবার অধিকার সকলেরই আছে। এ সমুদয় বিষয়ে কথা বলিতে হইলে জানিতে হয়, খাটিতে হয়; আমাদের দেশে এ দুইটী ইচ্ছারই এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট অভাব। তারপর এদেশে যত চেম্বার অব্ কমার্স আছে, তাহারা নামমাত্র ভারতবর্ষের, সভ্যদিগের রক্ত মাংস মন প্রাণ সমুদয় ইংলণ্ডের, দুই এক জন বাঙ্গালী যদি কখনও ফোঁ ধরে, তবে শানাইর ওয়াজে ঢাকিরা সে স্বর নিজের করিয়া লয়। দেশীয় সমিতি মহাশয়রা এই ছোট খাট বিষয় গুলির প্রতি তাহাদের বড় বড় নজরগুলি পাত করিলে কি হানি আছে?

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে আরো একটী কথা আছে; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রপ্তানি হইতে আমদানি বাদে যত টাকা আমাদের অপর দেশের নিকট পাওনা থাকে, ব্যবসায়ী সমাজের কেবল প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়াই আমাদের তৎসম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, সকল হুণ্ডীরই যখন মুদ্দত (ডিউ) আছে, তখন সে টাকাটা আজ না পাইলাম, দশদিন পরেও ত পাইব। ভারতবর্ষ যদি বিদেশের নিকট ঋণী না থাকিতেন, তবে একথা সত্য হইতে পারিত;

কিন্তু ভারতবর্ষের বাণিজ্য নামমাত্র ভারতবর্ষের, ইহার সর, ক্ষীর, সমুদয় বিদেশীয়দিগের; বিদেশীয় মূলধন, বিদেশীয় নৈপুণ্য, বিদেশীয় চিন্তা এখন ভারতবর্ষের বাণিজ্যের চালক। এই সমুদয়ের মূল্য স্বরূপ প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে অনেক টাকা ভারতবর্ষ হইতে যায়, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। এতদ্ব্যতীত আবার শাসন বিভাগের ব্যয়ের নিমিত্ত অনেক টাকা পাঠাইতে হয়; আমাদের বিশ্বাস যে, এদেশে যত টাকার মালের আমদানি হয়, সেই পরিমাণে বিনিময়ে এদেশ পাইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত রপ্তানির অবশিষ্ট টাকা এইরূপ নানা বাবদে বিদেশীয়ের কবলস্থ হয়। এ সম্বন্ধে ফসেট্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণ তাহার অর্থনীতি নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠায় একবার দৃষ্টি করিবেন।

প্রত্যেক ব্যবসায় মধ্যে তিন প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; ১মতঃ, পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, দ্বিতীয়তঃ, একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া; তৃতীয়তঃ শেষ স্থলে ইহাকে উপযুক্ত ভাবে বিভাগ করিয়া দেওয়া। এই তিনশ্রেণীর কার্য্যেই মূলধন; এবং কার্য্যকৌশলের আবশ্যক; এবং ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তিন শ্রেণীর কার্য্যেই, বিদেশীয় মূলধন এবং বিদেশীয় কার্য্যকৌশল অধিক পরিমাণে দিন দিন ব্যবহৃত হইতেছে; কয়েকদিন পরে যে কেবল মজুরির ভাগ ভারতবাসীর হাতে থাকিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

আমরা ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে এয়েকটী কথা বলিয়া পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের উল্লিখিত কথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বাণিজ্য ভারতবাসী বণিকের একচেটে সম্পত্তি ছিল; ইহার সহিত বিদেশের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। বাখরগঞ্জের কেয়া মদ্দি, রাম নারায়ণ রায়ের টাকা লইয়া, নিজে ছেলেপেলে নিয়া দশ মন ধান জন্মাইত; বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহা হইতে চাউল করিয়া হর পোদ্দারের নিকট বিক্রয় করিত। তিনি রামা মিস্ত্রীর গড়ান ফতে-উল্লা মাঝির নৌকায় ঐ মাল কলিকাতায় চালান দিতেন। রামধন সাহা আড়তদার, কৃষ্ণ মুদির হাতে দিয়া ঐ চাউল কলিকাতার বাজারে বিলি করিত। এই ব্যবসায়ের ফলাফল সমুদয় দেশীয় লোকের; কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নাই। এখন হাটে ঘাটে বিলাতি ফারমের টাকা, বিদেশীয় লোকের হাতে কার্য্য ভার, বিদেশীয় প্রস্তুত যান চালনি; বিদেশীয় চালকের দ্বারা পরিচালিত; পরে অধিকাংশ স্থলেই বিদেশীয় লোকের হাতে বিলি বন্দোবস্ত। এখন বিদেশীয় লোকে বিদেশীয় টাকার কৃষি ক্ষেত্র গুলির বন্দোবস্ত করিলেই, কেবল লাঙ্গল এবং কাস্তের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকিবে; তবে বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া অনেক সময় সে বিষয়েও আশঙ্কা হয়।

সামান্য কৃষি ব্যতীত অপর প্রকারের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অনেক দিন হয় উঠিয়া গিয়াছে; নীল, চা, রেশম্ লাক্ষা, রবর, চামরা, কাপাস, এ সমুদয় বিষয়ে আজকাল বিদেশীয়ের একচেটে মহল। তবে যদি দেশীয় কোন মহাত্মা কণ্ডুয়ণ সহ্য করিতে না পারিয়া হস্তক্ষেপ করেন, তাহার ফল হাতে হাতেই প্রাপ্ত হন। আমাদের এদেশীয় এণ্ড কোঃ

মহাত্মাদিগকে প্রায় ২।৩ বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া যায় না; তখন যদি পাঠকগণের মধ্যে কেহ দেউলিয়া আদালতের বোর্ডে অনুসন্ধান করেন, দেখিতে পাইবেন, তাহারা সেখানে স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করিতেছেন।

আমাদের পাঠক মহাশয় হয়ত বলিবেন, যে কোন কাযে পাকা না হইয়া হাত দিলেই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্থ হইতে হয়। সাধারণতঃ লোকে এইরূপই বলে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জানা না জানায়, আজ কাল আর কুলায় না। আপনার ব্যবসায় বুদ্ধি যতই প্রবল হউক না কেন, অধিকতর মূলধনশালী বিদেশীয়ের নিকট আপনাকে পরাস্ত হইতেই হইবে; আপনার পুটির প্রাণ, তিমি-রাঘবের লেজের আঘাত সহিতে পারিবেন কেন? কোন স্থানে আপনি ১০,০০০ হাজার টাকা লইয়া একটী কারবার খুলিলেন, আর সেইখানে রেলিব্রাদার্স ১০ লক্ষ টাকা লইয়া কারবার খুলিলেন; আপনাকে সে বাজার হইতে তাড়াইতে পারিলে বাজারটী তাঁহার একচেটে হয়। আপনার যখন কোন এক দ্রব্য ৪৲ টাকার খরিদ করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি ৪।০ টাকার খরিদ করিবেন; আপনি হাতে একটা কায ৫ দিনে করিবেন, তিনি কলে পাঁচ মিনিটে সে কার্য্যটী সারিয়া লইবেন; আপনার হাতের একটা জিনিস অল্প মালে অনেক স্থান যুড়িয়া রাখে, আর তিনি কলে করিয়া তাহার অবয়ব কমাইয়া দেন; রেলে বা জাহাজে তাহার মাল কম ভাড়ায় যাইবে। এত ব্যবসার কম মূলধন আর বেশী মূলধনের, কার্য্যের সুবিধা অসুবিধা গেল এই পর্য্যন্ত; তার পর আমাদের একটু বিলাতি রোগ আছে। এটা সাহাবের ঘরের মাল সুতরাং ইহার গৌরব বেশী; নিগার ভারতবাসীর মাল তাহাপেক্ষা দশগুণ ভাল হইলেও সাহেবী মালের মান বেশী, সাহেবী মালের মূল্য বেশী; এত গেল মান মূল্যের কথা। যদি কম মাল বলিয়া দেশীয়দিগের নিকট হইতে ।০ আনা কম মূল্য কেহ মাল লয়, তথাপি দেশীয় ব্যবসায়ীর কাতর হইবার বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাহেব উপস্থিত থাকিতে দেশীয়ের হাতে কেহ কাযের ভার দিতেই প্রস্তুত না; আমাদের বিশ্বাস দেশীয়গণ কায করিতে জানে না। এখন এ রোগের ঔষধ কেহ কিছু বলিতে পার? এরূপ অবস্থায় যে দেশীয়দিগকে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে, সে আর একটা আশ্চর্য্যের কথা কি?

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশীয় মহাজন সকল লোকসান দিয়া দিয়া একরূপ শেষ হইয়া গেল; অনেক ধনী লোকসান দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, দুই এক জন সতর্ক লোক কারবার বন্ধ করিয়া অবশিষ্ট কিছু টাকা লইয়া ঘরে গিয়া বসিয়া আছে; যাহারা আজিও কারবার করিতেছেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগকে অবসন্ন হইতে হয়।

বিদেশীয় বণিক দশ জন একত্র হইয়া কায করেন, আমাদের দেশীয় বণিকগণ স্বস্ব প্রধান, লাভ লোকসানের ফলাফল একারই ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ একার অর্থে তত ব্যয় সাধ্য কার্য্য অনেক সময়ই সঙ্কুলন হয় না। এ সমুদয় বিষয় আমরা বর্ত্তমান বাণিজ্যের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কালে সবিশেষ সমালোচনা করিব।

শ্রীকালী প্রসন্ন দত্ত।

দুঃখিনী।

১

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
বিষাদ কালিমা মাখা, গভীর নীরদে ঢাকা,
সুন্দর শরতচন্দ্র নিত্য অন্ধকার!
আয়ত আকর্ণ শ্রান্ত, নীলনেত্র পরিক্লান্ত
নীলসরোরুহে বর্ষ নিত্য অশ্রুধার!
নাহি বেশ নাহি ভূষা, শিশিরে শীতের ঊষা
নাহিক আশার সূর্য্য শিয়রে তোমার!
মলিন বসন ছিন্ন, দেখা যায় অবিভিন্ন
খেলিছে শরীরে যেন আলো অন্ধকার!
এত দুঃখ ভার শিরে, বহিতে না পার কিরে,
করেতে কপোল রাখি বিশ্রাম তাহার?
চাহিয়া ধরার পানে, বিষাদে বিষণ্ণ প্রাণে
ধুলায় দুঃখের দিন গ'ণ আপনার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার?

২

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
যাওনা কাহারো কাছে, অবহেলা করে পাছে,
গরবিনী প্রতিবেশী দেখি কদাকার!
কাঙ্গালিনী দীনহীনা, দেখিয়ে করিবে ঘৃণা,
মানিনি! আপনি মান রাখ আপনার!
পরের কথাটী হায়, সহেনা কোমল গায়,
এত যে সম্মুখে সিন্ধু অকূল পাথার!
আপনা আপনি যথা, জ্বলে তড়িতের লতা
সেই তীব্র তেজোরাশি হৃদয়ে তোমার!
এমন সম্মান বোধ, এত তীব্র প্রতিশোধ
আত্মার আদর এত নাহি দেখি কার!
নাহি ঘরে মুষ্টি অন্ন, তবু নহ অবসন্ন
শমন শঙ্কিত যেন বীরত্বে তোমার!
যাওনা কাহারো কাছে, যাহা আপনার আছে,
কভু কর উপবাস, কভু একাহার!
অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার।

৩

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
প্রবল শোকের ঝড়ে, যবে চিত্ত ভেঙ্গে পড়ে,
হৃদয়ে উড়ায় বালু শত সাহারার,
যায় ধৈর্য্য পলাইয়া, জীবন্ত আহুতি দিয়া
একাকী আকুল প্রাণ করে হাহাকার!
তখনি দেখিয়াছিরে, দেখিয়াছ দুখিনিরে
সজল নয়নে মুখ শিশু বালিকার!
তখনি দেখিয়াছিরে, দেখিয়াছ দুখিনিরে
সজল নয়নে নেত্র সজল আমার!

৪

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
সেই ভিখারিণীবেশ, শরীর কঙ্কাল শেষ,
সে পবিত্র আত্মহত্যা—মহান্—উদার!
সেই দুঃখ অমাবস্যা,—প্রীতিপূর্ণ সে তপস্যা,
নিরাশার শূন্য মাঠে—শ্মশান সংসার!
সেই মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা, উন্মাদিনী খড়্গহস্তা
শোণিতে তর্পণ কর প্রেম পিপাসার;
সেই মূর্ত্তি শক্তি মন্ত্রে, হৃদয় শোণিত যন্ত্রে
পূজিতেছি প্রাণময়ি চরণ তোমার!
কিন্তু আর নিত্য নিত্য, পারিনা চিরিয়া চিত্ত
নীরক্ত প্রাণের রক্ত দিতে উপহার;—
এ মূর্ত্তি পূজিয়া আশা মিটিল না আর!

৫

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
কোথা সে শৈশব শোভা বিধু বালিকার?
সে হাসি আনন হায়, দেখিব কি পুনরায়,
দেখিব কি পূর্ণচন্দ্রে সুধার জোয়ার?
পরি নানা বেশভূষা, বিনোদ বাসন্তী ঊষা
প্রণয়ের পূর্ব্বাচলে হাসিতে আবার?
দেখিব কি প্রাণেশ্বরি, স্বর্গের বালিকা পরী
গলায় কুসুম মালা দিতেছ আমার?

হায় রে কই সে দিন, আমি মূর্খ অর্ব্বাচীন,
কই তত পুণ্যরাশী আমি অভাগার?
জ্বলন্ত সূর্য্যের মত, দহিতেছি অবিরত,
প্রাণময়ী ঊষারাণী আমিই আমার!

৬

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার?
শত গ্রন্থি ছিন্ন বাস, একাহার উপবাস।
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর!
পত্র পুষ্প শূন্য যথা, শীতের বিশুষ্ক লতা,
অথবা মলিন যথা অঙ্গ বিধবার,
ম্লানতা দীনতা হায়, একাধারে সমুদায়
পরিম্লান পুষ্পভাণ্ড শরীরে তোমার
প্রিয়ে দুখিনি আমার!

৭

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
বিদেশে দাসত্বে হায়, নিত্যব্যাধি যন্ত্রণায়
সহিলাম এত কষ্ট দুখ দুর্নিবার,
প্রেতের অধিক হেয়, পিশাচের অবজ্ঞেয়
কত যত্নে পূজিলাম চরণ তাহার!
মানুষের যা মহত্ব, চিত্তের স্বাধীন স্বত্ব
অর্থলোভে করিয়াছি বিনিময় তার,
দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি, প্রাণের পবিত্র শক্তি
পবিত্র ধর্ম্মের মূর্ত্তি পর উপকার,
প্রেয়সিরে হায় হায়, ভুলিয়াছি সমুদায়
যত সাধ্য অধোগতি করেছি আত্মার!
বন্ধুতার তীব্রবাণ, আকুল করেছে প্রাণ
হায় সে পাপের জ্বালা নহে বলিবার!
পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন মানব জাতি
হৃদয় ভেঙ্গেছে করি চরণ প্রহার!
মূর্খের অধিক মূর্খ, কি বলিব সে যে দুঃখ
করিয়াছে মূর্খ বলি শত তিরস্কার!
সকলি সহিয়াছিরে, প্রাণময়ি প্রেয়সিরে,
কেবল চক্ষের জল মুছিতে তোমার!
কেবলি তোমারি তরে, সুখশান্তি অকাতরে
জীবনের যত আশা করি পরিহার,
হায় এ সন্ন্যাসী বেশে, ফিরিতেছি দেশেদেশে,
প্রাণময়ি প্রেয়সিরে কাঙ্গাল তোমার!

৮

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
তবুত চক্ষের জল ঘুচিল না আর!
আমিই পিশাচ সম, আমি দৈত্য নিরমম
আগুনে পোড়ানু পুষ্প প্রতিমা তোমার!
বিকট ভৈরব বেশে, ভীষণ শ্মশান দেশে
বিলুণ্ঠিত করিলাম পারিজাত হার!
ভিখারী প্রেমের রূপ, আমি পাপ অন্ধকূপ
অশোক শোকের বন তব কারাগার,
তুমিলো মাটীর মেয়ে, আছ মাটী পানে চেয়ে
মাটীর শরীরে নয় সকলি তোমার!

৯

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার!
দেখিতে ও অশ্রুমুখ নাহি পারি আর!
অই রবি অই শশী, গগনে রয়েছে বসি,
অই জলে ক্ষীণজ্যোতি ক্ষুদ্র তারকার,
তরুলতা তৃণদল, নদনদী জলস্থল
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি উচ্চ নীল পারাবার,
সকলেই দেখিয়াছে, বলিবে তোমার আছে
সহিয়াছি পৃথিবীর কত অত্যাচার!
যাই আজ দিব্যধামে, যেখানে মানব নামে
না আছে দানব দৈত্য কোনও প্রকার!
যাই আজ দিব্যধামে, পবিত্র তোমার নামে
খুলিগে স্বর্গের আগে কণক দুয়ার!
তুমিও সে দিব্যধামে, পবিত্র ঈশ্বর নামে
পায়ে ঠেলে আসিও এ ঘোর অত্যাচার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার!

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস।

সমাজ সমন্বয়।

(প্রতিবাদ।)

স্ত্রী পুরুষ সমান, কথাটী মানি। কিন্তু সে কথাটা যে অর্থে মানি, তাহাতে সুধু স্ত্রী পুরুষ কেন, সকল শ্রেণীর জীবজন্তুই এ সংসারে সমান; অর্থাৎ এ জগতে বাস করিবার, আপনার আপনার বিভাগে থাকিয়া ন্যায্যরূপে সকল অধিকারে অধিকারী হইবার সকলেরই সমান সত্ব। 'আপনার আপনার বিভাগে' বলিলাম এই জন্যে যে, একটী ঘোড়া কিছু সম্রাটের টেবিলে খানা খাইতে এবং রাজমন্ত্রী হইতে অধিকারী নয়; যে এ সংসারে যে অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, তাহাকে সেই কার্য্যই করিতে হইবে, তবে তাহার কার্য্যে স্বাধীনতা থাকিবে; সকলেরই এ সংসারে ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা অধিকার থাকিবে। কেহ কাহাকেও উৎপীড়ন করিতে বা বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অধিকারী নহে। এই অর্থে ধনী দরিদ্র সমান, স্ত্রী পুরুষ সমান, সকলেই সকলের সমান। এ কথাটা নূতন নহে; তবে এত করিয়া এ কথার ব্যাখ্যা এই জন্যে আবশ্যক বোধ করিলাম যে, এখনও দেশের বার তের হাজার পাঠক্, কাগজে সাম্য নীতির অসারতার এই প্রকার যুক্তি, যুক্তিযুক্ত বলিয়া পাঠ করেন যে "সাম্য নীতি যদি চালাইতে চাও তবে হে ভদ্র লোক তুমি পাল্‌কিতে বেহারার স্কন্ধে চাপ কেন"। যাক্, কিন্তু কথা এই, স্ত্রী পুরুষের সমান, জীবজন্তু সকলেই সকলের সমান। সকলেই আপনার অধিকার লাভে উপযুক্ত। তাই বলিয়া একের কাজ অপরে করিবে না, যাহার যে কাজ সে তাহাই করিবে। স্ত্রী স্ত্রীর কার্য্য করিবে, পুরুষ পুরুষের কার্য্য করিবে। আমাদের দেশে স্ত্রী জাতি সত্য সত্যই বড় দুরবস্থ, সমাজে দাসীর সত্বের মত তাহার সত্ব, এ অবস্থা বড় শোচনীয়; আমি ঠিক সিদ্ধেশ্বর বাবুর কথা মানি যে,দাস প্রথা তুলিবার জন্য যেমন আন্দোলন হইয়াছিল, এ দাসীত্ব নির্ম্মূলের জন্য তেমনি কিম্বা ততোধিক আন্দোলনের দরকার। কিন্তু আন্দোলনের তরঙ্গ নাকে মুখে গিয়া যেন একথাটা ভুলাইয়া না দেয় যে, স্ত্রী স্ত্রী, পুরুষ, পুরুষ। জ্ঞানালোচনা এবং কর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতি যাহার যেমন হওয়া উচিত, তেমনি হইবে।

স্ত্রী পুরুষের জ্ঞানালোচনার বিষয় এবং কর্ম্মক্ষেত্র একরূপ হইবে কি বিভিন্ন হইবে, ইহা নির্ণয় করিতে গেলে, উভয় শ্রেণীর শরীর ও মন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সিদ্ধেশ্বর বাবুও ঠিক সেই পথই অবলম্বন করিয়াছেন, তবে তাঁহার পরীক্ষা কার্য্যে এবং সিদ্ধান্তে কিছু ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে, সেইগুলি দেখানই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু রমণীগণের অর্থাৎ আমাদের মাতা, ভগ্নী ও জায়া প্রভৃতির অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয়, সিদ্ধেশ্বর বাবুর এই সুবুদ্ধি সিদ্ধান্তের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি।

সিদ্ধেশ্বর বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, স্বীকার করিয়াছেন যে, শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আছে; অথচ, উভয়ের জ্ঞানে, চিন্তায় ও

কার্য্যে যে বিভিন্নতা থাকিবে, একথা স্বীকার করেন নাই কেন? শ্রেষ্ঠ বলশালী যে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, একথা নাইবা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যখন শরীর গঠনে পার্থক্য দেখিতেছি, তখন মনের অবস্থা, কাজে কাজেই জ্ঞানের অবস্থাও যে পৃথক্ হইবে, তাহাতে সন্দেহ করা কেন? আর কিছু না হউক, অন্ততঃ বলশালী যে যুদ্ধের উপযুক্ত, আর দুর্ব্বল যে তাহা নহে, এটাত বুঝিতে পারি? তাহা হইলেও তো আপাততঃ একটা বিভাগ পাওয়া গেল যেখানে স্ত্রীজাতি নিষ্প্রয়োজনীয়; বন্দুক ধরিয়া লড়াই করিতে স্ত্রী কেহ নয়। একথা যদি সত্য হইল, তবে যুদ্ধযুগে, মনুষ্যের সমাজবন্ধন হইবার প্রথম সময়ে যে, স্ত্রীজাতি পুরুষের তত্ত্বাবধানে আসিবে, দুর্ব্বল সবলের রক্ষণাধীন হইবে, ইহাত নিশ্চিত। তবে সিদ্ধেশ্বর বাবু কেন বলিলেন, "সৃষ্টিগত প্রভেদবশতঃ তাহারা যে পুরুষের অধীন হইয়া আছে, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক ও অযৌক্তিক?" তবে তিনি বলিতে পারিতেন যে, একজন আমার রক্ষণাধীন হইলেই যে,সে আমার কষাঘাতের পাত্র তাহা নহে। তিনি পুরুষ জাতির অমানুষত্বকে তিরস্কার করিতে পারেন, কিন্তু পুরুষেরা অন্যায় রূপে স্ত্রীর তত্ত্বাবধায়ক, একথা বলিতে পারেন না।

দুর্ব্বল হইলেও যে স্ত্রীজাতি প্রগাঢ় চিন্তাশীল হইতে পারেন, ইহার যুক্তিতে সিদ্ধেশ্বর বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ মনে হয়। তিনি চিন্তাশীল বুদ্ধিমানদিগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা রাত্রিদিন জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকায় দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিলেন; অতএব দুর্ব্বলেরা চিন্তাশীল হইতে পারে, এ কি যুক্তি? শরীরের সুস্থতা ও সবলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে যে চিন্তাশীলগণ দীর্ঘজীবী হইয়া আমাদের অধিকতর উপকারে লাগিতেন, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

সিদ্ধেশ্বর বাবু স্ত্রীজাতির এ দুর্ব্বলতাও ঠিক প্রাকৃতিক অবস্থা বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলিয়াছেন যে, শরীর চালনাদি করিয়া দুর্ব্বল বলবান হইতে পারে। স্ত্রীজাতি বহুদিন পুরুষের অধীনে, তাই শরীরের উপযুক্ত চালনাদি না করিতে পারিয়া তাহারা দুর্ব্বল, জ্ঞানালোচনা না করিতে পারিয়া জ্ঞানহীনা। ইচ্ছাক্রমে ব্যবহারে লাগাইয়া এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া যাইতে পারে। আমি বিবর্ত্তনবাদের এ আইন মানি। কিন্তু একথা মানি না যে, Struggle করিতে২ বট শাল হইয়া যাইবে; যে যাহা মূলে নয়, সহস্র ইচ্ছা করিয়া, এবং ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আঁকর মাকড় করিয়া সে কোন প্রকারেই তাহা হইতে পারে না। তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে আমি শ্রীসদানন্দ বিবর্ত্তন প্রণালীর এক শেষ বা ভবিষ্যৎ ফল বলিয়া রাখি—যে অঙ্গের চালনা হয় সেই অঙ্গই নাকি বলবৎ হয়, এবং যে সকল অঙ্গের চালনা হয় না এবং চালিত হইবার প্রয়োজনে আসে না, তাহারা এযুগের মনুষ্যদিগের লেজের মত ক্রমে অদৃশ্য হইবে। তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎ বাণী এই যে, আমি এই ফলাহার ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ যদি আমার পুত্র পৌত্রেরা আমার এ ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁহারা এমন একশ্রেণীর জীব হইবেন, যাহাদের মুখ ও উদর ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ থাকিবে না। সিদ্ধেশ্বর বাবুর দৃষ্টান্ত-প্রদর্শিত চিন্তাশীলদিগের বংশধরগণ মস্তকমাত্র জীবরূপে পরিণত হইবেন,

ইত্যাদি ইত্যাদি।" রহস্য রাখিয়া আসল কথা বলিতে গেলে দেখা যাইবে যে, স্ত্রীজাতির সৃষ্টিতেই এখন কিছু বীজগত পার্থক্য আছে যাহাতে স্ত্রী দুর্ব্বল, পুরুষ সবল; মহিলে কি সকল সমাজেই, সকল দেশেই সভ্য অসভ্য সকলের মধ্যেই এই পার্থক্য দৃষ্ট হইত? ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া জগতে স্ত্রী ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন, কিন্তু সেই ভিন্ন অবস্থায় আদিকালে সর্ব্বস্থানে তাহাদিগকে কে নিক্ষেপ করিল? ইহা কি বাস্তবিক প্রকৃতি নহে? সে বীজগত পার্থক্য কি আমরা তাহা দেখাইতেছি। সিদ্ধেশ্বর বাবু নিজেই দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীপুরুষে সৃষ্টিগত পার্থক্য আছে; এবং সেই জন্যেই স্ত্রী পুরুষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামে দুইশ্রেণী বর্ত্তমান। কিন্তু এই বিভিন্নতায় যে তিনি কার্য্যগত ও জ্ঞানগত বিভিন্নতা কেন দেখিলেন না, তাহা বুঝিলাম না। স্ত্রীজাতির স্তন থাকা বশতঃ স্ত্রীজাতির আকৃতিগত বৈষম্য দেখিলেন, এবং সন্তান পালনের জন্য পয়োধরী স্তনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা দেখিলেন, তবে কেন দেখিলেন না যে, অন্ততঃ শিশুর অসহায় অবস্থায় লালন পালন জন্য যে প্রকারে গৃহ-বদ্ধা থাকিতে হয়, সর্ব্বদা সযত্নে তত্ত্বাবধান করিতে হয়, সে ভার স্ত্রীজাতির? কাজেই তাহাদের কার্য্য সন্তান পালনাদি সম্বন্ধে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকার। শিশুর সযত্ন তত্ত্বাবধান যাহার ঘাড়ে ন্যস্ত, সে কিছু দূর হইতে সেই সময়ে আবশ্যকীয় অর্থাদি বা অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনিতে পারে না; বলবান পুরুষই এখানে প্রয়োজনীয়; কাজেই দেখা যাইতেছে, কোন্ শ্রেণী কোন্ কার্য্যে লাগিতেছেন। স্থধু তাহাই নহে, স্তন থাকা বশতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা অধিক ভাব প্রধান (emotional)। এই ভাব প্রধানতা বশতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষ হইতে কত স্বতন্ত্র, এবং উভয়ের জ্ঞানে কত ইতর বিশেষ, একথা দেখাইবার পূর্ব্বে, স্তন আছে বলিয়া যে স্ত্রীজাতি বাস্তবিকই ভাব প্রধান, তাহা প্রমাণ করা যাউক। একথা প্রমাণ করিতে গিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবেত্তা বেনসাহেব যাহা বলিয়াছেন; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"Besides the five organs now enumerated as common to the two sexes we must recon the speciality of women, namely, the secretion of milk. As in all the other this secretion is genial, comfortable and healthy, during some states of mind, while depressing passions check & poison it. *Being an additional seat of sensibility and an additional reasonance to the diffused wave of feeling this organ might be expected to render the female temperament a degree more emotionol than the male, specially after child bearing has brought it into full play.*"

——Senses and Intellect.

এখন একথা যখন প্রমানিত হইল যে, স্ত্রীজাতি ভাব প্রধান; তখন ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় যে, যাহাদের ভাব বেশী তাহাদের বাহ্যানুভূতির সূক্ষ্মতা একটু কম। এ সম্বন্ধেও দার্শনিক হ্যামিল্টন বলিতেছেন যে; "Perception proper and sensation proper exist only as they coexist, in the degree or intensity of their existence they are always found in an inverse ratio to each other." এতৎ সম্বন্ধে বেন্ সাহেবও ঠিক তাহাই বলিতেছেন যে, Activity and sensibiiy stand in an inverse ratio to each other. অর্থাৎ যাহার ভাব বেশী তাহার বাহ্যানুভূতি কম এবং অনুভূতি কম হইলেও ভাব বেশী হয়। এতদ্বারা আমরা কি সিদ্ধান্তে আসিলাম? (১) স্ত্রীজাতির ভাব প্রাধান্য বেশী (২) এই ভাব প্রধানতা আছে বলিয়া তাহাদের বাহ্যানুভূতি কম। কাজেই সপ্রমাণিত হয় যে, বাহ্য বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুধাবন কম হইলে এবং কার্য্যক্ষমতাও (Activity) কম হইলে, সংসারের কাঠোর কার্য্য, এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞানালোচনা স্ত্রীজাতির পক্ষে খাটে না; ইহা পুরুষেরই কার্য্য। কার্য্যতঃও আমরা এ সংসারে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি; স্ত্রীজাতি এ পর্য্যন্ত অনেক দেশে পুরুষের মত শিক্ষিতা হইয়াছেন, কিন্তু শিক্ষার ফলস্বরূপ যে কার্য্য, তাহা পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদের পরিপক্ক নয়। কথাটায় কেহ অসন্তুষ্ট না হইলে বাধিত হইব। এ সম্বন্ধে রমণী-কুল ভূষণ স্বরূপা মহাপণ্ডিতা হারিয়ট মার্টিনু নিজে বলিয়াছেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে গেলে রমণীকে রমণীত্ব হারাইয়া একটু পুরুষত্ব একটু কঠোরতা লাভ করিবার প্রয়োজন। যাঁহারা মাদামদু সাটুলেট্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধা রমণীগণের জীবন চরিত জানেন, তাঁহারা ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবু আর একস্থানে বলিতেছেন যে, নারীজাতি পুরুষাপেক্ষা শক্তিহীনা নয় বরং তাঁহারা অধিক শক্তিশালিনী। এ কথাটা যে অর্থে সত্য তাহাতেই দেখা যায় যে, পুরুষের ব্যবসা অবলম্বন করিলে তাঁহারা সেই দেবী শক্তিহীনা হইবেন। সেই শক্তির নাম প্রেম শক্তি, এ শক্তি ভাব প্রধানতারই ফল; এবং এই শক্তিতেই স্ত্রীজাতি "করুণা নির্ঝর" "দয়ারসাগর" এবং স্ত্রীজাতিতে এগুণ না থাকিলে চরাচর সংসার মরুময় হইত।—কবির এ কথা কল্পনা নহে; সত্য কথা।

আমরা এ প্রবন্ধে কেবল ইহাই দেখাইলাম যে, স্ত্রী পুরুষের ক্ষমতা স্বতন্ত্র, কার্য্য কাজেই স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। কিন্তু সংসারে অধিকার অবশ্যই ন্যায়তঃ সকলের সমান হইবে। "স্ত্রীজাতির শিক্ষা এবং কার্য্যক্ষেত্র" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনার ইচ্ছা থাকিল, পারিত সে কথা ভবিষ্যতে হইবে। যাঁহারা স্ত্রীজাতির সংস্কারে ব্যস্ত, তাঁহারা এই কথা গুলি একবার অনুগ্রহ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন যে, স্ত্রী স্ত্রী, পুরুষ পুরুষ!

শ্রীসদানন্দ তর্কচুঞ্চু।

আস্তিকতা।

"নব্যভারতের" বৈশাখের সংখ্যায় আমরা নাস্তিক কারণবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছি। পাঠক মনে করিবেন না কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করাই সেই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ছিল। আস্তিকতার পথ পরিষ্কার করাও তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রবন্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্তই যে খণ্ডনীয় তাহা নহে; কিন্তু যে গুলি অখণ্ডনীয় সে গুলিই আবার দার্শনিক আস্তিকতার সহায়; তাহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব। দেখা যাক্ আস্তিকতা নাস্তিক কারণবাদ সম্বন্ধে কি বলেন, আর নিজের মতই বা কিরূপে সমর্থন করেন।

উক্ত কারণবাদ আগাগোড়া ভুল নহে;

কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ। উহা যাহা স্বীকার করে তাহা সত্য; কিন্তু যাহা অস্বীকার করে তাহাও অস্বীকার্য্য নহে, তাহাও সত্য। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি। ইহা সত্য যে, যদি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখ, ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে না চাও, তবে নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ভিন্ন কার্য্যের অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাইবে না। ইন্দ্রিয়ব্যাপার সমূহের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সমকালত্ব ও পরবর্ত্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব, শক্তি, ক্ষমতা এই সমুদায় গুণ নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? ইন্দ্রিয়ব্যাপার সমূহ, ইন্দ্রিয়বোধ সমূহ মনের অধীন ভাব পরম্পরা মাত্র; অধীনতাই ইহাদের স্বভাব; মনের অধীনতাতেই ইহাদের অস্তিত্ব। অধীনতাতেই যাহাদের অস্তিত্ব, তাহাদের আবার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কিরূপে? ইহারা পরিবর্ত্তিত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের পরিবর্ত্তনের সময়ে পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব, সমকালত্ব এবং পরবর্ত্তিত্ব ভিন্ন অন্য কোন সম্পর্ক লক্ষিত হয় না, কল্পনাও করা যায় না। যখন আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মনের ভাব পরিবর্ত্তন করি, তখন আমাদের নিজেদের উপরে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি, শক্তি আরোপ করি। যখন আমাদের অনিচ্ছাতে, আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে আমাদের ভাবসমূহ—ইন্দ্রিয়বোধ সমূহ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন আমরা কোন অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থে সেই পরিবর্ত্তনের কর্ত্তৃত্ব, সেই পরিবর্ত্তনের শক্তি আরোপ করি।

এই শেষোক্ত কথাতেই উক্ত কারণবাদের অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে। ইন্দ্রিয়ব্যাপার সমূহের মধ্যে পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নাই সত্য, যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে কারণান্বেষণ কর, তবে নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ব্যতীত আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাইবে না, তাহাও সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জগতে না গিয়া কি থাকিতে পার? কর্ত্তৃত্ব, শক্তি, ক্ষমতা প্রভৃতি যে সকল গুণ ইন্দ্রিয়ব্যাপারে খুজিয়া পাও না, সেই সকল গুণসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াতীত কারণে বিশ্বাস না করিয়া কি থাকিতে পার? কে পারে? হিউম পারেন নাই, কম্‌ট্‌ পারেন নাই, মিল্‌ তো শেষ জীবনে একেবারেই পরাজিত হইয়াছিলেন। শত যুক্তির বিরুদ্ধেও সেই "কল্পিত শক্তি" এই প্রকাণ্ড জ্ঞানীদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিত। তাই বলিতেছিলাম, উক্ত কারণবাদ অসম্পূর্ণ।

তারপর আর একটী অসম্পূর্ণতা। ইন্দ্রিয় জগতে নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনা ভিন্ন অন্যবিধ কারণ নাই, তাহা সত্য। এই কারণকে যদি কারণ বলিতে চাও, তাহাতেও বিশেষ আপত্তি নাই। খাঁটি জড়বিজ্ঞান যাহা,—যাহা ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুর কল্পনা করিতে চায় না, কেবল ইন্দ্রিয়ব্যাপার সমূহের পরস্পরের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব, সমকালত্ব এবং পরবর্ত্তিত্ব নির্ণয় করাই যাহার উদ্দেশ্য,—এরূপ জড়বিজ্ঞানের পক্ষে এই কারণবাদই যথেষ্ট; এরূপ জড়বিজ্ঞান ইহাতেই পরিতৃপ্ত। কিন্তু তা বলিয়া বলিও না যে, এরূপ কারণবাদে মানবমনের কার্য্যকারণ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়। তুমি বলিতেছ "প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; পরিদৃশ্যমান জগতে দেখিতে পাই কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করি, প্রত্যেক কার্য্যেরই

কারণ আছে; ইহা একটী সার্ব্বভৌমিক (universal) সত্য, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী (necessary) সত্য নহে। এমন কার্য্য কল্পনা করা যাইতে পারে যাহার কারণ নাই, অর্থাৎ নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য নাই; সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে; জগতের প্রথম কার্য্য অকারণ (uncaused) এবং তাহাই পরবর্ত্তী সমুদয় কার্য্যের আদি কারণ।"* এই মতে কি মানব মনের স্বাভাবিক বিশ্বাস পরিতৃপ্ত হয়? আমরা কেবল এই বিশ্বাস করি না যে, প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে (দেখিতেছি, সুতরাং আছে), আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক কার্য্যের কারণ থাকিবেই থাকিবে, দেখি আর নাই দেখি; ইহা কেবল একটী সার্ব্বভৌমিক সত্য নহে, ইহা একটী অবশ্যম্ভাবী সত্য। কারণশূন্য কার্য্য আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। যাহার নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-কার্য্য নাই, এরূপ কার্য্য কল্পনা করিতে পারি সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি কারণশূন্য কার্য্য কল্পনা করিতে পারি না। যে কার্য্যের কোন নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-কার্য্য নাই তাহারও কোন কারণ আছে, তাহাও স্বতঃ উৎপন্ন হয় নাই, আমরা এরূপ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-কার্য্য ভিন্ন অন্যবিধ কারণও আছে। কেবল নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী-কার্য্য ভাবিয়া কারণগত বিশ্বাস পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং পাঠক দেখিলেন, নাস্তিক কারণবাদ নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এখন আস্তিক কারণবাদ কি দেখা যাক্।

কারণ অর্থ কি? কারণ অর্থ কর্ত্তা (agent)—কর্ত্তৃত্ব গুণসম্পন্ন, কার্য্য উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন কোন পদার্থ। কার্য্যের সংজ্ঞা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, ইহার অর্থ এই—প্রত্যেক কার্য্যই কোন না কোন কর্ত্তৃত্বশালী পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন। কার্য্যের কারণরূপী কোন শক্তিশালী বস্তুর পরিচয় পাইয়া যদি আমরা ইহার লক্ষণদ্বারা দেখি ইহা অস্তশীল, অনিত্য, উৎপন্ন, তবে ইহার আবার একটী কারণ আছে এরূপ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। আর যদি দেখি প্রাপ্ত কারণ অনন্ত, নিত্য, জন্মরহিত তাহা হইলে আর ইহার কারণান্বেষণ করি না, কেন না এরূপ কারণের আর কারণের প্রয়োজন কি? কারণগত বিশ্বাস এই নহে যে, প্রত্যেক বস্তুরই কারণ আছে; কারণগত বিশ্বাস বাস্তবিক এই যে, প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, কোন কার্য্যই অকারণ হইতে পারে না, আদিকারণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না; প্রত্যেক কার্য্যেরই পশ্চাতে কারণরূপী কোন শক্তিশালী পদার্থ আছে। যখন আমরা কার্য্যের কারণরূপী একটী অনন্ত ও নিত্য শক্তিশালী পদার্থের বিশ্বাসে উপনীত হই, তখনই কারণগত বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়। এই অনন্ত নিত্য শক্তিশালী পদার্থের নামই ঈশ্বর।

এই বিশ্বাসের কি প্রমাণ দিতে হইবে? স্বতঃসিদ্ধতা এবং অনতিক্রমণীয়তা ভিন্ন ইহার আর কোন প্রমাণ নাই; অন্যতর প্রমাণের প্রয়োজনও নাই। ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলি কেন? ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহ স্বভাবতঃই অধীন, কর্ত্তৃত্ববিহীন, নিষ্ক্রিয়।

* "নাস্তিকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ। উদ্ধৃত অংশটীতে একটী শব্দগত ভুল ছিল; এবার তাহা সংশোধন করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

ইহারা আপনা আপনি কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। মনের অস্তিত্বে যাহাদের অস্তিত্ব, মনের উপরে যাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, যাহারা মনের ভাব পরম্পরা মাত্র, অধীনতাই যাহাদের স্বভাব, ইহারা আবার স্বতঃ পরিবর্ত্তিত হইবে কিরূপে? অথচ দেখিতেছি, ইহারা পরিবর্ত্তিত হয়,—আমাদের কর্ত্তৃত্ব নিরপেক্ষভাবে পরিবর্ত্তিত হয়; এরূপ স্থলে এই সকল পরিবর্ত্তনের এক জন কর্ত্তা না ভাবিয়া আমরা থাকিতে পারি না; কর্ত্তা ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যিনি এই স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ প্রমাণে সন্তুষ্ট না হন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু জানি কোন ক্রমেই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না। জানি এমন জ্ঞানী কেহই নাই, যিনি প্রকাণ্ড ঝটিকা—উৎপাতে, ভীষণ-সমুদ্র গর্জ্জনে, কর্ণ-বধিরকারী ব্রজনাদে "পূর্ব্বপর সংঘটিত ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমষ্টি" মাত্র ভাবিয়া পরিতৃপ্ত থাকিবেন। কে সেই মহাশক্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে?

কিন্তু এই মহাশক্তি—এই মহাশক্তিশালী আদি কারণ * যে জ্ঞানময় তাহার প্রমাণ কি? ইহা কি অজ্ঞান, অন্ধ, সুতরাং জড়-শক্তি নামে উচ্য হইতে পারে না? আস্তিকতা বলেন—না; কর্ত্তৃত্ব—কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি—কেবল জ্ঞানময় পদার্থেই সম্ভবে; জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞানবর্জ্জিত শক্তি অসম্ভব—অভাবনীয়। এই মতের পোষক যুক্তি দেখান যাইতেছে।

"জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ত্তা," "কর্ত্তৃত্বগুণ সম্পন্ন অজ্ঞান পদার্থ"—কথাগুলি বলা সহজ, কিন্তু ইহাদের ভাব উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। "কোণশূন্য ত্রিভুজ" বা "চতুষ্কোণযুক্ত বৃত্ত" এই কথাগুলিও বলা সহজ, কিন্তু কথাগুলি সম্পূর্ণরূপেই অর্থশূন্য। "কর্ত্তৃত্বের" ভাব—"শক্তির" ভাব আমরা কোথা হইতে পাইলাম, এটী ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, কর্ত্তৃত্বের মধ্যে জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, জ্ঞান ছাড়া কর্ত্তৃত্ব অচিন্তনীয়, অসম্ভব। আমরা দেখিয়াছি, ইন্দ্রিয় ব্যাপার কর্ত্তৃত্বশূন্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়-জ্ঞান (sensation) দ্বারা আমরা কর্ত্তৃত্বের ভাব পাই নাই। তবে এই ভাব কোথা হইতে আসিল? আত্মপ্রত্যয়—অর্থাৎ আত্মাতে স্বভাবতঃ জাত বিশ্বাস যে বলে "প্রত্যেক কার্য্যই কর্ত্তৃত্ব সম্পন্ন কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন,"—আত্মপ্রত্যয় এই কর্ত্তৃত্বের ভাব কোথায় পাইল? কোথা হইতে উপকরণ লইয়া এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস গঠন করিল? ভৌতিক জগতে, ইন্দ্রিয় ব্যাপারে, যখন এই ভাব পায় নাই, তখন জ্ঞানের অন্যতর প্রদেশ যে আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন (self-consciousness)—অবশ্য সেখানেই পাইয়া থাকিবে। আর বাস্তবিকও তাহাই। আত্মা জানে ইহা স্বয়ং একটী কর্ত্তৃত্বশালী, শক্তিশালী পদার্থ। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কল্পিত এবং প্রত্যক্ষীকৃত ভাব সমূহের মধ্যে, পদার্থ সমূহের মধ্যে, কার্য্য

* পাঠক কিঞ্চিৎ ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন "শক্তি" কোন পদার্থ নহে, "শক্তি" একটী গুণ। "শক্তি" অর্থ ক্ষমতা—কার্য্য উৎপাদনের ক্ষমতা। মানবমনের নিষ্কাশন শক্তির (power of abstraction) এই এক ফল হইয়াছে যে, একটী গুণকে গুণের আধার হইতে পৃথক ভাবিতে গিয়া গুণটীকে প্রায় একটী স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া গিয়াছে।

উৎপাদনে সক্ষম। আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে আমরা প্রত্যেকেই এক একটী কর্ত্তা (agent)—কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন পদার্থ। ইহাও নিশ্চয় যে, আমাদের কর্ত্তৃত্ব আমাদের জ্ঞানের সহিত জড়িত, কেবল জড়িত নহে, জ্ঞানের অধীন, জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যে টুকু কার্য্য প্রকৃতার্থে আমাদের,—আমাদের ইচ্ছাধীন, সেটুকু সংঘটিত হইবার পক্ষে দুইটী উপকরণ আবশ্যক—১। যে বস্তুর উপরে কার্য্য সে বস্তুর জ্ঞান, ২। যে কার্য্য করা হইবে সে কার্য্যের জ্ঞান। এই দুই লক্ষণ-বর্জ্জিত কার্য্য যদি কখনো আমাদের শরীর দ্বারা কৃত হয়, আমরা সে কার্য্যকে প্রকৃতার্থে আমাদের কার্য্য মনে করি না, আমরা ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তার কার্য্য বলিয়া মনে করি। আমাদের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত কোন না কোন আকারে বস্তুর জ্ঞান আমাদের মনে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তু আমাদের নিকট কিছুই নহে। যাহা আমাদের নিকট কিছুই নহে, তাহার উপর কার্য্য কিরূপে সম্ভব? তাই বলিতেছিলাম, জ্ঞান ব্যতীত কর্ত্তৃত্ব অভাবনীয়—অসম্ভব; কর্ত্তৃত্ব বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আছে এই বুঝায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যখন আত্মজ্ঞান হইতেই আমরা কর্ত্তৃত্বের জ্ঞান লাভ করি, আর যখন দেখিতেছি কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, জ্ঞান ব্যতীত কর্ত্তৃত্ব অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, তখন আর কিরূপে ভাবি যে অজ্ঞান কর্ত্তা বলিয়া আবার কিছু থাকিতে পারে? এই ভাবনা নিতান্তই অমূলক। যাহাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে চাও, তাহাতে জ্ঞান আরোপ না করিয়া থাকিতে পার না। জ্ঞানছাড়া কর্ত্তৃত্বের কোন অর্থই নাই। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখ, জ্ঞানশূন্য কর্ত্তা বাস্তবিক ভাবিতে পারিতেছ কি না, দেখিবে যেখানেই কর্ত্তা এবং কার্য্যের ভাবনা, সেখানেই জ্ঞাত ও জ্ঞাতের (subject and object, the knowing and the known) সম্বন্ধ নিগূঢ় ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। লৌকিক অজ্ঞানতা প্রাকৃতিক শক্তিকে অজ্ঞান ভাবে, এবং সেই অজ্ঞানতার সহিত যোগ দিয়া আমাদের ও অনেকটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে তাহা অজ্ঞান, অন্ধ; কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস তাহাতে একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, কিয়ৎ পরিমাণে মলিন হইয়াছে মাত্র। ধীর গম্ভীর ভাবে প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্যের বিষয় ভাবিলে আমরা এরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারি না যে, এই শক্তি কোন না কোন আকারে প্রাকৃতিক বস্তু সমূহকে জানে। জ্ঞাতা ও জ্ঞাতের দ্বিত্ব সম্বন্ধ (duality of subject and object) ভিন্ন কর্ত্তা ও কৃতবস্তুর (thing acted on) সম্বন্ধ ভাবা অসম্ভব। সুতরাং আদিকারণ অনন্তশক্তি ঈশ্বর জ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারেন না।

আদিকারণ যে অজ্ঞান, অন্ধ, অথবা "অজ্ঞাত" ও "অজ্ঞেয়" হইতে পারে না, তিনি যে আত্মারূপী জ্ঞানময় বস্তু, তাহার আর এক প্রমাণ এই; যে কোন বস্তু যে কোন কার্য্যের কারণ হইতে পারে না; কারণে কার্য্য সম্পাদনোপযোগী উপকরণ এবং ক্ষমতা থাকা আবশ্যক; যাহার যাহা নাই সে তাহা অন্যকে দিতে পারে না, নিরক্ষর চিন্তাহীন ব্যক্তি "প্রিন্সি-

পিয়া ও "ক্রিটিক অব্ পিয়োর রিজন্" লিখিতে পারিত না, ভাবশূন্য নীরস-হৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশকে ভক্তির স্রোতে ভাসাইতে পারিত না। যদি তাহাই হয়, তবে হে জড়-বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, কিরূপে কল্পনা কর যে, যাহাতে জ্ঞান নাই, অথবা জ্ঞান আছে কি না জান না, তাহা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত জ্ঞান দিতেছে,—যাহাতে ভাব নাই তাহা আমাদের মনে অসংখ্য ভাব রাশি প্রেরণ করিতেছে? আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা সমূহ দ্বার, অসংখ্য জ্ঞাত বস্তু, অসংখ্য ভাব পরম্পরা আমাদের আত্মার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, আমরা আত্ম-প্রত্যয়দ্বারা চালিত হইয়া এই সমুদায়ের একটী কারণ অন্বেষণ করি—এমন একটী মহাবস্তুর অন্বেষণ করি, যাহার কর্ত্তৃত্বে এই সমস্ত সমুপস্থিত হইতেছে, সমুৎপন্ন হইতেছে। ইহা কি কখনো বিশ্বাস করা যায় যে, যাহাতে কিছুই জ্ঞান নাই, এমন কোন বস্তু এই সমস্ত জ্ঞানের বস্তু উৎ-পাদন করিতে পারে, উপস্থিত করিতে পারে? এই সমুদায়ের প্রকৃত কারণ এমন এক জনই হইতে পারে—এমন একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্বাস পরিতৃপ্ত হয়—যাঁহার অনন্ত হৃদয়ে, অনন্ত জ্ঞানের অভ্যন্তরে, সমুদায় পদার্থ নিত্য ভাবরূপে স্থিতি করিতেছে, আর যিনি অখণ্ড নিয়মানুসারে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানস্থিত বস্তু সমূহ ক্ষুদ্র অথচ বর্দ্ধনশীল মানব মনের সমক্ষে অল্পে অল্পে প্রকা-শিত করিতেছেন—তাঁহার অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে অজস্র ধারে তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের আত্মাতে জ্ঞান বর্ষণ করিতে-ছেন। কেবল এরূপ সত্যেই জ্ঞানের তৃপ্তি, বিশ্বাসের তৃপ্তি, হৃদয়ের তৃপ্তি। অজ্ঞান জড়রূপী আদি কারণের মত—অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মের মত—অবোধ্য, অযৌক্তিক, অবিশ্বসনীয়, অতৃপ্তিকর।

পাঠক আস্তিকতার যুক্তি ও মীমাংসা দেখিতে পাইলেন। "প্রকৃতবাদ" নামধারী, জড় ও ঈশ্বর এই দ্বিকারণবাদী অপূর্ণ আস্তিকতা নহে,—'মায়াবাদ' নামে নিন্দিত, অদ্বিতীয়কারণবাদী পূর্ণ আস্তিকতার—যুক্তি ও মীমাংসা দেখিলেন। এই মতে জগৎব্রহ্মময়—কেবল কবিত্বের ভাবে নহে, —অন্ধবিশ্বাসের অর্থে নহে—প্রকৃতরূপে, অবশ্যম্ভাবীরূপে, জগত ব্রহ্মময়, ব্রহ্মে অবস্থিত; তাঁহার জ্ঞানরূপ আধার ভিন্ন জগতের অবস্থিতি অসম্ভব। তিনি তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে সমুদয় ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে প্রাকৃ-তিক কার্য্য সংঘটিত হইতেছে, তাঁহারই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে মানবমনে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইতেছে। সরস প্রেম রাজ্যের তো কথাই নাই, সে রাজ্যের কথা এখানে বলিয়া কাজ নাই—অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জ্ঞানরাজ্যেও তিনি জীবন্তভাবে, সাক্ষাৎভাবে বর্ত্তমান; চক্ষু মেলিলে তাঁহারই অঙ্গুলি-প্রদর্শিত চিত্র দর্শন করি, নাসিকা দ্বারা তাঁহারই প্রদত্ত ঘ্রাণ আ-ঘ্রাণ করি, রসনা দ্বারা তাঁহারই কর-কমলোত্থিত খাদ্য আস্বাদন করি, কর-স্পর্শে তাঁহারই জীবন্ত আবির্ভাব অনুভব করি, বুদ্ধিদ্বারা তাঁহারই প্রকাশিত সত্য শিক্ষা করি, বিবেককর্ণে তাঁহারই পবিত্র মন্ত্র গ্রহণ করি। তিনি আধার, তিনি প্রাণ, তিনিই বল, তিনিই জ্ঞান। চল পাঠক, তাঁহাকে জানিয়া জীবন সার্থক করি।

নবলীলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে!

জিতন পাহাড়ী। পাহাড়ীরা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়। অন্য কেহ তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা তাহাদের অসহ্য। এই জন্য পাহাড়ীরা প্রায়ই চাকরি করে না। তাহারা চাকরি করাকে ঘৃণা করে। লোকেরা বলিত, জিতন পেটের দায়ে চাকরি করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। পাহাড়ীদের সহিত জিতনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মধ্যে মধ্যে তাহারা উচ্চ পর্ব্বত হইতে নামিয়া জিতনের বাড়ীতে আসিত, দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। জিতন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সাহেব-বিদ্বেষী ছিল, দায়ে পড়িয়া এণ্ডারসনকে ভালবাসার চক্ষে দেখিত। বিনোদ বাবু তাহা বুঝিয়াছেন; তিনি জিতনের মনের ভাব ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সাহে-বেরা ভারতের উপকারী, এ সকল কথা জিতন বুঝিতে চাহে না। বিনোদ বলিতেন, সাহেব-দিগের দ্বারা আমাদের দেশের মহৎ উপ-কার হইবে। জিতন বলিত, অপকার হইবে। বিনোদ বলিতেন, সাহেবেরা কালে পশু-দিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে, জিতন বলিত, মানুষদিগকে সাহেবেরা পশু করিবে। তর্ক মীমাংসা হইত না; যাহা হইবার নহে, তাহা কেমনে হইবে? বিনোদ বুঝিয়া-ছিলেন, জিতনের প্রাণে অদম্য আশার উত্তেজনা;—বুঝিয়াছিলেন, জিতনের মন চক্রান্তে পূর্ণ। সকল আশাই যে জীবনে পূর্ণ হয় না, বিনোদ তাহা জিতনকে বুঝা-ইতেন। জিতন তাহা বুঝিত না; সুতরাং জিতন যে এণ্ডারসনকে ভালবাসিত, তাহার অঙ্কুরে কীট লুক্কায়িত ছিল। বিনোদকে আপন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য জিতন গুপ্ত মন্ত্র সাধনায় প্রবৃত্ত ছিল।

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, নূতন বৎসর ফিরিল। কালের সীমা নাই, কালের অনন্তত্ব মনের আয়ত্তাধীন হয় না সত্য, কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনে কালের ভাব কতক হৃদয়-ঙ্গম হয়। দক্ষিণে যে সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়া-ছিল, সেই সূর্য্য ক্রমে ক্রমে মস্তকের উপরে উঠিল,—যে বৃক্ষে পত্র ছিল না, সে বৃক্ষে পত্র ঝুলিল, যে পক্ষীর কণ্ঠে স্বর ছিল না, সে পক্ষীর কণ্ঠ নবরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বৃক্ষে পত্র ও ফুল হাসিল, অনন্ত নীলিমায় বিমল চন্দ্রের জ্যোতি ভাসিল। সেই জ্যোতি বিশালবিস্তৃত শূন্য ভেদ করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া ফুল্ল কুসুমকে চুম্বন করিল, নদী তরঙ্গে মিশিল। পৃথিবীর লোক গণনা করিল—বৎসর শেষ হইয়া আসিয়াছে, বসন্ত উপস্থিত। প্রকৃতির নিভৃত কক্ষে কক্ষে আনন্দের বার্ত্তা ধীরে ধীরে প্রচারিত হইল। জ্যোৎস্নাময়ী নদীতরঙ্গ কুল কুল করিয়া সৈকতে সৈকতে আন-ন্দের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে চলি-তেছে—কত মণি, কত হীরক খণ্ড, কত ফুল যেন নদী বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। জ্যোৎস্না খেলে জলের সহিত, জল খেলে বায়ুর সহিত, তিন মিলিয়া এক ভাবে উন্মত্ত, তিনই নৃত্যে বিভোর।

নব বর্ষের নবানন্দের প্রবাহ যখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; এই সময়ে বিনোদ বাবু প্রায়ই নীতটে বসিতেন। একদা নিশীথে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বসিয়া বিনোদ বাবু ভাবিতেছিলেন,—সেই ক্ষুদ্র মুখ দেখিব, না বিশাল-বিস্তৃত মানবহৃদয় লইয়া থাকিব! সেই ক্ষুদ্র মুখ মলিন,চিন্তা-কাতর কি গম্ভীর ভাবপূর্ণ! বোধ হয় যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতি সেখানে প্রতিবিম্বিত! সুলোচনা যে আশায় গৃহের বাহির হইল, তাহার সে আশা অপূর্ণই রহিল! সে মলিন মুখে আর হাসি উঠিল না! সে হৃদয়ে গভীর প্রেম পিপাসা অপূর্ণই রহিল! হতভাগিনী জানিল না—বিশ্ববিস্তৃত প্রেম কি? মহামায়ার মায়া জাল অনন্ত প্রসারিত, তাহা কি মধুর, কি মনমোহন! কামাক্ষ্যা তীর্থ স্থান,—সতীর অঙ্গবিশেষ এই স্থানেই পড়িয়াছিল! মহাপুণ্য স্থান! মহাযোগী মহাযোগ পরিত্যাগ করিয়া সতীর জন্য উন্মত্ত হইলেন! কিসের চাকরি কিসের কি? প্রেমের জন্য মহাদেব পাগল, প্রেমের জন্য আমিও উন্মত্ত হইব। প্রেম কি সতীতে?—না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে? সতী-রূপক শব্দ,—মানবহৃদয় সতীত্বের আদর্শ। তাই যদি হয়, তবে শাস্ত্রে কেন এক সতীর কথা?—কারণ বোধ হয় আর কিছুই নহে,—অনন্তকে ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করা মাত্র। অনন্ত ওখানে সীমাবদ্ধ!—মহাযোগী মহাদেবের মহালীলা! মনুষ্যও সেই ছবিতে চিত্রিত! পুরুষ আর স্ত্রী—বিধাতার সৃষ্টি, বিধাতার খেলা! ঐ পাহাড় এই নদী, কাঠিন্যে কোমলত্ব, শুষ্কতায় সরসত্ব! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সুলোচনা এসকল কিছুই বুঝিল না, জানিল না,—সে দুকূল হারাইল! আমি মহাপাতকী,—মহামায়াকে যে ছিন্ন করে, সে পাষণ্ড! নদীর আদর করিব, কি পাহাড়ের আদর করিব?—মহাদেবের আদর করিব, কি সতীর আদর করিব?—সুলোচনা কি চায়, আর আমি কি চাই?—সুলোচনা মিলনের শাস্ত্র চায়—সে বলে, "দূরত্ব চাই না, নিকটত্ব চাই, ভিন্নত্ব চাই না, একত্ব চাই।" এ অতি সার কথা—মিলন ভিন্ন মানুষ থাকিতে পারে না। যেখানে পাহাড় সেখানেই ঝরণা, সেখানেই নদী ওতপ্রোত ভাবে মিলিত! পাহাড়ে নদীতে মিল, নদীতে নদীতে মিল, পাহাড়ে পাহাড়ে মিল। জড়ে চৈতন্যের মিল, জড়ে জড়ে মিল, চৈতন্যে চৈতন্যের মিল। মিলন ভিন্ন আর শাস্ত্র নাই। সকলেই সকলের সহিত মিলিবার জন্য ব্যস্ত, সকলেই যেন পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণে লালায়িত। আমি কি মিলিব না?—সেই নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে বিনোদ বাবু ভাবিলেন—আমি কি মিলিব না—দুই হৃদয় কি এক হইবে না?—বায়ু শব্দ করিল, নদী তরঙ্গ কলকল করিল—চতুর্দ্দিকে সেই কলরব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"আমি কি মিলিব না?" বিনোদ বাবু উত্তর না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রয়ে ফিরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলনের দুই দিক—জিতন ও এণ্ডারসন!

সেই বসন্তের জ্যোস্না-প্লাবিত শূন্য ভেদ করিয়া দলে দলে পাহাড় হইতে পাহাড়ীরা নামিল। আকাশের বৃষ্টিধারা আর পাহাড়ের লোকধারা একই ভাবে একই গতিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়। দলে দলে লোক নামিয়া নির্ভীক ভাবে জিতনের

বাড়ীতে উঠিল, তাহাদের হাতে অস্ত্র, কোমরে তীর ধনুক। তাহারা স্বাধীন, সুতরাং তাহারা প্রফুল্ল। জিতন একটু সঙ্কুচিত, একটু চিন্তা-কাতর। লোক যত সভ্য হয়, ততই হিতাহিত জ্ঞান জন্মে। জিতন একটু সভ্য হইয়াছে, একটু হিতাহিত জ্ঞান জন্মিয়াছে। জিতনের হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, জিতনের সর্ব্বনাশের দিন যেন নিকট! দল দেখিয়া জিতন চিন্তা করিল, অধিকক্ষণ নহে, এক মুহূর্ত্ত মাত্র। জিতনের হৃদয়ে আগুণ জ্বলিল, আপন পরিণাম বুঝিল, বুঝিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক-বীজ তখনই হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। স্বাধীন জিতন স্বাধীনতার গীতি ধরিল—দলে মিশিল, সকলকে আলিঙ্গন করিল। জিতন আপন ভাষায় পরে পাহাড়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—খপর কি?—

পাহাড়ীরা বলিল—কল্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আমরা অসহায় কুলিদিগকে সাহেবদিগের ঘোর অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি বলিয়া অনতিবিলম্বে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষুধিতদিগকে অন্ন ও তৃষিতদিগকে জল দেওয়ায় আমাদের যে মহাপাপ হইয়াছে, ঘোষিত হইয়াছে, অচিরে আমাদিগকে তাহার প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

জিতন পুনঃ বলিল—কি হইলে যুদ্ধ হইবে না?—

পাহাড়ী।—আশ্রিত সকলকে প্রত্যর্পণ করিলে, এবং ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিলে!

জিতন।—তোমরা কি তাহাই করিবে?—পাহাড়ীরা গর্জ্জন করিল—সকলের হৃদয়ে একই ভাব জ্বলিল, সকলে মিলিয়া বলিল—প্রাণ থাকিতে নহে। নিজেরা মরিব, তবুও অত্যাচারিত অসহায় কুলিদিগকে পুনঃ সিংহের মুখে প্রত্যর্পণ করিব না। মানুষে তাহা পারে না, আমরাও তাহা পারিব না।

জিতন এপ্রকার উত্তর পাইবে, তাহা জানিত। জিতনও প্রদেশের সাহেবদিগের অত্যাচার বিলক্ষণ জানিত। ইংরাজ-রাজ্যে দাস ব্যবসায়ের কলঙ্ক জিতনের প্রাণে সহিত না। স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর অবমাননা, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীর শরীরে প্রহার, মাতার সম্মুখে শিশুর শরীরে বেত্রাঘাত, শিশুর সম্মুখে মাতার শরীরের রক্তপাত জিতন সহিতে পারিত না। সে অত্যাচারের কথা বলা যায় না, তাহা লেখা যায় না। আজও জিতনের বাড়ী নিরাশ্রয়া রমণীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পূর্ণ; সেই রমণী—যাঁহার অসহায় স্বামী পুত্রকে নিকট হইতে ছিনাইয়া চিরকালের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, এবং বলপূর্ব্বক যাহার সতীত্ব নষ্ট করা হইয়াছে। জিতন সে ক্রন্দন শুনে আর প্রাণ জ্বলে, সে মূর্ত্তি দেখে আর হৃদয় অস্থির হয়। সেই দেবতুল্য পবিত্র হৃদয় হইতে অনুতাপের উৎস যখন উৎসারিত হয়, জিতন তখন তাহা শুনে, শুনিয়া নির্জ্জনে কাঁদে। জিতন মানুষ—জিতন হৃদয়বান। হৃদয়বান জিতনের প্রাণের আশা কি পূর্ণ হইবে না?—যাহা হইবে, তাহা হইবেই হইবে। বিনোদ বাবুর চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইয়াছে—জিতন আপনি চেষ্টা করিয়া বিনোদ বাবুর সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা করিল। জিতন দলে মিশিল—আনন্দে মাতিল; জয় জয় রবে দিক পূর্ণ করিল।

তারপর কত কি পরামর্শ করিল, কত কি ষড়যন্ত্র করিল। পরামর্শের শেষ ফল এই হইল, সকলে জোট বাঁধিয়া সাহেবদিগের কুঠী লুট করিতে ধাবিত হইল।

বিনোদ বাবু নদীতীর হইতে ফিরিয়া আশ্রয়ে গেলেন। আশ্রয় এণ্ডারসনের বাড়ী। সেই গভীর রাত্রে গৃহে যাইয়া দেখিলেন, এণ্ডারসনের স্ত্রী বিমর্ষ ভাবে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। তেমন বিমর্ষ ভাব বিনোদ আর কখনও দেখেন নাই। বিনোদ বাবুকে দেখিয়াই জেলী ধীরে ধীরে একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিলেন; কোন কথা বলিলেন না। বিনোদ বাবু ভাব গতিকে কিছু বিপদ গণনা করিলেন। ত্রস্তভাবে পত্র খুলিয়া পড়িলেন;—

"প্রিয় বিনোদ,—তোমাকে না বলিয়াই আমি চলিলাম; কোথায় চলিমাম সময়ে জানিবে। তোমাকে বলিলে তুমি যাইতে দিবে না, সন্দেহ হইল, সেই জন্যই বলি নাই। আমার জীবনের দুটী কলঙ্ক,—একটী—আমি স্বার্থপর,—কেবল জ্ঞানপিপাসু, প্রেমপিপাসু নহি; আর একটী—আমি জাতিভেদ না মানিয়াও ভারতে আসিয়া নূতন জাতিভেদ সৃজনে সহায়তা করিতেছি। তোমার উপদেশেই হউক, কিম্বা যে রকমেই হউক, আমি আমার জীবনের অভাব বুঝিয়াছি। সে অভাব পূর্ণ করিবই করিব। অভাব পূর্ণ না হইলে আর ফিরিব না। যে জাতির অধ্যবসায় আকাশ হইতে নক্ষত্রকে ভূতলে অবতরণ করিতে সমর্থ, সে জাতির নরাধম আমি যদি প্রেমের সাধনায়, জাতিভেদ ধ্বংশে কৃতকার্য্য না হই, তবে আর ফিরিব না। ভারতে অভিনব যে দুটী জাতি সৃষ্ট হইতেছে, তাহার শোচনীয় ফলে হৃদয় অস্থির! কিন্তু সে কথা আজ থাকুক।

তোমার নিকটে একটী নূতন সত্য শিক্ষা করিয়াছি—তাহা কখনও ভুলিব না—শতকণ্ঠে তাহা চিরকাল ঘোষণা করিব। মহাদেবকেও চাই, সতীকেও চাই। জ্ঞানও চাই, প্রেমও চাই। জ্ঞান ভিন্ন প্রেমিক অন্ধ, প্রেম ভিন্ন জ্ঞানী কঠোর। মহাদেবকে যদি বুঝিয়াছি—তবে সতীকেও বুঝিব। জ্ঞানকে যদি বুঝিয়াছি, তবে প্রেমকেও বুঝিব। ধর্ম্মকে যদি বুঝিয়াছি, তবে কর্ম্মকেও বুঝিব। সুলোচনা চিরকাল ভাসিয়া বেড়াইবে, সাহেবের প্রাণ ইহা সহ্য করিতে পারিবে না?—তোমার বৈরাগ্য—তোমার উদাসীনতা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছি;—কর্ম্মক্ষেত্রই শিক্ষাক্ষেত্র, সেইক্ষেত্রে তোমার বিজাতীয় বন্ধু এণ্ডারসন কেবল বৈরাগ্যনীতিকে কখনও আদর করিবে না।

যে সময়ে গেলেম, এ সময়টী যাওয়ার পক্ষে বড় অনুকূল নহে, কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি করিব?—পাহাড়ীদিগের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—কবে কি হইবে জানিনা, কিন্তু তাহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে কখনও জীবনের বাসনা পূর্ণ হইবে না। তুমি আছ, তুমিই সকল দেখিবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করি, তোমার কর্ত্তব্য অবশ্য তুমি করিবে। লোক যাহা চায়, তাহা পায় না। তুমি চাও বৈরাগ্য—ভগবান তোমাকে সংসারী করিলেন। তোমার উপর আমার পরিবারের ভার রহিল—যাহা ইচ্ছা করিও।

জেলীকে তুমি আমাপেক্ষা ভালবাস, জেলী তোমাকে পাইলেই সুখে থাকিবে। কবে ফিরিতে পারিব তাহা ভগবানই জানেন।" তোমার স্নেহের—এণ্ডারসন।

বিনোদ বাবুর পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নূতন নূতন নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। এণ্ডারসনের স্ত্রী জেলী বুঝিল—বিনোদ বাবু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। জেলীর মস্তক পাতলা হইল—জেলী হাসিয়া বলিল,—'এত ভাবনা কিসের, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে। এখন আহার করুন।'

বিনোদ বাবু জেলীর কোমল ও সরল ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আহার করিতে বসিলেন। গৃহিণী আপনি পরিবেষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। আহারান্তে নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া বিনোদ কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এণ্ডারসনের মহত্ত্ব ও উদারতা হৃদয়ে চির লেখা লিখিল, বিনোদের চক্ষে নিদ্রা বসিল না; আপন জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ভারত-পঞ্জিকা।

"Prepare for rhyme—I will publish right or wrong.
Fools are my theme, let satire be my song." Byron.

শ্রীমতীআশ্‌মানিবিবি প্রপৃচ্ছতি হবীবরং
ব্রূহিমে প্রাণবল্লভ! ভারত্‌পঞ্জী ফলাফলং॥

হবীবরঃ উবাচ

শৃণু বিবি প্রবক্ষ্যামি ভারত্‌পঞ্জী ফলাফলং।
যস্য শ্রবণ মাত্রেন দিব্য জ্ঞানং লভেন্নরঃ॥

একদা সেই সুরম্য শ্রীবৃন্দাবনে ভগবতী কাত্যায়নী আশমানি বিবি প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে এবং ভক্তিভাবে স্বীয় প্রাণবল্লভ পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত হবীবর বেদান্তবাগীশ গোস্বামী মহাশয়কে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—নাথ! অনেক দিন হইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে, আপনার নিকট ভারত্ পঞ্জিকার ফলাফল শ্রবণ করি। কিন্তু নানাবিধ গৃহকার্য্যে আমি সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিয়াছি, এজন্য আমার এক মুহূর্ত্তও অবকাশ নাই; আবার আপনারও অবকাশ দেখিতে পাই না। আপনি সর্ব্বদা শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন। কখনও তাঁহাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাইতেছেন; কখনও তাঁহাদিগের নিকট পুরাণ পাঠ করিতেছেন; আবার কখনও বা তাঁহাদিগকে কোরাণ পড়াইতেছেন। শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আপনি সমস্বরে বেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, আমার বোধ হয় যেন বাহিরে মেঘ গর্জ্জন হইতেছে। আবার বেদ ছাড়িয়া কোরাণের ইয়াছিন সুরায় টান ধরিলে গৃহের চতুর্দ্দিক হইতে কুকুরগুলি ফেউ ফেউ করিয়া উঠে। আপনকার ঈদৃশ অধ্যাপনা দ্বারা এদাসীর শ্রবণ শক্তি ক্রমে রহিত হইতে চলিল। সম্প্রতি এই গ্রীষ্মের অবকাশে আপনার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অতএব এই সুযোগে ভারতপঞ্জিকার ফলাফল ব্যাখা করিয়া এ দাসীর বাসনা পূর্ণ করুন।

সুবৃদ্ধ হবীবর বেদান্তবাগীশ গোস্বামী মহাশয় স্বীয় প্রাণপ্রিয়া আশ্‌মানি বিবির ঈদৃশ বিনয়, সৌজন্য ও ধর্ম্ম তৃষ্ণা অবলোকন করিয়া যারপর নাই হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ভগবতী আশ্‌মানি গোস্বামী মহাশয়ের শেষ পক্ষের নিকাই স্ত্রী। গোস্বামী মহাশয় ঈদৃশ বৃদ্ধ বয়সে আশ্‌মানির পাণি

গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা নানাবিধ আশঙ্কার উদয় হইত। কখনও কখনও চিন্তা করিতেন যে, হয়ত আশ্‌মানি বৃদ্ধপতি লাভ সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু অদ্য আশমানির ধর্ম্মতৃষ্ণা, পতিভক্তি, বিনয় ও সৌজন্য অবলোকন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সকল আশঙ্কা দূর হইল। বুঝিলেন যে, আশ্‌মানি সামান্যা নারী নহে। বুঝিলেন যে, আশ্‌মানি সত্য সত্যই হরপ্রিয়া হৈমবতী সদৃশী। আশমানির সেই সুমধুর বাক্যগুলি গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণকুহরে অপর্য্যাপ্ত সুধা বর্ষণ করিয়া কিছু কালের জন্য তাঁহার শ্রবণ শক্তির কার্য্য রহিত করিল। আশ্‌মানির সেই প্রীতিপ্রফুল্ল মুখশ্রী দর্শনে গোস্বামী মহাশয়ের নয়নদ্বয় হইতে অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিল। আশমানির সুকোমল বদন বিনিসৃত অতি মনোরম্য রসুনের সুগন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল। ক্রমান্বয়ে গোস্বামী মহাশয়ের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হইয়া পড়িল। তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন; এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সেই অপ্রতিহত প্রেমোচ্ছ্বাসের বেগ কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—প্রিয়ে! অদ্যই আমি তোমার নিকট ভারত-পঞ্জিকার ফলাফল বলিতে আরম্ভ করিব। তুমি ভক্তি ভাবে প্রথমতঃ যুগ মাহাত্ম্য, যুগধর্ম্ম এবং যুগোৎপত্তির বিবরণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান কৈলাশপতি স্বীয় প্রাণপ্রিয়া পার্ব্বতীর নিকট এই সকল যুগধর্ম্ম এবং যুগ মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। ভগবতী হৈমবতী সেই সকল যুগধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াই স্বর্গীয় নারীগণের মধ্যে এতাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। প্রিয়ে! তুমি আমার নিকাই স্ত্রী হইলেও আমি স্বপ্নেও মনে করিতে পারি না যে, হরপ্রিয়া হৈমবতী হইতে তুমি কোন অংশে ন্যূন। বস্তুতঃ তুমি সর্ব্বাংশেই পার্ব্বতী সদৃশী। হরপ্রিয়া পার্ব্বতীর ন্যায় তুমিও স্বীয় পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহুল পুণ্য বলে অতি সুবৃদ্ধ পতি লাভ করিয়াছ। নারীগণের পক্ষে বৃদ্ধ পতি যে অতিশয় প্রার্থনীয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই দেখিতেছি যে, বৃদ্ধপতি চিরকালই যুবতি ভার্য্যার কৃতদাস হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করেন। যুবতি ভার্য্যা বৃদ্ধপতির কণ্ঠরত্ন; যুবতি ভার্য্যা বৃদ্ধপতির প্রাণ; যুবতী ভার্য্যা বৃদ্ধপতির উপাস্যা দেবী; যুবতী ভার্য্যা বৃদ্ধ পতির এক মাত্র জীবন সর্ব্বস্ব। এই পরমারাধ্যা যুবতি ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কত কত সুবৃদ্ধ পতি অহোরাত্র আয়না হস্তে করিয়া এক একটী সুপক্ক গোপ সমূলে উৎপাটন করিতেছেন। সপ্তাহে সপ্তাহে মস্তকের শ্বেত কেশগুলি কলপদ্বারা কাল করিতেছেন। যুবতির অনুরোধে শ্বেতবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সুচারু ঢাকাই ধুতি পরিধান করিতেছেন। এই যুবতি ভার্য্যার মনোরঞ্জনার্থ ত্রেতাযুগে সুবৃদ্ধ রাজা দশরথ অপত্য স্নেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রাম ও সীতাকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শ্বেত বরাহ কল্পে সাধারণতঃ স্ত্রীই এক মাত্র উপাস্যা দেবী; তাহাতে আবার বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী হইলে ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন যে কত দূর আরাধ্যা, তাহা ভগবান পার্ব্বতী-পতি পঞ্চ মুখেও বর্ণনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। অতএব প্রিয়ে!

তোমার মনোরঞ্জন করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তোমার নিকট ভারত-পঞ্জিকার ফলাফল বলিতেছি, শ্রবণ কর—

অথ কল্প ও যুগ নির্ণয়।

১৭৮৫ শকাব্দের ১২ আগষ্ট, কৃষ্ণপক্ষে, শনিবাসরে, নবমী তিথিতে, মঘানক্ষত্রে বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্প আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে চারিযুগে এক একটী কল্প পূর্ণ হইত। এবং কল্পান্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া পৃথিবী বিনষ্ট হইত। কিন্তু এই শ্বেতবরাহকল্পে ক্রমান্বয়ে বিংশতি যুগ অতিবাহিত হইয়া বর্ত্তমান ইলাবর্ত্ত ভূম্যধিকারী নামক যমজ যুগের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে সূর্য্যমণ্ডলের নিকটস্থ হইয়াছে বলিয়াই সমধিক সূর্য্যতেজ প্রাপ্তে এই যমজ যুগের উৎপত্তি হইয়াছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মতানুসারে * শ্বেত বরাহ কল্পের বিংশতি যুগের অবতার লিবঙ্গ। সেই লিবঙ্গ অবতারে একেবারে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইয়া পৃথিবীস্থ নর নারী চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল। দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। এইক্ষণে পৃথিবী যতই সেই দ্বাদশ সূর্য্যের সমধিক আলোক প্রাপ্ত হইতেছে, ততই মহাপ্রলয়ের সময়ও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। চরমে সেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়ই নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হইবে। শ্বেত বরাহ কল্পে প্রথমতঃ লবণ যুগের উৎপত্তি। অতএব প্রিয়ে! অগ্রে লবণ যুগের বিবরণ শ্রবণ কর।

* মার্কণ্ডেয় পুরাণের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অথ লবণ যুগোৎপত্তি বিবরণ।

১৭৮৫ শকাব্দের ১২ আগষ্ট কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্যা তিথিতে, মৃগশিরা নক্ষত্রে, বৃহস্পতিবার লবণযুগের উৎপত্তি হইল। লবণযুগে রাজগণ রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা অবলম্বন করিতেন। রাজপুরুষগণ রাজ্য শাসনে পরাঙ্মুখ। তাঁহারা কেবল বাণিজ্য দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রাজপুরুষদিগের এতাদৃশ আচরণ নিবন্ধন লবণের মূল্য অষ্টাদশগুণ বৃদ্ধি হইল। প্রজাগণের হাহাকার শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। রাজপুরুষদিগের প্রচারিত নিয়মানুসারে রাজ্যের কোন বণিকের লবণ বিক্রয় করিবার অধিকার রহিল না। রাজ্য মধ্যে যত লবণ উৎপন্ন হইত, তৎসমুদায়ই লবণ মহালের প্রজাগণের নিকট রাজপুরুষগণ ॥০ আনা মূল্যে প্রত্যেক মণ ক্রয় করিতেন। ৸০ আনার অধিক মূল্য কেহ দাবী করিতে পারিত না। রাজ্যের অন্য কোন লোকের নিকট কোন ব্যক্তি এক-পয়সার লবণ বিক্রয় করিলেও তাহার গুরতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। রাজপুরুষগণ এইপ্রকার লবণ মহালের কনট্রাকটরগণ হইতে প্রত্যেক মন লবণ ৸০বার আনা মূল্যে ক্রয় করিয়া দেশীয় বণিকগণের নিকট প্রত্যেক মন ৫ পাঁচটাকা হারে বিক্রি করিতেন। বণিকগণ আবার দেশস্থ লোকদিগের নিকট ৭টাকা হারে লবণ বিক্রি করিত। পূর্ব্বে ১।০একটাকা চারি আনা মূল্যে লবণ বিক্রয় হইত। কিন্তু রাজপুরুষদিগের লবণের একচেটিয়া নিবন্ধন প্রত্যেক প্রজাকে এক এক মণ লবণের জন্য ৫।৬ পাঁচ ছয় টাকা হারে টাক্স দিতে হইল।

লবণযুগে তন্তুবায়গণের প্রতি শনির

BLEED THROUGH.

ত্রিপদ ও রাহুর চতুষ্পদ দৃষ্টি নিপতিত হইল। তন্তুবায়গণের কোন কোন প্রকারের রেসমি বস্ত্র রাজপুরুষদিগের নিকট ভিন্ন অপর কাহারও নিকট বিক্রয় করিবার অধিকার ছিলনা। রাজপুরুষগণ যে বস্ত্রের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন, তন্তুবায়গণকে সেই মূল্যে সেইবস্ত্র বিক্রয় করিতে হইত। ইহাতে তন্তুবায়গণের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। তাহারা বস্ত্রের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া রেসমের কার্য্য করাইতেন। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া আপন আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া রেসম প্রস্তুতের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় দেখিতে লাগিল।

লবণযুগের অবতার ক্লিবলিঙ্গ। এই যুগের ধর্ম্ম স্বার্থপরতা। কর্ম্ম অত্যাচার। পাপ আঠার আনা। পুণ্যং নাস্তি। এই যুগের প্রধান তীর্থস্থান কাসিমবাজারের রেসমের কুঠী এবং ঢাকা, পাটনা, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতির লবণের গোলা। ইহার কোন এক তীর্থে প্রবেশ করিবা মাত্র লোকের সর্ব্ব প্রকার দরিদ্রতা মোচন হইত। এই সকল তীর্থে কিছুকাল বাস করিলেই লোক অতুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া পর্ণ কুটীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ সদৃশ অট্টালিকায় বাস করিতে সমর্থ হইত।

এই যুগে জীবের প্রাণ প্লীহাগত, অর্থাৎ বিলাতি ঘুসি প্রাপ্তি নিবন্ধন প্লীহা ফাটিলেই জীবের প্রাণ বিনাশ হইত। কোন কোন ব্যক্তির প্লীহা নাসিকাগ্রে অবস্থিতি করিত। কারণ নাসিকাগ্রে বিলাতি ঘুসা নিপতিত হইবা মাত্র অনেক লোকই প্লীহা ফাটিয়া মরিত। লবণযুগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম তারকব্রহ্ম বণিক কোম্পানি। যুগাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুগান্তের প্রলয়ের ন্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া পৃথিবীস্থ এক তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণ বিনাশ হইবা মাত্র লবণ যুগ সমাপ্ত হইল।

১৭৭২ খ্রীষ্টীয় অব্দের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণপক্ষে বৃষলগ্নে কর্কট রাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, শনিবাসরে নবমী তিথতে উৎকোচ গ্রহণযুগের উৎপত্তি। এই যুগে রাজপুরুষদিগের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এই যুগের সর্ব্ব প্রধান অবতার হট্ট ও ইল্বল বাতাপী। যুগ-প্রচলিত ধর্ম্ম উৎকোচ গ্রহণ। কর্ম্ম অর্থ সংগ্রহ। পাপ সাড়ে সতর আনা। পুণ্য বিয়োগ দেড় আনা। রুহিলাদের প্রতি শনির সম্পূর্ণ দৃষ্টি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাহুর উদয়। সুতরাং অযোধ্যার বেগম ও চিতসিংহের সম্বন্ধে খোনার বচন সার্থক হইল অর্থাৎ—

—রাহুর অগ্র শনির শেষ
—প্রাণে না মরে ছাড়ে দেশ।

এই যুগের সর্ব্ব প্রধান তীর্থস্থান মাল আদালত ও বন্দোবস্তের আফিস। এই সকল তীর্থস্থান একবার দর্শন করিলে দরিদ্রতা দূর হইত। এক একটী তীর্থে দীর্ঘকাল বাস করিলে বৈকুণ্ঠ স্বরূপ অট্টালিকা বাসের অধিকার হইত। এই যুগের আদ্যাশক্তি ভগবতী কাত্যায়নী বেরোনেস্। ভক্তিভাবে স্বর্ণ নৈবিদ্য ও রৌপ্যপুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে লোক সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের প্রাণ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ন্যায় প্লীহাগত, কিন্তু অনেকানেক জীবের প্রাণ উৎকোচ-গত ছিল। উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ হইলেই জীবের প্রাণ বিনাশ হইত। দিল্লীর

সূর্য্য মহারাষ্ট্রীয় রাহুর গ্রামে নিপতিত হইলে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ সমুপস্থিত হইয়া দিল্লী একেবারে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বিলাতি সূর্য্যের ক্ষীতরশ্মি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপালোকের ন্যায় এবং প্রভাত নক্ষত্রের নিস্তেজ রশ্মির ন্যায় ক্ষস্থায়ী আলোক প্রদান করিয়া অযোধ্যার উজিরের রাজপ্রাসাদ দুই তিন দিনের তরে আলোকিত করিল। কিন্তু প্রাতঃকালীয় নক্ষত্রের আলো অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। তাহা অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হইল। আবার যুগান্তের প্রলয় সমুপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিয়া ধর্ম্মরাজ ভীত হইয়া সংসার হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন সূর্য্যগ্রহণ নিবন্ধন সমুদায় পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন। ধর্ম্মরাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইক্ষণ কোথায় অবস্থিতি করিব। সমুদায় পৃথিবীই আলোকশূন্য হইয়াছে। হঠাৎ দৈববাণী হইল—"যাও হোলকারের রাজ্যে"।

তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ হোলকারের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সে দেশ আলোকে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কোথা হইতে এই ক্ষুদ্ররাজ্যে আলোক আসিয়া পড়িল। সূর্য্য কখন এতাদৃশ আলো প্রদান করিতে পারে না। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এ সূর্য্যালোক নহে; নারীহৃদয়ে সতীত্বধর্ম্মের আলোক। ধর্ম্মরাজ তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সূর্য্য অস্ত হইলে পৃথিবী একেবারে আলোক শূন্য হয় না। সাধ্বীর হৃদয়ের আলোক জগৎকে সূর্য্যালোক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমুজ্জ্বল করিতে পারে। সেই সময় হইতে কয়েক বৎসরের জন্য ধর্ম্মরাজ পরম সুখে অহল্যার হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সূর্য্যালোকের অভাবে পৃথিবীতে প্রলয় হইবার উপক্রম হইল। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ পরম পণ্ডিত হনুমানকে স্মরণ করিলেন। হনুমান ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র, ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস হনুমান! জগতে তোমার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই; ত্রেতাযুগে একবার তুমিই সূর্য্যকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে। বৎস! এইক্ষণ তুমি লেজ দ্বারা বিলাতি সূর্য্যটাকে একটু পূর্ব্বমুখী করিয়া রাখ যে, ভারতবর্ষে বিলাতি সূর্য্যের আলো নিপতিত হইয়া ভারতের অন্ধকার দূর করিতে পারে। হনুমান সার্দ্ধত্রিশত যোজন দীর্ঘ লেজ দ্বারা বিলাতি সূর্য্যকে বন্ধন করিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া লম্প প্রদান করিল। বিলাতি সূর্য্য তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমুখী হইয়া পড়িল এবং তন্নিবন্ধন তমসাচ্ছন্ন উৎকোচ গ্রহণ যুগ নিঃশেষিত হইল। ভারতে কিঞ্চিৎ ন্যায়ালোক নিপতিত হইল।

অর্থ কর্ণার্ট যুগোৎপত্তি বিবরণ।

১৭৮৬ খ্রীষ্টীয় অব্দের মাঘ মাসে, বুধবাসরে, মেষ লগ্নে এই যুগের উৎপত্তি। কর্ণার্ট যুগেই প্রথমতঃ রাজপুরুষগণ রাজশাসন সম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই যুগের প্রধান অবতার কর্ণার্ট, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটীযুগের অবতার ব্রহ্মদৈত্য সদৃশ নিম্ন শ্রেণীস্থ দেবতাগণ, কিন্তু এই যুগাবতীর্ণ দেবতাগণেরমধ্যে অনেকেইভদ্রকুলোদ্ভব ছিলেন।

এই যুগে রাহু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া মহিশুরে সমুদিত হইল। টিপুসুলতানের প্রতি শনি ও রাহুর দৃষ্টি পড়িল। এই যুগের ধর্ম্ম শান্তি সংস্থাপন চেষ্টা। কর্ম্ম

হস্তমুরারি বন্দোবস্ত। রাজস্ব আদায় তহসিলদারগণের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি। যত লোক রাজ-সরকারের খাজানা আদায় করত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভূম্যধিকারী হইল। রাজ-পুরুষগণ প্রজা-নিপীড়নের সমুদায় ভার সেই নবজাত ভূম্যধিকারীদিগকে প্রদান করিলেন। হনুমানের প্রসাদে এই নবযুগের উৎপত্তি হইল বলিয়া অধিকাংশ ভূম্যধিকারী হনুমান মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লেজ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসহায় ও নিরাশ্রয় লোক দেখিলেই সেই সকল লেজধারী ভূম্যধিকারী লেজের দ্বারা তাহাদিগের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতেন। সেই কর্ণাট যুগ হইতেই অধিকাংশ ভূম্যধিকারীর মধ্যে বংশ পরম্পরায় লেজ ধারণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ন্যায় এই যুগেও মাল আদালত ও বন্দোবস্তের আফিসই প্রধান তীর্থ স্থান ছিল। কিন্তু সদর নিজামত ইত্যাদি আর কয়েকটী নূতন তীর্থস্থান সংস্থাপিত হইল। এই যুগের বিচারকগণের মধ্যে অনেকেই ভব চন্দ্র রাজা। তাঁহারা যদি পুলিসের রিপোর্টে শুনিতে পাইতেন যে, চণ্ডীমণ্ডপের নিকট বসিয়া বাদী প্রতিবাদী মাইরপিট করিয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ চণ্ডীমণ্ডপকে সাক্ষী স্বরূপ তলব করিতেন। এই প্রকারে সময়ে সময়ে অশ্বত্থ গাছ ও চণ্ডীমণ্ডপকে ফৌজদারি আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষী দিতে হইত। কিন্তু কোন যুগই চিরকাল অবস্থিতি করে না, সুতরাং কর্ণাট যুগ সত্বরই অতিবাহিত হইল।

অথ উল্লুক যুগোৎপত্তি বিবরণ।

১৭৯৮ শকাব্দের চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে উল্লুক যুগের উৎপত্তি। উল্লুক যুগে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ঘোর সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইল। টিপু সুলতানের একেবারে সর্ব্বনাশ। সমস্ত মহিসুর প্রদেশ রাহুর গ্রাসে নিপতিত হইল। উল্লুক যুগের অবতার উল্লুক। এই যুগের ধর্ম্ম যুদ্ধ। কর্ম্ম রাজ্যবৃদ্ধি। পাপ ৸৹ চৌদ্দ আনা, পুণ্য ৵৹ দুই আনি। প্রজার সর্ব্বনাশ। "সপ্তম প্রথা" প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র ভূম্যধিকারীদিগের লেজ দশগুণ বৃদ্ধি হইল। খাজানা আদায়ের ছলনা করিয়া সেই সাত আইন অনুসারে এই সকল লেজধারী ভূম্যধিকারী প্রজার বাড়ী লুট করিতে লাগিল।

এই উল্লুক যুগের বিবরণ সমাপ্ত হইতে না হইতে ভগবতী আশ্‌মানি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, নাথ! অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে। এইক্ষণ আপনি বিশ্রাম করুন। আর অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া এই রসশূন্য, রসিকতাশূন্য যুগোৎপত্তির বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না। আশ্‌মানি মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতপঞ্জিকা বিদ্যাসুন্দর, কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদির ন্যায় নানা রস ও রসিকতা পরিপূর্ণ; আশ্‌মানি ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গীয় সুশিক্ষিত যুবকদিগের ডিনার পার্টিতে যে সকলহাস্য পরিহাস পরিপূর্ণ অশ্লীল গল্প হইয়া থাকে, যে সকল টপ্পা গান হয়, তাহাই ভারতপঞ্জিকা। কিন্তু এইক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতপঞ্জিকার মধ্যে সেই সকল হাস্য পরিপূর্ণ কথা নাই। পঞ্জিকার মধ্যে কেবল গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশি ইত্যাদি নির্ণয় বিবরণ, সুতরাং পঞ্জিকা শ্রবণে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হবীবর গোস্বামী মহাশয় আশ্‌মানির ভারতপঞ্জিকা শ্রবণে ঈদৃশ বীততৃষ্ণা অবলোকন করিয়া মনেং কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন।

বুদ্ধ কি কল্পিত দেবতা? শাক্যের জীবন চরিত।

পূত হিমালয়ের নির্ঝর-ধৌত পাদ-দেশে সহস্র স্মরণী স্তম্ভে এই কয়েকটী কথা পরিব্রাজকের নয়ন আকর্ষণ করে,—

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

কে লিখিয়াছে, তাহার নাম নাই, পথিকের আশ্রয় স্থানে নির্জন নির্ঝর তটে, সজন পণ্যবীথিকায়, দেবমন্দিরে বা তরুতলে কেবল দেখিতে পাই সেই কয়েকটী কথা,—

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

হিমাচল ছাড়িয়া প্রশস্ত মহাদেশ অতিক্রম করিয়া মলয় ও চন্দন বিরাজিত ভূসর্গ সিংহলে প্রবেশ কর, চারি দিকেই সেই কয়েকটী কথা। বৌদ্ধমঠে শ্রমণাচার্য্য শিষ্যদিগকে বলিতেছেন, "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। বিনীত অনুতপ্ত শিষ্য ক্ষীণস্বরে বলিতেছেন "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" জগতের অধিকাংশ লোকে বলে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," তথাপি কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধ উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

অস্ফুট বুদ্ধি সকল দেশে সমাজের স্তর বিশেষে গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাসনা করে। হিন্দু বা পারসী, গ্রীক বা রোমক, আর্য্য বা অনার্য্য, সকলেই গ্রহরাজ সবিতার চরণে এক এক সময়ে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়াছে। সূর্য্য পূজা কত প্রকারে বিভিন্ন সমাজে দেখা দিয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে সামাজিক ঐতিহাসিকের অভূত আনন্দের উদয় হয়। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" জগতের যাবতীয় জাতির সময়ান্তরের কামনা।

ফরাসী প্রত্নবিৎ এমিলি সেনার্ট অনুমান করেন, বুদ্ধের আখ্যায়িকা রূপান্তরে সূর্য্য-দেবের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা মাত্র। রাত্রির অন্ধকার মায়ার তামসীগর্ভ বুদ্ধের আদিম নিবাস। বুদ্ধের জন্ম মাত্র অন্ধ জগৎ দীপ প্রভায় উদ্ভাসিত হয়, তামসী নিশি প্রস্থান করে, তাই বুদ্ধের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে জগৎ আলোকিত এবং মায়ার পরলোক প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদসূক্ত-মধ্যে মেঘের ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সবিতা বজ্রপাণি রাক্ষসদিগকে কতবার পরাস্ত করিয়াছেন; বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধদেব কতবার শস্ত্রপাণি মারাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন, শক্রকে বিধ্বস্ত করিয়া সবিতার রশ্মিময় রথচক্র আকাশ পথে বিঘূর্ণীত হয়, মার পরাজয়ের অব্যবহিত পরে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সূচনা। ক্রমে দিবা অবসান হয়, পরাস্ত শক্র প্রভূত বলে সবিতৃ উজ্জ্বলি বংশ বিনাশ করে, আখ্যায়িকায় তাই শাক্য বংশের শক্রহস্তে বিমর্দ্দন বর্ণিত হইয়াছে, পরিণামে বুদ্ধেরও নিস্তার নাই—বুদ্ধেরও অন্তর্ধ্যান হইল, জ্বলন্ত চিন্তা জাহ্নবী জলে নির্ব্বাণ লাভ করিল, অস্তমিত সূর্য্যের

লোহিত কিরণ-জাল সাগর গর্ভে ডুবিয়া গেল (Senart—"Essæ sur la legende du Budha p. 504.)

সেনার্ট বুদ্ধের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম, বৌদ্ধগণ প্রতিদিন বুদ্ধের নাম গ্রহণ করিতেছেন, বুদ্ধ কি বলিয়াছেন, কি করিয়াছিলেন প্রতিদিন তাহারই আলোচনা করিতেছেন, বুদ্ধের মৃত্যুর অল্প কাল পরে বুদ্ধবচন সকল সংগৃহীত হইয়াছিল—এমন অবস্থায় কাহারও সাধ্য নাই, বুদ্ধের আবির্ভাব অস্বীকার করে। সেনার্ট ললিতবিস্তর নামক পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধের জীবন চরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া প্রতারিত হইয়াছেন; তাঁহার কঠোর অঙ্গুলি আঘাতে আখ্যায়িকার ঊর্ণজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাই তিনি বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত বুদ্ধ সম্বন্ধীয় আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালে বুদ্ধের জীবন চরিত লেখা হয় নাই। যে প্রাচীন সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সময়ে লোকে জীবন চরিত লিখিবার প্রথা শিখে নাই—ব্যক্তি বিশেষের সমগ্র জীবনী, আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একাকারে সমালোচনা করিবার রীতি তখনও পৃথিবীতে কোন দেশে কোন লোকে জানিত না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলী পালি ভাষায় লিখিত, প্রাচীন পালি গ্রন্থাবলীর মধ্যে বুদ্ধের জীবন-চরিত এক খানিও বিদ্যমান নাই—কোন কালে ছিল তাহাও বোধ হয় না।

আবার বুদ্ধ যাহা শিখাইয়াছিলেন, যাহা বলিয়াছিলেন, যাহা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বুদ্ধ কোন্‌বংশে কোন্ বৎসর কোন্ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সংবাদ অতি অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী, বুদ্ধের ইতিবৃত্ত তাঁহাদিগের চক্ষে পরিচিত পদার্থ; যাঁহারা বুদ্ধের পরকালবর্ত্তী, বুদ্ধ বচন তাঁহাদিগের চক্ষে বুদ্ধের জীবনী অপেক্ষা অধিক মূল্যবান; সে জন্য তাঁহারা দ্বিতীয়টী উপেক্ষা করিয়া প্রথমটী সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত দার্শনিক সক্রেটিসের জীবনবৃত্ত কেহ জানে না—কিন্তু তাঁহার উপদেশ মালা জেনোফনের লেখনীগুণে জগতে অক্ষয় পদবী লাভ করিয়াছে। কয়মাস কয়দিন গ্রীক প্রচারক গর্ভবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কোন্ বিদ্যালয়ে পড়িয়া কাহার নিকট চাকরী করিতেন, একথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে; কিন্তু কোন দিন জেনোফনের Memorabilia Socratica পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে না।

বেথেলহেমের মহাবীর খ্রীষ্ট যীশুর জীবনচরিত রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে জনসমাজে কেবল তাঁহার উপদেশ কথা প্রচারিত হইয়াছিল। লোকের যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক, তাহা ঐ কথা গুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; নব টেষ্টামেণ্টে প্রচারিত যীশুজীবনী আধুনিক; ভবিষ্যৎকালে যখন লোকে যীশুর জীবন্ত জীবনী বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত তিনি কে, কোথায় ছিলেন—তখনই তাহাদিগের জন্য যীশুর জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছিল।

বুদ্ধের সমগ্র-জীবনী গ্রন্থবিশেষে না পাওয়া যাইলেও তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক কথা প্রাচীন

গ্রন্থাবলী মধ্যে পাওয়া যায়। যে সময়ে শাক্যসিংহের ভারতভূমে আবির্ভাব হয়, পালি গ্রন্থ সকলে তাহার সুন্দর চিত্র অভিজ্ঞ চিত্রকর হস্তে চিত্রিত রহিয়াছে—যে সকল মনীষীগণ ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া একাকী বা সশিষ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ে আর্য্যাবর্ত্তের পরিত্রাণ-সূচক মতামত প্রচার করিতেন, বুদ্ধের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বদেশে তাঁহাদিগেরও প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান—সেই ছয় জন মহাগুরুর অন্যতম নাট পুত্র বৌদ্ধ ঐতিহাসিকের চিত্রে ভ্রান্ত বিধর্ম্মী—জৈনদিগের তীর্থঙ্কর বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধের জীবনী কেবল অন্ধকারময় আবর্ত্ত মাত্র নহে; বুদ্ধ উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নহে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও আমরা সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অসম্পূর্ণ বহুধা বিচিত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণে সক্ষম হই। পরন্তু ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনান্তে যখন আর্য্যাবর্ত্তের কোটী চক্ষু যুগপৎ সেই মুণ্ডিত মস্তক কৌশেয় কষায়পিহিত কমণ্ডলু পাণি মহাযোগীর দিকে আকর্ষিত হইয়াছিল—বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায়ের নেতামাত্র না হইয়া যখন শাক্যসিংহ সমগ্র হিন্দু সমাজ সন্ন্যাসী ও গৃহস্থমণ্ডলীকে একচ্ছত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন, শত্রু মিত্র সকলে তীব্র কটাক্ষে তাহার প্রতি মনোযোগ দিতেন; তাঁহার সে কার্য্য সে উপদেশগুলি তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্টতম অংশের পরিচয় দেয়। পালিপিটক সকল হইতে আমরা সে অংশের প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি।

সম্যক সম্বোধি লাভের পূর্ব্বতন বাললীলা, শাক্যের সংসার বাস কাল, প্রাচীন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণের বিশেষ আকর্ষণীয় নহে। এই জন্য প্রথম জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস বিদ্যমান নাই। ভবিষ্যৎ কালে বুদ্ধের সরল সহজ-ধর্ম্ম যখন শিষ্যগণের বিচিত্র উদ্ভাবনায় জড়িত ও অলঙ্কৃত হইয়াছিল, মত মাহাত্ম্যের অনুপাতে বুদ্ধকে অমানুষী দৈবশক্তি আরোপ করিবার আবশ্যক হয়, তখনই বুদ্ধের তুষিত-স্বর্গ হইতে অবতরণ, জন্মমুহূর্ত্তে বিবিধ অনৈসর্গিক ঘটনা, দেহে বিবিধ সুলক্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধ জীবনীতে উৎসাহমত্ত অনুশিষ্যগণ আরোপণ করিয়াছিল।

শাক্য-বংশে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে সিদ্ধার্থ বলিয়া ডাকিতেন—বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শ্রমণগোতম নামে তাঁহাকে অভিহিত করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণের সাধের আখ্যা বুদ্ধ বা তথাগত। সিদ্ধার্থের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মায়াদেবী তাঁহার গর্ভধারিণী। শুদ্ধোদন কপিলবস্তু নগরের রাজা ছিলেন। অযোধ্যার ঈশান কোণে হিমাচলের পাদদেশে হিমালয় হইতে আশীরবতীর তট পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা রোহিণী নামে স্রোতস্বতী, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা আশীরবতী, গোরক্ষপুর জেলার বর্ত্তমান বিনায়কপুর বাঁশি ও অর্দ্ধেক হাবেলী-পরগণা লইয়া এই রাজ্যটী গঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে কোশল, কৌশাম্বী ও মগধ নামে তিনটী প্রবল রাজ্য সংস্থাপিত ছিল। কোশল রাজ, কপিলবস্তু আপনার রাজ্য মধ্যে গণনা করিতেন, শাক্যগণও আপনাদিগকে কোশল-

বংশীয়দিগের অন্যতর বলিয়া পরিচয় দিত। বস্তুতঃ পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাহারা এক প্রকার স্বাধীনভাবে বসবাস করিত। রোহিণী নদীর অপর পার্শ্বে শাক্যদিগের কুটুম্ব কৌল্যদিগেরও একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন-রাজ্য অবস্থিত ছিল। শাক্যের জীবনের প্রধান ঘটনা সকল এই কয়েকটী রাজ্য মধ্যে ঘটিয়াছিল। কোশলা প্রাচীন সাম্রাজ্য, কিন্তু কালক্রমে ইহাও উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব প্রভৃতি নানা কৌশলায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শাক্যসিংহের আবির্ভাব সময়ে কেবল অযোধ্যার পূর্ব্বাঞ্চলকে কোশলা বলিত। শ্রাবস্তী* এই কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীন শ্রাবস্তি নগরের ভিত্তির উপর বর্ত্তমান ফৈজাবাদ নগর গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার কনিংহামের মতে বর্ত্তমান সাহেত মাহেত প্রাচীন শ্রাবস্তি। দশরথ উত্তর কোশলার রাজা ছিলেন; অযোধ্যা তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার মহিষী কৌশল্যা "দক্ষিণ কোশলাধিপতি পুত্রী"। কৌশল্যার বিবাহের অনতিপরে উত্তর ও দক্ষিণ কোশল সাম্রাজ্য এক হইয়া যায়। বহুকাল পরে এই দুইটী রাজ্য আবার বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রত্নপুর প্রদেশে প্রাপ্ত এক খানি তাম্র-শাসন পাঠে জানা যায়, ৭৮১ বা ৮৫৯ শকাব্দে ছত্তিশগড় প্রদেশ কোশল রাজ্যের অধীন ছিল। এ বোধ হয় দক্ষিণ কোশলা। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেন, এক সময় উড়িষ্যা দক্ষিণ কোশলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্ত কোশলার উল্লেখ আছে। ইঁহারই অন্যতম বিন্ধ্য পর্ব্বতে অবস্থিত ছিল। "দেব শ্রুয়-তাম্ ধয়মিতো দেবাদেশাৎ কতিপয়ৈরেবা হোভিরনেক করিতুরগপত্তি দুর্নিবারেণ মহতা বল সমূহেন গত্বা বিন্ধ্য দুর্গাবস্থিতস্য কোশল নৃপতে দ্বারমবষ্টভ্যসেনাঃ সমাবেশয়তুমার-দ্ধবন্তঃ"। রত্নাবলী চতুর্থাঙ্ক। *

কোশলার ন্যায় মগধ ভারতের আর একটী প্রাচীন সাম্রাজ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রাচীন নাম কিকট, জরাসন্ধ ঐ দেশকে মগধ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এক সময়ে কেবল বিহার দেশের দক্ষিণাংশকে মগধ বলা যাইত, কিন্তু কালক্রমে সমস্ত অনুগঙ্গ প্রদেশে মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজগৃহ মগধের প্রাচীন রাজধানী †। শাক্যের অভ্যুদয়ের পরে পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কুসুমপুর ও পদ্মাবতী পাটলি পুত্রের প্রাচীন নাম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে উদাসী রাজা কুসুমপুর স্থাপন করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর শত বৎসর পরে কালাশোকের সময়ে পাটলিপুত্র নগরে মগধের রাজ-ধানী স্থাপিত হইয়াছিল। বৈশালী, প্রাচীন মগধের আর একটী প্রধান নগর পাটলিপুত্র হইতে তেরক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম বেসার। শাক্যসিংহের সময়ে বৈশালী নগরে একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজা সুসঙ্গ এক সময়ে বৈশালী নগরে মগধের রাজ-ধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। রাজগৃহ ও বৈশালী নগরে শাক্যের প্রচার সময়ের অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। আর ভারতের চির পবিত্র বারাণসী—ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের প্রথম ক্ষেত্র, তাহাও তখন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুদ্ধের আবির্ভাব সময়ে বিম্বুসর এবং অজাত শত্রু মগধে রাজত্ব করিতেন।

রামায়ণে লিখিত আছে, "কুশাশ্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বী মকরোৎ পুরীং" কুশাশ্ব কুশের পুত্র রামের পৌত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সহস্রাণিকের বৃদ্ধ প্রপৌত্র চক্র এই নগর স্থাপন করেন। বৃহৎ কথার মতে স্বয়ং সহশ্রাণিক ইহার স্থাপয়িতা। হস্তিনাপুর গঙ্গাস্রোতে ধ্বংস হইলে কৌশাম্বী নগরে জনমেজয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। বুকেনান সাহেব এক সময়ে হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। আসিয়াটিক রিসার্চেস নামক গ্রন্থে (নবম খণ্ড ৪৩৩ পৃষ্ঠা) লেখা হইয়াছিল যে, কারা নগর প্রাচীন কৌশাম্বী মণ্ডলের অন্তর্গত। তদ্দর্শনে বোধ হয় Oriental Magazine নামক গ্রন্থে (No. I. P. 67.) কারা নগরকেই প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। আলাহাবাদের ত্রিশ মাইল উত্তরে কোশম নগরকে কানিংহাম ও বেলি সাহেব প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের মতে কৌশাম্বীর অপর নাম বৎস পত্তন। বৎস রাজা উদয়ন রত্নাবলীতে কৌশাম্বী নগরের অধিপতি-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ঐতিহাসিকেরা উদয়নকে শাক্যের সমসাময়িক বলিয়া লিখিয়াছেন। ললিতবিস্তরে লেখা আছে, একই দিনে শাক্য ও উদয়নের জন্ম হয়। কৌশাম্বী সাম্রাজ্য মগধ হইতে কোশলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সমাজের এক অবস্থায় রাজা, রাজ পরিবার, রাজ্য রক্ষক বা বিভিন্ন শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে পদের উচ্চানুচ্চতা জনিত পার্থক্য অতি অল্প থাকে। রাজ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য্যের ভার লইয়া আপন ইচ্ছা ও সাধ্যমত কর্ত্তব্য সাধন করে, একা সাধন করিতে অক্ষম হইলে সেই পরিবারের অন্য বা বহুজনে তাহার সাহায্য করে। সকলেই এক পরিবার; সমগ্র পরিবারের স্বার্থ উন্নতি বা গৌরব সাধন সকলেরই অভিপ্রেত, কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বিভিন্ন হইলেও পদ মর্য্যাদার বিশেষ বিভিন্নতা নাই, কেহ বেতনভুক কর্ম্মচারী নহে। কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মনোবাদ, দ্বেষ বা হিংসার কোন কারণ নাই। পরস্পরের সাহায্য করিতে সকলেই সমান উদ্যত। রাজ পরিবারের কেহ বা কৃষিকার্য্য তত্ত্বাবধারণ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যে শাক্য পরিবারের ভরণপোষণের ভার লইয়া ব্যস্ত; কেহ বা দেশগত বিদ্রোহ নিবারণ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্য ও রাজ পরিবার রক্ষায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি; কেহ বা সুবিচার বিতরণ শান্তি স্থাপনে জীবন অতিপাত করিতেছে। আবার সময়ান্তরে সকলেই ধনুর্বাণ হস্তে সমরাঙ্গনে অবরোহণ

* বুদ্ধের আবির্ভাব সময়ে প্রশেনজিৎ কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধকে বড় ভালবাসিতেন—উভয়েই ইক্ষাকু বংশীয়, হয়ত সে জন্যও ভালবাসার একটা নূতন আকর্ষণ জুটিয়াছিল।

† গিরিব্রজ ও কুশাগ্রপুর ইহার আর দুইটী প্রাচীন নাম। পর্ব্বত মালায় পরিবেষ্টিত বলিয়া ইহাকে গিরিব্রজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক ইহার চারি দিকে দণ্ডায়মান। এখন ইহাদিগকে বৈভার, বিপুল, রত্ন, উদয় ও সোণগিরি বলিয়া থাকে। স্বরস্বতী নামে একটী নির্ঝরিণী রাজ-গৃহের পার্শ্ব দেশে প্রবাহিত। রাজগৃহের বর্ত্তমান নাম রাজগির। মুঙ্গেরের কিয়দ্দূরে অবস্থিত।

করিতে সমর্থ। এরূপ শাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্রও নহে, রাজতন্ত্রও নহে। শাসন কর্ত্তৃগণ সকলেই ভাই ভাই, সকলেই সমান, সকলেই এক বংশজ। এরূপ প্রণালী বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত নহে। এ প্রণালীতে জমিদারী শাসন হইতে পারে, ক্ষুদ্র একটী রাজ্যভারও চালান যায়। পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ, তিনিই এই পারিবারিক রাজতন্ত্রের অধিনায়ক। তাঁহাকে মহাশয়জী, জমিদার, সর্দ্দার বা রাজা যাহা ইচ্ছা বল, রাজস্থানে এখনও এইরূপ রাজ পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের বিস্তৃতি বা শাসনের নিয়ম দেখিয়া তাঁহারা জমিদার বা রাজা, ইহা বুঝিতে পারিবে না;—তাঁহারা জমিদার নহেন,—কেবল করসংগ্রাহক তহশিলদার নহেন—তাঁহারা রাজা নহেন—কারণ রাজা বলিলে রাজ্যের বিস্তৃতি বা শাসনের বৈচিত্র্য যাহা বুঝায়, তাঁহাদের তাহা নাই। শাক্যগণ এমনই রাজ পরিবার ছিলেন, শুদ্ধোদন এমনই রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজ্য এতই ক্ষুদ্র ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে শুদ্ধোদন রাজা বলিয়া বিখ্যাত নহেন, তিনি "শাক্য শুদ্ধোদন" মাত্র। স্রোতস্বতী প্লাবিতা উর্ব্বর মাল ক্ষেত্রে ফল শস্যের অভাব ছিল না—কিন্তু ধন রত্ন হেতু শাক্যবংশ যশস্বী নহে—একা কোহিনুর সিদ্ধার্থ সেই পার্ব্বতীয় সুখী পরিবার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, বুদ্ধ রত্নের উজ্জ্বলতার অনুপাতে ভবিষ্য আখ্যায়িকাকার মহারাজ শুদ্ধোদনের রাজকোষ বহুবিধ রত্ন রাশিতে সুশোভিত করিয়াছিলেন।

শাক্য বংশীয়দিগের গোত্রনাম গোতম। এজন্য শুদ্ধোদন "গোতম শুদ্ধোদন" বলিয়া আখ্যাত, তাঁহার পুত্র "শ্রমণ গোতম" নামে অভিহিত। শুদ্ধোদন অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সিদ্ধার্থের মাতা মায়া ও মহা প্রজাপতি দুই সহোদরা ভগিনী; ইঁহারাও দুই জনে "গোতমী" নামে উক্ত হইয়াছেন। কথিত আছে, পুত্র জন্মের কয়েকদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়, তখন গোতমী মহাপ্রজাপতি সিদ্ধার্থের লালন পালন করিয়াছিলেন, মহাপ্রজাপতির গর্ভে শুদ্ধোদনের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল।

সিদ্ধার্থ জীবনের প্রথম অংশ কপিলবস্ত নগরে অতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় সন্তান, সুতরাং বেদপাঠ অপেক্ষা ধনুর্ব্বাণ পরিচালনায় তাঁহার অধিক আগ্রহ ছিল। শাক্যবংশীয় যুবকেরা অস্ত্র লইয়া মৃগয়া উদ্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন দিকে বিচরণ করিতেন—কথিত আছে মৃগয়া করিতে যাইয়া সুবিধা পাইলেই সিদ্ধার্থ বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইতেন। তৎকালে সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদিগের শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা তিনটী বিভিন্ন প্রাসাদে অতিবাহিত করিবার নিয়ম ছিল। সিদ্ধার্থের জন্য এমনি তিনটী কানন পরিধি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাল্যবধি অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল হইলেও সিদ্ধার্থ অন্যান্য রাজকুমারের ন্যায় প্রথম জীবনে বিলাস-সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার পত্নীকে কেহ বা গোপা, কেহ বা যশোধারা নামে অভিহিত করেন। রাহুল নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

পিতার গৃহে বিলাস সুখে এইরূপ সিদ্ধার্থের ঊনত্রিংশৎবৎসর অতীত হয়। সহসা কি জন্য তাঁহার মনে এমন বৈরাগ্যের উদয়

হইয়াছিল যে, পিতার সিংহাসন, জায়ার পবিত্র প্রীতি, কুমারের কোমল স্নেহ, বয়স্যগণের সরল সংসর্গ পরিহার করিয়া মুণ্ডিতমস্তক কষায়পিহিত কমণ্ডলুহস্তে সন্ন্যাসী হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কপিলবস্ত হইতে পলায়ন করেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কে জানিত? মনুষ্য জীবনের এক একটী ঘটনা এমন আছে যে, অতি প্রিয় আপ্ত জনেরও নিকট তাহা প্রকাশ করিতে কষ্ট বোধ হয়। সে কথাটী প্রত্যেকের হৃদ্‌গত ধন, গোপনে বুকের ভিতর তাহাকে পোষণ করিতেই আনন্দ, বাতাসে খুলিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়, যদি তাহা তেমন সুখপ্রদ আর না থাকে, যদি উঠিয়া যায়। আবার যাহারা সে কথাটী শুনিতে আকিঞ্চন প্রকাশ করে, তাহাদিগকে বলিতেও ভয় হয়, পাছে তাহাদিগের নখাঘাতে ব্যথা লাগে, পাছে তাহারা আমার অমূল্য রত্নের কোমল আভা উপভোগ করিতে অসমর্থ হয়? অথবা তাহাদিগের উপহাসে যদি উহা কাচবৎ প্রতীয়মান হইয়া আমার সুখের উৎস শুকাইয়া যায়। মানুষ সুখের জন্য পাগল; যদি মোহে সুখ পাই, সে মোহ বন্ধুর হস্তেও কাটাইতে প্রস্তুত নহি।

অথবা সিদ্ধার্থের চিন্তাশীল হৃদয় নিরন্তর বিলাস সুখে বিতৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া চিরস্থায়ী বিমলানন্দের জন্য লালায়িত হইবে আশ্চর্য্য কি? কত সময় আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সহসা হৃদয়ে কি বিতৃষ্ণারই উদয় হয়, তখন মন কিছুতেই আর আনত হইতে চাহে না। এরূপ অসুলভ বিপরীত বৃত্তি কেহ দৈব ঘটনা কেহ বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণন বলিতে পারেন। আবার মন যখন পদার্থ বিশেষের লালসায় চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সে পদার্থটী ভিন্ন জগতের আর কিছুতেই আর তাহাকে ফিরাইতে পারে না। ধর্ম্ম পিপাসু চঞ্চল হৃদয় কত আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে, কে গণনা করিতে পারে?

শাক্যের চিত্ত বিকার কি কারণে ঘটিয়াছিল, প্রাচীন গ্রন্থে কিছুই তাহার নির্দ্দেশ নাই। জরতী, পীড়িত বা শান্ত দর্শনের আখ্যায়িকা পশ্চাৎবর্ত্তী অনুশিষ্যদিগের আরোপিত। মনে যে ভাব হইতেই হউক, একবার যখন সিদ্ধার্থ সংসারের কনক পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া আকাশের বিশাল ক্ষেত্রে উড্ডীন হইলেন, আর কি কেহ তাঁহাকে ভুলাইয়া সে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে পারে? এখানে অসার ক্ষণস্থায়ী অপবিত্র বিলাস সুখ—তিনি যে পথে ছুটিয়াছেন, তাহার পরিণাম পবিত্র অনন্ত বিমলানন্দ। সংসারের মায়া কাটাইতে না পারিলে কেহ কি কখন অমৃতের অধিকারী হয়।

গৃহ ছাড়িয়া সিদ্ধার্থ সাত বৎসর কাল অতিপাত করিয়াছিলেন। সাতবৎসর অনুসন্ধানের পর তিনি সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়া তাপিত হৃদয়ে অতুলশান্তি লাভ করেন। এই সাত বৎসরের মধ্যে তিনি কিছুকাল দুইজন ব্রাহ্মণের নিকট তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকাল প্রচলিত সমাধিরীতি হটযোগ তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন—সিদ্ধার্থ যাহার অন্বেষণে বিরাগী, তাঁহারা তাঁহাকে তাহা দিতে পারেন নাই। এই দুই জন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে আবাড়কালাম ও রামপুত্র উদ্দক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ মগধে প্রবেশ করেন, এবং পর্য্যটনক্রমে নৈরঞ্জনা তটে উরুবিল্ব গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। নৈরঞ্জনার বর্ত্তমান নাম

ফাল্গুনদী এবং উরুবিল্ব বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার অপর পারে। উরুবিল্বের শ্যামল ক্ষেত্র, নৈরঞ্জনার বিমল স্রোত, শান্তিসুখময় কৃষাণ-বাস তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তিনি সমাধি সাধনের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া সেখানেই আসন গ্রহণ করিলেন। তপস্যায় তাঁহার কয়েক বৎসর এখানে অতিবাহিত হয়। তৎকাল প্রচলিত-রীতি অনুসারে তিনি চিত্ত সমাধানার্থ নানা প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছিলেন—তথাপি মনোগত পূর্ণ হইল না। তখন রাজকুমার কঠোরতর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, আহার পরিত্যাগ করিলেন, কুম্ভক অবলম্বন করিলেন—নানা প্রকারে দেহের পীড়ন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য আশ্রমবাসী আর পাঁচজন ঋষি তাঁহার তপশ্চর্য্যার কঠোরতায় ভীত হইয়া দেখিতে লাগিল। আশা—যদি তিনি সফল হন, তবে তাহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইবে। ক্রমে সিদ্ধার্থের শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, চলৎশক্তি রহিত হইয়া আসিল, তথাচ তিনি পূর্ণ-সমাধি লাভ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কৃচ্ছ্রসাধনে শান্তিসুখ লাভ হয় না, শারীরিক কঠোরতা সমাধি লাভের অন্তরায়। তখন তিনি কিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিলেন। পঞ্চ বর্গীয়েরা তাঁহাকে পতিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া চলিয়া গেল। তিনি একাকী সাধন করিতে লাগিলেন, এবং কিছু দিন পরে সফল হইলেন। জগতের অস্থিরতা ও দুঃখের কারণ কি, এবং কি উপায়ে তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে, তিনি ধ্যান বলে আবিষ্কার করিলেন। বোধিমূলে সম্যক সম্বোধি লাভ হইল। "যখন ইহা বুঝিলাম, যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম, আমার আত্মা, কামনা মোহ ও অজ্ঞানতা বিচ্যুত হইল, পার্থিব জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। মুক্ত মানসে মুক্তি জ্ঞান প্রতিভাত হইল, আমি জানিলাম, পুনর্জ্জন্মের অবসান হইল, সাধনার সমাপ্তি হইল, কর্ত্তব্য সাধন হইল, আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।" সিদ্ধার্থ এতদিনে বুদ্ধ হইলেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

অজ্ঞেয়তাবাদ ও নাস্তিকতা।

"সকলই আপনা আপনি হইয়াছে, পরমেশ্বর নাই" ইহা ষোল আনা নাস্তিকের কথা। "পরমেশ্বর আছেন কি না নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না" ইহা সন্দেহবাদীর কথা। "এই ব্রহ্মাণ্ড এক আদি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আদিকারণের স্বরূপ মনুষ্যের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়,, ইহা অজ্ঞেয়তাবাদীর কথা। অজ্ঞেয়তাবাদী, জ্ঞান কি দয়া কি প্রেম, কোন গুণই পরমেশ্বরে আরোপ করিতে চাহেন না। তিনি বলেন, মূল কারণ আছেন, এই মাত্র জানি, আর কিছুই জানি না। বর্ত্তমান সময়ে এই অজ্ঞেয়তাবাদ শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত দলে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

অজ্ঞেয়তাবাদীকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। যদি বিশ্বকারণের বিষয় কিছুই জান না, তবে কেমন করিয়া জানিলে যে তিনি অজ্ঞেয়? যদি এ পর্য্যন্ত কিছু জানিতে না পারিয়া থাক, বল যে তিনি অজ্ঞাত; অজ্ঞেয় বলিবার অধিকার কি? তুমি বলিতেছ যে, মানুষের পক্ষে পরমেশ্বরকে জানা অসম্ভব। কেন? তুমি অবশ্য তাঁহার বিষয় এমন কিছু জানিয়াছ, যে জন্য বলিতেছ যে, তাঁহাকে জানা যায় না। ঐ গরুটাকে অজ্ঞেয় বল না কেন? তুমি উহাতে এমন কিছু দেখিতেছ না, যে জন্য উহাকে অজ্ঞেয় বলা যুক্তিযুক্ত মনে কর। সুতরাং তোমাকে ইহা বলিতেই হইবে যে, তুমি বিশ্বকারণের বিষয়ে এমন কিছু জানিয়াছ যে জন্য তুমি বলিতেছ যে, তাঁহাকে জানা যায় না।

আমি যে পদার্থকে যথার্থই জানি না, তাহার বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না। তাহা অজ্ঞেয় কি জ্ঞেয়, এ উভয়ের মধ্যে কিছুই জানি না। যাহার বিষয় কিছুই জানি না, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞানভূমির অতীত স্থানে স্থিতি করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ধৃষ্টতা নহে?

কিন্তু অজ্ঞেয়তাবাদী নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন যে, আদিকারণ অজ্ঞেয়। তিনি অবশ্য আদিকারণ সম্বন্ধে এমন কিছু জানিয়াছেন, যে জন্য এ কথা বলিতে সাহস করিতেছেন। তবে অজ্ঞেয় কেমন করিয়া হইল? জ্ঞাত অজ্ঞেয়, "সোণার পাথর-বাটী" কি কখন হয়? যে জন্য বলিতেছ যে, তাঁহাকে জানা যায় না, সেই জন্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে জানা যায়।

লক্ষণ-জ্ঞান ব্যতীত এক প্রকার পদার্থ হইতে অন্য প্রকার পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায় না। পর্ব্বত বৃক্ষ নয়, বৃক্ষ পর্ব্বত নয়, নদী সমুদ্র নয়, সমুদ্র নদী নয়; হস্তী পিপীলিকা নয়, পিপীলিকা হস্তী নয়; মনুষ্য গরু নয়, গরু মনুষ্য নয়; এই সকল পার্থক্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখিয়াই উৎপন্ন হয়। পিপীলিকাতে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা হস্তীতে নাই; আবার হস্তীতে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা পিপীলিকাতে নাই। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, পিপীলিকা হস্তী নয়, এবং হস্তী পিপীলিকা নয়। সেইরূপ যদি জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়, এই দুই প্রকারে পদার্থ বিভাগ কর, তাহা হইলে এই উভয়বিধ পদার্থেরই লক্ষণ জানা চাই। কি লক্ষণ থাকিলে জ্ঞেয় পদার্থ হয়, এবং কি লক্ষণ থাকিলে অজ্ঞেয় পদার্থ হয়, তাহা না জানিলে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের প্রভেদ কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? কিন্তু যদি লক্ষণ জানা গেল, তবে অজ্ঞেয় কেমন করিয়া হইল? যাহাকে অজ্ঞেয় বলিতেছ, তাহা অবশ্য আংশিকরূপে জ্ঞেয়। তবে আর অজ্ঞেয়তাবাদ কোথায় রহিল?

কিন্তু তিনি অনন্ত। আমি পরিমিত হইয়া অনন্তকে কেমন করিয়া জানিব? একথাটী অনেকেই বলেন। সফরী কি সাগর পার হইতে পারে? ক্ষুদ্র পক্ষী কি আকাশ প্রদক্ষিণ করিতে পারে?

মনুষ্য কি অনন্তকে জানিতে পারে না? তবে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই অনন্ত-

অর্থ-বোধক শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? অনন্ত—এই শব্দটী বলিলে লোকের মনে অবশ্য একটী অর্থবোধ হয়। অর্থ-বোধ না হইলে উক্ত শব্দের ব্যবহার থাকিত না। যখন অনন্ত শব্দটী বলিলেই তাহার অর্থবোধ হইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিবে যে, অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব?

যদি অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব হয়, তবে কেমন করিয়া জানিলে যে অনন্ত আছে? অনন্ত ও "আকাশ কুসুম" কি একই অর্থ প্রকাশ করে? "আমি অনন্তকে জানি না" এমন কথা না বলিয়া, ইহাই কেন বল না যে, অনন্ত বলিয়া কিছু নাই? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যদি বলিতে পারি যে, অনন্ত আছে, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, অনন্তকে জানি। না জানিলে কেমন করিয়া বলিব, আছে?

অনন্তকে বুঝা যায় না বলিলে কি বুঝায়? ইহাই বুঝায় যে, অনন্তকে বুঝি। যদি অনন্তের কোন জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে অনন্তকে বুঝা যায় কি না যায়, এ দুয়ের কিছুই জানিতাম না। যদি তুমি নিশ্চয় করিয়া বল যে, মনুষ্য অনন্তকে কোন ক্রমেই জানিতে পারে না, তাহা হইলে তুমি অনন্তের বিষয়ে অবশ্য এমন কিছু জান, যে জন্য তুমি বলিতেছ যে অনন্তকে জানা যায় না। অনন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলে, মনুষ্য অনন্তকে জানিতে পারে না। এমন কথা বলিবার অধিকার থাকে না। যাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কেমন করিয়া বলিব যে তাহা অজ্ঞেয়? অনন্তকে না জানিলে কেহ বলিতে পারে না যে, অনন্তকে জানা যায় না। এক প্রকার খেলাতে বালকেরা তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু বাঁধিয়া দেয়। অপর সকলে একে একে অঙ্গুলি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিতে থাকে। যাহার চক্ষু বাঁধা হইয়াছে, সে তাহাদের ধরিতে চেষ্টা করে। যে ভাল মানুষ, সে হাত নাড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু দুষ্ট ছেলে কাপড়ের ভিতর দিয়া ঈষৎ একটু দেখিয়া লয়; অথচ এমনি ভাব প্রকাশ করে, যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছে না।

পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। দীর্ঘ কি? যাহা হ্রস্ব নয়। হ্রস্ব কি? যাহা দীর্ঘ নয়। ভাল কি? যাহা মন্দ নয়। মন্দ কি? যাহা ভাল নয়। পরিমিত কি? যাহা অনন্ত নয়। অনন্ত কি? যাহা পরিমিত নয়। বিপরীত পদার্থের জ্ঞান একত্রে বাস করে। যখন আমাদের পরিমিতের জ্ঞান আছে, তখন অনন্তের জ্ঞানও অবশ্য আছে।

প্রত্যেক পরিমিত পদার্থ অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র, তারা সকলই অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। সামান্য তৃণকণা, সামান্য ইষ্টক খণ্ড অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। সমুদ্র ও জলবিন্দু, হিমাচল ও বালুকণিকা সমভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। যাহা কিছু দেখি, তাহাতে অনন্ত প্রকাশিত। দূরে কেন যাই? আমি নিজে পরিমিত, সুতরাং আমাতেই অনন্ত প্রকাশিত।

তবে, "অনন্তকে জানি না" এ কথার কি কোন অর্থ নাই? আছে বই কি! অনন্তের ধারণা হয় না। অনন্ত তো দূরের কথা। সকল পরিমিত পদার্থেরই কি ধারণা হয়? এই পৃথিবীটা কত বড় ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে না। পৃথিবী

কেন? হিমালয় পর্ব্বত কত বড় ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে না। হিমালয় কেন? একটা সামান্য বাড়ী, একটা বৃক্ষকে ভাব দেখি; ধারণা করিতে পারিবে না। বাড়ীর ভিত্তি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত, এবং দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সমুদয় স্থান একসঙ্গে ভাব দেখি; কখনই পরিষ্কার ধারণা হইবে না। একটা বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব লইয়া সমগ্র বৃক্ষ ভাব দেখি; পারিবে না। মানুষের মন এত ক্ষুদ্র। যখন পরিমিত পদার্থেরই পরিষ্কার ধারণা হয় না, তখন অনন্তের ধারণা কি সম্ভব?

অজ্ঞেয়তাবাদ লইয়া বিচার করিতে হইলে দুটী বিষয় দেখা আবশ্যক। প্রথম, মানুষের এমন ক্ষমতা আছে কি না যে, জগতের আদিকারণকে জানিতে পারে। দ্বিতীয় আদিকারণের এমন ক্ষমতা আছে কিনা যে, তিনি মানুষের নিকট প্রকাশিত হন। আদিকারণের সে ক্ষমতা আছে কি? অজ্ঞেয়তাবাদীদিগের শিরোভূষণ হার্বার্ট্ স্পেন্সর্ আদিকারণ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন;—

"Thus the Eirst Cause must be in every sense, Perfect, complete, total: including within itself all Power and transcending all Law."

এ কথার মর্ম্ম এই যে, আদিকারণ সকল প্রকার অর্থেই পূর্ণ। তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশক্তি রহিয়াছে; এবং তিনি সকল নিয়মের অতীত। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আদিকারণ যদি সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত হন, তাহা হইলে তিনি আপনার স্বরূপ-লক্ষণ মনুষ্যকে জানাইতে পারিবেন না কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ কি আত্মপ্রকাশে অক্ষম? যিনি সর্ব্বত্র স্থিতি করিতে পারেন, তিনি কি মনুষ্যের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন না? যদি বল, পারেন না, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট ও সকল নিয়মের অতীত কেমন করিয়া হইলেন? যদি বল পারেন, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ কোথায় থাকিল?

অজ্ঞেয়তাবাদ বলিতেছে, মনুষ্যের পক্ষে বিশ্বকারণের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি স্বীকার করিলে অসম্ভাবনা থাকে কই? অজ্ঞেয়তাবাদ কি অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে? যদি তুমি বিশ্বকারণকে অজ্ঞেয় বল, অথচ তাঁহার অনন্ত-শক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে কি তুমি এক মুখে দুই বিপরীত কথা বল না?

আমাদের পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেমন সুন্দর কথা বলিয়াছেন!—

"যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

এই শ্লোকটীর প্রথমাংশে পরমেশ্বরকে বাক্য মনের অগোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে; দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে যে, যিনি সেই পরমেশ্বরের আনন্দ জানিয়াছেন, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। এই দুটী কথা কি পরস্পর-বিরোধী নহে? যিনি বাক্য মনের অগোচর, তাঁহার আনন্দ কেমন করিয়া জানা যাইবে? যদি তিনি

জীবের হৃদয়ে আপনার আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই জীব তাহা জানিতে পারে। পরমেশ্বর যে আপনাকে প্রকাশ করেন, মহর্ষিগণ অধ্যাত্ম যোগদ্বারা তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। উপনিষদের আর একটী শ্লোক দেখুন;—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা-দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।

নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়তাবাদের মধ্যে অজ্ঞেয়তাবাদ, অবশ্য, সত্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, অজ্ঞেয়তাবাদ অধিকতর অসঙ্গতি দোষ-যুক্ত। পরমেশ্বর আছেন, অথচ তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ অজ্ঞেয়, এ দুই কথা পরস্পর মিলে না। পরমেশ্বর আছেন কেন বলিতেছ? তিনি আছেন, এ কথা বলিবার যে কারণ, সেই কারণই কি তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া দিতেছে না? যদি সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া বল, তিনি আছেন, সৃষ্টিকৌশল কি তাঁহার জ্ঞানের কথা বলিতেছে না? যদি বিবেকের বাণী শুনিয়া বল, তিনি আছেন; বিবেক কি তাঁহাকে "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে না? যদি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিয়া বল, তিনি আছেন, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি তাঁহাকে শক্তিরূপী বলিয়া প্রচার করিতেছে না?

অজ্ঞেয়তাবাদী প্রথম দুইটী কারণ স্বীকার করেন না। শেষটী করেন; সুতরাং শেষটী লইয়া একটু আলোচনা করিব। প্রথমেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আদিকারণ সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞেয়, তবে তাঁহার শক্তির কথা বল কেন? যদি কিছুই জানা যায় না, তবে কেমন করিয়া শক্তির বিষয় জানা গেল? শক্তি কি একটী স্বরূপ-লক্ষণ নহে? যদি বল শক্তি ভিন্ন আর কিছু জানা যায় না, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় কেমন করিয়া হইলেন? শক্তি স্বীকার করিলে কি তাঁহাকে আংশিকরূপে জ্ঞেয় বলা হয় না?

কিন্তু শক্তি ভিন্ন আর কিছু স্বীকার না করিবার কোন অর্থ নাই। শক্তি মানিলে, ইচ্ছা ও জ্ঞান মানিতেই হইবে। অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, আমরা যাহাকে শক্তি বলি, তাহা ইচ্ছা ও জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে। এক জ্ঞানময়ী অনন্ত-শক্তি অনন্ত ভুবনে প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে।

শক্তি কি? যাহা পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। অগ্নির সহিত হস্তের সংস্পর্শ হইল, হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল। একটী মৃন্ময় বা কাচপাত্রে তুমি পদাঘাৎ করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইল, অমনি বিদ্যুল্লতা ঝলসিয়া উঠিল। হরির পৃষ্ঠে রাম মুষ্ট্যাঘাৎ করিল, পৃষ্ঠে বেদনা হইল। এই সকল স্থলেই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সেই পরিবর্ত্তনের মূলে শক্তি বিদ্যমান। অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে; সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শক্তি কার্য্য করিতেছে।

পক্ষীর কলরবে, প্রাণী দেহের শোণিত ধারে, নদীর স্রোতে, সাগরের তরঙ্গে, বায়ুর হিল্লোলে, গ্রহের গতিতে, সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন; সর্ব্বত্র শক্তির কার্য্য।

অনন্ত ভুবন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে বাঁধা রহিয়াছে। উত্তাপ সংযোগে জল বাষ্প হয়; যেখানে উত্তাপের সহিত জলের যোগ, সেই খানেই জলের বাষ্পরূপে পরিণতি। প্রথম ঘটনাটী উপস্থিত হইলেই দ্বিতীয় ঘটনাটী উপস্থিত হয়। শুষ্ক পত্র অগ্নিতে দেও, দগ্ধ হইবে। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত কর, লোহিত বর্ণ হইবে। ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ কর, ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। এই প্রকার সমুদয় স্থলে একটী ঘটনা ঘটিলেই আর একটী ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। প্রথমটীকে কারণ বলে, দ্বিতীয়-টীকে কার্য্য বলে। অগ্নির সহিত হস্তের সংশ্রব কারণ, হস্ত দগ্ধ হওয়া কার্য্য। কাচপাত্রে আঘাত কারণ, পাত্র ভগ্ন হওয়া কার্য্য। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ কারণ, বিদ্যুৎ উৎপত্তি কার্য্য। হরির পৃষ্ঠে রামের মুষ্ট্যা-ঘাত কারণ, পৃষ্ঠে বিশেষ-প্রকার ইন্দ্রিয় বোধ, কার্য্য।

কিন্তু একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা হইলেই কি প্রথমটী কারণ ও দ্বিতীয়টী কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে? বৃক্ষে একটী ফল পাকিয়া রহিয়াছে; উহার উপরে একটী পক্ষী আসিয়া বসিল। ফলটী অমনি পড়িয়া গেল। এস্থলে ফলটী পড়িল কেন? পক্ষী বসিল বলিয়া ফলটী পড়িল, না, ফলটী পাকিয়া আপনি বৃন্ত চ্যুত হইল? যদি দেখিতাম যে, যেখানে যখন পক্ষী ফলের উপরে বসে, সেখানে তখনই ফল পড়ে, অন্য প্রকারে পড়ে না, তাহা হইলে বলিতাম যে, পক্ষীর বসাই ফল পড়ার কারণ। কিন্তু দেখিতেছি যে, ফল নানা কারণে বৃন্তচ্যুত হয়;—সুপক্ক হইয়া আপনা আপনি বৃন্তচ্যুত হয়। সুতরাং ফলের উপরে পক্ষীর উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরে ফল পতিত হই-লেও প্রথম ঘটনাটী কারণ ও দ্বিতীয় ঘটনাটী কার্য্য না হইতে পারে।

কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয়রূপে সকল স্থানে ও কালে একটী বিশেষ ঘটনার পর আর একটী বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইলেই কি প্রথমটীকে কারণ দ্বিতীয়টীকে কার্য্য বলিব? যেখানে যখন চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হয়, সেখানে তখনই উহা লোহিত বর্ণ হয়। সুতরাং চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হওয়া কারণ, এবং লোহিত বর্ণের উৎপত্তি, কার্য্য।

সকল স্থলেই কি সেইরূপ? দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন হইতেছে। এনিয়-মের ব্যভিচার কখন দেখি নাই। তাই বলিয়া কি বলিব যে, দিন রাত্রির কারণ, অথবা রাত্রি দিনের কারণ? আমাদের নৈয়ায়িকেরা কারণের লক্ষণা করিয়াছেন; "নিয়তঃ পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ" যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই কারণ। এই লক্ষণা অনুসারে দিন রাত্রির কারণ, এবং রাত্রি দিনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বাস্ত-বিক তাহা নহে। দিন রাত্রির মধ্যে যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই, সহজেই বুঝা যায়। সূর্য্যোদয় ভিন্ন দিন হয় না, এবং সূর্য্যাস্ত ভিন্ন রাত্রি হয় না; সুতরাং সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তই দিন ও রাত্রির কারণ।

তবে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই কারণ; এবং অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহা পরবর্ত্তী, তাহাই

কার্য্য। সূর্য্যোদয় রূপ ঘটনাটী না ঘটিলে রাত্রি কখন দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না; এবং সূর্য্যাস্তরূপ ঘটনাটী না ঘটিলে দিন কখন রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। সেই জন্য দিন রাত্রির মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যোদয় হইলেই দিন হয়; সূর্য্যাস্ত হইলেই রাত্রি হয়; অন্য কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না,—সুতরাং সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তই দিন রাত্রির কারণ।

ইহাই যদি কার্য্য ও কারণ হইল, তবে শক্তি কোথায়? একটী ঘটনা আগে ঘটিতেছে, আর একটী পরে ঘটিতেছে, ইহা ভিন্ন তো আর কিছু দেখিতেছি না। যাহাকে কার্য্য কারণ শৃঙ্খল বলিতেছি, তাহা একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা ভিন্ন কিছুই নহে। শক্তি কোথায়?

আর এক প্রকারে আলোচনা করা যাউক। শক্তি কি পদার্থ? জড়পদার্থ না জ্ঞান পদার্থ? অথবা জড় ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনরূপ পদার্থ? শক্তি যদি পদার্থের গুণ হয়, তবে উহা জড়ের গুণ কি মনের গুণ? অথবা জড় ও মন ভিন্ন অন্য কোনরূপ পদার্থের গুণ?

প্রথমতঃ শক্তি যদি জড় বা জড়ীয় গুণ হয়, তাহা হইলে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অবশ্য উহাকে জানা যাইবে। কিন্তু চক্ষু দ্বারা শক্তি দেখা যায় না, কর্ণ দ্বারা শুনা যায় না; ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, শারীরিক কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না। অতি উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রও শক্তির সংবাদ বলিতে পারে না।

শরীরের দ্বারা যে শক্তিকে জানা যায় না, একথা অনেকেই বুঝিবেন না। পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠ দেশে একজন ধাক্কা দিল। আমি কি তখন শক্তি অনুভব করিলাম না? তবে কি অনুভব করিলাম? ইন্দ্রিয় বোধ (Sensation) ও গতি (Motion)। যে সকল স্থলে আমরা বোধ করি যে, শরীরের দ্বারা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই সকল স্থলে আমরা বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বোধ অথবা গতি ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করি না। কিন্তু ইন্দ্রিয় বোধ ও গতির উৎপত্তির কারণ যে শক্তি, তাহা কখনই অনুভব করিতে পারি না। মাংস পেশীতে কি শক্তি অনুভব করা যায় না? অনেক বুদ্ধিমান লোকেও মনে করেন যে, তাঁহারা মাংস পেশীতে শক্তি অনুভব করেন। বাস্তবিক মাংস পেশীতেই হউক, অথবা শরীরের যে কোন অংশেই হউক, এক প্রকার ইন্দ্রিয় বোধ ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না।

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, শক্তি জড় বটে, কিন্তু যারপর নাই সূক্ষ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয়ের অতীত, এমন কি অনুবীক্ষণ যন্ত্রেরও অতীত। সে কথা বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কার্য্য কারণ শৃঙ্খল পরীক্ষা করিলে, কেবল একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা লক্ষিত হয়। প্রথমটীকে কারণ বলে, দ্বিতীয়টীকে কার্য্য বলে। শক্তি যদি কোথাও থাকে, তবে উহা কার্য্য কারণ শৃঙ্খলেই থাকিবে। কিন্তু কই? পরে পরে দুটী ঘটনা হইল; ঐ দুটী ঘটনার মধ্যে এমন কিছু দেখিতেছি না, যাহা উভয়কে যোগ করিতেছে।

যদি বল, চক্ষুর অতীত এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহা কার্য্য ও কারণকে যুক্ত করে, এবং তাহাই শক্তি; সে কথা বলিলেও হইবে না। সেই সূক্ষ্ম পদার্থ অবশ্য প্রথমে কারণে (প্রথম ঘটনার) থাকে; তাহা হইতে

নিঃসৃত হইয়া উহা কার্য্যের দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে আসে। এখানে দেখ, এই সূক্ষ্ম (যাহাকে শক্তি বলিতেছ) উহার নিঃসরণ একটী ঘটনা, এবং উহা নিঃসৃত হইলে পর যাহা হয়, তাহা আর একটী ঘটনামাত্র; এ উভয়ের মধ্যে যোগ কোথায়? কেবল পরে দুটী ঘটনা ঘটিল বই তো নয়। ভাবিতে গেলে কি ভাবিব? শক্তি নামে একটী সূক্ষ্ম পদার্থ নিঃসৃত হইল, তারপর একটী ঘটনা হইল। পরে পরে দুটী ঘটনা হইল; কিন্তু কে বলিল যে, প্রথম ঘটনাটী দ্বিতীয় ঘটনাটীকে উৎপন্ন করিল? প্রথম ঘটনাটী ঘটিবামাত্র একটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সেই পরিবর্ত্তন দ্বিতীয় ঘটনা অথবা কার্য্য। কিন্তু প্রথম ঘটনা হইতে যে দ্বিতীয় ঘটনার উৎপত্তি, একথার প্রমাণ কি? যদি কোন সূক্ষ্ম পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে, (শক্তি বলিতেছ) তবে তাহা একটী ঘটনা মাত্র; সেই ঘটনা হইতে যে দ্বিতীয় ঘটনা প্রসূত হইল, এমন কথা কেন বল? পরে পরে দুটী ঘটনা হইল, এই কথা বলিলেই তো হয়? ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে দ্বিতীয় ঘটনার উৎপত্তি যদি প্রমাণ না হইল, তবে উহাকে কেমন করিয়া শক্তি বলিব? যাহা পরিবর্ত্তন করে,—ঘটনার উৎপত্তি করে,—তাহাই শক্তি; সুতরাং ঐ সূক্ষ্ম পদার্থকে শক্তি বলিতে পারি না। যদি ঐ প্রকার কিছু থাকে, উহা এক প্রকার সূক্ষ্ম জড়মাত্র।

যাহা শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড় বা জড়ীয় গুণ। জড় যদি সূক্ষ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয় গোচর না হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি আরও অধিক হইলে অথবা অনুবীক্ষণ যন্ত্র আরও ভাল হইলে উহা ইন্দ্রিয় গোচর হইত। কিন্তু প্রদর্শিত হইল যে, শারীরিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শক্তিকে কখনই জানা যায় না;—জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবে শক্তি জড় বা জড়ীয় গুণ নহে।

তবে কি জড় জগতে শক্তি বলিয়া কিছু নাই? কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনা-শ্রেণী রহিয়াছে? একথা মনুষ্যের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বজ্রাঘাতে গৃহের ছাদ ভগ্ন হইয়া গেল, পদাঘাতে কাচপাত্র চূর্ণ হইল, লগুড়াঘাতে মেরুদণ্ড দ্বিখণ্ড হইল, ইহার মধ্যে কোন শক্তি কার্য্য করিল না, কেবল একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, ইহা কেহ মনে করিতে পারে না। ঝড় হইয়া পৃথিবী তোলপাড় হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে শত শত গৃহ ভস্মীভূত হইল, ভূকম্পে লিস্‌বন্ নগর বিনষ্ট হইল, অথচ এই সকল ঘটনার মূলে কোন শক্তি কার্য্য করিল না, কেবল একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল, মনুষ্য ইহা মনে করিতে পারে না। জড় জগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে, ইহা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধসংস্কার।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক দেখিয়া দেখিয়া একটা সংস্কার জন্মে। তার পর বৈজিক নিয়ম (Law of heridity) অনুসারে উহা বংশ-পরম্পরায় চলিতে থাকে। শক্তি সম্বন্ধীয় সংস্কার সেইরূপ বংশ পরম্পরায় চলিতেছে, কিন্তু একথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। এস্থলে ইন্দ্রিয় পরীক্ষা কোথায়? যাহা সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া জন্মিবে? "মাথা নাই, মাথা ধরা" কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

এমনও কেহ বলিতে পারেন যে, লোকে অনুমান-দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। কিন্তু একটা মূল ভিন্ন অনুমান চলে না। কি দেখিয়া অনুমান করিবে? ঘটনার পর ঘটনা হইতেছে। একটী ঘটনা দেখিয়া আর আর একটী ঘটনা অনুমিত হইতে পারে; শক্তি কোথা হইতে আসিবে?

কেহ কেহ এমনও বলেন যে, শক্তির জ্ঞান ভ্রমমাত্র। শক্তি বলিয়া কিছু নাই। এসম্বন্ধে দুটী কথা কথা বলিব। প্রথমতঃ যদি ইহা ভ্রম হয়, তবে এ ভ্রম কোথা হইতে আসিল? ভ্রমেরও কারণ আছে। শক্তি বিষয়ক ভ্রমের কারণ কি? রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সত্য; কিন্তু সর্পের জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে সর্প-ভ্রম হয় না। সর্প দেখিয়াছি বলিয়া সর্পের জ্ঞান হইয়াছে। শক্তিকে তো দেখি নাই, তবে শক্তির জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?

দ্বিতীয়তঃ শক্তিতে বিশ্বাস স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী, ও বিশ্বব্যাপী। এরূপ বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিলে জগতে আর সত্য থাকে না। সকল যুক্তির মূলে স্বাভাবিক বিশ্বাস, সকল বিজ্ঞানের পত্তনভূমি স্বাভাবিক বিশ্বাসকে না মানিলে কিছুই থাকে না। এ জগৎ আছে কে বলিল? আমি আছি তাহার প্রমাণ কি? সমুদয় সত্য যেখানে দণ্ডায়মান, শক্তির অস্তিত্বরূপ সহান্ সত্য সেই ভিত্তিমূলেই প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞান ও ইচ্ছা ভিন্ন শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শক্তি কার্য্য করিতেছে বলিলে, জ্ঞান ও ইচ্ছা করিতেছে, বলিতেই হইবে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই সত্যটী প্রতিপন্ন করিব। অজ্ঞেয়-বাদীরা আর একটী কথা বলেন যে, জ্ঞান, দয়া, প্রেম প্রভৃতি গুণ পরমেশ্বরে আরোপ করিলে তাঁহাকে মনুষ্য-তুল্য করা হয়। এ কথা যে বিষম ভ্রান্তি, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। * শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় প্রজা ও ভূম্যধিকারী।

(প্রথম প্রস্তাব।)

একদিন এই বাঙ্গালা দেশে ভূম্যধিকারী এবং প্রজার সঙ্গে পিতা পুত্রাপেক্ষাও নিকট সম্বন্ধ ছিল; তখন প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জমিদার চিন্তা করিতেন, প্রজারা জমিদারের আপদ বিপদ সমুদয় বুঝিত, আজ নব্য-বাঙ্গালীকে একথা বুঝাইতে হইলে, দলিলী সাক্ষ্য না লইয়া আর তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কারণ তিনি এখন প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে কেবল খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দেখিতে পান; এক দল আর এক দলকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত, নিমিত্ত লোলুপ; আবার পক্ষান্তরে প্রজা জমিদারের রক্ত-পিপাসু, তাঁহাদের সর্ব্ব-নাশাকাঙ্ক্ষী এবং অনিষ্টকারক। ইহাদের মধ্যে কোন দিন যে ভাল ভাব ছিল, একথা কে বলিবে? কে বিশ্বাস করিবে? এক্ষণে কেহ সহজে বিশ্বাস কর এবং নাই কর, বঙ্গদেশের এসুখের অবস্থা ছিল। অনেক পুরাতন ভাল জিনিস আর দেশে নাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাল অবস্থাটীও দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরাই দেখিয়াছি, এক-জন ভূম্যধিকারী আর একজন সহযোগী ভূম্যধিকারীর সহিত দাঙ্গা হঙ্গাম করিতে হইলে রায়তদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, রায়তেরা লাঠীশুল্কী লইয়া আসিয়া তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে দাঁড়াইয়াছে। জমিদার আবার একজন প্রজার জ্বর হইলে পর্য্যন্ত তত্ত্ব লইয়াছেন; নিজের বাড়ীর দশ কর্ম্মে প্রজাদিগকে আদর করিয়া খাওয়াই-য়াছেন। জমীদার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে মাঠাকুরাণী, বৌঠাকুরাণী, পিসিঠাকুরাণী, বলিয়া নিকটস্থ প্রজারা সর্ব্বদা ডাকিত; কিন্তু আজ এদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ প্রজার শ্রীতে জমিদার কাতর এবং জমিদা-রের হতশ্রী ও হতমানেই প্রজার আনন্দ।

এসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন যে কেবল বঙ্গীয় দেশে হইয়াছে, এবং অপর কোন দেশে হয় নাই, এরূপ নহে; পৃথিবীর যে যে স্থানে উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভাগ ছিল, রক্ষিত এবং রক্ষক সম্বন্ধ সামাজিক গঠনের এক প্রকার অঙ্গ ছিল, সেই সেই দেশেই আমরা এই প্রকার বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। এবং যে দেশে পূর্ব্ব সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট, সেই দেশেই আবার বর্ত্তমান অসৌহার্দ্দ্য ভাব তত গুরুতররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

সমুদয় য়ুরূপ খণ্ডের মধ্যে আয়ার্লণ্ডে প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ ছিল। আইরিস্ প্রজা ভূম্যধি-কারীর ইচ্ছামত বাঁচিত; ভূম্যধিকারী তাহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন; আইন আদালত তিনি, মা বাপও তিনি, তাঁহার টাকা ধার করিয়া চাষ করিত, তাহা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া জীবন যাপন করিত। ভূম্যধি-কারী যেন ঠিক অতগুলি পরিবার মধ্যে একজন মুরব্বী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রজাদের সহিত যে কি সম্পর্ক, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আয়ার্লণ্ডের প্রজা এক একটী ভূম্যধিকারীর মুণ্ড ছেদনকে হয় ত স্বর্গারোহণের এক একটী সোপান বলিয়া মনে করে; মিসরের ফেলাহীন এবং ভূম্যধিকারীর প্রতি, আমেরিকার নিগ্র এবং শ্বেতকায় প্রভুর প্রতি দৃষ্টি করিলেও এ সত্য বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশেও সম্প্রতি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্তের অভিনয় হইতেছে। পাঠকগণ জিজ্ঞসা করিতে পারেন, এরূপ হয় কেন? তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে, একজন লোককে যদি আমার বলিয়া মনে করিতে পারি—আমি তাহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, জীবন মরণের কর্ত্তা—তবে সে লোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, বা সম্মানের ভাব না হইলেও, এক প্রকার ভালবাসা, দয়া এবং অনুগ্রহের ভাব না হইয়াই পারে না; এবং সে ব্যক্তি যদি মনে বুঝে যে, আমি ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর নাই, তবে ক্রমে ক্রমে তাহার ভক্তি ভালবাসা আসিয়া আমাকেই আশ্রয় করে। হিন্দুসমাজে ৫ বৎ-সরের বালিকা ১০ বৎসরের বালকের সহিত পরিণীতা হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক প্রকার ভালবাসার গাঢ়তা বোধ হয় অনে-

* সম্প্রতি জনৈক পূর্ব্বাঞ্চলীয় পণ্ডিত কলি-কাতায় বক্তৃতা করিয়া এই দূষিত মত সমর্থন করিয়াছেন। স্থূলদর্শী লোকে ভাবিতেছে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক প্রকার নাস্তিকতা প্রচার করিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এ কথা হয়তো তিনি নিজেই বুঝেন না। আর প্রচলিত উপধর্ম্মের এমনি শোচনীয় অবস্থা যে, তাহার নামে যে যাহা বলে তাহাতেই লোক নাচিয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই মতের অসারত্ব প্রদর্শিত হইবে।

কেই দেখিয়া থাকিবেন। অবিচ্ছিন্নবন্ধন এবং অনন্য গতিত্বই এই প্রকার ভালবাসা এবং ভক্তি উৎপাদনের প্রধান কারণ। যে যে দেশে ফিউড্যুয়েল প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সমুদয় দেশেই প্রভু এবং "ভেসালদিগের মধ্যে" এক প্রকার মাখামাখি ভাব ছিল। আজ স্বাধীন প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে সে ভাব আর নাই। বঙ্গদেশেও সেই কথা; বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী আর এক্ষণে প্রজার মা বাপ নন, তিনিও ভারতেশ্বরীর প্রজা, তাঁহার খানাবাড়ীতে বসতি, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হরমগুলও ভারতেশ্বরীর প্রজা। এরাজ্যে উভয়েরই অধিকার সমান; আজ সে ভূম্যধিকারীর একটু লাল চোক্ দেখিলেই দুই কুড়ি পাঁচ আইনের, অথবা নিজের বদ্‌মায়েসির আশ্রয় লয়; আর জমিদার তাহার প্রজাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দেখিলেই নিজকে উপেক্ষিত এবং অবমানিত বলিয়া মনে করেন। এই ভাবে ঝগড়া বিবাদের একটী ছোটখাল ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে বড় একটা নদী হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের এই প্রকার অবস্থার নিমিত্ত, অনেকে গবর্ণমেণ্টকে, অনেকে জমিদারকে, এবং কেহ কেহ বা প্রজাকে দোষী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমরা কেবল ঘটনা চক্রকেই নিন্দা করি। যদি চিরকাল রাজ্যের সকল প্রজারই ভূমি সম্বন্ধে সমান অধিকার থাকিত, তবে ঠাকুর, ঘোষাল, ঘোষ, রায়, সকলেই বুঝিতে পারিতেন যে, দেশের জমিতে তাঁহার আমার সকলেরই সমান স্বত্ব, তিনিই যে কেবল পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে কাটিয়া ভরিয়া বাগ বাগিচা করিয়া ভোগ করিবেন, আর আমি গরিবের ছেলে বলিয়া এ পৃথিবীতে দাঁড়াইবার নিমিত্ত স্থানও পাইব না, একথা কোন কাজের কথাই হইতে পারে না। যদি ভূমিতে জমিদারদিগের একটা স্বামিত্ব স্বত্ব করিয়া দেওয়া না হইত, তবে জমিদার আজ নিজকে কখনও ভূস্বামী বলিয়া মনে করিতেন না; এবং অপরকে তাহার পৈত্রিক বসত্‌বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, তাহার অর্দ্ধেক ফসল কাটা আর অর্দ্ধেক ফসল আকাটা ভূমি হইতে তাহাকে উচ্ছেদ করা, তাহার সম্মুখের শেষ অন্ন মুষ্টি পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াকে কখনও নিজের অধিকার বলিয়া মনে করিতেন না; আর এই সমুদয় অত্যাচার হইতে লোককে রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট আজ যে আইন করিতেছেন, সে আইনের নাম প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর আইন না হইয়া, কেবল দণ্ড বিধির এবং দেওয়ানী আইনের অংশ হইয়া নির্ব্বিবাদে পাস হইতে পারিত। গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে ভূমির উপর স্বামিত্ব দিয়াছেন, এবং সামান্য প্রজাকে এতদিন অবহেলা করিয়া সে স্বামিত্বের দায়িত্ব, সুতরাং অধিকার, ক্রমেই বৃদ্ধি করিয়াছেন, একথা বোধ হয়, প্রজার অত্যন্ত পক্ষপাতী কোন ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। স্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বোর্ড অব্ ডিরেক্টর লিখিয়াছিলেন, জমিদার যেরূপ স্থির জমায় এবং স্থায়ী স্বত্বে নিজের স্বামিত্ব স্বত্ব ভোগ করিবে, প্রজাও সেইরূপ স্থির জমায় এবং স্থায়ী স্বত্বে নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবে। লর্ড কর্ণ্‌ওয়ালিস্ যদি এই মত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন, যদি তিনি চাষী প্রজার জমাবন্দী করিয়া, প্রজাকে উচ্ছেদ করা প্রভৃতি সমুদয় অধিকার গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিয়া মাত্র জমিদারকে একটা

তহশলী নানকর বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, তবে জমিদার চিরস্থায়ী ভূস্বামী না হইয়া চিরস্থায়ী একজন সরকারী কর্ম্মচারী হইতেন। কিন্তু লর্ড কর্ণোয়ালিস্ তাহা করিতে পারিলেন না। সে সময় বঙ্গদেশের যে অবস্থা, তাহাতে অনেক মহলই পতিত, জঙ্গলময়, বা অত্যন্ত নিম্ন ভূমি, সম্পূর্ণরূপ চাষের অনুপযুক্ত; তাহাতে আবার এত জেলা, এত মহকুমার তখন ছড়াছড়ি ছিল না; এই বৃহৎ ব্যাপার রীতিমত সম্পন্ন করিতে হইলে, সমুদয় দাবি দাওয়া স্বত্বের ওজর আপত্তি মীমাংসা করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইলে এই তিন সুবার বন্দোবস্তী কাজ গবর্ণমেণ্ট ২০বৎসরেও সমাপ্ত করিতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। এত দীর্ঘকাল লর্ড কর্ণোয়ালিস্ কখনও অপেক্ষা করিতে পারিতেন না; রাজস্ব বিভাগের শোচনীয় অবস্থা; জমিদার তহশীল করিয়া আর সরকারি তলব মত খাজনা দেয় না; তাহার ভূমিতে কোন স্বত্ব স্বামিত্ব নাই; অস্থাবর সম্পত্তি একটু সরাইয়া রাখিলেই হইল; গবর্ণমেণ্ট কি ধরিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা লইবেন? মহল খদি ক্রোক করিয়া নূতন তহশীলদার পাঠান, প্রজারা খাজনা দেয় না; বঙ্গীয় কৃষক প্রজা কুড়ে,কাঁথা মাত্র সম্বল, কি বিক্রয় করিয়া টাকা লইবেন? লর্ড কর্ণোয়লিস এইরূপ ত্রিশৃঙ্গে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন; তখন আগুন হইতে তপ্ত কড়াও ভাল মনে করিয়া জমিদারদিগকে চিরস্থায়ী রূপে ভূস্বামী করিলেন। এই স্বামিত্বের প্রতিদানে জমিদার গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট খাজনা যথা সময়ে দিতে বাধ্য হইলেন; ভূমির ঔৎকর্ষ্য সাধন, প্রজাকে টাকা দিয়া হালগরু করিয়া দিয়া পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করা, নিঃস্ব প্রজাকে অর্থ দিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া দেওয়া, ধৌত দুর্ভিক্ষে প্রজাকে রক্ষা করা, এ সমুদয় কথা বন্দোবস্তের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে না থাকিলেও, জমিদার নিজের স্বত্ব স্বামিত্ব রক্ষার নিমিত্ত এই সমুদয় কাজ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন; স্ত্রী কন্যার গায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া, পুত্র পরিবারকে উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন হইতে বঞ্চিত করিয়াও, তাঁহাকে অনেক সময় এ সমুদয় কার্য্য করিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে নিজের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে পরের ঘাড়ে দিয়া "পৃথিবী ঘুরুক আর না ঘুরুক নিজের কুড়ি টাকা বেতন" লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদার প্রজার নিকট হইতে পরগণা রেটে কর লইবেন বলিয়া এক রিজলিউসন্ হইল, কিন্তু পরগণা রেট কি, তাহা তখন নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেন না, বোধ হয় আজও নির্দ্দিষ্ট করা তত সহজ কথা নয়। এই ভাবে জমিদারকে প্রজার মা বাপ করিয়া, লোহার শিকলে দুই শ্রেণীর লোকের অদৃষ্ট বাঁধিয়া দিয়া রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত করিলেন; এ বন্দোবস্তের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে উপকৃত হন নাই, একথা বলিতে পারেন না। এবং ভূম্যধিকারীও যে কেবল ঘুঁইয়ের ফরাসে বসিয়া অঙ্গুলী তামাক টানিয়া নিজের ভূমিকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন এবং সরকার বাহাদুর প্রদত্ত স্বত্ব স্বামিত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের পক্ষে এরূপ বন্দোবস্ত না করিলে চলিত না; আবার এরূপ বন্দোবস্ত হইলে প্রজা এবং

ভূম্যধিকারীর মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ না হইয়াই পারে না, কাজেই আমরা বলিতেছি যে, আমরা কেবল অনিবার্য্য ঘটনা শ্রেণীকেই নিন্দা করি।

আমরা জমিদার এবং প্রজা কোন পক্ষের খয়রাৎ খা নহি, সুতরাং ন্যায়কে উপেক্ষা করিয়া কোন কথাই বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ চুক্তি, তারপর ঔদাসিন্যদ্বারা ভূমির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জমিদারের হাতে আসিতে দিয়াছেন, আর বঙ্গীয় এক শ্রেণীর প্রজাকে হাত পা বান্ধিয়া চিরকালের নিমিত্ত আর এক শ্রেণীর প্রজার অনুগ্রহের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন।

এখন এরূপ সম্বন্ধ যে আর অধিক দিন থাকা উচিত না, তাহাও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু যেরূপ আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধ শিথিল করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেরূপ আইনে মনোরথ কতদূর পূর্ণ হইবে, জানি না। নির্ব্বাচন সভা যে পাণ্ডুলিপি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যদি সেই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হয়; তবে বঙ্গীয় কৃষক প্রজা এবং ভূম্যধিকারী উভয়কেই উৎসন্ন যাইতে হইবে; মামলা মোকদ্দমার ভাগ দশগুণ বাড়িবে; প্রজা এবং জমিদার উভয়েরই বদ্‌মায়েসি প্রকরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, সরকারী রাজস্ব বিভাগেরও খরচ বৃদ্ধি না হইয়া পারিবে না। তবে লাভ কেবল দুই চারিটী উকীল মোক্তারের, আর চাকরিয়া ভায়াদের।

জমিদারদিগের স্বত্ব সম্বন্ধে এবং তাহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সম্বন্ধে লর্ড মেট্‌কাফ্ যাহা বলিয়াছেন, পাঠকগণ একবার তাহা পাঠ করিয়া দেখুন, লর্ড মেট্‌কাফ্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ইংরাজ রাজত্বের একটী চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং কখনও জমিদারের পক্ষপাতী ছিলেন না। জমিদারের পক্ষপাতী থাকুন আর নাই থাকুন, ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া কথা বলা তাহার ন্যায় লোকের পক্ষে তত সম্ভবপর নয়; কাজেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁহাকে মীমাংসা করিতে হইয়াছে।

"আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূস্বামীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের যে পক্ষপাতী নহি, একথা না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন। আমার বিবেচনায় এইরূপ ভূস্বামীদল সৃষ্টি করিয়া কোন উপকার হয় নাই, বরং একটী গুরুতর ভ্রম হইয়াছে। যখন আমরা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তখনই গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ব্যতীত ভূমিসম্বন্ধীয় অপর সমুদয় মালিকি স্বত্ব—অর্থাৎ যাহা আমাদের দিবার অধিকার ছিল এবং যে স্বত্ব অপর কাহারও ছিল না—তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। যে ভূমিতে পূর্ব্বে অপরের যে অধিকার ছিল, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূস্বামীদিগকে দিবার কোন অধিকার আমাদের ছিল না, কিন্তু তাহাদের জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের একটী স্বত্ব ছিল, সেই স্বত্ব তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাই মাত্র আমাদের দিবার ক্ষমতা ছিল। যে ভূমিতে স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে অপর কাহারও স্বামিত্ব বা দখল ছিল না, সে ভূমির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জমিদারদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এই বন্দোবস্তানুসারে পুরাতন চাষী মালীক এবং দখিলকারদিগের স্বত্ব আমরা রক্ষা করিতে দায়ী,

এবং যদি না করি তবে তজ্জন্য আমাদিগকে নিতান্ত লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই পুরাতন শ্রেণীর প্রজা ব্যতীত, বন্দোবস্তের পর, ভূস্বামী নিজে যে নূতন প্রজা পত্তন করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভূস্বামীর যে চুক্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া, আমাদের মনোমত কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে আমাদের কোনই অধিকার নাই। * * * * * আমি আইনতঃ ভূস্বামীকে তাহার সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করিতে চাহি। ভূস্বামী কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ মাত্র পাইবেন, তাহাদের সহিত বন্দোবস্তের এরূপ উদ্দেশ্য কখনই থাকিতে পারে না; তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভূস্বামী হইবেন, উক্ত বন্দোবস্তের প্রকৃত অভিপ্রায়, এবং যেখানে অপরের পূর্ব্বস্বত্বের বিঘ্ন না হয়, সেখানে তাহারাই ভূস্বামী আছেন এবং তাহাদেরই থাকা উচিত। যখন অন্যের স্বত্ব হরণ করিবার ক্ষমতা—অর্থাৎ আইনতঃ ক্ষমতা, আমাদের ছিল না, তখন ঐরূপ ক্ষমতা কিছুই আমরা ভূস্বামীদিগকে দেই নাই, সুতরাং আমাদের সৃষ্ট ভূস্বামীগণ যদি পুরাতন কোন ভূস্বামী বা মকররিদারকে তাহার স্বত্ব হইতে উচ্ছেদ করিতে চাহেন, তবে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

লর্ড মেট্‌কাফের ন্যায় লোকের এইমত, তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, তিনি জমিদারদিগের পক্ষপাতী নন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষম ভ্রান্তি, তবে কি করিবেন? দায়ে পড়িয়া ন্যায় লঙ্ঘন করিতে পারিতেছেন না, কাজেই ন্যায্য যে কথা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জমিদারদের অধিকার সম্বন্ধে সার্জ্জন সোর, এবং লর্ড কর্ণেয়ালিসের মত ও পাঠ করিয়া দেখুন; তাঁহারাও জমিদারদিগকে স্পষ্ট ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন যদি আমরা বলি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগের ক্ষমতা বড় অনির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার এই উপযুক্ত সময়, তাহা হইলে আমাদের কথা তত ন্যায়-সঙ্গত হইবেক না।

যদি প্রজার স্বত্ব তখন প্রকৃতপক্ষেই অনির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছিল, এবং যে কোন সময়ে ঐ স্বত্ব নির্দ্দেশ করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের ছিল, তবে বন্দোবস্তী কাগজে সে সকল কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ নাই কেন? মকররীদার এবং ধস্ত মোরারীদার ব্যতীত অপর ছোট প্রজা তখন গবর্ণমেণ্টের বড় দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল না, এই আসল কথা; নচেৎ ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দের জমিদারদের ক্ষমতা নিয়া একবার আলোচনা করিয়া তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল; তারপর আবার ১৮১২ খ্রীঃ অব্দের ঐ ক্ষমতা পুনরায় বর্দ্ধিত হইল; তখনও কি গবর্ণমেণ্টের একবার গরিব প্রজা বলিয়া মনে পড়িল না? যদি এ কথা সত্য হয় যে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার অধিকার নির্দ্দেশ করিবার বন্দোবস্ত ছিল, তবে গবর্ণমেণ্টের এই ঔদাসিন্যের কলঙ্ক দুরপনেয়।

এখন দেখা যাউক, বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কি সুবিধা বা অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছেন।

তালুকদার—এতদিন বঙ্গদেশে তালুকদার বলিলে যাহাদিগকে বুঝা যাইত, সে শ্রেণী ছাড়াও আরো অনেক শ্রেণীকে তালুকদারের সংজ্ঞার মধ্যে আনা হইয়াছে। অনরেবল পাল, এবং দারভাঙ্গার মহারাজা

তাঁহাদের মন্তব্যের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বিধান দ্বারা কেবল দুই শ্রেণীর প্রজা তালুকদার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। যে স্থানে ভূমির মালিকান ছেক্কা কম, সে স্থানের পক্ষে একথা যে সত্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সমুদয় স্থানে ভূমির ছেক্কা অনেক বেশী, সে সমুদয় স্থানে অনেকগুলি নীচস্থ স্বত্বকে তালুকদারী স্বত্বের অন্তর্গত করা হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার হাওলাদার, ওসত হাওলাদার, নিম্ন হাওলাদার, নিম ওসত হাওলাদার, ও টিম হাওলাদার; এবং ফরিদপুর যশহরের জোতদার ও মৌরাসী গাতিদার; এবং রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার জোতদার, চুকনদার ও দরচুকনদার, এবং সর্ব্বত্রই জোতের অর্দ্ধেকের বেশী কোর্ফা বিলিকারী দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাকে তালুকদারের পদে উন্নীত করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত একশত বিঘার জোতদার যদি কতক ভূমি কোর্ফা বিলি করে, তবে ভূম্যধিকারী বিরুদ্ধে প্রমাণ না দিলে সেও তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবে, এ বিধানে এরূপ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ইহাতে যে জমিদারের কোন অনিষ্ট হয় নাই, আমরা একথা বলিতে পারি না। বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, তালুকদার এবং নীচ শ্রেণীস্থ মালিকাণের অধিকার এবং স্বত্বের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যে তালুকদারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী গবর্ণমেণ্ট, তিনি পত্তনী বিলি করিতে পারেন, এবং তাঁহার পত্তনীদার সম্বন্ধে খাজনা আদায় করিতে তিনি ১৮১৯ সালের ৮ আইন অনুসারে তদ্বির করিতে পারেন; তারপর সামিলাৎ তালুকদারের স্বত্ব খারিজা তালুকদারের স্বত্বাপেক্ষা অনেক কম হইলেও, নীচস্থ হকিয়তদারের স্বত্বাপেক্ষা স্বত্ব অনেক বেশী; পেটাওতালুকদার মাত্রেই ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে বিশেষ রেজেষ্টরীর অধিকার পাইয়াছেন, এবং যে তালুকদার এরূপ পাইতে পারেন নাই, এবং যাহার সহিত ভূম্যধিকারীর চুক্তিমধ্যে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই. তিনি এরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করিতেও পারেন নাই। সুতরাং এই সমুদয় বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা পাইবার নিমিত্ত, পেটাওতালুকদারকে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে, এবং অনেক টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া জমিদারের নিকট হইতে এই সমুদয় ক্ষমতা পাইতে হইয়াছে; কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে এই প্রাপ্তক্ষমতা পুরাতন তালুকদারদিগের সহিত কতক-অপ্রাপ্তক্ষমতা নীচশ্রেণী হকিয়ত-দারের অধিকার এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বারা কতকগুলি নূতন তালুক সৃষ্টি করিয়া পুরাতন তালুকের মূল্য কমান হইল, এবং জমিদারদিগের একটী বিশেষ লাভের পথ রুদ্ধ করা হইল। আইনের বলে তালুকদারী স্বত্ব পাইলে আর জমিদারকে খোসামোদ করিবে কে? সুতরাং এক পক্ষে দেখিতে গেলে এই নিয়ম দ্বারা যে জমিদার ও পুরাতন তালুকদারদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট করা হইয়াছে, সে কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

আবার পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে মধ্য শ্রেণীর হকিয়তদারের সহিতই জমির প্রধান সম্বন্ধ। যেখানে জমিদারের অধীন খোদখাস্তা রায়ত নাই, সেখানে জমিদার প্রজার অতি অল্পই সাহায্য করিয়া থাকেন; আমরা

মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় জমিদারের কথা বলিতেছি না; অপরাপর যে সমুদয় মহাপ্রভুরা আছেন, তাঁহারা প্রজার হিতাহিতের দিকে অল্পই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ভূমির উৎকর্ষ সাধন, প্রজারক্ষণাদি সমুদয় ভার নীচস্থ হকিয়তদারের হাতেই থাকে। মান্যবর পাল মহাশয় বলিয়াছেন, মধ্য শ্রেণীর হকিয়তদারকে লোকে কোন কার্য্যকর জিনিস বলিয়াই মনে করে না। যদি তাঁহার কথা সত্য হয়, তবে বড় দুঃখের বিষয়; যাহাদের যত্ন ও পরিশ্রমে তোমার জমিদারির উৎকর্ষ, তাহারাই কিছু নয়? "যার জন্য রামের মা তারে তুমি চিন্‌লে না" প্রজার সহিত মধ্যশ্রেণীর মালিকেরই অব্যবহিত সম্বন্ধ; জমিদার তাহাদের নিকট দিল্লিকা লাড্ডু। এই শ্রেণীর স্বত্ব জমিদারের হাতে রক্ষা না পাইলেই বা পরিশ্রমের পুরস্কার কোথায় থাকে? সুতরাং এক পক্ষে পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ জমিদারের প্রাপ্ত অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সেরূপ আবার অপর পক্ষে মাত্র পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। একটীকে রক্ষা করিতে গেলে আর একটীকে বিনষ্ট করিতে হয়, গবর্ণমেণ্টের বিষম বিপদ।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁহার মন্তব্যের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, মধ্যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ নীচস্থ হকিয়তদারই কৃষকের প্রতি অত্যাচারের মূলীভূত কারণ; তাঁহার নিজের চাষ বাস প্রায় থাকে না, কৃষককে মারিয়া যে দুই চার টাকা লইতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ দশ ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ভর করে, আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীরাই নিজের সামান্য অধিকারের মধ্যে অত্যাচার বিস্তার করিয়া জমিদারী প্রথাকে লোকের চক্ষে কলঙ্কিত করেন। তাঁহার মতে এই নীচ শ্রেণী হকিয়ত নষ্ট করিয়া কৃষক প্রজার সহিত জমিদাদের যত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থাপিত হয়, ততই ভাল। অনেক স্থলেই কোর্ফা প্রজার অবস্থা হইতে খোদখাস্তা প্রজার অবস্থা উন্নত দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি দ্বারা কতগুলি নীচ শ্রেণীর স্বত্ব প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৃষি সমাজের উপকার না করিয়া বরং অপকার করিতেছেন।

যাহারা জমিদার পক্ষের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থিরভাবে এসমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন নাই; তর্কের স্রোতে পরিচালিত হইয়া সমুদয় স্থলেই সমান জোরে সাতরাইয়া পার হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে একথাটী গুরুতর বিবেচনার বিষয় বলিয়া বোধ হয়। মধ্যবর্ত্তী হকিয়তদারগণ যে প্রজার পক্ষে অনেক স্থলে গুরুতর অনিষ্টের হেতু, সেকথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; জমিদার যদি তাঁহার মকররিদারের নিকট হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা আবওয়াব আদায় করেন, তবে মকররিদার সেই ছুতয় প্রজার নিকট হইতে ৫০৲ টাকা আদায় করিয়া লইবেন। যে মৌজায় ছেক্কা যত বেশী, সে মৌজায় অত্যাচার তত বেশী; কিন্তু জমিদার যেরূপ সমুদয় হকিয়তের মূল, তিনিই আবার সেইরূপ সমুদয় অত্যাচারের মূল; তবে তাঁহার তিল প্রমাণ অত্যাচার ক্রমে নীচস্থ মালিকাণের হস্ত পরম্পরায় কৃষকের শিরে তাল প্রমাণ হইয়া গিয়া পড়ে, সে কথা অস্বীকার করা কাহারও সাধ্য নাই; এবং

এবিষয়ে আমাদের কতক পরিমাণে বহু দর্শিতাও আছে। আজ নীচস্থ হকিয়ত যত বৃদ্ধি হইবে, চাষার তত অনিষ্ট হইবে। আবার অপর দিকে যে প্রজা শরীরের রক্ত জল করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত নিজের পরিশ্রমে পতিত জমিকে হাসিল করিয়াছে, আজ তাহারই পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে তাহাকে বা কোন মুখেই না করিব? অপর হকিয়তদারেরও যে কারণে হকিয়তে প্রকৃত দাবি, বহুকালের দখলীকার চাষী প্রজার তাহাপেক্ষাও ভূমিতে সেই কারণে অনেক বেশী দাবি। এখন এই দুই পক্ষ দেখিয়া এরূপ কোন আইন করা চাই, যাহাতে সকলেরই স্বত্ব বজায় থাকিতে পারে। পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি কিছু ঠিক করিতে পারেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই; এবং বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে আমাদের নির্ব্বাচন সভার সভ্য মহাশয়েরা সে বিষয়ে যে বড় বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা তাহা মনে করি না। এসম্বন্ধে আমাদের আর যাহা বলিবার থাকে, তাহা আমরা পরে বলিব। এক্ষণ আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের স্বত্বের বিশেষ অনিষ্ট করা হইয়াছে; পুরাতন তালুকের মূল্য কমান হইয়াছে; এবং নিম্নতর ছেক্কার হকিয়ত বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়া প্রকৃত চাষী প্রজার জঞ্জালের ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

তারপর এই নূতন আইন প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য কি, আমরা এ পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, প্রজার সত্ব জমিদার কর্ত্তৃক নানা কৌশলে অনেক সময় অপহৃত হয়, প্রজা একটু স্বাধীনভাবে চলিলে, এ পৃথিবীতে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না, দেশের প্রকৃত জীবন স্বরূপ এই প্রজা পুঞ্জকে অত্যাচারী জমিদারের কঠরগ্রাস হইতে রক্ষা করা; আর প্রজার নিকট হইতে সুবিধামত কর আদায় করিয়া জমিদারদিগের সূর্য্যাস্ত আইনের কঠোরতা কতক পরিমাণে দূর করা; আর জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের ভাগ কমান এই পাণ্ডুলিপির মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে এই তিনটী উদ্দেশ্যের একটীও সুসিদ্ধ হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ কেবল খিঁচুড়ী পাকাইয়াছেন। প্রজাকে কতকগুলি নূতন স্বত্ব দিয়াছেন, কিন্তু সে স্বত্ব রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান আইনানুসারে কোন ভূম্যধিকারী কেবল খোদখাস্তা বাইতের ভূমির শস্য ক্রোক করিতে পারেন, এবং পত্তনীদারের খাজনা মাত্র অষ্টমদ্বারা সরাসরি মতে আদায় করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে সমুদয় শ্রেণীর প্রজার প্রতিই সমুদয় শ্রেণীর মালিকাণের সরাসরি ক্রোকের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; আদালত হইতে ক্রোক হইবে, আদালত হইতে নিলাম হইবে, আইনে এ সব কথা লেখা থাকিলেও, প্রজার ইষ্ট না হইয়া বরং বর্ত্তমান বিধানে প্রজার সমধিক অনিষ্ট হইবে; এবং যে শ্রেণীর ভূম্যধিকারীর আজ প্রজার ভূমির শস্য এরূপ ক্রোক দিবার অধিকার নাই; তাহারই মাত্র যে কিছু সুবিধা করা হইয়াছে। এই প্রণালীর ক্রোকে জমিদারদেরও যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। এ আইনে প্রজা পক্ষের অসুবিধা এই:—

১। এরূপ ক্রোক ব্যয়জনক, সুতরাং বাকী খাজনার সহিত প্রজাকে আরো কতকগুলি অপব্যয়ের ভার বহন করিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমিদার নিজের নোটিসে নিজের দায়িত্বে প্রজার ভূমির শস্য ক্রোক করিতেন, কিন্তু আদালতের সাহায্যে তাহার সে দায়িত্বের অংশ অনেক কমিয়া যাইবে এবং ক্রোকী কর্ম্মচারী যদি উচ্চ বেতনের ও উচ্চ পদের লোক না হন, তবে চতুর জমিদার তাহাকে অক্লেশে মমের পুতুলের মত দুই অঙ্গুলীতে গড়াইয়া লইবে। আইনের বলে যত অত্যাচার করা যায়, নিজের বলে তত পারা যায় না।

৩। ক্রোকী কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে, প্রজাকে বাকী খাজনার নিমিত্ত মাত্র তিন দিনের অনধিক কালের—অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে ৪ দিনের নোটিস দিয়াও তাহার শস্য বিক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। বঙ্গীয় প্রজা অনেক সময় তিন দিনে তিন পসায়ও সংগ্রহ করিতে পারে না, সেস্থলে বাকী খাজনা এবং ক্রোকের খরচ সমুদয় তিন দিনে সংগ্রহ করিয়া আদায় করা কি তাহার পক্ষে কম কষ্টকর হইবে? সম্প্রতি ভূম্যধিকারীরা প্রজার শস্য ক্রোক দিয়া কোন মাতব্বরের জেম্মা করিয়া দেন; প্রজা তাহা হইতে ভূম্যধিকারীর অনুমতি লইয়া উপযুক্ত বাজার দরে কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া ২০ দিনে ২৫ দিনে এবং সময় সময় মাসাধিক কাল মধ্যে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য টাকা সমুদয়, কখন কখন বা কাঁদিয়া কাটিয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ পরিশোধ করিয়াও নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু আইন আদালতের কথা হইলে, গরিবদের একুলও যাবে, ওকুলও যাবে; ভূস্বামীও দয়া করিবেন না, আদালতও নিয়ম ছাড়িয়া কাজ করিবেন না। সোরাত নিলামে টাকার মাল বার আনায় বিক্রয় হইয়া ক্রোকের খরচ এবং বাকী আদায়তেই শেষ হইবে। অনেকে বলিতে পারেন, প্রজা যখন বদ্‌মায়েসী করিয়া খাজনা দেয় না, তখন তাহার এরূপ দুর্দ্দশা হওয়াই উচিত। আমরা এসম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকগণকে একটী কথা বলিতে চাহি। তাঁহারা যেন বঙ্গীয় জমিদার এবং গবর্ণমেণ্টের আধুনিক ওয়েলপেণ্ট হইতে বঙ্গীয় প্রজার অবস্থা কল্পনা না করেন, সকলেরই বাড়ীর কাছে রামা, শ্যামা, প্রভৃতি গরিব আছে। সে গরিবেরা অনেক সময়ই অশক্ত বিধায় খাজনা দিতে পারে না, এক্ষণে দুষ্টদিগের দমনের জন্য কি এ হতভাগাদিগকেও শাস্তি দিতে হইবে?

পাঠক মহাশয় বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমিদার কেবল খোদখাস্তা প্রজা এবং পত্তনীদারকে সরাসরি নিয়মের অধীনে আনিয়া টাকা আদায় করিতে পারিতেন; কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে, তিনি সমুদয় প্রকারের প্রজার বিরুদ্ধে সরাসরি ক্রোক প্রার্থনা করিতে পারিবেন; কাহারও সম্বন্ধে আদালত কিছু তাড়াতাড়ি কাজ করিবেন, কোন শ্রেণী সম্বন্ধে একটু কাল বিলম্ব করিবেন।

আমরা কোন দিনই ক্রোক প্রথার পক্ষপাতী নহি; ক্রোকের ক্ষমতা জমিদারের হাতে এক প্রকার সাংঘাতিক অস্ত্র; প্রজাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা হইলেই জমিদার ক্রোক দিতে পারেন। কোন্ খাজনা বাকী, এবিষয় প্রমাণের ভার প্রজার শিরে, প্রজার পক্ষে তাহা প্রমাণ করা যে কত সহজ,

তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। এতদিন কেবল জমিদারের খোদখাস্তা কৃষি প্রজা এই অত্যাচারের ভুক্তভোগী ছিল; এক্ষণ নীচস্থ সমুদয় হকিয়তদার পর্য্যন্ত এজ্জালায় জ্বালাতন হইবে।

ক্রোকের দ্বারা প্রজার এইরূপ অসুবিধা করিয়া, জমিদার পক্ষের কি সুবিধা করা হইয়াছে দেখা যাউক।—

১। বর্ত্তমান আইন অনুসারে খোদখাস্তা প্রজার খাজনা জমিদার যত শীঘ্র আদায় করিতে পারিবেন, এ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে তত সহজেও সত্বরে পারিবেন না; তাঁহাকে আদালতের সাহায্য লইতে এবং অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

নীচস্থ হকিয়তদার প্রজার স্বত্ব তিনি এক মাসের নোটিসে নিলাম করিতে পারিবেন; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আপত্তি না থাকিলেও একটা না একটা আপত্তি লইয়া লোক হাজির হইবে; সুতরাং তিনি যে দেওয়ানী ডিক্রী অপেক্ষা কার্য্য কালে এরূপ সরাসরি দ্বারা বড় অধিক সুবিধা পাইবেন, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না।

পাণ্ডুলিপির ক্রোকের বিধান যে জমিদারদিগের ইচ্ছানুরূপ হয় নাই, তাহা আমাদের পাল মহাশয়ের এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজের মন্তব্য লিপির এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন।

* * * *

"এই জন্য আমরা (জমিদার বর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে, আমাদিগকে খাজনা আদায়ের নিমিত্ত একটা সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে; কিন্তু তাহা করিয়া দেওয়া ত দূরের কথা, এই পাণ্ডুলিপি যে ভাবে আছে, যদি সেই ভাবে বিধিবদ্ধ হয়, তবে আমাদের অসুবিধা আরো বৃদ্ধি পাইবে। খাজনা আদায়ের নিমিত্ত সরাসরি এবং ব্যয় শূন্য কোন প্রণালী প্রবর্ত্তিত না করিয়া বরং আমাদের বর্ত্তমান খাস ক্রোক প্রথা সুবিচার সঙ্গত, ব্যয় শূন্য এবং নিশ্চিতরূপে কার্য্যকর প্রথা—রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও পাল মহাশয়ের এই মত। যে বিধানে প্রজা সন্তুষ্ট নয়, জমিদার সন্তুষ্ট নন, সে বিধানে ফল কি?

তারপর খাজনা বৃদ্ধির বিধানটীর প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করুন—

(ক) "দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের এবং তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজনা দেয়।"

(খ) "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।"

(গ) "ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।"

(ঘ) "রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

এখন প্রথম নিয়মে "প্রচলিত হারের" কথা বলা হইয়াছে। প্রচলিত হার কি? পূর্ব্বে পরগণা রেট যেরূপ অনির্দ্দিষ্ট ও অনিশ্চিত ছিল, এ প্রচলিত হারও সেইরূপ একটী অনির্দ্দিষ্ট জিনিস হইয়া পড়িবে। রেনল্‌ডস্ সাহেব বলিয়াছেন, "কৃষিজোত মাত্রেই কোন না কোন সময় ভূম্যধিকারীর হাতে গিয়া পড়িবে; তাঁহারা পুনরায় বিলি করিবার কালে

বর্দ্ধিত হার ব্যতীত কখনও বিলি করিবেন না; সুতরাং প্রচলিত হার অবিরতই প্রজার প্রতিকূলে চলিবে।" আমরা রেনল্‌ডস্ সাহেবের একথায় সায় দিতে পারি না, কারণ সামান্য কৃষি জোতের প্রচলিত হারের উপর প্রজার অদৃষ্ট ন্যস্ত করা হয় নাই। যে শ্রেণীর প্রজার স্বত্বের সহিত তুলনায় খাজনার হার বৃদ্ধি করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সে শ্রেণীর প্রজার জোত ক্রমশঃ ভূম্যধিকারীর হাতে যাইতে পারে না; তারপর বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে আরো কম যাইবার সম্ভাবনা। তবে আমাদের আশঙ্কা এই যে, যখন সকল প্রকারের ভূম্যধিকারীকেই সকল শ্রেণীর প্রজার শস্য ক্রোক করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে; এবং প্রজা আর ভূম্যধিকারীর মধ্যে যখন আর সৌহার্দ্দ্য থাকিবে না, তখন ভূম্যধিকারীর আইনতঃ অত্যাচারে প্রজা জেরবার হইয়া পড়িবে এবং পরে যে কোন বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারীর নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে; সুতরাং প্রচলিত হারের কোন সময়েই একটী নির্দ্দিষ্ট মান রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আমরা পরগণা রেট ঠিক করা সম্বন্ধেও কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে আজ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে দেখি নাই।

খ। নিয়মে—সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বাড়িয়া থাকিলে প্রজার কর বৃদ্ধি করা যাইবে, এরূপ বিধান করা হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, দুর্ভিক্ষের সময় ব্যতীত চলিত বাজারে খাদ্য শস্যের মূল্য যখন বৃদ্ধি হয়, তখন স্থানীয় পরিশ্রমের মূল্যও বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কৃষক যেরূপ অধিক মূল্যবান শস্য উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার তাহাকে তাহার উৎপাদনের জন্য অধিক মূল ধন ব্যয় করিতে হয়; সুতরাং শস্যের মূল্য বৃদ্ধি যদি চাষার আয়াস-প্রসূত নাও হয়, তথাপি অধিক মূল ধনের আবশ্যকতা, সুতরাং অধিক লোকসানের আশঙ্কা প্রভৃতি গণনা করিলে এরূপ মূল্য বৃদ্ধির জন্য ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজনা পাইবার অধিকারী যে কোন্ যুক্তিতে হইবেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

তারপর মনে করুন, কোন স্থানে পূর্ব্বে কাজলা গম এবং কাজলা চাউল উৎপন্ন হইত; কৃষকগণ নিজদিগের যত্ন, চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় করিয়া সেখানে উত্তম চাউল এবং দুধে গম উৎপন্ন করিল; ঐ দুধে গম এবং সরু চাউলের ৭ বা ৮ বৎসরের গড় মূল্য, ঐ স্থানের পূর্ব্বোৎপন্ন সাধারণ কাজলা চাউল এবং কাজলা গমের গড় মূল্যাপেক্ষা অবশ্য বেশী হইবে। এখন খ নিয়ম অনুসারে ভূম্যধিকারী এ অবস্থাতেও কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যে যে প্রধান খাদ্য যে যে প্রকারের যেস্থানে জন্মিত, সেই স্থানে যদি সেই প্রকারের সেই সেই খাদ্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হয়, তবে কৃষকের খাজনা বৃদ্ধি হইবে, নির্ব্বাচন সভা এরূপ নিয়ম করেন নাই। এখন ভাল জিনিসটী ভাল কৃষিটী উৎপাদন করিলেই কৃষকের কর বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিবে, এরূপ অলাভের বাণিজ্যে কে কচকচী করিতে রাজি হয়? আমাদের বিশ্বাস যে এই নিয়ম কৃষির উন্নতির পক্ষে গুরুতর অন্তরায়স্বরূপ কার্য্য করিবে।

এই নিয়মে "আবার সেই স্থানে বা চলিত বাজারে" বলিয়া কয়েকটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে; জমিদার পক্ষে মুখপাত্র

পাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "চলিত বাজার কে ঠিক করিয়া দিবে?" আমারাও এ সম্বন্ধে তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ সায় দেই। সরকারী লোকে যে দরের তালিকা প্রস্তুত করিবে, সে তালিকার প্রতি কখনও নির্ভর করা যায় না। তারপর পরগণার তালিকা প্রস্তুতের ভার বোধ হয় থানার প্রভু কিম্বা পাউণ্ডের মুন্সীজির হাতেই অধিকাংশ স্থলে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় যে দরের তালিকা প্রস্তুত হইবে, তাহা পাঠকগণকে না বলিলেও বুঝিতে পারেন। তারপর আবার চলিত বাজার বলিলে কি বুঝিব? বলুন ত মাহামুদসহি পরগণার চলিত বাজার কলিকাতা, না তাহার মধ্যস্থিত কোন প্রধান বন্দর? পাণ্ডুলিপির ভাষা এস্থানে অত্যন্ত গোলযোগের; এবং বিধান সভার সভ্যগণের মনেও ইহার কোন পরিষ্কার ভাব আছে বলিয়া আমরা কোন স্থানেই পরিচয় পাইলাম না! নির্ব্বাচন সভা যদি স্থানীয় চলিত বাজারের মূল্য লক্ষ্য করিয়া কথা বলিয়া থাকেন, তবে ঐ নিয়মের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া "সেই স্থানে বা চলিত বাজারের" স্থলে "সেই স্থানের চলিত বাজারে" হওয়া আবশ্যক। আর যদি ব্যবস্থাপক সভা কোন দূরস্থিত বাণিজ্য প্রধান স্থানকেও লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে ঐ নিয়মে আমাদের গুরুতর আপত্তি আছে। গরিব প্রজা, সামান্য আদার বেপারি, তাহার জাহাজের ব্যবসায়ের খপর লইয়া বাঁচিতে হইলে আর সে জীবিত থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এমন অনেক স্থান আজও এ দেশে আছে, যেখানে বাণিজ্য প্রধান স্থানের মূল্য বেশী কমি হওয়াতে কিছু আসে যায় না।

ঘ—রায়তের ভোগকৃত ভূমির শক্তি বন্যা দ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে।

বন্যাদ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইলে ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত কর পাইবেন কেন? আমরা ত তাহা বুঝিতে পারি না।

দখলী স্বত্ব হস্তান্তর করিবার বিধান মধ্যে ভূম্যধিকারীকে অগ্রক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে। যদি প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে মূল্য নির্দ্ধারণ না হইতে পারে, তবে আদালতকে তৃতীয় পক্ষ করিয়া মূল্য ঠিক করিয়া লইতে হইবে। আদালত যে মূল্য ঠিক করিয়া দিবেন, অপর খরিদার তাহাপেক্ষা বিশ গুণ বেশী মূল্য দিতে চাহিলেও, হয় প্রজা নিজের ভূম্যধিকারীর নিকট বিক্রয় করিবেন, আর না হয় ত তাহার বিক্রয় বন্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে যদি ভূম্যধিকারী নিতে স্বীকার না করেন, এবং যে সময়ে এই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আদালত হইতে না হয়, সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণ বশতঃ প্রজার সম্পত্তির মূল্য কমিয়া যায়; অথবা অপর খরিদার তাহার খরিদের ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত করে, তবে প্রজার আর উপায়ন্তর নাই, তাহার সমুদয় পরিশ্রম, সমুদয় কষ্ট, সমুদয় অর্থ ব্যয় কেবল জলে জল ঢালা। ইহার যে কোন ক্ষতিপূরণ প্রজা পাইতে পারিবে, পাণ্ডুলিপিতে তাহারও কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী বিধান নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা পাণ্ডুলিপির ৩২ ধারার ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ হইতে পড়িয়া দেখিতে পাঠকগণকে বিশেষ অনুরোধ করি।

দখলীস্বত্ব শূন্য প্রজাকে উচ্ছেদ করার

হেতুর মধ্যে, তাহার বাকী খাজনা না দেওয়া একটী হেতু নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিস্তিতে কিস্তিতে খাজনা আদায় না করিলেই বাকী খাজনা হইল। এক্ষণ আমি পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, এই ধারাটী থাকিলে দুর্ব্বৎসরে বঙ্গীয় প্রজারা দাঁড়ায় কোথায়? ইহার প্রতিবাদে জমিদার পক্ষের সূর্য্যাস্তের আইন প্রভৃতি অনেক বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। আমরা তাহা স্বীকার করি। আমরা এসম্বন্ধে এই মাত্র বলিতেছি যে, এ আইনে জমিদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি, তাহার মাথায় পদাঘাত করা হইয়াছে, এ আইন করিয়া জমিদারকে তাঁহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে; অথচ প্রজার স্বার্থের প্রতি—দেশের অধিকাংশের হিতের প্রতি—উপযুক্ত দৃষ্টি করা হয় নাই। এ পাণ্ডুলিপি খানি হিন্দুর গরু, মুসলমানের শূকর; ইহা দ্বারা কাহারও কোন উপকার হয় নাই। মানুষ দুনৌকায় পা দিয়া কোন দিনই পার পায় না, ইহা আমরা চিরকাল জানি। বঙ্গীয় বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা যদি এ বাহাদুরী দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহারা প্রকৃত বাহাদুরই বটে।

পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধে আমাদের আরো দুটী একটী কথা বলিতে আছে। পাণ্ডুলিপি খানি পড়িলেই দেখা যায় যে, সরকার ঠিক প্রজার মা বাপ। হরে আজ মুসরির ডাল খাইবে, কি মুগের ডাল খাইবে, তাহা হয় কালেক্টর সাহেব, না হয় আদালত কিম্বা আর কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী ঠিক করিয়া দিবেন; প্রজা ভূম্যধিকারী কোন কথায় পরস্পর সম্মত হইলেও আদালতের ছিটা না হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। ইহাতে কেবল মামলা মোকদ্দমার ভাগ এবং প্রজার অকারণ খরচ বৃদ্ধি করার পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরামী বন্দোবস্তে যত কার্য্য হয় ততই ভাল, কিন্তু বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি অনাবশ্যক স্থলে পর্য্যন্ত তাহার পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন।

এই পাণ্ডুলিপিতে অপর স্বত্বের রেজেষ্টরী সম্বন্ধীয় একটী বিধান সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কার্য্যকালে এই বিধান লইয়া বিষম তোলপাড় লাগিয়া উঠিবে। প্রজা রসদি জোতকে মকররি বলিবে, ভূম্যধিকারী মকররি জোতকে রসদি বলিয়া আপত্তি করিবেন। আইন মতে সকল হকিয়ত গুলি রেজেষ্টরী করিতে গবর্ণমেণ্টের যে সময় লাগিয়াছে, তাহার অনুপাত ধরিয়া হিসাব করিলে এ সমুদয় স্বত্ব বিশবৎসরেও রেজেষ্টরী হইতে পারিবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে।

আমরা এই সমুদয় অসুবিধা দেখিয়াই পাণ্ডুলিপির নিন্দা করিতেছি। প্রথমতঃ এই আইনের কোন মূল সূত্র খুজিয়া পাই না, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের হ্রাস না করিয়া বরং বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সার্ডবলিউ ওয়েডারবরণ সাহেব অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে নিজে নিজের মধ্যে যে সমুদয় বিষয় মীমাংসা করিয়া লইত, ইংরেজ শাসনাধীনে তাহারা সেই সমুদয় বিষয় ব্যয়সাধ্য আদালতী মোকদ্দমার সাহায্য ব্যতীত আর মীমাংসা করিতে পারে না, দিনে দিনে প্রজার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে।" লর্ডমেওর শাসনকালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরী আলন্‌হিউম সাহেবেরও মত এইরূপ।

দেশের লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, জানিতে পারিবেন, তাহাদেরও এই মত। তবে গবর্ণমেণ্ট অকারণ মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লোকের সর্ব্বনাশের পথ যে কেন প্রশস্ত করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

ব্রিটীস্ গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের হিত করিতে চাহেন, যদি আয়ার্লণ্ডের শোচনীয় অভিনয় তাঁহাদের এদেশে দেখিবার বাসনা না থাকে, তবে এক্ষণ একটু সাহসের সহিত কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত উচিত। জমিদারী প্রথা বর্ত্তমান রাখিয়া, জমিদারের সঙ্গে চুক্তি স্থির রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল আইন দ্বারা প্রজা এবং জমিদারের স্বত্ব ন্যায্য সীমায় রক্ষা করিতে চাহেন, তবে তাহাতে কখনও কৃতকার্য্য হইবেন না। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা নিজের স্বত্ব বুঝিয়া লইতেছে; আজ কাল গবর্ণমেণ্ট ভূমির উপর কোন টেক্স লইবার অধিকারী কিনা, এসম্বন্ধে ও যখন সময় সময় তর্ক বিতর্ক হয়, তখন জমিদারের অধিকার যে অধিক দিন শান্ত ভাবে স্বীকার করিবে, একথা বিশ্বাস করি না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

চরিত্র শিক্ষা।

পরম পিতা পরমেশ্বরের এই বিশ্বনিকেতনে যে সকল জীব বাস করে, তাহারা সকলেই নিরন্তর সুখাভিলাষী ও সাধ্যানুসারে স্ব স্ব অভিলষিত সিদ্ধ করণার্থ সচেষ্টিত। আমার সুখই হউক, দুঃখ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, ইহা জীবমাত্রেরই অভিপ্রেত। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি, এবং তাহা কোন্ উপায়ে লব্ধ হয়? এতদ্বিষয়ক যথার্থজ্ঞান অশিক্ষিত জীবের লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অশিক্ষিত জীবেরা হয় ত সুখভ্রমে দুঃখেরই অনুসরণ করে। তাহাদিগের মনোমধ্যে যখন যে বৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহারা সেই সেই উদিত মনোবৃত্তির উত্তেজনা বা সংক্ষোভ সহ্য করিতে না পারিয়া শত শত পরিণাম দুঃখের কার্য্য করে, এবং তাৎকালিক যৎকিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব করিয়া আপনাকে কৃত কৃতার্থ বোধ করে। ভাবিয়া দেখ, জীব ক্ষুধাপীড়িত হইয়া অতি ভোজন, নিদ্রাপীড়িত হইয়া অযোগ্য শয়ন, রীরংসাপীড়িত হইয়া অবৈধ রমণ, লোভাক্রান্ত হইয়া লোভ্য বস্তুর অতি সেবন, ক্রোধপীড়িত হইয়া জীবকে বধবন্ধন, দয়াপীড়িত হইয়া নিরবশেষ পরোপকার ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, করিয়া অনেক সময়ে তাহারা অবশেষে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত হয়। অতএব অশিক্ষিত বা অকৃত বুদ্ধি মানবেরা যথার্থতঃ সুখভোগের অধিকারী নহে বলিয়াই নির্ণীত হয়। জীবের মানসক্ষেত্রে বিধাতবিহিত বিকার-বীজ নিহিত আছে, তজ্জন্যই তাহারা নিরন্তর বিবিধ চিত্তবিকারবশতঃ ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সকল সংক্ষোভ

নিবারণ করিতে না পারিয়া বিবিধ অশান্তিবিষে জর্জ্জরিত—বা ব্যাকুলিত হয়। পরন্তু যে ব্যক্তি উল্লিখিত চিত্ত বিকার সমূহকে দমন করিয়া চলিতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থতঃ সুখাধিকার লাভ করিয়া অবশেষে পরলোকেও সুখভোগী হইতে পারে।

মনুষ্য জন্মমাত্রেই উক্ত ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয় না। গুরু জনের উপদেশ, সচ্চরিত্র লোকের সংসর্গ, এবং বিদ্যাধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা ক্রমে ক্রমে উক্ত অধিকার লাভ করিতে থাকে। সুতরাং মনুষ্যের সদা সর্ব্বদা উপদেশ গ্রহণ, সাধু লোকের সংসর্গ, এবং নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করা অতীব কর্ত্তব্য। ভাবিয়া দেখ, মনুষ্য যখন জননীর জঠর পিঞ্জর হইতে বহিরাগত হয়, তখন তাহাদের কেবল হস্তপদাদি অবয়ব, এবং এক সামান্য অন্তঃকরণ মাত্র বর্ত্তমান থাকে; অনন্তর ক্রমে তাহারা বয়োবৃদ্ধি সহকারে পিতামাতার উপদেশ, বয়োধিকগণের সংসর্গ ও বিদ্যাভ্যাসাদির দ্বারা হয় জগতের ভূষণ, না হয় পশুবৎ হইয়া জগতের কণ্টক স্বরূপ হইয়া হয় প্রীতিপ্রদ, না হয় বাধাপ্রদ হইয়া থাকে।

জগতে যে কিছু শিক্ষিতব্য আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে সচ্চরিত্রতাই প্রধান শিক্ষিতব্য। কেন না চরিত্রই মনুষ্যের প্রধান ভূষণ ও প্রধান উপকারী। যে ব্যক্তি চরিত্র শিক্ষা না করে, সচ্চরিত্র না হয়, সে ব্যক্তির কি নিরুপমা বুদ্ধি—কি অতুল্য ধন সম্পত্তি—কি জগদ্বিখ্যাত বিদ্যা,—সমস্তই বিফল ও অসুখের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি আপনার বিদ্যা বুদ্ধিতে ও আপনার ধন সম্পত্তিতে সুখজ্ঞান করে বটে; পরন্তু লোকের দুঃখপ্রদ হয় বলিয়াই তাঁহারা প্রকৃত সুখভোগের অধিকারী হইতে পারে না। শূন্য গৃহের দীপ, সৌন্দর্য্য ও সৌরভহীন পুষ্প, আর চরিত্র শূন্য মনুষ্য প্রায় সমান। উক্ত পদার্থদ্বয় যেমন আদরের অযোগ্য, চরিত্রহীন মনুষ্যও তেমনি জনসমাজের অগ্রাহ্য। যে নর অথবা যে নারী মস্তকে সচ্চরিত্র মুকুট ধারণ করিয়া বসতি করেন, সেই নর অথবা সেই নারী কুৎসিতাঙ্গ হইলেও, কদর্য্য কুলসম্ভব হইলেও, ধনহীন হইলেও, বিদ্যাবিহীন হইলেও, সভ্য সমাজে আদৃত ও সুশোভিত হন। এমন কি সচ্চরিত্রতার গুণে পশুবৃন্দও তাঁহার সুখকামী হইতে পারে।

সদ্‌গুণ ও সচ্চরিত্র তুল্য কথা। গুণের অথবা চরিত্রের সৎ অসৎ অর্থাৎ ভাল মন্দ কি? তাহা বুঝিবার জন্য, নির্ণয় করিবার জন্য, প্রথমতঃ কার্য্য প্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়, স্থির বুদ্ধি হইতে হয়। তাহা না হইলে গুণের বা চরিত্রের ভাল মন্দ অবধারণ করা যাইতে পারে না। আপনার কোন্ কার্য্যটী অন্যের পীড়াকর হয় না, অথচ আপনার হিত সাধন হয়, ইহা লক্ষ্য করিবে। যে গুণটী থাকিলে অন্যের বৈধ সুখের অব্যাঘাতে আত্মসুখের উন্নতি হয়, সেই গুণটীই সদ্‌গুণ বলিয়া সভ্যসমাজে গ্রাহ্য; নচেৎ নিরবচ্ছিন্ন আত্মসুখসাধক প্রকৃতি কদাপি সৎ বা সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মনে কর, তুমি কাহার কোন বস্তু অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিলে। তাহাতে তোমার সুখ হইল বটে; কিন্তু যাহার বস্তু লইলে তাহার বিপুল কষ্ট হইল। একজনের কষ্ট যদি অন্য জন লক্ষ্য না করে, তাহা হইলে সংসার ও লোকব্যবহার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থাৎ পরস্পর সক-

লেই যদি উক্তরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে কাহারও কোথাও বাস সুবিধা হয় না। অতএব, অন্যের বৈধ সুখের অব্যাঘাতে আত্মসুখ সমর্থন করাই সচ্চরিত্রার ও সদ্‌গুণের দৃষ্টান্ত ভূমি।

চরিত্র নির্ব্বাচন ও তাহার সৎ ও অসৎ অর্থাৎ ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার জন্য অগ্রে মানবজাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি মনোবৃত্তি নিচয়ের আলোচনা করিতে হয়। মানব কোন্ মনোবৃত্তির অধীন হইয়া কিরূপ বিকারের উত্তেজনায় কিরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। বিবেচনা কর, লজ্জা একটী মনের ধর্ম্ম বা মনের বিকার। সেই লজ্জা যখন উপস্থিত হয়, মানব তখন কি কি কার্য্য করে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিবে, অনেক অশিক্ষিত মানব কেবলমাত্র লজ্জার অধীন হইয়া অনেক প্রকার অন্যায় কার্য্য করে। কেহ বা এক মাত্র লজ্জার জন্য অন্য এক লজ্জাকর কার্য্যের অনুষ্ঠানও করে। কেহ বা আত্মহিত ও পরহিত ভুলিয়া যায়, কেহ বা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। অতএব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা, ভয়, লিপ্সা ও অন্যান্য মানসবিকার সমূহের কাহার কিরূপ স্বভাব, কাহার কিরূপ প্রভাব, কাহার অধীন হইলে, বশতাপন্ন হইলে, কিরূপ কার্য্যে কিরূপ প্রবৃত্তি হয়, কিরূপ কার্য্য করিলেই বা কিরূপ ফল লাভ হয়, এই সমস্তের পর্য্যালোচনা করা ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং উক্ত পর্য্যালোচনায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে মনুষ্য সহজেই সচ্চরিত্র হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, লজ্জার খাতিরে অনেক সময়ে অনেক মনুষ্যকে কুটিল হইতে হয়, লজ্জার খাতিরে অনেক সময়ে অনেককে কৃপণ হইতে হয়, বদান্যও হইতে হয়। লজ্জার খাতিরে মিথ্যা বলিতেও হয়, অন্যবিধ অধর্ম্মও করিতে হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত কার্পণ্য ও বদান্যতার সামঞ্জস্যার্থ, লোকব্যবহারের সারল্য সম্পাদনার্থ, উচিতভাবে লজ্জা ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। লজ্জার খাতিরে যেন অধর্ম্ম ব্যবহার ও কুটিল ব্যবহার না করিতে হয়, এরূপ নিয়ম করাই কর্ত্তব্য। যদিও সমাজের সকল ব্যক্তির দ্বারা উক্তরূপ শিক্ষার বা উক্ত নিয়ম প্রতিপালনের সম্ভাবনা নাই, তথাপি, বহু ব্যক্তি উক্তরূপে শিক্ষিত হইলেও অনেক মঙ্গল।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, "আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃসদা ভবেৎ।" মনুষ্য আহার বিষয়ে ও লোক ব্যবহার বিষয়ে নির্লজ্জ হইবেক। নির্লজ্জ হইবেক একথার অর্থ কি? না উচিতরূপে লজ্জা ব্যবহার করিবেক। এককালে লজ্জাশূন্য হইবেক, এরূপ অর্থ নহে। অনেকে শ্বশুর বাড়ী গিয়া লজ্জা দেখাইবার নিমিত্ত কিছুই খান না, অথবা অল্প খান। অনেকে সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী গিয়া লজ্জাপ্রযুক্ত অল্প খান। তাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা হয় না। আবার কেহ কেহ এক কালে লজ্জাশূন্য হইয়া "আর দাও—আরও দাও—অমুক দ্রব্য দাও—" ইত্যাদি বহুবিধ কুব্যবহার করিয়াও থাকেন। এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নহে। অতএব, আহার কালে বিবেচনা পূর্ব্বক উচিত রূপেই লজ্জা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ব্যবহার কালেও অনেক ব্যক্তিকে লজ্জার খাতিরে মিথ্যা বলিতে ও অন্যবিধ অধর্ম্ম করিতে দেখা যায়। কোন ভদ্র

দরিদ্র, কোন এক ধনাঢ্য লোকের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিল। কেহ বা টাকা ধার চাহিল। কেহ বা চাকুরী প্রার্থনা করিল। তাদৃশস্থলে, ভদ্রলোক দেখিয়া, ধনীর মনে পরিষ্কার কথা বলিতে লজ্জাদ্রেক হইল। তিনি ধন থাকিতে বলিলেন, নাই! টাকা থাকিতে বলিলেন, আমার বড় টানাটানি চলিতেছে। ক্ষমতা থাকিতে, অধিকার থাকিতে, প্রভু বলিলেন, চাকুরী খালি নাই, অথবা আমার হাত নাই। এরূপ কুব্যবহার, এরূপ প্রতারণা বাক্য, এরূপ মিথ্যা আচরণ অপেক্ষা মিষ্ট মধুর ও বিনয় বাক্যে না দিবার প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করাই ভাল। আমাদের দেশের স্ত্রীকবিরা সদাসর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, "দাতার চেয়ে বকিল্ ভাল, তুরুক জওয়াব্ দেয়।" বস্তুতঃ তুরুক জওয়াব্ দেওয়াই ভাল। কিন্তু দেশের সকল লোক উক্তরূপ ব্যবহারের অধীন হইয়া না চলিলে উক্তরূপ ব্যবহার ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে মঙ্গলাবহ নহে। কেন না দুই এক ব্যক্তিকে উক্তরূপ সভ্য ব্যবহার বা সরল ব্যবহার করিতে হইলে কুটিল ও ধূর্ত্ত লোকেরা তাঁহার শত্রু হইয়া অনিষ্ট চেষ্টা করে। অতএব, অনুচিত লজ্জা একটী চরিত্র শিক্ষার বিঘ্ন, ইহাও পরকালের শত্রু।

বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লজ্জা বা লজ্জা প্রতিপালন ব্যক্তি বিশেষে, অবস্থা বিশেষে ও জাতি বা ব্যবসায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিপালিত হইবার যোগ্য। স্ত্রী লোকেরা যে ভাবে লজ্জা ব্যবহার করিবে, পুরুষেরা সে ভাবে করিবেন না, করিলে অনেক হানি হইবে। পুরুষেরা যে ভাবে লজ্জা ব্যবহার করে, নারীরা সে ভাবে করিবেন না। করিলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। ভিক্ষুকেরা যে ভাবে লজ্জা প্রতিপালন করিবে, গৃহস্থেরা সে ভাবে করিবেন না, করিলে অনেক অমঙ্গল হইবে। পুরুষেরা নারীর নিকট আপন অক্ষমতা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে; তাই বলিয়া নারীরা পুরুষের নিকট আপন অক্ষমতা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিবেন, ইহা অনুপযুক্ত, সন্দেহ নাই। নারীরা যদি পুরুষের নিকট আপনার অক্ষমতা গোপন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই প্রগল্‌ভা বলিয়া খ্যাত হইতে হইবে এবং সাধারণের নিকট বিরক্তিভাজন হইতে হইবে। ভিক্ষুকেরা গৃহস্থের নিকট আপন ধনশালিতা প্রকাশ করিতে ক্ষতি ও লজ্জা বোধ করে, তাই বলিয়া গৃহস্থেরাও সে ভাহার নিকট আপন ধনশালিতা গোপন করিবেন, ইহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না।

পল্লিবাসিনী রমণীগণের লজ্জা ব্যবহার দেখিলে আমাদের হাসি পায়। লজ্জা কি? লজ্জার কার্য্যই বা কি? কোথায় কিরূপ প্রকারে লজ্জা করিতে হয়,—এ সকল তাঁহারা কিছুই জানেন না বলিয়াই বিবেচনা হয়। অন্তরে লজ্জাদ্রেক হইলে, কোথায় কিরূপ কার্য্য ও কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, শিক্ষার অভাবে সে সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নগরবাসিনী বা কলিকাতাবাসিনী রমণীরা অনেক অংশে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন। স্বাধীনতার দোহাই দিয়া তাঁহারা এমন সকল নির্লজ্জ ব্যবহার ও এমন সকল লজ্জা ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, তাহা দেখিয়া আমরা দিন দিন

সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইতেছি। নগরবাসিনীদিগের লজ্জা কিরূপ? তাহা পশ্চাৎ বিবেচিত হইবে, এক্ষণে পল্লিবাসিনীদিগের লজ্জা ব্যবহারের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।

পল্লিবাসিনী রমণীরা শ্বশুর গৃহে অবগুণ্ঠনবতী, আর পিত্রালয়ে নিরাবরণা। ইঁহারা যখন শ্বশুর গৃহে থাকেন, তখন একবারে অসূর্য্যম্পশ্যা, কিন্তু পিত্রালয়ে আসিলে তাহার কিছু মাত্র থাকে না। নিরাবরণা হইয়া এ পাড়া ও পাড়া করিয়া বেড়ান। এই দুই বিরুদ্ধ বা বিসদৃশ ব্যবহার এ দেশে কেন হইল? এবং উক্ত ব্যবহার দ্বয় ভাল কি মন্দ তাহা আলোচ্য বটে; পরন্তু তাহা পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

পল্লিবাসিনীদিগের অন্য এক প্রকার অদ্ভুত লজ্জা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাঁহারা স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরু জনের নামোল্লেখ করেন না। যাঁহার ভাসুর গঙ্গাধর, তিনি অন্যকে ফঙ্গা এবং গঙ্গাকে নদী বলিয়া উল্লেখ করেন। নবাগত বধূকে এত সলজ্জ ব্যবহার করিতে হয় যে, অভ্যাগত রমণীদিগকেও তাহার মুখ দেখিবার জন্য বিস্তর সাধ্য সাধনা করিতে হয়। বধূ কোন ক্রমেই আপন ইচ্ছায় মুখাবরণ উন্মোচন করিবেন না; কোন সঙ্গিনী যদি বল পূর্ব্বক তাঁহার মুখাবরণ উন্মোচন করে, বধূ অমনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া লজ্জার পরাকাষ্ঠা দেখান। চক্ষু বুঁজিয়া থাকিলে যে কি ফলোদয় হয়, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ফল কথা এই যে, পল্লিবাসিনীদিগের মধ্যে এরূপ অনেক বিসদৃশ লজ্জা ব্যবহার আছে, যাহার কোন কারণ নাই। সে সকল লজ্জার তালিকা ও বৃত্তান্ত আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বর্ণন করিব এবং সে সকল ব্যবহারের মূল কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিব। আমাদের বিবেচনায় যুক্তিশূন্য ও উদ্দেশ্যশূন্য ব্যবহার গুলি উঠিয়া যাওয়াই ভাল। ক্রমশঃ

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। * (ন ১)

আমাদিগের দেশে আজি কালি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া একটা রব পড়িয়াছে। বিশেষতঃ "হিন্দুধর্ম্ম" "হিন্দুধর্ম্ম" বলিয়া কতকগুলি লোক চীৎকার করিতেছেন। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "আমরা হিন্দু, আমরা হিন্দু, ধর্ম্মের রক্ষক, হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" যাঁহারা এই চীৎকারে যোগ দিতেছেন না—তাঁহাদিগকে তাঁহারা "অহিন্দু" "নরাধম" "পাষণ্ড" ইত্যাদি ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ উদারতা প্রণোদিত বিশেষণে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাঁদিগকে কে হিন্দু ধর্ম্মের অভিভাবক নিযুক্ত করিল, ইঁহাদিগকে কে জাতীয় গৌরবের প্রহরী করিল, তাহা আমরা জানি না। ইঁহারা উপযাচক হইয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার যে ভার লইয়াছেন, সেই ভার গ্রহণ করিতে কতদূর উপযুক্ত, তাহা বুঝা কঠিন। সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর অজ্ঞতা, সাধারণ

* এই প্রবন্ধটী সাহিত্যসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনৈক কৃতবিদ্য আর্য্যসন্তানের লিখিত বলিয়া সাদরে গৃহীত হইল। ন, স।

বিদ্যা বুদ্ধির একান্ত অভাব, হিন্দু আচার-বিরুদ্ধ কার্য্যে পূর্ণ আসক্তি, এবং সত্যের প্রতি ঘোর অনাস্থা থাকিলে, যদি হিন্দুধর্ম্মে উপদেশ দিবার বিশেষ অধিকার জন্মে, তাহা হইলে নিশ্চিয় ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিবার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এখন কি এতই দুরবস্থা যে, যাহারা সামাজিক কপটতা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে সমর্থন করিতেছে, "যাহাদিগকে প্রকাশ্যে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে" চোর, বলিলে তাহারা "আমি চোর তাহাতে তোমার মাথা ব্যথা কেন?" এই অশ্রুত পূর্ব্ব জঘন্য উত্তর দিয়া মুখ দেখাইতে লজ্জিত হয় না, যাহারা বড় লোকের মিথ্যাগ্লানি ও মিথ্যা কুৎসারূপ পুঁজ নিয়ত কুতূহলে পান করে, এবং অন্যের নিকট পানীয় বলিয়া প্রেরণ করে—যাহারা এতদূরও নির্লজ্জ,—হিন্দুধর্ম্মকে কি অবশেষে তাহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল? আমরা হিন্দুধর্ম্মের সান্ত্রী সিপাহী নহি বটে, তথাচ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এখনও আমাদিগের এত ভক্তি আছে, প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যঋষিদিগের স্মৃতি এখনও আমাদিগের নিকট এত পবিত্র যে, তাহাদিগের উচ্চ ও উদার ধর্ম্মের নাম লইয়া মূর্খ ও ব্যবসায়ী ও কপট ব্যক্তিগণ, অন্যের চক্ষে ধূলি দিয়া, নিজের নীচ স্বার্থ সিদ্ধ করিতেছে, আর্য্যদিগের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিতেছে, দেব মন্দিরে মলরাশি—নিক্ষেপ করিতেছে—ইহা প্রাণে সহজে সহে না। আজিও জগতে ব্রাহ্মণ বংশের প্রাচীন গৌরব, আমাদিগের পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ এমনি জাজ্বল্যমান দেখিতেছি যে, যখন ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম মনে করি, তখন বর্ত্তমানের ঘোর দুর্দ্দশাময় পদদলিত জীবনের অন্ধকারময় আকাশে, ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাই। কিন্তু যখন দেখি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঘোর কপটতার হস্তে পড়িয়াছে, তখন সহজেই মনে হয় "হা হিন্দুধর্ম্ম, তোমার অবশেষে কি এই দশা হইল!"

যদি কোন শশধর তর্ক চূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ্যে সমর্থন করেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে আমরা দোষ দেখি না। যাঁহার যে বিষয় বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান আছে, তিনি যদি সে বিষয়ের প্রচার করিতে আয়াস পান, তাহাতে তাঁহাকে কে নিন্দা করিবে? যিনি যাহা সত্য বিবেচনা করেন, তিনি তাহা জগতের সমক্ষে, অকুতোভয়ে প্রচার করিবার চেষ্টা করুন। জগৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে। ইহাতে দুঃখের বিষয় নাই। দুঃখের বিষয় তখন হয়, যখন কপট ও ধূর্ত্ত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের পবিত্র নাম লইয়া, ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সরলতার ও সত্যের বুকে ছুরি মারিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করে।

সম্প্রতি দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা আন্দোলন দেখিতেছি। ইহা কতদূর বাহ্যিক, কতদূর আন্তরিক ও বাস্তবিক, তাহা আর কিছু দিন না দেখিলে বলা যায় না। যাহা হউক, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আশাময়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আন্দোলনে উপযুক্ত উপদেশ বা বিচার দেখিতেছি না। তর্ক চূড়ামণির মুদ্রিত বক্তৃতা

এমন অসংলগ্ন ও এমন যুক্তি বিরুদ্ধ, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তিনি তাহাই এতবার প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার নিকট যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাইবার আশা নিতান্ত কম। এখন তাঁহাকে লইয়া কতকগুলি চিন্তাশূন্য, আর কতকগুলি অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি যে হৈচৈ করিতেছে, তাহা অতি শীঘ্র থামিয়া যাইবে, আমাদিগের বিশ্বাস; যদি না থামে তাহা হইলে তর্ক চূড়ামণির বক্তৃতার অসারতা দেখাইবার পরে চেষ্টা করিব। হিন্দু আচার ব্যবহারের মধ্যে সকলই কুসংস্কার নহে, বরঞ্চ দীর্ঘকালীন ভূয়োদর্শনের ফল, এবং তজ্জন্য এই সকল আচার ব্যবহারের মধ্যে অনেক গুলিই এ দেশীয় ব্যক্তিগণের ইষ্টের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবার অধিক সম্ভাবনা, ইহা প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই ধারণা আছে। সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চূড়ামণির নিকট কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আরও একটী ধারণা আছে (তাহা তর্ক চূড়ামণির আছে কি না জানি না), যে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় রীতি নীতির পরিবর্ত্তন অনেক সময় ইষ্টজনক ও তাহা অবশ্যম্ভাবী।

আপাততঃ তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তাঁহার তর্ক চূড়ামণিত্ব ভোগ করিতে দিয়া আমরা অন্য একটী বিষয় আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতেছি, যে ক্ষেত্রে তর্কচূড়ামণি, সেই ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বঙ্কিম বাবু,—উভয়েই হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয়ই এক পক্ষের যোদ্ধা হইয়াও, যে কারণেই হউক, ফলে পরস্পরের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন। সাকার উপাসনা বিশিষ্ট যে হিন্দুধর্ম্ম, চূড়ামণি মহাশয় তাহাই সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; বঙ্কিম বাবু ঈশ্বরহীন যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বরযুক্ত ও ঈশ্বরহীন উভয়ই হিন্দুধর্ম্ম, যদিও তাহারা পরস্পর বিসম্বাদী, তথাচ উভয়ই সত্য, উভয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই কি বুঝিতে হইবে? কতকগুলি লোক এমনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য, যে সময়ে এক হস্তে চূড়ামণির ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছে, আবার সেই সময়েই অন্য হস্তে বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছে। কেন না উভয়েই হিন্দু নামের গন্ধ আছে। যখন তর্ক চূড়ামণি মহাশয় বলিতেছেন "জল উঁচু" তখন তাহারা বলিতেছে "আজ্ঞে হাঁ, জল উঁচু।" যখন বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন "জল নীচু" তখনও "আজ্ঞে হাঁ, জল নীচু"। যাহারা চক্ষু থাকিতেও দেখিবে না, বুদ্ধি থাকিতেও বিবেচনা করিবে না, কেবল হৈ চৈ করিয়া বেড়াইবে, তাহাদিগের শিক্ষা কিরূপে হইতে পারে?

বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, পরিপক্ক ব্যক্তি যখন কোন কঠিন প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অগ্রসর হন, তখন আশা হয় কিছু নূতন শিখিব। দুর্দ্দান্ত হেষ্টি দৈত্যকে যিনি পরাজিত করিয়াছেন, দুরূহ সাংখ্যের যিনি বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মর্ম্ম অনেককে বুঝাইয়া দিয়াছেন, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতের সহিত হিন্দুদিগের ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি কল্পনার মিল আছে পরিষ্কার রূপে যিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি যখন ধর্ম্ম মন্দিরে গুরুর আসন প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিলেন, তখন ভাবিলাম, কিছু নূতন শিখিব,—

ভাবিলাম, মনের যে প্রদেশ সন্দেহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বঙ্কিম বাবুর জ্বলন্ত প্রতিভাতে হয়ত প্রদীপ্ত হইবে। কিন্তু আমরা "নবজীবনের" প্রথম সংখ্যার ব্যাখ্যা পড়িয়া হতাশ হইলাম। তাহাতে বাগাড়ম্বর যথেষ্ট দেখিলাম, কিন্তু কোথায়ও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাইলাম না।

বঙ্কিম বাবু প্রথমত ধর্ম্ম শব্দ ছয় অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাই বলিলেন। ধর্ম্মের ১ম অর্থ religion, ধর্ম্মের চতুর্থ অর্থ রিলিজন বা নীতি অনুমোদিত কার্য্য * * যথা দান পরম ধর্ম্ম ইত্যাদি। এখানে চতুর্থ অর্থ, ১ম অর্থের অর্থাৎ রিলিজন শব্দের অন্তর্গত কারণ Max Muller বলিতেছেন—

"In our ordinary language we use religion in at least three different senses: (1) as the object of belief; (2) as the power of belief, (3) as the manifestation of belief whether in acts of worships or in acts of real piety।" অথবা সংক্ষেপে, religion, কখন (1) religious dogma, কখন (2) religious faith কখন বা (3) religious acts অর্থে, প্রয়োগ হয়।

তাহার পর (৮ পৃঃ) গুরুদেব বলিতেছেন, "নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহে"। দুর্নীতেরাও নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে"। কিন্তু গুরুদেব আবার (১৯ পৃঃ) বলিতেছেন "যাহারা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, তাহারা তদন্তর্গত বলিয়া সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে" অর্থাৎ নীতির প্রয়োজন স্বীকার করিতেছে না।" এই দুইটী বাক্য পরস্পর সামঞ্জস্যহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথমে বুঝিলাম, বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন, religion না থাকিলে নীতি থাকিতে পারে। যেমন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের religion ছিল না, কিন্তু তাঁহার নীতি ছিল। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন "এরূপ ইয়ুরোপীয় বিস্তর কৃতবিদ্য, ভাবুক বিজ্ঞ এবং সচ্চরিত্র লোক আছেন, তাঁহারা religionএর আবশ্যকতা মানেন না। এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক।" ইহাতে বুঝিলাম, ইয়ুরোপে এবং আমাদিগের দেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা religionএর উপর বীতরাগ, অথচ নীতি পরিত্যাগ করিতেছেন না। কিন্তু (১৯ পৃঃ) আবার বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন, "যাঁহারা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, তাহারা তদন্তর্গত বলিয়া নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে" এস্থলে "তাহারা" "তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক" এই না বুঝাইলে দুইটী স্থল পরস্পর বিরোধী হয়।

বঙ্কিম বাবু বলেন—"দুর্বিনীত মনে করে যে, আমার নীতির বশবর্ত্তী হইবার আবশ্যক নাই; কিন্তু সে কখন মনে করে না যে, আর সকলেরও নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। চোর ইচ্ছা করে না যে, অন্যে তাহার ধনাপহরণ করুক, নরঘাতী ইচ্ছা করে না যে, অন্যে তাহাকে খুন করুক, পারদারিক মনে করে না যে, অন্যে তাহার ভার্য্যাহরণ করুক। অতএব দুর্নীতেরাও নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাকে নীতির বাধ্য মনে করে না, সেও আর সকলে নীতির বাধ্য হয়, ইহা ইচ্ছা করে। আমরা বলি যে, আপনার পক্ষে নীতি মানে না, সে আর সকলের পক্ষেও নীতির প্রয়োজন মানে না। সে আর সকলের পক্ষে নীতি পালন চাহে না; সে চাহে আপনার

স্থবিধা। যে স্থলে অন্যের নীতি পালন তাহার পক্ষে স্থবিধা, সে স্থলে সে অন্যের নীতিপালন ইচ্ছা করিবে। কিন্তু যে স্থলে অন্যে নীতিপালন করিলে, তাহার অস্থবিধা, সে স্থলে সে অন্যের নীতি-পালন ইচ্ছা করিবে না। "পর দ্রব্য চুরি করিবে না" এই নীতি তাহার নিজের সম্পত্তি সম্বন্ধে আর সকলে পালন করিলে চোরের স্থবিধা, সুতরাং এই স্থলে অন্যের এই নীতিপালন চোর ইচ্ছা করিবে। কিন্তু পাহারাওয়ালা পাহারার কাজ সাধ্যমত করিলে তাহার অস্থবিধা হয়, সুতরাং পাহা-রাওয়ালা এ সম্বন্ধে নীতির বশবর্ত্তী হয়, চোর তাহা ইচ্ছা করিবে না। চুরি হইলে চোরকে ধরিতে পুলিসের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত, পুলিস এই নীতিপালন করিলে চোরের অস্থবিধা হয়, সুতরাং চোর এস্থলে পুলিস নীতিপালন করে, তাহা ইচ্ছা করে না। বিচারক নীতির বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করিলে যেখানে চোরের অস্থবিধা, সেখানে বিচারকের নীতিপালন চোর ইচ্ছা করিবে না; যেখানে বিচারকের নীতিপালনে তাহার স্থবিধা (যখন চোরের নিজের জিনিস চুরি গিয়াছে), সেখানে সে বিচারকের নীতিপালন ইচ্ছা করিবে। অতএব চোর বা অন্য দুর্নীত ব্যক্তি, যে স্থানে আর সকল ব্যক্তি নীতির বশবর্ত্তী হইলে তাহার অস্থবিধা, সেখানে "আর সকলের নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন আছে" সে কখন ইহা মনে করে না। ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। তথাচ বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, দুর্বিনীত ব্যক্তি সকল সময়ই মনে করে যে "আর সকলের নীতির বশবর্ত্তী" হইয়া চলা উচিত বা ইচ্ছনীয়। গুরুদেবের এমন ভুল কেন হইল?

তাহার পর যদি স্বীকার করাই যায়, যে দুর্নীত ব্যক্তি নিজে নীতির বাধ্য হইতে চাহে না, কিন্তু অন্য লোকে নীতির বাধ্য হয়, তাহা ইচ্ছা করে, তাহা হইলেই কি বলা যায় তাহারা "নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে?" মনে করুন, কোন সমাজে সকলেই মনে করে যে, অন্যে নীতির বাধ্য হউক, আমি হইব না। তাহা হইলে, এইরূপ সমাজ "নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে," তাহা কি আমি বলিতে পারি? আমরা যাহা "নীতি" শব্দে বুঝি তাহার এক কণাও, তাহার ধা-ণাও, এই সমাজে নাই; এই সমাজে যাহা আছে, তাহা "নীতি" নহে, তাহা নীচ স্বার্থ-পরতা, তাহা কেবলমাত্র নিজের সুখের অন্ধ অনুসরণ। বঙ্কিম বাবুর "নীতির" নূতন ব্যাখ্যা অনুসারে এইরূপ দুর্নীতিময় সমাজ নীতির প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু নীতির যে অর্থ প্রচলিত, তদনুসারে পারে না।

১১ পৃষ্ঠায় শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ধর্ম্ম কাহাকে বলে? গুরু উত্তর করিতেছেন, "প্রশ্নটা অতি প্রাচীন * * আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইব"। বঙ্কিমবাবু এইরূপ বিনীতভাব অবলম্বন করিয়া ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকার-দিগের মত, সংস্কৃত শ্লোকে, এবং জার্ম্মান ও ইংরাজি পণ্ডিতদিগের মত, ইংরাজিতে, উদ্ধৃত করিলেন। তাহাদিগের অনুবাদ ব্যাখ্যা বা সমালোচন করিলেন না। কিন্তু যখন সেই সকল মত বলা হইয়া গেল, তখন উহাঁর আর পূর্ব্বের বিনয়ভাব দেখিতে পাই না। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত অভ্রান্ত মনে করিয়া সাহস পূর্ব্বক যেমন প্রচার

করিয়াছেন, বঙ্কিম বাবুও আপনার মত সেইরূপ সাহসের সহিত প্রচার করি-লেন। বঙ্কিম বাবুর উপদেশ,—"প্রকৃত সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আর সকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ।" তাহার পর "সুখ" এই সহজ শব্দটী বুঝাইবার জন্য আবার তিনি একটী কঠিন ব্যাখ্যার অব-তারণা করিলেন,—"মনুষ্য প্রকৃতি কতক-গুলি শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তির সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে। সেইগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরি-তৃপ্তিই সুখ"। আবার উপযুক্ত বা "সমুচিত পরিতৃপ্তি" অর্থে বুঝিতে হইবে, "যেরূপ পরি-তৃপ্তিতে আপনার এবং অন্যের অনিষ্ট না হয়।"

"অনিষ্ট" অর্থে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বঙ্কিম বাবু বলেন নাই। তাহার অর্থ যদি অসুখ হয়, তাহা হইলে ফলে এই দাঁড়াইল, —ধর্ম্ম কি? যাহাতে বৃত্তি সকলের সমুচিত পরিতৃপ্তি ইত্যাদি হয়। সমুচিত পরিতৃপ্তি কি? যেরূপ পরিতৃপ্তিতে নিজের অন্যের অনিষ্ট না হয়। অনিষ্ট কি? যাহাতে নিজের এবং অন্যের সুখের বিঘ্ন হয়। আবার সুখ কি? বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি সমঞ্জস পরিতৃপ্তি। পুনর্মূষিকাভব। এই ব্যাখ্যা অন্যোন্যাশ্রয় (reasoning in a circle) দোষযুক্ত হইল।

আবার, যদি ধর্ম্ম সুখের উপায় হয়; অর্থাৎ ধর্ম্ম উপায়, সুখ উদ্দেশ্য এই কথা মানা যায়, তাহা হইলে "বস্তুত ধর্ম্মই সুখ," অর্থাৎ ধর্ম্মও সুখ, (উপায় ও উদ্দেশ্য) কিরূপে "বস্তুত" এক পদার্থ হইতে পারে, তাহাও আমরা ধারণা করিতে পারি না। যাহারা পৃথক পদার্থ, ভাষার বলবিধানের জন্য, কখন কখন তাহাদিগকে এক পদার্থ বলা যায়। যথা নির্ম্মল জলই স্বাস্থ্য. অর্থাৎ পরিষ্কার জল উপায়, স্বাস্থ্য উদ্দেশ্য। Time is money সময়ের সদ্ব্যবহার অর্থাগ-মের উপায়। আহারই জীবন। বস্তুতঃ জলও স্বাস্থ্য এক পদার্থ, সময় ও টাকা এক পদার্থ, অথবা আহার ও জীবন এক পদার্থ, এই-রূপ কেহই মনে করে না। জলে পিপাসার দূর, বা পরিতৃপ্তি, বা সুখ। তাই বলিয়া কি জল (উপায়) ও পরিতৃপ্তি (উদ্দেশ্য) এক পদার্থ বিবেচনা করিতে পারি?

বঙ্কিম বাবুর এই ব্যাখ্যার আর একটী বিশেষ একটী আপত্তি আছে। যদি আমার সুখ অর্থাৎ আমার বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি সামঞ্জস্য পরিতৃপ্তি আমার ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যাহাতে এই স্ফূর্ত্তি ইত্যাদির বিঘ্ন হয়, তাহা কখনই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রাণত্যাগ করিলে বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি ইত্যাদির চরম বিঘ্ন হইয়া যায়। সুতরাং দেশের জন্য, অথবা অন্য পরোপকারে, অথবা সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য, প্রাণত্যাগ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধও নিন্দনীয় কার্য্য। একজন প্রাণ দিলে তাঁহার পিতা যন্ত্রণাময় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, সেস্থলে "স্ফূর্ত্তি" লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া তিনি নিজের স্ফূর্ত্তিও পরি-তৃপ্তি লক্ষ্য করিবেন, না পিতাঠাকুরের?

এখানে আমরা একটা কথা বলি। অনেকে বলেন Honesty is the best policy ইহার অর্থ অনেকে সততাতেই সুখ, এই মনে করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সৎপথে থাকিলে ইহলোকে সুখী হওয়া যাইবে, এই মনে করিয়া সৎপথে থাকিতে চাহে, পদে পদে তাঁহার সৎপথ ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কারণ অনেক সময় সৎপথ কণ্টকময়—

অনেক সময়েই সৎপথে থাকিলে দারিদ্র্য, অনাহার, গঞ্জনা, নির্ব্বাসন, অগ্নিদাহ, কারাবাস ও যন্ত্রণাময় মৃত্যু। যে সকল ব্যক্তি সুখের বা "স্ফূর্ত্তির" লোভে সৎপথে চলে, তাহারা, যখনই দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে সৎপথ হইতে পলায়ন করিবে।

আর একটী কথা মাত্র বলিব। বঙ্কিম বাবু তাহার রচিত প্রবন্ধ হইতে একটু ইংরাজি তুলিয়া দিয়াছেন। "The words

Religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration,—which together make up worship—are felt in various combination for human beings and even for inanimate objects. It is not exclusively, but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude indentifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as habitual and *permament admiration*"

ভাষাটী অতি সুন্দর, আনন্দের সহিত স্বীকার করি। কিন্তু ভাবটীর মধ্যে কোন সার বা বোধাগাম্য বস্তু আছে, বলিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু বলেন, হিন্দুদিগের জীবন religion ময়, তাই তাহাদিগের মধ্যে religion ব্যঞ্জক কোন শব্দ ছিল না। ইহার অর্থ কি এই যে, হিন্দুদিগের প্রত্যেকের জীবন সমানরূপে religion ভাবে পূর্ণ ছিল? তাহারা কি আর্য্যদিগের মধ্যে বা অনার্য্যদিগের মধ্যে এই religion এর ভাব কাহাতেও কম কাহাতেও বেশী দেখে নাই? অবশ্যই দেখিয়াছিল। রিলিজনের ভাব কোথায়ও বেশী কোথায় কম, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য religion ব্যঞ্জক কোন শব্দের প্রয়োজন হয় নাই? তাহা অসম্ভব। religion এর ভাব হিন্দুদিগের সর্ব্ব জীবন ব্যাপৃত হওয়াতে তাহার নামের আবশ্যক হয় নাই, এইটী সর্ব্বথা অপ্রমাণিত কথা বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন ভাষার কোন একটী ভাবব্যঞ্জক কথা না থাকিলে, তৎভাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই ভাবের অভাব ছিল বরঞ্চ একদিন মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ভাব এত বিস্তৃত ও অধিক ছিল যে, তাহার নামকরণের প্রয়োজন হয় নাই, এইটী নূতন ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি কথার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। যথা—Toleration, Patriotism ইত্যাদি। তাহাতে Toleration বা Patriotism হিন্দু মনে অতি অধিক পরিমাণে ছিল, অথবা মোটেই ছিল না, উভয় সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত নহে।

অন্য ভুল এবার দেখাইবার সময় নাই। উপসংহারে বক্তব্য, বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। হয়ত সমাপ্ত হইলে এখন যে সকল বিষয় যত যুক্তি বিরুদ্ধ মনে হইতেছে, পরে তত বোধ হইবে না। যাহা হউক, আমাদিগের নিকটে তাঁহার ব্যাখ্যা যে যে স্থানে দোষযুক্ত বোধ হইল, তাহা নির্দ্দেশ করিলাম। তাহার এই প্রবন্ধ "কৃষ্ণ সরকার" বা "মদন পূজা" বা "নবজীবনের গান" বা "ভানু সিংহের জীবনী" বা "সর্ষপ মাহাত্ম্যের" ন্যায় অসার বা অপাঠ্য হয় নাই বটে, তথাচ বঙ্কিম বাবুর মত ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট আমরা যাহা আশা করি, তাহা আমরা এবার পাই নাই। আমাদিগের আশঙ্কা হয়, অসাধারণ প্রতিভা থাকা হেতু, তাঁহার আত্মপ্রত্যয় এত অধিক যে, উচিত অধ্যয়ন বা চিন্তা না করিয়া, কখন কখন প্রবন্ধ লিখিয়া ভ্রম প্রমাদে পতিত হন। তাহার একটা দীপ্যমান সাক্ষী, তাহার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনাগুলি। তাহার অনেক গুলি ভুল একখানি পুস্তিকাতে প্রদর্শিত ও তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান লেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, যে, তিনি বাঙ্গালার যদি কোন জীবিত লেখকের পুস্তকে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহা বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে তিনি ইহাও বলিতে বাধ্য যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ, "নবজীবনের" "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা," আপাততঃ ভ্রমসঙ্কুল, যুক্তি-বিরুদ্ধ, আত্মবিরোধী বলিয়া বোধ হইতেছে।

শ্রীমীমাংসা প্রার্থী।

নবলীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহৌষধে।

জিতনের দল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন সাহেবের কুঠি লুটিতে চলিল। এণ্ডারসন ভিন্ন আরও দুটী সাহেবের কুঠি ছিল। এণ্ডারসনের সিংহ দরজায় যখন পাহাড়ীদের একদল উপস্থিত হইল, তখন বিনোদের চক্ষে নিদ্রা বসে নাই, জেলীর চক্ষে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে পাহিড়ীরা নির্ভয়ে প্রবেশ করিল। দরজায় যে প্রহরী ছিল, সে হঠাৎ জাগিয়া 'কোন্ হায় কোন্ হায়' বলিয়া একটু পিছে হটিয়া দেখিল, ব্যাপার সামান্য নহে, অনেক দস্যু কুঠিতে ঢুকিতেছে। সে ভাবিল, অদ্য আর নিস্তার নাই, কারণ সাহেব বাড়ীতে নাই। প্রহরী হিন্দুস্থানী, কিন্তু হিন্দুস্থানীদের আর পূর্ব্বের সাহস বা বীর্য্য নাই, সাহেবের গোলামী স্বীকার করিয়া করিয়া সকল মাটী হইয়া গিয়াছে। প্রহরী থাকিয়া থাকিয়া সকল দেখিল; দেখিয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। পাহাড়ীরা প্রাঙ্গনে যাইয়া একবার জয় জয় রব হাকিল। সে শব্দ শুনিয়া অন্যমনস্ক বিনোদের চেতনা হইল, তিনি এস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। জেলী বিনোদের পূর্ব্বেই সকল বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি একেবারে ২টী দোনালা বারুদ পূর্ণ বন্দুক লইয়া দরজা খুলিলেন। পাহাড়ীদের উপদ্রবের ভয়ে সাহেবেরা সর্ব্বদাই বন্দুক পূর্ণ করিয়া রাখিত। জেলী বাহিরে যাইয়া দেখিল, বিনোদ পূর্ব্বেই বারাণ্ডায় আসিয়াছেন,—জেলী বলিল,—আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কার্য্য, কি করিবেন?

বিনোদ বাবু নিমেষের মধ্যে উত্তর করিলেন,—মানুষ কি রক্ষা করিবে, রক্ষাকর্ত্তা যিনি তাহাকে স্মরণ করুন।

জেলী একথা শুনিয়া মৃদু হাসিল, বলিল, বৈরাগ্যনীতির এ সময় নহে, রক্ষাকর্ত্তাকে স্মরণ না করিয়া এই বন্দুকের আশ্রয় লইলে অনেক কাজ হইবে।

বিনোদ।—রক্ষা হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে এক জনের জীবনের জন্য আর দশ জনের জীবন যাইবে! খ্রীষ্টনীতি এ নহে।

জেলী উত্তর দিল, বলিল, খ্রীষ্টনীতির সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহার খোসা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমার জ্ঞান বলে, আত্মরক্ষা সকল ধর্ম্মের মূল; আপনাকে যে বিনাশ করে, সে সকল ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়।

বিনোদ বুঝিল, তর্কে কিছুই মীমাংসা হইবে না, কারণ শত্রু বুকের উপর। বিনোদ ভাবিয়া বলিল, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।

জেলী বলিল, আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কার্য্য, আমি কি করিব?

বিনোদ বলিল, তা জানি। আমার কার্য্য আমি করিব, কিন্তু উপায় স্বতন্ত্র।

ইতিমধ্যে পাহাড়ীরা বারাণ্ডায় উঠিবার উপক্রম করিল দেখিয়া জেলী হঠাৎ একবার বন্দুকের আওয়াজ করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য স্থির হইল না। কোন লোক তাহাতে আহত হইল না দেখিয়া মেম সাহেব আবার বন্দুক হাতে তুলিলেন। বিনোদ বাবু মহা বিপদ গণনা করিয়া হঠাৎ মেমের সম্মুখে ছুটিয়া যাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, মারিতে হয়, অগ্রে আমাকে মারুন।

বিনোদের নয়ন প্রান্তে যেন বিদ্যুৎ চমকিল, জেলী সে মুখে এক অলৌকিক জ্যোতি দেখিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতের বন্দুক নামাইয়া বলিল, বিনোদ বাবু আপনি বালক, পাগ্‌লামী ছাড়ুন, অসভ্যেরা ধনে প্রাণে মারিবে, আমি তা সহিতে পারিব না; লক্ষ্য পথ ছাড়ুন।

বিনোদ কথা বলিলেন না, নিমেষের মধ্যে পাহাড়ীদের সম্মুখীন হইলেন। পাহাড়ীদের যে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাকে বিনোদ জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিলেন; সে ব্যক্তি প্রায়ই জিতনের বাড়ীতে আসিত। তাহার নাম ফেলাই সিং। ফেলাই বিনোদকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল বলিল,—সাহেব কোথায়?

বিনোদ বলিল, সাহেব বাড়ীতে নাই—বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও আমি আছি। আজ বৈকালে সাহেব নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

ফেলাই বিনোদের কথা বিশ্বাস করিল, কারণ সে বিনোদকে বিলক্ষণ জানিত, বলিল,—বাবু পথ ছাড়ুন, আমরা আজ এ বাড়ী লুটিব। মেম সাহেবকে মারিব!

বিনোদ।—শূন্য বাড়ী লুটিবে, ভারতবাসীর এ ধর্ম্ম নহে—স্ত্রীবধ মহাপাপ!

ফেলাই গর্জ্জিয়া বলিল, লুটিব; ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না,—দলের আদেশ মানাকেই ধর্ম্ম মনে করি; অত্যাচারীর বাড়ী লুটাকে আমরা পুণ্য কর্ম্ম মনে করি, আপনি পথ ছাড়ুন।

বিনোদ বাবু বলিলেন, আমিই এ বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তা, তবে আমাকে অগ্রে মার।

ফেলাই।—তা মারিব না, কারণ তুমি অত্যাচারী নও।

বিনোদ।—এণ্ডারসন সাহেব কি অত্যাচারী?

ফেলাই।—ভয়ানক অত্যাচারী, আপনি এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে সে না করিয়াছে, এমন কাজ নাই।

বিনোদ একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, এণ্ডারসন বাড়ীতে নাই, তাহার মেম আছেন, তিনি ত অত্যাচারী নন।

ফেলাই,—তিনি আরো অত্যাচারী—এই যে বন্দুকের শব্দ শুনিলেন, ইহা তাহারই ফল! পথ ছাড়ুন, আমরা বন্দুকের ভয় করি না।

বিনোদ পুনঃ বলিলেন, তোমরা কি করিতে চাও?

ফেলাই।—এই বাড়ীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নদীতে ভাসাইব, পরে এই বাড়ী মাটীতে মিশাইব।

বিনোদ।—তাতে তোমাদের স্বার্থ কি?

ফেলাই। স্বার্থ—প্রতিশোধ। প্রতিশোধ না তুলিলে আর মানুষ কি জন্য হইয়াছি? পথ ছাড়ুন, আজ প্রতিশোধ তুলিব।

বিনোদ।—আমি পথ ছাড়িব না, তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা পালন কর, আমার ধর্ম্ম আমি পালন করিব, পথ ছাড়িব না।

ফেলাই একটু উষ্ণ হইয়া বলিল,—পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দূর হ, বাঙ্গালী সাহেবের গোলামী করাকে ধর্ম্ম মনে করে, পাহাড়ীরা মহাপাপ মনে করে, নরাধম দূর হ!

বিনোদ আরো নরম হইয়া বলিলেন, আমি গোলাম কিন্তু নেমকহারাম নহি। যাহার দ্বারা উপকার পাইব, তাহার উপকার করিব।

ফেলাই—আর স্বদেশ?—তাহার নিকট কি কোন উপকার পাও নাই?—

বিনোদ,—উপকার যথেষ্ট পাইয়াছি, সেই দেশের জন্যইত জীবনের সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাহেবের গোলাম হইয়াছি। দেশের উন্নতির জন্য সাহেবের গোলামী করিতেই হইবে;—আর পথ নাই, আর উপায় নাই।

ফেলাই,—তুই পাষণ্ড, তুই নরাধম, তোর ন্যায় নরাধমের দ্বারাই এই বিষ দেশে আসিয়াছে! দূর হ।

বিনোদ।—আমার দ্বারা যদি আসিত, আমি আমার জীবনকে সার্থক মনে করিতাম, এ কার্য্যে যে সহায়তা করিয়াছে, সে স্বর্গে স্থান পাইয়াছে।

ফেলাই সিংহের চক্ষু রক্তজবার ন্যায় হইল, বলিল, সে প্রতারকের নরকেও স্থান নাই,—তোরও নাই। স্বদেশবাসীর কষ্ট দুঃখ যে দেখিল না, বুঝিল না, সে পাষণ্ড! এই সাহেবদের দ্বারা দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কি কখনও দেখিস্ নাই। হায়, কত বিধবা আশ্রয়হীন, কত মাতা পুত্রহীন, কত পুরস্ত্রী সতীত্বহীন! চোখ থাকে, চাহিয়া দেখ্, দেশের কত অধোগতি হইতেছে!

বিনোদ বিনয়ে নত হইয়া ফেলাইর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, তারপর বলিলেন, তুমি স্বদেশবৎসল, কিন্তু ভাই, অধর্ম্মে কি হইবে? এ সংসার লক্ষ্য নহে; উপরে ভগবান আছেন; অত্যাচার হইয়া থাকিলে তিনিই তাহা গণনা করিতেছেন; তাহার ন্যায় দণ্ডে সকল নিয়মিত হইবে। অত্যাচার হইয়া থাকে, একদিন ইংরাজ রাজত্ব উঠিয়া যাইবে, এস ভাই আমাদের কর্ত্তব্য আমরা প্রাণপণে পালন করি। এস ভাই আমরা মানুষ হই!

ফেলাই বলিল,—এ অধর্ম্ম, কে বলিল? এই ত প্রকৃত ধর্ম্ম। জীব শরীরের জন্য যেমন জীব নাশ প্রকৃতির নিয়ম, জীবের স্বাধীনতার জন্য, শান্তির জন্য, সুখের জন্য, ধর্ম্মের জন্যও রক্তপাত হওয়া আবশ্যক। অধর্ম্ম হইলে আমাকে ও জিতনকে এ কার্য্যে দেখিতে পাইতে না। জিতন ও আমি দশবৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছি, ধর্ম্ম কথা শুনিয়াছি। সে সকল কথা পরে জানিবে। এই বলিয়া ফেলাই সিং আবার

জয় জয় রব হাকিল। ইতিমধ্যে আবার জেলীর বন্দুকের আওয়াজ হইল, সে লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না, দুই জন পাহাড়ী মাটী কাঁপাইয়া পড়িল। ফেলাই ক্রোধে উন্মত্ত হইল, বিনোদের গালে এক চপটাঘাত করিয়া বলিল, ঠক, প্রতারক, দূর হ;—দেশের কুলাঙ্গার, দূর হ।

বিনোদ বুঝিল, কথার আর সময় নাই—ফেলাইর পা ধরিয়া বলিল, ক্ষমা কর, অপরাধ হইয়াছে। পরে বিনোদ একখানি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ফেলাইর হাতে দিল; ফেলাই তাহা দেখিয়া লজ্জায় মুখ নত করিল। ফেলাই যে অপরাধ করিল, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ফেলাই অস্থির হইল। ফেলাই আর কিছু না করিয়া বলিল,—আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে; কেবল এই ভিক্ষা।

বিনোদ ক্ষণকাল কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন, পরে কি ভাবিয়া প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সদলে বিনোদকে বেষ্টন করিয়া সদর্পে ফেলাই পর্ব্বতাভিমুখে চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

বিনোদকে লইয়া ফেলাই সিংহের দল পাহাড়ে উঠিয়া নিভৃত স্থানে পৌঁছিল। জিতনের দল পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছিয়াছিল। জিতন সে দিন জয়ী, ফেলাই জয়ী না হইয়াও জয়ী। ফেলাই জয়ী, কেন না, ফেলাই বিনোদকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে। জিতনের বাড়ী ঘর সকলই পাহাড়ে উঠিয়াছে; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জিতন সকল পাহাড়ে তুলিয়াছে; সে আর দাসত্ব করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা। যদি ফেলাই বিনোদকে না পাইত, তবে অদ্যকার জয় অসম্পূর্ণ থাকিত। জিতন জানিত, বিনোদ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক। জিতন বুঝিত, শরীরের বলে বুদ্ধি বল সংযুক্ত না হইলে চলিবে না। সেই জন্যই বিনোদকে গ্রেপ্তার করিতে ফেলাইকে আদেশ করা হইয়াছিল। সাহেবের সহিত বিনোদের ঘনিষ্ট যোগ, ইহা জানিয়া জিতন সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিত, কোন্ সময়ে হয় ত ক্রোধোন্মত্ত পাহাড়ীর হস্তে বিনোদের প্রাণ যাইবে। এই আশঙ্কায় জিতন বিনোদের হস্তে একখানি তাম্রফলক দিয়াছিল, সেই তাম্রফলক সাঙ্কেতিক চিহ্ন। জিতন বলিয়া দিয়াছিল, যখন পাহাড়ীরা তোমাকে ধরিবে, তখন ইহা দেখাইবে। সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিনোদ সদাই কাছে কাছে রাখিতেন। তাহাতেই অদ্য কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছেন। ফেলাই সিংহ বিনোদকে পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছে। জিতন বিনোদকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইল। বিনোদ সে অপূর্ব্ব স্থান দেখিয়া বিমোহিত হইলেন,—গভীর রজনী—নিস্তব্ধ—নীরব—সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকাশ হইতে চন্দ্রের প্রফুল্ল বিমল জ্যোতি নামিয়া নামিয়া গগনভেদী পর্ব্বত শেখরে শেখরে ভাসিতেছে! শেখরের পশ্চাতে উন্নততর শেখর, তাহার পশ্চাতে উন্নততম, এই প্রকারে ক্রমিক উন্নত শেখরগুলি অধিত্যকার ব্যাপার যেন জ্যোস্নার আলোতে দেখিতেছে! অধিত্যকায় জিতনের দল! অধিত্যকা সাগরতল হইতে অনেক উচ্চ। অধিত্যকা উন্নত পাহাড় বেষ্টিত। পাহাড় হইতে মৃদু মৃদু ঝরণা কুল কুল করিয়া নামিতেছে—গতি অবিশ্রান্ত। ক্ষুদ্র প্রস্তরে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ শাখায় সেই গতির প্রতিরোধে মধুর

শব্দ হইতেছে—অবিশ্রান্ত। চতুর্দ্দিকের মৃদু২ শব্দ মিশিয়া এক আনন্দপ্রদ মহারোল নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গগনে উঠিতেছে। সে গম্ভীর ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয় না। তাহাতে কতই মধুরতা, কতই কোমলতা, কতই আনন্দ! যিনি কখনও শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় ঐ মধুর শব্দ, জ্যোৎস্না প্লাবিত পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া সে স্থান এক অভূতপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে পূর্ণ! বিনোদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন! চতুর্দ্দিকে পাহাড়ীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে, পাহাড়ীদের প্রফুল্ল মুখে নব উৎসাহ খেলিতেছে! সে উৎসাহে বীর্য্য—স্বাধীনতা—সরলতার সুন্দর আভা পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়াও বিনোদ মোহিত হইলেন। সেখানে সংসারের জাঁকজমক বা বেশ ভূষার পারিপাঠ্য নাই—কিন্তু হৃদয়ের শোভা শরীরকে কতই সুন্দর করিয়া দেখাইতেছে।

জিতন বিনোদের সম্মুখীন হইয়া বলিল,—আপনি রাজা, আপনি প্রভু, আমরা আপনার প্রজা, আপনার ভৃত্য; এ রাজত্ব আপনার পক্ষেই শোভা পায়; আমরা অগণিত প্রজাপুঞ্জ আপনাকে এই রাজ্যের রাজপদে বরণ করিতেছি।

বিনোদের প্রাণ মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইল, জিতনের কথায় মিথ্যা নাই, তাহাতে প্রবঞ্চনা নাই, তাহাতে কপটতা নাই, তাহাতে অসরলতা নাই, এ বিশ্বাস বিনোদের প্রাণে দৃঢ়বদ্ধ। বিনোদ যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। কথা সরে না—মুখ গম্ভীর, শরীর নিস্পন্দ।

জিতন ইঙ্গিতে ফেলাইকে নিকটে ডাকিল। ফেলাই নিকটে আসিল। জিতন বলিল,—ফেলাই, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ—রাজার হস্তে তীর ধনুক দেও;—রাজভূষায় নব রাজাকে সাজাও।

ফেলাই আদেশ পালন করিল।

বিনোদ বাবু কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—জিতন, তোমার একি লীলা দেখিতেছি? আমি সন্ন্যাসী, আমি বৈরাগী, আমাকে কি করিতেছ?

জিতন বলিল,—আপনাকে সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর অধিকারীই করিতেছি। পৃথিবীতে সকল থাকিতে যে আসক্তিশূন্য হয়, সেই বৈরাগী, রাজা হইয়াও যে সুখ-কামনা বিবর্জ্জিত থাকিতে পারে, সেই সন্ন্যাসী। যাহার কিছুই নাই সে বৈরাগীও নহে, সন্ন্যাসীও নহে। বৈরাগ্য মনে, সন্ন্যাস মনে। মনের সাধনই সাধন। বাহিরের সাধন আমরা মানি না। বাহিরে আমরা অসভ্য, কিন্তু মনে আমরা দেবত্ব লাভ করিতে প্রয়াসী। সকলই মনে। এ সকল কথা আপনার নিকটেই শুনিয়াছি। সুতরাং আপনি এ সকল পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই সকল রাখিয়া ভিতরে যদি অনাসক্ত হইতে পারেন, তবেই আপনার সাধনা সিদ্ধ হইবে। অতএব এই রাজধর্ম্ম আপনাকে পালন করিতেই হইবে।

বিনোদ বাবু অসভ্য জিতনের চরণে প্রণাম করিলেন, তারপর বলিলেন, তুমিই রাজা হও, আমি তোমার ভৃত্য হই। তোমার নিকটে অনেক শিখিবার আছে।

জিতন।—আমার নিকট আপনাকে কখনও শিখিতে হইবে না—আমি মূর্খ, আমি অসভ্য, আমি অধার্ম্মিক; আপনার কথাই আপনাকে পালন করিতে হইবে। মনুষ্যের শরীর পৃথিবীতে কখনও রাজত্ব করিতে পারিবে না—চরিত্রবান্ হৃদয়ই রাজত্ব

করিবে। আপনি চরিত্রে দেবতা। আমরা পশু—পশুর দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইহা আপনারই কথা। পশুর ধর্ম্ম হিংসা—হিংসায় রাজ্য রক্ষা হয় না। অহিংসা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং আপনিই রাজা হইবেন।

বিনোদ। কথায় তোমার নিকট হারিলাম। রাজার কি করিতে হয়, বল।

জিতন বলিল,—আপনি কি সকলিই ভুলিয়াছেন?—আপনার নিকটেই সকল শুনিয়া শিখিয়াছি, এবং তদনুসারে জীবনে কার্য্য করিয়াছি। এ দল আপনার কথা মতই হইয়াছে। আপনার কথাই আপনাকে বলিব,—উন্নত চরিত্রের কর্ত্তব্য অবনতদিগকে উন্নত করা, বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য মূর্খদিগের বুদ্ধিপরিচালনার সহায়তা করা—জ্ঞানীর কার্য্য অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান করা। রাজার কার্য্য ইহাই। বুদ্ধি, চরিত্র, প্রেম ও জ্ঞানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। এই অসংখ্য পশুকে আপনি মানুষ করিবেন। যাহারা কাটাকাটী করিয়া মরে, তাহাদিগকে আপনি প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।

বিনোদ।—বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম কি, এসম্বন্ধে লোকের বড়ই কুসংস্কার জন্মিয়াছে—সাম্প্রদায়িকতাই ধর্ম্মের জীবন হইয়াছে। লৌকিক ধর্ম্মেরই রাজত্ব। আমার কথা জগতে থাকিবে না।

জিতন একটু উষ্ণ হইয়া বলিল—ভবিষ্যৎ কে জানে, কে বুঝে? সত্য যাহা তাহা জগতে থাকিবে। জীবন হইতে একটী জীবন্ত সত্য বাহির হইলে, অনন্ত কাল তাহার রাজত্ব থাকিবে। যখন জীবন পাইবেন, তখনই তাহার কার্য্য হইবে। যে কখনও জীবনে সত্য পালন করে নাই, সেই নিরাশার স্বপ্ন দেখে। সত্যবীর—সত্য সেবক—সত্য যাহার আহার ও পানীয়, সে নিরাশার স্বপ্ন দেখে না। অতএব কি থাকিবে, কি থাকিবে না, তাহা ভাবিয়া কোন প্রয়োজন নাই, আপনি রাজার উপযুক্ত, আপনি রাজা হইবেন।

বিনোদ আর কোন কথা বলিলেন না। সেই নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে জিতন বলপূর্ব্বক বিনোদকে নূতন রাজ্যে অভিষেক করিল।

বিনোদ রাজা হইলেন, ফেলাই সৈন্যাধ্যক্ষ হইল। জিতন মন্ত্রী হইল। অসংখ্য সৈন্য সামন্ত লইয়া ফেলাই পর্ব্বত কাঁপাইয়া ভৈরব রব করিল। ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বলিদান দিয়া বিনোদ জিতনের কথা পালন করিলেন।

হতাশ কামনা।

নিস্তরঙ্গ সাগরের সীমাহারা প্রাণ সম
অবোধ্য ভৈরব,
কি জানি কে যেন আসি, উচ্চারিছে কর্ণে মম
"আয় আয়" রব!
অনন্ত শ্মশানপুরী ভেঙে ভেঙে ভগ্নপদে
কোথা যাব আর?
এখনও শুনিছি দূরে, ঐ শব্দ "আয় আয়"
শ্রান্তি নাহি তার!

কলঙ্ক ছুঁইলে প্রাণে, পবিত্র শৈশব স্বপ্ন
যথা মধুময়;
সেই স্বপনেরি মত, কল্পনার ছায়া সম
প্রতারণাময়!
কতবার ভাবিয়াছি, সীমাময় কারাগারে
বাঁধিব আমারে,
কতবার ভাবিয়াছি, প্রেমহীন অন্ধকারে
ডুবাব আমারে!

মুক্ত, কারা-বাতায়নে অনন্ত আকাশপুরী,
আলোক আঁধারে!
সীমায় অসীমা গাঁথা, এইরূপ ভূরি ভূরি
হেরি চারি ধারে!
ক্ষুদ্র শক্তি প্রাণ মোর, অনন্তের সূত্রগাছি
পারনা ছিঁড়িতে?
সীমাময় নরকের দৃষ্টিহীন অন্ধকারে
পার না ডুবিতে?
জ্ঞেয়ান-তৃষিত-কণ্ঠে, বিস্মৃতির সুধাটুকু
পার না ঢালিতে?
ওই আয় আয় ধ্বনি, অবোধ্য অনন্তরূপী
পার না ভুলিতে?
সপ্রেম চুম্বনে যবে সুষুপ্তা ঊষারে আসি
অরুণ জাগায়,
অর্দ্ধমুক্ত নেত্রে তার, আধস্ফুট জ্যোতিকণা
দিগন্তে খেলায়!

প্রৌঢ়ার রূপের মত, পূর্ণ রূপে বিকশিত
শরৎ যখন,
সীমার ক্রোড়ের পরে অসীমার ভাবরাশি
করে রে স্থাপন,
তখন পরাণ তুমি, মুদিয়া নয়ন দুটী
ডুবিও আঁধারে;
সদাদৃপ্ত আলো রেখা, তেজিতে না পার যদি,
বলিও তাহারে,
"দুর্ব্বল চরণ হায়, ছুটীতে পারে না আর
শ্মশান ভাঙিয়া;
তৃপ্তির অমৃত যদি সুধুই কল্পনা কথা,
দেও গো আনিয়া
বিস্মৃতির হলাহল; তাহাই করিয়া পান
যাই গো ডুবিয়া"
হে অনন্ত-রূপ মুগ্ধ, হতাশ-কামনা কথা
যেওনা ভুলিয়া!!

বরষার বিল।

এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ
অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল!
পানা, জল, ঘাস গাছে, কত কি মাধুরী আছে
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল!
ডাকে জলচর পাখী, দাম দলে থাকি থাকি,
এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল?
সুনীল লহরী তুলি, নাচাইছে দুলি দুলি
সন্ধ্যার শীতল অই মলয় অনিল,
নূতন সলিলে ভরা বরষার বিল!

শত শত ধান খেতে, যেন শ্যাম সাগরেতে
উঠিছে মৃদুল রাতে সবুজ লহরী,
ছুটিছে সলিলে নীচে, তরঙ্গ তরঙ্গ পিছে,
কাঁপিছে প্রকৃতি অঙ্গ পুলকে শিহরি!
কি আনন্দ কেবা জানে, আজি প্রকৃতির প্রাণে
কমল কুমুদ কাঁপে বুকের উপরি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ উঠিছে শিহরি!

ডাহুক ডাহুকী সুখে বেড়িয়া বেড়ায়,
এখানে ওখানে সবে, মধুর মধুর রবে
সরালি কালেম পিপী কত নাচে গায়,
মরাল মরালী সনে, তেমনি পুলক মনে
কমল কুমুদ বনে ভাসিয়া বেড়ায়!
চক্রবাক চক্রবাকী, চঞ্চুতে চঞ্চুটী রাখি
কত কষ্ট জানাইছে লইতে বিদায়,
সরল পাখীর প্রাণ—আসন্ন সন্ধ্যায়!

সুশীতল সন্ধ্যাকালে—

ফুটিয়াছে থরে থরে কুমুদ কুসুম,
সুনীল গগন তলে, সহস্র হীরক জ্বলে,
ভাঙ্গিয়াছে সুরশিশু তারকার ঘুম।
অমর অধরে হাসি, অফুরন্ত সুধারাশি
সমস্ত জগতে ওর লে'গে গে'ছে ধুম!
হাসিতেছে সুরশিশু—কুমুদ কুসুম!

সন্ধ্যার ললাটে হাসে অর্দ্ধ চন্দ্র এক,
রজত সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক!
ঘাসের ছায়ার গায়, কুমুদী হারাণ যায়
সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক!
কি সুন্দর লুকোচুরি, জানে এ কুমুদী ছুঁড়ী
সাথে সাথে থকে ধরা দেয়না বারেক!
শুয়ে থাকে সন্ধ্যা রে'তে, কৌমুদী কুমুদ পাতে
ঝোপে ঝাপে ধান খেতে ঠিক্ নাই এক!
এ সামান্য বিছানায়, ও কম কিরণ কায়
নয়ন ভুলিয়া থাকে দেখিলে বারেক!
দেখিনি এমন শোভা—দেখেছি অনেক!

পারে পারে, ঘাটে ঘাটে লইবারে জল,
গ্রামের গৃহস্থবধূ এসেছে সকল!
হারাণ কুমুদ জ্ঞানে, ভাসে শশী অই খানে
না চিনিয়া মিছামিছি হাসিছে কেবল!
কলসীতে ঢেউ দিয়া, শশধরে খেদাইয়া
সরলা গৃহস্থবধূ ভরিতেছে জল!
ও তরঙ্গ বিকম্পনে, কত যে পুলক মনে
এক চন্দ্র শত হ'য়ে হাসিয়ে পাগল,
ভাবিয়া গৃহস্থবধূ কুমুদ বিমল!

গ্রাম অভিমুখে অই চলেছে তরণী,—
আকাশেতে ভাঙা ভাঙা মেঘ কয় খানি!
কৃষক বাহিছে ধীরে, কৌমুদী মাখান নীরে
বিলের বিমল বুকে মৃদুলে ক্ষেপনী,
করিতেছে গ্রাম্য গান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ
শিখিতে অমর কণ্ঠে গায় প্রতিধ্বনি!
সবুজ লহরী গুলি, সুখে করে কোলাকুলি
এমন সলিল নৃত্য দেখিনি কখনি!
এত মধু—মাদকতা, স্বর্গীয় এ সরলতা
মিলে কি এমন আর খুঁজিলে অবনী?
চাহিলে নয়ন কোণে, বারেক উহার পানে
পরাণ পাগল হয় আপনা আপনি,
গ্রাম অভিমুখে অই চলেছে তরণী!

গ্রাম অভিমুখে যায় অই ক্ষুদ্রতরী,—
ছৈয়ের ভিতর থেকে, শরীর লুকায়ে রেখে
চুপি দিয়ে চেয়ে আছে সরলা সুন্দরী!
গগনের পূর্ণশশী, ভূতলে পড়েনি খসি,
ফোটেনি কুমুদ নীল জল পরিহরি!
এমনি মধুরে হেসে, দাঁড়াইয়া তীরদেশে
কি দেখিছে গ্রামের ও 'ঝিয়ারী' 'বহুরী'?
আজি বহুদিন পরে, আসিছে বাপের ঘরে
শৈশবের সহচরী, নূতন 'নায়রী'!
সারি দিয়ে দেখে তাই সরলা সুন্দরী!

কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা,
পরস্পরে সুখে দুখে, প্রীতির প্রসন্ন মুখে,
কেমন সে মিলনের প্রথম জিজ্ঞাসা!
কেমন সে গদ গদ, ঢল ঢল কোকনদ
কেমন সে আধ ফোটা মধুর সম্ভাষা!
সংসারের দয়া মায়া, একত্রে রমণীকায়া,
সরলা রমণীমূর্ত্তি পূজা করে চাষা!
ইচ্ছা করে নিত্যসেবি, ও গ্রাম্য সরলা দেবী
সামান্য গৃহস্থ হয়ে মিটাই পিপাসা!
কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা!

দেখিছে দাঁড়ায়ে যেন—
তীরে তীরে তরুগণ কাতারে কাতার,
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ বিল বরষার!
দেখে বোধ হয় হেন, পুণ্যস্নান করে যেন
আকণ্ঠ মগন জলে—হিজল উদার!
অথবা মনের সুখে, শীতল সলিল বুকে
ঢালিছে অনন্তদগ্ধ প্রাণ আপনার!
ইচ্ছাকরে—
অই বুকে বুক রাখি, অমনি লুকা'য়ে থাকি,
ভুলে যাই এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার!
শত কষ্ট—শত দুখ, এ অন্তর দগ্ধ বুক
নিবাই প্রাণের গুপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার!
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ বিল বরষার!

মানব জন্ম।

"Know thyself! This is the source of all wisdom, said the great thinkers of the past and the sentence was written in golden letters on the temple of the gods. To know thyself, Linnaeus declared to be essential and indisputable distinction of man above all other creatures. I know indeed in study nothing more worthy of free and thoughtful man than the study of himself. For if we look for the purpose of our existence, we cannot possibly find it outside ourselves. We are here for our own sake."

Karl Ernst Baer.

আকৃতি ও কার্য্যে মনুষ্যের সহিত অন্য জীবের সাদৃশ্য এত অধিক যে, জীবপর্য্যায় গণনাকালে মনুষ্যকে পৃথক বলিয়া গণ্য করা যায় না। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পরিমাণানুসারে জীবরাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জগতে যাবতীয় চেতন পদার্থ বিদ্যমান আছে, জন্তু ও উদ্ভিদ এই দুই জাতিতে (Kingdom) তাহাদের সকলকেই বিভক্ত করা যায়, এক এক জাতি নানা (Sub-kingdom) উপজাতিতে, একএকটী উপজাতি নানা (Genera) গোত্রে, এক একটী গোত্র নানা (order) শ্রেণীতে, এক একটী শ্রেণী নানা (species) মেলে এবং এক একটী মেল নানা (variety) রূপে বিভক্ত হইয়াছে। সাদৃশ্যের তারতম্য এইরূপ বিভাগের কারণ। বলিতেছিলাম, মনুষ্যের সাদৃশ্য অন্য জীবের সহিত এত অধিক যে যেরূপে অন্যান্য জীবের উৎপত্তি হইয়াছে সেইরূপেই মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। উৎপত্তির নিয়ম অন্য জীবের প্রতি যেরূপ প্রাধান্য পরিচালন করিয়া থাকে, মনুষ্যের প্রতিও সেইরূপ করে, মনুষ্যের উৎপত্তি সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। একটী জীবের অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে অন্য জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে যদি একথা স্বীকার করা যায়, তবে অন্য জীবের বিবর্ত্তনে মনুষ্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। অন্য সকল জীব বিবর্ত্তন ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল মনুষ্য স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। যাবতীয় চেতন পদার্থ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে আলোচনা করিতে বৈজ্ঞানিকের প্রভূত আনন্দ লাভ হয়, পরন্তু মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে আলোচনা করিতে মনুষ্য মাত্রেরই ঔৎসুক্য জন্মিবার সম্ভাবনা।

অন্যান্য জীবের ন্যায় মনুষ্যও ডিম্ব হইতে জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য-ডিম্বের ব্যাস এক ইঞ্চির একশত পঞ্চবিংশতি অংশের এক অংশ মাত্র। জরায়ু বাসের প্রথমাবস্থায় নরভ্রূণ (Invertebrata) মেরুদণ্ড হীন জীবের আকৃতি বিশিষ্ট, ক্রমে মেরুদণ্ডশালী জীবের আকৃতি লাভ করে। কিন্তু তখনও কাহারও বলিবার সাধ্য থাকে না সেই ভ্রূণ মেরুদণ্ড বিশিষ্ট কোন্ শ্রেণী জীবের অনুরূপ হইবে। আরো কিছু দিন পর্য্যবেক্ষণ করিলে বলা যায় সে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট কোন শ্রেণী স্তন্যপায়ী হইবে। দেহের ঊর্দ্ধভাগের শোণিতযন্ত্র ও অধোভাগের অন্ত্র সকল

পরীক্ষা করিয়া বুঝা যায় না যে, সে ভ্রূণ মৎস্য বা তদপেক্ষা উন্নততর আর কোন মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব আকার ধারণ করিবে—ক্রমে ক্রমে বুঝা যায় যে, সে স্বতন্ত্র শ্বাস-যন্ত্র শালী কোন প্রকারের মেরুদণ্ডী হইবে। গোধা প্রভৃতি সরীসৃপের পা এবং পাখীর পা ও পাখা যেরূপে বিকশিত হয়, মনুষ্যের হস্ত পদ ঠিক সেইরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। পুনরায় বিকাশের পর বিকাশ—অনেক গুলি অবস্থা পরিবর্ত্তন না হইলে বুঝা যায় না জরায়ুবাসী ভ্রূণ কোন্ শ্রেণীর স্তন্যপায়ীতে পরিণত হইবে। যখন বুঝা যায় ভ্রূণ মৎস্যও নহে, সরীসৃপও নহে, পতত্রীও নহে, তখনও কোন শ্রেণীর বানর কি মনুষ্য হইবে বুঝা যায় না। আমাদের হৃৎপিণ্ডে চারিটী গহ্বর আছে, ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড একটী সামান্য ভস্ত্রা মাত্র। আমাদিগের আহারাদি জনন ও স্রাব যন্ত্র স্বতন্ত্র, ভ্রূণের দেহে এ তিনটীর পরিবর্ত্তে কেবল একটী যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, (cloacal passage)। আমাদিগের পৃষ্ঠাস্থির নিম্নভাগ কুঞ্চিত ও অস্ফুট, ভ্রূণের পৃষ্ঠাস্থি বিকশিত হইয়া চরণ অপেক্ষা দীর্ঘতর লাঙ্গুলে পরিণত হয়। আমাদিগের পাকনালী কত জটিল, ভ্রূণের পাকনালী মাছের পাকনালীর ন্যায় একটী সামান্য যন্ত্র। নিম্নশ্রেণী বানর যুবকের মস্তিষ্কের গঠন যেরূপ সপ্তম মাসে, ভ্রূণের মস্তিষ্ক ঠিক সেইরূপ হয়।

মনুষ্যের আকৃতিতে কতকগুলি (Rudimentary) অস্ফুট অংশ দৃষ্ট হয়। এই সকল অংশ রক্ষাহেতু শোণিত ব্যয় হইয়া থাকে—অথচ ইহাদিগের দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনুষ্য স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়া থাকিলে এই অনাবশ্যক অথচ ব্যয়সাপেক্ষ অংশের সৃষ্টি হইবার কারণ কি বুঝা যায় না। বিবর্ত্তনবাদে তাহারা পূর্ব্বাবস্থার চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়; ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। সমাজে যেমন কতকগুলি অনাবশ্যক অনর্জ্জনকারী ব্যয়সাপেক্ষ শ্রেণীর স্বত্বা দৃষ্ট হয়, যাহাদের লোপ হইলে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই, এই অস্ফুট অনাবশ্যক শোণিত-ব্যয়-সাপেক্ষ অঙ্গগুলি ঈশ্বর অকারণ সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন কে বিশ্বাস করিবে?

বানর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবের দেহ লোমে আচ্ছাদিত। এই সকল জীবের ক্রম বিবর্ত্তনে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে মনুষ্য দেহ লোমে আচ্ছাদিত হইত। কিন্তু মনুষ্য দেহের কিয়দংশ ভিন্ন সাধারণ দৃষ্টিতে, সর্ব্বত্র লোমরাজি দৃষ্ট হয় না। এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, অন্য জীব বিবর্ত্তনে মনুষ্যের উৎপত্তি ঘটে নাই। বস্তুতঃ কোন জাতির দেহে লোম সংখ্যা কম হইলেও আমাদের হস্ততল ও পদতল ভিন্ন সর্ব্বত্র অল্প বা অধিক পরিমাণে লোম জন্মিতে দেখা যায়। যে সকল জাতির দেহে লোম সংখ্যা সাধারণ দৃষ্টিতে অল্প বোধ হয়, অনুবীক্ষণ বা অন্য কোন সহায়ের সাহায্য লইয়া দেখিলে তাহাদেরও দেহে সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূম্র বর্ণের লোম দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের লোমে কোন উপকার হয় না, বরং ইহাদিগকে পোষণ করিতে অনর্থক শোণিত ব্যয় হইয়া থাকে। মনুষ্য স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই লোম সৃষ্টির সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। বিবর্ত্তন বাদে এই অস্ফুট অনাবশ্যক লোমরাজি কি কারণে উৎপন্ন হয়, বুঝিতে পারা যায়।

জরায়ু-বাসী ভ্রূণ ছয়মাস বয়সে পশমের মত লোমে আচ্ছাদিত হয়। উচ্চতর জীবের শৈশবাবস্থা, ইতর জীবের পূর্ণাবস্থার সমতুল্য একথা স্মরণ রাখিলে ভ্রূণের লোমশ হইবার কারণ সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ক্ষুদ্র মস্তক, অব্যাবৃত মস্তিষ্ক, প্রসারিত চিবুক, অল্প বুদ্ধি, বাকাশূন্য, অমনোযোগী সদাচঞ্চল একপ্রকার লোমশ বানর (Microcephalous idiot) কখন কখন মানুষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ইহারা চারি পায়ে হামাগুড়ি দিতে বা গাছে চড়িতে সুদক্ষ হয়—মানুষের মত সোজা হইয়া চলিতে ভালবাসে না। মস্তক হইতে সমস্ত দেহ লোমে আবৃত থাকে—বস্তুত নারীগর্ভে জন্ম ব্যতীত ইহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া অনুমান করিবার আর কোন কারণ নাই। মানুষের ঔরষে মানুষের গর্ভে এরূপ অমানুষী সন্তান উৎপন্ন হইবার কারণ বিবর্ত্তনবাদী ভিন্ন আর কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিবর্ত্তনবাদী বলেন, পরিবর্ত্তন ও উন্নতি স্রোত নানা কারণে পরাবৃত হইয়া পূর্ব্বতন জীবের পূর্ব্বতন জন্মের পুনরভিনয় হইয়া থাকে। আবার সভ্যদিগের অপেক্ষা অসভ্যদিগের, অসভ্যদিগের অপেক্ষা বর্ব্বরদিগের দেহ অধিকতর পরিমাণে লোমে আচ্ছাদিত। দৃঢ়কায় বনচর রাক্ষস, দেহে অস্থি ও পেশী পরিপূর্ণ, মস্তিষ্কে মজ্জার ব্যাবৃত্তি যত অল্প, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বক্ষদেশ তাহার ততই লোমে পরিপূর্ণ।

বিবর্ত্তনবাদের প্রতিবাদীগণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মনুষ্যের লাঙ্গুল কোথায়? যাঁহারা একথা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকে না যে, উচ্চতর নানা বংশের বানরদিগের লাঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা সচরাচর যে সকল বানর দেখিতে পাই তাহাদিগের সকলেরই লাঙ্গুল আছে, এজন্য আমাদের দেশীয়েরা মনে করেন বানরমাত্র লাঙ্গুল বিশিষ্ট। কিন্তু পশু-বাটীকায় অনেক উচ্চশ্রেণীর বানর দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহাদিগের লাঙ্গুল আমাদিগের অদৃশ্য। পরন্তু অস্ফুট লাঙ্গুল আমাদের দেহে অবস্থিত আছে। মেরুদণ্ডের নিম্নতন সঙ্কুচিত অংশ (os coccygis) অস্ফুট লাঙ্গুল মাত্র। ভ্রূণাবস্থায় মনুষ্যের লাঙ্গুল অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় নারীগর্ভে যখন অমানুষী সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহারও লাঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁধের পার্শ্বে দুইটী ছিদ্র (supra condyloid foramen) সিংহ, ব্যাঘ্র, বানর ও মনুষ্য দেহে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদদিগের দেহে এই দুইটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া অতি দৃঢ় দুইটী শিরা বাহুর সহিত সংযুক্ত থাকে। সিংহ ব্যাঘ্র যেরূপ প্রবল বেগে বাহু সঞ্চালন করিয়া মৃগদিগকে আক্রমণ করে, এই দুইটী শিরা বাহুর সহিত সংযুক্ত না থাকিলে আক্রমণ বেগে বাহুদ্বয় ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। বানর বা মনুষ্য দেহে এই দুইটী শিরা থাকিবার কোন কারণ নাই, অথচ তাহাদিগেরও দেহে শিরাদ্বয় বিদ্যমান আছে।

ঐ দুইটী ছিদ্রের পার্শ্বে আর দুইটী ছিদ্র (Inter condyloid foramen) দেখিতে পাওয়া যায়। যাবতীয় ইতর স্তন্যপায়ীদিগের ন্যায় বানর ও কোন কোন মনুষ্য দেহে ও সে দুইটী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যত অধিক মনুষ্যদেহে

এই দুইটী ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যাইত এখন তত দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে সকলের দেহ হইতে ইহারা অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা।

দন্ত পংক্তির সর্ব্ব শেষ ভাগে উপর নীচে দুইটী করিয়া চারিটী দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে জ্ঞান দন্ত বলে। সপ্তদশ ও পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যে ইহারা দেখা দেয়। সুতরাং দন্ত উঠিবার সময়ের অনেক দিন পরে ইহারা দেখা দেয়, সকলের পূর্ণ সংখ্যা উঠেও না। এই দাঁত গুলি উঠিবার সময় বড় যন্ত্রণা হয়, এমন স্থানে ইহারা অবস্থিত যে, চর্ব্বণ কার্য্যে ইহাদিগের দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, অথচ প্রথম আবির্ভাব কালের ন্যায় মাঝে মাঝে ইহারা এত কষ্ট দেয় যে, তুলিয়া ফেলিবার জন্য আরো কিছু যন্ত্রণা সহ্য করিতে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। অকারণ ইহারা এত কষ্ট দেয় কেন? যেরূপ ভাব গতিক, ইহারা ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে, আর কিছু দিন পরে ছুরী দিয়া মাড়ি কাটিয়া দেখিলেও ইহাদের দেখা পাওয়া যাইবে না। আমাদিগের চিবুকাস্থি যেরূপ অবস্থিত, তাহাতে জ্ঞানদন্তগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া অদৃশ্য হইতেছে বটে কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বতন যে সকল জীবের চিবুকাস্থি স্থূলকোণে অবস্থাপিত ছিল, তাহাদিগের চর্ব্বণ কার্য্যে ইহারা একদিন বিস্তর সাহায্য করিয়াছিল।

মানুষের কাণের উপরভাগে এক অংশ একটু ঊর্দ্ধগত। আমরা যাহাদিগের বিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছি, তাহারা এক সময় ঊর্দ্ধকর্ণ ছিল ইহা তাহার নিদর্শন। পক্ষীরা নিদ্রা যাইবার সময় একটী সূক্ষ্ম আবরণে চক্ষুর গোলক আবৃত করিয়া রাখে। এই আবরণ আমাদিগের চক্ষুতে অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান আছে। অস্ফুট বলিয়া ইহার স্বতন্ত্রায় আমাদিগের কোন উপকার লাভ হয় না। অশ্ব বা গাভীর দেহে ডাঁশ কি মশা বসিলে তাহারা কখন লাঙ্গুল দিয়া কখন মুখের দ্বারা সে গুলি তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহাদিগের বৃহৎশরীরে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে লাঙ্গুলাদি স্পর্শ করিতে পারে না। এমন স্থানে কোন কীট উপবিষ্ট হইলে এই সকল জীব ভূকম্পের ন্যায় চর্ম্ম কাঁপাইয়া তাহাদিগকে দূর করে। চর্ম্ম কাঁপাইবার জন্য ইহাদিগের একটী পেশী আছে (Panniculus carnosus) আমাদিগের দেহের প্রায় সকল অংশই আমরা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি, সুতরাং চর্ম্ম কম্পিত করিয়া কীটাদি দূর করিবার কখন আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি অস্ফুট ভাবে পূর্ব্বোক্ত পেশীটী আমাদিগের দেহে নিহিত রহিয়াছে। আবশ্যকমত সম্মুখভাগে বা পশ্চাৎ দিকে অশ্বাদি আপন আপন কর্ণ চালিত করিতে পারে। যে পেশীদ্বারা তাহারা এই কার্য্য সাধন করিয়া থাকে আমাদিগের কর্ণে সেই পেশী বিদ্যমান আছে। কিন্তু অস্ফুট বলিয়া আমরা আমাদিগের কর্ণ ইচ্ছামত বিভিন্নদিকে চালিত করিতে পারি না। মনুষ্যের সহিত অন্য জীবের শারিরীক গঠনের সৌসাদৃশ্য এতই অধিক। এই সকল সাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে যে রূপে অন্য জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপে মনুষ্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে, অন্য জীবের বিবর্ত্তনে মনুষ্যের জন্ম, একথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকে না।

আবার মনুষ্যের শারিরীক প্রকৃতি অন্য জীবের শারিরীক অবস্থার এত অনুরূপ যে অন্য জীবের সহিত মানুষের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। নানা জাতীয় কীট মনুষ্যের ত্বকের উপর বাস করে। ইহারা মনুষ্য শোণিতে পোষিত হয়। যে যে শ্রেণীর কীট মনুষ্য দেহে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মগৌরব উপভোগ করেন, সেই সকল ইতর জীবের ত্বকেও তাহারা বাস করিয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্য ত্বক্ ঐ সকল জীবের ত্বকের অনুরূপ স্বীকার করিতে হইবে। অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যে দেখা গিয়াছে, মনুষ্যের শোণিত যে ভাবে গঠিত অন্যান্য উচ্চ জীবের শোণিতও সেই ভাবে গঠিত, রসায়ন শাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, যে উপাদানে নরশোণিত গঠিত সেই সেই উপাদানে অন্য জন্তুর শোনিত গঠিত; কিন্তু ঐ সকল অপেক্ষা যখন দেখিতে পাই একই শ্রেণীর জীব সমভাবে উভয় শোণিত আস্বাদন করিয়া উভয় শোণিতের প্রতি সমভাবে আকর্ষিত, তখন এই বিভিন্ন জাতীয় জীবের সৌসাদৃশ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ থাকিতে পারে না। আবার চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি যে পরিমাণে নরদেহের উপর আপন শক্তি পরিচালিত করিয়া থাকে, অন্যান্য জীবের উপরও সেইরূপ করে। রোগের উৎপত্তি ও স্থিতি, গর্ভধারণ জননী শক্তির বিকাশ ইত্যাদি নানা কার্য্য চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। এ নিয়মে মনুষ্যের ন্যায় নানা শ্রেণীর বানর, নানা শ্রেণীর স্তন্য পায়ী, নানা শ্রেণীর মেরুদণ্ডী সামান্য কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত নিয়মিত।

যে সকল রোগ মনুষ্য দেহে আবির্ভূত হয়. ইতর প্রাণী সকলও সেই সকল রোগের শাসনাধীন। শীতাতপের সহসা পরিবর্ত্তনে আমাদিগের যেমন কাশ জন্মে (cebus Axaræ) বানরদিগেরও সেইরূপ হয় এবং আমাদিগের মত উহাদিগের ও কাশ রোগ ক্ষয়কাশে পরিণত হইয়া প্রাণান্ত ঘটাইয়া থাকে, দুর্ভাগ্য বানর আমাদিগের মত নানাবিধ শ্বাস রোগের অধীন। যে সকল শিরঃ অন্ত্র ও চক্ষু রোগে আমরা যন্ত্রণা পাই, ইহাদিগেরও সেই সকল রোগ জন্মে। আমাদিগের শিশুর ন্যায় বানর-শিশু দন্তোদ্গমকালে স্থূলভকোপ ও ক্রন্দনশীল হয়। নর শিশুর ন্যায় বানর শিশু সে সময়ে কখন কখন আক্ষেপক রোগে অভিভূত এবং কেহ কেহ জ্বর রোগে গতাসু হয়। সংক্রামক ব্যাধি সকল মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণীগণে এবং ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্য দেহে পরিচালিত হয়। অলর্করোগ কুকুর হইতে, জহরবাত অশ্ব হইতে এবং বসন্ত গাভী হইতে মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হয়। বানর হইতে মনুষ্যে এবং মনুষ্য হইতে বানর দেহে বাতশ্লেষা পরিচালিত হইতে পশুবাটীকায় দেখা গিয়াছে। এই সকল সাদৃশ্য দেখিলে কে না বলিবে যে, নর শোণিত শিরা পেশী সকলই অপর প্রাণীর অনুরূপ। আবার অহিফেন সুরা কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধি আমাদিগের শরীরে যে সকল গুণ প্রকাশ করে, বানরের শরীরেও সেই সকল গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য দেহ ও মানব শক্তি অন্যান্যজীবের অনুরূপ হইলেও শৈরিকযন্ত্রে মানবীয় স্বাতন্ত্র্যতা সাধারণতঃ

স্বীকার্য্যরূপে গৃহীত হয়। মনুষ্যের শৈরিক-যন্ত্র অন্যজীবের অনুরূপ, ব্যাবৃতি ভিন্নতা থাকিলেও প্রকার ভিন্নতা নাই, একথা সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। শৈরিকযন্ত্র জ্ঞান তন্তুর আকর, শৈরিক-যন্ত্রের ব্যাবৃতি বুদ্ধিশক্তির পরিমাপক. মানবীয় বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা লক্ষ্য করিলে মানবীয় শৈরিক যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। তথাপি ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে. শৈরিকযন্ত্র মনুষ্যের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সুরা বিষের প্রাধান্য শৈরিক যন্ত্র শাসন করে। যখন সুরাপানের যে সকল গুণ আমাদের দেহে প্রকাশিত হয়, সেই সকল গুণ বানর ও অন্য জীবের দেহে প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই, তখনই বিভিন্ন জীবের শৈরিক যন্ত্রের প্রকার ভিন্নতা অস্বীকার করিতে বাধ্য হই। মৌমাছী ও বানর মদ খাইয়া আমাদের মত মাতাল হয়, দেখা গিয়াছে। মদ খাইলে কোন মনুষ্য যেমন অনবরত হাসিতে থাকে, কেহ কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়, কাহার ও বিষাদে মুখ মলিন, গাম্ভীর্য্যে অবাতকম্পিত সাগর তুল্য প্রতীয়মান হয়, কেহ বা প্রফুল্লতায় বিকশিত হইয়া পড়ে। সুরাপানে বিভিন্ন বানরকেও এইরূপ ভিন্ন ভাবে ভাবান্বিত হইতে দেখা যায়। পর দিন প্রাতঃকালে মনুষ্যের মত বানরদিগকেও মস্তক টিপিয়া শিরঃপীড়া উপশম করিতে দেখা গিয়াছে। খোঁয়ারী ভাঙ্গিতে মনুষ্য সুরা পায়ী আর একটু গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বানর সুরাপায়ী খোঁয়ারী ভাঙ্গিতে আবার সে কুকুর দংশন সহ্য করিতে চাহে না। তথাপি দু একটী সভ্য বানরকে কখন কখন সোডা ও ব্রাণ্ডি পানি প্রত্যুষে সেবন করিতে দেখা গিয়াছে।

যেরূপে অন্য জীবের ক্ষত আরোগ্য হয়, সেই রূপেই মনুষ্যের ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। কোন কোন নিকৃষ্ট জীবের দেহের এক অংশ কাটিয়া লইলে আবার স্বাভাবিক নিয়মে সে ক্ষত পূর্ণ হইয়া থাকে। মনুষ্য দেহে ও কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগের একটী অধিকতর অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলি পার্শ্বে সংযোজিত থাকে, সেটী কাটিয়া ফেলিলে আবার বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে।

বিবাহ সন্তানোৎপাদন ও সন্তান পালনের নিয়ম সকল পক্ষেই সমান। জন্মের কয়েকদিন পর পর্য্যন্ত আমাদিগের শিশুদিগকে যেরূপে রক্ষা করিতে হয়, বানর শিশুকেও সেইরূপে রক্ষা করিতে হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে রমণীগণ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে সন্তান বহনে সক্ষম হয়। ঐ সকল দেশে বনমানুষেরা ঐ বয়সে সেই ক্ষমতা লাভ করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনুষ্য ও অন্য জীবের শৈরিক যন্ত্র এক বিধ, কেবল বিকাশে কিছু বিভিন্ন, একথা স্বতন্ত্র সৃষ্টি-বাদীগণ স্বীকার করেন না। সুরাবিষের উভয় বিধ শৈরিক যন্ত্রে একই বিধ প্রাধান্য পরিচালিত হইতে দেখিয়া যাঁহারা পশ্চাৎ-পদ হন, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে উভয়বিধ জীবের শৈরিক যন্ত্র নিম্ন অঙ্গে এক প্রকার হইলেও উচ্চ অঙ্গে ভিন্ন প্রকার। যে বুদ্ধি দৃষ্টির অতীত কোটী যোজনের দূরগত ছায়া পথের নক্ষত্র রাজি গণনা করে, কাদম্বিনী-শায়িনী তড়িতলতা আবাস কুটিমে আরোপিত করিয়া আলোকে চন্দ্রিকা বিলজ্জিত করে, বিশাল তরঙ্গময়

বারিধি গোষ্পদের ন্যায় অতিক্রম করে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমভাবে যাহার করতল ন্যস্ত আমলকবৎ, জ্ঞানের অতীত কল্পনার অতীত পরম চৈতন্যস্বরূপকে জগতের আদি কারণ রূপে যে জানিতে পারিয়াছে, সে বুদ্ধি ফলাহারী অগ্নিশূন্য নিরস্ত্র শাখামৃগের বুদ্ধির স্বজাতীয়, একথা কি বিশ্বাস যোগ্য? পাঠক তুমি ঘনশ্যামকে পূর্ণচন্দ্র বলিয়া নামকরণ কর, কাণ্ড জ্ঞান শূন্য বর্ব্বরকে কালিদাস বলিয়া ডাক, একবার কি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছ, তাসমেনীয় বর্ব্বর হইতে ইউয়ার্ট গ্লাডষ্টোন যত বিভিন্ন বনমানুষ বা বানর হইতে তাসমেনীয়ের পার্থক্য তত অধিক নহে। তুমি সাণ্ডুইচ বাসী রাক্ষসকে যীশুর ন্যায় মনুষ্য বলিয়া গণনা কর। তুলনা করিবার সময় বর্ব্বরের সহিত বানরের তুলনা কর, উভয়ের বুদ্ধি শক্তির সৌসাদৃশ্য কত অধিক বুঝিতে পারিবে। নিউটন ও গালিলিওর সহিত শিম্পাজির তুলনা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি, নিম্ন-শ্রেণী জীবের সর্ব্বোচ্চ ও উচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বাধম অনুরূপ। নতুবা ব্যাবৃতমস্তিষ্ক সভ্যের এবং অব্যাবৃত বানরের সাদৃশ্য সম্ভাবনা কোথায়? উভয় জীবের ব্যাবৃতির পার্থক্য আছে কিন্তু প্রকার ভিন্নতা নাই, বিবর্ত্তন-বাদী এই কথাই বলিয়া থাকেন।

যাঁহারা পশুপক্ষীর বিচার শক্তির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে সাহস করেন না যে উচ্চতর মানসিক শক্তি মনুষ্যের নিজস্ব সম্পত্তি। মানসিক বিকাশের মূলশক্তি সুখ দুঃখ অনুভব ক্ষমতা, ইহা মনুষ্যের ন্যায় পশু পক্ষীরও অধিকৃত। সুখ দুঃখ বোধ, ভয় সন্দেহ সাহস বিরক্তি, জীঘাংসা, দাম্পত্যপ্রেম, সন্তান বাৎসল্য, ভক্তি, লজ্জা অহঙ্কার ও গৌরবে পরিণত হয়। এই সকল গুণই পশুপক্ষীর মনে বিরাজিত। অনুসন্ধিৎসা আমাদিগের ন্যায় পশুপক্ষীরও আছে। অসাধারণের অনুভূতি আমাদের মত উহাদিগেরও আছে। অনুকরণ প্রিয়তা আমাদিগের ন্যায় উহাদিগের আছে। বস্তুবিশেষে মনোযোগ দিবার ক্ষমতা আমাদিগের ন্যায় উহাদিগের মধ্যেও বিভিন্নজীবে বিভিন্ন পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পশুর স্মৃতি-শক্তি আমাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। স্মৃতি হইতে কল্পনার উৎপত্তি। তোমার দ্বার দেশে সারমেয় নিদ্রাবস্থায় যখন সমস্ত-দেহ বিকম্পিত করে, মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া থাকে, তখন কে না বলিবে সে পূর্ব্ব দিনের মৃগয়া ব্যাপার স্বপ্ন দেখিতেছে? কল্পনাশক্তি না থাকিলে কি স্বপ্ন দেখিবার ক্ষমতা জন্মে? কেহ কেহ বলিবেন পশু পক্ষীর বিচারক্ষমতা নাই। সময়ান্তরে পশুপক্ষীর বিচার শক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন, শস্ত্রব্যবহার, ধন সংস্থান, গৃহনির্ম্মাণ, বাক্যকথনভাষা নিরপেক্ষভাব, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ধর্ম্মবিশ্বাস এ গুলি কেবল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার আদীম নিবাসী ও তাসমেনিয়-দিগের মধ্যে কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না, ইহারা যে মনুষ্য একথা সকলেই স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে বনশিম্পাঞ্জী বাদাম প্রভৃতি ভাঙ্গিবার জন্য পাথর ব্যবহার করিয়া থাকে। মার্কিন দেশে একটী পোষা বানর পাথর দিয়া বাক্স ভাঙ্গিত। কোন কোন শ্রেণী বন্য বানর ভারী দ্রব্য তুলি-

বার জন্য লাঠীর সাহায্য লয়। একদিকে নানাজাতীয় বর্ব্বরদিগের মধ্যে ধনজ্ঞান কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে কুকুর ও বায়সেরা যেরূপে আত্মোপার্জ্জন রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে পদার্থ বিশেষ তাহার নিজের এ জ্ঞানটী যে জন্মিয়াছে, বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিরূপে গৃহনির্ম্মাণ করিতে হয়, তাসমেনিয়েরা আদৌ অবগত ছিল না। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী গণ নিত্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিত; পক্ষান্তরে আগ্নেয়গিরিবহুল প্রদেশবাসী বানরগণ অগ্নিপ্লাবনে আত্মরক্ষা নিমিত্ত বৃক্ষশাখে মঞ্চ বাঁধিয়া তদুপরে বাস করে। আমরা যাহাকে বাক্যকথনভাষা বলি, আমাদিগের শিশুদিগেরও তাহা নাই। শিশু ও বর্ব্বরের ভাষা, ভাব প্রকাশক শব্দ মাত্র। পশুদিগের ভাষা ও সেইরূপ। যাহাদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা যায়, তাহাকেই ভাষা বলা যাইলে মূক দিগের ইঙ্গিত, শিশু ও বর্ব্বরের অর্দ্ধ ইঙ্গিত অর্দ্ধ কথাকে ও ভাষা বলিতে হইবে। ভাব প্রকাশক ভাষা পশুদিগেরও আছে, তাই স্বজাতীয় এক জনের চিৎকারে অন্যেরা সতর্ক বা সমবেত হয়। কোন কোন পশুর কোন ভাষার কোন অর্থ আমরাও গৃহপালিত পশুর বিভিন্ন স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু কিছু বুঝিতে পারি। ভাষা জীব মাত্রের সাধারণ সম্পত্তি। মানব প্রকৃতি নামক গ্রন্থে ভাষা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করা গিয়াছে, এখন আর নূতন কিছু বলিবার নাই। নিরপেক্ষভাব নানা অসভ্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে দয়া বা সৌজন্যতার কোন অভাব পশুরা ধারণ করিতে পারে না একথা সত্য নহে। সৌন্দর্য্য জ্ঞান পশুপক্ষীর মধ্যে কত অধিক, যৌননির্ব্বাচন আলোচনা করিবার সময় দেখান যাইবে। আমরা যাহাকে ধর্ম্মবিশ্বাস বলি, যাবতীয় পশুপক্ষীর ন্যায় নানা অসভ্য জাতির মধ্যেও তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে দৈব বিশ্বাস সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই অল্প বা বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার কারণ জানে না, অসভ্যেরা তাহাকেই দৈবে আরোপ করিয়া থাকে। এক সময়ে যাবতীয় ঘটনা দৈব বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, ক্রমে যে গুলির কারণ জানিতে পারা যায় সে গুলি ভিন্ন অন্য গুলি দৈব বলিয়া বিবেচিত হয়। দৈব ঘটনার পরিমাণ যত হ্রাস হইতে থাকে, দেবতার সংখ্যা ও তত অল্প হয়। সুতরাং দৈববিশ্বাসের মূলে অজ্ঞতা। আমরা অনুমান করিতে পারি, যখন অজ্ঞতার গাঢ় তিমির জ্ঞানালোকে কিছুমাত্র উদ্ভাসিত হয় নাই, তখন সকল ঘটনা ব্যাখ্যাকারী দেবতা মাত্রে ও মনুষ্যের বিশ্বাস ছিল না। ধর্ম্ম বিশ্বাস মস্তিষ্কের প্রকৃষ্ট ব্যাবৃত্তির ফল। মনুষ্য উৎপত্তির সহস্র সহস্র বৎসর পরেও মানুষের ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্বচিৎ দেখা যাইত। সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যাবৃত্তি ফলে মনুষ্য যাহা লাভ করিয়াছে, পশু পক্ষীর মধ্যে নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও মনুষ্যের সহিত পশু বুদ্ধির প্রকার সাদৃশ্য নাই, একথা বলিবার কোন কারণ নাই।

অন্যান্য শক্তির ন্যায় বিবেক শক্তিও ক্রম বিকাশ সাপেক্ষ। সুতরাং বিবেক শক্তি মানবের অসামান্য শক্তি বলিয়া গৌরব করিবার কোন অধিকার নাই। মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে ইতর বিশেষ এই মাত্র যে, যে শক্তি মনুষ্যে অধিক পরিমাণে বিকশিত সেই শক্তি অন্য প্রাণীদিগের কাহার

ও মধ্যে আদৌ অঙ্কুরাবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, কোন কোন প্রাণী বা মনুষ্যের সমান শক্তি লাভ করিয়াছে। নানা বর্ব্বর জাতির মধ্যে বিবেক শক্তির কিছুমাত্র বিকাশ হয় নাই, অথবা অতি অল্প পরিমাণে হইয়াছে, মানব প্রকৃতিতে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এমন অনেক দুর্বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের কিছুমাত্র বিবেক শক্তির আভাস পাওয়া যায় না। হয়, তাহাদিগের মনে সে শক্তি আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই, অথবা হইয়াছিল, এখন লোপ পাইয়াছে।

বিবেক শক্তির বিকাশ সমাজ মধ্যে। যখন এক একজন স্বতন্ত্র ভাবে দিগ্‌দিগন্তে বিচরণ করে, তখন নিজের যাহা ভাল লাগে সে তাহাই করে। বাধা দিবার কেহ নাই, আপত্তি করিবার কেহ নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই; আমার স্বার্থ সাধনে তখন অন্য কাহার ক্ষতি হয় না। নানা কারণে ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণী বাস করে। সমাজ বন্ধনের প্রধান কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, একাকী পাইলে শত্রুগণ আমাকে যত সহজে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে, যখন দশজনে একত্র হইয়া বাস করি, আমাকে আক্রমণ করিলে অন্যেরা আমার পক্ষ সমর্থন করে, তখন শত্রুর আক্রমণ বিফল হইবার সম্ভাবনা হয়। এজন্য দল বাঁধিবার ফল অনুভব করিবার শক্তি জন্মিলেই সকলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চেষ্টা করে। একাকী ভ্রমণ কালে সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে, ক্রমে পরিবার বদ্ধ হইলে আপন স্বেচ্ছাচার সেই পরিমাণে ন্যূন করিতে হয়, যে পরিমাণে পরিবারের স্বার্থ তাহার বিরোধী। এই অবস্থায় বিবেক শক্তির সীমা গৃহ প্রাঙ্গণ। পূর্ব্বে যাহাতে আমার অসুখ হইত তাহাই করিতাম, যাহাতে আমার অসুখ হইত তাহাই মন্দ বলিতাম, পরিহার করিতাম। কখন ও বা সাময়িক উত্তেজনায় যাহা মন্দ বলিয়া জানিতাম তাহাও করিতাম, কিন্তু শেষে গতানুশোচনা পরন্তন যন্ত্রনা তাহার মন্দত্ব আরো অধিক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলে আর সেদিকে অগ্রসর হইতাম না। ক্রমে যখন পরিবার বদ্ধ হইলাম, তখন নিজের সুখাসুখে ভাল মন্দের যথেষ্ট পরীক্ষা হইত না। পূর্ব্বে যে কার্য্য হইতে পরন্তন যন্ত্রণা-স্মৃতি আমাকে নিবৃত্ত করিত, এখন পরিবারের নিন্দা তাহা অপেক্ষা আরো অনেক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমার সুখ আমার ভালর বিচারক ছিল, এখন পরিবারের যাহাতে সুখ হয়, তাহাই ভাল বলিয়া সেই মত কার্য্য করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে আপনা ভিন্ন আর কাহার ভালর সন্ধান রাখিতাম না, এখন পরিবার ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখি না। আপন পরিবার সুখী করিতে অন্য পরিবারের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম না। অন্য পরিবারের প্রতি অত্যাচার ব্যভিচার বিশ্বাসঘাতকতা প্রবঞ্চনা নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ ভাল, যদি সে কার্য্যে আমার পরিবারের সুখ হয়। যখন দলবদ্ধ হইলাম, সমাজ বাঁধিলাম, তখন ভালর সীমা আর একটু প্রশস্ত হইল। এখন কেবল পরিবারের সুখ লক্ষ্য করিলে যথেষ্ট হয় না, আমার যে কার্য্যে আমার সমাজের কাহারও ক্ষতি হয়, সে কার্য্য মন্দ, আর আমার যে কার্য্যে আমার পরিবারের ও সমাজের উপকার, অন্তত ইহাদিগের কাহারও ক্ষতি না

হয়, তাহাই ভাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। পূর্ব্বে আমার মনের গঞ্জনা আমাকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিত, মাঝে পরিবারের ধিক্কারে নিবৃত্ত হইতাম, এখন সমাজের স্তুতি নিন্দা আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ হইল। পূর্ব্বে আপন পরিবারের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার অন্যায় মনে করিতাম না, এখন আপন সমাজের অতীত অন্য সমাজের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হই না, বরং তাহাতে আপন সমাজের সম্পদ সম্ভ্রমের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইলে তাহা পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণনা করি, ক্রমে মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি যত বৃদ্ধি হয়, দেশের অন্যান্য সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের উপর আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে বুঝিতে পারি, তখন আপন সমাজ অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য আর দেশের যাহাতে ক্ষতি তাহাই অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি। সভ্য য়ুরোপের অনেক দেশ এখনও এই অবস্থায় অবস্থিত, আপন দেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা সাধন করিতে ভিন্ন দেশের কোন ক্ষতি হইলে লোকে তাহা অন্যায় বলিয়া মনে করে না। কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধি ক্রমে যত উন্নত হইবে, কর্ত্তব্যের সীমা ক্রমে তত প্রখর হইতে থাকিবে। শেষে সমস্ত পৃথিবীর যাহাতে মঙ্গল তাহাই কর্ত্তব্য এবং পৃথিবীবাসী অধিকাংশের যাহাতে ক্ষতি তাহাই অমঙ্গল বলিয়া গণ্য হইবে। আবার পূর্ব্বে আপন কষ্ট, পরে অন্যের নিন্দা, যাহা পাপ বলিয়া মনুষ্যকে নিবৃত্ত করিত, দেশে শাসন প্রণালী প্রচলিত হইলে রাজদণ্ড তাহার নিবৃত্তি করিতে সাহায্য করে। শেষে কেহ না জানিতে পারিলেও কাহারও ক্ষতি হয়, আপন মনোমধ্যে এমন চিন্তা পোষণ করিতেও মন পরাবৃত্ত হয়। বিবেকের সেই ঊর্দ্ধ সীমা।

সুতরাং মনুষ্য ইতর প্রাণীর ন্যায় যতদিন স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিত, ততদিন বিবেকশক্তি মনুষ্যের ছিল না, এ কথা বলা অতিশয়োক্তি নহে। মনুষ্য স্বতন্ত্রভাবে একদিন যে বাস করিত, পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে তাহা প্রমাণ করা গিয়াছে। যখন মনুষ্য কেবল পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিত, তখন মনুষ্যের বিবেকশক্তি অতি সামান্য ছিল। আর যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, তাহারাও অন্য সমাজের প্রতি কতদূর গর্হিতাচরণ ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করে, মানব প্রকৃতি গ্রন্থে তাহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত প্রচলিত আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ বর্ব্বর জাতির বিবেক বুদ্ধি এত অল্প, তাহার সহিত যে সকল পশু পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের বিবেক বুদ্ধির তুলনা করিলে উহাদিগের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। কাক, পারাবত প্রভৃতি পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। শৃগাল প্রভৃতি পশু দলবদ্ধ হইয়া শীকার করে। হরিণ, মহিষ ও হস্তিগণ জঙ্গলে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। চরিবার সময় তাহারা প্রহরী রাখিয়া দেয়। বানরেরা বড় দলভক্ত। আবার যেখানে একজন বানর অক্ষম, সেখানে পাঁচ সাতজনে মিলিয়া গুরুভার কাষ্ঠ বা প্রস্তর উঠাইয়া তাহার ভলবাসী কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে দেখা হইয়াছে। কাকেরা অপরাধীদিগকে দলবাঁধিয়া সাস্তি দেয়। কটকে একটী বানর দেখিয়াছিলাম, সে কি অপরাধ করিয়াছিল, এখন স্মরণ হয় না; তাহার দলের

সকলে মিলিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া যেরূপ শাস্তি দিয়াছিল, তাহা কোন দিন ভুলিব না। বানরেরা শাস্তিস্বরূপে অপরাধীদিগকে একঘরে করিয়া রাখে। মানব প্রকৃতিতে দেখান গিয়াছে যে, সকল বানর জড়াজড়ি করিয়া কুণ্ডলী বাঁধিয়া শুইয়া থাকে, সেই কুণ্ডলী বাঁধিবার সময় উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে আর তাহাকে কুণ্ডলীমধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। সে সমস্ত রাত্রি শীতে কাঁপিতে থাকিলে, যন্ত্রনায় চীৎকার করিলেও তাহার ক্ষমা নাই। সময়ে উপস্থিত না থাকিবার এমন দণ্ড মনুষ্য সমাজে দেখা যায় না। দণ্ডের প্রাবল্য দেখিলে কে না বলিবে বানরেরা আপন সমাজের অনভিপ্রেত কার্য্য করিতে সাহস করে না এবং এইরূপ কার্য্য যে অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহারই বা সন্দেহ কি?

বালকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। সে কাহারও তক্কা রাখে না। দারুণ স্বার্থপর, তাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিবে, অন্যের তাহাতে ক্ষতি হয় কি না হয়, সে দেখিবে না, যাহাতে আপনার কষ্ট হয় কেবল সেই কার্য্য সে করে না। কিসে কষ্ট হয় প্রথমে সে জানিত না, ঠেকিয়া শিখিয়াছে। তাহার একটী আবার ভাল লাগিয়াছে, সে তাহার সব খাইবে—পিতা মাতার তাহা খাইতে ইচ্ছা রহিয়াছে দেখিয়াও সে পিতা মাতাকে বঞ্চিত করিবে। ক্রমে পিতা মাতা ও পরিজন মিষ্টবাক্যে উপদেশচ্ছলে তাহাকে শিক্ষা দেন, এইটী করিও, এইটী করিও না। বালক প্রবীণ হইল, পিতা মাতার পরিবর্ত্তে সমাজ, মধুরতার পরিবর্ত্তে কঠোর ভাব, নিন্দার পরিবর্ত্তে দণ্ডদিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা দেয়। বালক যেরূপে কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করে, সকল মনুষ্যই সেইরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। প্রভেদ এই, সভ্য বালক উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা লাভ করে, বর্ব্বরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না, তাহা পাইতে হইলে তাহাকে দূরদর্শনের সাহায্য লইতে হয়।

বস্তুতঃ অন্যান্য জীবের সহিত মনুষ্যের শারিরীক বা মানসিক প্রকৃতির কোন প্রকার ভিন্নতা নাই। অন্যান্য জীব যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যও সেইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যের স্বতন্ত্র সৃষ্টি অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। স্বতন্ত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। বিবর্ত্তনবাদ যে যুক্তিসঙ্গত, ইহাই প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইল মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যোৎপত্তির সূচনা কত কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে, কে গণনা করিবে? চিন্তা করিতে অনন্তের অনন্ত প্রসারিত হয়। জ্ঞানবিহীন, ইন্দ্রিয়বিহীন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন কীটাণু কীট মনুষ্যের আদিপুরুষ স্বীকার করিতে কেহ লজ্জা অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু পদদলিত ধূলিকণা অপেক্ষা কি জীবনশক্তি সম্পন্ন কীটাণু শ্রেষ্ঠ পদার্থ নহে?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

প্রজা ও ভূম্যধিকারীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

পাঠকগণ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা জমিদার এবং প্রজার মধ্যে এখন কি করিতে বাসনা করি, তবে আমাদিগের উত্তরে তাঁহারা যে কতদূর সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সন্তুষ্ট হউন, আর অসন্তুষ্টই হউন, নিজের মনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ করি, তাহা স্পষ্ট না বলিয়া থাকিতে পারি না। তবে আমাদের মত প্রকাশের পূর্ব্বে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেশের যে উপকার হয় নাই, এরূপ আমাদের মত নহে, বরং উক্ত বন্দোবস্ত দ্বারা তৎকালীন দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাই বলিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে যে কোন বিশেষ অনিষ্ট হইত, এবং দেশ একেবারে রক্ষা পাইত না, আমরা এরূপ কিছুই মনে করি না। কিন্তু সে পুরাতন কথা লইয়া আমরা তর্ক করিতে চাহি না; আমরা স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে ভূস্বামিত্ব প্রদান করিয়া চুক্তি করিয়াছিলেন, আমরা স্বীকার করি, ঐ চুক্তি অনুসারে জমিদার সমুদয় শস্যের জমিতে পুকুর করিতে পারেন এবং সমুদায় জলাশয় ভরিয়া শস্যের জমি করিতে পারেন; এবং সামান্য কৃষি প্রজাকে ইচ্ছামত সমুদয় জমি হইতে বেদখল করিতে পারেন; এ সমুদয় স্বীকার করি। কিন্তু আইন এক কথা, চুক্তি এক কথা, ন্যায় আর এক কথা। আমেরিকায় যখন মানুষ অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত, তখন তাহাদের সে কার্য্য কি আইনানুমোদিত ছিল না? আইন কোন দিন এ পৃথিবীতে অভ্রান্ত নয়, এবং আইনতঃ কার্য্যও যে ন্যায়ানুমোদিত না হইতে পারে, ভারতবাসী পাঠককে আর সে কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মনে করুন, যদি গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন আইন করেন যে হাজার টাকা যাহার আয় আছে, সে তাহাপেক্ষা কম আয়ের লোককে গুরুতর আঘাত করিলে কোন শাস্তি পাইবে না; এবং কয়েক বৎসর পর, যদি কেহ উক্ত প্রকার আইনকে অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করে, তবে তাহা কি পরিবর্ত্তিত হইবে না? গবর্ণমেণ্ট জমিদারদের সহিত যদি এরূপ কোন চুক্তি করিয়া থাকেন যে, তাহার অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে, দেশের শান্তি এবং উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত না করিলেই চলে না, তবে কি সে চুক্তি বলবৎ রাখা উচিত? তবে এই চুক্তিভঙ্গের জন্য যে গবর্ণমেণ্টের কতক ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক, এ বিষয় আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

আমাদের প্রস্তাব যে, জমিদারদিগের এবং নীচস্থ হকিয়তদারের সমুদয় স্বত্বলোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভূস্বামী হউন, এবং কৃষি প্রজাকে রায়ত করিয়া এক প্রকার বন্দোবস্ত করুন; এরূপ বন্দোবস্ত না হইলে ভূস্বামী এবং প্রজার মধ্যে আইন দ্বারা শৃঙ্খলা সংস্থাপন অসম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেহ কাহারো অধীন হইয়া চলিতে চাহে না; দেশের সম্বন্ধে জমিদারের যে অধিকার, আমি সামান্য প্রজা আমারও সে অধিকার; ভূমিতে চাষ করা, ভূমি ভোগ করা আমার ঈশ্বরদত্ত স্বত্ব; ইহা

হইতে আমাকে কোন রাজা, কোন সমাজ বঞ্চিত করিতে পারেন না। সুতরাং জমিদার আমাকে কেন উচ্ছেদ করিবেন, কেন আমার স্বাধীন ভোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবেন? তাঁহাকে এ ক্ষমতা কে দিল, এ ক্ষমতা দিবার কাহার অধিকার আছে? প্রজাগণ যত শিক্ষিত হইবে, ততই তাহারা এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে থাকিবে। এ আন্দোলনের দ্বারা যে কি ফল হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের দশজনের কার্য্যের প্রতি সাধারণতঃ একপ্রকার সম্মান থাকে, তারপর সেই দশ জনের এক জন যদি আমি হই, তবে সে দশজনকৃত একটী অত্যাচার নিজের কৃত কার্য্য বলিয়াই অনেক সময় অবনত মস্তকে বহন করি। কোন স্বাধীন রাজ্যের এক জন প্রজা গবর্ণমেণ্টের কোন মীমাংসার বিরুদ্ধে তর্ক করিবে, মীমাংসা অন্যায় হইলে তাহার বিষয় লোককে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু প্রাণান্তেও সে মীমাংসায় অবহেলা করিবে না; কারণ যে দশ জনের হাতে শাসনদণ্ড, তাহার মধ্যে সেও একজন; যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ তাহার প্রতি সেইরূপ অন্যায় কোন অত্যাচার করেন, তবে সে ব্যক্তি তাহা কখনই স্থির ভাবে সহ্য করিতে পারিবে না। আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন অত্যাচার হইলে প্রজা তাহা যত সহজে সহ্য করিবে, রাজ্যের আর এক শ্রেণী প্রজার হাতে সে অত্যাচার তাহারা কখনও স্থির ভাবে সহ্য করিবে না।

জমিদারী প্রথা প্রচলিত থাকিলে পত্তনি বিলি, পেটাও বিলি, জোত বিলি, কখনও বন্ধ রাখা যাইবে না, নীচস্থ হকিয়তদার অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর প্রজা যত বৃদ্ধি হইবে, কৃষক প্রজার অসুবিধার ভাগ তত বৃদ্ধি হইবে; আর যে স্থানের কৃষক প্রজা বলবান্, লাঠি সুল্‌পী চালাইতে জানে, সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা, অসৌহার্দ্দ্য, খুন জখম, মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেই। বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুর বঙ্গদেশের মধ্যে দুইটী প্রধান দাঙ্গাবাজ প্রজার বসতি স্থান; পাঠকগণ একবার এই দুই জেলার প্রতি দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবেন, আমাদের কথায় কত সত্য আছে। এই দুই জেলায় প্রজা এবং মধ্য শ্রেণীর ভূম্যধিকারী দুই দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক দল অপর দলকে নির্যাতনের চেষ্টা করিতেছে। তবে যদি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের প্রস্তাবানুসারে, সমুদায় জমিদারের হাত হইতে পেটাও বিলির ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয়, এবং সমুদয় প্রজাকে নিজের ভূমি হইতে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা জমিদারের হাতে না দেওয়া হয়, এবং সমুদয় বিষয় সরকারী লোকের দ্বারা মীমাংসা হয়, তবে জমিদারের অস্তিত্ব ঢেরাসহি মাত্র; তিনি তখন গবর্ণমেণ্টের এক জন কর সংগ্রাহক কর্ম্মচারী মাত্র। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবে আর তাঁহাদের প্রস্তাবে প্রভেদ নাই।

তারপর ভূমির নিরবচ্ছিন্ন কর বৃদ্ধি করাকে আমরা দেশের কৃষির উন্নতির একটী গুরুতর অন্তরায় বলিয়া মনে করি। জমিদার যখন ভূস্বামী, তখন তাহার প্রতি অন্যায় না করিয়া এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হাত দিবার অধিকার কি? আর গবর্ণমেণ্ট হাত না দিলেই বা তাহাদের কে রক্ষা করে? এই সমুদয় বিকল্পাবস্থা দেখিয়াই আমরা এরূপ প্রস্তাব করিতেছি।

আজ কাল সকলেই এ কথা বুঝিতে

পারিতেছেন যে, প্রজা যত দিন নিজের পরিশ্রমোৎপন্ন ফল নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে না পারে, এবং যত দিন পর্য্যন্ত তাহার দখলী ভূমি তাহার নিজের বলিয়া মনে করিতে না পারিবে, ততদিন তাহারা কৃষির উন্নতির নিমিত্ত সম্যক্ প্রয়াস পাইবে না; আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ কথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই প্রকারান্তরে জমিদারকে তাহার চুক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রজার ন্যায়তঃ স্বত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট নিজের দায়িত্ব হইতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করিতে গিয়া যে অপরকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন, অথচ তাহার ক্ষতিপূরণে একটী পয়সাও দিবেন না, আমরা সে অন্যায় কথায় মত দিতে পারি না।

যদি বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হয়, তবে মধ্য শ্রেণীর প্রজার অস্তিত্ব অতি অল্প কালের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। তারপর কেবল জমিদারের স্বেচ্ছাধীন কৃষক শ্রেণী বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাদিগকে বাকী খাজানার ছুতা ধরিয়া জমিদার যখন তখন উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। আমরা বর্ত্তমান আইনে দেশের গুরুতর অনিষ্ট আশঙ্কা করি।

বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে দেশের অনিষ্ট আশঙ্কা করি, বর্ত্তমান আইন সমূহ দ্বারাও আর শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না, দেখিতে পাইতেছি; আর ভূস্বামীর স্বত্ব বজায় রাখিয়া প্রজাকে তাহার পরিশ্রমোৎপন্ন ফল ভোগের অধিকার দেওয়া যে সম্ভব, তাহাও আমাদের বুদ্ধিতে আসে না; কাযেই আমরা সমুদয় হকিয়ত দারের স্বত্ব খরিদ করিয়া লইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছি।

আমরা যে প্রস্তাবটী করিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না? এ সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে হইলে, নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত।

ক—এখন সমুদয় হকিয়তের স্বত্ব খরিদ করিতে যত টাকা দরকার, তাহা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন কি না?

খ—এরূপ স্বত্ব ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের আয় বিভাগের কোন অনিষ্ট হইবে কি না?

গ—প্রজা খাস তহশীলে সুখী হইবে কি না?

আমরা এই কয়েকটী বিষয় ক্রমে ক্রমে বিবেচনা করিব।

১৮৯, ৮৩৭ বর্গ মাইল বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সির অন্তঃর্গত; তন্মধ্যে ৩৩৬৩৪ এবং ২৬০০ বর্গ মাইল করদ এবং মিত্ররাজ্যের অন্তঃর্গত, তদ্বাদে ১৫০৬০৩ বর্গ মাইল বা ৯৬৩৮৫৯২০ একার ভূমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন স্থায়ী, অস্থায়ী এবং খাস মহলে বিভক্ত।

বঙ্গ, বিহার ও উৎকল প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভূমির ভিন্ন ভিন্ন দর। বঙ্গদেশে প্রতি একর ৸০ হইতে ২১৲ টাকা হারে বিলি হইয়া থাকে; উড়িষ্যার নিম্ন হার বঙ্গীয় ভূমির ন্যায় হইলেও রায়তি জমির সর্ব্বোচ্চ হার কখনও ১৫৲ টাকার উপরে যায় না; ছোট নাগপুরে ৪৷৷০ টাকার উপর নয়, কিন্তু কোন দেশেই এই উচ্চ হারের ভূমির সংখ্যা শত করা ৫ পাঁচের অধিক হইবে না, বোধ হয় পাঁচও হওয়া সম্ভবপর নয়; তথাপি কম হারে হিসাব না করিয়া আমরা সর্ব্বোচ্চ

হারে পাঠকগণকে হিসাব দেওয়া উচিত মনে করি। এখন আমরা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই তিন প্রদেশের গড়ে ৸০ আনা হইতে ১৪৲ টাকা দরে প্রতি একর প্রজার নিকট বিলি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কম দরের জমি শত করা ৯৫ এবং বেশী দরের জমি শত করা ৫৲; আমরা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে উচ্চ রেট লিখিলাম, তাহা কেবল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান, বাখরগঞ্জ, এবং বারুয়ের বরজ ব্যতীত অপর কোন স্থানে কেহ দেখিতে পাইবেন না। সমুদয় মহলের পতিত এবং হাসীল জমি যদি আমরা গড়ে ২৲ টাকা বিঘা অথবা ৬৲ টাকা একর হিসাব করি, তবে কিছু বেশী ছাড়া কম ধরা হইবে না।

যদি ছয় টাকা হারে খাজনা ধরা যায়, তবে ৯৬৩৮৫৯২০ একর ভূমির কর ৬৲ হিসাবে ৫৭৮৩১৫৫২০; ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের আয় এবং জমিদারদিগের সদর খাজনা ৩,৭৮,৬১,৯২৫, বাদ দিলে ৫৪০৪৫৩৫৯৫ টাকার ক্ষতি পূরণ গবর্ণমেণ্টেকে দিতে হইবেক।

কোন হকিয়ত পাঁচগুণ, কোন হকিয়ত ১০ গুণ এবং কোন কোন হকিয়ত বা ৩০ গুণ মূল্যের হইবে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মোটের উপর ১৫ গুণের অধিক ক্ষতি পূরণ দেওয়া আবশ্যক হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। ৫৪,০৪, ৫৩,৫৯৫ টাকার ১৫ গুণে ৮১০, ৬৮,০৩, ৯২৫ টাকা গবর্ণমেণ্টের দিতে হইবে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের ঋণ ৯০ কোটী টাকা। বর্ত্তমান ঋণের প্রায় ৯গুণ টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ করিতে পারিলে দেশীয় সমুদয় ভূম্যধিকারীর স্বত্ব খরিদ করিয়া লইতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে এত টাকা কর্জ্জ করা সম্ভবপর হইবে না, তাহা আমরা জানি, এত টাকা ভারতবর্ষে কর্জ্জ করিতে হইলে কোম্পানির কাগজ শতকরা ৫০৲ টাকায়ও কেহ খরিদ করিবে না। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে এ পরিমাণ টাকা কর্জ্জ করা তত কষ্টকর হইবে, আমরা তাহা মনে করি না। তারপর জমিদারদিগকে যদি শতকরা ৪৲ টাকা সুদের কাগজে অর্দ্ধেক মূল্য প্রদান করা যায়, তাঁহারা ও যে অস্বীকার করিবেন, আমরা এরূপ মনে করি না। তারপর সমুদয় মহলই একদিনে এক ঘণ্টায় যে গবর্ণমেণ্ট হাতে লইবেন আমরা এরূপ কিছু বলিতেছি না, গবর্ণমেণ্ট যদি ২৭ বৎসরে সমুদয় মহল হাতে লইবেন ঠিক করেন, তবে প্রতি বৎসরে ত্রিশ কোটী টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক হইবে, এবং ৬০বৎসরের মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইতে পারিবে, এ হিসাব আমরা পরে দেখাইব। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রতি বৎসর ৩০ ক্রোড় টাকা কর্জ্জ করা যে বিশেষ একটা গুরুতর অসুবিধার বিষয়, আমরা তাহা বোধ করি না; বিশেষতঃ যে কার্য্য উপলক্ষে এই টাকা লওয়া হইবে, তাহা যে গবর্ণমেণ্টের অলাভের কাজ নহে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ফরাসী, মিসর, স্পেন, পর্ত্তুগেল অক্লেশে রাশি রাশি টাকা ইংলণ্ড নিকট হইতে ধার লইতেছেন, আর ভারতবর্ষই কি একেবারে পচিয়া গেল? আমাদের বিশ্বাস, বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট খরিদদার উপস্থিত থাকিলে অপর অপেক্ষা অনেক আদরে টাকা পাইতে পারিবেন। সুতরাং আটশত দশ ক্রোড় টাকা আজ দেখিতে যতই বড় দেখা যাউক না কেন, উহা লওয়া যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে

অসম্ভব, আমরা তাহা মনে করি না।

খ—বিলাতের গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩৲ সুদে আজ টাকা কর্জ্জ করিলে অনেক বেশী প্রিমিয়মে টাকা কর্জ্জ করিতে পারেন। সে স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৪৲ সুদে টাকা কর্জ্জ করিলে নিদেন সমান২ কর্জ্জ পাইবেন এমন আশা অন্যায় নহে। উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা যদি শতকরা ৪ হারে কর্জ্জ করিতে হয়, তবে প্রতি বৎসর ৩২৪২৭২১৩৬ টাকা সুদ দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত রাজস্ব বাদে আয় ৫৪০, ৪৫৩৫৯৫ হইতে উক্ত সুদের টাকা বাদ দিলে ২১৬১৪৫৯ থাকে, তাহা হইতে মোট তলব ৫৭, ৮৩, ১৫, ৫২০ টাকার তহশিলী বন্দোবস্তী ও উৎকর্ষ সম্পাদনের খরচ শতকরা ১০৲ হিসাবে ৫,৭৮,৩১,৫৫২ টাকা বাদ দিলে ১৫, ৮৩, ২৯, ৯০৭ টাকা বাকী আয় থাকে; এ হিসাবে ৫৪ বৎসরে সমুদয় সুদ পরিশোধ করা যায়, তবে যদি দেশে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের কর আদায় সম্বন্ধে কিছু অসুবিধা হইতে পারে, এই নিমিত্ত আমরা আরো ছয় বৎসর অধিক হিসাবে ধরিলাম। তহশিলী বন্দোবস্তী প্রভৃতি খরচ বাবদ শতকরা ১০৲ হার ধরিয়াছি, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের তহশীল খরচ শতকরা ৬—৯ টাকা মাত্র। সুতরাং শতকরা দশ টাকায় সমুদয় খরচ নির্ব্বাহ হওয়া খুব সম্ভব। সুতরাং আমাদের এ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে বর্ত্তমান আয় স্থির রাখিয়া ৬০ বৎসর পরে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৫০ ক্রোড় টাকা আয় বৃদ্ধি হয়। এই প্রস্তাবের আবার একটা অপকারের দিকও আছে, এই ষাটবৎসর পর্য্যন্ত যে ৩২ক্রোড়ের অধিক টাকা দেশের লোকের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিত, তাহা গিয়া সুদ স্বরূপ বিদেশীয়দিগের কবলস্থ হইবে। কিন্তু জমিদার মহাশয়েরা যদি নগদ টাকা না লইয়া ৬০ বৎসরের মেয়াদি সরকারি ঋণ পত্র গ্রহণ করেন, তবে আর অসুবিধা থাকিতে পারেনা; এবং তাহাতে তাঁহাদের অনেকের মুনফা কিছু মাত্র কমিবে না। সম্প্রতি তাঁহাদের আবওয়াব বাজে জমা সমুদয় একত্র করিয়া শতকরা ৪৫৲ টাকা হিসাবে পড়িবে না; তবে মধ্যশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হকিয়তদার যদি নগদ টাকা চাহে, তাহার পরিমাণ ঋণ বোধ হয় দেশ হইতেই উঠাইয়া দেওয়া যায়; তারপর যদি দেশের লোক নিজদিগের ভাল মন্দ না বুঝিয়া একগুয়ে হইয়া সমুদয় টাকা নগদ লইতে চাহে, তবে স্থায়ী উপকারের সহিত ৬০বৎসরের অল্পদিন স্থায়ী অপকার তুলনা করিলে আমরা তাহাতেও বিশেষ আপত্তি করিবার বিষয় কিছু দেখিতে পাই না।

গ—এখন দেখা যাউক খাস তহশীলে প্রজা সুখী হইবে, কি অসুখী হইবে।

সম্প্রতি যে সমুদয় খাস মহল আছে, তাহাতে প্রজাগণের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়া থাকে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; অনেক স্থলের তহশীলদার প্রজার নিকট দুই পয়সা না পাইলেই বাকী জায় প্রস্তুত করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন, কালেক্টর সাহেব ঐ বাকীজায় দপ্তর দাখিল করিয়া প্রজার নামে সার্টিফিকেট দেন, নোটিস জারি করার কর্ত্তাও তহশীলদার মহাশয়, সুতরাং অনেক সময়ই সে সমুদয় নোটিস তফাৎ হয়, তার পর কয়েক দিন পরে যখন গরিব প্রজার মাল বাটী ক্রোক হইয়া বিক্রয় হয়, তখন

অকস্মাৎ এরূপ নিলামের কারণ সে কিছুই খুজিয়া পায় না। তার পরে গরিব চাষা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে আবার তহশীলদারের নামে মামলা করিতে আসিবে, তাহার পক্ষে সে বড় সহজ কথা নহে। এরূপ আরো দু চারিটী অত্যাচার আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এরূপ অত্যাচার জমিদারের মহলেও হইয়া থাকে, এটী খাস মহালের কোন একটা অতিরিক্ত অত্যাচার নহে, জমিদারের উপর বরং মেজেষ্ট্রেট সাহেব যত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাঁহার নিজের অধীন তহশীলদারের উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন; সুতরাং এ প্রকারের অত্যাচারে আমরা খাস তহশীলের বিশেষ দোষ মনে করি না।

প্রজার সম্বন্ধে খাস তহশীলের যে সমুদয় গুণ আছে, জমিদারের অধীন তহশীলে সে সমুদয় অসম্ভব। জমিদার ভূস্বামী, ভূমি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে কোন আইন করুন না কেন, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কিছুই করিতে পারেন না; কিন্তু খাস তহশীলের নিয়ম গবর্ণমেণ্ট যখন ইচ্ছা তখন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। জমিদারের অধীনে কৃষি প্রজার এক রেটে ভূমি ভোগ করা অসম্ভব, কিন্তু খাস তহশীলে তাহা সম্পূর্ণরূপ সম্ভবপর।

উল্লিখিত সমুদয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, গবর্ণমেণ্ট দেশের সমুদয় ভূস্বামীর স্বামিত্ব স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া মধ্য শ্রেণীর হকিয়তদারদিগকে একেবারে যদি দেশ হইতে উঠাইয়া দেন, তবে দেশের মঙ্গল ব্যতীত কিছুই অমঙ্গল হইবেক না।

আজ এই গুরুতর বিষয়ে অগ্রসর হইয়া হস্তক্ষেপ করেন, আমদের রাজপুরুষদিগের মধ্যে এরূপ কেহই নাই। যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এত দূর অগ্রসর হইবেন কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষীয় রাজ সভায় প্রকৃত পক্ষে ভারতবাসী প্রজার প্রতিনিধি কেহই নাই; সুতরাং বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিই যে অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হইয়া বিধিবদ্ধ হইবে, এরূপই বোধ হইতেছে; কিন্তু যদি প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়, তবে আজ লর্ড কর্ণোয়ালিস, এবং সারজন সোরকে কেবল এক শ্রেণীর লোকে নিন্দা করিতেছে, কতিপয় দিবসের মধ্যে বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এবং তাহার সভাস্থ সকলে আপামর সাধারণের নিকটই নিন্দার পাত্র হইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাতে সায় দেন, তবে তাহাকেও নিন্দার ভাগ বহন করিতে হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

এরিয়েল ও যক্ষ।

"Where the bee sucks, there lurk I ;
In a cowslip's bell I lie :
There I walk, where owls do cry ;
On the bat's back I do fly,
After summer, merrily.
Merrily, merrily, shall I live now,
Under the blossom that hangs on
the bough."

"মন্দং মন্দংনুদতি পবনশ্চানুকুলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদদতি মধুরং চাতকস্তেসগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচান্নুনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তেনয়নসুভগংখেভবন্তং বলাকাঃ॥"

এরিয়েল কে? যাহারা সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটক পড়িয়াছেন, তঁহাদের পক্ষে এ কথা পুরাতনের পুরাতন, তবুও "এরিয়েল কে" এ কথার উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া উচিত বোধ করিলাম।

এক স্থানে প্রস্পেরো এরিয়েলকে বলিতেছেন,—

"গর্ভবতী ডাকিনী সাইকোরাক্সকে নাবিকেরা এই স্থানে ছাড়িয়া যায়। দাস, তোর সম্বন্ধে তুই নিজেই বলিয়াছিস্, তাহার বিলাস বাসনা ও জঘন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিতে বিশেষ উপযুক্ত প্রেতাত্মা ছিলি বলিয়া, তোকে তখন তাহার ভৃত্য হইতে হইয়াছিল। তাহার দুর্দ্দান্ত আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায়, অপ্রতিকার্য্য ক্রোধ বশতঃ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের সাহায্যে, সে তোকে একটা দ্বিধাবিভক্ত দেবদারুগাছের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখে। সেই গাছের ফাটালে অতি কষ্টে, অতি দুঃখ যন্ত্রণায় বার বৎসর কাল কাটাইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে সেও মরিয়া গেল। তুই সেইখানেই পড়িয়া থাকিলি। সেখানে থাকিয়া যাতনায় ও ক্লেশে জাঁতাকলের চাকার শব্দের মত ঘন ঘন চীৎকার করিতিস্। তখন এই দ্বীপ, সেই ডাকিনী এখানে যে এক চিতাবাঘের ন্যায় ডাইন সন্তান প্রসব করিয়াছিল, তাহারই জন্য পড়িয়া রহিল। সে সময়েও মানুষের পাদস্পর্শে এস্থান সম্মানিত হয়নাই।"

আবার প্রস্পেরো এরিয়েলকে বলিতেছেন ;—"ওরে মূর্খ আমি তাই বলিতেছি! সে এই কেলিবান্ (Calibon)। এখন আমারই সেবায় তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছি। তুই বেস জানিস্, তোকে আমি কি ভয়ানক শঙ্কটে দেখিয়াছিলাম! তোর যাতনার চীৎকারে বনের বাঘ কাঁদিতেছিল, চিররুষ্ট ভল্লুকের প্রাণ সূচিবিদ্ধ হইতেছিল। স্বয়ং পাপিয়সী ডাকিনী সাইকোরাক্স্ এ সঙ্কটে পুনরায় আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ। এ আমারই ক্ষমতাধীন বিষয়। আমি যখন এই দ্বীপে পদার্পণ করিলাম, তোর চীৎকার শুনিলাম, তখন সেই দেবদারুর কোটর খুলিয়া দিলাম এবং তোকে বাহির করিলাম।"

এরিয়েল কে? চিনিলাম। এরিয়েল একটী প্রেত-আত্মা। আলজিরিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ডাইন সাইকোরাক্স্ ইহাকে মায়ামন্ত্রে বশীভূত করিয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত করে। তাহার পার্থিব বিলাস ও দুরভিলাস পূরণের পক্ষে ইহার বিশেষ

উপযোগিতা ছিল। আদেশ লঙ্ঘন করাতে সে এরিয়েলকে দেবদারু গাছের ফাটালে বন্দী করিয়া রাখে। তাহার মৃত্যুর পরেও এরিয়েল সেই অবস্থাতেই থাকে। বার বৎসর যাতনা ভোগ করিলে, প্রস্পেরো যখন এই দ্বীপে আসিলেন, তখন তিনি দয়া করিয়া ইহাকে গাছের গহ্বর হইতে বাহির করিলেন। কিন্তু এক বারে স্বাধীনতা দিলেন না। আপনার কাজের জন্য তিনিও এরিয়েলকে ইন্দ্রজাল মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। এরিয়েল এখন প্রস্পেরার ভৃত্য।

এরিয়েলের বাহিরের পরিচয় কিছু কিছু পাইলাম। ভিতরের পরিচয় চাই। এক স্থানে এরিয়েল প্রস্পেরোকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছে ;—

"গাম্ভীর্য্যের অবতার মহান্ প্রভো, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। যাহা খুসী আজ্ঞা করুন্। আদেশ শিরোধার্য্য করিতেই আসিলাম্। উড়িতেই হউক্, সাঁতার দিতেই হউক্, আগুনেই ডুবিতে হউক, কিম্বা স্তূপাকার মেঘের পিঠে চড়িয়াই বেড়াইতে হউক্, আপনার কঠোর আদেশে এরিয়েল সমস্ত প্রাণ মনের সহিত খাটিতে প্রস্তুত।"

এখানে এরিয়েলের প্রভুভক্তি বা কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই পরিচয়ের মধ্যে কেমন উদ্দাম ভাব (Wildness) এবং তেজস্বিনী শক্তির আভাস নিহিত! কেমন কথার ভাব!

এরিয়েল সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রভুর আজ্ঞা পালনে সহজে সম্মত নয়। আর এক স্থানে প্রস্পেরো যাই বলিয়াছেন "But there's some more work."

দুই একটা বাজে কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের পরেই অমনি এরিয়েল বলিয়া উঠিল ;—"Is there more toil ? Since thou dost give me pains.

Let me remember thee what thou hast promis'd,
Which is not yet perform'd me."

প্রস্পেরো দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পরেই বুঝিলেন, ব্যাপার সহজ নয়। তখন ক্ষমতানুসারে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সেই ভয় সূচক কথা এই ;—

"তুই কি লবণ সমুদ্রের কর্দ্দমময় ভূমিতে বেড়াইতে, ভয়ানক শীতল উত্তর বাতাসের উপর দিয়া দৌড়াইতে, বরফাবৃত শুষ্ক কঠিন পৃথিবীর নানা দুর্গমস্থান পরিভ্রমণ করিয়া আমার কাজ করিতে ভালবাসিস্ না?"

তিরস্কার শুনিয়া এরিয়েল বলিতেছে, "I do not, sir"

আবার প্রস্পেরো বলিলেন,

"ওরে দুষ্ট! তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস্! তুই কি বয়োভগ্ন এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ সেই পাপিয়সী ডাকিনী সাইকোরাক্স্কে ভুলিয়া গিয়াছিস্? তাকে কি ভুলিয়াছিস্?"

উত্তরে এরিয়েল "No, sir".

বস্তুতঃ প্রস্পেরো এরিয়েলকে মায়ামন্ত্রে বন্দী করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে কখনও মিষ্টি কথা বলিয়া কখনও ভয় দেখাইয়া খাটাইতে হইত। এইরূপ ভৃত্যকে আমরা কি বলি? বলি, বন্য স্বভাব। ভাষায় বলি, গোঁয়ার। বস্তুতঃ এরিয়েলে কিছু উদ্দামভাব (wildness) বেশি। উদ্দামতার সঙ্গে কিছু মিষ্টতা ও অদ্ভুত রস মিশ্রিত আছে।) প্রস্তাবের শির্ষস্থানে যে ইংরেজি কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা এরিয়েলের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ঐ উচ্ছ্বাসেও

স্পষ্টতঃ এই তিনটী ভাব ফুটিয়াছে। উদ্দামতা, মিষ্টতা, অদ্ভুতরস এই তিনে এরিয়েল চরিত্র গড়া।) প্রবন্ধের শির্ষোদ্ধৃত ইংরেজি কবিতাটীর স্থূল ভাব এইরূপ ;—

"যে ফুলে মৌমাছী মধু সংগ্রহ করে, আমি সেই ফুলে লুকাইয়া থাকি। ফুটন্ত ফুলের মাঝ খানটীতে শুই। যেখানে পেচা ডাকে সেইখানে বেড়াইয়া বেড়াই. আবার যাই গ্রীষ্ম ফুরাইয়া যায়, অমনি বাদুড়ের পিঠে চড়িয়া আনন্দে উড়িয়া পালাই। এখন গাছের ডালে দোদুল্যমান সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের ছায়ায় পরম সুখে থাকিব।"

এ গান এরিয়েল কখন্ গাইল? যখন প্রস্পেরো বলিলেন "Thou shalt ere long be free."

মেঘভাঙ্গা রৌদ্র, আঁধারের গায়ে চাঁদের জ্যোৎস্না বড় সুন্দর। দুঃখের রজনী প্রভাতোন্মুখ। আকাশে সুখতারা জ্বলিতেছে। ঘোর অধীনতা—দীর্ঘ কালব্যাপী দুর্ল্লঙ্ঘ্য অধীনতার শেষ মুহূর্ত্তে এরিয়েল গাইল—নিজের মনের স্ফূর্ত্তিতে নিজে গাইতে লাগিল ; "Where the bee &c."

আরও দুই একটী উদাহরণ দেখাইয়া এরিয়েলের কথা শেষ করিব।

রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ড শোকে দুঃখে বিহ্বল। মনের বিশ্বাস, "জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, পিতা এবং সুহৃদ্‌গণ ডুবিয়া মরিয়াছেন।" হতজ্ঞান হইয়া বিজন সমুদ্রকুলে পড়িয়া আছেন। তিনিও জলমগ্ন হইয়াছিলেন। বস্ত্রাদি আর্দ্র, এমন সময় কে যেন গাইতে লাগিল ;—

"Come unto these yellow sands,
And then take hands :
Court'sied when you have, and kiss'd
The wild waves whist,
Fat it featly here and there ;
And, sweet sprites, the burden bear.
Hark, Hark !
Bur. Bowgh, Wowgh.
The watch-dogs bark :
Bur. Bowgh' Wowgh.
Hark, hark ! I hear
The strain of strutting chanticlere
Cry, cock-a doodle-do."

এরিয়েল সহচর প্রেত্যাদিগকে আহ্বান করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গাইতেছিল।

ফার্ডিনাণ্ডের কাণে এ শব্দ গেল। তিনি চারিদিকে চাহিয়া "তাইত কোথায় এ গান হইতেছে? আকাশে না পৃথিবীতে? ইত্যাদি" কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় আবার গান ;—

"Full fathom five thy father lies ;
Of his bones are coral made ;
Those are pearls that were his eyes :
Nothing of him that doth fade ;
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell ;
[Burden, ding dong.
Hark ! now I hear them,—ding dong, bell."

রাজকুমার ফার্ডিনণ্ডের পক্ষে এ কি ভয়ানক সঙ্গীত! কোথায় এ গান হইতেছে, কে গাইতেছে, কিছুই বুঝিতেছেন না। মনে মনে ভাবিতেছেন "এ গান আমার পিতার স্মৃতিই জাগাইতেছে। গান এ মানুষের নয়। এ শব্দ পৃথিবীর নয়। এখন যে ইহা মাথার উপরে শুনিতেছি!"

এখন আর রাজপুত্র কার্ডিনাণ্ড বসিয়া নন্। প্রথম গান শুনিয়াই তাহার পিছনে পিছনে পা চলিয়াছে। তিনি চলিতেছেন, না গানই তাহাকে চালাইতেছে, ঠিকনাই। তিনি বলিতেছিলেন "thence I have follow'd it or it hath drawn me rather :

এই এরিয়েলই আবার নিদ্রাভিভূত গঞ্জালোর কাণে গাইতেছে;—"Awake! Awake!"

আর উদাহরণ দিব না। কবি এরিয়েলকে টেম্পেষ্টের সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার কলকাঠি করিয়াছেন। এরিয়েলের প্রাণে উন্মত্ত স্বাধীনতার তেজ। এই তেজকে নিদারুণ দুর্লঙ্ঘ্য অধীনতার আঁধারে ঘেরিয়া মানব চক্ষুর নিকট অপূর্ব্ব আকারে চিত্রিত করিয়াছেন। এরিয়েলের নির্দ্দিষ্ট আকার বা দেহের কোন পরিচয় নাই। পড়িতে পড়িতে ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় যেন সুমিষ্ট, অদ্ভুত, উদ্দামতাময় স্বাধীনতার জ্বলন্ত জীবন্ত তেজটুকু। অসাধারণ অদ্ভুত চরিত্রে, শিক্ষার অপেক্ষা উত্তেজনা অধিক। এরিয়েলচরিত্র উত্তেজনাময়। "Where the bee sucks" ইত্যাদি গানটী শুনিতে২ ইচ্ছা হয় দুইটীপাখা তুলিয়া জগন্মান্য মহাকবি সেক্সপিয়ারের মানস রচিত অনন্ত গগনবিহরী তেজোময় এরিয়েল পাখীর পিছনে পিছনে ছুটি; পাপ, তাপ, বন্ধনময় ধূলির পৃথিবীকে পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাই। যাই—সেই মৌমাছীর সঙ্গে এক ফুলে মধু পান করিতে, যাই—সেই ফুটন্ত ফুলের কোলে শুইতে, যাই—বাদুড়ের পিঠে চড়িয়া যেখানে প্রকৃতি বসন্তের সাজে সাজিয়া হাসিতেছে, সেইখানে তরুশাখে দোদুল্যমান ফুলের ছায়ায় ঘুমাইতে।

এরিয়েল ক্ষুদ্র জাতীয় সাধারণ শ্রেণীর প্রেতাত্মা। এজন্য কবি ইহাতে উচ্চ ভাব উচ্চ প্রবৃত্তি ফুটান নাই। টেম্পেষ্টের উদ্দেশ্য, মিরান্দার সরলতাময়, দেবমহিমময় অপূর্ব্ব বিকাশ। ক্ষুদ্র এরিয়েল সেই মহা কার্য্যের অন্যতম ক্ষুদ্র সাধন। কাজেই ইহাতে কোন উচ্চ শিক্ষা নাই, উদ্দাম উত্তেজনা আছে।)

অনেকে বলেন, যক্ষ আর এরিয়েলে তুলনা সম্ভবপর নয়। আপাততঃ, এরিয়েল পার্থিব জ্ঞান বা প্রবৃত্তি বর্জ্জিত; উদ্দাম স্বাধীনতা পিপাসু, আকাশ বিহারী অশরীরী জীব;—ক্ষুদ্র, সামান্য, প্রেতাত্মা। ক্ষুদ্র হইয়াও কাজেও কথায় অসাধারণ অদ্ভুত ক্ষমতা বা শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যক্ষ একটা আমির ওমরাও গোছের স্ত্রৈণ বিলাসী অদ্ভুত জীব। যক্ষের প্রথম পরিচয়—

"কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা সাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তগমিতমহিমবর্ষাভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥
তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ সকামী।
নীত্বামাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥"

কামাতুর যক্ষ এতদূর বাহ্যজ্ঞান বা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য যে, চেতনাচেতনে ভেদ জ্ঞান নাই। মানুষের সাধ্য দৌত্যকার্য্যে জড় পিণ্ড মেঘকে অনুরোধ করিতেছে। কবি বলিতেছেন ;—

"ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্বমেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়া।
ইত্যৌৎসুক্যা দপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তহি প্রকৃতি কৃপাণাশ্চেতনাচেতনেষু॥"

যে মনোমোহিনী যক্ষের মনোহরণ করিয়াছেন, যক্ষ নিজমুখেই তাঁহার বর্ণনা করিয়া বলিতেছে; তিনি "যুবতী বিষয়ে সৃষ্টেরাদ্যেবধাতুঃ" "তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধারোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

যক্ষের মন প্রাণ যেন তন্ময়। এ বিপুল জড় জগতে সে রূপ মাধুরীর সমগ্র সাদৃশ্য একসঙ্গে কোথায়ও তাহার চক্ষুসমীপে ভাসে না। "তন্বী শ্যামাশিখরিদশনা "কে

মনের এ ক্ষেদ—এদারুণ পিপাসা জানাইতে কল্পিত দূত মেঘকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে; "মন্নূখেনেদমাহ"

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিত হরিণীপ্রক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াশশিনি শিখিনাং বর্হ ভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রুবিকলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ কচিদপি নতেচণ্ডি সাদৃশ্য মস্তি॥"

পরে যক্ষের ধন ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা। যক্ষ নিজ মুখে মেঘকে বলিতেছে, "সেই অলকা নগরে কুবেরের বাড়ীর উত্তরে আমার বাড়ী। দূর হইতেই নানা বিধ মণি মাণিক খচিত রামধনুরাকার সুন্দর বহির্দ্দ্বার দেখিতে পাইবে। দ্বারের অভ্যন্তরে একপার্শ্বে একটী নব জাত ক্ষুদ্র পারিজাত বৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছভরে অবনত হইয়া আছে। ফুলগুলি হাতেই নাগাইল পাওয়া যায়। আমার স্ত্রী পুত্র নির্ব্বিশেষে ঐ মন্দার বৃক্ষটী প্রতিপালন করিয়াছেন। আমার বাড়ীতে একটী দীঘী ও আছে। তাহার তটের গায় মরকত নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বিরাজিত। বৈদূর্য্য মণি নাগে সুবর্ণ পদ্মসকল ফুটিয়া সরোবরের বক্ষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। জলে রাজহংসগণ ক্রীড়া করিতেছে। তাহারা তোমাকে দেখিয়া তোমার নবীন ধারায় জলকষ্ট দূর হইবে ভাবিয়া, অদূরবর্ত্তী মানস সরোবরে যাইবার কথা ভুলিয়া যাইবে। দীঘীর পাড়ে মনোহর ইন্দ্র নীলরচিত শিখর মালা ভূষিত একটী ক্রীড়া শৈল শোভা পাইতেছে। সুবর্ণ-নির্ম্মিত কদলী বৃক্ষে তাহার চারিদিক্ ঘেরা দেখিতে পাইবে। সেই ক্রীড়া পর্ব্বত আমার গৃহিণীর অতি প্রিয়। সখে, যখন তোমার প্রান্ত ভাগে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে থাকে তখন কাতর প্রাণে তাহার কথা স্মরণ করিতে বাধা কি। এই স্থানে কুরবকবেষ্টিত মাধবী-লতামণ্ডপের সম্মুখে একটী রক্তাশোক আর একটী বকুল বৃক্ষ আছে। যখন আমি আর তোমার সখী একত্রছিলাম তখন স্ব স্ব পুষ্পোদ্গম সময়ে কেহ তাঁহার বাম পদাভিলাষী হইত, কেহ বা তাঁহার এক গণ্ডুষ বদন মদিরা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিত। এই দুইটী পুষ্প বৃক্ষের মধ্যস্থলে একখানি কাঞ্চন-বাসযষ্টি প্রোথিত আছে। তাহার মূলে কাচা বাঁকের মত সুন্দর দীপ্তিশালী মরকত বেদীকা। বেদীর উপরিভাগ স্ফটিকফলকে মোড়ান। তোমার সুহৃদ্বর নীল কণ্ঠ ময়ুর দিবসে আমার প্রিয়ার বলয়াদির মনোহর শিঞ্জনে তালে তালে নাচিয়া বেড়ায় এবং সন্ধ্যা সময় উপস্থিত হইলে ঐ যষ্টিপরে আসিয়া বাস করে। হে সাধো, যত চিহ্ন আমার স্মরণ হইল সকলই বলিলাম। এই সকল লক্ষণ দ্বারা এবং দ্বারের উভয় পার্শস্থ শঙ্খ পদ্মের খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার বাড়ী চিনিয়া বাহির করিবে। অবশ্যই আমার বিয়োগে সে বাড়ীর পূর্ব্বশোভা সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গিয়াছে। কারণ সূর্য্যাস্তে পদ্ম আপনার শোভা হারায়।"

যক্ষ যে দেশ বাসী, তাহার চিত্র দেখাইতে হইলেও অনেক কথা বলিতে হয়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীতে একটু আভাস পাওয়া যাইবে।

"মন্দাকিন্যাঃ সলিণশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছয়য়া বারি তোষঞ্চাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তেমণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥"

কথা কয়টীর মোটামুটি অর্থ এই

"যেখানে অমরবাঞ্ছিত রূপলাবণ্যবতী কুমারীগণ মন্দাকিনীর পুলিনজাত পারিজাত বৃক্ষের ছায়া তলে বসিয়া, সুবর্ণ বালুকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মণি লুকাইয়া, খুজিয়া বাহির করিয়া, ক্রীড়া (১) করে, আর তখন মন্দাকিনীর জল কণাসিক্ত সুশীতল মন্দ মন্দ বায়ু তাহাদিগের সেবা করিতে থাকে।" সেই অলকায় আমার বাস গৃহ। যক্ষ মেঘের নিকট পরিচয়স্থলে নিজের দেশের এই সকল কথা বলিতেছে।

তবে যক্ষ কে? যক্ষ ধনপতি কুবেরের একজন সহচর। কর্ত্তব্য কার্য্যে অনবধানতা-হেতু এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত। কৈলাস পর্ব্বত হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাম গিরিতে একাকী বাস করিতেছে। এই রাম গিরির শোভা ও সংস্কার (Association) অতি মনোহর। সীতার স্নান পবিত্র জল ধারারূপিনী গিরিনদী কল কল নাদে ইহার বক্ষ হইতে নিঃসৃত। সর্ব্বস্থান তরু রাজির স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল। শৃঙ্গে শৃঙ্গে গহ্বরে গহ্বরে গিরি মল্লিকা প্রভৃতি ফুটজ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত। যখন হইতে যক্ষের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ, তখন নবীন বর্ষার প্রারম্ভ আষাঢ় মাসের প্রথম দিবস। পর্ব্বত পাত্রে সংলগ্ন মেঘ-মালা দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন মত্তমাতঙ্গ সকল দন্তে গিরিগাত্র উৎখাত করিয়া, আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। কামার্ত্ত যক্ষ ইহা দেখিয়া বিহ্বল। বাহ্য জ্ঞান শূন্য। মেঘকে দূত করিয়া স্ত্রীর কাছে পাঠাইতে ব্যস্ত। তাহাকে মানুষের মত নানা কথা বলিয়া দিতেছে। কথার ভাবে বুঝা গেল, সে একজন ধনী, বিলাসী। এক মনো-মোহিনী তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া বসতি করেন। ইত্যাদি আরও কত কি। পূর্ব্ব পরিচিত এরিয়েলের সঙ্গে ইহার তুলনা কি সে হইবে?

যক্ষ একটী অপার্থিব অমানুষিক জীব। কুবের পুরী অলকা দেবাশ্রম কৈলাস ধামে। সে স্থান হিন্দুর বিশ্বাসে পৃথিবীর অতীত। যক্ষপুরী এবং অলকাধামের যে বর্ণনা টুকু দিয়াছি, তাহাতেই ইহা বুঝা যায়। উত্তর মেঘে এ ভাব প্রতিপাদক বর্ণনার অন্ত নাই। যক্ষ, রক্ষ, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি মানুষের অতীত জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ কথা সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। অপার্থিবতা এবং অমানুষিকতায় যক্ষ কিছু পরিমাণে এরিয়েলের তুলনীয়, এ কথা অস্বীকার করিবার কারণ দেখি না। যক্ষে অমানুষিক শক্তি আছে বলিয়াই কৈলাস হইতে রাম গিরিতে সহজে আসা সম্ভবপর হইয়াছে। নতুবা পথেই এক বৎসর কাটিবার কথা।

যক্ষ অমানুষিক, অপার্থিব জীব হইলেও তাহাতে পৃথিবীর ভাব, মানুষের ভাব যথেষ্ট আছে। এ কথা বুঝাইতে আর অধিক বলিতে হইবে না। এতক্ষণ যক্ষের পরিচয় সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই সমুচিত প্রমাণ। এরিয়েলেও মানুষিক ভাব, পৃথিবীর ভাব আছে। চীৎকার, গান, কথা, মনের ভাব সকলই মানুষের। এরিয়েলের সুখের কামনা, স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস, ভয় প্রভৃতি অদ্ভুত রকমের হইলেও পার্থিব। মধু খাওয়া, ফুলের ছায়ায় শুইয়া থাকা, বাদুড়ের পিঠে চড়া, পৃথিবীর কথা। যক্ষের ন্যায় এরিয়েলের মূর্ত্তি বা দেহের চিত্র

(১) গুপ্তমণিক্রীড়া। এক পক্ষ সুবর্ণ বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মণি লুকাইয়া রাখে। অপর পক্ষ খুঁজিয়া বাহির করে।

যদিও তত সুস্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট নয়, কিন্তু এরিয়েল দেহ শূন্য নিরাকার নয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধেও যক্ষে ও এরিয়েলে একবারে বিসদৃশ ভাব নয়। যদিও প্রথম পরিচয়েই যক্ষের একটী মূর্ত্তি মনে অঙ্কিত হয়, কিন্তু পরে আর সে মূর্ত্তির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে না। সমুদয় মেঘদূত খানি যক্ষের হৃদয়ের উচ্ছাস—কিছুক্ষণের চিন্তা তরঙ্গ মাত্র। এ কথা স্মরণ করিয়া মেঘদূত পড়িলে যক্ষকে চিন্তাময়, ভাবময় বলিয়া বোধ হয়। মেঘদূত যক্ষের সমস্ত জীবনের চিত্র নয়। সমস্ত নির্ব্বাসিত সময়েরও চিত্র নয়। এক দিনের একটী মুহূর্ত্তের চিন্তার ছবি মাত্র।) এই চিন্তা অপবিত্র বা অরুচিকর বলিয়া যদি ভ্রম থাকে, সে ভ্রম অমূলক। সেই গভীর নির্জ্জন বর্ষাকালীন নবনীরদজালাচ্ছাদিত মনোমোহন পার্ব্বত্য প্রকৃতির সুন্দর কোলে একাকী বসিয়া যদি আট মাস পরে বহুদূরস্থিত নির্ব্বাসন স্থান হইতে প্রকৃত পবিত্র সরল প্রণয় সূত্রে বাঁধা, প্রাণের অর্দ্ধভূতা, জীবনের সুখ দুঃখের সম ভাগিনী, সহধর্ম্মিনীর জন্য কেহ মূহুর্ত্তকাল চিন্তা করে, কল্পনা করে, তাহার সে চিন্তাকে দূষিত ভাবিবার কোনই কারণ দেখি না।)

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্র বাকীমিবেকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষুদিবসেষেষুগদ্দৎসুবলাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং॥"

যক্ষমুখের বর্ণনাতে এই কয়টী কথা শুনিয়া কি মনে হয় না, যক্ষে এবং যক্ষপত্নীতে নির্ম্মল গাঢ় প্রেম? সতীর মুখে অধিক কথা নাই। পতির দ্বিতীয় জীবনভূতা প্রিয়বিরহে বর্ত্তমান দিনগুলি গাঢ়োৎকণ্ঠায় কাটাইতেছেন। আহা! শীতের কঠোরতা স্পর্শে যেমন পদ্মিনী মথিত বা বিদলিত হইয়া বিবর্ণ বিরূপ হয়, তিনিও সেইরূপ হইয়াছেন। বস্তুতঃ যক্ষমুখে যক্ষপত্নীর কেবল রূপই বর্ণিত হয় নাই, গুণও বর্ণিত হইয়াছে। "উৎসঙ্গে বা মলিন বসনে সৌম্যনিক্ষিপ্যবীণাং মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা। তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সরয়িত্বা কথঞ্চিৎ ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপিকৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী॥"

বিয়োগ বিধুরা যক্ষ-পত্নী মলিন বসনাবৃত ক্রোড়ে বীণাটী স্থাপন করিয়া পতির নামাঙ্কিত পদাবলী বিরচিত গান গাইতে উদ্যত হইতেছেন, আর চক্ষুজলে বীণার তন্ত্রী ভাসিয়া যাইতেছে। যদি বা তারগুলি অতি কষ্টে মুছিয়া গাইতে আরম্ভ করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ আপনার সঙ্গীতের স্বরগ্রাম আপনিই ভুলিয়া যাইতেছেন। এইরূপ ভাব কি অরুচিকর ঘৃণার উত্তেজক? প্রণয়ের "প্র" শুনিতে যাঁহারা কাণে হাত দেন, তাঁহাদের কথা ভুলিয়া বলিতে পারি, এ প্রেমের চিত্র দূষিত হইলে শকুন্তলা, দুষ্মন্তকে, বক্ষে ধরিয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে না। দুষ্মন্ত বা শকুন্তলার সমস্ত মহত্ত্ব কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইতে হয়।

আবার যক্ষ, বর্ণনা শেষ করিয়া, বলিতেছে "হে মেঘ, আমার প্রতি তোমার সখীর প্রাণে বিশেষ অনুরাগ সঞ্চিত আছে জানি বলিয়াই প্রথম বিরহ সময়ে তাঁহার এইরূপ বর্ণনা করিলাম। মনে করিও না যে, নিজের সৌভাগ্যের অহঙ্কার আমাকে বাচাল করিয়াছে। ভ্রাতঃ, যাহা ২ বলিলাম, অবিলম্বেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।"

যাহার কল্পনাতে এইরূপ বিনয় ও সমুচ্চ ভাব, তাহাকে কি বলিব? যে যক্ষ ধূমজ্যোতি সলিলাদির সম্পাত মাত্র জড়বস্তু মেঘকে (পরে দেখাব) সুধু কুতুহল বশতঃ, ক্ষণিক কল্পনায় দূত ভাবিয়াও কথায় কথায় সখা, সুহৃদ, সাধু, সৌম্য, ভ্রাতঃ ইত্যাদি সম্মান সূচক আখ্যা ব্যবহার করিতেছে, কেবল ইহা নয়, নবজাত কুটজ কুসুমাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক প্রীত করিয়া, মিষ্ট সম্ভাষণের পরে আপনার অনুরোধটী জানাইতেছে, সেই যক্ষকে কি বলিব? জীবনভূতা সহধর্ম্মিনীর জন্য আট মাস পরে মূহুর্ত্ত কাল ভাবিয়া মনে মনে একটুকু কৌতুক করিতেছে বলিয়া কি বলিব এ উদার, বিনীত এবং সাধু চরিত্র নয়?

আবার যক্ষ প্রণয়িণীর জন্য ভাবিতেছে বলিয়া ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যাইতেছে না। ভ্যাল, ভ্যাল—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কাঁদিয়া ধরা ভাসাইতেছে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৌতুক বশতঃ এ কল্পনা। তবে কি ইহার সঙ্গে কাতরতা নাই? আছে। সে কাতরতার প্রকৃতি এই—

'অস্ত্র স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো
রন্তর্ব্বাষ্পচিরমনুচরো রাজরাজস্যদধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥'

টীকাকার ব্যাখ্যা করিতেছেন "যক্ষণাং রাজ্ঞোহনুচর কথনাদন্য সম্ভবেহপি অত্র যক্ষ এবাতঃ ন বিরুদ্ধ মতিকারিতাস্তীতি অবি কথনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্ব ইতি ধীরোদাত্ত লক্ষণাৎ যক্ষঃ অন্তর্ব্বাষ্পো ধীরোদাত্ত ত্বাদন্তঃ স্তম্ভিতাশ্রুঃ সন্ কৌতুকা ধানহেতো-রভিলাষোৎপাদকারণস্য ইত্যাদি।"

এখন বুঝিলাম যক্ষ কেবল বিনয়, সৌজন্য এবং উদারতার আধার নন্। কিন্তু ধীর গম্ভীর প্রকৃতি। কষ্টকে কষ্ট, দুঃখ যন্ত্রণাকে দুঃখ যন্ত্রণা বলিয়া বোধ আছে। অথচ প্রাণের আগুন প্রাণে সম্বরণ করিতে পারেন। চক্ষুর জলধারা অন্তরে চাপিয়া রাখিতে পারেন। ধৈর্য্যে অতি গাম্ভীর্য্যে, তিনি মহাসত্ত্ব—মহাত্মা। পরন্তু সে হৃদয় ভাবপ্রবণ কোমল মধুর। সুন্দর প্রকৃতির মনোরম কুসুম শয্যাস্বরূপ মনোহর রাম শিরির গাত্রে নবীন মেঘমালার ঘটা ও ছটা দেখিয়া সে ভাবসিন্ধু উচ্ছ্বসিত। স্বভাবতঃ বহুদিন পরে প্রিয়তমার কথা মনে পড়াতে কৌতুক করিয়া নানা কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু উচ্চ মনের এ ক্ষণিক কল্পনাতেও উচ্চনীতি উচ্চ ভাব সকল ফুটিতে থাকে। মহাসত্ত্ব যক্ষের চিন্তায় তাই ফুটিয়াছে।)

"তামুখাপ্য স্বজলকণাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনার্থে গবাক্ষে
বক্তুম্ ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ॥
ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধিমামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈ র্হৃদয়নিহিতৈ রাগতং ত্বৎসমীপম্।
ইত্যাদি।"

যক্ষমনে যক্ষের চিন্তায় কিরূপ তেজস্বিনী স্বাধীনতার প্রভা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ের কোমল ভাব গুলি কেমন গম্ভীরতা, সৌজন্য ও মধুরতা মিশ্রিত, প্রদর্শন করিতে এই কবিতাময় পক্তিং কয়টী পাঠককে উপহার দিলাম। ভাব এই "মেঘ, তোমার বিদ্যুৎ সম্বরণ করিয়া জানালায় থাকিয়া, স্বজল কণা শীতল মন্দ বায়ুভরে অভিনব মালতী কলিকার সহিত সেই স্তিমিত নয়নাকে জাগাইয়া ধীর ও মধুর বচনে বলিবে "অবিধবে,

আমি আপনার পতির প্রিয়বন্ধু অম্বুবাহ। তাঁহার সংবাদ হৃদয়ে বহন করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

কেহ মনে করিবেন না এতক্ষণ ধান ভানিতে শিবের গীত গাইলাম। বস্তুতঃ যক্ষ চরিত্র ভালরূপে আঁকিয়া দেখাইতে হইলে, যাহা যাহা বলিলাম, তাহা না বলিলে ভাব খোলে না। কথা এই, যক্ষ যে একটা কামুক উন্মত্ত প্রকৃতির অপ দেবতা নন, তাহা এক রকম দেখান হইল। কিন্তু তাঁহাতে স্বাধীন ভাব কোথায়? এখন তৎ সম্বন্ধে কিছু ভাবা যাউক্।

"জাতংবংশেভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ
তেনার্থিত্বং ত্বয়িবিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোহহং
যাচ্ঞা মোঘাবরমধিগুণে নাধমেলব্ধকামা।"

আবার পূর্ব্ব মেঘের অষ্টম শ্লোকের শেষ চরণে লেখা আছে

"নস্যাদন্যোঽপ্যমহমিবজনো যঃ পরাধীনঃ বৃত্তিঃ॥

বস্তুতঃ এই কয়টী কথার মধ্য হইতেই যক্ষ-প্রাণের স্বাধীনতার পিপাসা এবং জ্বলন্ত তেজোবত্তার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই বিকাশের পরিণাম, মেঘকে দূত সাজান। অনন্ত গগনবিহারী মেঘকে দূত করা,—কেমন মনোহর কথা! কেমন স্বাধীনতার ভাব! মেঘের গতি অপ্রতিহত। প্রসারিত স্থানে মেঘ প্রসারময়। সঙ্কীর্ণ স্থানে আপনার দেহ তদনুরূপ করিতে সমর্থ। মেঘ আকাশে উড়িতে পারে এবং পর্ব্বত পৃষ্ঠস্থ গৃহের জানালার ভিতর দিয়া ঘরেও প্রবেশ করিতে পারে। মেঘ কামরূপ। স্বাধীনতার ক্ষেত্র। তাই এইরূপ স্বাধীন ভাবের পূর্ণোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলা সম্ভবপর হইয়াছে,

"তামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্যুপেক্ষেতজায়াং
নস্যাদন্যোঽপ্যহমিবজনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ॥
মন্দং মন্দং নুদতি পবনমশ্চানুকুলোযথাত্বাং
বামশ্চায়ং নদতিমধুরং চাতকস্তেসগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নুনমাবদ্ধ মালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥"

প্রকারন্তরে এই স্বাধীন ভাবের মধ্যে এরিয়েলের সেই উদ্দাম মধুর স্বাধীন হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছায়া দেখিতে পাই। কবি যক্ষকে ভাবান্তরে চিত্র করিবার জন্য যক্ষ প্রাণের এই উচ্ছ্বাস মেঘকে লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়াছেন।

আবার কালের এবং প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও একবিধ দুর্লঙ্ঘ্য অধীনতা পাশে এরিয়েল এবং যক্ষ বদ্ধ। উভয়ই নিজের নিজের ভাবে সে পাশ ছিন্ন করিতে আকুল।

বস্তুতঃ এরিয়েল যক্ষে পূর্ণ সাদৃশ্য আছে একথা আমরাও বলিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু যাঁহারা বলেন, এই দুইয়ে তুলনা সম্ভবপর নয়, তাঁহারা কখনও এই দুই চরিত্র প্রতিভার দৃষ্টিতে তৌলাইয়া পড়েন নাই।

আর এক ভ্রম, যক্ষ কেবল বিরহ বিধুর কামাতুর একটী অদ্ভুত জীব। তাহাকে পাঠ করিলে মানুষের কোন শিক্ষা লাভ হয় না। এইরূপ ভ্রমান্ধদের মনে রাখা উচিত, যে মহাকবির লেখনী, রঘুবংশের ন্যায় নীতিপূর্ণ মনোহর মহাকাব্য প্রসব করিয়াছে, কুমার সম্ভবের মত নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতত্ত্বরাশি সুমধুর কাব্য গানে গাইয়াছে, অভিজ্ঞান শকুন্তলং নামক মহা-

রত্নে জগদ্ভাণ্ডার উদ্ভাসিত করিয়াছে, সেই লেখনী মেঘদূত লিখিতে গিয়া এতই অসার হয় নাই। এই জন্যই প্রথমে মহাকবি সেক্সপিয়ারের চিত্রিত এরিয়েলের সঙ্গে যক্ষের তুলনা করিলাম। কারণ সেক্সপিয়ারের অঙ্কিত চিত্রে পাঠক মাত্রেরই শ্রদ্ধা আছে। ইহার আলোকে যদি যক্ষের ছবি দাঁড়াইতে পারে—তবে অনেকে হয়ত মানিলেও মানিতে পারেন, যক্ষেও কিছু দেখিবার আছে।

এখন দেখি, যক্ষচরিত্রে কি শিক্ষা লাভ হয়? উদারতা, বিনয়, সৌজন্য, গাম্ভীর্য্য, কোমলতা, ভাবুকতা, ধৈর্য্য, বিশুদ্ধ অকপট প্রেম রাশি, তেজ এবং উদ্দাম স্বাধীন ভাবের তীব্র জ্যোতিতে পরিশোভিত হইতে পারে, আর সেই শোভা অতুলনীয় মধুর হয়। আর এক শিক্ষা কবির কৌশল। কবি এক বিন্দু ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসের গর্ভে এক মহাচরিত্ররূপ মহাজগতের অপূর্ব্ব শোভা ফুটাইয়াছেন। অপার্থিব বস্তুকে পৃথিবীর বস্তুতে ঢাকিয়া ধূলীর মানুষের হাতে খেলেনা করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে শিখিলাম কেবল কালিদাসের উপমা শ্রেষ্ট নয়। তিনি কেবল বাহ্য প্রকৃতির দাস নন্। তিনি বাহিরের বর্ণে গভীর অন্তর সমুদ্র রচনা করিতে সুপটু। আঁকার কৌশলে দুর্দ্দান্ত সাগর প্রশান্ত বলিয়া বোধ হয়। তরঙ্গ গর্জ্জনে কেহই আর পালায় না। আবাল বৃদ্ধ তাহাতে আনন্দে সাঁতরায়। এই অন্তর আঁকিতে কালিদাস বাহিরের ভক্ত। কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এই বাহিরে ঢাকা গভীর অন্তর। মেঘদূত ও তাই। ধূমাদির সন্নিপাত জড়মেঘ, দূতের কল্পনা, সকলই ছায়া, সত্য কেবল যক্ষের মহিমময় চরিত্র!)

বাঙ্গালার কলঙ্ক।

(প্রতিবাদ)

বঙ্গদর্শন অনন্তধামে গমন করিয়াছে। "নবজীবন" ও "প্রচার" তাহার স্থান অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। "নবজীবন" সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় প্রচার নীরবে আপন প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছে। প্রথম সংখ্যা প্রচারে "বাঙ্গালার কলঙ্ক" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের "ভারত কলঙ্ক" এই প্রবন্ধের আদর্শ-স্থল, ইহা তাহারই পরিশিষ্ট।

আমরা বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের নিকট "দাতা কর্ণ" "গুরুদক্ষিণা" প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। সে সকল সেই সময়ে নিতান্ত উপাদেয় বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণ আমরা আর তাহার পক্ষপাতী নহি। এক সময়ে আমরা বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ, অনুকরণ ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধটী কেবল বালকের নিকটে কেন, ঐতিহাসিক তত্ত্বানভিজ্ঞ অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবে। কিন্তু আমরা তাহার কতকগুলি কথার প্রতিবাদ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

প্রবন্ধ লেখক বলেন "পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র পাল বংশীয় এবং সেন বংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। * * * গথ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংশ হইয়াছিল, বজাজেত ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজীত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন পাল সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি।"

পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক পণ্ডিত, আমরা তাহার নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিয়াছি। তিনি আমাদের ভক্তির পাত্র। তাহার "সেনরাজ" ও "পাল ও সেন" রাজ শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমরা অনুমোদন করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা এরূপ বলিতে পারি না যে, সেই সেই প্রবন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছ, তৎ সমস্তই অখণ্ডনীয়। যাহারা এরূপ অন্ধভাবে পর পদানুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে ঐতিহাসিক লেখনী ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা "বান্ধব" ও "ভারতী" পত্রিকায় যে সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, সেই প্রবন্ধ সমূহের কোন কোন স্থলে আমরা মিত্র মহোদয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিতে ক্রটী করি নাই। যে দেশে লেখকের নাম দিয়া প্রবন্ধের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, সেই দেশে আমাদের মতগুলি যে এত শীঘ্রই সর্ব্ব সাধারণে সমাদৃত হইবে, ইহা আমরা কখনও আশা করি নাই, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমাদের আশার অতিরিক্ত ফল ফলিয়াছে। বাঙ্গালার দুই চারি জন প্রধান পণ্ডিত আমাদের মত গুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা সে সকলের উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক, মিত্র মহাশয়ের পদানুসরণ করিয়া যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, মূলে যে সেই সকল ভ্রমসঙ্কুল, এক্ষণ আমরা তাহাই দেখাইব।

প্রবন্ধ লেখক বলেন "ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তারপর সেন বংশীয়েরা রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেন বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তারপর সেনবংশীয়েরা পাল বংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন।"

পণ্ডিত প্রবর মিত্র মহোদয় তাঁহার "পাল ও সেন রাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মত প্রচার করিয়া দুইটী রাজবংশের নিম্ন লিখিতরূপ বংশাবলী প্রচার করিয়াছেন।

পাল রাজবংশ।

পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে।

১।	গোপাল	৮৫৫ খ্রীঃ অঃ
২।	ধর্ম্মপাল	৮৭৫ ঐ
৩।	দেবপাল	৮৯৫ ঐ
৪।	বিগ্রহপাল	৯১৫ ঐ
৫।	নারায়ণপাল	৯৩৫ ঐ
৬।	রাজপাল	৯৫৫ ঐ
৭।	— পাল	৯৭৫ ঐ
৮।	বিগ্রহপাল	৯৯৫ ঐ
৯।	মহীপাল	১০[illegible] ঐ

১০।	ন্যায়পাল	১০৪০ খ্রীঃ

বিহার প্রদেশে

১১।	বিগ্রহপাল (৩য়) ও অন্যান্য।	

——oo——

সেন রাজবংশ।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে।

১।	বীরসেন	৯৮৬ খ্রীঃ
২।	সামন্তসেন	১০০৬ ঐ
৩।	হেমন্তসেন	১০২৬ ঐ

সমগ্র বাঙ্গালায়

৪।	বিজয় ওরফে শুক সেন	১০৪৬ ঐ
৫।	বল্লালসেন	১০৬৬ ঐ
৬।	লক্ষ্মণসেন	১১০৬ ঐ
৭।	মাধবসেন	১১৩৬ ঐ
৮।	কেশবসেন	১১৩৮ ঐ
৯।	লাক্ষ্মণেয় বা অশোক	১১৪২ ঐ

পাল ও সেন রাজ বংশ সম্বন্ধে আমাদের মত সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রদর্শিত হইবে, এস্থলে প্রবন্ধ লেখকের নেত্রে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক কেবল মিত্র মহোদয়ের কয়েকটী ভ্রম দেখাইয়া দিব।

মিত্র মহোদয়ের মতে সেন রাজগণ ৯৮৬ হইতে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালা শাসন করেন, অবশেষে বিজয় সেন ১০৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়পালকে জয় করিয়া উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালা অধিকার করেন। মিত্র মহোদয় রাজসাহির প্রস্তর ফলক হইতে এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ভ্রম ক্রমে রাজসাহির প্রস্তর ফলককে ভাগলপুরের প্রস্তর লিপি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হউক আমরা এইরূপ সামান্য ভ্রম প্রদর্শন জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করি নাই, রাজসাহির প্রস্তর লিপির বিংশতি শ্লোকটী এইরূপ লিখিত আছে—

ত্বং নাম্নবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাঽন্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥ ২০

যখন বিজয় সেনের পূর্ব্ব পুরুষকে মিত্র মহোদয় বঙ্গের রাজা বলিয়া অবধারণ করত বিজয় কর্ত্তৃক গৌড় বিজয় প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলেন, তখন তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিলেন—

"Thou hast no hero to conquer" said the bards. On hearing it, through a misconception (the words being susceptible of the meaning thou hast conquered no hero) the king overthrew the king of Gauda, subjugated the hero of Kamrup and quickly conquered him of Kalinga." (J. A. S. B. XLVII. I. 401.)

মিত্র মহোদয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রোক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলেন, কিন্তু ইহার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই শ্লোকের কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুণ—

"Thou hast no hero to conquer" said the bards. On hearing it, through a misconception (the words being susceptible of the meaning 'thou hast conquered no hero,') a deep anger rose and assailed the king of Gouda who overcame the king of Kamrupa, and forthwith conquered him of Kalinga."

এই অনুবাদ দ্বারা মিত্র মহোদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম বারে মেটকাফ্ অনুবাদক, মিত্র মহোদয় সংশোধন কর্ত্তা। মিত্র মহাশয় এই শ্লোকের অনুবাদ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"The latter part of the sloka may

mean that the King (not the anger) assailed the king of Gour, subjugated the king of Kamrupa and quickly conquered him of Kalinga; or he assailed the king of Gour who had subjugated the king of Kamrup, and quickly conquered him of Kalinga; or he quickly conquered the king of Kalinga who had overcome the king of Kamrupa without the intervention of the king of Gour."

R. M.

প্রথমোক্ত অনুবাদ দ্বারা নির্ণীত হয় যে, রাজা (বিজয় সেন) গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গ দেশীয় রাজাগণকে জয় করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়োক্ত অনুবাদের মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, মিত্র মহাশয় গৌড়ের রাজা (বিজয় সেন) কর্ত্তৃক কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ই সেই সময় স্থির করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে বিজয় সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে;—

"He is related to have invaded Assam (Kámárupa) and the Coromandal Coast between the Chilka Lake and Madras (Kalinga).

ইহা দ্বারা দৃঢ় ভাবে বলা যাইতে পারে যে, মিত্র মহোদয় তৎকালে শ্লোকের বিকৃত অর্থ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ভ্রান্তত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। বিজয় সেন যে কোন ভিন্ন দেশীয় নরপতি ছিলেন ও ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া গৌড় বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সেই সময়ে তাহার নিকট নিতান্ত অপ্রামাণ্য উক্তি বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তৎপর ১৮৭৮ খীষ্টাব্দে যখন তিনি রাজসাহির প্রস্তর ফলকাঙ্কিত শ্লোকগুলি পুনর্ব্বার আলোচনা করিলেন, তখন দেখিলেন যে, বিজয় সেন ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিশ্চয়ই গৌড়ের রাজা ছিলেন না। বিজয় অন্য কোথা হইতে আসিয়া গৌড় জয় করেন। অতএব লিখিলেন যে, বীর সেন, সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেন বঙ্গের রাজা ছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন পালরাজকে জয় করিয়া গৌড় (সুতরাং সমগ্র বাঙ্গালা) অধিকার করেন। কিন্তু রাজসাহির প্রস্তর লিপি দ্বারা সুন্দররূপে দেখা যাইতেছে যে, বিজয় সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথের কোন প্রদেশাধিপতি ছিলেন। উক্ত প্রস্তর লিপের চতুর্থ শ্লোক কি বলিতেছে পাঠকগণ শ্রবণ করুণ—

বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতক লাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে। যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয়শুচয়ঃ সূক্তি মাধ্বীকধারাঃ পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণ পরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥ (৪)

মিত্র মহোদয় এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—

"In his race' who enjoyed the companionship of the celestial maidens, and the virtuous deeds of which race were celebrated in honied verses by Vyasa for the satisfaction of the universe, were born king Virasen and others, who were Dakshenatyas and famous everywhere."

শ্লোকের এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়া থাকে—

"অমর স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত লীলা কলাপের সাক্ষী স্বরূপ তাহার বংশে * দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণিন্দ্র কীর্ত্তিশালী বীর সেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাদিগের চরিত্র যুক্ত-সুন্দর-উক্তিপূর্ণ-মধুশ্রাবী ইতিহাস জগজ্জনের শ্রবণ রঞ্জণার্থে পরাশর পুত্র (ব্যাস) প্রণয়ণ করিয়াছিলেন।"

* পূর্ব্বে শ্লোকে চন্দ্রের বর্ণনা আছে। এ চন্দ্র বৈদ্যদিগের "চন্দ্র" নহেন। তিনি শিবের শিরোভূষণ চন্দ্র। সেন রাজগণকে তাহারই বংশধর বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকের দ্বারা সরলভাবে ইহাই নির্ণয় করা যাইতে পারে যে "চন্দ্রবংশে দাক্ষিনাত্য পতি বীর সেন প্রভৃতি রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু বীর সেন কোন সময়ের লোক তাহা বলা যাইতে পারে না। এই শ্লোক দ্বারা বরং তাহাকে ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ঐ প্রস্তর লিপির পঞ্চম শ্লোকে লিখিত আছে, সেই সেন বংশে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়দিগের কুলের শিরোভূষণ স্বরূপ বীর বিজয়ী সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিত্র মহোদয় সেন বংশের যেরূপ বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সামন্ত সেন, বীরসেনের উত্তরাধিকারী (Immediate successer) নির্ণীত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকটী উদ্ধৃত হইতেছে। সরল হৃদয় পাঠকগণ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক একত্র আলোচনা করিয়া দেখুন মিত্র মহোদয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন কি না।

তস্মিন্ সেনান্বয়ায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ। উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথ তনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথা॥

এই সামন্ত সেনের বর্ণনা করিয়া ৮ম শ্লোকে লিখিত আছেঃ—

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্টাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহতবসামাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

মিত্র মহোদয় ইহার এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

"He did extirpate the enemies who plundered the riches of the Carnatic, and the marrow, flesh and bones, (of the dead bodies of his enemies' troops) to be found in abundance there, has caused Yama not to leave the southern quarters up to the present time, becoming himself gladly an inhabitant of the place."

বাঙ্গালা অনুবাদঃ—এই একমাত্র বীর সামন্ত সেন, অরিকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত-কর্ণাটলক্ষ্মী, লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিয়াছিলেন। মৃতজীবের (অর্থাৎ শত্রু সৈন্যের) মেদ, মাংস, বসা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া, হর্ষযুক্ত পরিবার বর্গের সহিত প্রেতভর্ত্তা যম অদ্যাপি দক্ষিণদিক পরিত্যাগ করেন নাই।

চতুর্থ শ্লোকে পাঠক দেখিতে পাইয়াছেন যে, বীরসেন প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ দাক্ষিণাত্যপতি ছিলেন। ৮ম্ শ্লোক দেখা যাইতেছে যে, সেই বংশীয় সামন্ত সেন কর্ণাট লুণ্ঠণকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিয়াছিলেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সরল হৃদয় পাঠকগণ অবশ্যই বলিবেন যে, বিজয় সেনের পূর্ব্ব পুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশাধিপতি ছিলেন।

বিংশতী শ্লোকের মূল আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, পুনরায় এস্থলে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—

"কবিরা বলিলেন, আপনি "নান্যবীর বিজয়ী" অর্থাৎ অন্য বীর তোমাকে জয় করিতে পারে না," কিন্তু তিনি অন্যায় বুঝিলেন, অর্থাৎ আমি অন্য বীরকে জয় করিতে পারি নাই" তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং কামরূপেশ্বর বিজয়ী গৌড়েন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কলিঙ্গকেও জয় করিলেন।"

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কে ইহা

বলিতে পারে যে "বীরসেনের পুত্র সামন্ত সেন তৎপুত্র হেমন্ত সেন, ইহারা বঙ্গের রাজা ছিলেন, হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন গৌড় জয় করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ লেখক বলেন "সেন বংশীয়েরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার সুবর্ণ গ্রামে রাজা ছিলেন। আর পাল বংশীয়েরা মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন।" ইহাও ও ঠিক নহে। সেনদিগের রাজধানী বিক্রমপুর ও পালদিগের প্রধান রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও উপরাজধানী মুদ্গগিরি ছিল। ইহা তাম্র ও প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে। সুবর্ণ গ্রামের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরা-পতির সহিত সর্ব্বদা বঙ্গরাজের কলহ চলিত।

গ্রীক দূত মেগস্থনীসের গ্রন্থে Gangarides বা Gangaridae নামক জনপদের উল্লেখ আছে। * কিন্তু প্রবন্ধ লেখক ইহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মূলের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য নহে।

প্রবন্ধ লেখক "গঙ্গারিদেশ" কে "গঙ্গরাঢ়ী" অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতবর উইলসন সাহেবের লিখিত কয়েকটী পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে গ্রীকগণ মগধকেই এই বিকৃত নামে পরিচয় করিয়াছেন।

"We find in *Diodorus Siculess* the king of *Gangaridæ*, Whose power alarms the Macedonian, is there named *Xandrames*."

"Chandra Gupta, the king of the *Gangaridæ* at the time of Alexander's invasion."

"All the classical writers agree in representing *Sandracoptus* as king of the nations which are situated along the Ganges, which are *Gangaridæ* and *prasii* * * * The first name was probably of Greek origin, expressing, *Raderus* and *Cellarius* justly observe, the situation of the nations in the neighbourhood of Ganges."

*See Mc Crindle's Ancient India p 155

ত্রিহুত প্রাচীন কালে "তীরভুক্তি" নামে পরিচিত ছিল। ইহা সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী, পাঠকগণকে ইহা শ্রবণ করান নাই।

তৎপর প্রবন্ধ লেখক বলেন "ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহ" গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। একথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে।"

আমরা এই অংশের মূল উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"Chouranga was not the founder of the Ganga Vamsa family, but that the first who came into Kalinga, was Ananta Verma also called Kolahala, sovereign of Ganga Rarhi the low country on the right bank of the Ganges or Tumlook and Midnapore." (Mackenzie's Collection. vol. I. p. CXXXVIII.)

এই কথা গুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উইলসন্ সাহেব প্রকাশ করেন নাই। অনন্তবর্ম্মা যে গঙ্গাবংস সম্ভূত, তাহার কোন উল্লেখ আমরা কোন শাসন পত্রাদিতে প্রাপ্ত হই নাই। বিন্ধ্যাপর্ব্বত গহ্বরে ক্ষোদিত প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে, যে "খ্যাত নামা যজ্ঞবর্ম্মা নৃপতির এক পুত্র ছিল, তাহার নাম শার্দ্দূলবর্ম্মা। এই রাজার ঔরসে ও মৌখরী দেবীর গর্ভে সুবিখ্যাত মহারাজা অনন্তবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা বিন্ধ্যপর্ব্বত গহ্বরে কাত্যায়নী দেবী মূর্ত্তি সংস্থাপন

পূর্ব্বক মহানদী তীরস্থিত সমৃদ্ধিশালী দান্দী গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মহানদী তীরবর্ত্তী দান্দী উৎসর্গকারীই সেই "ত্রিকলঙ্গাধিপতি" অনন্তবর্ম্মা, তৎপ্রতি কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

গঙ্গাবংশীয় সপ্লেশ্বর দেবের শাসন পত্র পাঠে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, উঢ্রগঙ্গ (সাহেবি ইতিহাস চৌরগঙ্গ) তাহার পুত্র অনিয়ঙ্কভীমদেব (অনঙ্গভীমদেব) প্রভৃতি রাজগণ কেহই গঙ্গাবংশীয় ছিলেন না।

তৎপর প্রবন্ধ লেখক "পুরীর মন্দির কোনার্কের* মন্দির, লাঙ্গলীয়া নরসিংহ কর্ত্তৃক গৌড় বিজয় বৃত্তান্ত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সকল কার্য্য গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের কীর্ত্তি। সেই গঙ্গাবংশ যখন বাঙ্গালি তখন এই সকল আমাদেরই কীর্ত্তি বলিতে হইবে।

সত্য বটে সামান্য ইতিহাসে পুরীর মন্দির প্রণেতা অনিয়ঙ্কভীমদেব, কোণার্কের মন্দির নির্ম্মাণ কর্ত্তা ও তুগণখাঁর দর্প চূর্ণকারী লাঙ্গুলীয়া নরসিংহকে গঙ্গাবংশীয় বলা হইয়াছে, কিন্তু শাসন পত্র তাহা স্বীকার করে না। গঙ্গাবংশীয় সপ্লেশ্বর দেবের শাসন পত্রে লিখিত আছেঃ—

"গৌতম গোত্রে (গঙ্গাবংশে) দ্বারদেব নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র মূলদেব, তৎপুত্র অহিরাম। সমুদ্র হইতে যে রূপ চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি, সেইরূপ অহিরাম হইতে চন্দ্রমা সদৃব পুত্র শ্রীসপ্লেশ্বর দেব ও লক্ষ্মীর ন্যায় কন্যা সুরমা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্লেশ্বরের শাসন পত্রের ৩।৪।৫।৬ শ্লোক হইতে উক্ত তত্ত্ব গৃহীত হইল। তৎপর কয়েকটী শ্লোকের অহিরামের কন্যা সুরমার স্বামীর বংশের এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,—

"নিসাপতির বংশের চূড়ামণি স্বরূপ উঢ্রগঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার দুই পুত্র শ্রীরাজরাজ ও অনিয়ঙ্কভীমদেব। রাজরাজ সুরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজরাজ বহুকাল রাজ্য সুখভোগ করিয়া চরমাবস্থায় স্বীয় অনুজ অনিয়ঙ্কভীমকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।"

রুদ্রদেব নামে জনৈক তৈলঙ্গ দেশীয় নরপতি ১০৫৪ শকাব্দে উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন। কোন কোন বিখ্যাত পণ্ডিত তাহাকেই "চোরং" বা "চোরগঙ্গ" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা গঙ্গাবংশীয় ও উঢ় গঙ্গের বংশীয় রাজাদিগের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছি। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তাহা পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিব। যাহা হউক যে বংশে গঙ্গাবংশজাত সুরমার বিবাহ হইয়াছিল, তাহাকে চন্দ্রবংশ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গাবংশজাত-সুরমার স্বামীবংশ যে গঙ্গাবংশ হইতে পারে না, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্র গুলির

* "কোনার্ক" নহে, ইহা কোণার্ক হইবে। যখন বঙ্গদর্শনে "কোনার্ক" শব্দ লিখিত হয়, তখনও আমরা এই ভ্রমটী দেখাইয়া দিয়াছি। কিন্তু অভিমানন্ধ লেখক "ণ" কে "ন" লিখিয়া অভিধান ও ব্যাকরণের মুণ্ড চর্ব্বণ করিবেন, তথাপি আত্মভ্রম সংশোধন করিবেন না

মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর, কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্সমূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিয়োর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হণ্টার প্রভৃতির কস্থম কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। না পার, গুরুগিরি করিও না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

নষ্ট চন্দ্র।

চতুর্থীর চারুচন্দ্র শারদ আকাশে,
অনন্ত অসীম নীলে একা একা হাসে!
গৃহ-কোণে বঙ্গ বধূ, লুকাইয়া হাসে মৃদু,
ঈষৎ ঘোমটা যেন খুলিছে বাতাসে!
সে পবিত্র দেব দেহ, পারে না দেখিতে কেহ,
অনিন্দ্য অতুল তনু ঢাকা নীল বাসে!
ফোটেনা মুখের কথা, মৌনময়ী সরলতা
কিরণ প্রতিমা খানি কারে না সম্ভাষে!
আপনি আপন প্রাণে, কেবলি হাসিতে জানে,
হাসির সরল শিশু একা একা হাসে,
চতুর্থীর চারুচন্দ্র শারদ আকাশে একা।

১

ফুটিয়াছে উপবনে নানা জাতি ফুল,
মল্লিকা মালতী জাতি, গোলাপ বান্ধুলী পাতি,
গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলী টগর পারুল!
নিশিগন্ধা কুন্দজবা, চম্পক সুবর্ণ প্রভা,
শিরিষ রঙ্গণ রক্ত অশোক বকুল,
শেফালি কেতকী আদি ফুটিয়াছে ফুল!

২

বহিছে মলয়ানিল সুগন্ধি শীতল,
নাহি মান অপমান, সকলে সমান জ্ঞান,
মহান্ উদার প্রাণ করুণা তরল!
যেখানে যাহারে পায়, তারে আলিঙ্গিয়া যায়
অবিভেদে ফুল্লফুল তীব্র শিলাচল!
নদ নদী সরোবর, কিবা হ্রদ কি সাগর,
সকলে সমান স্নেহে করিছে বিহ্বল!
এত ভালবাসা জানে, পশে গে মরম স্থানে,
বিনে ও অমৃত স্পর্শে মরে জীব দল!
বিনে তার প্রেম মন্ত্র, প্রাণের সমস্ত যন্ত্র
চলে না মুহূর্ত্ত কাল,—স্থির অবিচল!
প্রীতির বিজ্ঞানবিত্ হেন শিল্পী কদাচিত্—
কে দেখেছ কোন্ দিন হেন দৈব বল?
প্রাণময় প্রেমময় সমীর শীতল!

৩

সুন্দর স্ফটিক স্বচ্ছ স্থির সরোবরে,
প্রফুল্ল কুমুদ মালা, শাপ-ভ্রষ্ট দেববালা
আকণ্ঠ মগন যেন সলিল নিথরে!
পাপের ধরণী ধামে, শঙ্কিতা মানব নামে
দিবসে খোলেনি আঁখি মানবের ডরে!
মানবের পাপ শ্বাস, পবিত্রতা করে নাশ,
দৃষ্টিতে প্রণয় পোড়ে দূর—দূরান্তরে!
নিশিতে কুমুদ তাই ফুটিয়াছে সরে!

৪

সুখের স্বপন সম প্রমত্ত চকোর,
এই দেখি এই নাই,—সুধা পানে ভোর!
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ গুলি নব নীলাকাশে,
সরের বিমল বুকে দাম দল ভাসে!
ডুবিয়া ভাসিয়া অই তারা গুলি খেলে,
পাড়াগেঁয়ে কৃষকের শিশু মেয়ে ছেলে!
আর অই সুধাকর অনন্ত আকাশে,
অকূল অসীম নীলে একা একা হাসে!

৫

যদিও উহার সনে লতা পাতা ফুল
সামান্য সমীর জল হাসিয়া আকুল!
তথাপি—তথাপি হায়, শত পুষ্প সুষমায়
বিরচিত যেই শিশু আনন অতুল,
জীবন্ত লাবণ্য রাশি, আধ ফোটা আধ হাসি
অলক্ত মাখান ছানা মোমের পুতুল!
ছোট দুটি হাত তুলে, "আয় চাঁদ আয়" বলে
ডাকে না উহারে আজ—আনন্দে আকুল!
কি হবে হাসিলে শুধু লতা পাতা ফুল?

৬

লতা পাতা ফুল জল হাসিলে কি হয়?
জল চেয়ে সরলতা, ফুল চেয়ে পবিত্রতা,
মধুর অধিক মধু হেসে কথা কয়!
লতার অধিক হায়, প্রাণে জড়াইয়া যায়
কাটিয়া মরমে বসে যেখানে হৃদয়!
কৌমুদী অধিক হাসে, প্রাণ ভরা ভালবাসে,
প্রেম যেন হাসি মুখে কোলে টে'নে লয়!
করুণা কোমল কান্তি, যুবতী জীবন্ত শান্তি,
পৃথিবীর স্পর্শমণি পরিমলময়,
না হাসিলে, লতা পাতা হাসিলে কি হয়?

৭

হাসিলে কি হয়, ওযে অচেতন সব,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হায়, হাসিলেও বৃথা যায়,
যদি সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ না হাসে মানব!
পৃথিবীর পূজনীয়, ভারতীর অদ্বিতীয়
না হাসিলে আর্য্যবংশ মানব গৌরব,
হাসিলে কি হয়, ওযে অচেতন সব!

৮

শশধর!
কেন আজ কোন্ পাপে, কি কলঙ্ক অভিশাপে
অসাধু তস্কর আদি দস্যু সমুদায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী তপস্বী সিদ্ধ
কেহই নয়ন তুলে চাহে না তোমায়?
চোরের অধিক চুরি করিলে কোথায়?
কিম্বা কবে কোন্ দেশে, প্রবেশিয়া দস্যুবেশে
লুটিলে সর্ব্বস্ব কার গভীর নিদ্রায়?
দস্যু ও তোমারে কেন চাহে না ঘৃণায়?

৯

আগে—
কেনা ভাল বাসিয়াছে শশাঙ্ক তোমারে?
দেখিলে তোমার মুখ, কত হর্ষ কত সুখ
উথলিত সকলের চিত্তে একেবারে?
রোগে শোকে দগ্ধ বক্ষে, যাতনার অশ্রু চক্ষে
একটু পাইত শান্তি জ্বলন্ত সংসারে!
সে শান্তি ঠেলিয়া পায়, আজি কেহ নাহি চায়
কত যেন হবে পাপ দেখিলে তোমারে,
ঘৃণায় চাহে না হায় ফিরে একেবারে!

১০

আজ—
এত প্রেম ভালবাসা ভুলিয়াছে সব,
এতই কি অকৃতজ্ঞ ধরার মানব?
বুকে কি কলিজা নাই, কলিজায় প্রাণ,
মানবের বুকভরা এত কি শ্মশান?
প্রাণে নাই প্রাণ দেওয়া প্রেম ভালবাসা,
কেবলি আকণ্ঠ পূর্ণ শোণিত পিপাসা?
প্রেমে নাই ক্ষতিদান আছে প্রত্যাহার,
সত্য কি মানব এত পশু নরাকার?
অথবা তোমারি কোন কার্য্য পাপকর,
আছে কি এমন শশি, দাওনা উত্তর?

১১

ছিছিছি, লজ্জায় মরি, ওহে লজ্জাহীন!
হরিয়া এনেছ নাকি কোলের হরিণ?
প্রেমের নন্দন কার, করিয়াছ ছারখার,
দেবতা দানব হতে এত কি কঠিন?
কার বুকে মেরে ছুরি, করিলে এ রত্নচুরি
পাষণ্ড! করিলে কারে চির উদাসীন?
হায়রে কলঙ্ককালী, কার কুলে ঢেলে দিলি

কার সে পবিত্র কুল করিলি মলিন?
পাপিষ্ঠ! করিলি কারে চির উদাসীন?

১২

কেন তোরে হায় হায় গিলিয়া আবার
উগারিয়া ছেড়ে দেয় রাহু দুরাচার?
পাপিষ্ঠ দেবের মৃত্যু নাই কি কিছুতে?
যা তবে সাগর জলে, ডোব গিয়ে সে অতলে
আর যেন পাপমুখ না হয় দেখিতে?
হৌকচির অমাবস্যা চির অন্ধকার,
তবু তোরে নষ্টচন্দ্র দেখিব না আর!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম্ম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করেন, তখন তাঁহার আশা ছিল যে দেশের লোকের শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ আস্থা, তাহাতে তিনি যদি একবার প্রমাণ করিতে পারেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রের অনুমোদনীয়, তাহা হইলে লোকে আর বিধবা-বিবাহের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিবে না। এই সংস্কার হৃদয়ে থাকাতেই তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বাহির হইবার পূর্ব্বে তিনি ছয় মাসের অধিক কাল বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে বাস করিয়াছিলেন। একবার আহারার্থ যে কিছু সময় যাইত, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় সময় শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতেন। দিন যায়, রাত্রি যায়, তিনি শাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন! প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যখন যাও দেখিবে, তিনি স্তূপাকার গ্রন্থ রাশির মধ্যে বসিয়া প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র বিচার করিতেছেন। এখন যেমন প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইয়া আপামর সাধারণ সকলের হস্তে অর্পিত হইয়াছে এবং কোন বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে বড় একটা ক্লেশ পাইতে হয় না; তখন তাহা ছিল না, তাঁহাকে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল।

তিনি এই শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সত্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না। আমাদের বোধ হয়, তিনি প্রাচীন সিসিলি দেশীয় পণ্ডিত আর্কিমিডিসের ন্যায় "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিয়া নির্জ্জনে নৃত্য করিয়া থাকিবেন। এত কষ্টে যাহা সংগ্রহ করিলেন, আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাহা প্রচার করিলেন; ভাবিলেন,—"আর কি! দেশের লোক প্রতি কথায় যে শাস্ত্রের দোহাই দেয়, সেই শাস্ত্রেই যখন বলিতেছে, হতভাগিনী বিধবাদিগকে পুনর্ব্বিবাহের অধিকার দেও, তখন আর ভাবনা কি? ইহা দেখিয়া কি ভীরুর হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইবে না? সন্দিহান ব্যক্তির সন্দেহ ভঞ্জন হইবে না? উদ্যোগীর উদ্যোগ শতগুণ বাড়িবে না?" ইহা ভাবিয়া তিনি ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। এই তর্কযুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ লোক দেখা গেল না। বঙ্গদেশের নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, প্রখর বিচার-শক্তি ও আশ্চর্য্য শাস্ত্রীয় মীমাংসার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইবে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহের অধিকার দিয়া আইন পাশ করিলেন। কিন্তু এ সকলের ফল কি হইল? কার্য্য কালে আমরা কি দেখিলাম? আমরা দেখিলাম যে, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে বিধবা বিবাহ করিলেন কিম্বা বিবাহ দিলেন তাঁহারা সকলেই হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। একি! বর্ত্তমান হিন্দুগণের শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা একথা যদি যথার্থ হয়, তবে তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাইয়াও এরূপ আচরণ করিলেন কেন? ফল কথা এই, লোকে শাস্ত্র দেখিয়া চলে না, কিন্তু লোকাচার দেখিয়াই চলে। দেশের দশজন লোকে যে কাজ করেনা কিম্বা যে কাজের বিরোধী, তাহা একজনে করিতে সাহসী হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অখণ্ডনীয় যুক্তিপরম্পরা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, নিরপরাধা বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র ও নীতি উভয় সম্মত; বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। যে মনুষ্যত্ব থাকিলে লোকে সাহসের সহিত সত্যানুসরণ করিতে পারে, কিম্বা কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইয়া লোকের প্রতিকূলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না, সেই মনুষ্যত্বের অভাবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশা পূর্ণ হইল না। লোকে বিচারের সময় যতই শাস্ত্রের দোহাই দিক্ না কেন, কার্য্যকালে লোকাচার দেখিয়াই চলে, শাস্ত্র দেখিয়া চলে না।

ইহার আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

মনু বলিতেছেন;—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্হি শুল্কংলোভেন স্যান্নরোপত্য-বিক্রয়ী॥"

"কন্যার পিতা যদি বিদ্বান্ হন, তিনি অণুমাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, যদি লোভবশতঃ পণ গ্রহণ করেন তাহা হইলে সন্তান বিক্রয়ের পাপভাগী হইবেন।" এই যদি শাস্ত্রীয় আদেশ হয়, লোকে কি তদনুসারে চলিতেছে? কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে কন্যাবিক্রয় একটী ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে পুত্র বিক্রয় একটী ব্যবসায় হইয়া উঠিতেছে।

স্ত্রীশিক্ষা যখন প্রথমে এদেশে প্রচলিত হয়, তখন মদন মোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষা পক্ষীয় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রীয় বচন তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন;—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ॥

অর্থাৎ "কন্যাকেও পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।" ইহাতেই কি দেশের লোক নিরুত্তর হইয়াছিলেন? সে অধিক দিনের কথা নয়, সে দিন পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণাপরাধে গ্রামের লোক কন্যাদের পিতা মাতার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।

যতই বিবেচনা করা যাইবে ততই দেখা যাইবে যে, লোকে শাস্ত্রানুসারে চলিতেছে না কিন্তু গড্ডলিকাপ্রবাহের মত প্রত্যেকে অপর দশ জনকে দেখিয়া চলিতেছে।

আবার দেখুন যে ব্যক্তির ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই, যাহার প্রবৃত্তি সকল অশাসিত, কি শাস্ত্র কি লোকাচার কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া

রাখিতে পারিতেছে না। লোকভয়, বা নরক যন্ত্রণার ভয়ে তাহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না। ইহারও হাজার প্রকার প্রমাণ দিতে পারা যায়। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ "সুরা পান" ও "বর্ণসঙ্কর" এই উভয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মন্বাদি শাস্ত্র খুলিয়া দেখ সুরাপানের প্রতি ঘোরতর শাসনে; মনু বলিয়াছেন;—

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ংগুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তিপাতকান্যাহুঃ তৎসংসর্গীচ পঞ্চমঃ।"

অর্থ"ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, গুরুপত্নী, হরণ চৌর্য্য এ গুলি যে করে সে মহাপাতকী এবং ইহাদের সহিত যে সংসর্গ করে সেও মহাপাতকী" সুরাপানকে গুরুপত্নী হরণের তুল্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা কঠোর শাস্ত্রীয় বিধি কি আশা করা যাইতে পারে! আর যদি লোকাচারের কথা বল, ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু সমাজে লোকাচারেও ভদ্র জাতির সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কঠিন শাস্ত্র এবং লোকাচার উভয়ে মিলিত হইয়াও ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব ব্যক্তিদিগকে এই দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত রাখিতে পারিল না। বর্ণ-সঙ্কর সম্বন্ধেও এইরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যদি কোন বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া থাকেন, তাহা বর্ণ সঙ্কর বিষয়ে; বর্ণ সঙ্কর হওয়াকে তাঁহারা সমাজের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং ইহা নিবারণ করিবার জন্য অতি কঠোর বিধি সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাছে বর্ণ-সঙ্কর হয় এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির ছিলেন। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন;—

"যদি হ্যহং নবর্ত্তেয়ম্ জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানু-বর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমেলোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যা মুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥"

অর্থ,—হে পার্থ যদি আমি সতর্ক হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমার পথের অনুবর্ত্তন করিবে; এবং এই সংসার উৎসন্ন যাইবে ও আমি বর্ণ সঙ্করের কারণ হইব।" বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে, ইহা একটী প্রধান ভয়ের বিষয় ছিল। তথাপি ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কত বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে! ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, দুর্বৃত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব নরনারী শাস্ত্রের শাসন, ধর্ম্ম ভয় ও লোক ভয় কিছুই গ্রাহ্য করে নাই। অজামীল ব্রাহ্মণতনয় হইয়াও চণ্ডাল কন্যার প্রেমে আসক্ত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অজামীলের সংখ্যা জন সমাজে কখনই অল্প ছিল না।

তবে শাস্ত্র, লোকাচার ও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি—এই তিনটী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। এখন আমরা কাহার অনুসরণ করিব? যদি বল শাস্ত্রের অনুসরণ কর; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি কোন শাস্ত্রের অনুসরণ করি? এ দেশেত শাস্ত্র অগণ্য। প্রথম, চারিবেদ শাস্ত্র, তৎপরে, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, ও বশিষ্ঠ, এই বিংশতি জন ধর্ম্ম শাস্ত্রকারের লিখিত গ্রন্থ শাস্ত্র; তৎপরে অষ্টাদশ পুরাণ, ও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ইহিহাস শাস্ত্র; তৎপরে আধুনিক তন্ত্র সকলও শাস্ত্র। ইহার মধ্যে আবার শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ। এক জনের বিধি অপরের নিষেধ।

এখন আমরা কাহাকে অবলম্বন করি? ইহার অধিক উদাহরণ দিব না একটী দিলেই যথেষ্ট হইবে। মনু বলিয়াছেনঃ—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃস্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥

অর্থ "শূদ্র কেবল মাত্র শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিবে, বৈশ্য শূদ্রা ও বৈশ্যা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় উক্ত উভয় জাতীয় ও নিজ জাতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে; ব্রাহ্মণ চারি জাতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে।" এই ত এক ধর্ম্ম শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণের শূদ্রা বিবাহের অনুমতি দিলেন, আর এক ধর্ম্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেনঃ—

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
নৈতন্মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ং॥

অর্থ "শূদ্রজাতি হইতে ব্রাহ্মণের ভার্য্যা গ্রহণের যে, বিধি আছে তাহা আমার মত নয়, কারণ মানব স্বয়ং পুত্ররূপে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।" উভয়ে যদি শাস্ত্রকার তবে কাহার বিধি বলবত্তর? ইহা দেখিয়াই একটী প্রাচীন উক্তি রচিত হইয়াছে।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ না
সৌমূনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অর্থ "বেদ সকল পরস্পর বিসম্বাদী, স্মৃতি সকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন, তিনি মুনিই নন, যাঁহার মত অপর সকল হইতে ভিন্ন নয়, ধর্ম্মের তত্ত্ব গভীর গহ্বরে নিহিত, সুতরাং মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বনীয়। অর্থাৎ এক এক জন মহাপুরুষের উক্তি সকল অবলম্বন করিয়া যে সকল আচার ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এখানেও সেই পুরাতন আপত্তি। সকল মহাজন ত এক কথা বলেন না, এক পথ প্রদর্শন করেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য শিব পূজার বিধি দিয়াছেন; এবং ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রাদি শৈব উপাসকের চিহ্ন সকল ধারণের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ হারীত-সংহিতাতে একজন মহাজন বলিতেছেনঃ—

"রুদ্রার্চ্চনাৎ ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রেণ সমতাং ব্রজেৎ।
যক্ষভূতার্চ্চনাৎ সদাশ্চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ॥
ন ভস্ম ধারয়েদ্বিপ্রঃ পরমাপদ্গতোপিবা।
মোহাদ্বৈবিভূয়াৎ যস্তু স সুরাপো ভবেদ্ধ্রুবং॥
তির্য্যক্পুণ্ড্রধরং বিপ্রংপটাম্বরধরং তথা।
শ্বপাকইব বীক্ষেত ন সম্ভাষেত কুত্রচিৎ॥"

অর্থঃ—"ব্রাহ্মণ যদি শিব পূজা করে তাহা হইলে শূদ্রের সমান হইয়া যায়; যক্ষ ও ভূতের উপাসনা করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়; ব্রাহ্মণ ঘোর বিপদে পড়িলেও ভস্ম ধারণ করিবে না; যদি মোহ বশতঃ ভস্ম ধারণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সুরাপায়ীর ন্যায় পাতকী হয়। যে ব্রাহ্মণ-ত্রিপুণ্ড্রধারী ও যে পটবস্ত্র পরিধান করে; তাহাকে চণ্ডালের ন্যায় দর্শন করিবে; কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সহিত আলাপ করিবে না।" এখন বলুন দেখি, এই দুই মহাজনের মধ্যে কোন জনের অনুসরণ করি? যদি আমাদের বুদ্ধির দ্বারা মহাপুরুষদিগের বিচার করিতে হয় ও ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে চরমে আমাদের বিচারশক্তি ও প্রবৃত্তির উপরই নির্ভর করা হইল।

যদি বল দেশাচার দেখিয়া চল,

তাহাই বা কিরূপে করি? দেশাচারের ন্যায় অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তু আর নাই। এক প্রদেশের দুই শ্রেণীয় লোকের মধ্যে দুই প্রকার আচার, দুই প্রকার রীতি নীতি। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে সকল লৌকিক আচার প্রচলিত, তাহা পশ্চিম বাঙ্গালাতে নাই; এক জেলার আচার ব্যবহার অন্য জেলার অনুরূপ নহে। আমাদের বঙ্গ দেশে সগড়ি লইয়া কত মারামারি! স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে কি ভয়ানক সগড়ি বিচার! কিন্তু পঞ্জাব প্রদেশে গিয়া দর্শন কর— ভদ্রজাতীয় হিন্দুগণ বাজারের দোকান হইতে অন্ন ব্যঞ্জন ক্রয় করিয়া খাইতেছে! প্রভু আপীষে যাইবার সময় ভৃত্যকে অন্ন ব্যঞ্জন আপীষে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিয়া গেলেন, ভৃত্য অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্রটী লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখস্থিত টেবলের উপর রাখিল; তিনি অবসরক্রমে এক সময়ে আহার করিয়া লইলেন। এতদ্ভিন্ন পঞ্জাবের ভদ্রজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে শূকর মাংস ভোজনের রীতি আছে। বাজারে শূকরের আচার বিক্রয় হইয়া থাকে, এবং হিন্দুগণ তাহা ক্রয় করেন। ইহা শুনিয়া বঙ্গবাসি-গণ কি বলিবেন?

আবার বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে গিয়া দর্শন কর, দেখিবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর হিন্দুগণ নিত্য কুক্কুট মাংস আহার করি-তেছেন। মান্দ্রাজের কোন কোন শূদ্রের বাড়ীতে গেলে মুসলমানের বাড়ীতে আসি-য়াছি বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গৃহে কুক্কুট পুষিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া এদেশের লোকের এই ভ্রমে পড়িবার সম্ভবনা যে, এই সকল দেশের লোক হিন্দুর আচার-ভ্রষ্ট। তাহা কেহ মনে করিবেন না। বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। তাঁহারা বাঙ্গালিদিগকে হিন্দুর আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেখানে পৌত্তলিকতার যেমন প্রবল প্রতাপ ও হিন্দুয়ানীর যেমন বাড়াবাড়ি, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। জাতিভেদের কঠোর নিয়ম সেখানে অদ্যাপি শিথিল হয় নাই। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া একটি বৈশ্যের আনীত জলে স্নান করিয়াছিলাম বলিয়া একটী সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সেই মান্দ্রাজ প্রদেশে ভদ্র শূদ্রদিগের মধ্যে কুক্কুট মাংস প্রচলিত। ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আবার সেখানে হিন্দুরা মাতুল কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন। এসকল আচার সম্বন্ধে বাঙ্গালিগণ কি বলেন?

এইরূপে যতই গূঢ়রূপে দেখা যাইবে, ততই বুঝিতে পারিব যে, লোকাচারের ন্যায় চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তু আর নাই। বুদ্ধিমান লোকে কেমন করিয়া এই দেশা-চারকে আপনার নেতাস্বরূপ করিয়া সম্পূর্ণ-রূপে তাহার অধীন হইতে পারে?

তবে কি আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিব? এখানেও ভয়ের কারণ আছে এবং আপত্তি ও আছে। মানব যদি আপনার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির অধীন হয়, যদি প্রত্যেকে আপনাপন অশা-সিত প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ত্বরায় সমাজ মধ্যে অরাজ-কতা উপস্থিত হইবে; এবং সমাজ প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারজনিত বিবাদ বিসম্বাদে পূর্ণ হইয়া অশান্তির আলয় হইবে।

আমরা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি না; দেশাচারকে নেতা ভাবিয়া সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করিতে পারি

না; নিজ প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে ও বিপদ আছে; তবে এখন উপায় কি? এই স্থানে সূক্ষ্মদর্শী ধার্ম্মিকগণ বলিয়া থাকেন যে, এমন একটী কষ্টিপাথর আছে, যদ্দ্বারা শাস্ত্র, দেশাচার ও প্রবৃত্তি এই তিনকে কষিয়া লওয়া যায়। শাস্ত্র হইলেই যে পরিত্যাজ্য, দেশাচার হইলেই যে বর্জ্জনীয়, এবং প্রবৃত্তির অনুসারে কার্য্য করিলেই যে নিন্দনীয়, তাহা নহে। এমন এক স্থান আছে যেখানে এই তিনটীরই বিচার হয়, এবং যাহার সহায় ও অনুকূল হইলে এই তিনটীই অবলম্বনীয়। সে বস্তুটী কি? তাহা ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দ্বারা এই তিনেরই বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে শাস্ত্রীয় বিধি ধর্ম্মের অনুকূল, তাহা শিরোধার্য্য, আর যাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল, তাহা বর্জ্জনীয়। যে দেশাচার ধর্ম্মের অনুগত, তাহা প্রতিপালনীয়, যাহা ধর্ম্ম বিরোধী, তাহা বর্জ্জনীয়। সেইরূপ যে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের অনুগত, তাহা চরিতার্থ করিতে পারি, যাহা ধর্ম্মের বিরোধী, তাহাকে শাসন করিতে হইবে।

এক ধর্ম্মের দ্বারাই সকলের বিচার করিতে হইবে। কারণ ধর্ম্মই মানব জীবনের লক্ষ্য। মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই জন-সমাজের সৃষ্টি। যদি সমাজ মানবাত্মার উন্নতির অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, যদি সামাজিক প্রথা সকল এরূপ হয় যে, তন্মধ্যে বাস করিয়া ধর্ম্ম ও ন্যায় রক্ষা করা দুষ্কর, তাহা হইলে সে সমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী সমাজ, তাহা মানবাত্মার বাসযোগ্য নহে। যদি দেশাচার বশতঃ জন সমাজের এরূপ দুরবস্থা হইয়া থাকে যে, দুষ্কর্ম্মাসক্ত, ভণ্ড, প্রবঞ্চক অধর্ম্মী ব্যক্তিরা সেখানে অনায়াসে আশ্রয় পায়, কিন্তু সত্য ও ন্যায় অনুসারে যে ব্যবহার করে, তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়, ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই; তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্গতি অপরিহার্য্য, সে সমাজ নিত্য নিত্য অধিক হইতে অধিকতর রূপে পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকে। একটী সংস্কৃত কবিতাতে আছে;—

"ছেদশ্চন্দন চূত চম্পকবনে রক্ষা চ শা কোট্যক
হিংসা হংস ময়ূর কোকিল কুলে কাকে চ
নিত্যাদরঃ,
মাতঙ্গগণ খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর কার্পাসয়োঃ;
এযাযত্র বিচারণা গুণি গণে দেশায় তস্মৈ
নমঃ॥

অর্থ "যে দেশে চন্দন চূত ও চম্পক বৃক্ষ দেখিলেই ছেদন করে, কিন্তু সজিনা বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে, হংস ময়ূর কোকিল কুলকে নষ্ট করে এবং কাককে আদর পূর্ব্বক পালন করে, যেখানে হস্তি দ্বারা গর্দ্দভ ক্রয় করে, এবং যেখানে কর্পূর এবং কার্পাসের সমান দর, যে দেশে গুণিগণের প্রতি এরূপ বিচার, সে দেশের চরণে প্রণাম।" আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইব, সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকিব, ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য; শাস্ত্র যদি ইহাতে সাহায্য না করিয়া প্রতিকূলাচরণ করে, তবে সে শাস্ত্রকে গঙ্গা জলে ফেলিয়া দেও; দেশাচার যদি ইহার বিরোধী হয়, তবে তাহাকে ঘৃণাপূর্ব্বক উপেক্ষা কর, তোমার প্রবৃত্তি যদি ইহার প্রতিকূল হয়, তাহাকে বিনাশ করে।

একমাত্র ধর্ম্মই মানবজীবনের লক্ষ্য এবং ধর্ম্মই মানব কার্য্যের বিচারক। কিন্তু ধর্ম্ম

কি? কেহ হয়ত বলিবেন, শাস্ত্রকে ছাড়িয়া আবার ধর্ম্ম কি? শাস্ত্রে যাহা আদেশ করিয়াছে, সে আদেশ ধর্ম্মার্থেই করা হইয়াছে; সেইরূপ কেহ কেহ এমনও বলিতে পারেন, ধর্ম্মোদ্দেশে যে সকল শিষ্টাচার প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে ধর্ম্মবিরোধী হইবে? ধর্ম্মের উদ্দেশে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মোদ্দেশেই শিষ্টাচার প্রচলিত হইয়াছে, ইহা যথার্থ; কিন্তু ধর্ম্ম, শাস্ত্র কিম্বা লোকাচারে বদ্ধ নয়। ধর্ম্ম এ সকলের অতীত। পরমেশ্বরে বিশুদ্ধ প্রীতি-জনিত যে আধ্যাত্মিক যোগ,—যে যোগ নিবন্ধন মানবাত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা দ্বারা মানবের হৃদয় মন পবিত্র হয়, ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা মানব হৃদয় অনুপ্রাণিত হয়, সত্য ও ন্যায় পথে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়, সেই আধ্যাত্মিক যোগ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই ধর্ম্ম জীবন যদি মানুষ পায়, তাঁহার পক্ষে আর শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রয়োজন থাকে না। সে আপনাপনি সুরক্ষিত হয়। তাঁহার জন্য শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রয়োজন নাই, কারণ সে ধর্ম্ম জীবনের দ্বারাই শাসিত। যে অন্তরে এ আলোক পাইয়াছে, তাঁহার নিকট শাস্ত্রের বা লোকাচারের আলোক অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। উপনিষদে আছেঃ—

"অপরাঋগ বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-থর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তছন্দো জ্যোতিষ মিতি অথপরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে॥"

অর্থঃ—"ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ, এ সমুদায়ই নিকৃষ্ট বিদ্যা, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।"

যিনি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট এ সকল শাস্ত্র নিকৃষ্ট। ভগবদ্গীতাতে আছেঃ—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

অর্থ—"সমুদায় দেশ জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইলে লোকের সামান্য জলের চৌবাচ্ছাতে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, ঈশ্বরকে যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও চারিখানি বেদে ততটুকু প্রয়োজন।" ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে? যে ধর্ম্মকে জানিয়াছে, ঈশ্বকে ডাকিয়াছে, প্রাণে আলোক দেখিয়াছে, সে তাঁহারই শক্তির দ্বারা শাসিত হয়, ধর্ম্ম তাহার নিকট প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, সুতরাং যে শাস্ত্র, যে দেশাচার বা যে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের পরিপন্থী, তাহা তিনি বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

জাতীয়ত্ব।

ভাল কথার মিছেও নাকি ভাল, তাই এই পরপদ-দলিত, অসার, পরানুকরণ-তৎপর দেশে যখনই জাতীয়ত্বের সঙ্গীত শুনি, যখনই বহুদিন বিস্মৃত আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার কথা শুনি, ভাল হউক মন্দ হউক, তখনই সেই কথায়, সেই গীতে এ দুঃখ জর্জ্জরিত হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে থাকে। কিন্তু হায়, আবার যখন তন্মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাই

যে, এ জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা নহে, এ তাহার বিনাশ সাধন, এ তাহার মস্তকে কুঠারাঘাত, তখন আবার তেমনি দ্বিগুণিত বিষাদে হৃদয় পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে এই যে জাতীয়ত্ব স্থাপনের জন্য একটা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, যে কোলাহলে বঙ্গের অচিন্তাশীল লোকদিগের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছে, ইহাতে কোন সাধু ফল প্রসূত হওয়া দূরে থাকুক, ইহাদ্বারা দেশের মহানিষ্ট সাধিত হইতেছে। সমাজের নেতা, চিন্তাশীলদিগের আর চুপ করিয়া থাকিবার অবকাশ নাই, তাঁহাদিগকে এই সময়ে, চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া—এই সকল ভ্রম প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইতে হইয়াছে। এই সকল জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠাতাদিগের বক্তৃতায় ও লিপিতে যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সার মর্ম্ম এইঃ—"দেশীয় শাস্ত্র, দেশীয় ধর্ম্ম, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় ভাষা, ইহাই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়—হিন্দু ধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম নাই, হিন্দুর জ্ঞানের মত উন্নত জ্ঞান নাই, অতএব সর্ব্বপ্রকার দেশীয় চির প্রচলিত প্রথা সকলকে আলিঙ্গন কর, আর ম্লেচ্ছের ধর্ম্ম, ম্লেচ্ছের জ্ঞান অতি অপবিত্র, অতি অসার, অতএব তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য হও, ম্লেচ্ছের কাছে কিছু শিখিবার নাই, ম্লেচ্ছের সাহিত্যাদি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিও না।" এই চিৎকার যে সকল চিন্তাশীল মহোদয়দিগের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তাঁহারা হয়ত এ সকল কথা শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, এমন কথা কি কেহ এ কালে প্রচার করিতে পারে? আমরা তাঁহাদিগের উদ্দেশে বলিতেছি, আমরা এই সকল কথা কল্পনা করিয়া গড়ি নাই; তাঁহারা যদি এই অচিন্তাশীলদিগের মুখপাত্র স্বরূপ সংবাদপত্র পাঠ করেন, এবং ইহাদিগের চালক দুই এক জন বক্তার কথা শুনেন, তাহা হইলে ইহা ঠিক কি না, বুঝিতে পারিবেন। দেশীয় আচার ব্যবহার ও দেশীয় শাস্ত্রের দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্তি নাই। শাস্ত্রের মধ্যে, আচার ব্যবহারে, প্রথাপদ্ধতিতে এমন কি মহা বিষবীজ লুক্কায়িত ছিল, যাহার ফলে আজি আমরা পরাধীন, পরপদানত; আবার সেই শাস্ত্রে এমন কি পবিত্র শুভফলময় মহাবৃক্ষের অঙ্কুর ছিল, যাহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া আজি আমরা পরপদানত হইয়াও জীবিত ভবিষ্যতের উন্নতির আশায় আশ্বস্ত; আমেরিকা, নবজিলন্দ বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় একেবারে উৎসন্ন হই নাই? ইহার কোন কথারই তথ্যানুসন্ধান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই দুই দিক হইতেই দেশীয় শাস্ত্রের দিকে, দেশীয় রীতি নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, ইহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অখণ্ড পূর্ব্ব-প্রথা-প্রতিষ্ঠাতাদিগের দৃষ্টি এতদূর পৌঁছে কি? তরলমতি লোকদিগের প্রকৃতিই এই যে, যখন যে ধুয়া ধরে, তাহা ছাড়ে না। "যাহা দেশীয় সব ভাল, যাহা বিদেশীয় সব মন্দ। ইহাদের চালকগণ এই সুবিধা পাইয়া *Ad hominum* নামক যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সকল লোকদিগের তরলচিত্তে তরঙ্গ তুলিতেছেন! একবার বল "আমাদের ভারত" "আমাদের শাস্ত্র", তোমার কথা সহস্র অর্থ শূন্য হউক, সহস্র অসার হউক, অমনি এই শ্রেণীর লোকদিগের দ্বারা উহা অমূল্য রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে। বাগ্মীবর বার্ক এই সকল ব্যবহারকে "Levity of the vulgar" নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন রীতিনীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথার চিন্তায় সত্যসত্যই বড় সুখ হয়। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদিগের জ্ঞান মাহাত্ম্য আজি নব্য ইউরোপে ঘোষিত হইতেছে, ইহা কি পতিত আর্য্যসন্তানদিগের নিকটে সাধারণ আনন্দের কথা! কিন্তু আমরা এত অন্ধ কেন, এত স্বার্থমগ্ন, এত হীনচেতা কেন যে, অপরের ভাল চক্ষে সহে না? আমাদিগের শাস্ত্রের আদর করিয়া জর্ম্মানি আমাদিগের পদলেহন করিতেছেন, না আপনাদিগের উচ্চ জ্ঞানের, উচ্চ উদারতার বিশেষ পরিচয় দিতেছেন? জ্ঞানী না হইলে কি জ্ঞানের আদর জানে, গুণী না হইলে কি গুণের সম্মান করিতে পারে? যে জর্ম্মানেরা আমাদের শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে একটু পড়িয়াছে, এবং আমরা শাস্ত্রাদি কিছু না পড়িয়াই "আমাদের শাস্ত্র, আমাদের শাস্ত্র," বলিয়া লাফাইতে শিখিয়াছি, আমরা যদি মানুষ হইতাম, তবে এই মহৎ উদার জর্ম্মান জাতির মহত্ত্ব ও উদারতা যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, যে মাহাত্ম্যের ফলে তাহারা সরলভাবে আমাদের পিতৃপুরুষদিগের জ্ঞান গৌরবের প্রশংসা করিতেছে, সবিনয়ে সকৃতজ্ঞচিত্তে সেই জাতির সেই সাহিত্য দর্শন মনোযোগ করিয়া পাঠ করিতাম; এবং তেমনি উদারতার সহিত এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতাম, "জর্ম্মানি, তোমার শিলর গেটে হীন প্রভৃতি, হীগল ফিক্‌টে, কাণ্ট স্যুয়েগ্‌লার প্রভৃতি মহাত্মাদিগের চরণতলে বসিয়া আমাদের অনেক শিখিবার আছে।" ইহা কি পরপদলেহন? হায়রে, আজি যদি সত্যসত্যই এ অন্ধকারমগ্ন ভারতে প্রাচীন ঋষির জ্ঞান থাকিত, উদারতা থাকিত, যদি বাস্তবিকই আমাদের জাতীয়ত্ব থাকিত, তবে কি জর্ম্মানিকে এই প্রকার স্তুতিবাদ করিতে মোক্ষমূলর প্রভৃতির স্বুবর্ণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভারতের স্ত্রীপুরুষ আজ অধীর হইত না? পরের নিকটে কিছু শিখিবার নাই, এ কথা যে বলে, তাহার মত মূর্খ ও অজ্ঞান এজগতে আর কে আছে? যে কারণেই হউক, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন শিক্ষিত বাঙ্গালার কণ্ঠলগ্ন রত্ন, এবং সত্যের অনুরোধে কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি না বলিবেন যে, সেক্ষপীয়র কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ইংরাজী অনভিজ্ঞেরা আপনাদের গৌরব স্থাপনের জন্যে যাহাই প্রচার করুন না কেন, বিদেশীয়দিগকে আপনাদিগের অপূর্ব্ব উদারতার ফলে সহস্রবার ম্লেচ্ছ বলিয়া তিরস্কার করুন না কেন, ইউরোপ যেমন ভারতীয় শাস্ত্র সযত্নে পড়িতেছে, ভারতবাসীও তেমনি সযত্নে ইউরোপীয় শাস্ত্রাদির সবিশেষ আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। যাহাই প্রচার কর, স্পেন্‌সার, মার্টিনু, ডারবিন, ওয়ালেস্, সেক্ষপীয়র, শেলী, রুসো, বার্ক, যীশুখ্রীষ্ট, লুথার, পার্কার আমাদের মহা সম্মানিত গুরু স্থানীয়! এরূপ জাতীয়ত্বের মস্তকে পদাঘাত করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইও না, যাহা কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য আবরণ দ্বারা এই সকল বিদেশীয় উপাদেয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিতে চাহে না! যদি তুমি বেদবেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি ও ভাগবৎ প্রভৃতির প্রতি অনাস্থাবান হও, তবে তুমি হে ভারতবাসি, সত্যসত্যই জাতীয়ত্ব হারাইয়াছ। আবার তুমি যদি জাতীয়ত্বের নামে ভিন্ন দেশস্থ বলিয়া কোন জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভ করিতে অনধিকারী হও, তবে বুঝিব, তুমি মৃত, তুমি মূর্খের মূর্খ, তোমার না আছে

জাতীয়ত্ব না আছে কিছু; কেবল আছে—চিৎকার ও বাচালতা।

যদি একথা কেহ প্রমাণিত করিতে পারেন যে, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মনীতি হইতে কোমতের প্রত্যক্ষবাদ পর্য্যন্ত, আরিষ্টটলের তীক্ষ্ণ জ্ঞান হইতে স্পেন্সরের গভীর গবেষণা পর্য্যন্ত, হোমর হইতে টেনিসন বা স্যুইন্‌বার্ণ পর্য্যন্ত, যাহা কিছু প্রচারিত, কথিত বা লিখিত হইয়াছে, সমুদায়ই প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে প্রাপ্তব্য, তবুও কি বলিতে পার, তবুও কি চিরদিনের জন্য ধরিয়া লইতে পার যে, যাহা আমাদের আছে, যাহা লোকহিতার্থ চাই, তাহা সকলি তাহাতে বর্ত্তমান; বিদেশের কিছু লইবার নাই এবং কখনও লইতে হইবে না? আদৌ ত একথা ধরিয়া লওয়াই অযৌক্তিকতা যে, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বিদেশে হইয়াছে, তাহা সকলি আমাদের আছে। তাহার পরে আবার কি এটাও মানিয়া লইতে হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান? প্রচার-যোগ্য বিদেশীয় সত্য সকল যদি দেশীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়; তবে তাহা জাতীয়ত্বের পোষাক পরাইয়া প্রচার করায় বিশেষ ফলোদয় আছে, স্বীকার করি; কিন্তু যখন সর্ব্ব প্রকারের সত্য ও জ্ঞানের কথায় কেহ শেষ মীমাংসা করিতে পারেন না; আর যাহা কিছু সত্য বুঝিব, ভাল বুঝিব, তাহাই যখন একমাত্র গ্রহণীয়, তখন এ প্রকার শিক্ষা কি নিতান্ত সংকীর্ণ ও অনিষ্ট উৎপাদক নয় যে, যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হইবে, সমুদায়ই শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে? এরূপ শাস্ত্র মাহাত্ম্য প্রচার কি কুসংস্কার প্রচার হইতে ভিন্ন? কোন কোন বুদ্ধিমান লোক প্রচার করিতেছেন যে, "যাহা কিছু শাস্ত্রে রহিয়াছে, সকলি গ্রহণীয় হইতে পারে না, মনুতে ভালও আছে মন্দও আছে; বুদ্ধির চালনা দ্বারা মীমাংসা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে হইবে; হিন্দু শাস্ত্র অগাধ সমুদ্র, তবুও ইহা হিন্দু শাস্ত্র হইতেই করিতে হইবে।" হিন্দু শাস্ত্র সকল যত্নে অধীত হয়, সে ত বড়ই সুখের কথা। কিন্তু এরূপ শিক্ষার দুইটী প্রধান দোষ বর্ত্তিয়া থাকে। ১ম, শাস্ত্রের প্রতি একটা বৃথা অনুরাগ প্রচার; একথা এই মাত্র একবার বলিয়া আসিলাম। ২য়তঃ একটা কথা যদি সত্য বুঝা যায়, আর যদি তদনুরূপ কোন ভাব শাস্ত্রে (থাকিতে পারে কিন্তু) দৃষ্ট না হয়; তবে সেই সত্য প্রচারের অনুরোধে শাস্ত্রের কোন কোন অংশের অসরল অর্থ করিয়া কি মিথ্যার জালে আপনাকে এবং ভ্রমের জালে শিষ্যদিগকে জড়াইতে বাধ্য হইতে হয় না? তখন সত্যের নামে অসত্য প্রচার করিতেই হয়। এরূপ যে হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যুক্তি-সম্মত নব বিজ্ঞানের সৃষ্টি বিবরণের সহিত যখন বাইবলের সৃষ্টি বিবরণ মিলিল না, ধর্ম্মারক্ষার্থ তখন পাদরী সাহেবেরা এক এক দিনের অর্থ এক এক হাজার বৎসর ইত্যাদি নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধির খেলা বা মিথ্যার খেলা খেলাইলেন। এ দেশেও শাস্ত্র-ভক্তেরা তেমনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। Metempsycosis এর মত Evolution এর ঘাড়ে চাপাইয়া,—অজ্ঞেয়তাবাদ দিয়া পুত্তলিকা গড়াইয়া,—প্রত্যক্ষবাদকে ভাগবত ব্যাখ্যা বলিয়া—, ডারবিন, স্পেন্সার ও কোমৎ শিষ্যদিগকে হিন্দু করিবার চেষ্টা হইতেছে। এরূপ

জাতীয়ত্বের আদর সর্ব্বথা পরিহার্য্য, এরূপ কপটতার প্রশ্রয় সর্ব্বথা নিন্দনীয়। বাল বিধবার কষ্ট মোচন করিতে আমার সাধ্য নাই; আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ, তবে আমার আত্মমত বজায় রাখিবার জন্য বুদ্ধির খেলা কেন, ম্যাল্‌থাসের দোহাই দেওয়া কেন? সরল ভাবে আপনার আপনার মত প্রচার কর; নাস্তিকতা হউক, অজ্ঞেয়তাবাদ হউক, আস্তিকতা হউক, যাহা সত্য, তাহাই ষ্টিকিবে। সত্যের অপলাপ করা, কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া কখনও উচিত নহে; ইহাতে জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না; বরং জাতিয়ত্বের বিনাশ হইবে। যাহাতে জাতীয়ত্ব যায়, যেখানে প্রকৃত পরাধীনতা ও দাসত্ব, তোমরা সেখানে গোলাম; কেবল যেখানে অহিত, সেখানেই এই ধুয়া ধরিয়া কোলাহল কর।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। নীহারিকা। "বণলতা" রচয়িত্রী-কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৸৹। এই কবিতাগ্রন্থ খানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রমণী রচিত বলিয়া নহে, পুরুষে লিখিলেও নিঃসংশয়ে ইহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করা যায়। যদি ভাবে আদিমত্ব থাকে, ভাষায় মাধুরী ও প্রাঞ্জলতা থাকে, যদি কবিতাগুলি সত্য সত্যই হৃদয়স্পর্শী হয়, তবে তাহার প্রশংসায় স্ত্রী পুরুষে ভেদ দৃষ্টি হইবে কেন? বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আজি আনন্দিত হইতেছি। এ দিকে ভারতীর মত মাসিক পত্রে "পৃথিবী" রচয়িত্রী প্রতিভাশালিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সুযোগ্যা সম্পাদিকা, আবার দেখি "নীহারিকা" রচয়িত্রী তাঁহার প্রতিভা-প্রসূত ভাবশিশুগুলিকে দরিদ্র বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপহার দিতেছেন। তবে বুঝি এক দিনে ইংলণ্ডের মত আমরাও হারিয়ট মার্টিনু বা জর্জ ইলিয়ট সদৃশী ললনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিব। স্থানাভাব বশতঃ পাঠকদিগকে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিতে পারিলাম না।

২। বাল্য সখা (দ্বিতীয়ভাগ) শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত। মূল্য ১০ আনা। বাল্য সখা প্রথমভাগ পড়িয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, দ্বিতীয়ভাগ পড়িয়াও তেমনি সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখানি আবার গদ্য ও পদ্যময়। "মেনার্ডের বীরত্বের" মত সুন্দর নীতি পূর্ণ গল্প বালক পাঠ্যগ্রন্থে আর দেখি নাই। "পদ্ম ফুল" প্রভৃতি কবিতা গুলি বিশেষ কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। ভরসা করি এখনিও প্রথমভাগের ন্যায় বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইবে।

৩। প্রদীপ (গীতি কবিতাবলী) শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য॥০ আনা। এক শ্রেণীর গীতি কবিতা আছে, যাহা জাতীয় কবিতা বলিয়া কোন দেশেই গৃহীত হইতে পারে না। এই সকল কবিতায় আত্মার তত্ত্বই প্রকাশিত হয়, নির্দ্দিষ্ট জাতির কোন জীবন কীর্ত্তিত হয় না; ইউরোপে সেলী কীটস্, ওয়ার্ডসোয়ার্থ

প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবি। বাঙ্গালায় আমরা অধুনা এই শ্রেণীর কবিতার অভ্যুদয় দেখিতেছি। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদলে অগ্রণী। অক্ষয় বাবুও সেই শ্রেণীর গীতি কবিতায় প্রদীপ লিখিয়াছেন। এক শ্রেণীর লেখক বলিয়া অনেকে অক্ষয় বাবুকে রবীন্দ্র বাবুর শিষ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। প্রদীপে "রজনীর মৃত্যু" "পুনর্ম্মিলনে" "নিশীথ গীত" প্রভৃতি পড়িয়া আমরা অক্ষয় বাবুকে শত ২ ধন্যবাদ দিয়াছি। তাঁহার কবিত্বময় স্বাধীন লেখনী অনেক মধুর কবিতার ভবিষ্যত জননী হইবে, এমন আশা করি। একটা কথা, অক্ষয় বাবু যেন স্থানে ২ ইচ্ছা পূর্ব্বকই একটু mystic হইয়াছেন; Mysticism গুণ নহে, বরং উহাতে দোষ স্পর্শে। আশা করি, এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তিনি একটু সতর্ক হইবেন।

৪। সাধনবিন্দু—ধর্ম্মসাধন বিষয়ক প্রবন্ধাবলী—শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০। ধর্ম্ম সাধনের প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত, উচ্চ সাধকগণের জন্য নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ভূমিকায় একথা লিখিয়াছেন, এ বিনয় উক্তিতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। সহজ ভাষায় গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব সকল সাধারণকে বুঝাইবার জন্য সীতানাথ বাবু বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তকের নিতান্ত অভাব। সাধনবিন্দু বঙ্গ সমাজে আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

৫। স্বাস্থ্য-সোপান, প্রথম প্রস্তাব, জল। শ্রীযুক্ত বাবু ভারত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নববিজ্ঞান জল সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে যত দূর বলা যাইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে বলা হইয়াছে। গ্রাম্য অজ্ঞ লোকেরা কি করিয়া জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় জলকে দূষিত করিয়া থাকে, তাহাও এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য সোপানের অপরাপর খণ্ড দেখিয়া আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

৬। নারীশিক্ষা—দ্বিতীয়ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ৸৹। অন্তঃপুরিকা ও বিদ্যালয়স্থ ছাত্রীগণের ব্যবহারার্থ। যাঁহাদিগের জন্য পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্ম, এ সকল সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে—তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। গৃহকার্য্য ও পারিবারিক চিকিৎসাদি সম্বন্ধে ২। ৩ টী প্রবন্ধ থাকিলে ভাল হইত। পারিবারিক চিকিৎসা অতি প্রয়োজনীয়। আর একটী কথা, পুস্তকের মূল্য আরো কিছু অল্প হইলে ভাল হইত। স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে এদেশের অনেকেই কুণ্ঠিত। আমরা জানি, মূল্য অধিক হইয়াছে বলিয়া কোন এক সভার পাঠ্যতালিকায় এ পুস্তকখানি সন্নিবেশিত হয় নাই। বামাহিতৈষীগণের সর্ব্বদা সুলভ গ্রন্থ প্রচার করিতে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৭। ব্যবসায়ী—শ্রীশ্রীনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত; এরূপ পত্রিকা প্রচারে দেশের মহৎ উপকারের আশা করা যায়; ইহা উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হইতেছে। (৮) চিকিৎসাসম্মিলনী, ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত—এরূপ পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নাই—এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজির গুণ মাহাত্ম্য একত্রে কীর্ত্তিত। পত্রিকাখানি দ্রুতকাল-

স্থায়ী হইলে দেশের মহৎ উপকার হইবে। (৯) সৎসঙ্গ—শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। (১০) তপস্বিনী—শ্রীজীবনচন্দ্র ভক্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (১১) শ্রীহট্টসম্মিলনীর সপ্তম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—১২৯০-৯১; সভার কার্য্য বেশ চলিতেছে, খরচ বাদে হস্তে ৪৫৩।/৫ স্থিত আছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। (১২) কালীকচ্ছ সার্ব্বজনিক সভার প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, সভাটী স্থায়ী হয়, প্রার্থনীয়। (১৩, ১৪, ১৫) তরণীসেনবধ, যদুবংশধ্বংশ ও রাজা বিক্রমাদিত্য নাটক, বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত; থিয়েটরে অভিনীত। রাজকৃষ্ণ বাবুর পুস্তক যেমন হয়, তেমনি হইতেছে—কলম অবিশ্রান্ত চলিতেছে—কিন্তু উন্নতিও নাই, অবনতিও নাই। (১৬) ভারতে দুর্গোৎসব—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। গ্রন্থকার যে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, মতামত প্রকাশ করিতে ভয় হয়। (১৭) ভগ্ন-আশা, শ্রীতশাহুদোন হোসেন প্রণীত। পুস্তকখানি মুসলমানের লিখিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লিখিতেছেন, ভালই। সমালোচনার প্রয়োজন নাই। (১৮) ভারতগীতি—ভারতভৃত্য প্রণীত। প্রচলিত গীতের সুর মিলাইয়া পদ্য লেখা চলে না, এইজন্য কবিত্বের অংশে পুস্তক ভাল হয় নাই। স্বদেশ উদ্দীপনায় পূর্ণ বলিয়া এ পুস্তকখানির বিশেষ আদর হওয়া উচিত। (১৯) কলিসংহার নাটক—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক যেমন হইয়াছে, এখানি তেমন হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। (২০) সংসার, নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস। মূল্য ১৲; পুস্তকখানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই; ইহাতে শিখিবার কিছু আছে। (২১) হেমপ্রভা, উপন্যাস, শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত প্রণীত;—এখানি খুব উচ্চ দরের উপন্যাস নহে বটে, কিন্তু পড়িয়া সুখ পাওয়া যায়, সময় বৃথা গেল মনে হয় না। (২২) নজির সংগ্রহ—বৃহৎ ইণ্ডেক্স—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আইন ব্যবসায়ী লোকেরা ইহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। (২৩) জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখান। এই পুস্তকখানি আমরা অনেক দিন হইল পাইয়াছি। পুস্তকের মতের সহিত আমাদের মিল নাই—মতের ভ্রম দেখাইতে হইলে বৃহৎ একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। গ্রন্থকার যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। আছে থাকুক। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। গ্রন্থখানি গবেষণা পূর্ণ। লেখা চিন্তাশীল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পুস্তকের ভাষা বড়ই জটিল হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি অনুবাদক না হইতেন, তবে এ দোষ বোধ করি ঘটিত না। আমাদের মতে যিনি যাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখেন নাই, তাঁহার সে কথা না লেখাই ভাল। (২৪) রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়ের বিধবা বিবাহ বিষয়ক অনুষ্ঠানলিপি। রাজা প্রমথভূষণের সৎঅনুষ্ঠানের প্রশংসা করিবে না, এমন শিক্ষিত লোক বাঙ্গালায় অতি অল্প। রাজা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উৎসাহ-স্থায়ী হউক, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

"অষ্টাঙ্গ হৃদয়", মোক্ষমূলর কৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি," "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন" ও "বঙ্গগৃহ" প্রভৃতি পুস্তকের সমালোচনা স্থানাভাব বশতঃ এবারে গেল না।

অজ্ঞেয়তাবাদ ও নাস্তিকতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

সকলেই বলেন যে, আগুনের দাহিকা শক্তি আছে। দাহিকা শক্তি অর্থ কি? আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, এ কথার অবশ্য অর্থ এই যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে। কিন্তু কেমন করিয়া জানিলে যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে? তুমি এই সহজ প্রশ্নের এই সহজ উত্তর দিবে; "সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে, আগুন পদার্থ সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেই জন্যই বলি যে, আগুন দগ্ধ করিতে পারে; সেই জন্যই জানিয়াছি যে, আগুনের দাহিকাশক্তি আছে।"

আমি বলি, আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে,—আগুন যে পদার্থ সকলকে দগ্ধ করে, ইহা কেহ কখন দেখে নাই, দেখিতে পায় না।

তুমি বলিবে, "সে কি কথা। শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নিতে দেও দেখি, এখনই দেখিবে, অগ্নি উহাকে দগ্ধ করিতেছে।" আমি বলি তাহা কখনই দেখিতে পাইব না, কখন দেখা যায় না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আগুনে কাঠ দিলে কেবল দুটী ঘটনা পরে পরে দেখা যায়। প্রথম ঘটনা এই দেখি যে, অগ্নির সহিত কাষ্ঠের সংশ্রব হইল; দ্বিতীয় ঘটনা এই দেখি যে, কাষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে। অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠ দিলে পরে পরে এই দুটী ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রথম ঘটনার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় ঘটনাটী সংঘটিত হয়

আগুনের সহিত কাষ্ঠের সংশ্রব হইল, আর কাষ্ঠ দগ্ধ হইতে লাগিল। এই দুটী ঘটনা ভিন্ন মানুষ আর কিছু দেখিতে পায় না। তবে কেন বল, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে? বলিতে পার, অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; কিন্তু অগ্নি যে কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতেছে, ইহা কি কখন দেখিয়াছ?

কেহ কখন দেখে নাই। তবে কেন বল, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে? সেইরূপ, কখন কি দেখিয়াছ যে, জল শীতল করিতেছে? কখনই না। (১) শীতল জলের সহিত পদার্থের সংশ্রব হইল, এবং (২) উহা শীতল হইল, ইহা ভিন্ন আর কেহ কিছু দেখিতে পায় না।

জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, ইহাও কি কখন দেখিয়াছ? (১) তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শীতল জল পান করিলাম, আর (২) তৃষ্ণা নিবারিত হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তুমি করিয়াছ, সকলেই করিয়াছে। কিন্তু শীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করিল, ইহা কেহই কখন প্রত্যক্ষ করে নাই।

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, বহির্জগতে আমরা পদার্থ ও ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কোন একটী পদার্থ অপর কোন একটী পদার্থকে উৎপন্ন করিল, অথবা কোন একটী ঘটনা অপর কোন একটী ঘটনাকে উৎপন্ন করিল, ইহা কখন প্রত্যক্ষ করি না। পরে পরে ঘটনা সকল ঘটিতেছে, এই মাত্র দেখিতে পাই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। উৎপাদন ক্রিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় নহে;—বিশ্বাসের বিষয়।

যখন উৎপাদন করা বা উৎপাদিত হওয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইল না, তখন শক্তি কেমন করিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে?

শক্তি বলিলে আমরা কি বুঝি? শক্তি কি? যাহা উৎপাদন বা পরিবর্ত্তন করে * কিম্বা উৎপাদন করিতেছে বা পরিবর্ত্তন করিতেছে, ইহা যখন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তখন শক্তি কেমন করিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে? অগ্নির দাহিকা শক্তি. জল বা বরফের শীতল করিবার শক্তি, অন্নাহারের ক্ষুধা নিবারণ শক্তি, জলস্রোতের ভাসাইয়া লইবার শক্তি, বায়ুর উড়াইয়া দিবার শক্তি, বজ্রের ভাঙ্গিয়া ফেলিবার শক্তি, প্রভৃতি বহির্জগতের কোন শক্তিই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। শক্তি যেমন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সেইরূপ যে উহা অনুমানের বিষয়ও হইতে পারে না, তাহা প্রথম প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শক্তি যে কোন প্রকার স্থূল অথবা সূক্ষ্ম জড় নহে. তাহাও প্রথম প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, শক্তি কোন রূপ জড়ীয় গুণ কি না? জড়ীয় গুণ কাহাকে বলে? যাহা চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড়ীয় গুণ। † শক্তি চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সুতরাং শক্তি জড়ীয় গুণ নহে।

শক্তি যখন জড় অথবা জড়ীয় গুণ হইল না, তখন শক্তিকে কি বলিব? যাহা জড় * বা জড়ের গুণ নহে, তাহা অবশ্য আত্মা বা আত্মার গুণ। কেন? জড় ও আত্মা ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন পদার্থ কি থাকিতে পারে না? কেন পারিবে না? অবশ্য পারে। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আমাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় বা শক্তি নাই, যদ্দ্বারা জড় ও আত্মার অতীত কোন পদার্থকে জানিতে পারি। সেরূপ কোন পদার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান। সুতরাং শক্তি যদি জড়ীয় গুণ না হয, তাহা হইলে উহা অবশ্য আত্মার গুণ হইবে।

বহির্জগতে শক্তিকে দেখিতে পাইলাম না। এখন তাহার অন্বেষণার্থ অন্তর্জগতে প্রবেশ করি। বহির্জগতে যেমন ঘটনার পর ঘটনা, অন্তর্জগতেও সেইরূপ ঘটনার পর ঘটনা; একটী মানসিক অবস্থার পর আর একটি মানসিক অবস্থা। জড়জগতে যেমন নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিয়ত নিরপেক্ষ পরবর্ত্তী ঘটনা রহিয়াছে, মনোজগতেও সেইরূপ। তবে কি বহির্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও শক্তিকে দেখিতে পাইব না।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া যাহাকে

* শক্তির লক্ষণা করিতে হইলে, "যাহা পরিবর্ত্তন করে," এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়। প্রথম প্রবন্ধে সেই রূপই বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল অধিক স্পষ্ট কবিবার জন্য 'উৎপাদন' শব্দ ব্যবহৃত হইল। একটীও পরমাণু উৎপাদিত হইতে পারে না; ঘটনা উৎপাদিত হয়। কিন্তু পরমাণু বা ঘটনা যাহাই কেন উৎপাদিত হউক না, পরিবর্ত্তন শব্দই যথেষ্ট। ছিল না, হইল; এই পরিবর্ত্তন।

† চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়, জড়ীয় গুণ ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারে না। আবার জড়ীয় গুণ সকল চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য প্রকারে জ্ঞেয় নহে। সুতরাং যাহা চক্ষুরাদি শারীরিক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তাহাই জড়ীয় গুণ, এইরূপ বলিলেই জড়ীয় গুণের সর্ব্বোত্তম লক্ষণা হয়।

* জড়ীয় গুণ ভিন্ন গুণাধার জড় কিছু আছে কি না, তাহা এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জড় শব্দ সামান্যতঃ জড়পদার্থ অর্থেই ব্যবহৃত হইল।

দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, আপনার অন্তরেই তাহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা যায়। অন্তরেই শক্তি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।

বহির্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও ঘটনার পর ঘটনা, অবিরল ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু এখানে এমন কিছু আছে, যাহা বহির্জগতে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাহা কি?

প্রত্যেক মনুষ্য আপনার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাকে। আমি করিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই অনুভূত বিষয়। আমি চিন্তা করি, অনুভব করি, ইচ্ছা করি, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যই জানিতেছেন। আপনার কর্ত্তৃত্ব মনুষ্য মাত্রেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়।

পদে পদে জানিতেছি যে, আমি কর্ত্তা; আপনার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতেছি। কর্ত্তৃত্ব অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি অনুভব করিতেছি। শক্তি ব্যতীত কর্ত্তৃত্বের কোন অর্থই নাই। কর্ত্তৃত্ব অনুভব করার অর্থ কি? করিতে পারি, অর্থাৎ আমার করিবার শক্তি আছে, এরূপ অনুভব করা।

"আমি করিব" এই কথা যখন বলিলাম, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি। "আমি করিব, এই বাক্যটীর অর্থ কি? আমার শক্তিকে কার্য্যসাধনার্থ প্রয়োগ করিব। "আমি করিতেছি" ইহার অর্থ কি? আমার শক্তিকে কার্য্যসাধনার্থ প্রয়োগ করিতেছি। করিব বা করিতেছি ইত্যাদি শব্দে মনের যে ভাব প্রকাশ করে, তাহাতে শক্তির অনুভূতি সুস্পষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনার শক্তি অনুভব না করিলে কেহ বলিতে পারে না 'করিব' বা 'করিতেছি।

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয় সম্বন্ধেই আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। ইচ্ছামাত্রে শারীরিক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালনা করিতেছি। হাত উঠুক, হাত উঠিল; পা চলুক, পা চলিল; নয়ন ফিরাই, নয়ন ফিরিল। আবার শরীরের সাহায্যে বহির্জগতের অন্যান্য পদার্থকেও পরিচালনা করিতেছি। তবে এই শক্তির অবশ্য সীমা আছে।

অন্তর্জগতে মানসিক ভাব সকলের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্বশক্তি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। এটা ভাবিব না, ওটা ভাবিব; এ দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিব না, এ ইচ্ছাকে দমন করিব; এই প্রকার প্রতিজ্ঞায় আমরা আমাদের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাকি। কেবল প্রতিজ্ঞা নহে; আমরা কার্য্যতঃ অন্তর্জগতের ঘটনানিচয়কে পরিচালিত করিতেছি। ভাঙ্গিতেছি, পড়িতেছি, রাখিতেছি, তাড়াইয়া দিতেছি; মানসিক ভাব সকলের উপর আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছি।

মনে করিলাম, একটা বৃক্ষ হোক্। অমনি বৃক্ষ হইল। বৃক্ষকে শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলে সুশোভিত করিলাম; অমনি সুশোভিত হইল। তারপর বৃক্ষের কতকগুলি পত্র ও পুষ্প ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; কতকগুলি ফল পাড়িয়া ফেলিলাম; গোটা-কতক ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। অবশেষে, সমগ্র বৃক্ষটীকেই বিলুপ্ত করিয়া দিলাম।

বলিলাম একটা পর্ব্বত হোক্। অমনি একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইল। পর্ব্বতের শেখরদেশ শুভ্র তুষারে মণ্ডিত করিলাম; কক্ষদেশ নিবিড় তরুলতার হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত করিলাম; রৌপ্যতন্ত্রীবন্নিভ সঙ্কীর্ণ নদী

মানুষ প্রেম ভিক্ষা পায়! মানুষকে যখন মানুষ ভালবাসিতে পারে না, তখন অনন্ত প্রকৃতিতে নিমগ্ন হইয়া মানুষ প্রেমিক হইয়া ফেরে। অথবা যখন মানুষের হৃদয় অহঙ্কারে স্ফীত, মুখ মলিন, জীবন মৃতের ন্যায়, তখনই প্রকৃতি মানুষকে ডাকিয়া এই গভীর তত্ত্ব শিক্ষা দেয়।

বিশ্বের অন্তরালে যে অনন্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে যে প্রেমের অনন্ত উৎস খেলিতেছে, কার আদেশে কে জানে, তাহাতে মানুষ ডুবিলে তবে আনন্দ এবং প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া সংসারে ফেরে। প্রকৃতিতে মজিয়া মজিয়া মানুষ যখন প্রেমে মাতোয়ারা হয়, তখন এই সংসার তার নিকটে স্বর্গের ন্যায়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম-মাতোয়ারা যাঁহারা, তাঁহারাই জগতে পূজ্য। প্রকৃত প্রেমিকের নিকট—ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, জীবন মরণ সমান। ভেদাভেদ সেখানে থাকে না। মায়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। মায়ের মঙ্গল ইচ্ছার জয় সতত সে প্রতি ঘটনায় দেখে। তাঁর প্রাণ মরণের ওপারে ছুটিয়াছে;—তাঁর প্রাণ জীবন মরণের অতীত।

প্রকৃতিকে কখনও ভালবাসে নাই, এমন মানুষের কথা শুনা যায় না। অতি অসভ্য জাতিও প্রকৃতি রপূজা করে। প্রকৃতিতে মোহিত এবং স্তম্ভিত সকলেই,—অল্প বা অধিক পরিমাণে। ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন—"ক্ষুদ্র কারাগৃহের গবাক্ষপথ দিয়া অনন্ত নীলিমাময় আকাশ এবং অনন্ত উর্ম্মিমালাময় সাগর আমার নয়নগোচর হইত, তাহাতেই আমি শান্তি এবং সুখ পাইতাম; এবং মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাখী গৃহে আসিয়া কি যেন অমৃত বা অনন্তের সংবাদ কাণে ঢালিয়া দিয়া চিন্তাকাতর প্রাণকে মাতাইয়া যাইত।" আমি বলি, কেবল তাহা নয়;—ধীরে ধীরে ঐ অনন্ত প্রকৃতিতে ডুবিয়াই ম্যাট্‌সিনি প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন! অস্ত্রাঘাত-শোণিতপাতে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,—দেশের শত শত লোকেরা চক্রান্ত করিয়া ভিক্টর ইমানিউএলকে সিংহাসনে বসাইতেছে—প্রাণতুল্য গ্যারিবল্ডিও প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছেন—কিন্তু তবুও প্রেমাবতার ম্যাট্‌সিনি দেশের মঙ্গল, স্বদেশী ভ্রাতাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন! এই গভীর প্রেমের শিক্ষাগুরু,—ঐ অনন্ত আকাশ, ঐ অনন্ত সাগর এবং ঐ অনন্ত সংবাদ-বহনকারী ক্ষুদ্র পাখী, মনে রাখিবে। প্রকৃতি সেবায় ম্যাট্‌সিনি স্বদেশ-বৎসল। কথিত আছে, প্রকৃতিসাধন-রত লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসর অনাহারে থাকিয়া মেঘনাদ-বধের ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কথাটা প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইবে,—লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসর প্রকৃতিসেবায় রত থাকিয়া সিদ্ধ হইয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শস্থল হইয়াছেন। শাক্যসিংহ রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অনেক বৎসর অরণ্য বাস করিয়া সিদ্ধ বা বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তার অর্থ—ঐ অনন্ত প্রকৃতির নিকট প্রেমতত্ত্ব শিখিয়া, অহং-বিসর্জ্জন দিতে পারিয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া তিনি মানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট মরণকালে শত্রুদের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শত্রুদের মঙ্গলের জন্য দেহপাত করিয়াছিলেন। ইহাপেক্ষা গভীর প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নাই। এই খ্রীষ্ট—সর্ব্বদাই পর্ব্বতে, জঙ্গলে বাস করিতেন। অনন্ত প্রকৃতি ইঁহারও দীক্ষা-গুরু। অনন্ত প্রকৃতির নিকট প্রেম পাইয়াই যিশু, খ্রীষ্ট

হইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির মূলে এক অনন্ত অধিনশ্বর মহাপুরুষ বিদ্যমান। মানুষ যখনই সংসার কোলাহল ভুলিয়া প্রকৃতির নিকট যায়, তখনই জড়-প্রকৃতির ভিতর হইতে সেই অনন্ত সুন্দর পুরুষ বাহির হইয়া মানুষকে আলিঙ্গন করেন। মুশা তখন বর প্রাপ্ত হন। জন যখন দীক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করেন, খ্রীষ্ট তখন আকাশের আলোক পাইয়া প্রেম-দীক্ষিত হইয়া, অরণ্য হইতে ফিরিয়া সংসারের জন্য দেহপাত করিতে সমর্থ হন। তিনি তখন জগতের, জগৎ তখন তাঁহার। জীবন ও মরণ—তখন তাঁহার নিকট উদ্দেশ্যসিদ্ধির রূপান্তরিত দুটী অবস্থা মাত্র। মরিয়াও তখন তিনি জীবিতের ন্যায়, বাঁচিয়াও তখন তিনি মৃতের ন্যায় ইচ্ছাবর্জ্জিত জড়-প্রকৃতিক। তুমি প্রেকৃতিতেও ডুবিবে না, মানুষকেও সম্মান করিবে না, অথচ সেই মহাপুরুষকে দেখিবে, প্রেমিক হইবে, এ কেমন কথা? যাও, হৃদয়ে অরণ্য সৃজন কর, পৃথিবীর কোলাহল ডুবাইয়া দেও।—যাও, নির্জ্জন গভীর জীবন্ত প্রকৃতির ভিতরে যাও—সেখানে কেবল বায়ু সো সো বহিতেছে, আকাশে কেবল চাঁদ ফুট্‌ ফুট্‌ জ্বলিতেছে, বৃক্ষে কেবল পাতা সর সর শব্দ করিতেছে, পাখী কেবল গভীর তান ধরিতেছে, সাগরে কেবল উর্ম্মিমালা দুলিয়া দুলিয়া তানে তানে উঠিতেছে, পড়িতেছে। যাও, এমন সুন্দর, এজন মন-মুগ্ধকর স্থানে অন্তত একটী রাত্রি বাস করিয়া এস, তারপর দেখিব, তুমি কেমন নাস্তিক, কেমন অবিশ্বাসী, কেমন অপ্রেমিক! প্রকৃতির মধ্যে যে অনন্ত, চিৎ-শক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে লোক কখনও বিশ্বাসী হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসী না হইলে প্রেমিক হইতে পারা অসম্ভব। অবিশ্বাসী প্রেমিক, একটীও নাই। অবিশ্বাসীর প্রেম, কল্পনার প্রেম; মৃত জীবের শ্মশানের ভস্মের সহিতই তাহা বিলীন হইয়া যায়! বিশ্বাসীর প্রেম অনন্ত কাল স্থায়ী, অবিনশ্বর—ইহকাল পরকাল ছাইয়া তাহা জ্বলে,—তাহা অনন্ত জগতে অনন্ত-বিস্তৃত। এইরূপ প্রেমিকই পূজ্য। এইরূপ প্রেমিকই ধন্য। এইরূপ প্রেমিকই মিলনের মহাশাস্ত্র বুঝিয়াছে। একে প্রেম, একে বিশ্বাস, একে প্রাণ না সঁপিলে কিছুতেই সেরূপ প্রেমিক হওয়া যায় না। প্রকৃতি সাধনে সিদ্ধ হইলে মানুষ সেই প্রেম, সেই বিশ্বাস—সেই অনন্ত, সেই চিদাকাশ, সেই সদানন্দকে বুকে পায়। বুকের ধন বুকে বসে। শাক্য তখন বুদ্ধ হন, যিশু খ্রীষ্ট হন, মুশা যোগী হন, নিমাই চৈতন্য হন। মানুষ মরিয়া তবে বাঁচিয়া উঠে। মরার অর্থ—অপনাকে ভোলা। অহংবোধ তখন উড়িয়া যায়। "আপনার স্থান" তখন বিশ্ব গ্রাস করে। আমিত্বের বীজ তখন জগতবৃক্ষে পরিণত। মানুষ তখন আপনা-ভুলিয়া জগতের হইয়া গিয়াছে। জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে; দেশে দেশে তখন মহামিলন হয়। ইহকাল পরকাল, তখন একসূত্রে গ্রথিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী তখন একই সাগরে মিশিয়াছে। দেশ কাল, আকাশ পাতাল সব একীভূত! সংসার তখন স্বর্গে উঠিয়াছে, স্বর্গ তখন সংসারে নামিয়াছে। প্রেমের অবতার প্রেম বিলাইতে তখন জগতে অবতীর্ণ হয়। মানুষ তখন প্রেমে হাসে, প্রেমে গায়,

শাক্যের সমাধি লাভ ও ধর্ম্মপ্রচার।

নিদারুণ সংগ্রামের পর জয়লাভ হইলে সে সুখ অতি অমূল্য, হৃদয়ে তাহাকে পোষণ করিতে হয়, যত্নে তাহার রসাস্বাদন করিতে হয়, পরিতৃপ্ত হইতে সময় চাই। এবং নূতন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লব্ধবিজয়ের পূর্ণ আস্বাদন লইতে সহজেই বাসনা হয়। যে অমূল্য সত্য বোধিমূলে বুদ্ধদেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চারি সপ্তাহ সেই বোধি মূলে নির্জ্জনে একাকী তাহার রসাস্বাদন করেন। এই চারি সপ্তাহ অতীত স্মৃতি, আবিষ্কার-জনিত চিন্তা, চিন্তাজনিত সুখ, সুখজনিত সম্মোহে তাঁহার দিন রাত্রি অতিপাত হয়। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের মূল আশ্রয় করিতেন, এক চিন্তা হইতে অপর চিন্তায় সরিয়া পড়িতেন ধ্যানের পর ধ্যানে মুগ্ধ হইতেন। বস্তুতঃ সে আনন্দের গভীরতা, তাহার উন্মাদকতা, তাহার কোমলতা, তাহার তীব্রতা, সংক্ষেপে তাহার অপূর্ব্বতা সাধারণের সাধ্য নাই যে অনুভব করে। "অবিদ্যা হইতে সংখ্যা, সংখ্যা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে লালসা, লালসা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা, মৃত্যু, যন্ত্রণা, রোগ, শোক, দুঃখ। অবিদ্যারই জন্য যদি অবিদ্যার উন্মূলন হয়, জীব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়, জীব মোক্ষ লাভ করে। যদি কারণ সূত্র জীব একবার বুঝিতে পারে, কার্য্য শৃঙ্খলা অনুসরণ করিতে পারে, তবে মোহের সম্ভাবনা কোথায় থাকে? মধ্যাহ্ন সূর্য্য সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেমনে ব্যোমমণ্ডল রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত করেন, কিরূপে অবিদ্যার বিবর্ত্তনে যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়, একবার বুঝিতে পারিলে কামের সহস্র সহস্র প্রলোভন অতিক্রম করিতে কি সন্দেহ থাকে?" ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। চারি সপ্তাহ এই মন্ত্র জপ করিতে অতীত হইল।

সুখের আতিশয্য হ্রাস হইলে বুদ্ধের হৃদয়ে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। সেই চিন্তার মীমাংসার উপর পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করিয়াছিল। যে মহাসত্য বুদ্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন. সে মহাসত্য একাকী নির্জ্জনে উপভোগ করিবেন,একাকী নির্ব্বান পদ লাভ করিয়া পরিশ্রম সার্থক করিবেন, মানবজন্ম চরিতার্থ করিবেন, পুনর্জ্জন্মের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, অথবা তামসী নিশাচ্ছন্ন মোহনিদ্রাগত নির্জীব জগতে নূতন সত্যের সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়া নবজীবনে উদ্দীপিত করিবেন? স্বার্থপরতা ও হিতৈষণার তুমুল সংগ্রামে বুদ্ধের হৃদয় আলোড়িত হইল, ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল। একদিকে মার পিশুন বলিতে লাগিল, পিতার রাজবৈভব, যশোধরার পবিত্রপ্রীতি, রাহুলের স্নিগ্ধজ্যোতি, জন্মভূমির আনন্দ নিবাস পরিহার করিয়া সাত বৎসর নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধনের পর গোতম যে মহারত্ন উপার্জ্জন করিয়াছ, যে রত্নের সঞ্চয়ে মুহূর্ত্তেক জন্য কেহ তোমার সহায়তা করে নাই, পরন্তু প্রলোভন দেখাইয়া প্রতারণা করিয়া নিন্দা ও কলঙ্ক রটনায় পীড়িত বা বিপথগামী করিয়াছে, সে রত্ন নির্ব্বুদ্ধিভাবে অন্যকে কেন

বিতরণ করিবে. তোমার সঞ্চয় তুমি উপভোগ কর, কৃতার্থ হও, নির্ব্বাণ পদলাভ কর। পক্ষান্তরে ব্রহ্মা সহাম্পতি অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সিদ্ধার্থ জগৎবাসী মোহগত, তোমার মত প্রতিভা কয় জনের?—তোমার মত সাধন বা কে করিবে? যদি স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি অন্ধদিগকে পথ প্রদর্শন না কর, মুমুর্ষুদিগকে ঔষধ বিতরণ না কর, তবে জগতের পরিত্রাণ কোথায়? কে আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ ও বিদেশবাসীকে নিরয় হইতে পরিত্রাণ করিবে? এ মহারত্ন বিতরণে ক্ষয় হইবে না, তোমার নির্ব্বাণপদ অক্ষুণ্ণ রহিবে, পরন্তু তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অপরে পুনর্জন্ম যন্ত্রণায় অব্যাহতি পাইবে। প্রবৃত্তি পরায়ণ অনেকে পূর্ব্বপর অনুধাবন না করিয়া কার্য্য বিশেষে উন্মত্ত হয়—সংস্কার কার্য্যে উদ্যত হয়, সাধন করিলেও করিতে পারে, প্রায়শঃ সহস্র জনে অসম্পূর্ণ রাখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। প্রকৃত প্রতিভা-সম্পন্ন মনীষিগণ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও আপন বলের পরিমাণ তুলনা করিয়া প্রথম পদক্ষেপ করেন। তখন সহস্র বিপত্তি ঝটিকা বা করকাপাতে সে সন্মুখগতি অবরুদ্ধ বা বিপথগামী হইবার নহে।

কেবল স্বার্থপরতার সহিত হিতৈষণার দ্বন্দ্ব হয় নাই। মার পিশুনের অক্ষয় তূণীর নানাবিধ তীক্ষ্ণশরে পরিপূর্ণ ছিল। স্বোপার্জ্জিত ধন আপনি একা উপভোগ করিবে, স্বার্থপরতা জনিত এ চিন্তা সিদ্ধার্থের হৃদয়ে তাদৃশ সম্ভব নহে, সে মহাসত্যের প্রচার আশঙ্কাজনিত পথে বাধা বিপর্য্যয় পরিমাণ হেতু যাদৃশ সম্ভব। যে সত্যের উদ্ভাবনায় তাঁহার মত তীক্ষ্ণধীর সাতবৎসর অতীত করিয়াছিল, যে সত্য মহাপ্রতিভাশালী পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই, সে সত্যকে সত্য বলিয়া সংসারের লোকে কি বিশ্বাস করিবে? অবিশ্বাসী মন তাঁহাকে উপহাস করিয়া কি অন্ধতর তিমিরে পুন জড়িত হইবে না? অবিশ্বাসের কারণ অজ্ঞানতা। যে হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মহা সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ সে হেতুমালা, সে কার্য্যাবিবর্ত্তন সাধারণ লোকে কি বুঝিতে পারিবে? সংসারের লোক মোহনিদ্রিত, সংসারের কণক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে শৃঙ্খলের কনকতায় তাহারা পুলকিত, দাসত্বের গরলতা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে, নরককে তাহারা স্বর্গ বলিয়া ভুলিয়াছে, তাঁহার কথায় তাহারা কি সে সংসার ছাড়িবে—সংসারের আপাত মনোরম মোহিনী মায়া পরিহার করিতে পারিবে? স্ত্রী পুত্র পরিবার ধন জন বৈভব ছাড়িয়া তাঁহার মত সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতে পারিবে? নির্ব্বাণলাভের একমাত্র পথ সন্ন্যাসচর্য্যা, সংসার পরিহার লালসা বিসর্জ্জন। কয় জনে গিরি শৃঙ্গের দৃঢ়ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মত অপরিণত বুদ্ধি যুবকের পরামর্শে তরঙ্গ উন্মাদিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে?

পক্ষান্তরে ব্রহ্মা সহাম্পতি বলিতে লাগিলেন, সিদ্ধার্থ আপনার জন্য জীবনমুক্তি লাভ করিতে যদি এত কৃচ্ছ্রসাধনে পরাঙ্মুখ না হইলে, ভ্রাতৃবৎ তোমার প্রতিবেশীমণ্ডলীর উদ্ধার সাধনার্থ কষ্ট স্বীকারে কেন পরাঙ্মুখ হও? সংসারের ধূলিরাশী মধ্যে বাস করিয়া এখনও সহস্র আত্মা দেহের শুভ্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তুমি দুন্দুভিধ্বনিত করিলে ইহারা অবিলম্বে তোমার পতাকা পার্শ্বে সমবেত হইবে—পরিশ্রম বিফল হইবে

না। যদি একটী আত্মারও পরিত্রাণ সাধন করিতে পার, তোমার গর্ভে ধারণ করিয়া ধরিত্রীর কিছু উপকার সাধিত হইবে। তুমি যে হেতুবাদের কূটতায় আশঙ্কিত হইতেছ, আর্য্য মনাষী মণ্ডলে তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে। জ্ঞানের যে পরিমাণ, বুদ্ধির যে স্ফুটতা তোমার আবিষ্কৃত সত্যের ধারণা হেতু আবশ্যক, আর্য্যাবর্ত্তবাসী সহস্র জনের তাহা অধিগত। সন্ন্যাসী জীবনের যে কঠোরতা সংসার মুগ্ধ মানবের অনতিক্রমের বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, অদ্যাপি কত লক্ষ আর্য্য সন্তান তাহা অতিক্রমণ করিয়াছে। বাধা যত উত্তাল বলিয়া অনুমান করিতেছ, প্রকৃত তত ভয়ানক নহে। যত্ন কর কার্য্যসিদ্ধ হইবে, জগতের পরিত্রাণ তোমার মুষ্টি মধ্যে, কৃপণতা করিও না। সদয় হও, জীবের ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদে কর্ণপাত কর।

মার পিশুন পরাস্ত হইল। জগৎবাসীর পরিত্রাণ সূচক মহাসত্য প্রচারে বুদ্ধদেব দৃঢ়ব্রত হইলেন। বারাণসী চিরদিন ভারতের ধর্ম্ম সাম্রাজ্যের রাজধানী। ভাগিরথী পাদধৌত পবিত্র পুরী কত মহাজনের কঙ্কাল চূর্ণে উর্ব্বরিত। প্রতিভার দিপ্তি, সাধুতার গৌরব, পবিত্রতার শুভ্ররশ্মী রাশী আলোকিত, দেবঋষি কর্ম্মঠগণের চির সেবিত, হৃদয়বানের চির বন্দিত, আর্য্য কবির গরীয়সী উদ্ভাবনা অকারণ তোমাকে মহাদেবের ত্রিশূল শৃঙ্গে অবস্থিত করে নাই। যদি একাধারে বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা ও সাধুতা দেখিতে চাও, বারাণসী দর্শন কর। যদি দিগ্বিজয়ী হইবার বাসনা থাকে, বারাণসীর সংগ্রাম ক্ষেত্র সর্ব্বাগ্রে জয় লাভ কর। এই খানেই অগ্নি পরীক্ষা, এখানে উত্তীর্ণ হইলে শ্যামিকার আশঙ্কা থাকে না। সিদ্ধার্থ তাই সর্ব্বাগ্রে বারাণসীতে নূতন সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার হৃদয়ে বল আছে, আপন মতে বিশ্বাস আছে, সে এখানেই তাহার পরীক্ষা লয়।

যে পাঁচ জন সন্ন্যাসী তাঁহার অনতিদূরে নৈরঞ্জনাতটে যোগ সাধন চেষ্টা করিয়াছিল, সিদ্ধার্থ কৃচ্ছ্রসাধন বিরত হইয়া অন্ন পান পুন গ্রহণ করিলে যাহারা তাঁহাকে পতিত ভাবিয়া তাঁহার সংসর্গ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা এই সময়ে বারাণসীর অন্তর্গত মৃগদাব ঋষিপত্তনে বাস করিতেছিল। তথাগত তাহাদিগের আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই, পরন্তু তাঁহার অসাধু ব্যবহার তাহাদিগের হৃদয়ে জাগিয়া ছিল। তথাগতকে দূরে আসিতে দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু কি যেন কি হইল, তিনি দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা সমুচিত সমাদর করিতে বিমুখ হইল না। বিশ্রাম সুখে পথক্লেশ অপনীত হইলে তথাগত তাহাদিগের নিকট আপন আবিষ্কৃত সত্য প্রকাশ করিলেন, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মৃগদাব ঋষিপত্তনে আরম্ভ হইল। বুদ্ধ কর্ত্তৃক অশ্রুত পূর্ব্ব মহাসত্যের ব্যাখ্যা শ্রবণে তাহারা পুলকিত হইল এবং রীতিমত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কৌণ্ডন্য তথাগতের প্রথম শিষ্য, বৌদ্ধ চমূর জ্যেষ্ঠ সেনানী, ভিক্ষুদলের অগ্রজ। "এই সময়ে জগতে ছয় জন সাধু লোক ছিলেন। তথাগত এবং তাঁহার পঞ্চ শিষ্য।

শিষ্য সংখ্যা শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৌণ্ডন্যাদি পঞ্চ ছবর্গীয়ের দীক্ষা হইবার অনতিবিলম্বে যশ নামে এক সমৃদ্ধিশালী বণিক পুত্র তথাগতের সংঘ্য মধ্যে আশ্রয়

লইয়া সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাহারই অনতিবিলম্বে তাঁহার সহচর ও আত্মীয় স্বজন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। যশের জনক জননীও গৃহস্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এইরূপ বারাণসী ক্ষেত্রে প্রথম আন্দোলনে তথাগত যাটজন শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন। তথায় কয়েক মাস নব-দীক্ষিত শিষ্যদিগকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিয়া তিনি প্রচারার্থ আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন ভাগে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকে নব সত্য প্রচারার্থ এক এক দিকে ধাবিত হয়, দুই জন একত্র যাইতে নিষেধ ছিল। নব প্রাণিত উৎসাহশীল যাটজন লোক অনন্যকর্ম্মা হইয়া একান্ত মনে যুগপৎ বিভিন্ন দিকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আক্রমণ করিলে ফল কি হইতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়। তথাগত স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন না। তিনি নৈরঞ্জনার পুলীন দেশে ক্রিয়া যোগ নিরত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, একাকী সেই শান্ত উরুবিল্বমুখে প্রস্থান করিলেন। এখানে সন্ন্যাসীগণের গুরু কাশ্যপ বংশীয় তিন সহোদর সহস্র শিষ্য সহিত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া জ্ঞান চক্ষু লাভ করেন। কর্ম্মঠ কৃষক ক্ষেত্র বিশেষে শস্যরাশি সংস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার নহে, অমনি ক্ষেত্রান্তরে ধাবিত হয়। কাশ্যপদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি রাজগৃহ নগরে উপস্থিত হন। মগধরাজ বিম্বুসর গৃহস্থ বৈরাগীর দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন শত শত ধর্ম্ম-পিপাসু যুবকগণ দীক্ষা লইয়া ভিক্ষু-সংঘ্যভুক্ত হয়। যুবকগণ চিরদিনই সকল সৎকার্য্যের প্রথম সহায়। বৌদ্ধ সঙ্ঘের ৬ রিষ্য পৃষ্ঠার উজ্জ্বল নাম সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণ এখানেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ গৈরিকধারী, অবনত নয়ন বিনীত প্রশান্ত ভিক্ষুদিগকে দেখিলেই লোকে আকৃষ্ট হইত, আবার তথাগতের মোহিনী বাখ্যা একবার শ্রবণ করিলে মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া কাহারও সাধ্য হইত না সে আশ্রম পরিত্যাগ করে। রাজগৃহে হাহাকার উঠিল, গৃহ ছাড়িয়া উদ্ধ স্থখে যুবকগণ গিরি শিখরে তথাগতের শরণ লইয়া ভিক্ষা-ভাজন ধারণ করিতে লাগিল। নগরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কে কবে পুত্র শূন্য, কে কবে বিধবা হয়, আশঙ্কায় উন্মত্ত হইয়া নগরবাসীগণ শ্রমণদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। দূরদর্শী সেনাপতি শিষ্যদিগকে বলিলেন, "ভয় নাই, সহ্য কর, সপ্তাহ মধ্যে বাত্যা নিবারণ হইবে।" রাজগৃহে সে দিন কি শোভাই না হইয়াছিল, পাঠক কল্পনা কর। যেমন রাজগৃহে তেমনি বৈশালী, তেমনি শ্রাবস্তী নগরে। বিশাল কাশী কোশলা কৌশাথী ও মগধ রাজ্য বুদ্ধ ও তাঁহার প্রচারকগণের আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কেবল কুরুক্ষেত্র ও পঞ্চনদের ব্রাহ্মণ্য দুর্গে সে তরঙ্গ আঘাত করিতে পারে নাই। যেখানে বুদ্ধদেব সেখানেই তাঁহার শত সহচর প্রত্যাবর্ত্তন কালে শত শতে পরিণত হয়।

বুদ্ধের জীবন চরিত আলোচনা সময়ে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়। আমরা বুদ্ধের জীবন চরিত পাই নাই, বৌদ্ধদিগের বাল-ইতিহাস পাইয়াছি। সেই ইতিবৃত্তের মধ্য হইতে যতদূর সম্ভব বুদ্ধের জীবনী বাহির করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, সে কেবল শিষ্যগণের নাম, কিরূপে তিনি দিনপাত করিতেন, কখন কি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল এই মাত্র। জীবন চরি-

তের কাব্যভাগ ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। সিদ্ধার্থের মানস-জীবনের অঙ্কুর, উৎপত্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও পরিণতি কিরূপে হইয়াছিল, আমরা জানিতে পারি না। শাক্যের পূর্ণ-চিত্র আমাদিগের সম্মুখে; তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পূর্ণভাবে জানিত, সেই চিত্রই তাঁহারা অঙ্কিত করিয়াছে। যে মত পরিবর্ত্তন সজীবতার অবশ্যম্ভাবী ফল, বারাণসীর মৃগদাব ঋষিপত্তনে যে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়, প্রতিকূল বাত্যার তাড়নায়, ব্রাহ্মণ-প্রমুখ বিপক্ষকুলের আক্রমণে সে বৃক্ষ কিরূপে অবনত, উন্নত, উদ্গত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, প্রাথমিক সরলতা পরিহার করিয়া ক্রমে ক্রমে অপ্রতিবিধেয় বৈচিত্র্যে কিরূপে জড়িত হয়, কোন ইতিহাসে কোন বৈজ্ঞানিক সে স্তর সকলের অনুসরণ করেন নাই। জীবন বৃত্তের মধুরতা ও প্রয়োজনীয়তা এই খানে, ইহাই আমাদের নাই। আবার যে প্রাকৃত পার্থক্য গুণে এক ব্যক্তি বিশেষকে অপর সকল হইতে বিভিন্ন করিয়া লওয়া যায়, তথাগতের সে বিশেষণত্বের কোন পরিচয় কোন গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই। বিশেষণত্ব সজীবতার প্রাণ। শাক্য সিংহের প্রতিকৃতি আমাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান, সে কিন্তু বাতাসের উপর ছায়ামাত্র. স্পর্শ করিতে পারা যায় না। আনন্দ বা উপালি, কাশ্যপ বা সারিপুত্র সকলেই এক ছাঁচে নির্ম্মিত, নির্জ্জীব নিরীহ সন্ন্যাসী, কাহারও পৃষ্ঠে অস্থি নাই, কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, সংসারের যন্ত্রণা ভয়ে ম্রিয়মান, সকলেই বসিয়া বসিয়া শূন্যের উপর শূন্য সংযোজনা করিয়া দুর্গ রচনা করিতেছেন। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, শাক্য ধর্ম্ম প্রচারে অবাধগতি লাভ করিয়াছিলেন, সকলেই আসিয়া একই প্রশ্ন করে, একই উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হইয়া দীক্ষা লয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এতই কি নির্জ্জীব হইয়াছিল? তবে পঞ্চনদে শাক্যের জীবন কালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই কেন? সকলেই ধর্ম্ম পিপাসু হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অনুসারে পিপাসার প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ নির্জ্জীব লোকে জীবন্ত সাম্রাজ্য গঠনে সমর্থ নহে। শাক্যের সংঘ্য শাসনের নিয়মাবলি তাঁহাকে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, নীতি শাস্ত্রের দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এমন সজীব লোকের স্বাতন্ত্র্যতা বিশিষ্ট ছিল বলিয়া স্বতঃই প্রতীত হয়। ভারত প্রকৃতির সাধারণ অবিশেষণত্ব হেতু তাঁহার জীবন-বৃত্ত-রচয়িতাগণ তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাকৃতিক নির্জ্জীবতা সে অনুভব শক্তি নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিয়াছিল?

প্রায় চল্লিশ বৎসর বুদ্ধদেব নগর হইতে নগরান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার মত উৎসাহে দিগ্‌দিগন্তে নূতন সত্য বিস্তার করিতেন। কেবল বর্ষার তিন মাস যাতায়াতের অসুবিধা হেতু এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গত প্রাচীন প্রথা অনুসারে তিনি স্থান বিশেষে যাপন করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভের কয়েক বৎসর মধ্যে এত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল যে, আশ্রয় স্থানের অভাবে বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। গৃহস্থ বৈরাগী শিষ্যগণ সংসারের অপবিত্র জালে আবদ্ধ থাকিয়া সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে প্রয়াস পাইত। কোন দিকে বৌদ্ধগণ প্রচারার্থ বাহির হইলে ইহাদিগের আশ্রয়ে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। আবার আশ্রয়দাতা গৃহস্থ বৈরাগী না পাওয়া যাইলেও প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে কোমল তৃণশয্যায় দলে দলে রাত্রি বাসে সন্ন্যাসীর দুঃখ কি? ধনবান গৃহস্থ বৈরাগীগণ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহারার্থ সুনির্ম্মিত মট বা প্রশস্ত উদ্যান উৎসর্গ করিত। রাজগৃহের বেণুবন বিহার এবং অনাথ পিণ্ডদ প্রদত্ত জেতবন বিহার বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বেণুবন বিম্বুসরের প্রমোদ কানন ছিল, তিনি উহা তথাগতকে দান করেন। অনাথ পিণ্ডদ শ্রাবস্তীবাসী ধনশালী বণিক একজন গৃহস্থ বৈরাগী। বর্ষার তিন মাস এইরূপে কোন বিহারে বুদ্ধদেব বাস করিতেন। সেই সময়ে শিষ্যগণ প্রচার কার্য্য ক্ষান্ত দিয়া তাঁহার পার্শ্বে সমাগত হইত, এবং এই তিন মাসে গুরুর নিকট সদুপদেশ লাভ করিত, কাহার কিছু বুঝিবার অবশিষ্ট থাকিলে সে তাহা বুঝিয়া লইত। প্রতিবেশী রাজন্য বা ধনশালী গৃহস্থ শিষ্য বা অন্য আতিথেয়ীগণের বদান্যতায় সে কয়েক মাসে উদরান্নে ভিক্ষা করিবার কষ্ট প্রায় সহ্য করিতে হইত না, নিরবচ্ছিন্ন সম্ভাষণ সুখে অতিবাহিত হইত। যাঁহারা শিষ্য নহেন, তাঁহারা সেই সকল সদালাপ শ্রবণ করিয়া বা সন্দেহের মীমাংসা করাইয়া কৃতার্থ হইতেন। বিহার সকল নগরের উপকণ্ঠে নির্ম্মিত হইত, জনপূর্ণবীথিকা হইতে দূরে অথচ নগরবাসীদিগের যাইতে কষ্ট হয়, এত দূর নহে। সুতরাং জন কোলাহলে শান্ত সম্ভাষণের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশাল বৃক্ষ, গভীর তড়াগ, শীত সমীরণ বিহার সকলকে বড় প্রীতিপ্রদ করিত। কোথায়ও ধর্ম্মালাপ, কোথায়ও বৃক্ষমূলে সমাধি, কেহবা কূটতর্ক ভেদে কুঞ্চিত-ভ্রু, কেহবা প্রথম সূত্র অভ্যাসে নিরত—বৌদ্ধ বিহার বৈদিক ঋষির তপোবন। অদ্যাপি ভারতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কুশীনগরের মল্ল ও বৈশালীর লিচ্ছবীগণ হইতে বারাঙ্গনা অম্বপালী পর্য্যন্ত, কত লোকেই যে তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত, সশিষ্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত এবং বুদ্ধ ও সংঘের নামে কত বিহারই যে উৎসর্গ করিয়াছিল, এখন আর সংখ্যা করা যায় না।

গৃহত্যাগীর গৃহ, নিরন্তর ভ্রমণশীল সন্ন্যাসীর আশ্রম যদি সম্ভব হয়, বিহার সকল বৌদ্ধশ্রমণদিগের গৃহ ছিল। পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ এই স্থানে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিত, কয়েক দিনের জন্য তাপিত মস্তক শান্ত করিবার একই নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় ভোগ হইত, প্রীতিভক্তি বন্ধুতা পরিচালনার সুযোগ ঘটিত। অন্য সময়ে নিত্য নূতন আশ্রয়, নিত্য নূতন আলাপ, নিত্য নূতন পরিচয়, বিহার তিন মাসের জন্য দিগন্তবিহারী বিহঙ্গকুল, একই পুরাণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ভিক্ষুকগণ সমবেত হইতেন এবং নয় মাস নূতন অভিজ্ঞতার আলোচনা করিতেন। সকলের একই আচার, একই ব্যবহার; সকলেরই পরিধান গৈরিক, সকলেই এক জাতীয়, সকলেই মাসে দুইবার বুদ্ধের নিকট আপন পাপ তাপ দুর্ব্বলতার পরিচয় দিত। "গঙ্গা যমুনা আশীরবতী বিভিন্ন নামে সংসার পরিচিত, কিন্তু দিগন্তব্যাপী সমুদ্রে পড়িলে কাহারও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তেমনি সংসারে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র বিভিন্ন, কিন্তু সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সকলেই এক জাতীয়, সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ"। সারিপুত্র ও সৌদ্গাল্যায়ণ ব্রাহ্মণ

কুমার, আনন্দ ও অনুরুদ্ধ ক্ষত্রিয় সাধক উপালি জাতিতে ক্ষৌরকার ছিলেন। সারিপুত্রকে তথাগত ভিক্ষুকদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং ধর্ম্ম সেনাপতি বলিয়া ডাকিতেন। আনন্দ তাহার "প্রতিপালক" কমণ্ডলু বা গৈরিকের কুশাসন বা আহারের অভাব হইলে তাঁহাকে সে সকল তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। তিনি সকল সময়ে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিতেন। আনন্দ ও উপালি, রাহুল ও অনরুদ্ধ, সারিপুত্র এবং মৌদ্গ্যালয়ণ বৌদ্ধ সংঘের উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া গণ্য হইতেন, বিদ্যার গভীরতা বা বুদ্ধির প্রখরতা, ভক্তির আধিক্য বা ধর্ম্মবিশ্বাসের উন্নতি এই পার্থক্যের কারণ হইয়া থাকিবে, আভিজাত্য অন্যতম কারণ রূপে গণিত হইয়াছিল বোধ হয় না। ইঁহাদিগের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্গ্যায়নের পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। দুই জনে বালবন্ধু, দুই জনে একদা জন্মযন্ত্রণা এড়াইবার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, দুই জনে এক সময়ে বৌদ্ধসঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার এমনি আশ্চর্য্য এক জনের মৃত্যুর অতি অল্প পরেই অন্যের মৃত্যু হয়। পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধন থাকিলেও প্রভুর প্রতি প্রীতি সকলেরই সম্পূর্ণ ছিল, কেবল দেবদত্ত সে সুখী পরিবারে কিয়ৎ পরিমাণে অশান্তি আনিয়াছিলেন। দেবদত্ত সিদ্ধার্থের শ্যালক, বৌদ্ধেরা বলেন, তিনি বুদ্ধের আসন অধিকার করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বিম্বসরের পুত্র মগধের নূতন রাজা অজাতশত্রু দেবদত্তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। অনন্তর দেবদত্ত সঙ্ঘমধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ সঙ্ঘটন করিবার চেষ্টা করেন। ভিক্ষুগণের শাসনার্থ বুদ্ধদেব যে কয়েকটী নিয়ম ঘোষণা করিয়াছিলেন, দেবদত্ত তদপেক্ষা কঠোরতর নিয়মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। বুদ্ধদেব প্রণীত নিয়মমালা সামান্য কঠোর ছিল না, তথাপি যে টুকু সরসতা তিনি তাহার মধ্যে অনুমতি করিয়াছিলেন, দেবদত্ত তাহাও শুকাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ চেষ্টাও সফল হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার আন্দোলনে নূতন সমাজে কিছু অশান্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সে সুখের গৃহে অন্য কোন দুঃখের কারণ ঘটে নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

লর্ড রিপন।

আর কয়েক দিন পরে লর্ড রিপন বাহাদুর এ দেশের শাসন ভার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন; ভারতবাসীর আশা মরীচিকা এবারের মত সেই দিনই শেষ হইবে। যে দিন লর্ড রিপন প্রথম ভারতবর্ষে আসিলেন, ভারতবাসীর পক্ষে, লর্ড রিপনের পক্ষে, সেই এক দিন, আর আজ এ উভয়েরই পক্ষে এই এক দিন। তিনি এদেশে আসিবেন, এই সংবাদ পাইয়াই ভারতবাসী আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল,—কতকদিন পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রের স্তম্ভে কি পড়িলে? কেবল রিপনের গুণানুকীর্ত্তন;

বক্তার মুখে কি শুনিলে? ঐ কথা। পাঁচ জন বন্ধু সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পরে সন্ধ্যার সময় কোন্ বিষয় লইয়া আলাপ করিলে? ঐ বিষয়। দেশের সকল স্থানে একই কথার আলোচনা, একই ভাবে সমস্ত দেশ প্রফুল্ল, একই আশার স্রোতে সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত। সামান্য কৃষকগণ পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বসিয়া কথোপকথনে বলিত "এবার কে এক বড় লাট আসিতেছে, সে নাকি দেশের কি একটা বড় কায করিবে"। এত আশা, এত ভরসার লর্ড রিপন ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ২রা জুন তারিখে যখন বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিলেন বোম্বাই বাসী বাল বৃদ্ধ যুবা সানন্দ হৃদয়ে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইল, প্রকৃত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সহিত তাঁহার অভিনন্দন করিল। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা আসিলে কলিকাতাবাসীর আনন্দের সীমা রহিল না; যেন কত কি অমূল্য রত্ন ব্রিটেনিয়া তাহাদিগের দরিদ্র গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছে। সেদিন বঙ্গবাসী যে ভাষায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, সে চিরপ্রচলিত নিয়মাধীন পদাবলির সন্নিবেশ মাত্র নহে; সে সমুদয় কথা তাহাদের উত্তেজিত আনন্দ ফুল্ল হৃদয়ের আবেগ লহরী। ভারতবাসীর সেই এক সুখের দিন। লোকের দুরাশাময়ী কল্পনা যতদিন কার্য্যক্ষেত্রের কঠোর অনলতাপে বিবর্ণ না হয়; ততদিনই তাহা হৃদয়ের শোভার এবং সুখের উপাদান; ভারতবাসীর হৃদয়ও তখন সেই সুখে পরিপূর্ণ ছিল।

লর্ড রিপন যদি বিষম কপটী না হন, তবে তাঁহারও সে দিন সুখের দিন; তিনিও অবশ্য আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, অশান্তি এবং অসাম্যময় ভারতে শান্তি এবং সাম্যের দুইটী পবিত্র অক্ষয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিবেন; সে দিন তাঁহার হৃদয়ও আশার কুহকী মায়ার অনেক সৌন্দর্য্যে সজ্জিত হইয়াছিল; নচেৎ তিনি অত সাহসে, অত প্রকাশ্য ভাবে অত কথা বলিবেন কেন? অনেকে বলেন, লর্ড রিপন যাহা মুখে বলিয়াছিলেন, তিনি মনে তাহা কোন দিনই ভাবেন নাই; আমরা একথা কোন দিনই স্বীকার করিব না; লর্ডরিপনকে আমরা তত নিচাশয় বলিয়া মনে করি না; এরূপ মনে করিতে আদৌ আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যায়। তার পর তিনি প্রত্যেক বিফল প্রযত্ন উদ্যমকে ফলবান করিতে গিয়া যত তিরস্কার, যত গঞ্জনা, যেরূপ ভাবে সহ্য করিয়াছেন, কপট হৃদয় কখনও সেরূপ সহ্য করিতে পারে না. মুখসে মুখ ঢাকিয়া লোক কত দিন পৃথিবীকে প্রতারিত করিতে পারে? এক দিন না এক দিন সে মুখস নিশ্চয়ই উড়িবে। আজ টমসন সাহেবকে কে চিনিতে না পারিয়াছে? লবণ আর চিনি একত্র মিশাইয়া অনেক খরিদার ঠকান যায় না। আমাদের বিশ্বাস, লর্ড রিপন যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমুদয়ই তাঁহার হৃদয়ের কথা, কপট স্তোভ বাক্য নহে। পৃথিবীতে ভাল কাজ করার বাসনা অনেকেরই থাকে কিন্তু শক্তি সকলের থাকে না, যে হৃদয়ে শক্তি বাসনার উপযোগী, পৃথিবী তাহার সুখময় স্বর্গ; আর শক্তিবিহীন বাসনা যে হৃদয়ের নিবাসী, এ পৃথিবী তাহার পক্ষে কুম্ভিপাক অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান। যে এ বৃশ্চিকের দংশন কোন দিন সহ্য করে নাই, সে হয়ত এ সমুদায় কথা হাসিয়া উড়াইবে, কিন্তু যে এ কামড় খাইয়াছে, যে এ বিষে এক বার ছট্‌ফট্ করিয়াছে, যে এ দুর্ভোগ ভুগিয়াছে, সে লর্ড রিপনের নিমিত্ত অশ্রু

বর্ষণ করিবে, দুঃখ করিবে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে তিরস্কার করিবে না।

বোম্বাই নগরের অধিবাসীগণ যে দিন লর্ড রিপন বাহাদুরকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি বলিলেন "আপনাদের নিকট আজ উজ্জ্বল অক্ষরে আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যমালার অনুষ্ঠান লিপি প্রদান করিতে চাহি না, আমার কার্য্য দেখিয়া আপনারা আমার সম্বন্ধে মতামত ঠিক করেন, সেই ভাল; এবং সেরূপ মতামত আপনারা নিশ্চয়ই ঠিক করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই; তবে আমি আজ এই মাত্র বলিতে চাহি যে, যত দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিব, তত দিন আমার সম্রাজ্ঞীর এবং তাঁহার ভারতীয় প্রজাবর্গের হিতচিন্তা দিবা রাত্রি আমার জপমালা স্বরূপ থাকিবেক"। লর্ড রিপন এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই; আমরা একথা বলিতে চাহি না, তিনি প্রাণপণে এদেশের হিত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং আমাদের অদৃষ্টলিপি দোষে সে সমুদয় কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। ঔদাসীন্য বা কাপট্য দোষে যদি কেহ লর্ড রিপনকে দোষী করিতে চাহেন, তাঁহার সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই বলিয়াই আমরা আরো দুঃখিত।

লর্ডরিপন এদেশে আসিয়াই কাবুলের বন্দোবস্ত লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, একরূপ সে গোলযোগ মীমাংসা হইয়া গেল; যে ভাবে মীমাংসা হইল, তদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপে মীমাংসা করা লর্ড রিপনের সাধ্য ছিল না; গ্লাডষ্টোন মন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের পদচিহ্ন কতক পরিমাণে অনুসরণ না করিয়া পারিলেন না, সুতরাং কাবুলে যাহা হইবার একটা হইয়া গেল।

আমাদের একজন সুযোগ্য সহযোগী লিখিয়াছেন, "আমরা রিপন বাহাদুরের পক্ষ যেরূপ ভাবে অনবরত সমর্থণ করিয়াছি, তিনি তাহার উপযুক্ত কি করিলেন? মুদ্রা মন্ত্র সম্বন্ধীয় বিধি হ্রদ করিয়াছেন? সে ত শেষে একপ্রকার ডেড্ লেটারের মত পড়িয়াছিল। সম্রাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাপত্রের মত এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন? তাহা মুখের কথাতেই রহিল। দণ্ড বিধির কার্য্য সংক্রান্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্থির মতির পরিচয় দিয়া শেষে কার্য্য কালে হাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং সায়ত্বশাসন সম্বন্ধে একটী অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ভাগ্যে যে কি হইবে, তাহাই বা কে জানে।"

রিপন সাহেব আমাদের জন্য কিছু করিবেন বলিয়াই যে তাঁহার পক্ষ আমরা সমর্থন করিয়াছি, এ কথা আমরা স্বীকার করি না, সত্য এবং ন্যায় অনবরত রিপন সাহেবের অবলম্বন ছিল, কাযেই আমরাও তাঁহার পক্ষে ছিলাম; তিনি যদি অন্যায় করিয়া, অসত্য ব্যবহার করিয়া আমাদের জন্য কিছু করিতেন, কোন্ সত্য পরায়ণ ভারত-সন্তান তাহার পক্ষ সমর্থণ করিয়া ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করিতেন না।

অভাবময়ী ভারতবর্ষে চতুর্দ্দিকেই অভাব, ইংলণ্ডের এদেশে যত কর্ত্তব্য অসম্পাদিত রহিয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও রিপন সাহেব করেন নাই, কিন্তু কিছুই করেন নাই, একথা কি বলিতে পারি? জীবন্ত ঘটনাগুলির সমক্ষে সত্যের অপলাপ না করিয়া কোন মুখে এ কথা

বলিব? লর্ডরিপন বাহাদুর যখন এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি অত্যাচারময়;—"সংবাদ পত্র সমালোচনা করে, তাহার মুখ বন্ধ কর; দেশের লোকের হাত হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও নিরূপায় করিয়া দাও? পরস্বাপহরণের আশায় কপট ব্যবহার করিয়া মিত্রকে শত্রু কর; যুদ্ধ-প্রিয় ভারত সেনা পাছে, নিরর্থক বসিয়া বসিয়া বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, এই জন্য তাহাদের কতগুলিকে যুদ্ধের ছলে দূর দেশে নিয়া যমালয় পাঠাও; আর অকারণ দেশের কতগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ কর। ভারতবাসীকে গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ বেতনের পদ সমূহ হইতে বঞ্চিত করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা সমুদয় কর; ভারতের শিল্প বাণিজ্য যাহাতে অধঃপাতে যায়, তাহার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা কর।" যখন ভারতবক্ষে এই সমুদয় সুখময় ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; যখন ভারতবাসী সাহেবের চক্ষে অবিশ্বাসের, কপটতার, নীচতার, এবং বিষম বিদ্বেষের একটী ঘৃণাময় চিত্র পট, সেই সময় লর্ড রিপন এ দেশে আসিলেন, সে দিনের মধ্যে আর অদ্যকার মধ্যে, তুমি ভারতবাসী, কি কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছ না? যদি না দেখ, তোমার চক্ষু অত্যন্ত অন্ধ, যদি ইচ্ছা করিয়া দেখিয়াও না বল, তবে তুমি নীচাশয় এবং অকৃতজ্ঞ।

কাবুলের যুদ্ধানল প্রশমিত হইল, আর বৈজ্ঞানিক প্রান্তদেশ নিদ্ধারণে ভারতের দরিদ্র প্রজার অর্থরাশি এবং তদপেক্ষা আরো মূল্যবান মানব জীবন অকারণ ব্যয়িত হইল না, ইহার নিমিত্ত লর্ড রিপনকে প্রশংসা করিবার কিছু নাই কি?

তুমি আজ সংবাদ পত্রের স্তম্ভে মুক্ত কণ্ঠে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কলাপ সমালোচনা করিতেছ; মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন থাকিতে তোমার এত কি বুকের পাটা ছিল যে এত লম্বা চৌড়া কথা বলিবে? "আমার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন কর্ত্তা কি কারণে এই আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার সমালোচনা করিতে চাহিনা, কিন্তু আমার শাসন সময়ে এই আইনটী প্রচলিত না থাকে এই আমার বাসনা;" যে রাজ পুরুষ এইরূপ উদার ভাবে ব্যগ্র হইয়া নিজের কার্য্যকলাপ সাধারণের সমালোচনার্থ মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা পুনরায় দান করিলেন, তাঁহার মধ্যে কি কোন মহত্ত্ব দেখিলে না?

ভারতবর্ষীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত যিনি অনবরত ব্যগ্র, প্রত্যেক গেজেটে যখন দেশের কোন না কোন হিতকর মন্তব্য লিপি বাহির হইয়াছে;—আজ গবর্ণর জেনেরল বলিলেন, দেশীয় শিল্প প্রস্তুত ছুরী কাঁচি, সমুদয় আফিসে ব্যবহৃত হইবে; কাল আবার বলিলেন, এদেশের কালি কাগজ ব্যবহার কর, তারপর বলিলেন, বিদেশীয় জিনিস যত ত্যাগ করিতে পার ততই ভাল; এ সমুদয়ের মধ্যে তাঁহার সদিচ্ছার কোন পরিচয় পাইলে না কি?

তোমার ঘরের কায এত দিন পরের হাতে আছে; তুমি নৌকায় চড়িয়া খেয়া পার হইবে, তাহার বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ কয়েকজন ইংরেজ রাজপুরুষ করিবেন? তোমার বালক বালিকার শিক্ষাবিধান তাঁহারা করিবেন; তোমার ঘরে জানালা কাটিয়া তাহারা তোমাকে বাতাস আনিয়া দিবেন; তোমার বাড়ীর পাশের পচা পুষ্করণীর দুর্গন্ধ-

ময় দাম দল উঠাইয়া তোমাকে দীর্ঘজীবী করার চেষ্টা করিবেন; রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখিয়া তোমার চলিবার সুবিধা করিয়া দিবেন, কোন কোন স্থানে তোমার মৃত্যু হইলে পর্য্যন্ত তাঁহারাই তোমার শব দাহনের বন্দোবস্ত করিবেন, তুমি নিরুপায় পুতুল, কেবল আহার করিবে আর নিদ্রা যাইবে, এই সমুদয় কার্য্যগুলি লর্ড রিপন তোমাদের হাতে দিয়া দেশের ভবিষ্যত উন্নতি সোপানের একটী নিম্নতম ভিত্তি গাঁথিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। যে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব যে প্রকারে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তাহাদের বিশেষ বিশেষ মত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে এই মত সত্বর কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে এই বিল পাশ করিতে গৌণ হইতেছে। এই বিলম্বের নিমিত্ত লর্ড রিপনকে দায়ী করিতে হইবে, কারণ তিনি ইচ্ছা করিলে লোকের মতামত অপেক্ষা না করিয়া, শাসনের সৌকার্য্য অসৌকার্য্য না দেখিয়া, নিজের মতে অনয়াসে স্বায়ত্বশাসনের আইন বিধিবদ্ধ করাইতে পারিতেন, সেরূপ না করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই; এক শ্রেণীর লোক এই বলিয়া মুখ ভারি করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক এইরূপ সময়ের মধ্যে যতদূর করিতে পারেন, রিপন বাহাদুর তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই; স্বায়ত্বশাসনের আইন যদি এত সত্বরই বিধিবদ্ধ হওয়া দেশের লোকে আবশ্যক বোধ করিয়াছিল, তবে দেশের লোকের সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত ছিল। যখন, স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে এ বৎসর কিছু আর বিবেচনা করা হইবে না, নিদ্ধারিত হইল; তখন তোমরা তাহাতে আপত্তি করিলে না কেন? নিজেরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া পরের কার্য্যে দোষ প্রক্ষালন করা কি উচিত? স্বায়ত্বশাসনের নিমিত্ত একটা জ্বলন্ত বাসনা অনেক দিন হইতে নব্য ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরুক ছিল, কিন্তু মধ্যে লর্ড লিটনের মত লোকের নিকট সে প্রস্তাব করিতে সাহস করিতেছিলে না। এইরূপ সময় তোমাদের চাহিবার পূর্ব্বে অযাচিত ভাবে লর্ড রিপন দেশকে জিজ্ঞাসিলেন, ভারতবাসী নিজের কায নিজের হাতে রাখিতে চাও কি না? তোমাদের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল, প্রজ্বলিত বাসনা আরো প্রজ্বলিত হইল, তোমরা একাগ্রে তাঁহার সহিত যোগ দিলে, যে কার্য্য তোমরা মুখে আনিতে সাহস করিতে না, সেই কার্য্যে তিনি অগ্রণী, যে বিলম্বের নিমিত্ত তোমরা তাঁহাকে দোষ দাও, সে বিলম্ব ইচ্ছা করিলে তোমরা সহজে এড়াইতে পারিতে, কিন্তু তাঁহাকে এড়াইতে হইলে, অনেক প্রকার ক্ষমতা চালাইয়া করিতে হইত, সে রূপ ক্ষমতা চালানের পক্ষপাতী তিনি কোন দিনই নহেন। এখন বলত এ ব্যক্তির নিমিত্ত তোমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত কি না?

লর্ড রিপনকে যাঁহারা দোষ দেন, তাঁহারা ইলবার্ট বিলের অনুষ্ঠান এবং উপসংহার উভয় অংশই অত্যন্ত দূষনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে রাজনীতিজ্ঞ কাল দেশ এবং পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন; যে রাজনীতিজ্ঞ এই তিনটীর প্রতি দৃষ্টি না করেন, তিনি কেবল স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সমূহের মধ্যে অনর্থক অনাত্মীয়তা এবং বিদ্বেষ উৎপাদন

করিয়া দেশের উন্নতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ করেন, তারপর কোন ব্যক্তি কোন নীতিকে অবশ্য অবলম্বনীয় মনে করিয়া একবার তাহা অবলম্বন করিলে, যদি সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীর অসন্তোষ ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করেন, তবে এই শ্রেণীর আস্পর্দ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং শাসন শক্তির কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। লর্ড রিপন প্রথমতঃ এই আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, দেশে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্বেষানল জ্বালাইয়া দিয়াছেন এবং পরে তাহার পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্ট দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদিগের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইটীই লর্ড রিপনের মারাত্মক দোষ, যদি ইলবার্ট বিল যেরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছিল সেইরূপ পাশ হইত, তবে আজ লর্ড রিপনের জয় জয়াকার হইত; তাহার আর সন্দেহ নাই। মানুষ এক এক সময়ে এক একটী বিষয়ে এত একগুয়ে হয়ে পড়ে, সে তাহা প্রকৃত পক্ষে বিষয় কি, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে, সুতরাং আমাদের দেশের লোক যে স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি একটু বিরক্ত হইবেন, সেটা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু শিক্ষিত এবং বিবেক প্রধান লোককে যখন এই সাধারণের সহিত যোগ দিতে দেখি, তখনই আমারা অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করি। ইলবার্ট বিল উপলক্ষে লর্ড রিপনের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে ইলবার্ট বিল প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টী কি, তাহাই আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে বলিতে চাই।

পাঠকবর্গের মধ্যে বোধ হয় সকলেই

করিয়াছেন, অবগত আছেন যে, রাজনীতি সমা[illegible] দিয়া- একটী অঙ্গ মাত্র; অপরের অধি[illegible] নিমিত্ত, প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া যার য[illegible] ক্ষমতার নিজ শক্তি কার্য্যে পরিণত করার [illegible] পূর্- অধিকার সকলকেই দেওয়া সমাজনীতির মূল মন্ত্র। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিব যে, ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষ শাসনে এ নীতি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন নাই। তবে বিশেষ বিশেষ শাসনকর্ত্তা পদ পাইয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ না করিয়া কিম্বা বিকৃতভাবে প্রকাশ করিয়া সময় সময় দেশের অনিষ্টকর ও অসমদর্শী বিধান সমূহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেও সেই মহতী নীতির দোহাই দিয়া। যেমন বঙ্গবাসী শাক্ত জগৎজননী আদ্যা শক্তির বেদির নিকট নির্দ্দোষী ছাগশিশুকে বধ করিয়া নিজের উদর পূরণ করেন, সেইরূপ সেই মহতীনীতির বেদির সম্মুখে অনেকবার ভারতবাসীর সুখৈশ্বর্য্য কপট ও স্বার্থপর রাজপুরুষদিগের হস্তে কাটা পড়িয়াছে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে ইংরেজ জাতির প্রশংসা এই যে, সে মূল নীতি তাঁহারা আজও পরিবর্ত্তিত করেন নাই। চতুর্থ জর্জ্জের শাসন কালে রাজঘোষণা হইল, "যে আইনানুসারে ইংলণ্ডের প্রজা শাসিত হইবে, সেই আইন অনুসারেই ভারতবর্ষের প্রজা শাসিত হইবে।" এ ঘোষণার মন্তব্যানুসারে আজিও এ দেশে কার্য্য হইতেছে; কিন্তু আজ এদেশে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা ইংলণ্ডবাসীর স্বাধীনতার ন্যায় অব্যাহত নহে। তাহাতে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, অবলম্বিত নীতি সম্পূর্ণরূপে মতেতে রক্ষিত হইয়াছে, কোন কার্য্যকারকদিগের কৌশলে কার্য্যতঃ কোন কোন স্থানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া

PAGE(S) MISSING.

লর্ডরিপন ভারতবাসী কপটী ইংরেজদিগের মুখসের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রকৃত মুখ দেখিতে পান নাই; তাহারা মুখে যেরূপ বলিয়াছে, মনেও তাহাদের সেইরূপ, এই কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এই ভ্রান্তিতে পড়িয়া তাঁহার স্বদেশের মুখ কতক পরিমাণ সভ্য জগতের সম্মুখে অবনত করাইয়াছেন, এজন্য তিনি তোমার বা আমার নিন্দার পাত্র যে নহে, সে কথা আর দুইবার বলার আবশ্যক করে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লর্ডরিপন একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ হইলে, তিনি এই কালিমাময় চিত্র প্রকাশ না করিয়া কৌশলে ইহা দূর করিতে পারিতেন; এক বার এই কালিমা চিত্র জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, ইংরেজ লজ্জার মাথায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, এখন সে দিন দিন আরো দুর্দ্দমনীয় হইবে।

আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, পৃথিবীতে কত বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ জন্মিলেন, মরিলেন; কত দেশ বড় হইল আবার ছোট হইল; কিন্তু কোন দেশে কোন কালে এইরূপ নীতির কৌশলে জিত এবং বিজিতের মধ্যে সাম্য সংস্থাপিত হইতে দেখিয়াছ? যদি লর্ডরিপন এরূপ করিতে পারিতেন বা কোন ইংরেজ করিতে পারেন, তবে তাঁহার অমানুষী শক্তি। ইংরেজ আজ লজ্জার মাথায় জলাঞ্জলি দেওয়ায় আমাদের যত ক্ষতি হইয়াছে, তিনি পয়োমুখ বিষকুম্ভ বন্ধ থাকিয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করিতে পারিতেন। ইলবার্ট বিলের প্রস্তাবে ইংলণ্ডের সদাশয় মহাশয়েরা জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের দেশের কি প্রকার প্রকৃতির লোকের হাতে ভারতের উন্নতি ন্যস্ত হইয়াছে।

ইলবার্ট বিল যে দূর করিবার হইয়াছে, তাহাতে লর্ড রিপনের অধিকার (কি তাহাই দেখা যাউক। কতা (dis

সাহেবেরা বলিকি প্রভৃতি করিলেন, ইলবার্ট বিল দূরে দিই বুকির, আমাদের দেশীয় মহাত্মারাও বসন্তেও উঠিলেন, "যদি পূরপূরী পাশ না হয়, অবশ্য নিতান্ত ভাল"; রিপন বাহাদুর তাহা শুনিতে পারিলেন না; তিনি বিবেচনা করিলেন, প্রকৃত পথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায় ততটুকুই ভাল; বোধ হয় টর যে জানেন যে ইলবার্ট, বিল পাশ করিতে হইলে অধিকাংশ সভ্যের অমতে তাঁহার সে কার্য্য করিতে হইত; গবর্ণর জেনেরেলের হাতে অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে, কিন্তু সে ক্ষমতা থাকা অনেক সময় আমরাই অনুচিত বলিয়া মনে করি, এবং যে ক্ষমতা আজ তিনি ব্যবহার করিলেন না বলিয়া নিন্দা করিতেছি, সে ক্ষমতা ব্যবহার করা যে একান্ত অন্যায় এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করার নিমিত্ত লর্ড লিটন যে একজন খামখেয়ালী এবং অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। তবে গবর্ণমেণ্ট এক কাজ করিতে পারিতেন; বিল উঠাইয়া লইবার অধিকার তাহাদের ছিল; কিন্তু আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি প্রকৃত পথে যতদূর সম্ভব ততদূরই অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করিলেন, এবং আমাদের মতে তাহাই উচিত হইয়াছে, বিল একেবারে উঠাইয়া দেওয়া অপেক্ষা আংশিক পরিবর্ত্তনের সহিত পাশ হওয়াই উচিত হইয়াছে। তার পর যে যে জেলায় সাধারণতঃ জুরির বিচারের নিয়ম নাই, সাহেব সেই সেই জেলায় জুরি

দ্বারাও বিচারিত হইতে পারিবেন, ইংরেজ জাতির যে একটী প্রধান অধিকার হইতে তাহাদিগকে এত দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, তাহাই তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এই অধিকার পাইয়া তাহারা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সুবিধা পাইবে কি না, সে বিচার আমরা করিব না, এ অধিকার যে ন্যায়তঃ সকল শ্রেণীর লোকেরই থাকা উচিত, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এক শ্রেণীকে গবর্ণমেণ্ট আজ সেই ন্যায় অধিকার দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহার একটী ন্যায় কার্য্য আংশিক সম্পাদনে তাহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু উক্ত উভয় ন্যায্যাধিকার ভবিষ্যতে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতি বিস্তৃত করার পথে কোন কণ্টক রোপন করেন নাই; আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস লর্ডরিপন এ দেশে আর কিছু কাল থাকিলে দেশীয় লোকের সর্ব্বত্র জুরি দ্বারা বিচারিত হইবার প্রথা তিনি প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেন। যুগ যুগান্তের অসাম্য এবং অত্যাচার এক ব্যক্তি এক দিনে দূর করিতে পারিলেন না বলিয়া কি তাঁহার নিন্দা করা কোন বুদ্ধিমান লোকের উচিত?

আমাদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, লর্ড রিপন কি করিয়াছেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—তিনি অন্যায়, অধর্ম্মে, ও অনিয়মে শাসিত ভারতবর্ষীয় রাজনীতির মধ্যে ন্যায়, ধর্ম্ম এবং নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি ইংলণ্ডবাসীকে স্পষ্ট বুঝিতে দিয়াছেন, ভারতবর্ষের অস্তিত্ব ভারতবর্ষের নিমিত্ত, ইংলণ্ডের নিমিত্ত নহে। তিনি অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়াও দেশীয় রাজকার্য্যেও সাধারণের মতের অনুবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি সত্য, ন্যায় এবং ধর্ম্মের নিকট রাজনীতিকে, কৌশলকে গালি দিয়াছেন, এবং তাহার উদারদর্শী চক্ষু সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করিয়াছে। লর্ড রিপনের শাসনকাল ভারতবর্ষীয় রাজনীতির এক নূতন যুগ; লর্ড রিপন কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গেলেন, কাঁটা খোচা সমুদয় তাঁহার ভাগ্যেই হইল, এখন তাঁহার পরাগত রাজ-পুরুষ অক্লেশে ন্যায় পথে ইচ্ছা করিলে বিচরণ করিতে পারিবেন।

লর্ড রিপনের দুর্ব্বলতা আছে, শাসন নিয়ম অভ্রান্ত নহে, আমরা এ সকল কথায় প্রতিবাদ করিব না; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যত গভর্ণর জেনেরল আসিয়াছেন, তন্মধ্যে রিপন বাহাদুর অপেক্ষা আমাদের অধিক হিতৈষী আর কেহ আসেন নাই, আর কেহ ভারতবর্ষকে মনেমুখে এক কথা বলেন নাই, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। আমরা যেন এমন উদার রাজপুরুষকে বিদায় দিবার সময় অকৃতজ্ঞ ভাবে বিদায় না দেই।

জড় পদার্থের বল।

জড় পদার্থ স্বভাবতঃ নিশ্চেষ্ট। উহা কোন স্থানে স্থির থাকিলে চিরকাল সেই স্থানেই সেই ভাবে অবস্থিতি করিবে এবং গতিবিশিষ্ট হইলে চিরকাল একই ভাবে চলিতে থাকিবে; অর্থাৎ স্থির থাকিলে নিজে চেষ্টা করিয়া চলিতেও পারে না, এবং একবার সচল হইলে নিজে চেষ্টা করিয়া স্থির হইতে বা ঐ গতির পরিবর্ত্তন করিতেও

TORN PAGE(S).

পারে না। জড় বস্তুর এই প্রকৃতির নাম নিশ্চেষ্টতা বা জড়ত্ব।

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সমস্ত এক একটী প্রকাণ্ড জড় পিণ্ড। উহারা নিশ্চেষ্টতা প্রভাবে অন্তরীক্ষে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং অন্য প্রতিরোধ দ্বারা স্থগিত না হইলে চিরকালই এইরূপে চলিতে থাকিবে। তবে যে পৃথিবীর উপরিস্থ লোষ্ট্রাদি বিক্ষিপ্ত হইলেও অল্পকাল মধ্যে গতিরহিত হইয়া স্থির হয়, ইহার কারণ নিশ্চেষ্টতার অভাব নহে, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং বায়ু ও বন্ধুর ভূমির ঘর্ষণ। কোন লোষ্ট্র ভূমির উপর দিয়া গড়াইয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার বেগ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আদি প্রভাবে ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি লোষ্ট্রটী পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে তাহার গতি বিনষ্ট হইবে না। উহা পৃথিবীর আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিলে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, এবং এককালে অতিক্রম করিতে না পারিলে চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। ডাং বলের মতে সম্ভবতঃ এইরূপেই সূর্য্যের আকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের বিচ্ছেদ হইয়াছে এবং চন্দ্র, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এককালে অতিক্রম করিতে না পারাতে উহাকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে।

এই স্থলে এমত কথা হইতে পারে যে, পৃথিবী, চন্দ্রাদি বাস্তবিক নিশ্চেষ্ট জড়-পদার্থ, উহারা আপনা হইতে সচল হইতে পারে না, তবে উহাদের বর্ত্তমান গতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? ধর্ম্ম-শাস্ত্র মতে এক অচিন্ত্য, অনাদি শক্তিই ঐ সমস্ত গতির কারণ। কিন্তু জগতের কোনও কার্য্যেই সেই অচিন্ত্য শক্তির সাক্ষাৎ হস্ত পরিলক্ষিত হয় না।* সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব পৃথিবী আদির বর্ত্তমান গতির কারণও প্রাকৃতিক কার্য্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

জড় পদার্থ সমস্ত আপনা আপনি সচল হইতে না পারিলেও এমত ক্ষমতা ধারণ করে যে, সন্নিকটবর্ত্তী জড় বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার গতি জন্মাইতে পারে। কোন পাত্রে জল লইয়া তাহাতে এক খণ্ড শোলা কি কাগজ (কিয়দংশ জলে স্থাপিত এবং কিয়দংশ জল হইতে উত্থিত করিয়া) ছাড়িয়া দিলে যখন তাহা পাত্রের ধারের সমুচিত নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন বেগে যাইয়া উহাতে সংলগ্ন হইবে। এই স্থলে পাত্রের পার্শ্ব শোলা কি কাগজ খণ্ডের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহা টানিয়া আনে। এই ক্রিয়া-শক্তির নাম আকর্ষণ। যাবতীয় জড় বস্তুরই আকর্ষণ আছে। জগতে যত প্রকার কার্য্য ও গতি দেখা যায়, আকর্ষণই সেই সমুদয়ের মূল।

যদি জগতে একটীমাত্র জড়পিণ্ড থাকিত, তবে তাহা কোনও আকর্ষণের অধীন হইত না এবং গতি বিশিষ্টও হইতে পারিত না, কিন্তু যদি কেবল দুইটী জড়পিণ্ড থাকিত, তবে উহারা পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সচল হইত এবং অবশেষে যাইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পড়িত। পরন্তু যখন অসংখ্য জড়পিণ্ড পরস্পর আকর্ষণাধীন রহিয়াছে,

* বলা বাহুল্য যে, এমতে আমাদের একটুও সহানুভূতি নহে। সৃষ্টি কৌশলে স্রষ্টার পরিচয় নামক প্রবন্ধে নগেন্দ্র বাবু পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়াছেন, জগতের সমস্ত কার্য্যেই সেই অচিন্ত্য শক্তির সাক্ষাৎ হস্ত রহিয়াছে। ন, স।

তখন সমুদয়ই তৎপ্রভাবে সচল হইয়া নিয়ত পর্য্যটন করিবে, অথচ একটী অপরাপর পিণ্ডের আকর্ষণ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া অন্য কোনওটীর উপর যাইয়া পতিত হইতে পারিবে না। এই সৌরজগতে পৃথিবী আদি গ্রহ সমস্ত আপন আপন উপগ্রহের সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতেছে* গ্রহগণের এই সূর্য্যাবর্ত্তক গতি, সূর্য্যের প্রবলতম মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবেই জন্মিয়াছে†। পরন্তু যদি কেবল সূর্য্যেরও একটী গ্রহ থাকিত, তবে গ্রহটীর গতি সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখেই জন্মিত। সুতরাং তখন উহা সূর্য্যের মধ্যে যাইয়া পতিত হইত। কিন্তু গ্রহের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উহাদের কোন টীর গতি সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে উৎপন্ন হইতে পারে নাই। অন্যান্যের আকর্ষণে দিক পরিবর্ত্তন জন্মিয়াছে। তাহাতেই উহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।*

পৃথিবী আদির গতির ন্যায় উহাদের উৎপত্তিও আকর্ষণ প্রভাবে হইয়াছে। আমরা আকাশে যেরূপ সাদা মেঘ দেখিতে পাই, কোন উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশে দণ্ডায়মান হইলে নিম্নস্থিত গুহাতেও কখন কখন সেইরূপ সাদা মেঘ দেখিতে পাইব। তাহা বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া শিখরোপরি উত্থিত হইলে শীতকালের কুজ্ঝটিকার ন্যায় পরিলক্ষিত হইবে। অতএব আকাশের মেঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল বিন্দু ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

* প্রধান গ্রহ ৮টী—(ভক্কেন,-অনিশ্চিত) বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস্ এবং নেপ্চুন্। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যে আরও প্রায় ২৪০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। যে সমস্ত জড় পিণ্ড গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে পর্যটন করে, সেই সমস্তকে উপগ্রহ বলে। যথা, চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। তদ্রূপ মঙ্গলের ২, বৃহস্পতির ৪, শনির ৮, উরেনাসের ৪ এবং নেপ্চুনের ১টী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† কারণ নিউটন "প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোন পিণ্ড যে দিকেই কেন চলিতে না থাকে, সূর্য্যের আকর্ষণাধীন হইলে দূরত্ব ও বেগ অনুসারে একবিধ কোনিক্ সেক্সন্ (conic section) আকারে গমন করিবে। সেই আকার ইলিপ্স্ কি পেরাবোলা কি হাইপারবোলা! এই তিন প্রকারের কোনও এক প্রকার হইবে। গ্রহগণের এরূপ বেগ আছে যাহাতে উহাদের গতি ইলিপ্সের (অণ্ডাকৃতি সমতল ক্ষেত্রের) সহিত ঐক্য হইতেছে।"—নলেজ পত্রিকার ৬১ পৃষ্ঠা, ১৮৮২ সালের ২য় ভলম। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রিচার্ড প্রক্টার নিউটনের উক্ত প্রমাণ সাধক যুক্তিকে একবারে সম্পূর্ণ এবং সুন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলেন যে, গণিত বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শী না হইলে উক্ত যুক্তি বুঝিতে পারা যায় না। কারণ তাহার সহজবোধ্য প্রমাণ নাই।—নলেজ পত্রিকার ১৪৮ পৃষ্ঠা, ১৮৮৪ সালের ১ম ভলম।

* গ্রহগণের বর্ত্তমান আবর্ত্তনেও অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের নিদর্শন পাওয়া যায়। নিউটনের প্রমাণিত নিয়ম মতে পৃথিবী সূর্য্যকে অণ্ডাকার পথে প্রদক্ষিণ করে। সেই অণ্ডাকার পথ সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। কখন কখন অতিশয় দীর্ঘ এবং কখন কখন হ্রস্ব হইয়া প্রায় বৃত্তাকার হয়। পৃথিবীর উপর গ্রহগণের বিশেষতঃ বৃহস্পতি ও শনির আকর্ষণই সেই পরিবর্ত্তনের কারণ। যখন পৃথিবীর একই দিকে সূর্য্য এবং বৃহস্পতি ও শনি থাকে, তখন উহাদের সকলের আকর্ষণ একই দিক্ হইতে কার্য্যকারী হওয়াতে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া কক্ষ হ্রস্ব হয় এবং যখন পৃথিবী, একদিকে সূর্য্য এবং অপর দিকে গ্রহদ্বয় এমত স্থানে আসে, তখন গ্রহদ্বয়ের আকর্ষণে পৃথিবী সূর্য্য হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হইয়া কক্ষ দীর্ঘ হইয়া থাকে। তদ্রূপে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রভাবে মঙ্গল গ্রহের কক্ষও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়।

ঐ সমস্ত জল-বিন্দু বৃষ্টিরূপে পতিত হইবার সময়ে সন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় জল বিন্দু আকর্ষণ করিয়া বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়। যদি পৃথিবী এত নিকটবর্ত্তী না থাকিত, তবে উহারা ক্রমে নিম্নে গমন করিত, আর আরো জল-কণা গ্রহণ করিয়া আরো বৃহৎ হইতে থাকিত। এখন বিবেচনা কর, পৃথিবী আদি কোনও জড়পিণ্ড অদ্যাপিও উৎপন্ন হয় নাই। এজন্য জড় পরমাণু সমস্ত কোন বৃহৎ পিণ্ডের আকর্ষণাধীন না থাকিয়া ইতস্ততঃ অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের পরস্পর আকর্ষণ থাকাতে সমধিক পরিমাণ স্থানে স্থানে সংগৃহীত হইতে থাকিবে, * আর গতি নিবন্ধন সঙ্ঘর্ষণ হইয়া প্রখর তাপ উৎপন্ন হইবে এবং তদ্ধেতু সংগৃহীত পিণ্ড সমস্ত বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া গোল হইবে †। অপর উষ্ণ পিণ্ড সমস্ত তাপ বিকীরণ করিয়া ক্রমে শীতল হইতে থাকিবে, আর বায়বীয় পদার্থ ক্রমে তরল এবং তরল পদার্থ ক্রমে দৃঢ় হইতে আরম্ভ হইবে। পরন্তু যে জড়পিণ্ড যত বৃহৎ হইবে, তাহা শীতল হইতে তত অধিক সময় আবশ্যক হইবে *। এইরূপেই সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে *।

* জড় পদার্থের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। যথা, বোতলের গলায় দড়ির পেঁচ দিয়া ঘন ঘন আকর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হইয়া পেঁচের স্থান উষ্ণ বোধ হয়। তাপ প্রভাবে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই হেতু যখন কোন বোতলের বেলোয়ারী ছিপি নিষ্কাশন করিতে পারা যায় না, তখন তাহার গলায় দড়ির পেঁচ দিয়া ঘন ঘন আকর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হইয়া গলার পরিধি বিস্তৃত হয়। সুতরাং তখন ছিপিটা নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে। তাপ প্রভাবে দৃঢ় বস্তু বিস্তৃত হইয়া তরল এবং তরল বস্তু বায়বীয় আকার ধারণ করে।

† এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, মেঘস্থিত জল-কণা সমস্ত আকর্ষণ প্রভাবে সংগৃহীত হয় না, তবে জড় পরমাণু সমস্ত সংগৃহীত হইবে কেন? ইহার কারণ এই,—মেঘের জলীয় বাষ্পকণা সমস্ত তাপ গ্রহণ করিয়া পরস্পর বিদূরিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না সেই তাপবিকীর্ণ হইয়া যাইবে, সেই পর্য্যন্ত জলকণা সমস্ত সংগৃহীত হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জড় পরমাণুর মধ্যে তাপ না থাকাতে উহাদের আকর্ষণ কার্য্যকারী হইয়া দাড়াইবে।

* দুই হস্ত দীর্ঘ, দুই হস্ত প্রস্থ এবং দুই হস্ত উচ্চ এমত একটী সমতল ঘন কাষ্ঠ লওয়া যাউক। উহার ছয়টী পার্শ্ব। প্রত্যেক পার্শ্বের ধরাতল পরিমাণ ৪ বর্গ হস্ত করিয়া সমস্ত কাষ্ঠের ধরাতল পরিমাণ ২৪ বর্গ হস্ত। উহাকে দৈর্ঘ্যের ঠিক মধ্য স্থানে কর্ত্তন করিলে সমান দুই খণ্ড হইয়া দুই হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ বিশিষ্ট দুইটী অতিরিক্ত পার্শ্ব হইবে। সুতরাং তখন উহাদের ধরাতল পরিমাণ ৩২ বর্গ হস্ত হইবে। অতএব ক্ষুদ্রতর বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুর ধরাতল পরিমাণ অল্প। জড় পিণ্ড সমস্ত ধরাতল দিয়াই তাপ বিকীরণ করে। সুতরাং দুইটী সম পরিমাণ উত্তপ্ত অসমান বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রতরটী একই সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে শীতল হইয়া পড়ে।

† আকাশ অনন্ত। যদি জড় পরমাণু সেই অনন্ত আকাশ পরিব্যাপক হয়, তবে এমন স্থান আছে যেখানে অদ্যাপিও কোনও বৃহৎ জড় পিণ্ড উৎপন্ন হয় নাই। নক্ষত্র সমস্ত এক একটী প্রকাণ্ড সপ্রভ সূর্য্য। উহারা চারিদিকে নিয়ত আলোক বিক্ষেপণ করে। সেই বিক্ষিপ্ত আলোক যত দূরে গমন করিতে থাকে, ততই অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া চলে। এ জন্য তাহা ক্রমেই নিস্তেজ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাস্তবিক কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। অতএব স্থান অতিক্রম করিতে আলোকের বিনাশ হয় না। এই হেতু উৎপন্ন নক্ষত্র যত দূরবর্ত্তী কেন না হউক, তাহার কিছু না কিছু আলোক এই পৃথিবীতে সমাগত হইবেই হইবে। অতএব যদি নক্ষত্র সংখ্যা অনন্ত হইত তবে দৃশ্যমান্ এক নক্ষত্র অবধি অন্য নক্ষত্র

অপর উহারা তাপ বিকীরণ করিতেছে আর ক্রমে শীতল হইয়া সঙ্কুচিত ও ঘন এবং নিষ্প্রভ হইতেছে *। সৌর জগৎ মধ্যে সূর্য্যই বৃহত্তম জড়পিণ্ড। তৎপর ক্রমে বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস ও নেপচুন, পৃথিবী ও শুক্র, এবং মঙ্গল ও বুধ। অতঃপর চন্দ্র এবং সর্ব্বশেষে ধূমকেতু * এবং উল্কাপিণ্ড। যদি সূর্য্যকে ২৬ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটী গোলক বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে বৃহস্পতির ব্যাস ৩২ ইঞ্চ, শনির ২৮, উরেনাস্ ও নেপচুন প্রত্যেকের ১২, পৃথিবী ও শুক্র প্রত্যেকের ৩ এবং মঙ্গল ও বুধ প্রত্যেকের ২ এবং চন্দ্রের এক ইঞ্চ অপেক্ষাও ন্যূন হইবে। উল্কাপিণ্ড সমস্তের ব্যাস অতি যৎসামান্য। এখন যদি এই সমস্ত জড়পিণ্ড একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে উল্কাপিণ্ড এবং ধূমকেতু † সর্ব্ব প্রথমে, তৎপর ক্রমে চন্দ্র, বুধ ও মঙ্গল, পৃথিবী ও শুক্র, উরেনাস্ ও নেপচুন, শনি, বৃহস্পতি এবং সর্ব্বশেষে সূর্য্য শীতল হইয়া তরল ও দৃঢ় হইবে। বাস্তবিক ঐ সমস্ত জড়পিণ্ডের অবস্থা সমালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। উল্কাপিণ্ড সমস্ত ধাতুময় দৃঢ় লোষ্ট্র, চন্দ্র এককালে শীতল হইয়া নিষ্প্রভ এবং উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। মঙ্গল গ্রহ জীবনের বৃদ্ধাবস্থা ও পৃথিবী পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শনিও বৃহস্পতি শীতল হইয়া নিষ্প্রভ হইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপিও উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীর বাসোপযোগী হইয়া উঠে নাই। উহাদের উপরিভাগে সময়ে সময়ে এত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাদের অদ্যাপিও আগ্নেয় কিশো-

পর্য্যন্ত যে স্থান তাহা, দূরবীক্ষণের কথা দূরে থাকুক, সহজ চক্ষেও আলোক শূন্য বোধ হইত না, কিন্তু ছায়া পথের ন্যায় সমুজ্জ্বল দৃষ্ট হইত। সুতরাং যে সমস্ত নক্ষত্র স্পষ্ট রূপে এবং যাহাদের কেবল আভা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমুদয় ব্যতীত আর নক্ষত্র উৎপন্ন হয় নাই, কিম্বা এত দূরে উৎপন্ন হইয়াছে যে, উহাদের আলোক অদ্যাপিও পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই। পরন্তু যদি শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে আকাশের নিষ্প্রভ শূন্য স্থান বৎসর বৎসর ক্রমে আভা যুক্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু অদ্যাপিও ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

* নিষ্প্রভ জড় বস্তু প্রখর রূপে উত্তপ্ত হইলে সপ্রভ হইয়া উঠে। এই সত্যের পার্থিব উদাহরণের অভাব নাই। এজন্য আমরা করেকটী নাভস্থলিক উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। উল্কাপিণ্ড সমস্ত অণ্ডাকার পথে সূর্য্য ও কোন কোন ধূমকেতুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু নিষ্প্রভ হওয়াতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পরন্তু যখন কোনটী ভূবায়ু বিদীর্ণ করে তখন দ্রুত গতি (প্রতিসেকেণ্ডে ন্যূনাধিক ১৫ মাইল) নিবন্ধন বায়ু-পরমাণুর সহিত সঙ্ঘর্ষিত হইয়া প্রখর তাপ উৎপাদন করে এবং তদ্ধেতু সমুজ্জ্বল হইয়া পতনশীল নক্ষত্র রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কখন কখন কোন কোন স্থির নক্ষত্র মধ্যেও সমুজ্জ্বলতার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কোন জ্যোতিষ্কের সহিত সঙ্ঘর্ষণ হওয়াই সেই প্রখর সমুজ্জ্বলতার কারণ হইবার সম্ভাবনা। এই স্থলে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। শিগ্নস্ নামক নক্ষত্র-পুঞ্জের একটী নক্ষত্র কদাপিও সহজ চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু তাহা ১৮৭৬ সালের ২৪ এ নবেম্বর হঠাৎ ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল দৃষ্ট হয়। তৎপর মলিন হইতে আরম্ভ হয়, দুই সপ্তাহ পরে সহজ চক্ষুর অগোচর হয় এবং বৎসরাধিক কাল পরে আপন স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

* সকল ধূমকেতুর পরিমাণ সমান নহে। কোন কোনটী এত ক্ষুদ্র যে সহজ চক্ষে দেখা যায় না।

† ধূমকেতু সমস্ত বায়বীয়ই আছে। উল্কাপিণ্ডের সহিত সর্ব্বদা সঙ্ঘর্ষিত হওয়াই ইহার কারণ হইবার সম্ভাবনা।

রত্ব রহিয়াছে বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত হয়। অপর পক্ষে সূর্য্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বায়বীয়ই রহিয়াছে।

এখন সৌর জগতের গ্রহাদি মধ্যে পরিমাণ বিষয়ে এত অধিক ইতর বিশেষ থাকিবার কারণ সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক। পৃথিবী আদি যে হঠাৎই এত প্রকাণ্ড হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। উহারা উৎপন্ন হইয়া অবধি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে, আর উল্কাপিণ্ডাদি গ্রহণ করিয়া ক্রমে বৃহত্তর হইতেছে। ডাং ক্রোল বলেন যে, পৃথিবীর পঞ্জর দৃষ্টে এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা যায়, যে সূর্য্য অন্যূন ১০ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া পৃথিবীকে রশ্মি প্রদান করিয়া আসিতেছে। পৃথিবী বহিরাকাশ হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৭৩২ মণ পদার্থ গ্রহণ করিতেছে। অতএব পৃথিবী এই ১০ কোটি বৎসরে অন্যূন ৯৯৭১৮০০০০০০০০ মণ অতিরিক্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়াছে*। তদ্রূপ সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহও প্রারম্ভে এত বৃহৎ ছিল না, কিন্তু ক্রমে উল্কাপিণ্ডাদির পদার্থ গ্রহণ করিয়া এত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু সূর্য্য সন্নিকটবর্ত্তী পদার্থ গ্রহণ করিয়া অতি প্রকাণ্ড হওয়াতে বুধ গ্রহের জন্য বাস্তবিক সমুচিত পরিমাণ পদার্থের অপ্রতুল হইয়াছিল। এজন্য তাহা অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে। এদিকে পৃথিবীও শুক্র অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হওয়াতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ পদার্থ পাইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। আবার পৃথিবীর প্রবলতর আকর্ষণ নিবন্ধন পদার্থের অপ্রতুল হইয়া চন্দ্রও অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে। পক্ষান্তরে এক দিকে চন্দ্র ও পৃথিবী, অপর দিকে বৃহস্পতি ও তাহার উপগ্রহ সমধিক পরিমাণ পদার্থ গ্রহণ করাতে মধ্যবর্ত্তী মঙ্গল ও ক্ষুদ্র গ্রহ সমস্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। আবার বৃহস্পতির প্রবলতর আকর্ষণে শনি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং উরেনাস ও নেপ্‌চুন আরো ছোট হইয়াছে। উপগ্রহ সমস্ত যে এত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহারও কারণ গ্রহগণের প্রবলতর আকর্ষণ*।

জড় পদার্থ গতি বিশিষ্ট হইলে নিশ্চেষ্টতা নিবন্ধন চিরকাল একই ভাবে চলিতে থাকে; কিন্তু যদি অন্য কোন বস্তুর উপর যাইয়া পতিত হয়, তবে উহার গতি সেই অন্যতর দ্রব্যে প্রবেশ (অর্থাৎ তাহার গতি উৎপাদন) করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই রূপে এক বস্তুর গতি দ্বারা অন্য বস্তুর গতি উৎপন্ন হয়। যে গতি দ্বারা অন্যতর গতি জন্মে, সেই গতির নাম বল এবং বল প্রভাবে উৎপন্ন গতির নাম কর্ম্ম। বল এবং উহার কর্ম্ম উভয়ই সমান থাকে, অর্থাৎ যে পরিমাণ বল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মান্বিত দ্রব্যের সেই পরিমাণ গতি জন্মে। যখন কোন দ্রব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে, তখন উহার শক্তি আছে বলা যায়। জড় বস্তুর শক্তি দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। অবস্থান এবং গতি নিবন্ধন। বিবেচনা কর কোন দোলক লম্ব ভাবে স্থির আছে, তখন উহার কোনও কর্ম্ম সাধন করিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু চালাইয়া দিলে উহা

* পৃথিবীর পঞ্জর দৃঢ় হইবার পর হইতে এই গণনা করা হইয়াছে। পৃথিবী তৎপূর্ব্বে বায়বীয় ও তরল অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং ঐ সময়েও অনেক অতিরিক্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়াছিল।

* পৃথিবী উত্তপ্ত বায়বীয় ও তরল পিণ্ড হইতে কিরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সমালোচনা করিব।

একবার এক পার্শ্বের দিকে এবং অন্যবার অন্য পার্শ্বের দিকে দুলিতে থাকে। এইরূপ দোলায়মান হইবার সময়ে যখন উহা এক পার্শ্বের পরিসীমায় উত্থিত হয়, তখন উহার সেই উচ্চ স্থানে অবস্থিতি নিবন্ধন বিপরীত দিকে চলিবার প্রকৃতি জন্মে। এই অবস্থান নিবন্ধন গমন করিবার প্রকৃতির নাম আস্থানিক (potential) শক্তি। আর দোলকের গমনশীল অবস্থার কার্য্যকারিতাকে সাঞ্চরিক (kinetic) শক্তি বলে। আস্থানিক শক্তি অনেক সময়ে সামান্য প্রতিবন্ধক প্রভাবে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে। তখন বল প্রয়োগ করিয়া উহাকে ক্রিয়ান্বিত করিয়া দিলে, প্রয়োজিত বল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এরূপ স্থলে যে স্বল্প বল দ্বারা আস্থানিক শক্তির ক্রিয়া প্রবর্ত্তনা করা যায়, তাহার নাম উত্তেজন।

গন্ধক, সোরা এবং অঙ্গার একত্রে মর্দ্দন করিলে বারুদ হয়। বারুদে অগ্নিকণা সংলগ্ন করিলে সমধিক পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইয়া উৎপন্ন এবং বিমুক্ত বায়ু ১৩৯৩ গুণ পরিমাণ স্থান ব্যাপক হয়। এই স্থলে যে পরিমাণ তাপ নিবিষ্ট করা যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ তাপ প্রকাশিত হইয়া কর্ম্ম স্বরূপে বন্দুকের গুলি চালনা করে। অতএব বারুদ মধ্যে আস্থানিক শক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইহা নিষ্ক্রিয় থাকিবার ব্যাখ্যান এইঃ—বারুদের গন্ধক, সোরা এবং অঙ্গার-অণুসমস্ত বাস্তবিক রাসায়নিক আকর্ষণের রাজ্য মধ্যে এককালে প্রবিষ্ট না হইয়া পরস্পর এমত নিকটবর্ত্তী স্থান গ্রহণ করে যে, সমুচিত সামান্য উত্তেজন দ্বারা ক্রিয়ান্বিত হইলেই স্থানচ্যুত হইয়া রাসায়নিক আকর্ষণের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। অতএব প্রয়োজিত উত্তেজনের অতিরিক্ত যে বল প্রকাশিত হয়, তাহা ক্রিয়াবান্ রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দ্রব্যের অণু সমস্ত যোগাকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একত্র সংলগ্ন থাকে। কিন্তু যদি তাহাতে তাপ নিবেশ করা যায়, তবে যোগাকর্ষণ শিথিল হইয়া উহারা অপেক্ষাকৃত পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়। তাহাতেই বস্তুটীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। অতএব তাপ আকর্ষণের বিরুদ্ধ কার্য্য করে, অর্থাৎ আকর্ষণে জড়াণু সমস্তকে পরস্পর নিকটবর্ত্তী কিন্তু তাপে উহাদিগকে দূরবর্ত্তী করিয়া থাকে। এজন্য তাপও এক প্রকার বল। কিন্তু আস্থানিক শক্তি নহে, এক প্রকার সাঞ্চারিক শক্তি। সাধারণ সাঞ্চারিক শক্তি জড় পদার্থের এমত সঞ্চারের উপর নির্ভর করে, যাহাতে উহা চলিয়া স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে। কিন্তু তাপের সাঞ্চারিক শক্তিতে বাস্তবিক স্থান অতিক্রান্ত হইতে থাকে না, কেবল উত্তপ্ত দ্রব্যের অণু সমস্ত এক স্থানে থাকিয়াই কম্পিত হইয়া থাকে। পরন্তু তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত যখন উত্তপ্ত দ্রব্যের আয়তন বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, তখন অণু সমস্তের যে কথঞ্চিৎ স্থান অতিক্রম-কারিণী গতি জন্মে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু সেই গতি কেবল তাপ বৃদ্ধি এবং হ্রাসের সহিতই জন্মিতে থাকে, সমতা স্থলে আর থাকে না। অপিচ তাপ, উত্তপ্ত জড় পিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আকাশ পথে বিকীর্ণ হয়। তাপের বিকীরণ নির্ব্বাত স্থানেও হইয়া থাকে। অতএব তাহা জগৎ-ব্যাপক কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের আশ্রয়ী হইবে। সেই কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় পদার্থের নাম ইথার। ইথার প্রত্যেক জড়

পিণ্ড এমন কি দৃঢ়তম দ্রব্যের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং তাহা এত সূক্ষ্ম যে, সমস্ত জড় পদার্থের আভ্যন্তরীণ অতীন্দ্রিয় ছিদ্র দিয়াও যাতায়াত করিতে পারে। অতএব জড় পদার্থের উত্তপ্ত অবস্থার দুইরূপ ব্যাখ্যান হইতে পারে। (১) জড় পরমাণু সমস্ত বেগে চলিয়া যখন পরস্পর সঙ্ঘর্ষিত হয়, তখন উহাদের স্থান অতিক্রমকারিণী গতি রহিত হইয়া স্থিতিস্থাপকতা প্রভাবে উহারা কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া পরস্পর ক্রমাগত আঘাত ও প্রতিঘাত করিতে থাকে। এই আঘাত ও প্রতিঘাত নিবন্ধন আন্দোলন হইতেই তাপের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। (২) জড়াণু সমস্তের স্থান অতিক্রমকারিণী গতি সঙ্ঘর্ষণ নিবন্ধন রহিত হইয়া ইথরাণুতে পরিচালিত হয়। সেই ইথরাণুর আন্দোলন প্রভাবে জড়াণু সমস্ত কম্পিত এবং তাপের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।

উত্তপ্ত দ্রব্যের তাপ কখন কখন আস্থানিক শক্তিরূপেও সঞ্চিত হয়। ৮০ ডিগ্রি উষ্ণ এক সের জলের সহিত শূন্য ডিগ্রির এক সের জল মিশ্রিত করিলে ৪০ ডিগ্রির দুই সের জল হয়। এই স্থলে তাপের সমস্ত শক্তি সঞ্চরমানই থাকে। কিন্তু যদি ৮০ ডিগ্রির জল শূন্য ডিগ্রির হিমশিলার সহিত একত্র করা যায়, তবে হিমশিলা গলিয়া তরল জল হয় বটে, কিন্তু জলের তাপ শূন্য ডিগ্রিই থাকে, কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় না। এই স্থলে জলের ৮০ ডিগ্রি তাপ সঞ্চারবিহীন হইয়া আস্থানিক শক্তিতে পরিণত হয়। তদ্রূপে তাপ এবং আস্থানিক শক্তি, সাঞ্চরিক শক্তিতে এবং সাঞ্চরিক শক্তি, তাপ ও আস্থানিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দোলকের ইতস্ততঃ দোলনে সাঞ্চরিক ও আস্থানিক শক্তি পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বারুদ দগ্ধ হইলে যে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থের গতি জন্মে, ইহা তাপের সাঞ্চরিক শক্তিতে এবং দুই বস্তুর সঙ্ঘর্ষণ নিবন্ধন যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা সাঞ্চরিক শক্তির তাপে পরিবর্ত্তিত হইবার উদাহরণস্থল।

আকর্ষণ দ্বারা বস্তুর গতি উৎপন্ন হয়। অতএব আকর্ষণও এক প্রকার বল। কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক কার্য্যে চাপ অথবা টানই গতি উৎপত্তির মূল দেখিতে পাই। কিন্তু আকর্ষণে সেই চাপ অথবা টানের কোনও ক্রিয়া দেখা যায় না। কারণ জড় বস্তু দূর হইতেই পরস্পর আকর্ষণ করে, অথচ তজ্জন্য কোনও যন্ত্র দি বিস্তার বা প্রেরণ করে না। তবে আকর্ষণের কৌশল কি? এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, আকর্ষণ কোনও আধ্যাত্মিক কি অভৌতিক পদার্থ নহে। কারণ তাহা হইলে সমস্ত জড় বস্তুই সচেষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। আমরা "জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানের" ১১—১৪ পৃষ্ঠায় ইথারের চাপ দ্বারা আকর্ষণের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পৃথিবীর এমত শক্তি আছে যে, উহা উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণী উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিনাশ করিতে পারে। আকর্ষণই সেই শক্তির আদি মূল। পৃথিবী উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পরমাণু সমস্ত ইতস্ততঃ অবস্থিত ছিল। যখন আকর্ষণ প্রভাবে একত্রে সংগৃহীত হইতে লাগিল, তখন সঙ্ঘর্ষণ নিবন্ধন তাপ উৎপন্ন হইয়া সংগৃহীত পিণ্ডে স্থাপিত হইল। সেই সঞ্চিত তাপের উপরই বায়বীয়তা, তরলতা প্রভৃতি জড়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং সূক্ষ্ম জড়ের (আলোক তাপাদির) ক্রিয়া

নির্ভর করে। * উদাহরণ স্বরূপে বীজ হইতে ভ্রূণের উৎপত্তি লওয়া যাউক। ভ্রূণ বীজ মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ক্রিয়া পরিচালিকা শক্তির অভাবে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পরন্তু রস, বায়ু ও তাপের সংস্রবে স্থাপিত হইলে উহাকে সত্বর অঙ্কুর বহির্গত করিয়া ডাল, পালা বিস্তার করিতে দেখা যায়। অতএব জল, বায়ু, এবং তাপই বীজ হইতে ভ্রূণোৎপত্তির মূল। কিন্তু জলের তরলতা এবং বায়ুর বায়বীয়তা প্রথমকার সঞ্চিত তাপের উপরই নির্ভর করে। সেই তাপ আকর্ষণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব আকর্ষণই জীবোৎপত্তির আদি মূল। অপিচ রস কৈশিক আকর্ষণ প্রভাবেই প্রথমতঃ বীজে প্রবেশ করে। অতএব আকর্ষণ সাক্ষাৎরূপেও জীবোৎপত্তির মূল। আর বীজ কোনও অমিশ্র ভৌতিক পরমাণু নহে, উহা নানাবিধ পদার্থের বিশেষরূপ সংযোগে উৎপন্ন। সেই সংযোগও বাস্তবিক আকর্ষণ সম্ভূত। তাহা বিচ্ছিন্ন হইলে আর বীজের বীজত্ব থাকিতে অর্থাৎ তাহা হইতে কোনও উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব এই ভাবেও আকর্ষণ জীবোৎপত্তির মূল।

* চন্দ্র উৎপন্ন হইবার সময়ে পৃথিবীর ন্যায় শক্তি বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু কালক্রমে শীতল হইয়া এককালে নিঃশক্তিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উহাতে তরল পদার্থ মাত্র নাই। অতীব সূক্ষ্ম বায়ু থাকিলে থাকিতে পারে। বৈদ্যুতিক ক্রিয়াও কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। আর উহার উপরিভাগে যে কোনও রূপ পরিবর্ত্তন কি কার্য্য হইতেছে, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায় না; অথচ তাহা যে এক সময়ে বিবিধ প্রাকৃতিক কার্য্যের স্থান ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

বিবিধ ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈবনিক ক্রিয়ার উপর জীবন নির্ভর করে। এমন ভৌতিক ক্রিয়া আছে, যাহার অভাব হইলে জীবন রক্ষা পাইতে পারে না। যথা—প্রাণিগণের শ্বাস ক্রিয়া এবং উদ্ভিজ্জের রস সঞ্চার। এই উভয় কার্য্যই আকর্ষণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। বায়বীয় এবং তরল বস্তুর অণু অতীব সূক্ষ্ম ও তন্নিবন্ধন মসৃণ হওয়াতে উহাদের মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণ হয় না। এজন্য কোন পরিমাণ বায়বীয় বা তরল পদার্থ অন্য কোন পরিমাণ বায়বীয় বা তরল পদার্থের উপর স্থাপন করিলে তাহা মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে উপরিভাগে থাকিতে না পারিয়া নিম্ন দিকে সরিয়া পড়ে। এই হেতু যদি তাহা কোন পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে তাহা সেই পাত্রের সকল অংশে সমান ভাবে চাপ দিতে থাকে এবং তদ্ধেতু এক স্থান হইতে ক্বিয়ৎ পরিমাণে উঠাইয়া লইলে উচ্চতর ভাগ সরিয়া পড়িয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে। তদ্রূপে পৃথিবী পরিবেষ্টক বায়ুরাশিও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সকল স্থানে সমানভাবে চাপ দিতেছে। সুতরাং যখন আমরা বক্ষ বিস্তৃত করিয়া ফুস্ফুসের অভ্যন্তর ফাঁক করি, তখন বাহিরের বায়ু তন্মধ্যে বেগে গমন করিয়া অতি সূক্ষ্ম শ্বাসনলী পর্য্যন্ত পূর্ণ করে এবং তথায় শোণিতের সহিত সংলগ্ন হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত ও পোষক করিয়া তোলে।

জীবন রক্ষার জন্য প্রাণিশরীরে যেরূপ শোণিতের সঞ্চার হওয়া আবশ্যক, উদ্ভিজ্জ দেহেও সেইরূপ রস চালনার প্রয়োজন। অধিকাংশ প্রাণিদেহের শোণিত সঞ্চার হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা শিরা ও ধমনী যোগে সম্পন্ন হয়। লেন্‌সিওলেট

নামে এক প্রকার মৎস্য উষ্ণ এবং অনুষ্ণ কটিবন্ধের সমুদ্রকূলে বাস করে। উহাদের কোনও হৃৎপিণ্ড নাই। তথাপি উহাদের স্নায়ু থাকাতে রক্তবহা নাড়ী প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শোণিত চালনা করিয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জের হৃৎপিণ্ডও নাই এবং রস বহা প্রণালীও সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় না; অথচ নিয়ত রস চালনা হইয়া সমস্ত শাখা প্রশাখা ও পল্লবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ইহা বাস্তবিক মাধ্যাকর্ষণ দ্বারাই সাক্ষাৎরূপে সম্পন্ন হয়। উদ্ভিজ্জগণ শিকড় দ্বারা ভূমি হইতে রস গ্রহণ এবং পত্র যোগে অদৃশ্য বাষ্পাকারে রস পরিত্যাগ করিতেছে। এইহেতু পল্লবের রস অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও তদ্ধেতু গুরু হইয়া নিম্ন দিকে চাপিতেছে, আর শিকড়ের রস অপেক্ষাকৃত তরল ও লঘু হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতেছে। ইহাতেই রস চালনা সম্যক সাধিত হইয়া উদ্ভিজ্জ জীবন রক্ষা পাইতেছে। *

আকর্ষণ কিরূপে জীবের বিনাশ সাধন করে তাহা এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বিবেচনা কর, অদ্য তুমি একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছ। উহা ভূমি হইতে উচ্চ থাকিলেও পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মাধ্যাকর্ষণ উহাকে অণুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু বন্ধন দড়ি শক্ত হওয়াতে ভূতলশায়ী করিতে পারিতেছে না। পরন্তু এমত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহার যোগাকর্ষণ চিরকালই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করিতে পারে। সুতরাং যত শক্ত বস্তু দিয়া কেন বন্ধন দড়ি প্রস্তুত না কর, তাহা কালক্রমে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের নিকট পরাভূত হইবেই হইবে। এখন তোমার দেহকে গৃহের স্থলে অভিষিক্ত কর। দৈহিক পদার্থ জৈবনিক ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়া দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ থাকাতে জীবন রক্ষা পাইতেছে। এই বন্ধন মাধ্যাকর্ষণের নিকট আপাততঃ অজেয় থাকিলেও উহার অবিশ্রান্ত কার্য্য প্রভাবে কালক্রমে পরাভূত হইবে। তাহা হইলে যে কেবল জীবিত * পদার্থের সংযোজন বিচ্ছিন্ন হইবে এমত নহে, মৃত অস্থি মাংসাদিও চূর্ণ ও বিগলিত হইয়া মৃত্তিকায় লীন হইয়া যাইবে।

জড় পদার্থ একবার গতিবিশিষ্ট হইলে আর আপনা হইতে স্থগিত হইতে পারে না, কিন্তু অন্য কোন বস্তু মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই গতি গ্রহণ করিলে কেবল স্থির হইতে পারে। এরূপ স্থলে উহার যে গতি অন্তর্হিত হয়, তাহা বাস্তবিক বিনষ্ট হয় না, কেবল অন্য দ্রব্যে প্রবেশ করে। তদনুসারে পৃথিবী আদি জড় পিণ্ড সকলের উৎপত্তি কালে উপাদান জড়াণু সমস্তের যে গতি জন্মিয়াছিল, তাহা অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই, স্থল বিশেষে কেবল আশ্রয় পরিবর্ত্তন করিয়াছে। জড়াণু সমস্তের প্রারম্ভের গতি সঙ্ঘর্ষণ নিবন্ধন প্রথমতঃ তাপে পরিবর্ত্তিত হয়।

* তরল গুরু বস্তুর চাপে যে লঘুতর বস্তু ঊর্দ্ধগামী হয়, ইহা কেবল মাধ্যাকর্ষণের ফল।

* জীবদেহে দুই প্রকার পদার্থ আছে। জীবিত ও মৃত। রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায়, সেই সমস্তই মৃত। কিন্তু উহাদের মধ্যে এক প্রকার বর্ণহীন, অর্দ্ধতরল পদার্থ আছে, তাহা বাস্তবিক জীবিত। সেই জীবিত পদার্থের উপরই জীবন নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত জীবিত পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই জীবদেহে জীবন দৃষ্ট হয়। জীবিত পদার্থ, সমস্ত জীবে সাধারণ এবং দেখিতে একই প্রকার।

তৎপর সেই তাপ ইথার আশ্রয়ে বিকীর্ণ হইয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া যাইতে লাগিল, আর জড়াণু সমস্ত আকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ হইল। তখন উহারা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ অনুসারে পরস্পর নানা প্রকারে মিশ্রিত হইয়া বিবিধ দ্রব্যে পরিণত হইতে চলিল আর অন্তর্গত কিয়ৎ পরিমাণ তাপ আস্থানিক শক্তি রূপে প্রত্যেক দ্রব্যে স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই সঞ্চিত আস্থানিক শক্তির উপরই জীবজগতের জীবন নির্ভর করে। অঙ্গারক অম্ল বায়ু (carbonic acid) অম্লজান এবং অঙ্গারের এক প্রকার রাসায়নিক মিশ্রণ। প্রভূত পরিমাণ অঙ্গারক বায়ু অগ্ন্যুৎপাতীয় প্রদেশ সকলের গহ্বর এবং প্রাণিগণের নিশ্বাস হইতে বহির্গত হয়। উদ্ভিজগণ সেই অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ ও বিশ্লিষ্ট করিয়া অঙ্গার ভাগ শক্তিরূপে সঞ্চয় এবং অম্লজান ভাগ পরিত্যাগ করে। প্রাণিগণ আকার উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করিয়া উক্ত সঞ্চিত শক্তি আপনাদের শরীরে নিবিষ্ট করিতেছে এবং কালক্রমে মৃত হইয়া আপনাদের শক্তিকে মৃত্তিকা ও বায়ুতে অর্পণ করিতেছে। এই রূপে অধিকাংশ পার্থিব শক্তি কেবল আশ্রয় পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে না। তবে তাহা তাপাকারে বিমুক্ত হইলে কিয়ৎপরিমাণ বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেই বিকীর্ণ শক্তিও বাস্তবিক বিনষ্ট হইতেছে না, কিন্তু সম্ভবতঃ আকাশের এমত স্থানে বিদ্যমান থাকিতেছে, যেখানে তদ্দ্বারা কোনও কর্ম্ম সাধিত হইতেছে না, অথবা সাধিত হইলেও তাহা প্রাণিজগতের উপকারে আসিতেছে না।

তাপের বিকীরণ নিবন্ধন পৃথিবী, সূর্য্যাদি ক্রমেই নিঃশক্তিক হইয়া পড়িতেছে। পরন্তু শক্তির এইরূপ হ্রাস হওয়া এক পক্ষে অবনতি এবং অন্য পক্ষে উন্নতির লক্ষণ। কারণ পৃথিবীর শক্তি হ্রাস পাইলে তাহা কালক্রমে এমত অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইবে, যখন চন্দ্রের ন্যায় উহাতে কোনও জীব প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং এই অবস্থা পৃথিবীর পক্ষে অবনতির লক্ষণ। পক্ষান্তরে সূর্য্যের শক্তি হ্রাস পাইলে উহা কালক্রমে জীবের বাসোপযোগী হইয়া উঠিবে। এই অবস্থা এক পক্ষে অবনতি হইলেও অন্য পক্ষে উন্নতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু তখনও যে সূর্য্যে কোনও জীব থাকিতে পারিবে, এমত আশা করা যাইতে পারে না। কারণ সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলে উহার অধিবাসী জীবের জন্য আর একটী সূর্য্য আবশ্যক হইবে। কিন্তু এরূপ সূর্য্য কোথায়? সূর্য্যে জীব বাস করার পক্ষে আরো একটী অন্তরায় আছে। ইহা সূর্য্যের অতিপ্রবল বিষম মাধ্যাকর্ষণ। এই বিপুল মাধ্যাকর্ষণের নিকট জীব-দেহের উপাদান মধ্যে যোগাকর্ষণ কার্য্যকারী থাকিতে পারে কি না, সংশয় স্থল।

বলের ক্ষয় না হইয়া জড় পদার্থের গতি জন্মিতে পারে না। কিন্তু বলের নূতন উৎপত্তি নাই। অতএব গতিরও নূতন উৎপত্তি নাই। তবে যে আমরা স্থির লোষ্ট্রাদি নূতন বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিতেছি, তাহাও বাস্তবিক পূর্ব্ব সঞ্চিত শক্তির বিকাশ নিবন্ধনই জন্মিয়া থাকে। আমরা বাহ্য জগৎ হইতে সর্ব্বদা আহার ও শ্বাস গ্রহণের সহিত শক্তি লইয়া দেহ মধ্যে স্থাপন করিতেছি। স্নায়বীয় উত্তেজনায় সেই সঞ্চিত

শক্তি বিকশিত হইয়া পেশী সঙ্কোচন দ্বারা লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

বল দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। সেই বল এবং কর্ম্মমধ্যে নির্দ্ধারিত সম্বন্ধ আছে; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। যথা, একমণ ভার ৩ হস্ত উচ্চ করিতে হইলে যে পরিমাণ বল আবশ্যক, তাহাকে ৬ হস্ত উচ্চ অথবা দুইমণ ভার ৩ হস্ত উচ্চ করিতে তাহার দ্বিগুণ বলের প্রয়োজন। তদনুসারে সম্পাদিত কর্ম্মের পরিমাণ দ্বারা প্রয়োজিত বল পরিমাণ করা যায়। অতএব বল অর্থাৎ বস্তুর গতি বাস্তবিক কোনও বস্তু না হইলেও এক প্রকার পরিমেয় পদার্থ। আর জড় বস্তুর আশ্রয় ছাড়া উহার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বল অবিনশ্বর ও পরিমেয় কিন্তু জড়াধীন।

মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, আলোক, তড়িত এবং চৌম্বকী ও সূর্য্য রশ্মির রাসায়নিক শক্তি প্রাকৃতিক বল বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু বাস্তবিক উহারা কিরূপ পদার্থ, তাহা অদ্যাপিও স্থিরীকৃত হয় নাই।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

REVOLUTION.

বিপ্লব।

"The Lord's arm is not shortened. The Lord's eyes are not closed. The Lord is still as near as ever, He is governing the world as he has always governed it by the everlasting moral laws, by which the wages of sin are death. Your iniquities have with-held good things from you. You have earned exactly what God has paid you. Yourselves are your own punishment. You have been wicked men, and therefore weak men; your own vices and not the Goths have been your true conquerors"—Salvian's De Gubernatione Dei (i. e. of the government of God.)

বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত হইলে, এবং প্রাচীন রোমের সভ্যতা, রোমের সাহিত্য এবং রোমের রাজনীতি সম্যক্ বিনষ্ট হইলে, সমস্ত ইউরোপ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল; জ্ঞান ও সত্যের জ্যোতি ইউরোপ হইতে অন্তর্হিত হইল। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নিপতিত হইয়া শত শত দুর্ব্বলমতি ধর্ম্মভীরু মনুষ্য মনে করিল, বুঝি পৃথিবীর বিনাশকাল সমুপস্থিত, বুঝি ঈশা রাজ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মানব মণ্ডলীর বিচারার্থে পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে আগমন করিবেন। এক দিকে এই অন্ধ বিশ্বাস যেমন তাহাদিগের হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করিল, অন্য দিকে অরাজকতাসম্ভূত দুঃসহ সামাজিক উৎপীড়ন তাহাদিগকে অভিভূত করিল। এই অবস্থায় রোম সাম্রাজ্যের সহস্র সহস্র নরনারী বৈরাগ্য অবলম্বন করিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীর পিতা, স্বামী, পুত্র বা স্বজনবর্গ সমর ক্ষেত্রে বিনাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও দেখিলেন যে, সংসারে তাঁহাদিগের কোন সুখেরই আশা নাই। তৎকালে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই সকল সৎকুল জাতা কামিনী বিবাহার্থিনী হইলেও উপযুক্ত পাত্রের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তাঁহাদিগের দুঃখভারাবনত হৃদয়ের শোকাবেগ সংবরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া, এবং ঈশ্বরের সহচরী হইবেন, ঈশার সহচরী হইবেন এই আশায় প্রলোভিত হইয়া তাঁহারা (nunery) নানারি অর্থাৎ বৈরাগ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। সংগ্রামাবসানে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যে কিছু জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম অবশিষ্ট ছিল, তাহাও সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন রোমের ভদ্রবংশীয়গণের অনুসরণ ক্রমে সেই সন্ন্যাসাশ্রম সকল আশ্রয় করিল। তদানীন্তন ইউরোপীয় সমাজ, এইরূপে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সত্য ও ন্যায়পরতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিশাচবৃন্দ পরিবেষ্টিত শ্মশান ভূমিবৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। এবং ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন এই সময় ইতিহাস বেত্তাগণ কর্ত্তৃক "তিমিরাচ্ছন্ন কাল" বলিয়া অভিহিত হইল।

কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত মানবগণের কার্য্যকলাপের মধ্যে সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। সংসারের উৎপীড়ন অসদাচার ও নৃশংসতা নিবারণের নিমিত্ত সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত নিয়তই নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐশ্বরিক শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে কতপ্রকার কৌশল রহিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহা বুঝিয়া উঠে? মনুষ্য বর্ত্তমান বিপদকেই মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া স্বীয় বুদ্ধির অসারত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু দিব্য চক্ষে দর্শন করিলে বিপদই সম্পদের একমাত্র মূল কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। বিপদ, বিঘ্ন অত্যাচারই মানবসমাজকে যুগে যুগে উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে সমুত্থিত করিতেছে।

বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম সাম্রাজ্যের বিনাশ, মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতের পরাজয় যদিও আপাততঃ জাতীয় বিপ্লব বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি বর্ব্বর জাতির আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোম সাম্রাজ্যের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত পরাজয়ের পূর্ব্বে ভারতে জাতীয় জীবনের স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা সবিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, শুদ্ধ কেবল মানবের সমুন্নতির জন্যই রোম সাম্রাজ্যের বিনাশ এবং ভারতের ভাগ্যে দাসত্ব ঘটিয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের বিনাশ এবং ভারত-স্বাধীনতার উচ্ছেদ যুগান্তের প্রলয়ের ন্যায় তৎকালপ্রচলিত সামাজিক অবস্থা ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নবজীবন আনয়ন করিয়াছিল। বস্তুতঃ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, পৃথিবীতে সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যত প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া মানব সমাজের নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ করিয়াছিল। বহির্জগতে যদ্রূপ সময় সময় ঘোর ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া দেশের দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ করিয়া যায়, সামাজিক বিপ্লব ও রাজবিপ্লব দ্বারাও সেইরূপ বৃহৎ মনুষ্য সমাজের দূষিত নৈতিক বায়ু শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ করিবার জন্য যেমন ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের প্রয়োজন; শারীরিক রোগ নিবারণার্থ যেরূপ রসনার অপ্রিয় স্বাদশূন্য, কটু কিম্বা তিক্ত ঔষধের প্রয়োজন, রক্ত দূষিত হইয়া শরীরে বিস্ফোটকাদি জন্মিলে যেমন অতি কষ্টকর অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক; সেই প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক দূষিত অবস্থা সংস্কর-

ণার্থ সময় সময় সামাজিক বিপ্লব ও রাজ বিপ্লবের আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং ঈদৃশ বিপ্লবকে যাঁহারা সামাজিক দুর্ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোম সাম্রাজ্যের বিনাশ হইতে অদ্যাবধি পৃথিবীর নানা দেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সমূহ যে প্রকারে মনুষ্য সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসরিত করি- [illegible] এবং যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কুসংস্কার, কুৎসিৎ ব্যবহার ও অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, সংক্ষিপ্তরূপে তৎসমুদয়ের সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মানব প্রকৃতি বিশেষরূপে সমালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইলেই, বাসনা পরিপূর্ণ হইলেই, মনুষ্য সুখী হইতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনের অবরোধই মনুষ্যদিগের দুঃখের এক মাত্র মূল কারণ। কিন্তু যদি সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখলাভাশায় সমাজস্থ প্রত্যেক মনুষ্য, অপরের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, আপন আপন স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন করিতে থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সময় সময় এক জনের স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন দ্বারা অপরের স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনের যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সমাজের মধ্যে যদি প্রত্যেকেই রাজা হইয়া অপর সমুদয়ের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করে, তবে সংসারের সংগ্রামানল কখনও নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। সহস্র সহস্র লোকের স্বাধীন ইচ্ছার গতি প্রতিরোধ না করিলে, সহস্র সহস্র লোককে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনের সুখ হইতে বঞ্চিত না করিলে, সেই এক এক জনের স্বাধীন ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। অতএব এক দিকে দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ইচ্ছার তৃপ্তি ব্যতীত মনুষ্যের সুখ হয় না, আবার দেখা যাইতেছে যে, এক জনের স্বাধীন ইচ্ছার সঞ্চালন দ্বারা অপরের স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করিব যে, এই সংসার মনুষ্যের সংগ্রাম ক্ষেত্র মাত্র? তবে কি বুঝিতে হইবে যে, এখানে আপন আপন তুল্যাধিকার সংরক্ষণ পূর্ব্বক চলিতে গেলে, মনুষ্যের পরস্পরের সহিত মিলন রহিবে না?—এখানে দুইটী লোক পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে অপরের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কিম্বা এক জনকে সম্পূর্ণরূপে অপরের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে? চিন্তা করিলে সহজেই দেখা যায় যে, মনুষ্য অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া আপন স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সম্পূর্ণ সমর্থ। মনুষ্য আপনার বন্য (wild) স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া, অপরের সহিত একত্র হইয়া বাস করিতে সমধিক ইচ্ছা প্রকাশ করে। এক দিকে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন দ্বারাই মনুষ্যের সুখ লাভ হয়, পক্ষান্তরে মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাস না করিলে, জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্য ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার সেই অসীম বন্য স্বাধীনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া জীবন যাপন করে। এই সম্মিলিতাবস্থায় অপরের স্বাধীনতার

উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক মনুষ্য যে পরিমাণে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সমর্থ, তাহাই তাহার প্রকৃত এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা। সামাজিক জীবনে এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকেই ন্যায়তঃ বঞ্চিত করা যায় না। বস্তুতঃ এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজে ঈদৃশ সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন সম্বন্ধে প্রত্যেক নরনারীরই তুল্যাধিকার রহিয়াছে। অন্যায় ও অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তি অপরকে সেই প্রকৃতিগত তুল্যাধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে, এবং মানব মণ্ডলীর সেই স্বাভাবিক তুল্যাধিকার মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য সংস্থাপিত না হয়, কেবল এই উদ্দেশ্যেই ভিন্ন ভিন্ন সুসভ্য সমাজ-মধ্যে নানাবিধ রাজনৈতিক শাসন প্রণালী (political government) প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল শাসন প্রণালীর স্থায়িত্ব, বিলোপ এবং ক্রমিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা নির্দ্দিষ্ট এবং অখণ্ডনীয় নিয়ম দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে। ফলতঃ প্রত্যেক দেশেই প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালীর স্থায়িত্ব পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে পরিমাণে এই উদ্দেশ্য সুচারু রূপে সংসিদ্ধ হয়, সেই পরিমাণেই প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী দৃঢ়তা লাভ করে। যে দেশের প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী এই সদুদ্দেশ্যবিহীন, সেই তুল্যাধিকার সংরক্ষণে হীনযত্ন, প্রত্যুত উহার মূল দেশে কুঠার প্রহারে কৃতোদ্যম, সেই দেশেই ধীরে ধীরে অশান্তির হুতাশন প্রধূমিত হইতে থাকে। এই ধূমব্যাপ্ত প্রচ্ছন্ন বহ্নি কালক্রমে একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া, ভীষণ বিপ্লবের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মহারণ্যে দাবাগ্নির ন্যায় সবেগে প্রধাবিত হয় এবং প্রচলিত শাসন প্রণালীকে একেবারে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে।

আমরা সংসারে যে কোন বস্তু কিম্বা বিষয়ই অবলোকন করি না কেন, দেখিতে পাই যে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; এই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতাই উহার জীবনী শক্তি। এই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতারূপ শক্তি বর্জ্জিত হইলেই প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক বিষয় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগতে অমঙ্গলের বীজ বপন করে। বস্তুতঃ জগতে যত কিছু অমঙ্গল দর্শন করি, সকলই পদার্থ কিম্বা বিষয়ের বিকৃতাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন সমুদ্ভূত হয়। পদার্থ কিম্বা বিষয় যে পরিমাণে আপনার নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযোগী হয়, সেই পরিমাণে যে তাহার জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহা সহজেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। এই জীবনী শক্তির হ্রাসকেই রুগ্নাবস্থা বলা যায়। রোগ একটী শারীরিক অমঙ্গল বিশেষ; কিন্তু ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। শারীরিক কোন একটি শক্তির খর্ব্বতাই রোগ। রুগ্নাবস্থা এবং বিকৃতাবস্থা এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। পদার্থ কিম্বা বিষয়, কিয়ৎপরিমাণে, উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতা বিবর্জ্জিত হইয়া রুগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, হয়ত ক্রমে বিনাশ পাইতে থাকে, নতুবা শক্তির পুনরুদ্ধার সহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে যে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য, তাহা জগতের ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতেছে। কোন দেশ-প্রচলিত শাসন-প্রণালী সম্বন্ধীয়

নিয়ম কিম্বা ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যের প্রকৃতিগত তুল্যাধিকার হইতে মনুষ্যদিগকে বিচ্যুত করিবার ইচ্ছা যে সময়ে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইয়াছে, তখনই সেই দেশে রাজবিপ্লব কিম্বা সামাজিক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়া, ঘোর সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। মনুষ্য অপরাপর মনুষ্যের উপর অযথোচিত প্রভুত্ব সংস্থাপনে উদ্যুক্ত হইয়াই সংসারে সংগ্রাম ও অশান্তির বীজ বপন করিয়া থাকে। মানবগণের পরস্পরের মধ্যে যে কোন প্রকারের বৈষম্য থাকিবে না, এবং সমুদয় মনুষ্যই যে সংসারে সমান অবস্থায় অবস্থিতি করিবে, এবম্বিধ কোন মত আমরা পোষণ করি না। শারীরিক ও মানসিক শক্তির তারতম্য নিবন্ধন, মনুষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে অবশ্যই বৈষম্য থাকিবে; কিন্তু জন বিশেষের স্বার্থপরতা যেন মানবগণকে তাহাদিগের প্রকৃতিগত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত না করে, কারণ, তাহা হইলে, সুসভ্য এবং উন্নতিশীল সমাজে কোন একটী বিপ্লব যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আবার মানবগণের স্বাভাবিকী স্বাধীনতা ও প্রকৃতিগত অধিকার সংরক্ষিত না হইলে তাহাদিগের ক্রমশঃ উন্নতি কখনই সম্ভবপর নহে। যে মুহূর্ত্ত হইতে মনুষ্য কোন একটী বিষয়ে আপনার প্রকৃতিগত স্বাধীনতা ব্যবহার করিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ স্বাধীনতা সঞ্চালনে বিরত থাকে, সেই মুহূর্ত্তাবধি সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহার উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, যে ব্যক্তি অপরকে তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি আপনার সেই স্বাভাবিক অধিকার পরপদে বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহাদের উভয়েই তাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধানানুসারে, উন্নতির পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবনের মহত্ত্ব দিন দিন হারাইতেছে। বীরকুল তিলক নেপোলিয়ান যতদিন জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায়ের পক্ষ পোষণ করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার অস্ত্র দধীচির অস্থি নির্ম্মিত ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় অপ্রতিহার্য্য ছিল। কিন্তু যখন তিনি ন্যায় ও সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া মানবের স্বাধীনতা হরণে প্রয়াসী হইলেন, তখন তাঁহার বাহুবল অবসন্নতা প্রাপ্ত হইল, তাঁহার অস্ত্র শতধা চূর্ণ হইল। মানব প্রকৃতির প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ করিয়া মনুষ্যগণ উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবেন, ইহাই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ভীরুতা প্রযুক্ত যাহারা অত্যাচারের অবরোধ না করিয়া, আপনার প্রকৃতিলব্ধ স্বাধীনতা অপরের হস্তে সমর্পণ করে, পক্ষান্তরে স্বার্থপরতা ও প্রভুত্ব লিপ্সা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যাহারা অপরের সেই স্বাধীনতা ক্রয় করে, তাহাদিগের উভয় পক্ষই ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিই নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তন্নিবন্ধন অনিবার্য্য দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিলাম, তাহা হইতে চারিটী সাধারণ নিয়ম উদ্ধৃত করা যায়—

প্রথমতঃ,—সামাজিক জীবনে প্রত্যেক মনুষ্যের সীমাবদ্ধ তুল্যাধিকার রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্য, অপরের স্বাধীনতার

উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া, আপন আপন স্বাধীনতা সঞ্চালনে সম্পূর্ণ সমর্থ। দ্বিতীয়তঃ,—প্রত্যেক মনুষ্যের এই তুল্যাধিকার সংরক্ষণার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানাবিধ শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ,—কোন দেশ-প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী দ্বারা সেই তুল্যাধিকার সংরক্ষিত না হইলেই ক্রমে সেই শাসন প্রণালী বিকৃতাবস্থা বা রুগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ,—ঈদৃশ বিকৃতাবস্থাপ্রাপ্ত শাসন প্রণালী, অন্যান্য কারণ সহযোগে, ক্রমে প্রকৃতিস্থ না হইলে তাহার বিকৃতাবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং অবশেষে সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালীকে সমূলে উৎপাটন করে।

পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বারা এই চারিটী মূল সূত্র অতিসহজেই সপ্রমাণ করা যায়। প্রাচীন কালে কি গ্রীক, কি রোমান, এই উভয় জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় কার্য্যতঃ মনুষ্যের তুল্যাধিকার স্থাপনে ন্যূনাতিরিক্ত হীনযত্ন ছিল। সুতরাং তন্নিবন্ধন সময় সময় রাজনৈতিক আন্দোলন সমুপস্থিত হইয়া, ক্রমে সেই সকল শাসনপ্রণালীর বন্ধন ছেদন করিতে লাগিল এবং অবশেষে যুগান্তের প্রলয়ের ন্যায় এক একটী বিপ্লব সমুদ্ভূত হইয়া এক এক কালের শাসন প্রণালী সমূলে উৎপাটিত করিল। বস্তুতঃ মানব মণ্ডলীর তুল্যাধিকার রূপ ভিত্তির উপর শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত না হইলে, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। প্রত্যেক সুসভ্য জাতীয় সমাজের মধ্যে আমরা দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই;—সমাজস্থ কতকগুলি লোক মনুষ্যের তুল্যাধিকার স্থাপনে যত্নবান, আর অপর কিয়ৎ সংখ্যক লোক সেই তুল্যাধিকার বিনাশের জন্য স্বীয় স্বীয় শক্তি সঞ্চালন করে। এই দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত শক্তির কার্য্যকারিতা সমধিক হইলেই শাসনপ্রণালী স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত শক্তির আধিপত্য নিবন্ধন হয়ত সমাজ একেবারে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হয়, নতুবা জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইয়া সমাজ মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে আসিয়ার মধ্যে চীন, তিব্বত, আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে জাতীয় জীবন এই প্রকারে শেষোক্ত শক্তির আধিপত্য নিবন্ধন অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে। এই সকল জাতির জীবন মধ্যে আর ক্রমোন্নতির স্রোত প্রবাহিত হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে এই দ্বিবিধ শক্তি সতত বিদ্যমান ছিল। সুতরাং আসিয়ার অধিবাসিদিগের ন্যায় ইউরোপীয় জাতীয় জীবন ঈদৃশ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কদাপি মৃতাবস্থায় পতিত রহে নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে রোমানদিগের জাতীয় জীবনে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ শক্তির বিদ্যমানতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইটালীর সমুদয় প্রদেশ রোমের অধিকৃত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই রোমানদিগের মধ্যে জন সাধারণের তুল্যাধিকার সংস্থাপনার্থ সময় সময় যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাই রোমের ক্রমোন্নতির মূল কারণ। পক্ষান্তরে, প্রিটোরিয়ান গার্ড (Pretorian guards) নামক

সৈনিক দল সংস্থাপনপূর্ব্বক সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টাদ্বারাই রোমের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইল। বস্তুতঃ ন্যায়ানুগত আচরণ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত পাশব প্রণালী সংরক্ষিত হইতে পারে। শাসন বল দ্বারা কখন রাজ্য শাসন করা যায় না।

অতি প্রাচীন কালে রোমের অধিবাসিগণ পেট্রিসিয়ান (Patrician) ও ক্লায়েণ্ট (Cleint) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে পেট্রিসিয়ান সম্প্রদায় তাহাদিগের ক্লায়েণ্টদিগের প্রতি যদৃচ্ছা আধিপত্য সঞ্চালন করিতে পারিত। ক্লায়েণ্টগণ সম্পূর্ণরূপে পেটিসিয়ানদিগের অধীন ছিল, এবং সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে পেট্রিসিয়ান ও ক্লায়েণ্টের মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীস্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী প্লিবিয়ান (Plebeians or Plebes) নামে অভিহিত হইল। পেট্রিসিয়ানগণ সেই প্লিবিয়ানদিগকেও সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বিচ্যুত রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মানবাত্মা সর্ব্বকালে এবং সকল দেশেই অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বীয় অধিকার সংরক্ষণে যত্নবান হয়। রোমের প্লিবিয়ানগণ ক্রমে আপন আপন অধিকার সংরক্ষণে উদ্যুক্ত হইলে দেশস্থ সহৃদয় এবং রাজনীতিজ্ঞগণ তাহাদিগের অধিকার প্রদানের ঔচিত্য অনুভব করিয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগের অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই প্লিবিয়ানদিগের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, রোম সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে এই ন্যায়সঙ্গত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সৈনিক বল দ্বারা সাম্রাজ্য রক্ষিত হইবে মনে করিয়া, অগষ্টাস্ সিজার যে সময়ে রাজ্যরক্ষার্থ প্রিটোরিয়ান গার্ড নামক সৈনিক দল সংস্থাপন করিলেন, সেই সময়েই রোমের বিনাশের বীজ রোপিত হইল। কালক্রমে সেই প্রিটোরিয়ানগার্ডদিগের অন্যায়াচরণ ও স্বার্থপরতা দ্বারাই রোম সমূলে উৎপাটিত হইল। রোমের ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্লিবিয়ানদিগের অধিকার বৃদ্ধির জন্য রোমানদিগের মধ্যে সময় সময় যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, শুদ্ধ কেবল তদ্দ্বারাই রোম কার্থেজের বীরদর্প চূর্ণ করিয়া সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় অব্দের ৪৯৪বৎসর পূর্ব্বে, প্লিবিয়ানদিগের অধিকার রক্ষার্থ রোমনগরে দুই জন ট্রিবিউন (Tribune) নিযুক্ত হয়। এই সময় রোমে প্লিবিয়ানগণ পেট্রিসিয়ানদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতেছিল। ট্রিবিউনদিগের নিয়োগ দ্বারা সেই অত্যাচার কথঞ্চিৎ নিবারিত না হইলে, তৎক্ষণাৎ সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন দ্বারা তদানীন্তন ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট রোম রাজ্য নিশ্চয়ই বিনাশ পাইত, এবং জগতের ইতিহাসে রোমের নাম উল্লিখিত হইত কি না সন্দেহ। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে স্পারিয়াস কাসিয়াসের (Spurius Cassius) প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধীয় প্রথম আইন (The first agrarian law) এবং পিউবিলিয়ান বিধান (Pubilian law) প্রবর্ত্তিত হইয়া রোমের জাতীয় একতা ক্রমে দৃঢ়তর করিতে লাগিল। অবশেষে, হর্টেনসিয়ান (Hortentian)বিধান ক্রমে সম্যক প্রবর্ত্তিত হইলে রোমের জাতীয় একতা একবারে সংস্থাপিত হইল এবং প্লিবিয়ান ও পেট্রিসিয়ানদিগের মধ্যে বিভিন্নতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। এই সময়—

"None was for a party,
When all was for the State,
When the rich man helped the poor,
And the poor man loved the great.—

রোমে কোন পক্ষাপক্ষের ভাব ছিল না। তখন সকলেই রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল, এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সদ্ভাব ছিল।

কিন্তু কালক্রমে আবার রোম সাম্রাজ্যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রচলিত পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদিগের মধ্যস্থিত জাতিভেদ সমুপস্থিত হইল। ধনী ও দরিদ্রের প্রকৃতিসিদ্ধ তুল্যাধিকার মধ্যে ঘোর বৈষম্য সংস্থাপিত হইল। প্রিটোরিয়ান গার্ডগণ অবৈধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের অর্থ শোষণ পূর্ব্বক যদৃচ্ছা অত্যাচার আরম্ভ করিল। সম্রাট নিয়োগ ও সম্রাটদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা কেবল সেই প্রিটোরিয়ানগার্ডদিগের হস্তেই রহিল। অর্থলোভে তাহারা নিতান্ত কপটাচারী অধার্ম্মিক ও নৃশংস প্রকৃতি নরপিশাচদিগকে সময়ে২ রাজ সিংহাসন প্রদান করিতে লাগিল, এবং ঈদৃশ অবস্থানিবন্ধন রোম অনতিবিলম্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

এই প্রকারে প্রত্যেক দেশের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিতেছে যে, মানব প্রকৃতির তুল্যাধিকার বিনাশ এবং নরনারীর প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা করিলেই সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক বিপ্লব সমুপস্থিত হয়। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লাস মনে করিতেন যে, রাজা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত সুতরাং তাহার অনুষ্ঠিত কোন

কার্য্য সম্বন্ধেই প্রজাদিগের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা নাই। ঈদৃশ অন্ধবিশ্বাস-মূলক স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন তিনি নরনারীর প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলেন, তখনই তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত হইতে হইল, এবং অবশেষে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপন কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় নৈতিক নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সংস্থাপিত না হইলে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। শাসন কর্ত্তা নির্ব্বাচন এবং শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে জন সাধারণের যদ্রূপ প্রকৃতিসিদ্ধ তুল্যাধিকার রহিয়াছে, সেই প্রকার শাসন কর্ত্তা ও শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তাহাদিগের তুল্যাধিকার আছে; এই অধিকার সংরক্ষিত হইলে কোন প্রকার বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু কি পূর্ব্বকালে, কি বর্ত্তমান সময়ে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে একবার কোন ব্যক্তি শাসন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলে, পুরুষ পরম্পরায় তাঁহার বংশধরগণই সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে থাকে। ঈদৃশ অন্যায় নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা জন সাধারণের প্রকৃতিগত অধিকার যে বিনষ্ট হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রতিষ্ঠিত শাসন কর্ত্তা কিম্বা রাজগণকে যদি জন সাধারণের সম্মতি ক্রমে সিংহাসন প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের অন্যায় ব্যবহার নিবন্ধন তাহাদিগকে সিংহাসন চ্যুত করিবার ক্ষমতাও অবশ্যই জন সাধারণের হস্তে রহিয়াছে। রাজা বা শাসন কর্ত্তা যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, ঈদৃশ ভ্রমাত্মক মত ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার

আলোকে কখনও মনুষ্য হৃদয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে রাজ্যে মানবমণ্ডলীর প্রকৃতিসিদ্ধ তুল্যাধিকার বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়, সেই স্থানেই বিপ্লবের উপক্রম হইবে তাহার সন্দেহ নাই। পাশব বল দ্বারা যাঁহারা রাজ্য সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্য সত্যই ঘোর ভ্রম-জালে পতিত রহিয়াছেন। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

জাতীয় পতন।

মনুষ্যের যত প্রকার বৃত্তি আছে, তৎসমুদায়ের যথেষ্ট পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়ত যত্নবান। এই পরিচালনার ব্যাঘাত হইলেই তাহার মহাকষ্ট উপস্থিত হয়। নদীস্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে প্রতিরুদ্ধ হইলে নদী যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করে, মনুষ্যের কোন বিশেষ বৃত্তির পরিচালনার ব্যাঘাত হইলে সেও তেমনই আপনার অন্যান্য বৃত্তিকে ভাসাইয়া দেয়। মনুষ্য স্বাধীনতাপ্রিয় জীব; সে প্রতি কার্য্যে ও চিন্তায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য ও চিন্তা করিতে যত্নশীল। কি শারীরিক, কি মানসিক, কোন প্রকার স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইলেই তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। আবার বৃত্তি সকলের পরস্পর এমনই সম্বন্ধ যে, একের ব্যাঘাতে অন্যেরও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে। কেবল তাহা নহে। মনের সহিত শরীরের এমনই নিকট সম্বন্ধ যে, মানসিক বৃত্তির ব্যাঘাতে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাও লাভ করা যায় না।

পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পর্ব্বতাদি দ্বারা স্রোতের গতিরোধ হইলেও বেগবতী নদী সকল যেমন নূতন পথ খোদিত করিয়া প্রান্তরকে ভাসাইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়া যায়, তেমনই কোন বৃত্তি বিশেষের গতিরোধ হইলে লোকে অন্য এক বা অধিক বৃত্তির এতই পরিচালনা করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ স্বচ্ছন্দে তাহার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ইহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গের কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ। আজি তাঁহারা যে পরিমাণে আপনার ও সাধারণের মঙ্গল সাধনে সক্ষম হইয়াছেন, আমাদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস যে, কেরাণীর এবং বিচারকের আসন হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা কখনই আপনার বা সাধারণের সে পরিমাণে উপকার সাধিত হইতে পারিত না। সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় কবি লর্ড বাইরণ প্রণয়ে হতাশ হইয়া উৎকৃষ্ট কবি হইয়াছিলেন। যদি তাঁহার স্বাধীন বৃত্তির পর্য্যাপ্ত পরিচালনা চলিত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে তিনি যে প্রকার শ্রেষ্ঠ কবি, সে প্রকার হইতে পারিতেন? যাহা হউক, স্থল বিশেষে দেখা যায় যে, স্রোতের প্রতিরোধ হইলেও নূতন পথে সে স্রোত বিশেষ কার্য্যকর ও মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না, এমন নহে। কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। মনুষ্য বৃত্তির স্রোত রুদ্ধ হইলে প্রায় সর্ব্বত্রই নদীর স্রোতের ন্যায় বিপথগামী ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে, যে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, সে কার্য্যে বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার মানসিক বৃত্তি সকল বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার পথ কোন মতে রুদ্ধ না হয় মনুষ্য মাত্রেরই এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রাজ্য শাসন ও সমাজ শাসন—কার্য্যে শাসন কর্ত্তাদিগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক যে, তাঁহাদিগের শাসন দোষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্ব না হয়। এই স্বাধীনতা কিন্তু কোন কালে কোন দেশে অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। প্রতি সভ্যদেশের ইতিহাস অনুসন্ধান কর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে যে, যে জাতি বহুকাল অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ সে জাতির উন্নতি নাই—সে জাতির অধঃপতন হইয়াছে। স্বদেশীয় সিংহাসনে স্বদেশীয় রাজা বসিলেও অনেক স্থলে সুশাসন ও সুনিয়মের অভাবে সে জাতির অধঃপতন হইতে দেখা গিয়াছে। এক দিনে রোমের বা ভারতের পদস্খলন হয় নাই। এক দিন দৈবাৎ কোন দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া অধিবাসীগণের চরণে পরাধীনতার নিগড় পড়িল, এমন কথা কখন শুনা যায় নাই এবং সম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না। সংসারে যাহারা যাহারা উন্নত থাকিয়া অবনত হইয়াছে, তাহারা এক দিনে উন্নত বা পতিত হয় নাই। সেই সেই দেশের রাজ্য ও সমাজ শাসনের শোনিত মধ্যে এমন কোন বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াছে যে, সেই বিষাক্ত দ্রব্যের দোষে শোণিত দিনে দিনে দূষিত হইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। সেই বিষাক্ত দ্রব্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হানি ব্যতীত আমরা আর কিছুই বলি না।

যে ভারতবাসী আর্য্য সন্তানগণ আজ জগতের সমস্ত জাতির চক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা চিরকাল এমনই ছিল না। তাহারাও স্বাধীন ছিল। স্বাধীন থাকিয়া অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিয়াছে, উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে; দর্শন, বিজ্ঞান শিল্প, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিদ্যার চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু কালে তাহাদিগেরও অধঃপতন হইয়াছে—তাহাদিগের এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, কোন বিজীত জাতির ইতিহাসে তাহাদিগের সমান পাওয়া যায় না। যে রোমের প্রতাপে এক দিন সমস্ত জগৎ কম্পিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল তাহারও অধঃপতনের ইতিহাস আছে। যে রোম বহুকাল ধরিয়া স্বাধীন ছিল, স্বাধীন থাকিয়া নানা দেশে জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, সে রোমকেও পরাধীনতার নিগড় পরিতে হইয়াছে। এই পরাধীনতা, এই অধঃপতন কি এক দিনে সম্পাদিত হইয়াছে? আমরা বলি কখনই নহে।

যে, যে পরিমাণে একটী কার্য্য করে, সেই কার্য্যে তাহার সেই পরিমাণে পটুতা জন্মে। এক বস্তু যে যত অধিক দিন ভোগ দখল করে, সেই বস্তুতে তাহার তত অধিক মমতা জন্মে। এই কারণে, আমরা বহুদিন হইতে বিজয়ীদিগের পদানত আছি বলিয়া পরাধীনতা আমাদিগের বড় একটা অসুখ বলিয়া বোধ হয় না, এবং অস্থি মজ্জা হইতে স্বাধীনতার নাম গন্ধও দূরীত হইয়াছে; সুতরাং পুনরায় তাহা লাভ করিবার জন্য বড় একটা ব্যাকুলতা বা ইচ্ছাও দেখা যায় না। যদি কোন ঘটনা বিশেষে মনে কোন প্রকার স্বাধীনভাবের উদয় হয়, দুঃখের কথা বলিব কি, অমনি চারিদিকের বন্ধন সকল অগ্রসর হইয়া সে ভাবটীকে আর মাথা তুলিয়া উঠিতে দেয় না; বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অমনি তাহা উৎপত্তি স্থানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু রোম ত বহুদিন স্বাধীন

ছিল, পূর্ব্ব ভারতও ত বহুদিন স্বাধীন ছিল, তবে তাহাদিগের অধঃপতন কেন? শত যোজন বিস্তৃত নদীকে যেমন পুনরায় পর্ব্বতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া যায় না, বহুদিন উপযুক্ত স্বাধীনতারও তেমনই এক দিনে বিনাশ সম্ভব নহে। দিন দিন তিল২ করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট হয়, অবশেষে এক দিনের সামান্য একটী যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া অন্ত-র্জ্জলী-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পানিপথ যুদ্ধের এক দিনে ভারত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে নাই। পলাশীর এক দিবসের যুদ্ধেই ইংরাজের নিকট ভারত পরাজিত হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের দিবসের ভীরুতা দেখিয়া যিনি জাতীয় সাহসের নিন্দা করেন, তিনি মহাভ্রমে পতিত, তাঁহার জানা কর্ত্তব্য যে, এক দিনে কোন প্রবল জাতির সাহস ক্ষণ-প্রভার ন্যায় আকাশে মিলাইয়া যাইতে পারে না। পলাশীর যুদ্ধের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার লোপ হইয়াছে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতের অস্থি মজ্জাতে অধীনতার বিষ মিশ্রিত হইয়াছে।

জাতীয় উত্থান ও পতন এক দিনে সম্ভা-বিত নহে। যে দিন ফ্রান্স বলিল যে, প্রত্যেক অধিবাসীরই সত্ব সমান, সেই দিন হইতেই ফ্রান্সের প্রকৃত উত্থান আরম্ভ হইল। যে দিন রোমের সামান্য কৃষকেরও সম্রাটের স্থান পাইবার পথ পরিষ্কার হইল, সেই দিন হইতেই রোমের গৌরব বৃদ্ধি হইল। যে দিন ইংলণ্ডে রাজা প্রজা সমান হইল; সেই দিন হইতেই ইংলণ্ডের মুখ উজ্জ্বল হইল। আবার যে দিন যুদ্ধ কেবল ক্ষত্রিয়েরই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই দিন ভারত ডুবিল। যে দিন রোমের এক একটী সেনাপতি এক একটী নবাব হইলেন, সেই দিন রোমের সূর্য্য অস্ত গেল। যে দিন ফ্রান্সের শাসন বল্‌গা কয়েকজন স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতালোভী পিশাচের হস্তে পড়িল, সেই দিন ফ্রান্সের পদস্খলন হইল। যে দিন হইতে জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার হয়, সেই দিন হইতেই সেই জাতির উন্নতির সূত্রপাত, আর যে দিন হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ হইতে আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতেই সেই জাতির মৃত্যুর দিন গণনা করা যাইতে পারে। স্বাধীনতা, লোকের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি, ইহার পরিচালনায় ব্যক্তি-গত ও সমাজগত উন্নতি এবং ইহার ব্যাঘাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিকৃতি। ব্যক্তি মাত্রই স্বাধীনতাপ্রিয়, সুতরাং যে সমাজে যে পরিমাণে স্বাধীনতা আছে, সেই সমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণ সেই পরিমাণে উন্নত ও সুখী; এই জন্য কবিগণ স্বাধীনতার এত গুণগান করিয়াছেন। যে চলিতে সক্ষম তাহাকে চলিতে না দিয়া কিছুকাল আবদ্ধ রাখ, দেখিবে সে বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং সুখে জলাঞ্জলী দিয়া বসিয়া আছে। কোন এক বিষয়ে স্বাধীনতার লোপ হইলেই লোকের সকল দিক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, স্বাধীনতার এমনই ধর্ম্ম, অতএব ব্যক্তি-গত স্বাধীনতার লোপ হইলে কেবল যে বিদেশীয় কোন জাতি আসিয়া পতিত জাতির রাজ সিংহাসন অধিকার করে, আমরা তাহাই বলিতেছি, এমত নহে। যাহারা হৃদয়ের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জিত করিয়াছে, তাহাদিগের সিংহাসনে অন্যে না বসিলেও তাহারা অধঃপতিত ও মৃত জাতি মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু জাতিমাত্রই আপনার স্বাধীনতার রঙ্গভূমি বৃদ্ধি করিতে নিয়ত যত্ন-বান, সুতরাং অধঃপতিত জাতি সহজেই ভীম

পরাক্রম বীর্য্যবান জাতির চরণে দলিত হইয়া পড়ে। সংসারে ক্ষমতাই ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল বলিয়া বীর্য্যবান আপন বীর্য্যবলে সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিয়া সতেজ হয়, আর যে দুর্ব্বল সে বলবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাভূত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়। এই কারণে পরা-ধীন স্বাধীনতা-বিহীন জাতি সর্ব্বত্রই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া কালে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়।

শাসন স্বাধীনতার পরম শত্রু। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, যাহারা স্বাধীন তাহারাই অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছে। সিজর, হানিবল, নেপোলিয়ন প্রভৃতির কোন বীরই কেবল ধনের আশায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রধান ইচ্ছা অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করা। যে কেবল অন্যের সামগ্রী অপহরণ করিতে চাহে, সে যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে তাহার স্বাধীনতা অন্যে অপহরণ করিলে তাহার বড় অধিক ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে। তদ্ভিন্ন দেখা যায় যে, যাহারা সকলেই সকলের প্রভু হইতে চাহে, তাহারা সকলেই আবার তৃতীয় ব্যক্তির দাস হইয়াছে; সুতরাং কেবল সকলের প্রভু হইবার ইচ্ছায় অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিলে নিজের স্বাধীনতা ও শীঘ্র বা বিলম্বে বিসর্জ্জন করিতে হয়। যাহার মনে এমন একটী সংস্কার জন্মিল যে, ভারতীয়েরা হীন-বল এবং আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান, সুতরাং আমরা তাহাদিগের প্রভু; তাহার মনে স্বতঃই আর একটী সংস্কার উপ-স্থিত হইবে যে, অন্য এক জাতি আমাদিগের অপেক্ষা বলবান, সুতরাং তাহারা আমাদি-গের প্রভু। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রভুত্ব করিবার আশায় দেশ জয় করিলেই বা নিজের দেশে বসিয়াই অন্যের উপর আধিপত্য করিতে গেলেই অধিকতর বলবান জাতির ভয়ে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যে দেশ স্বাধীন, তাহার শাসন যাহাদিগের হস্তে তাহাদিগের এমন প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে যে, অন্যের স্বাধীনতা তাহাদিগের করতলস্থ এবং অন্যের স্বত্ব লোপ করিতে তাহারা যত্নবান। ভারতের শেষ অবস্থায় দেখা যায় যে, বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বিদ্যমান ছিল এবং কয়েক জনের করতলে অন্যান্য অনেকের স্বাধীনতা দলিত করবাসীরা বিজ্ঞ ছিল, সুতরাং তাহাদিগের অধঃপতিত। বহুকালে হইবে যে, তাহারা এবঙ্কল আবিষ্কৃত অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন, কীর্ত্তি প্রচলিত স্বত্ব তাহাদিগের হস্তের ত্তিত হইয়াছে,। পক্ষান্তরে এমনও বিশ্বাস ছিল যাহাদিগের অপেক্ষা যে অধিক ক্ষমতাপন্ন, সে আবার তাহাদিগের প্রভু হই-বার উপযুক্ত। এই কারণে অনেকে সংগ্রাম-বিমুখ হইয়া দেশ ছাড়িয়া দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় জড়বৎ বসিয়া রহিল, আর বঙ্গেশ্বর জগন্নাথ তীর্থে প্রস্থান করিলেন। এই বিশ্বাসেই সর্ব্বত্র সন্ধি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কেন না, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করা প্রাজ্ঞ সম্মত।

সকল পদার্থেরই অল্প বিস্তর বল প্রয়োগ করিবার শক্তি আছে। সামান্য একটী পর-মাণুরও বল আছে। কিন্তু বল একত্রিত হইয়া যে কার্য্য করিতে পারে, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তেমন করিতে পারে না। সাগরে বিস্তর বাষ্প আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পীয় যন্ত্রের ন্যায় কোন কার্য্যই করিতে পারে না, কেন না বল যত কেন্দ্রীভূত হইবে, ততই তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু কোন

জাতির পতন সময়ে সমগ্র জাতীয় শক্তি এক কেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয় নাই। প্রায় সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা এই জাতীয় বলকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এমন করিয়া বিভক্ত করিয়াছিলেন যে, কার্য্যের সময়ে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্রিত করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কোন প্রবল শক্তিকে সামান্য বলে পরাঙ্মুখ করা যাইতে পারে না। যতক্ষণ না সমস্ত জাতীয় বল একত্রিত হয়, ততক্ষণ সে বল কোন কার্য্যকর হয়ে, কিন্তু মত্ত হস্তীর রজ্জু ছিন্ন করিতে অশক্ত হওয়ার ন্যায় রাজিত হয় নাই। ত্রিত হইলে তাহাকে ভীরুতা দেখিয়া শক্তি কাহার? অতএব নন্দা করেন, তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত না কর্ত্তব্য যে, কার্য্যের সময় এক কেন্দ্রে আ সাহস ক্ষণ- হয় নাই, সেইখানেই পরাজ হইতে আছে। কেবল যে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে একথা প্রযুক্ত হইতেছে, এমন নহে। মনে কর, দেশে একটী লৌহের বাণিজ্য করিবার আবশ্যক হইল। কিন্তু এই বাণিজ্য বিস্তর অর্থ-সাপেক্ষ এবং এক জনের বা দশ জনের এমন অর্থ নাই যাহাতে এই কার্য্যটী সুচারুরূপে চলিতে পারে। এমন স্থলে যদি আর সকলে আসিয়া কার্য্যে যোগ না দেয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে কার্য্য চলিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল দুই চারি জনের শক্তি দ্বারা দেশের সে বাণিজ্য চলিল না এবং চলাতে যে লাভ হইতে পারিত, তাহাও হইল না।

ব্যক্তিগত সামাজিক স্বাধীনতার যথা-সঙ্গত ও যথা সাধ্য পরিচালনার ব্যাঘাত হইলেও দেশের অনিষ্ট। আমি ব্রাহ্মণ তুমি শূদ্র, অতএব তোমার কন্যার সহিত কদাচ আমার পুত্রের বিবাহ চলিবে না। তোমার কন্যার আমার পুত্রের অপেক্ষা সহস্রাধিক গুণ ও ক্ষমতা থাকিলেও তোমার এমন অধিকার নাই যে, আমার সহিত সমান হও। অতএব তুমি চিরকালই আমার অধীন হইয়া রহিলে, অথবা চিরকালই পরস্পরকে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। শূদ্র যতই পণ্ডিত হউক না কেন, বেদ তাহার পাঠ্য নহে। বেদে যে সকল উপদেশ আছে তাহা কখনই তাহার জ্ঞাতব্য নহে, সে কখনই ব্রাহ্মণের সহিত সমান জ্ঞান লাভ গত রিতে পারিবে না। আবার একজন ব্যক্তি ক্ষণও রজকের কার্য্য করিতে পারিবে না, ম রিলেই সে জাতিভ্রষ্ট হইবে এবং ব্রাহ্মণের যাহাতে যাহাতে বিশেষ অধিকার, তাহাতে তাহাতে তাহার আর অধিকার থাকিবে না। এই প্রকার বৈষম্য একটী জাতীয় অধঃপতনের প্রধান হেতু, অর্থাৎ সকল লোকের সকল কার্য্যেই স্বাধীনতা না থাকিয়া কেবল কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের উপর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার থাকিলে, সে কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না এবং সমগ্র জাতির উন্নতি না হইয়া অধঃপতনের পথ পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যে গুণে একজন ব্রাহ্মণ, সেই গুণ থাকিলে অপরে ব্রাহ্মণ হইতে না পারিবে কেন? যখন ভারতে তাহা হইতে পারিত, তখন ভারতের অবস্থা আজিকার ন্যায় গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন নহে। কোন বিশেষ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়াই প্রতি পুত্র পিতার ন্যায় গুণবান বা গুণহীন হইবে, এমন কি অর্থ আছে? একজন প্লিবিয়ন কোন মতেই পেট্রিসিয়ন না হইবার পক্ষে কি স্বাভাবিক কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল? এই জন্য বড় আশঙ্কা হয় যে, ইংলণ্ডে লর্ডস্ ও কমনস্ এবং লিবারেল ও কনসার্ভেটিভ্ সম্প্রদায় লইয়া এক দিন মহা গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। তাহা হইলে ইংলণ্ডেরও রোম এবং ভারতের ন্যায় অবস্থা হইবে। স্বাধীনতায় বৈষম্য মহা অনর্থের হেতু, এবং এই বৈষম্য দোষেই অনেক রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছে।

যাহারা নির্ব্বিবাদে অনেক দিন স্বাধীন থাকিয়া প্রবল বলশালী হইয়াছে এবং সভ্যতার চরম সোপানে আরোহণ করিয়া সভ্যতার ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই উদ্যমবিহীন হইয়া বিলাসপ্রিয় হইয়াছে। ক্রমশঃ উন্নতির দিকে লক্ষ্য না থাকিলে জাতিমাত্রকেই স্রোতবিহীন কূপোদকের ন্যায় পুতিগন্ধযুক্ত হইতে হয়। ব্যবহার না থাকিলে লৌহ যেমন মরিচা ধরিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বিলাসপ্রিয়তা আসিয়া তেমনই স্থিতিশীল জাতিকে দুর্ব্বল করে। অবশেষে যখন বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কোন কাজেই লাগে না। স্থিতিশীল হইলে জাতিমাত্রই যে বিলাসপ্রিয় হয়, এমন বলি না। অনেকে উন্নতি ও চেষ্টাশীল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক এবং তাহাদিগের ক্ষমতাও সামান্য। দুই চারি জন ক্ষমতাশালী উচ্চ শ্রেণীর লোকও বিলাস-বর্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু যখন দেশের সাধারণ স্রোত বিলাসের এবং স্থিতিশীলতার দিকে, তখন দুই চারি জন বিলাস-বর্জ্জিত ব্যক্তির দ্বারা কি হইতে পারে? অতএব উন্নতির দিকে চিরকালই লক্ষ্য থাকা আবশ্যক এবং স্থিতিশীলতা, জাতীয় অধঃপতনের একটী প্রধান হেতু। চালনা অভাবে যেমন শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনার অভাবে লোকের মানসিক বৃত্তির ও তেজের হানি হয়; সুতরাং জাতিমাত্রই স্থিতিশীল ও বিলাসপ্রিয় হইলে নিস্তেজ হইয়া অধঃপতিত হয়। স্থিতিশীল বলিয়া চীনদেশ পতিত হইয়াছে, যদিও তাহাদিগের রাজসিংহাসন এখনও বৈদেশিক রাজার দ্বারা অধিকৃত হয় নাই তথাপি তাহাদিগের উন্নতির পথে কণ্টক যাহা পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? তাহারা স্থিতিশীল, তাহারা উদ্যমবিহীন, তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। চীন কবাসীরা বিজ্ঞ ও সভ্য, কিন্তু স্থিতিশীল হইয়া থাধঃপতিত। বহুকাল পূর্ব্বে যে নিয়ম এবঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে সকল সমাজ-কীতি প্রচলিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। যদিও সে সকল নীতিকে দোষযুক্ত বলা সহজ নহে, তথাপি তাহার আলোচনারও উন্নতি আবশ্যক এবং এই আলোচনা ও উন্নতির অভাবে, অর্থাৎ সেই সকল নিয়ম কাহারও অনতিক্রম্য হওয়াতে, জাতীয় ও মানসিক বৃত্তি নিশ্চল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে তাহাদিগের লক্ষ্যও নাই এবং যদি কখন তাহাদের পুনরায় আলোচনা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় বিদেশীয়ের দ্বারাই তাহা হইবে। ভারতেরও এই অবস্থা। মনু ও মান্ধাতার সময়ে যে সকল রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা সেই সকল নিয়মেই কাজ করিয়া আসিতেছিলাম। সেই জল ঘটীকা, সেই বালু ঘটীকা, সেই গন্ধক লিপ্ত দেশালই, সেই চকমকির বাক্স, সেই সুতা প্রস্তুত করিবার চরকা, সেই নবম বৎসর বয়সে বিবাহ, সেই বস্ত্র পরিধানের রীতি, সেই আহারের পদ্ধতি, সকলই সেই পুরাতন

নিয়মের অধীন থাকিয়া চিরকাল সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহাতে প্রকার ভেদ নাই, অর্থাৎ যাহা চিরকালই সমান, তাহা স্থিতিশীল, সুতরাং তাহা রুগ্ন ও নিস্তেজ। রুগ্ন ও নিস্তেজ সামগ্রী লইয়া বহুকাল লোকে উন্নত থাকিতে পারে না, সুতরাং শক্তি রতের অধঃপতন হইল। চীনেরও এইরূপ অধঃপতন। সমস্ত আসিয়া খণ্ডেরই এই শূন্য মলিন অবস্থা।

কেহ কাহারও অধীন না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে আপন আপন জীবনতরঙ্গ চালিত করিলে, কোন জাতিই স্থিতিশীল থাকে না। এক পথে না চলিয়া সকলেরই স্বতন্ত্রপথে চলা আবশ্যক এবং এই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার জন্য সকলেরই স্বাধীনতার প্রয়োজন। জাতীয় উন্নতির জন্য, অতএব, স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতার নিতান্ত আবশ্যক। যাহাদিগের এই দুইটী অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব, তাহারা কখনই উন্নত ও সভ্য থাকিতে পারে না। এই দুই ধনে ধনী বলিয়া ইউরোপের প্রায় সকল জাতিই আজ উন্নত ও সভ্য। আসিয়ার অপেক্ষা ইউরোপ এত উন্নত, কেবল এই কারণে। কি নিমিত্ত ইউরোপ আসিয়ার ন্যায় স্থিতিশীল না হইয়া এত উন্নত হইল? ইউরোপের কিছু শ্রেষ্ঠ গুণ বা ক্ষমতা নাই, ইউরোপ আসিয়া অপেক্ষা প্রকৃতির প্রিয়পাত্র নহে। আসিয়াতে সকলেই সমান, সকলেই এক নিয়মের অধীন, সকলেই এক পথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইউরোপে তাহা নহে। জাতি বিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষ পরস্পর হইতে পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং সকল পথই অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী। এই বিবিধ পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করাই ইউরোপের বাস্তবিক উন্নতি ও সভ্যতার সোপান। সকল বিষয়ে পারদর্শিতা ও পূর্ণতালাভ কেবল বিবিধ উপায় অবলম্বন করাতেই সম্ভব। এবং ইউরোপ এই বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া নানা বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। আমরা যেমন একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া নিস্তেজ ও পতিত হইয়াছি, ইউরোপ তাহার বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন পথে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এক পথে চিরকাল চলিয়া আসিলে অন্য পথ আবিষ্কার করা এবং তাহাতে চলা অতি কঠিন হইয়া উঠে। এক পথ এবং এক নিয়ম বহুকাল চলিয়া আসিলে অন্য পথে যাইতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং নানা প্রকার অভাব ও বলহানি আসিয়া উপস্থিত হয়। এক পথে বহুকাল চলাতে জাতীয় চরিত্র দূষিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে এবং সেই এক পথই প্রকৃতির প্রকৃত পথ বলিয়া লোকের ভ্রমজনক বিশ্বাস হইয়া যায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতি ও চরিত্র গঠনের জন্য পার্থক্য বড়ই প্রয়োজনীয় এবং এই পার্থক্য অবলম্বন করিতে সকলেরই স্বাধীনতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কি নিমিত্ত সকলেই বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবে? এক জন দাসত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া অন্যে কৃষি বাণিজ্য অবলম্বন করিবে না কেন? কেহ বা শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা সেনা বিভাগে প্রবেশ করিল—এই প্রকারে সকল পথ সকলকেই পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, নতুবা সকলে এক পথে গমন করিলে অন্যান্য বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া অবশ্যই অবশেষে ভারতের ন্যায় বিদেশীয়ের পদ-দলিত ও অন্নাভাবাপন্ন হইয়া নিধন লাভ করিবে।

জাতীয় উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসায় ও কার্য্যের এক দিকে যেমন প্রয়োজন, স্বাধীনতারও তেমনি প্রয়োজন। সিংহাসনে অন্য কোন বিদেশীয় রাজা বসিলেও চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত বিনা ব্যাঘাতে প্রবাহিত হইতে পারে। মুসলমান রাজত্বের প্রথম অবস্থায়, যখন রাজ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই, তৎকালে, ভারতের সিংহাসনে যবন বসিলেও যে যে বিষয়ে হিন্দুর স্বাধীনতার প্রয়োজন, তাহাতে তাহারা বঞ্চিত ছিল না। সমস্ত হিন্দু-সত্বই অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল, সুতরাং মুসলমান রাজত্বকালে বড় একটা ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন তাহাদিগের রাজত্বের শেষে হিন্দু স্বাধীনতার লোপ হইতে লাগিল, মুসলমানেরা আর কেবল রাজস্ব লইয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া জাতীয় স্বাধীনতাতে হস্তার্পণ করিল, তখন হইতেই মুসলমান সিংহাসন দোলায়মান হইতে লাগিল। কিন্তু যত দিন সমস্ত রাজকার্য্য হিন্দুর দ্বারা চলিত এবং যে যে বিষয়ে জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল, সে সময়ে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি নিশ্চল ও নিষ্কম্প। যদিও তৎকালে স্বাধীন রাজ্যের ন্যায় সকল সুখ ও সুবিধা সুলভ ছিল না, তথাপি মুসলমান রাজত্ব কালে দেশের বড় একটা ক্ষতি হয় নাই, কেন না অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল, শাসনকর্ত্তা নামতঃ মুসলমানের হস্তে থাকিলেও উচ্চ রাজপদ সকল হিন্দুরই করতলস্থ ছিল এবং দেশের ধনরাশি দেশেই ব্যয়িত হইত, কেন না মুসলমান এদেশের রাজা হইয়া এই স্থানেই বাস করিতেন।

যদি বিজয়ী জাতি বিজীত দেশে বাস করে, তাহা হইলে অনেকটা সুখের ও লাভের বিষয় বটে, কেন না যে, যে দেশে বাস করে সেই দেশকে উন্নত ও ধনসমৃদ্ধিশালী করিতে তাহার বিশেষ যত্ন থাকে, কিন্তু ইংরাজ এখানে বাস করিতে আসে নাই, সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য তাহার ষোল আনা যত্ন থাকা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। তাহার যত্ন, কিসে এখানকার ধন ও সুখ রাশি লইয়া গিয়া আপন দেশের ধন ও সুখ বৃদ্ধি করিবে এবং ইহা সম্পাদিত হইতে যাহা লাগে তাহাও তাহার চিন্তা ও চেষ্টার বিষয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিজয়ী জাতি যতই বিজীত দেশে বাস করে ততই সে দেশের মঙ্গল। বিজীত দেশে থাকিয়া রাজা যত প্রজার অবস্থা জ্ঞাত হইবে এবং প্রজার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, ততই উভয়ের মঙ্গল।

উন্নতির সাধারণ দুই একটী নিয়মের কথা বলা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতের কি আছে এবং কি নাই। ভারতের উন্নতি-প্রদায়ক কি আছে, দেখিতে গেলে বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়, চারি দিকেই ঘোর অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলিবেন, ভারতের ন্যায় সভ্য দেশ আর কোথায়? ভারতের ন্যায় ধন ও জ্ঞান কোথায় অধিক? ভারতের ন্যায় ধর্ম্মপ্রধান, উৎকৃষ্ট সামাজিক নিয়ম প্রধান দেশ পৃথিবীতে আর কোথায়? ভারতের ন্যায় সমতল ভূমি, পর্ব্বত, নদী, সাগর, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি বিশিষ্ট এত বড় বিস্তীর্ণ দেশ আর কোথায়? কিন্তু আমরা বলি, ভারতের এক্ষণে সকলই ভূগর্ভ-নিহিত রত্ন খনির ন্যায় অপ্রকাশ রহিয়াছে। এক সময়ে ইহার সকলই ছিল বটে, এবং যাহা ছিল তাহা আর কোন সভ্য দেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু ভারত এক্ষণে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রজনীর ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত

হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। পূর্ব্বে ভারত এমন ছিল, তেমন ছিল, বলিয়া অহঙ্কার করিলে আর চলিবে না—এক্ষণে ইহার আর কিছুই নাই, কেবল ছায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্বের অবস্থার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যাইবে, এই জন্য সংক্ষেপে আমরা কয়েকটী অভাবের উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব এবং সেই সকল অভাব মোচনের কোন উপায় আছে কি না, সে পক্ষেও আমাদিগের মত প্রকাশ করিব।

একতাই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ। কিন্তু ভারত এ বিষয়ে বড়ই কাঙ্গাল। সমস্ত জাতীয় একতার কথা দূরে রাখিয়া দেখিবে যে, কোন একটী ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্গত দুই তিন জনেরও মতের ঐক্য হয় না এবং কোন একটী কার্য্যে সকলের সাহায্যের আবশ্যক হইলে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ পথে প্রস্থান করে। ব্যক্তিগত কার্য্যে সকলেরই যে এক মত হইবে এবং সকলেই এক কার্য্য করিবে, তাহা আমরা বলি না, কিন্তু কোন একটী সাধারণ কার্য্যে যে, সাধারণের সাহায্যের ও যোগ দানের আবশ্যকতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। একত্র কার্য্য করাতে যে কি সুফল, তাহা আমরা জানি না এবং তদ্বিষয়ে আমাদিগের যত্ন ও নাই। একত্রে কার্য্য করার ফল আমরা জানি না এবং আমাদিগের মধ্যে শিখিবারও দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু ইউরোপে অনেক কার্য্য একজনের সাধ্যায়ত্ব হইলেও পাঁচজনে তাহা করিয়া থাকে। আজ কাল ব্যবসায় বাণিজ্যে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দুই চারি জনকে একত্রে কাজ করিতে দেখা যাইতেছে এবং ইউরোপীয় দৃষ্টান্তে সে বিষয়ে শিক্ষা পাইবারও উপায় হইতেছে। এটী ভারতের মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। যাহাতে একতা সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য অনেক দেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্থানে স্থানে সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন, প্রার্থনা করি, তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হউক। জাতীয় একতা কখন সংস্থাপিত হইবে কি না, তাহা জগদীশ্বরই জানেন, আমরা কিন্তু বিস্তর বিঘ্ন দেখিতে পাই। যদিও সাধারণ কার্য্যের জন্য এবং সমস্ত জাতির মঙ্গলের জন্য সে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থাতে আমাদিগের বড় আশা ভরসা নাই।

ইংরাজী শিক্ষার যাহা কিছু অপকৃষ্টাংশ তাহার সারভাগ আমরা গ্রহণ করিতেছি। নিজের নিজের বিষয়ে ইংরাজ কিছু আপ্তসুখান্বেষী। তাহাদিগের সাধারণ কার্য্যের একতার দৃষ্টান্ত না দেখিয়া কেবল দোষ ভাগই আমরা গ্রহণ করিয়া সাধারণ কার্য্যেও আমরা আপ্তসুখান্বেষী হইতেছি এবং সকলের সহিত সহানুভূতি বিরহিত হইয়া কেবল নিজের মঙ্গলের দিকেই দৃষ্টি রাখিতেছি। এই এক ভারতে নানা জাতি হইয়া, নানা ভাষা কহিয়া এবং নানা প্রকার ধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া আমরা অন্যের সুখ দুঃখ বুঝিয়া সহানুভূতি করিতে বড়ই কৃপণ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য, অর্থাৎ সকল বিষয়ে না হউক, কেবল কয়েক বিষয়ে মাত্র এক জাতীয়ত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য প্রথমেই পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারা আবশ্যক। পরস্পরের দুঃখই যদি ভাষার অনভিজ্ঞতা বশতঃ বুঝিতে না পারিলাম, তবে কি প্রকার পরস্পরের সহিত সহানুভূতি প্রকাশিত হইবে এবং তাহার দূরীকরণের জন্য চেষ্টা হইবে?

অতএব কোন একটী সাধারণ ভাষা সকলেরই শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। ইংরাজী ও হিন্দি, এই দুই ভাষার একটী ভারতে সাধারণ ভাষা, মাতৃভাষারূপে না হউক, বলিবার ও বুঝিবার জন্য প্রচলিত হওয়া উচিত। ইংরাজ রাজা, সুতরাং সর্ব্বত্রই ইংরাজী ভাষা স্বচ্ছল এবং না শিখিলে রাজায় প্রজায় পরস্পর কথা বার্ত্তা ও সাংসারিক কাজ কর্ম্ম চলা নিতান্ত অসঙ্গত, এই জন্য ইংরাজী আমাদিগের সাধারণ ভাষা হইবার পক্ষে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। তৎপরে হিন্দি। হিন্দি ভাষাতে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ও আধুনিক মুসলমান শাসন কালের রাজভাষার বিস্তর শব্দ আছে। তদ্ভিন্ন হিন্দি প্রায় দেশের সকল অংশেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং রাজপুরুষেরাও অনেকে হিন্দি বলিতে ও বুঝিতে পারেন, এই জন্য ভরসা হয় যে, হিন্দি আমাদের কথিত ভাষা হইলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না এবং ভারতের প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক লোকের ইহাই মাতৃভাষা। সুযোগ্য "নব্যভারত" সম্পাদক বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা কালে সাধারণ ভাষা হইবে, কিন্তু আমাদিগের সে পক্ষে বড় ভরসা নাই।

জাতীয় সহানুভূতির স্রোত একদিকে চালিত করিতে হইলে, প্রথমেই একে অন্যের সুখ দুঃখ বুঝিবার জন্য ভাষা বুঝিবার আবশ্যকতা দেখা যায়। তৎপরে ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ মতের ঐক্য হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রধান দেশে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য ও গতি প্রায় এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কখনই একত্র মিলিত হইতেছে না। অতএব আমাদিগের এক্ষণে কর্ত্তব্য যে, সকল ধর্ম্মের সার ও সাধারণ নিয়ম সকল সংগ্রহ করিয়া একটী নূতন নামে সকল পুরাতন নিয়মের সারাংশকে অভিহিত করা। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত এমত আশা ছিল, কিন্তু উক্ত ধর্ম্মের প্রধান প্রধান নেতাগণের নিজের দৃষ্টান্তে সাধারণের এক প্রকার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে আর কার্য্যসিদ্ধি হইবার বড় আশা নাই। ভারতীয় ধর্ম্ম বা আদি ধর্ম্ম নামে এই সকল পুরাতন ধর্ম্মের নূতন নাম করণ করিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না? ইহাতে একটী প্রধান দৃষ্টির বিষয়, উপাসনার নীতির অনস্তিত্ব এবং যে সকল সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মনিয়মের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পরিহার।

ধর্ম্ম ও ভাষা এই দুই বিষয়ে আপাততঃ ঐক্য হইলে বোধ হয় অনেকটা একতা সংস্থাপিত হইতে পারিবে এবং ভারতীয় সকল জাতিই পরস্পরের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে। ইহার উপর যদি সামাজিক রীতিনীতিরও সাম্য প্রবর্ত্তিত করা যায়, এবং বর্ণে বর্ণে এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিবাহাদি দ্বারা আত্মীয়তা সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে অনেকটা মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। একতাসূত্রে বদ্ধ হইবার আরও অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আমরা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েরই কেবল উল্লেখ করিলাম। কথিত বিষয়ে ঐক্য হইলেই কেবল যে যথেষ্ট হইবে, তাহা নহে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, সময়ে সময়ে সকল জাতি তথায় একত্র হইয়া একতাকে দৃঢ় বন্ধনে বন্ধন করে।

পূর্ব্বকালে ভারতে এ প্রকার বিস্তর মেলা ছিল এবং এখনও প্রয়াগ ও অন্যান্য স্থানে বিকৃত অবস্থায় দুই একটী বিদ্যমান রহিয়াছে। দেশ-ভ্রমণ, তীর্থ পর্য্যটন, পণ্ডিতদিগের দিগ্বিজয়, ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে নিমন্ত্রণ প্রভৃতির দ্বারাও বিস্তর ফললাভ আশা করা যাইতে পারে।

শিক্ষা ও শাসন প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যে সাধারণের আলোচনা বৃদ্ধি করা পতিত জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয়ে চিরকাল বিজয়ী রাজার উপর নির্ভর করিলে আর চলিবে না। রাজা যে প্রকারে ইচ্ছা শিক্ষা দিবেন, স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাসন করিবেন, আর পতিত জাতি তাহাই শিরোধার্য্য করিবে, তাহা হইলে পতিত জাতির আরও অধোগতি হইবে। যে সকল বিষয় শিক্ষা করাতে আমাদিগের আপাততঃ লভ্য দেখিব, তাহাই শিক্ষা করিব। এক জন কৃষকের পুত্রকে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া মনস্তত্ত্বের জটিল মীমাংসা শিখাইলে কি হইবে? যে প্রকার শাসন সাধারণের উপযুক্ত নহে, তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রাজাকে জানাইতে হইবে যে, কি প্রকার শাসন কাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। যে ঔষধি সেবন করিলে যাতনা বৃদ্ধি হয়, পীড়া শান্তি করিবার জন্য তাহা সেবন করিয়া পীড়া বৃদ্ধি করিব কেন? বিদেশীয় রাজা চিরকাল বলে ও স্বেচ্ছাচারিতায় পরকীয় দেশ আপন কবলে রাখিয়া শাসন করিতে অক্ষম, ইহা সকল বিদেশীয় রাজনীতিজ্ঞ রাজপুরুষই অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন যাহারা পরকীয় দেশে বহুদিন আপন অধিকার রাখিতে বাসনা করে, তাহারা বিজীত জাতির ভয় অপেক্ষা ভক্তির অধিক প্রার্থী, সুতরাং শাসন সম্বন্ধে যে অত্যাচার ও অনিয়ম হয়, তাহা কেবল বিদেশীয় রাজার দেশীয় রীতি নীতি ও অবস্থার অজ্ঞানতা প্রযুক্তই বলিতে হইবে। এই অজ্ঞতা নিবারণ জন্য আমাদিগের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক এবং যাহাতে রাজপুরুষেরা দেশের অভাব সকল সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য আপনাদিগের শাসন আপনাদিগের হস্তেই রাখিবার উদ্দেশে এমন সকল উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা আমাদিগের নিজ নিজ প্রস্তাবিত নিয়ম সকল রাজনিয়ম বলিয়া পরিগণিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই রীতি যথাযথ প্রযুক্ত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন শিক্ষা এ দেশে এখন ও রাজনিয়মের অন্তর্ভূত না হওয়াতে তদ্বিষয়ে লোকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ আছে। তবে রুচি ভেদে যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের নিজেরই ভ্রম বলিতে হইবে, কেন না এমন কোন নিয়ম প্রচলিত নাই যে, আমাকে এই প্রকার শিক্ষাই লাভ করিতে হইবে, অন্য প্রকারে কোন অধিকার নাই। অধিকন্তু কেবল বিদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্টতা ও তাহাদিগের আচার পদ্ধতি ইত্যাদি জানিবার জন্য তাহাদিগের শিক্ষা প্রণালী অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাতে লভ্য ভিন্ন আমরা ক্ষতি দেখি না, কেন না জ্ঞান যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গলের বিষয়, বিশেষতঃ যে জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও সাংসারিক জীবনে নিত্য আবশ্যক।

কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি প্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধির ও দেশের ধন যাহাতে বিদেশে না গিয়া এই দেশেই ব্যয়িত হইতে পারে, তাহার সদুপায়ের উপর বিস্তর পরিমাণে জাতীয় উন্নতি

নির্ভর করে। কৃষি বাণিজ্য বৃদ্ধি করায় যে কি ফল, এবং বিদেশীয় সামগ্রীর আদর বৃদ্ধিতে যে দেশের কি অপকার, তাহা ভারতে এখন অল্প লোকেই বুঝিতে পারিয়াছে। অতি সামান্য সামান্য দ্রব্যের জন্যও ভারত পরাধীন। কিন্তু এ সকল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ভারতকে একেবারে স্বাধীন করিতে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ভারত এতদূর নিম্নে নামিয়া গিয়াছে যে, সংসারের সামান্য বিষয় শিক্ষার জন্যও তাহাকে জাহাজ ভাড়া করিয়া বিদেশে যাইতে হয়। ভারত যে কেবল রাজকীয় ক্ষমতাতে পরাধীন হইয়াছে, তাহা নহে, পরাধীনতা এক্ষণে এ দেশের অস্থি মজ্জার সহিত এক প্রকার মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অতএব যাহাতে রাজকীয় ক্ষমতা ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিতে না হয়, অগ্রে তাহারই একটা উপায় করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়।

সকল প্রকার কার্য্যের জন্যই চিন্তার, বাক্যের ও কার্য্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সামাজিক বিবর্ত্তনের সময় হইতে মনুষ্য যত দিন স্বতন্ত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, ততদিনই ক্রমে উন্নত হইয়াছে। কিন্তু যে দিন নিয়ম হইল যে, কৃষিকার্য্য হইতে বিরত হইয়া বৈশ্যতনয় বেদাধ্যয়ন করিতে পারিবে না, সেই দিন হইতেই উন্নতির পথ বদ্ধ হইয়া সমাজ স্থিতিশীল হইয়া পড়িল। স্থিতিশীলতার দোষ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, জাতিভেদ প্রথাটা কিঞ্চিৎ শিথিল করিলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে। তবে একেবারেই যে, আমরা সকলের সহিত আহার ব্যবহার করিতে বলিতেছি, তাহা নহে; কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, যে স্থলে এক্ষণে উন্নতির অন্তরায় দেখা যাইতেছে, সেই স্থলের অন্তরায় মোচন করিয়া উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিলাস পরিত্যাগ ও শারীরিক বল বৃদ্ধি করা পতিত জাতির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিলাসের সামগ্রীতে অনেকে অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু শিক্ষার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য দরিদ্রদিগের দুঃখনাশের জন্য এবং অপরাপর নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য তাহার শতাংশের এক অংশও ব্যয় করিতে কাতর হইয়া থাকেন। বিলাসের দিকে দৃষ্টি থাকিলেই যে শরীর দুর্ব্বল হইবে, এমন কোন কথা নাই, কিন্তু আমরা অতি অপকৃষ্ট বিলাসী, কেন না আমাদিগের স্বাস্থ্যের ও শারীরিক বল বৃদ্ধির দিকে কোন যত্ন নাই। শারীরিক বল নাই বলিয়া অনেক সময় অপমানিত হইয়াও অকাতরে সকল ক্লেশ সহ্য করি এবং অন্তরে অসুখী থাকিয়া পবিত্র বৃত্তি সকলকে দলিত করি। মান মর্য্যাদা রক্ষা ও বিপদে নিস্তার অনেক সময়ে কেবল শারীরিক বলের অভাবে আমাদিগের দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। এই বলে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে চাহে, তাহারা নিতান্ত অপরিণামদর্শী।

প্রত্যেক পতিত জাতিরই পুনরুত্থানের জন্য বিশেষ চেষ্টা থাকা কর্ত্তব্য। এই চেষ্টাকে সজীব রাখিবার জন্য জাতীয় পূর্ব্ব গৌরবের আলোচনার আবশ্যক। সর্ব্বদা জাতীয় গৌরবের আলোচনা হইলে লোকের মনে স্বতঃই তুলনার ভাব উদয় হইয়া পতিত অবস্থার উপর ঘৃণা জন্মে এবং উন্নত অবস্থ

প্রাপ্ত হইবার যত্ন বৃদ্ধি হয়। স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গীত সকল এ পক্ষে বিশেষ শুভদায়ক। মাধবাচার্য্য একাকী মহারাষ্ট্রীয় জাতির পূর্ব্ব গৌরব গান করিয়া যে উপকার করিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র রণনিপুণ যোদ্ধার দ্বারাও তাহা অসম্ভব! লোকের উচ্চ অভিলাষ না হইলে উচ্চ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না এবং সন্তরণ দ্বারা জলের উপর ভাসিতে চেষ্টা না করিলে সন্তরণকারী অতলজলে ডুবিয়া যায়। কিন্তু আলোচনা দূরে থাকুক, আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা কি ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় আমরা কতদূর অপকৃষ্ট, তাহা আমাদিগের জ্ঞান নাই। বিদেশীয়েরা আমাদিগের দেশের পূর্ব্ব সাহিত্য বিজ্ঞানাদি লইয়া জাতীয় ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেছে, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া আছি, ইহা সামান্য দুরবস্থার বিষয় নহে! প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের উন্নতির ইচ্ছা এখনও প্রকাশ পায় নাই, বীজ মধ্যেই নিহিত আছে বলিতে হইবে। কিন্তু ক্রমশঃ আলোচনার বৃদ্ধিতে যে আত্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল জাতিরই উত্থান ও পতন আছে—কে বলিতে পারে ভারত আর উঠিবে না, বা ইংলণ্ড এবং আমিরিকা কখনও পতিত হইবে না? যে নিয়মে একটী মনুষ্য দেহ রুগ্ন হইয়া কিছু দিনের জন্য নিস্তেজ হয় এবং আবার রোগ-বিমুক্ত হইয়া সচল হয়, সমাজ ও জাতির উত্থান ও পতন সম্বন্ধেও সেই নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। হতাশ হইলে চলিবে না, সকল কার্য্যই যত্ন সাপেক্ষ, সুতরাং যত্ন কর, সময় আসিবে। সময়কে আহ্বান কর, দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী নহে। ইতিহাস অনুসন্ধান কর, কালে অনেক পতিত জাতির পুনরুত্থান দেখিতে পাইবে—ভারত যে কখনই সুপ্তোত্থিত হইবে না, বিধাতার কি এমনই ইচ্ছা! ফুল ফুটিয়া পড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা হইতেই শতফুল উৎপাদনকারী বীজের জন্ম। ফুল হইতে ফল, ফল হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে আবার ফুল—সংসার চিরকাল এই নিয়মেই চলিতেছে, ভারতের পক্ষে অন্য নিয়ম হইবে কেন?

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

প্রকৃতি।

সৃষ্টির মধুরিমা দেখিয়া মানব মন চিরকালই বিমোহিত। দিগন্ত-প্রসারিত নীল চন্দ্রাতপতলে শারদীয় পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিতেছে, তাহারই ছবি বুকে ধরিয়া রজতরেখাবৎ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আপন উদ্দেশ্য পথে অবিরাম ছুটিতেছে; কোমল ব্রততী আশ্রয় বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া পৃথিবীকে প্রসূনোপহার দিবার জন্য বাতাসের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে; স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘ মালার নীচে সান্ধ্যরবি-কিরণ প্রতিফলিত পর্ব্বত শৃঙ্গ নীরবে তপস্বীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে—আরও কত কি, কে বলিতে পারে—দেখিয়া মানব মন গলিয়া পড়িল; বিস্ময় ও প্রীতিতে উছলিয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, আহা কি সুন্দর! মরি কি সুন্দর! আবার সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল, অপরিসীম শৃঙ্খলা ও অনন্ত জ্ঞান দেখিয়া মানব বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া গেল; আপনা ভুলিয়া তাহার তত্ত্বান্বেষণে তাহারই নিভৃত নিকেতনে নিমগ্ন হইল। এই বিস্ময়, এই সৌন্দর্য্য-পিপাসা, এই সৌন্দর্য্য তত্ত্বান্বেষণ লালসার ফলে কালিদাস ও সেক্ষপীয়র, ইস্কিলস্ ও পিত্রার্ক, গেটে ও সিলর। কিন্তু মানব মন চিরকালই ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না; কবির সম্বল বিস্ময় ও প্রীতি, ক্রমে দার্শনিকের সম্বল analysis ও decomposition (বিশ্লেষণ) এ পরিণত হইল। এই সৌন্দর্য্য, এই শৃঙ্খলা ও এই কৌশলের কারণও তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাই নানা মতের সৃষ্টি হইল। যিনি সৃষ্টি-কারণকে যে প্রকারে দেখিলেন, যে প্রকারে বুঝিলেন, তাহাই ক্রমে বিধিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তাহারই ফলে কপিলের প্রকৃতিবাদ ও আধুনিক ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ। ক্রমে অন্যান্য মতও প্রবর্ত্তিত হইল এবং মতভেদও আসিয়া পড়িল। এই সমস্ত মতভেদই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়; তাহাই আমরা আজ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা প্রথমতঃ অস্মদ্দেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক দলের অধিনায়ক স্বরূপ দুইজনের মত ব্যাখ্যা করিয়া পরে ইউরোপীয় নাস্তিকদল হইতে কপিলদেবকে এবং আস্তিক দল হইতে শঙ্করাচার্য্যকে বাছিয়া লইলাম।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা—"ইহাই কপিলের প্রকৃতির সংজ্ঞা—অর্থাৎ এই ত্রিগুণ সম্মিলিত অথবা অবয়বযুক্ত কোন অবিনশ্বর পদার্থের নামই প্রকৃতি*। কপিলের মতে প্রকৃতি চির নিত্য, ব্যাপক, পরিণামশীলা সূক্ষ্ম ও জড়া। কপিল বলেন, যেমন সূক্ষ্মতম বীজ হইতে কালে ফল পত্রাদি সুশোভিত বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি এই প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বিশ্বব্যাপারের জনন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কপিল সেই জন্যই প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় কালে ইহাকে সূক্ষ্ম কহিয়াছেন; সূক্ষ্ম শব্দে তিনি এই বুঝেন যে, যদিও প্রকৃতি পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন নহে, তাই বলিয়া ইহা যে ইন্দ্রিয়-গোচর, তাহাও নহে। ইহা যদিও পরমাণু হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন, তথাপি ইন্দ্রিয়-গোচর হইবার উপযুক্ত আয়তন-বিশিষ্ট নহে; তিনি ইহাকে মানবের চেতন স্বভাব ও কাষ্ঠলোষ্ট্রের জড় স্বভাবের মধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। তিনি যেমন একপক্ষে ইহাকে আত্ম-চৈতন্যের (self-consciousness) বিপরীত বলিতেছেন, তেমনি আবার অন্য পক্ষে ইহাকে জড় পদার্থ হইতেও বিভিন্ন বলিতেছেন। প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার আত্মা ভিন্ন "আব্রহ্মস্তম্ব" পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকেই প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই জগৎনির্ম্মাতা ভৌতিক শক্তি নিচয় পূর্ব্বে কোন সময়ে অতি সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ছিল; ক্রমে সেই শক্তি গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এবং তজ্জন্যই এই প্রকৃতির বিকৃতাবস্থা হইয়া এই বিশ্বব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রকৃতি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাতা ভৌতিক শক্তিপুঞ্জের আধারভূত কোন পদার্থ হইল, তাহা হইলে ইহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? মানব যেমন বস্তু-নিরপেক্ষ অথবা স্বাবলম্বন গতি (apart from any object) অর্থাৎ আধার শূন্য নিরবচ্ছিন্ন

*ইংরাজিতে something যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, "পদার্থ" শব্দও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইল।

নিত্যগতি অনুমান করিতে পারে না, তেমনি আধারশূন্য শক্তিপুঞ্জেরও অস্তিত্ব অনুমান ও উপলব্ধি করিতে অক্ষম। ঐ সমস্ত বিষয়ের অনুমান করিতে হইলে, অগ্রে আমরা তদাধার বস্তু সমূহের স্থিতি-স্থান পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করি এবং তৎপরে শক্তি ও গতি ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়ের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত তত্তদাধার স্থূল বস্তু হইতে করিয়া লই। যদি তাহাই হইল, তবে আমাদিগের পণ্ডিতেরা যাহাকে প্রকৃতি বলিয়াছেন, তদাখ্যাত কোন পদার্থের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? তবে কি প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই অথবা জগৎ নির্ম্মাণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতির অস্তিত্ব কি এখন নাই? সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি নিত্য অর্থাৎ আদিতেও ছিল, এখনও আছে, ও পরেও থাকিবে। জগৎ নির্ম্মায়ক শক্তিপুঞ্জের আধারভূত এই প্রকৃতি যে বাস্তবিক আমাদিগের অজ্ঞানগোচর, তাহা নহে, তবে তাহা যে আপাতত সাংসারী আত্মার জ্ঞানগোচর বা জ্ঞানায়ত্ব হইতেছে না, তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতি এক্ষণে রূপান্তর ধারণ করিয়া অবস্থান্তরে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রকৃতির এক্ষণে আর যথাস্বরূপ পূর্ব্বাবস্থা নাই, এক্ষণে তাঁহার জগদবস্থা; পূর্ব্বে যাহা কারণ ছিল এক্ষণে তাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আমরা প্রকৃতি বা জগতের মৌলিক অবস্থা বা আদি কারণকে এক্ষণে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ না করিয়া তন্নিমিত্ত তৎপূর্ব্বাধেয় শক্তিপুঞ্জ সমুদ্ভূত কার্য্যরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই জড় জগতে এ প্রকার দৃষ্টি হইয়া থাকে যে,কোন পদার্থ অবস্থাভেদে পদার্থান্তরের ধর্ম্ম, গুণ বা সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। যেমন জল অতি শৈত্যে জমিয়া বরফ হয়, আবার অতিশয় উত্তাপে বাষ্পরূপে পরিণত হয়, কিন্তু মূলত দুই পদার্থ এক, যদিও দৃশ্যত ও নামত ইহারা বিভিন্ন পদার্থ। সেই প্রকার সাংখ্যকার বলেন যে, প্রকৃতি ও এই বিশ্বজগৎ মূলত একই পদার্থ, তবে একটী অন্যটীর মৌলিক অবিকাশ বা অব্যক্তাবস্থা, অন্যটী অর্থাৎ জগৎ অপরটীর কার্য্য, বিকার বা ব্যক্তাবস্থা।

অতএব সাংখ্যের মতে প্রকৃতি কি তাহা বুঝিতে হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা এই জগতের বীজ বা মূল, তাহাই প্রকৃতি এবং যাহা তাহার বিকার বা ব্যক্তাবস্থা তাহাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। পাঠক দেখিতেছেন যে,সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের প্রকৃতি যে স্থান অধিকার করিয়াছে, ন্যায়ের পরমাণুও সেই স্থান অধিকার করিতেছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে উভয়েরই কার্য্যকারিতা প্রায় সমান। সে যাহাই হউক, নিরীশ্বরবাদী কপিল জগতের বীজ বা মূল বলিলে আস্তিকের ঈশ্বর বুঝেন না; তাঁহার প্রকৃতি যে আস্তিকপ্রোক্ত ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, তাঁহার "ঈশ্বরাসিদ্ধে" বচনটীই তাহার প্রমাণ।

এক্ষণে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মত পঞ্চদশী নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া নিম্নে অবতারণা করা যাইতেছে,

—অবিক্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা
মায়ান্তপ্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং

(ব্রহ্মানন্দে ১৩ পরিচ্ছেদ ৩৩ শ্লোক) অর্থাৎ বিকার রহিত আর ব্রহ্মেতে বর্ত্তমান সেই মায়া শক্তি নানা প্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রকৃতি বলা যায় এবং তদ্বিশিষ্ট পরব্রহ্মকে মায়ী বলা যায় (১)

(১) আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কৃত অনুবাদ (২) ঐ

চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা
তমোরজঃ সত্ত্বগুণাপ্রকৃতি দ্বিবিধাচ সা

(তত্ত্ববিবেক ১৪ শ্লোক) অর্থাৎ চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সূক্ষ্ম অবস্থাকে প্রকৃতি বলা যায়, সেই প্রকৃতি দুই প্রকার হয়,মায়া,ও অবিদ্যা।(২) তবে এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, সেশ্বরবাদী ভগবান শঙ্করাচার্য্য ও নিরীশ্বরবাদী ভগবান কপিল উভয়েই প্রকৃতির সংজ্ঞা প্রদান সম্বন্ধে ঐক্য মতাবলম্বন করিয়াছেন,কপিল যাহাকে জগতের অব্যক্ত বা কারণাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,শঙ্কর তাহাকেই সূক্ষ্ম করিয়াছেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এমনই একটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যে কপিল দেব তাহা প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট ইত্যাদি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আস্তিক মাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এই প্রকৃতি পরমাত্মা স্বরূপ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির অস্ফুট প্রতিবিম্ব দ্বারা প্রতিফলিত ও অস্ফুট আভাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। ভগবান শঙ্করও তাহাই করিয়াছেন, নাস্তিক কপিল দেব ত অবশ্যই ইহা অস্বীকার করিবেন। এই কথাই শঙ্করাচার্য্য অন্য এক স্থানে বিশেষ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার প্রকৃতির প্রথম প্রকারে অর্থাৎ মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনি সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়েন, এবং উক্ত অবিদ্যাতে চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীব শব্দে কথিত হয়। (৩) এস্থলে কপিলেতে ও শঙ্করেতে মহৎ প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে; কপিল প্রকৃতিকে জড়া বলিতেছেন, শঙ্কর প্রকৃতিকে চৈতন্যময় বলিতেছেন। এক জন প্রকৃতিতে চৈতন্যের কিছুমাত্র আভাস পাইতেছেন না; অপর জন প্রকৃতির ভিতরে অনন্ত চৈতন্যের প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দেখিতে পাইতেছেন। তবে এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির মূল সংজ্ঞা প্রদান কালে উভয়েই প্রায় এক প্রকার সংজ্ঞা দিয়াছেন, তবে দুটী কথা লইয়াই যত গোলযোগ যথা—পরব্রহ্ম প্রতিবিম্ব ইহা ব্যতীত প্রায় সবই এক প্রকার।

পাশ্চাত্য প্রকৃতিবাদী পণ্ডিতেরা প্রকৃতি অন্য এক প্রকারে বুঝেন। প্রথমতঃই প্রকৃতি কি তাহা তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন না, অগ্রে কোন পদার্থ বিশেষের প্রকৃতি কি তাহাই বুঝেন, যেমন জলের প্রকৃতি কি, অগ্নির প্রকৃতি কি ইত্যাদি। মনে করুন,শেষোক্ত পদার্থটীর প্রকৃতি কি—না—দাহিকা শক্তি; জলের প্রকৃতি কি—না শৈত্য শক্তি। অগ্নির প্রকৃতি দাহিকা শক্তি বলিলে এই বুঝি যে, যে নিয়মে বা যে প্রকারে অগ্নি তৎসংলগ্ন কোন পদার্থের উপর কার্য্যকরে এবং যে নিয়মে বা যে প্রকারে অগ্নিসংলগ্ন পদার্থ অগ্নির উপর কার্য্য করে—অর্থাৎ অগ্নির গুণ বা শক্তি নিচয়ের সমষ্টি মাত্র; জলের প্রকৃতি বলিলেও ঠিক ঐ প্রকারে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন চেতন পদার্থের (Sentient being) প্রকৃতি বলিলে কি বুঝ? ইহার উত্তরও ঠিক ঐ প্রকারে করিতে হইবে, ইতি পূর্ব্বে কোন পদার্থ বিশেষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল, তাহা এবং ঐ চেতন পদার্থের ভাব গ্রহণ সামর্থ অথবা চৈতন্যশক্তি দ্বারা কোন বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তি বা উপলব্ধি করণের ক্ষমতা,

(৩) বিদ্যাবাগীশ কৃত অনুবাদ।

এই বুঝিতে হইবে। তবে কোন পদার্থ বিশেষের প্রকৃতি বলিলে সংক্ষেপতঃ আমাদের এই উপলব্ধি হয় যে, উক্ত পদার্থের ব্যাপারাবলি বা পরম্পরা প্রদর্শন করিবার সম্যক ক্ষমতা বা শক্তি *। কোন সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক নিয়ম, কার্য্য বা সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অগ্রে তত্তজাতীয় ঐকদেশিক কোন নিয়ম, কার্য্য বা সত্য হইতে বুঝিতে হইবে, যথা—মানব মাত্রেই চিন্তাশীল জীব, এই সত্যটী হঠাৎ কাহারও উপলব্ধি হয় না। প্রথমতঃ আমাদিগের চতুপার্শ্বস্থ বন্ধুবর্গের মধ্যে দেখিলাম যে, কতকগুলি লোক—রাম, শ্যাম, হরি ইত্যাদি—চিন্তাশীল; ক্রমে আমাদিগের জ্ঞানের সীমা ও বৃত্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আজ দুই জন, কাল পাঁচ জন, পরশ্ব দশ জন, দেখিলাম সকলেই চিন্তাশীল, অবশেষে এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইলাম যে, মানব চিন্তাশীল জীব। এই প্রকার পর্য্যবেক্ষণলব্ধ (gained by observation) জ্ঞানকে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করাইলে ক্রমে তাহাদের পরিধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং তল্লব্ধ জ্ঞান সমূহের মধ্যে সামান্য প্রত্যক্ষ (generalisation) করিয়া কোন সাধারণ সত্যে আসিয়া উপনীত হই। জগতের চিরস্মরণীয় মহাত্মারাও এই পদবীর অনুসরণে বহুমূল্য সত্য সমস্ত আবিষ্কার করিয়া জগৎকে অজ্ঞানের তমোময়ী অন্ধকার রাশি হইতে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। নিউটন কিছু প্রথমতঃ মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের সার্ব্বভৌমিকতা জানিতেন না; বৃক্ষ হইতে আতাটী ভূমিতে পড়িল অমনি নিউটনের মনে সন্দেহ হইল, তিনি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তল্লব্ধ জ্ঞানের সীমা ভূয়োদর্শনের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত এবং বর্দ্ধিত হইলে তাহাদিগের গুণ সমূহের সামান্য প্রত্যক্ষ করিয়া অবশেষে মাধ্যাকর্ষণের সার্ব্বভৌমিক সত্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। আমরাও প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি, প্রথমতঃ কোন পদার্থ বিশেষের প্রকৃতি বলিলে কি বুঝা যায়,তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে প্রকৃতি কি, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন পদার্থ বিশেষের প্রকৃতি বলিলে যেমন তাহার গুণ ও শক্তি নিচয়ের সমষ্টি বুঝায়, সেই প্রকার প্রকৃতি বলিলে যাবতীয় পদার্থ নিচয়ের গুণ এবং শক্তি সমষ্টি বুঝায়। প্রকৃতি বলিলে আমরা যে কেবল কার্য্যপরম্পরায় সমষ্টি মাত্র বুঝি, তাহা নহে, তদুৎপাদক কারণ সমূহও বুঝি; যে কার্য্য বা ব্যাপারাবলি ঘটিয়াছে, কেবল তাহাই নহে, পরন্তু ভৌতিক শক্তিপুঞ্জের ক্রমিক বা সম্পূর্ণ বিকাশ হেতুক অথবা কোন কারণ সাপেক্ষে বা ভেদে সেই শক্তিগুলি অবস্থান্তরে পরিণীত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য পরম্পরা বা ঘটনাবলির উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ যাহা ঘটিয়াছে তাহাও যতদূর প্রকৃতি শব্দের ভাবান্তর্গত, যাহা ঘটিতে পারে এবং কার্য্যের সমবায়ী কারণ পরম্পরায় অব্যবহৃত শক্তি বা ক্ষমতাও ততদূর অন্তর্গত।

এতদ্ভিন্ন প্রকৃতি অন্য একটী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যে সমস্ত কার্য্যপরম্পরা ঘটিতেছে তাহা নহে, যাহা মানবের ইচ্ছা ব্যতীত—মানব তাহা ইচ্ছা করুক আর নাই করুক—ঘটিয়া থাকে। তবে দেখা

*Its entire capacity of exhibiting phenomena. J. S. Mill.

যাইতেছে যে, প্রকৃতি শব্দ প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—প্রথমতঃ যাবতীয় পদার্থের গুণ বা শক্তি সমূহের সমষ্টি মাত্র, দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় পদার্থ মানবীয় মধ্যস্থত্ব অথবা হস্তক্ষেপ ব্যতীত যে অবস্থান্তরে পরিণত হইবে, তাহাও বুঝায়। কিন্তু এই দুইটীতেই যে ইহার বহুকাল হইতে ব্যবহৃত অর্থ সমস্ত পর্য্যবসিত হইয়া গেল, এমন নহে। নৈতিক শাস্ত্র সমূহে ইহা অন্য এক প্রকার একটী অর্থে প্রযুক্ত, দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কার্য্য প্রকৃতিসিদ্ধ বা প্রাকৃতিক বলিলে সে কার্য্যের যত প্রকার দোষই কেন থাকুক না, তৎসমস্তই ক্ষালিত হইয়া গেল। লোকে সেই কার্য্যের অন্তস্থলে ডুবিয়া তাহার যুক্তিযুক্ততা বা সারবত্তা দেখে না।

নৈতিক শাস্ত্রে প্রকৃতি যাহা বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদায়ের সমষ্টির নাম মাত্র বুঝায় না, তাহাতে যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা কি হওয়া উচিত, তাহাই শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের বাহ্য জগতের কার্য্য প্রণালীর শিক্ষাগুরু। সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির অনুসরণে কার্য্য করিতে যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতে প্রকৃতি আমাদের কর্ত্তব্যের তমোময় পথে একমাত্র আলোকবর্ত্তিকা। আমরা যাহা করিব এবং যাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য, তৎসমুদয়ের বাহ্য লক্ষণ শিক্ষণে বা তদুপদেশ লাভ পক্ষে প্রকৃতিই এক মাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক যে, এই মতটী কতদূর সত্য। প্রকৃতির অনুসরণই আমাদিগের ধর্ম্ম, আর তাহা হইতে উন্মার্গগামী হওয়ার নামই অধর্ম্ম, কর্ত্তব্যের কঠোর মার্গে প্রকৃতিই আমাদিগের নেতা এবং যে স্থলে মানব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেবল স্বাবলম্বনে কার্য্য করে, সে স্থলে প্রায়ই তাঁহার জীবন-নদ সন্দেহে দোলায়মান হইতে হইতে একেবারে পঙ্কিল ও পূতিগন্ধময় ভীষণ অকর্ত্তব্যের হ্রদে গিয়া পতিত হয়; এক্ষণে এই মতের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। যখন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন হয়, তখন প্রকৃতি শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরা পূর্ব্বে প্রকৃতির যে দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার কোন অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে? মনে কর যে, ইহা আমাদের প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ নিচয় ও তাহাদের ধর্ম্ম এবং শক্তি। যদি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির অনুসরণ মানবের ধর্ম্ম, এইরূপ কথা নিতান্ত অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। যখন প্রকৃতি অন্ধশক্তি সমূহের সমষ্টি মাত্র এবং মানবের ইচ্ছাশক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তখন প্রকৃতির অনুসরণ ভিন্ন মানবের আর কোন উপায় নাই। মানব তাহার নিয়মে আবদ্ধ ও তদ্বারা পরিচালিত না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। একটা উদাহরণ লইয়া ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা যাউক,—সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নিজ অর্কে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে উপগৈরিক নেদিষ্ট পদে (Perihelion distance or the Earth's nearest distance to the Sun) উপস্থিত হয়, তখন যদি কেহ তদ্বিপরীত ইচ্ছা করিয়া তাঁহার শক্তি, বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা হইবে? প্রাবৃট-সম্ভূত নিবিড় জলদ জাল যখন গগন মণ্ডলকে সম্যক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন কি কেহ, সহস্র তাঁহার বিদ্যা থাকুক,সহস্র তাঁহার বুদ্ধি থাকুক,সহস্র

তাঁহার ক্ষমতা ও কৌশল থাকুক—তৎক্ষণাৎ শরতের পৌর্ণমাসী চন্দ্র-কৌমুদীতে জগৎ-সংসারকে ধৌত করিতে পারেন? কখনই নহে। তবে এইত গেল বাহ্য জগতের উপর মানবের কর্ত্তৃত্ব। এক্ষণে দেখা যাউক, মানব বাহ্য পদার্থ সংলগ্ন স্বদেহের উপর কতদূর ক্ষমতা প্রকাশে সক্ষম। মনে কর, একটী সুন্দর গোলাপ ফুল উদ্যান আলো করিয়া ফুটিয়া আছে; সুমন্দ পবনের হিল্লোল ভরে নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিক নিজ সৌরভে আমোদিত করিতেছে, ফুলটী হাতে করিয়া লইয়া বেড়াও, কত পরিতুষ্ট হইবে, কত আরাম, কত আমোদ পাইবে। কিন্তু আবার সেই গোলাপ ফুলের মত রক্তাভ একখণ্ড অগ্নি হাতে কর দেখি, দেখ কি হয়, তোমার হাত পুড়িয়া যাইবে। তোমার হস্ত সমন্বয়কারী পরমাণুপুঞ্জের সহিত আর ঐ রক্তাভ অগ্নি-খণ্ডের সহিত যে দাহ্য দাহকত্ব সম্বন্ধ আছে, যে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে এই দুই পরমাণু-পুঞ্জ অন্যোন্য সমন্বিত বস্তুত্ব (Objective phenomenon) প্রদর্শিত করিতে সমর্থ হইতেছে, কেহ কি তাহার অন্যথা করিতে পারেন? তবে দেখা যাইতেছে যে, মানবের সহস্র ইচ্ছাই থাকুক, আর সহস্র শক্তিই থাকুক, যে নিয়ম বলে এই অন্ধ শক্তি পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইতে এক পদও বিপথগামী হওয়া মানবের সাধ্যাতীত; সুতরাং প্রকৃতির অনুসরণ কর, না করিলে অধর্ম্ম হইবে, এই প্রকার উপদেশ অর্থশূন্য হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদিগের প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থে এই মত কতদূর প্রযোজিত হইতে পারে। প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থ এই—মানবের মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ যে অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। ইহা অতি স্পষ্টতঃই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ, যেমন আমাদের প্রথম অর্থানুসারে প্রাকৃতিক নিয়মে কার্য্য করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, তেমনি আমাদের দ্বিতীয় অর্থ-বোধ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি সাধনই আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি প্রকৃতি মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ সুখকর হইবে, যদি মানবের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত প্রকৃতির সৌহৃদ্য থাকিবে, তাহা হইলে শিল্পের উৎপত্তি কখনই হইত না এবং মানবের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া যে দিন হইতে নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে দিন হইতে মানবের মনে প্রাথমিক পশুভাব বিদূরিত করিবার ইচ্ছার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মানব প্রকৃতির জড় শক্তির উপর নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছে, সেই দিন হইতেই শিল্পের জন্ম আরম্ভ হইয়াছে। লোকে নিরন্তরই প্রকৃতির সহিত বিবাদ করিতেছে। ওলন্দাজদিগের সমুদ্রের বাঁধ (Embankment) সম্পূর্ণ প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থবোধ্যভাবের বিরুদ্ধ ও বিপরীত, সুতরাং ঐ বাঁধ নির্ম্মাণ করাই তবে হলণ্ডবাসীদিগের অত্যন্ত অধর্ম্ম হইয়াছে। আমাদিগের কৃষিকার্য্য দ্বারা অর্থাৎ শৈল্পিক উপায় দ্বারা শস্য উৎপাদন করাও তবে নিতান্ত অন্যায় হইয়া পড়ে। শীতাতপ নিবারণের জন্য মানবের গৃহাদি নির্ম্মাণও অন্যায় হইয়া পড়ে। এইরূপে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায় যে, মানব প্রত্যেক কার্য্যেই আমাদিগের প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থের বিপরীত কার্য্য করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেকন এক স্থলে কহিয়াছেন যে, আমরা এই প্রকারে প্রকৃতির

আজ্ঞাবহ হইব, যেন তদ্বারা আমাদিগের আজ্ঞাপালন করাইয়া লইতে পারি*। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেই দেখা যাইতেছে যে, মানব আমাদিগের প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থের অনুসরণ করা দূরে থাকুক, নিরন্তর তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া আসিতেছে; আর যদি মানব জাতি এতকাল প্রকৃতির অনুসরণে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে মানবজাতিকে বোধ হয় ইহার অনেক পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত। তবে এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রকৃতির অনুসরণ করা ধর্ম্ম, আর না করা অধর্ম্ম, এইমত আমাদের প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োজিত হইলেও নিতান্ত অযৌক্তিক ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

তৎপরে মিল ইহা হইতে এনেক প্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে তাহার অবতারণা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। এক্ষণে আমরা কপিল এবং মিলের মতের কিঞ্চিৎ সমালোচনার পরে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

কপিল প্রকৃতিকে জড়াশক্তি বলিতেছেন এবং পুরুষকে জ্ঞানময়ী চেতনাশক্তি বলিতেছেন। পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে হীনবল, তাহা যদিও কপিল স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার লিখন ভঙ্গী দ্বারা উহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। পুরুষের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ মুক্তি; প্রকৃতির উদ্দেশ্য মায়া মোহে আচ্ছন্ন করিয়া পুরুষকে স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে বিস্মৃত করিয়া তদ্বারা এই জগৎ-কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত করা। পুরুষের উদ্দেশ্য প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা, প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধীন করা*। এই মুক্তিলাভের জন্য পুরুষ স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে অক্ষম; তাই পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করে। তবে যে পর হস্ত মুক্ত হইতে স্বতঃই অক্ষম হইয়া অপেক্ষা করে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের—তত্ত্বজ্ঞান যাহাই হউক না কেন—অপেক্ষা করে, এবং যে নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পরমুখাপেক্ষী সে নিশ্চয়ই যে হীনবল, তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে। কপিল ইহাও আবার স্বীকার করেন যে, এই পুরুষ প্রকৃতির যোগে জগৎ-কার্য্য সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ভাবে চলিতেছে। তবে এক্ষণে দেখ যে, এই হীনবল পুরুষ তদপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্না প্রকৃতিকে কি প্রকারে নিয়মিত করিতেছে এবং কি প্রকারেই বা তাহার দ্বারা এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সম্পূর্ণ শৃঙ্খল ভাবে চালাইয়া লইতেছে? তর্কের খাতিরে সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে অস্বীকার করিলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, কেন না হীনবল শক্তি তদপেক্ষা অধিকতর বল সম্পন্ন শক্তিকে এ প্রকারে স্বায়ত্ব করিতে পারে না যে, তাহার দ্বারা সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করাইয়া লইতে পারে। যদি পুরুষ ও প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও গতি এক দিকে হইত, তাহা হইলে সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিবার কোন প্রকার বাধা থাকিত না, কিন্তু যখন উভয়ের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং গতিও সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তখন কেমন করিয়া এই পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে পরিচালিত এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে? তবে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই পুরুষ

* "To obey nature so as to command her"—Bacon.

* উদ্দেশ্য বলিলে পাঠক যেন ইহা না বুঝেন যে, প্রকৃতির কোন প্রকার জ্ঞান দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ও প্রকৃতির অন্তরালে এমন এক প্রকাণ্ড শক্তি আছে, যাহা এই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া জগৎকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতেছে। তবে এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কপিল নিজের যুক্তি দ্বারাই নিজে মারা পড়িতেছেন, তাঁহার "ঈশ্বরাসিদ্ধে" বলিবার কোন অধিকার নাই।

এক্ষণে মিল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহা পক্ষান্তরে প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়, তৎসমস্তই এক মহাশক্তির কার্য্য এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে যে সমস্ত শক্তি দেখিতে পাই, তৎসমস্তই এক প্রকাণ্ড শক্তির স্থল ভেদে ভিন্ন২ বিকাশমাত্র।(Different manifestations of the same force)বিজ্ঞান যতই উন্নত হইতেছে, ততই এই সত্য দৃঢ়ীকৃত হইতেছে যে, এই জগতে শক্তি এক বই দুই নহে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বা প্রকৃতি সেই মহাশক্তির ক্রিয়া, কার্য্য বা রূপান্তর মাত্র। এই শক্তি যে জ্ঞানময়ী, অথবা এই শক্তির কার্য্যে যে জ্ঞানের বহুল আভাস পাওয়া যায়, তাহা মিল তাঁহার (Theism) নামক প্রবন্ধে স্বয়ংই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।(১)এই মহাশক্তির কার্য্য দেখিয়া পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার বর্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)অবাক হইয়া গিয়াছেন, এবং তিনি ইহাকে (inscrutable mysterious force) নামে অভিহিত করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলে ইহা অতি স্পষ্টতঃই দেখা যাইবে যে, এই শক্তি মঙ্গলময়ী; নিরন্তরই মানবের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছে; যেখানে ভাঙ্গিতেছে, সেখানে গড়িবার জন্য, যেখানে নষ্ট করিতেছে, সেখানে পুনর্জন্মের জন্য, এবং যেখানে সামঞ্জস্য ও সাম্য ভাঙ্গিতেছে,সেখানে সামঞ্জস্য ও সাম্য বিধান করিবার জন্য। মার্কিন পণ্ডিত ইমারসনের একটী কথা এস্থলে অতি সুন্দর রূপে প্রযুজ্য হইতে পারে (Death is not only a transformation but a transfiguration) এই মহাশক্তির এই মঙ্গলময় ভাবের ব্যতিক্রম স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইলেও ইহাকে অমঙ্গলময়ী বলা যেমন যুক্তি সঙ্গত,তেমনি হস্তের বেদনা হয় বলিয়া হস্তই অমঙ্গলময় একথা বলাও তেমনি যুক্তিসঙ্গত। যাহাই হউক, এই মহাশক্তি যে অধিকাংশ স্থলেই আমাদের মঙ্গলের জন্যই কার্য্য করিতেছে,তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে দেখ, প্রকৃতি যদি এই প্রকাণ্ড জ্ঞানময়ী ও মঙ্গলময়ী মহাশক্তির ক্রিয়া, কার্য্য বা রূপান্তর মাত্র হইল, তাহা হইলে এই কল্যাণ-বিধাত্রী শক্তির রূপান্তরের আনুগত্য স্বীকার করাও এক প্রকারে সেই মহাশক্তির আনুগত্য স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে প্রকৃতির অর্থাৎ এই মঙ্গলময়ী মহাশক্তির রূপান্তরের আনুগত্য স্বীকার করা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ মঙ্গলময় ও শুভকৃৎ ব্যক্তির বশতাপন্ন হওয়া মানবের ধর্ম্ম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই মঙ্গলময়ী মহাশক্তির রূপান্তরাবস্থা দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং তাহারই অনুসরণ করা মানবের পক্ষে অযৌক্তিক নহে, অস্বাভাবিকও নহে, এবং অধর্ম্মও নহে।

বাস্তবিক একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে স্পষ্টতই দেখা যাইবে যে, এই প্রকৃতির অন্তরালে এক প্রকাণ্ড মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে। এই প্রকৃতি তাহার জীবন্ত

(১) এস্থলে "জ্ঞান" adaptation of means to ends অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে disign argument বলে, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইল।

বহির্বসন মাত্র *। মানবের মস্তক স্বতঃই তাহার নিকট নত হইয়া পড়িল, প্রকৃতির মধ্য দিয়া এবং প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া মানব তাহারই উপাসনায় নিরত হইল, তাই মানব চিরকালই প্রকৃতির উপাসক। সৃষ্টির প্রাথমিক কোমল অবস্থা হইতে বর্ত্তমান শতাব্দির কঠোর বৈজ্ঞানিক সময় পর্য্যন্ত; বহু কবি, বহু দার্শনিক প্রকৃতিকে আনন্দ ও ভক্তির অঞ্জলি ও বিস্ময় ও প্রীতির উপহার প্রদান করিয়া আসিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে অবর্ণনীয়, অব্যক্ত ও মধুর এরূপ কোন প্রকার ভাব গূঢ় নিহিত রহিয়াছে, যে ভাবে বিভোর হইয়া ভারতের কবিকুল পিক কালিদাস তাঁহার জগতে অতুল কাব্যনিচয়ের প্রাণস্পর্শী অংশ সমূহ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যে মায়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কবি কাউপার বারন্‌স্ টম্‌সন্ প্রভৃতি সুধাময় সঙ্গীত স্বর লহরী ছড়াইয়া ইংলণ্ডের কঠোর প্রাণকেও মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং যে প্রাণমদ সুরাপানে বিহ্বল হইয়া কবি আপনা ভুলিয়া মর্ত্ত্য মানব ধাম ভুলিয়া অতি গভীর কমনীয় গাঁথায় গাইলেন;—

"To me the meanest flower that blows can give thoughts that lie too deep for tears."

শ্রীজ্ঞানদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

* The "living garment of God." Sartor Resartos.

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের একটী শিক্ষা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুদূর পশ্চিমে ফরাসী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবে যে তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল,তাহার বিবরণ শুনিতে কাহার না কৌতুহল জন্মে? সমগ্র ফরাসিদেশ-ব্যাপিয়া স্বাধীনতার যে বিজয় দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল, দাসত্ব-বিদ্বেষী সমস্ত নরনারী সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ধনী দরিদ্রের যে অপূর্ব্ব মিলন সংগঠিত করিয়াছিল, তাহার তুলনা এ পৃথিবীতে কোথায়? অধর্ম্ম যদি হিমাচল শিখরস্থিতও হয়, তথাপি বিচূর্ণিত হইবে, ধূলির সহিত মিশাইয়া যাইবে, জগতে অসত্য যাহা তাহার স্থান নাই, এ রাজ্যে যিনি বিধির নিয়মের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী হন, তাঁহার কদাপি নিস্তার নাই। মনুষ্য, তুমি যদি অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক, রাজাধিরাজ মহারাজ হইলেও তোমার পাপ-ভারাক্রান্ত মস্তক পথের ভিখারীর চরণ তলে বিলুণ্ঠিত হইবে, ন্যায়ের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের যে এ বিশ্বরাজ্যে কখন ব্যভিচার হইতে পারে না, ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবে এই চিরন্তন সত্য সমূহ জ্বলন্ত ভাবে বিভাষিত হইয়াছিল। মনুষ্য সমাজের গতি ও উন্নতি স্বাধীনতার দিকে, যে ব্যক্তি তাহার বিরোধী হইবে, মনুষ্য সমাজ তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেই। উপযুক্ত সময়ে যখন মনুষ্য সমাজের স্বাধীনতাস্রোত বেগবতী নদীর ন্যায় বহিতে থাকে, তখন কেহ তাহার প্রতিরোধ করিলে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়; পর্ব্বত সম্মুখে পড়িলে পর্ব্বত ভেদ করিয়া সাম্য-সাগরাভিমুখে বেগে প্রধাবিত হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইংলণ্ড, আমে-

রিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশ সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মনুষ্য কখনও অপর মনুষ্যের দাস হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ইতিহাস কত কত ঘটনাবলী দ্বারা শত রসনায় তাহা প্রচার করিতেছে। মনুষ্য মাত্রেই মূলে সমান। রাজা প্রজা সকলেই মূলে সমান। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, মনুষ্যগণ মধ্যে বৈষম্য যত, সাম্য তদপেক্ষা অধিক। এক দিকে মহা রাজাধিরাজ, অপর দিকে দীন দুঃখী ভিখারী, দুইয়ের তুলনা করিলে দেখা যায়, বাহিরে যত বৈষম্য থাকুক, মূলে তাহারা সমান। রাজাই কি, ভিখারীই কি, মনুষ্য মাত্রেই—যাহার জন্য এই সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্য নামের এত গৌরব—সকলেই সদসদ্ বিবেচনাত্মক ধর্ম্মবুদ্ধির অধিকারী, সকলেই অনন্ত উন্নতির ক্ষমতাধারী। এমন মনুষ্য কে আছেন, যিনি বক্ষস্থলে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিতে পারেন, "আমি অমুক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"! তুমি কি বলিতে পার, ঐ যে ছিন্ন বস্ত্র-পরিহিত ভৃত্য তোমার পদ প্রক্ষালন করিতেছে, ঐ ব্যক্তি নৈতিক বলে, অথবা মানসিক তেজে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? কোন ব্যক্তিই, অমুক অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না। বৈষম্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, রামের যে যে গুণ আছে, শ্যামের তাহা নাই, অপর দিকে শ্যামের যে যে গুণ আছে, রামের তাহা নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, তাহার হয়ত সামান্য বিষয়িণী বুদ্ধির অভাব, আবার যাহার এইরূপ বুদ্ধি আছে, সে হয়ত লিখন পঠনাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে কে বলিবে, ইনি অমুক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? মূলে সকলেই সমান। এই মৌলিক সাম্য সূত্রের প্রমাণ স্বরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ যে অশ্বশালায় মাতৃগর্ভ হইতে পতিত শিশু যীশুখ্রীষ্ট, উনি কি রোম সম্রাট অগষ্টস্ সীজর হইতে ন্যূন? সেই যে ওহাইও প্রদেশের সূত্রধর বালক জেমস্ গারফিল্ড, যিনি আপনার বুদ্ধিবলে ও কার্য্যগুণে এই পৃথিবীর সভ্যতম ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রেসিডেণ্ট পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, কি রুষিয়ার সম্রাট শ্রেষ্ঠ? কর্সিকা দ্বীপান্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী এজেকসিও নগরের সামান্য মধ্যবিৎ একটী ভদ্র লোকের পুত্র নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একদিন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল, তিনি কি বিখ্যাত আলেকজাণ্ডার-দি-গ্রেট হইতে ন্যূন? আর সেই যে মার্টিন লুথর, যিনি সহস্র সহস্র লোক মণ্ডলী সমক্ষে নির্ভীক হৃদয়ে ইতালীর পোপ দশম লিওর ঘোষণাপত্র ভস্মীভূত করিলেন, ক্রমে ক্রমে যাঁহার মতের প্রবলতায় সম্রাট-পূজ্য পোপকে অধিকার চ্যুত হইতে হইল, তিনি কি সেই পোপ হইতে ন্যূন? এইরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া কে বলিবে, রাজা এবং প্রজায়, ধনী ও দরিদ্রে কোন মৌলিক প্রভেদ আছে? প্রভেদ যদি না থাকিল, তবে একে অপরের দাস হইবে কিরূপে? তবে মূলে সমান হইলেও তুমি যদি ক্ষমতাশালী ধনী ও জ্ঞানী হও, প্রকৃতির নিয়মানুসারে দুর্ব্বল নির্ধন যাহারা তোমার অধীন হইবে, তুমি যতদিন তাহাদের মঙ্গলাভিপ্রায়ে ন্যায়ানুসারে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, ততদিন তাহারা তোমার অধীন থাকিবে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যেদিন তুমি স্বার্থান্ধ হইয়া

তোমার জন্য, তাহাদের মঙ্গল বাসনা ত্যাগ করিয়া, অন্যায়কে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে তোমার দাস করিবার জন্য, তোমার স্বেচ্ছাচারের বিষয়ীভূত ক্রীড়া সামগ্রী করিবার জন্য মনঃস্থ করিবে, সেই দিন হইতে, তুমি যাহাদিগকে দুর্ব্বল ও ভীরু মনে করিয়াছিলে, তাহারা যে একদিন সহস্র হস্তীর বলে বলীয়ান্ হইয়া, ধনের ও জ্ঞানের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া, তোমার অধীনতা পাশ কাটিয়া, তোমার সমান হইয়া স্বাধীন তেজে তোমার অর্ব্বাচীনত্ব, তোমার মূর্খত্ব সমস্ত সংসারকে দেখাইয়া দিবে, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে। একদিনে হউক, দশ দিনে হউক, সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর সমক্ষে তোমার মূর্খত্ব প্রতিপন্ন হইবেই হইবে। ইংলণ্ডে রাজা জন নানারূপ কষ্টকর শুল্ক ইত্যাদি ধার্য্য করিয়া ও কতকগুলি কঠিন বিধি প্রণয়ন করিয়া ইংলণ্ডবাসিদিগকে তাঁহার দাসের ন্যায় উৎপীড়িত করিয়াছিলেন বলিয়াই, বাধ্য হইয়া রণিমিড ক্ষেত্রে ১২১৫ সনের ১৫ জুন তারিখে ম্যাগ্না কার্টায় স্বাক্ষর করিয়া তাহার মূর্খত্বের পরিচয় দিলেন। হতভাগ্য প্রথম চার্লস যথেচ্ছাচারী হইয়া (Ship money) জাহাজের জন্য শুল্ক ধার্য্য করিয়া ইংলণ্ডবাসিদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই, যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়া, অবশেষে স্বীয় জীবন শোণিত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তৃতীয় জর্জ্জ তিন কোটি লোকের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও আমেরিকাবাসিদিগের প্রতি তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চা'র কর ধার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার সহিত আমেরিকাবাসিগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহারা স্বাধীন হইল, তৃতীয় জর্জ্জের মূর্খত্ব প্রতিপন্ন হইল। ঈশ্বরের এই বিধির খণ্ডন নাই।

এ পৃথিবীতে এমন একটী মনুষ্য নাই, অধীন হউক, স্বাধীন হউক, যাহার কতকগুলি অধিকার নাই। প্রত্যেক নরনারীরই কতকগুলি অধিকার আছে। সেই অধিকার-বিশিষ্ট কতকগুলি নর নারীর সমষ্টির নাম সমাজ। সমাজের সহিত ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নর নারীর গভীরতম সম্বন্ধ। সমুদ্র কতকগুলি জল কণার সমষ্টি। একটী জলবিন্দুতে আঘাত লাগিলে যেমন সমস্ত জলরাশি, তুমি বুঝিতে পার আর না পার, আন্দোলিত হয়, তেমনি সমাজাভ্যন্তরস্থিত একটী ব্যক্তির গাত্রে আঘাত করিলে সমস্ত সমাজময় সেই আঘাতের ফল প্রসারিত হয়। সমস্ত শরীরের সহিত শরীরস্থিত প্রত্যেক পরমাণুর যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত সমাজমধ্যস্থ প্রত্যেক নর নারীর সেই সম্বন্ধ। বাম পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির শিরোভাগের এক পার্শ্বে সর্প দংশন করিলে যেমন আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বিষে জর্জ্জরিত হয়, তেমনি সমাজস্থিত নিতান্ত সামান্য একটী মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধে অপমানিত করিলে তাহার অপমানে সমস্ত সমাজ অপমানিত হয়। যতই কেন নিকৃষ্ট প্রাণী হউক না, ঈশ্বর যখন তাহাকে তাহার উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার দিয়াছেন, তোমার তাহাকে সেই সম্মান, কি অধিকার-চ্যুত করিবার স্বত্ব কি? ঈশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে যতটুকু উচ্চ করিয়াছেন, অপরের তাহাকে তদপেক্ষা খর্ব্ব করিবার অধিকার কোথায়? ঈশ্বরের বিধান কি মনুষ্যের বিধান কর্ত্তৃক প্রণষ্ট হইবে? সাবধান, মনুষ্য, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও তুমি সামান্য সৃষ্ট পদার্থ—স্রষ্টানির্দ্দিষ্ট স্বত্ব লোপ করিতে কদাপি হস্তোত্তলন করিও না। যদি কর,

তোমার আপন মস্তকে তাহার আঘাত লাগিবে। সমাজস্থিত এক ব্যক্তির উপর হস্তক্ষেপ করিলে সমগ্র সমাজ তোমাকে শাস্তি দিবে। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজের কষ্টে সমাজমধ্যস্থ প্রত্যেক মনুষ্যের কষ্ট, এবং সমাজমধ্যস্থ প্রত্যেক মনুষ্যের কষ্টে সমগ্র সমাজের কষ্ট। প্রাচীন রোমে এক লুক্রেসিয়াকে অপমানিত করায় সমস্ত সমাজ অপমানিত হইয়াছিল; তাই টারকুইনিয়াস্‌কে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইল। সমাজের মাত্র একটী প্রাণীর উপর অতি সামান্য অত্যাচার করিলেও বিধি তোমার নিকট হইতে তাহার উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ লইবেন, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ঐ যে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দীন হীন কৃষক দ্বিপ্রহর বেলায় সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ধান্য ক্ষেত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হল চালনা করিতেছে, বিচিত্র সৌধ প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যাশায়ী সগর্ব্ব সুরাপ্রমত্ত রাজন্, জানিও, ঐ সামান্য কৃষকের এ বিশ্বরাজ্যে যে অধিকার ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার উপর তোমার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। যাই তুমি উহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে, অমনি তোমার পদস্খলিত হইবে, যে দিন হইতে যতটুকু উহার অধিকারে আক্রমণ করিতে চেষ্টিত হইবে, সেই দিন হইতে ততটুকু তোমার শাস্তির আয়োজন হইতে থাকিবে। যদি তুমি আপনার দোষ বুঝিয়া তোমার ধৃষ্টতা প্রত্যাহার কর, তোমার মঙ্গল হইবে, আর যদি তুমি তাহা না বুঝিয়া ক্রমে পাপপথে অগ্রসর হইতে থাক, নিশ্চয় এই সামান্য কৃষকের দীর্ঘনিশ্বাসে এক দিন, আজি হউক দশ দিন পরে হউক, তোমার স্বর্ণ সিংহাসন, তোমার রত্নমুকুট, তোমার হীরকখচিত রাজদণ্ড সমস্ত উড়িয়া যাইবে। এই পৃথিবীতে বিধির এই রূপ বিধি।

মনুষ্যের বিধিনির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতা লোপ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। হয়ত শিক্ষার জন্য সে কয়েক দিন অপরের অধীন হইতে পারে, কিন্তু যাই তাহার শিক্ষা শেষ হইবে, তখন আর অধীন থাকিবে না। পশু, পক্ষী, মনুষ্য সকলের এই একই নিয়ম। পশুশাবক কি পক্ষীশাবক, যত দিন উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইয়া স্বপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিতে না পারে, তত দিন পরাধীন থাকে, যাই সেই ক্ষমতা হয়, আর অধীন থাকে না। ব্যক্তিগত এই নিয়ম, জাতিগতও এই নিয়ম। কোন জাতির প্রথম অবস্থায়, অথবা পূর্ব্বে স্বাধীন থাকিয়া কর্ম্ম দোষে স্বকীয় বল বীর্য্য নষ্ট হওয়ায়, যতদিন শিক্ষার প্রয়োজন, ঈশ্বরের বিধানুসারে তত দিন অপর কোন জাতির অধীন হয়, যাই সেই জাতির সুব্যবহারে কি কুব্যবহারে উপযুক্ত শিক্ষালাভ হয়, অমনি শাসনের কোন গর্হিত দোষের প্রতিবাদ করিয়া আপন শিক্ষার ফল দেখাইয়া স্বাধীন হয়। ইটালী ও গ্রীসের পুনরুত্থান এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ, কি ধর্ম্মনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি রাজনৈতিক, সকল প্রকারের উন্নতিই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। সেই নিয়মানুসারে জাতীয় পতন ও জাতীয় অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। যে নিয়মানুসারে শৈশবে কি বার্দ্ধক্যে, অথবা রোগে কি অন্য কারণে দুর্ব্বল হইলে মনুষ্য পরাধীন হয়, এবং যৌবন কালে ও সবলাবস্থায় স্বাধীন ভাব ধারণ করে, সেই নিয়মানুসারেই এক জাতি শৈশবে কি বার্দ্ধক্যে, অথবা স্বকর্ম্মদোষে বিলাস দম্ভ স্বার্থপরতায়

দুর্ব্বল হইলে অপর জাতির অধীন হয়, এবং যৌবন কালে ও সবলাবস্থায় স্বাধীন হয়; এবং এক জাতির মধ্যে দুই সম্প্রদায় থাকিলে, যে সম্প্রদায় শৈশবাবস্থায় কি অন্য কোন কারণে দুর্ব্বল, সেই সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের অধীন হয়, আবার যখন সেই সম্প্রদায় সবল হয়, তখন আর অধীন থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির জীবনে যত বল হয়, সে যেমন তত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনি যে জাতি কি সম্প্রদায়ে যত বলের সঞ্চার হয়, সেই জাতি ও সম্প্রদায় তত স্বাধীন ভাব ধারণ করে। মনুষ্যের মানসিক ও দৈহিক বল উভয়ই অধীনতার বিরোধী। যে ব্যক্তির যত মানসিক ও দৈহিক বলের সঞ্চার হয়, সে যেমন তত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ যে জাতির, কি সম্প্রদায়ের যত মানসিক ও দৈহিক বলের সঞ্চার হয়, সেই জাতি ও সম্প্রদায় তত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। যখন কোন ব্যক্তির এরূপ বল হয় যে, আর তাহার অপর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন থাকে না, তখনই সে স্বাধীন হয়; সেইরূপ যখন কোন জাতি কি সম্প্রদায়ের এরূপ বল হয় যে, আর সে জাতির ও সম্প্রদায়ের অপরের সাহায্যের প্রয়োজন থাকে না, তখনই সেই জাতি ও সম্প্রদায় স্বাধীন হয়। যদি কেহ উপযুক্ত বল সঞ্চারের পর স্বাধীনতার প্রতিরোধ করে, তাহার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। স্বাধীনতার উপযোগী শক্তি সঞ্চারের পর যিনি তাহার সহিত যোগ দিবেন তাঁহার মঙ্গল, কেহ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সেই অপরিহরণীয় শক্তি তাহাকে তৃণের ন্যায় উড়াইয়া লইয়া যায়। ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের প্রত্যেক পংক্তি অগ্নিময় অক্ষরে এই সত্যের মহিমা বর্ণন করিতেছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

সুন্দরবনের প্রজা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

সাধারণত* সুন্দরবন বলিলে খুলনা জিলার সমুদয় দক্ষিণাংশ, এবং ২৪ পরগণার ও বাখরগঞ্জের দক্ষিণস্থ কিয়দংশ বুঝায়। কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবে কেবল খুলনা জিলাস্থ সাতক্ষিরা ও খুলনা সবডিভিসনের অন্তর্গত সুন্দরবনভুক্ত স্থান সমূহের প্রজাদিগের অবস্থার বিষয় বর্ণন করিব। তাহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, অসহায় দুঃখী প্রজাবর্গ কিরূপ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমরা ক্রমশ ইহাদিগের সাংসারিক আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম, কৃষি, শিল্প এবং ইহাদিগের প্রতি সুন্দরবনস্থ জমিদারী কাছারীর কর্ম্মচারিবর্গ কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন, সময়ে সময়ে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে কি উপায়ে ইহাদিগকে রক্ষা পাইতে হয়, তাহা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও প্রকাশ করিব। এই প্রস্তাবে সময়ে সময়ে দুই একটী এমন বিষয় বর্ণিত হইবে, যাহা সহরবাসী পাঠকবর্গ অতিশয় আশ্চর্য্য এবং

* বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ স্থানে বিসর্গ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া আমরা দিলাম না। ন,স।

অসম্ভব মনে করিবেন। কিন্তু যাঁহারা এই দুস্থ প্রজাকুলের অবস্থা একটুও অবগত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার একটী বর্ণও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় লইয়া শরৎ ঋতুতে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি, সুতরাং শরৎ হইতে প্রত্যেক ঋতুতে ঐ প্রজাবর্গ কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করে, এবং উহাদিগকে ঋতু বিশেষে কি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই পাঠকবর্গকে মাসে মাসে উপহার দিব।

শরৎকাল আসিল না সুন্দর বনবাসী প্রজাদিগের বিশ্রামের সময়, আমোদ আহ্লাদের সময় আসিল। এখন আর ইহাদিগকে ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠে থাকিয়া ধান্য রোপণাদি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় না। ধান্য ক্ষেত্রের আলির উপর বসিয়া গুড় দিয়া পান্তা ভাত খাইতে হয় না, সন্ধ্যার সময় বাটী আসিয়া আগুন জ্বালিয়া হাত পা সেক দিয়া জ্বালা নিবারণ করিতে হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাদিগকে বর্ষাকালে যে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এখন তাহার কিছুই নাই বলিলেই হয়। এখন সকলেই আমোদ আহ্লাদে রত। এই সময়ে পাঠকগণকে ইহাদের ঘর দরজাদির বিষয় কিছু বলিয়া লই। কারণ, তাহা হইলে পরের বিষয়গুলি ভাল লাগিবে। ইহারা নদী বা খালের ধারে বাস করিতে ভালবাসে, ইহার কারণ সুন্দরবনের জমী অত্যন্ত নীচু এবং প্রায় বারমাস জলে পূর্ণ থাকে। কেবল নদী বা খালের ধার অপেক্ষাকৃত উচ্চ, ইহারা এই অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীর উপর অন্য স্থান হইতে মাটী তুলিয়া ভিটা করিয়া তাহার উপর বাটী নির্ম্মাণ করে। ঐ প্রকার ভিটার উপর বাটী নির্ম্মাণ না করিলে জোয়ারের সময় যখন নদীর জল বৃদ্ধি হয়,তখন ঘরের মেজেতে জল উঠে। এত উঁচু স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করে, তবুও ঘরের ভিতে সময়ে সময়ে জোয়ারের জল লাগে, বিশেষত বর্ষা এবং শরৎ ঋতুতে। সাধারণত প্রায় সকল বাটীতেই ৪। ৫ খানা ঘর থাকে। এক খানা বা দুই খানা থাকিবার ঘর, এক খানা ধান রাখিবার গোলা ঘর, এক খানা গরু এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী হলাদি রাখিবার গায়াল ঘর, অপর খানি ঢেঁকিশালা। থাকিবার ঘর খানা প্রায়ই উত্তরের ভিটায়, অর্থাৎ বাটীর উত্তর সীমায় দক্ষিণ দুয়ারি, গোলা ঘর পশ্চিম দিকে, গোয়াল ঘর দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ থাকিবার ঘরের বিপরীত দিকে, এবং ঢেঁকিশালা পূর্ব্ব দিকে। গোয়াল ঘর ব্যতীত অপর ঘর গুলি বৃত্তাকার। ইহার ব্যাস ৭। ৮ হাত, ভিটা সমভূমি হইতে দেড় কি দুই হাত উচ্চ। ইহার জন্য পৃথক খুঁটী বা থাম লাগে না, নল দিয়া একটী বেড় প্রস্তুত করে। মাটী দ্বারা খুব পুরু করিয়া লেপিয়া দেওয়াতে উহা খুঁটী এবং বেড়া উভয়ের কার্য্য করে। চালে, বাঁসের চটা বা সুন্দরি প্রভৃতি কোড়া দ্বারা কাঠাম করিয়া পরে পাতড়ার (এক প্রকার ঘাস বিশেষ) ছাউনি দেয়। চালের যেখানে বাঁধন দিবার আবশ্যক হয়, সেখানে দড়ি না বাঁধিয়া একপ্রকার লতা দিয়া বাঁধে। গোলাঘর ও ঢেঁকিশালা প্রায় থাকিবার ঘরের ন্যায়, তবে অপেক্ষাকৃত ছোট। ঢেঁকিশালার ভিতর এক পার্শ্বে মাটী দিয়া গাঁথা একটী ছোট হাঁস থাকিবার ঘর থাকে।

গোয়াল ঘর খানা অপর তিন খানার ন্যায় গোল নয়। ইহা দুই চালা, দৈর্ঘ্যে ১৫। ১৬ হাত, প্রস্থে ৬। ৭ হাত, ইহাতে খুঁটী বা থাম আছে; খুঁটী প্রায়ই খেজুরের বা তালের, বেড়া বা দেওয়াল নাই। কৃষিকার্য্যের হলমই ইত্যাদি খুঁটীতে ঝুলান থাকে। বাটীতে তাল এবং খেজুর ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ প্রায়ই দেখা যায় না, তবে কোন কোন বাটীতে দুই একটী নীম, কলা এবং দেশী কুলের গাছ দেখা যায়। এরূপ নীম, কলা এবং কুলের গাছ যাহার বাটীতে আছে, লোকে তাহাকে ভাগ্যবন্ত বলিয়া মান্য করে। ঘর দরজার বিষয় বলিতে বলিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি, পাঠক হয়ত বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু উহা না বলিলেও উহাদিগের পারিবারিক অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। যাহা হউক, পুনরায় আমরা ইহাদিগের সেই শরৎঋতুর অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহারা এখন সকলেই আমোদ আহ্লাদে মগ্ন, বস্তুত ইহাদের বহু পরিশ্রমের ফল সবুজ ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকে। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিন, পাঠক এক বার স্বচক্ষে এ প্রকার সুবিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত্র দেখিলে আনন্দে বিভোর হইবেন। অধিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতে পাইলে মন স্বভাবতই প্রফুল্ল হয়, তাহাতে আবার শারদীয় পূজা আগত প্রায়। পূজার সময় বাবুর বাটীতে (জমীদারের বাটী) পূজা দেখিবে, গান শুনিবে, ছেলে মেয়েকে নূতন কাপড় পরাইবে, ইত্যাদি আমোদের চিন্তায় বিভোর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন আর ইহাদের তত কাজ কর্ম্ম নাই; তবে জমীদারের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং পূজার সময়ের কাপড় কিনিবার টাকার সন্ধানে বেড়াইতে হয়। ইহা ভিন্ন আর সময় কেবল মাছ ধরিয়া, এবং সন্ধ্যার পরে অনেকে এক স্থানে বসিয়া খেঁউড় কবি গাইয়া আমোদে সময় কাটায়। পাঠক হয়ত জমীদারের উৎপীড়নের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন যে, নিরীহ সরল কৃষকদিগের এমন আমোদ প্রমোদের সময় আবার জমীদারের উৎপীড়ন! পাঠক! বিস্মিত হইবেন না, এই নিরক্ষর নিঃসহায় প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচর হয়, তাহা শুনিলে অবাক হইবেন। জমীদারের আদেশানুসারে নায়েব গোমস্তাগণ,পূজার মধ্যে আধা তলব (যে প্রজা বাৎসরিক যত টাকা কর দেয় তাহার অর্দ্ধেক) খাজানা আদায়ের জন্য গরীব প্রজাদিগকে কাণ ধরিয়া ঘোড়দৌড় প্রভৃতি অভদ্রোচিত কত প্রকার পীড়ন করেন; তাহা সাধারণ পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করান বড় সহজ নয়। যাঁহারা এরূপ অত্যাচারের বিন্দুবিসর্গও জানেন না, এমন কি আর কখনও শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ; তাঁহাদের সহজে হৃদয়ক্ষম হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

প্রজাগণের নিজ নিজ পরিশ্রমের ফল যে ধান পায়, লাগায়েত বৈশাখের মধ্যে জমীদারের খাজনা এবং মহাজনের দেনা শোধ প্রভৃতির জন্য প্রায় তাহার ¾ অংশ দিতে হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাতে যাহার অল্প পরিবার, তাহার অতিকষ্টে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলিতে পারে। যাহার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিবার, তাহার অতি কষ্টে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত চলে কিনা সন্দেহ * ধান ফুরা-

* যদিও প্রায় আষাঢ় মাস হইতে ইহাদের অনেকের ঘরে খাদ্যের সংস্থান থাকে না, তথাপি মনিবাড়ী গেলেই পাইব, এই আশাতেই ইহারা একরূপ নিশ্চিন্ত থাকে।

ইলে নির্দ্দয় জমীদারের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন ইহাদিগের আর উপায় নাই। প্রত্যেক জমীদারের কাছারীতে প্রচুর ধান মজুত থাকে, তাঁহারাও সময় বুঝিয়া প্রজাদিগকে দুনা সর্ত্তে (প্রজায় বত ধান লইবে ফসলে অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসে তাহার দুনা দিবে) ধান দিতে থাকেন। অনাহারে কয়দিন থাকিতে পারে? বালক বালিকার ক্রন্দন কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? কাযেই নিরুপায় হইয়া দুনা সর্ত্তে লইতে বাধ্য হয়। ইহার উপর আবার খাজনার জন্য পীড়ন। এই সময় ২।১ জনের ঘরে যাহা কিছু ধান থাকে, তাহাও নায়েব গোমস্তা এবং রক্তানের (পেয়াদার) ঘোর অত্যাচারে জমীদারকে দিয়া আবার দুনা সর্ত্তে জমীদারের নিকট হইতে লইতে হয়। কোন প্রজা খাজনা দিতে বিলম্ব করিলে তাহাকে পেয়দা দিয়া কাছারীতে লইয়া যাইয়া নানা প্রকার সাজা দেওয়া হয়। সময়ে পাঠকগণকে সে বিষয় ভাল করিয়া জানাইব। যাহাদের ঘরে ধান নাই, * জমীদারের নিকট হইতে দুনা সর্ত্তে লইয়া কোন রূপে দিন চালাইতেছে, তাহাদিগের নিকট হইতে নায়েব গোমস্তাগণ খাজনা আদায়ের বিলক্ষণ পথ করিয়াছেন। প্রজাদিগকে নিজ হইতে সওয়াই সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া, পরে তদ্বারা খাজানা দিতে বাধ্য করিয়া ফসলে অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসে মায় সুদ আদায় করেন। পাঠক হয়ত সওয়াই সুদ কি প্রকার, বুঝিতে পারিতেছেন না। সওয়াই সুদের নিয়ম একটাকা ধার লইলে, ফসলে ১।০ এক টাকা চারি আনা দিতে হয়। আশ্বিন মাসে টাকা দিয়া পৌষ মাসেই প্রায় আদায় করা হয়; তাহা হইলে দেখুন, প্রজাদিগকে প্রায় চারি মাসে শত করা ২৫ টাকার হিসাবে সুদ দিতে হয়! এ লাভটা নায়ের গোমস্তা মহাশয়দের নিজেরই হইয়া থাকে। পাঠক হয়ত বলিবেন, ইহারা কি জমীদার বা জমীদারের কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোথা হইতে অল্পসুদে টাকা বা ধান লইতে পারে না? না। এখানে জমীদার বা নায়েব গোমস্তা ভিন্ন অন্য মহাজন প্রায়ই নাই। সম্প্রতি যে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রজাদিগকে ঋণ দিবার নিয়ম হইতেছে, ইহাতে যে সুন্দর বনের প্রজার দুঃখ দূর হইবে, এমত বোধ হয় না। কারণ, উক্ত নিয়মানুসারে ঋণ লইতে হইলে জিলা বা মহকুমা হইতে লইতে হইবে, তাহার জন্য দরখস্ত করিতে হইবে, তজ্জন্য কত উকিল মোক্তারের খোসামোদ করিতে হইবে, তাহা ইহাদিগের দ্বারা কোন মতেই হইয়া উঠিবে না। ইহারা নিরক্ষর, বিষয় বুদ্ধিহীন এবং অতি সরল প্রকৃতির লোক। ইহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সংবাদপত্র, পরামর্শদাতা, সমস্তই স্বার্থপর নায়েব গোমস্তাগণ। এমন কি, গবর্ণমেণ্ট হইতে যে প্রজাদিগকে ঋণ দিবার নিয়ম হইতেছে, নায়েব মহাশয়দিগের জন্য প্রজারা আদৌ তাহা জানিতেই পারিবে না। দুই এক জন কোন প্রকারে জানিতে পারিলেও উক্ত মহাশয়েরা নানা প্রকার বাক্‌চাতুর্য্যে তাহাদিগের নিকট উহা মিথ্যা, কোম্পানির জুয়াচুরি বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। দিবেনইত, নহিলে উহাদের নবাবি চলিবে কিসে? এখন পাঠক চিন্তা করুন, কিসে ইহাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে। শীঘ্র যে ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে, অবস্থা দৃষ্টে এমন ত বোধ হয় না।

* সুন্দরবনে ধান ভিন্ন অন্য কোন শস্য হয় না যে, তাহা বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজনা দিবে; ইহাদের ধান ভিন্ন আর উপায় নাই।

ইহাদের এইরূপে বৎসর বৎসর ঋণ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। হইবে না? প্রভুরা আবার সুদের সুদ তস্য সুদ পর্য্যন্ত আদায় করিতেও ত্রুটী করেন না। পরিশেষে ঋণের দায়ে ইহারা কৃষি কার্য্যোপযোগী হল গরু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া জমীদারকে দিয়া পথের ভিখারী হইয়া, অন্য জমীদারের জমীদারিতে পলায়ন করে। কিন্তু গেলে কি হয়? কথায় আছে, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"। যেখানে যায়, সেখানেও পুনঃ ঐরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ইহারা আজীবন সন্তবাতীত পরিশ্রম করিয়া কেবল জমীদার এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। নির্দ্দয় জমীদার এবং নায়েব গোমস্তাগণ একবার ইহাদের কষ্টের বিষয় চিন্তাও করে না।

বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সাধারণ শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন ইহাদের দুঃখ কিছুতেই দূর হইবে না। দুঃখের বিষয় কি বলিব, যদিও গবর্ণমেণ্ট সুন্দরবনের কোথাও কোথাও সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের এচেষ্টা নাম মাত্র, গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য করিতেছেন, তাহা অতি সামান্য। ইহার উপর আবার হর্ত্তাকর্ত্তা নায়েব মহাশয়েরা সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী, তাঁহারা বলেন,—'ব্যাটারা লেখা পড়া শিখিয়া পরে খাজনা হিসাবের সময় কড়াগণ্ডা পর্য্যন্ত হিসাব করিতে বসিবে।' প্রভুরা বিরোধী হইবেনইত! কারণ ইঁহাদিগের অনেকেরই বিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালার দপ্তর ভাগ পর্য্যন্ত, কাযেই হিসাবের বেলায় আনার পর গণ্ডার দিকে গেলে আঁধার আঁধার দেখেন। এ দিকে ভাঙ্গা ভাঙ্গ্‌টা হিসাবে নিরক্ষর প্রজাদিগকে ফাকী দিতে কিন্তু খুব মজবুত।

প্রজাদিগের এই অনাটনের সময় আবার দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া উপস্থিত। ছেলে, মেয়ে নূতন কাপড়ের জন্য পিতা মাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ বলে, বাবা আমায় কোকিল পেড়ে কাপড় কিনে দাও, কেহ বলে, বাবা আমায় ডুরে শাড়ী দাও, ইত্যাদি। তবুও রক্ষা যে, ইহারা শান্তিপুরে বা ঢাকাই কাপড়ের কথা জানে না। পিতা মাতা এখন ভাবিয়াই অস্থির, কোথা হইতে কি করিয়া দেয়। এ দিকে ঘরে খাবার নাই, দুদিন অন্তর জমীদারের কাছারী হইতে ধার করিয়া আনে আর খায়, ছেলে মেয়েকে কাপড় কিনিয়াই বা কোথা হইতে দেয়? না দিলেও নয়, অবোধ বালক বালিকা বুঝিবে কেন? ঘরে খাবার থাক্ আর না থাক্, তাদের নূতন কাপড় চাইই চাই। কি করে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জমীদারের কাছারী যাইয়া নায়েব মহাশয়কে গড় হইয়া এক প্রণাম করিয়া বলিল, "কত্তা, আজ আমার মান বাঁচাতি* হবে। বাড়ী খোয়াখুয়ী (ছেলে মেয়ে) নতুন কাপড়ের দন্নি (জন্য) বড় বেরাক্ত কত্তেছে। আবার জামুই বাড়ী কাপড় না দিলিই বা মান বা'চে কেমন ও'রে? (কেমন করে)। ইদিরি (এ দিকে) ঘরের তেনারাও (কৃষকপত্নী) খুয়ীরি দে নাঙা শাড়ী চা'তেছে। তা—আর গড়া পাচেক টাহার দন্নি আলা (এলাম)।" নায়েব মহাশয়ও

* পাঠক! সুন্দরবনস্থ প্রজারা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে, যাহা সাধারণের বুঝিয়া উঠা কঠিন; যে গুলিন একেবারে বুঝা যায় না, সে গুলির প্রতিশব্দ বন্ধনির মধ্যে দিলাম।

সময় বুঝিয়া গুণা টানিতে লাগিলেন,—'তাইত—এখন টাকাই বা কই—প্রায় সমস্তই বাবুর বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি। তবে, তোমার বড় দাদাবাবুর (নায়েব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের) কিছু টাকা আমার নিকট আছে, তিনি সুদে খাটাইতে দিয়াছিলেন, যদি কার্ত্তিক মাসে সওয়াই সুদ সমেত শোধ করিতে পার, তবেই দিতে পারি।' এ দিকে ছেলে মেয়ের ক্রন্দন, গৃহিণীর অনুরোধ, কাজেই নায়েব মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। বলিল—"তার দন্নি আর ভাবনা কি? না হয় কার্ত্তিক মাসে বাদাইতে (বন হইতে) কাট কা'টে আ'নে তাই বেচে শোধ দ্যাব। তবে এই এক মাসে সওয়াই সুদ দিতি হবে—তাব'লে আর কি কর্‌ব, বড় দাদাবাবু ত আর অন্যি পর না, তা তেঁনার দন্নি নয় দ্যাব, সিনিও ত হাপনার বড় ছাবাল, তাও এক কোথা।" নায়েব মহাশয় যখন দেখিলেন অভিষ্ট সিদ্ধ হইল, তখন বাক্স হ'তে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া, উপস্থিত পেয়াদা, মণ্ডলদিগকে সাক্ষী রাখিয়া নির্ব্বোধ প্রজার হাতে দিলেন। সরল কৃষক টাকা পাঁচটী হাতে পাইয়া, নায়েব মহাশয়কে গড় হইয়া আর একটী প্রণাম করিয়া বাটী চলিয়া গেল।

বাটী যাইয়া সকালে সকালে খাইয়া খিলে ডিঙ্গিতে (লৌহর পেরেকের পরিবর্ত্তে বাঁসের খিল দিয়া প্রস্তুত ক্ষুদ্র নৌকা) উঠিয়া বড় দলের অথবা প্রতাপনগরের * হাটে গেল। যাইয়াই কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড় চাহিল, দোকানদার সুন্দরবুনে লোক বুঝিতে পারিয়া ৷৷০ আনার কাপড়ে ১টাকা চাহিয়া বসিল। সরল প্রকৃতির নির্ব্বোধ চাষাদিগের নিকট হইতে ফাকী দিয়া লইতে কেহই ক্রটী করে না। কৃষক অল্প আপত্তির পর তাহাতে সম্মত হইয়া আবশ্যকীয় কাপড় কিনিয়া লইয়া বাটীতে আসিল। ছেলে মেয়ে এবং গৃহিণী কাপড় পাইয়া মহা সন্তুষ্ট! ছেলে মেয়ে সপ্তমী পূজার দিন বাবুর বাড়ী পূজা দেখিতে যাইবে, ভাল কবি শুনিবে, এই আমোদেই ভোর। দেখিতে দেখিতে সপ্তমী পূজাও আসিল, ছেলে মেয়ে, বৌ-ঝি (দুই এক জন বৃদ্ধ ব্যতীত) সকলেই খিলা ডিঙ্গিতে চড়িয়া বাবুর বাড়ী পূজা দেখিতে গেল। প্রথমে যাইয়াই প্রতিমার সম্মুখে গড় হইয়া এক এক প্রণাম করিল, কেহ বা মা দুর্গার নিকট এই বলিয়া বর মাগিল "যেন আমার বড় খোয়ার বিয়ে মাঘ মাসের মধ্যি হয়।" পরে পূজা দেখা হইয়া গেলে বাবুর বাড়ী চিড়ে আর নারিকেলের নাড়ু জল খাবার পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী আসিল। দেখিতে দেখিতে নবমী পূজাও আসিল, সে দিন সকালে সকালে খাইয়া বাবুর বাড়ী গান শুনিতে যাইবে, সেই উদ্যোগ করিতে লাগিল; ছোট ছোট ছেলেরাও সাজিল। কি করে; বালকের আব্‌দার কাজে কাজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। গান শুনিবার সজ্জা পান, তামাক, একটী ছোট হুকা, চকমকি (প্রস্তর বিশেষ, ইস্পাত দ্বারা আঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়; ইহারা বিলাতি দিয়াশলায়ের সন্ধান জানে না) নারিকেলের খোসা ইত্যাদিও সঙ্গে লইতে ক্রটী করিল না, কেন না গান শুনিতে বসিয়া ছোট ছোট ছেলেরা "বাবা তামুক খাম হোকা দে—" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই; তখন

* আমাদের বর্ণিত সুন্দরবনের মধ্যে বড়দল এবং প্রতাপ নগরের হাটই প্রধান।

আগুন তামাক কোথায় পাইবে? কাযেই বাটী হইতে সমস্ত গুছাইয়া লইল। তাড়াতাড়ী নৌকায় উঠিয়া ৪।৫ জন সজোরে দাঁড় টানিয়া বাবুর বাড়ী পৌঁছিল। যাইয়াই শুনিল, কবির দল বায়না হয় নাই, কলিকাতা হইতে ভাল যাত্রা আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মন উঠিল না, "দেওয়ানজী কোবায় (কোথায়) দেওয়ানজী কোবায়" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, পরে দেওয়ানজীর দেখা পাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"কত্তা! এব্‌রা আমাগের পর এ অবিচের কেন?" দেওয়ানজী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, হ'য়েছে কি? ব্যাপার খানা কি বল দেখি? প্রজারা বলিল, কত্তা! বছর বছর আমগের দন্নি দুদল ক'রে কবি আসে, আমরা পোরাণ ভ'রে গান শুনি,* এবরা তা আসেনি কেন? দেওয়ানজী বলিলেন, আরে ব্যাটারা, এ আর অবিচের কি? অন্য বার যে টাকায় দুদল কবি এবং এক দল যাত্রা আসে, এবার সেই টাকায় কলিকাতা হইতে লোকাধোপার যাত্রা আনা গেছে। প্রজরা লোকাধোপার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, এ হ্যাবারা (একেবারে) গোরাপ (নষ্ট) ক'রে চাও; নোয়া ধোপা—ধোপায় আবার কেমন গান গাবে! দেওয়ানজী বলিলেন, ওরে এখন থাম! গান শুনিলে তখন অবাক্ হ'য়ে যাবি, বড় ভাল দল। দেওয়ানজীর কথায় সকলে নিরস্ত হইল। পরস্পর বলিতে লাগিল, দেহা যা'ক ধোপা কেমন গান গায়। পরে যাত্রা আরম্ভ হইলে, অনেক ভদ্র লোক গান শুনিতে বসিলেন; প্রজারাও চারিদিকে দরমা পাতিয়া গান শুনিতে বসিল। ইহারা যাত্রার দলের সং দেখিতে কিছু ভাল বাসে, কিন্তু প্রায় ২ঘণ্টা অতীত হইল, সং আর আসে না দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া উঠিয়া বলিল, সে উনি (সেই সময়) দেওয়ানজীরি বলেলা যে, ধোপায় আবরা কেমন গান গাবে? তা বল্লে না খুব ভ্যাল যাত্রা, এইত ভ্যাল! এট্টা সংও নেই—ওরে ও পোরাণে ও ফেদো, ওরে ওঠ চল; বাড়ী হাই। কা'ল স্যাওন (তখন) ভাসান দেখ্‌তি আস্‌প। যদি কোপালে থাকে, আর বা'চে থায়ি ত ফিরে বছর যাতে বাবুর বাড়ী কবি আনে, নায়েব মশারে তার বিধেন কত্তি কব; ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে নৌকায় উঠিয়া দাঁড়ে জোর দিয়া বাটীতে চলিল। বিজয়া দশমীর দিন আবার ছেলেয় বুড়য়, বৌ ঝিয়ে মিলিয়া নৌকা চড়িয়া ভাসান দেখিতে গেল। ভাসান দেখা শেষ হইলে স্ব স্ব মনিবের প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় প্রতিমা হইতে রাং খুলিয়া লইয়া বৌঝিদিগকে কপালে পরিবার জন্য দিল। বাজার হইতে কলা, ইক্ষু, রাঙ্গা হাঁড়ি ইত্যাদি কিনিয়া লইয়া নৌকায় উঠিয়া মেয়ে, এবং পুরুষ প্রত্যেকেই এক এক খান দাঁড় বা বৈটে বাইতে বাইতে বাটী আসিয়া পৌঁছিল। এবৎসরের মত পূজা দেখাও শেষ হইল।

* সুন্দর বনের প্রজারা অশ্লীল ভাষায় কবি গান শুনিতে কিছু অধিক ভাল বাসে।

প্রমদা।

প্রমদা! স্বর্গের শিশু বালিকা আমার!
শারদ পূর্ণিমা রেতে, আসিলি কি চাঁদ হ'তে,
খসিয়া একটী ক্ষুদ্র কিরণ তাহার,
পথ ভু'লে প্রমদারে পরাণে আমার?
অথবা ঊষারআলো,ভুলে তোরে ফেলে গেলো
আঁচলের গাঁ'ট খু'লে পড়েছিলি তার,
প্রাণময়ী প্রমদারে পরাণে আমার?

১

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি,আবার কোথায় গেলি
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার!
মলয়া পলা'য়ে যে'তে,পড়েছিলি কোল হ'তে
চুরি করা কুসুমের পরিমল তার?
কমল লাবণ্য খু'লে, তোরে থুয়েছিল ভুলে
শারদ সায়াহ্ন কালে কোলে সারদার?
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায়গেলি
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার?

২

দেখিছি যামিনী কালে,বেষ্টিত তারকা জালে
অকূল অসীম নীল নভ কলেবর,
তা' হইতে পড়ে ছুটি, মাঝে মাঝে দুই একটী
ক্ষুদ্র সে জ্যোতির বিন্দু কোমল সুন্দর!
তুই কি একটী তার, কোলে এসে সারদার
পড়েছিলি না বুঝিয়া দিশাহারা হয়ে?
কি ছিলি?
চাঁদের অমিয়া ছিলি? ফুলের সুবাস ছিলি?
ঊষার আলোক ছিলি? কমলের হাসি ছিলি?
কি ছিলি?
আকাশের তারা গেলি আকাশে মিশা'য়ে?

৩

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি,আবার কোথায় গেলি
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার!
এখনো কাঁদে যে প্রাণ, জ্বলিতেছে মর্ম্ম স্থান,
এখনো নয়নে বহে শত অশ্রুধার!
এখনো সারেনি ভুল, দেখিলে কমল ফুল,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার!
দেখিলে ঊষার কোলে, অরুণ শিশুটী খেলে,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার!
সায়াহ্নে তারকা সবে, দেখিলেই ভাবি তবে,
ইহার (ই) একটী হবে প্রমদা আমার!
যদি ফুল-বাস পাই, কোল বাড়াইয়া যাই
মনে ভাবি আসে বুঝি প্রমদা আমার!

৪

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি,আবার কোথায় গেলি,
সরলা সোণার পরী শিশুটী আমার!
শুনেছি শচীর গলে, পারিজাত হার দোলে,
তুই কিরে ছিলি তার মণির মন্দার?
অথবা
কার বুক খালি ছিল, তোরে দিয়া পূরাইল—
কোন্ সেই ভাগ্যবতী সুর অঙ্গনার?
এই কি বিধির বিধি—এই কি বিচার?

৫

আহা হা!
সেই যে বৈশাখ,—পোড়া কপাল আমার,
এখনো স্মরিতে বহে শত অশ্রুধার!
এখনো এখনো হায়, দেখি যেন বিছানায়
শিরিষ কুসুম সেই তনু সুকুমার,
অবশ পড়িয়া আছে, অভাগিনী ব'সে কাছে,
কাতর নয়নে তোরে চাহে বারবার!
বোঝেনি সে হতভাগী,যাস্ যে জন্মের লাগি,
জীবনের সুখ শান্তি লইয়া তাহার!
বোঝেনি সে জ্ঞানহীনা,ফিরে আর আসিবিনা
ভুলিবি স্বর্গের সুখে পাপের সংসার!

৬

তখনি মুহূর্ত্তে পুনঃ—
দেখিতে দেখিতে কণ্ঠ অন্তিম হিক্কায়
কাঁপিয়া উঠিল যে রে,—হায় হায় হায়!
ঘরের বাহির করি, কেহ বলে হরি হরি—
নয়ন ঢাকিয়া দিল তুলসী পাতায়!
স্খলিত তড়িত মেঘে, ছুটিয়া আসিয়া বেগে,
অভাগী সারদা পড়ে আছাড়ি ধরায়!
কাঁদে পরিবার যত, হাহাকারে অবিরত
কে কারে প্রবোধে, সবে পাগলের প্রায়,
কেহ শিরে কর হানে, কেহ বা ব্যথিত প্রাণে
ডাকিছে আকুল কণ্ঠে "প্রমদা কোথায়!"
সে উচ্চ ক্রন্দন রোল, ঘন ঘন হরি বোল,
অভাগিনী সারদার "হায় হায় হায়!"
সব দেখিলাম চক্ষে,সব সহিলাম বক্ষে,
নিকটে দাঁড়ায়ে আমি পাষাণের প্রায়!

৭

একি?
আবার সে উচ্চ রোল, আবার সে হরিবোল,
প্রাণময়ী প্রমদারে কোথা নিয়ে যায়?
"দিবনা দিবনা নিতে, দিবনা সমাধি দিতে"
কাড়িয়া সে পাগলিনী কোলে নিতে চায়!
কি সে এলোমেলো বেশ,উগ্রচণ্ডী—মুক্তকেশ,
ছুটিল সে বৎসহারা বাঘিনীর প্রায়!
কি সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য,—ছাইভস্ম হোক্ বিশ্ব,
ভাবিতে পারি না, প্রাণ আতঙ্কে শুকায়!
সেই যে জন্মের শোধ দিয়াছি বিদায়!

৮

প্রমদা!
সেই যে মুকুতাদন্ত সহাস আনন,
সেই অর্দ্ধ উচ্চারিত "বাব্বা" সম্বোধন,
সেই দিবা অবসানে শ্যাম সন্ধ্যাবেলা,
জননীর সনে তোর ত্রিদিবের খেলা!
তারাভরা চাঁদভরা নিরখি গগন,
সুধাভরা মুখে তুই হাসিতি যখন,
দেখি তোরে হাস্যময়ী আনন্দেরই ডালি,
আদরে সারদা কত দিত করতালি!
গোপনে দাঁড়ায়ে সেই একেলা একেলা,
দেখিতাম অভাগীর মেয়ে নিয়ে খেলা!
স্মরিতে এখনো উহা কেঁদে উঠে মন,
এ জনমে আর নাকি দেখিব কখন?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

দেবতত্ত্ব *।

আমাদের দেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে যে প্রকার রূপকের অতিবাহুল্য দৃষ্ট হয়, এ প্রকার আর কোন দেশীয় গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় না। এমন কি, প্রত্যেক অক্ষরের রূপ-কল্পনা হইয়াছে, যথা—আকারের রূপ, "আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে। ব্রহ্মাবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে॥ পঞ্চ প্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং পরম-কুণ্ডলী॥" ইতি কামধেনু তন্ত্রধৃত শব্দকল্পদ্রুম শ্লোকঃ॥ অর্থাৎ আকারের রূপ পরমাশ্চর্য্য, শঙ্খজ্যোতির ন্যায়, ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,

* এই প্রস্তাবের কতকাংশ বিশ্ববন্ধু নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্র বন্ধ হওয়াতে আবার প্রথমাবধি প্রকাশ করা যাইতেছে।

ও পঞ্চ প্রাণ অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ পঞ্চ প্রকার বায়ু, প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান আছে। ইহা স্বয়ং কুণ্ডলী অর্থাৎ দেহান্তর্গত শক্তি বিশেষ স্বরূপা। গুহ্যদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ভাগে শাস্ত্র মতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীকেও কুণ্ডলী বলে। প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর রূপ কল্পনা হইয়াছে, যথা—গান্ধার রাগের রূপ, "জটাং দধানঃ কৃতভূতিভূষণঃ কাষায়বাসাস্তনুতে হ-যষ্টিঃ। সযোগপট্টঃ কৃতনেত্রমুদ্রো গান্ধার রাগ কথিতস্তপস্বী॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত সঙ্গীত-দামোদর শ্লোকঃ॥ অর্থাৎ গান্ধার রাগ জটা, ভস্ম, কাষায় বস্ত্র ও যোগপট্টযুক্ত ক্ষীণ দেহ-ধারী মুদ্রিত নেত্র তপস্বীর ন্যায়। ধানসী রাগিণীর রূপবর্ণনা;—"নীলোৎপলঃ কর্ণযুগে বহন্তী। শ্যামা সুকেশী চ সুমধ্যভাগা। ঈষৎসহাস্যাম্বুজরম্যবক্ত্রা। সা ধানসী পদ্ম-সুচারুনেত্রা"॥ ইতিশব্দকল্পদ্রুমধৃত সঙ্গীত দামোদর শ্লোকঃ। অর্থাৎ কর্ণযুগে নীলোৎ-পলধারিণী ধানসী শ্যামবর্ণা, সুকেশী ও ক্ষীণ-কটীযুক্তা। ইহাঁর ঈষৎ হাসযুক্ত মুখ ও নয়ন যুগল পদ্মের ন্যায়। নাড়ীর রূপকল্পনারও অভাব নাই। যথা,—ইড়াচ শঙ্খচন্দ্রাভা তস্যা বামে ব্যবস্থিতা। পিঙ্গলা সিতরক্তাভা দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতা॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত যোগার্ণব শ্লোকঃ। অর্থাৎ ইড়া শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় আর দক্ষিণপার্শ্বস্থ পিঙ্গলা শ্বেতমিশ্রিতরক্ত-বর্ণা। স্বরের রূপবর্ণনারও অভাব নাই। হস্তীস্বরতুল্য নিষাদ নামক স্বরের শ্বেত মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত হইয়াছে। দেহাভ্যন্ত-রস্থ মাংশপেশী প্রভৃতিরও রূপ কল্পিত হই-য়াছে; যথা,—"তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভং। মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজো-ময়ং ততঃ। মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসার শ্লোকঃ। অর্থাৎ নাভিদেশে মহাপ্রভাযুক্ত বহুতেজোময় মেঘ ও বিদ্যুতের ন্যায় মণিপূর নামক চক্র আছে। উহা মণির মত ছিদ্র বিশিষ্ট, এই জন্য উহার নাম মণিপূর বলা হই-য়াছে। জ্বরেরও রূপবর্ণনা আছে, যথা,—মাহেশ জ্বরাকার। "জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণোজ্বরঃ। শিবভক্তশ্চ যোগীচ সএব বিকৃতাকৃতিঃ॥ ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা ষড়্ভুজো নবলোচনঃ। ভস্ম প্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমঃ॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভাব প্রকাশ শ্লোকঃ। অর্থাৎ মাহেশ জ্বর সর্ব্ব-রোগের জনক, দুর্ব্বার ও দারুণ। উহা শিব-ভক্ত যোগী ও বিকৃত আকার বিশিষ্ট। উহার তিন পদ, তিন মস্তক, ছয় হাত ও নয় চক্ষু। উহা কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ানক ও ভস্মরূপ অস্ত্রবিশিষ্ট। অস্ত্র শস্ত্রকেও রূপ বিশিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—খড়্গের রূপ, "নীলোৎপলসবর্ণাভং ভীক্ষ্ণদ্রংষ্ট্রং কৃশোদরং। প্রাংশুং সুদুর্দ্ধর্ষতরং তথৈব হ্যমিতৌজসং॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মহাভারত শ্লোকঃ। অর্থাৎ খড়্গ নীলবর্ণ, কৃশোদর মহাতেজা, উচ্চ দুর্দ্ধর্ষ ও তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট। এই প্রকারে সংস্কৃত ভাষাতে রাগ ও অস্ত্রের রূপবর্ণনা হইয়া তাহাদিগের পুত্রকলত্র বিশিষ্ট বংশেরও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব উপাস্য দেবতা লইয়া যে রূপক বর্ণনার চাতুর্য্য প্রকাশে শাস্ত্রকারদিগের বিশেষ আগ্রহ হই-য়াছে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সামান্য স্থলেই যখন রূপক বর্ণনাতে তাঁহারা আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন মহানুরাগ আকর্ষক প্রীতিভক্তি বিস্ফারক দেব-বর্ণনস্থলে যে উহার অতি বাহুল্য লক্ষিত হইবে, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশিত বিষয়। এই সকল

বর্ণনাতে তাঁহাদিগের প্রশংসনীয় কল্পনাশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগের আলঙ্কারিক ভাব বুঝিতে সামান্য লোক ত দূরে থাকুক, অনেক পণ্ডিতই অসমর্থ হও-য়াতে কল্পনাকেই সত্য চলিয়া তাঁহাদিগের এক দুরপনেয় প্রতীতি জন্মিয়াছে। যাঁহারা ঐ সকল কল্পনার অর্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা যে সত্যের পরমবন্ধু, এবিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আকাশ।

শূন্য অনন্ত, সুতরাং অসীম শূন্যের নামই অনন্ত দেব। অনন্ত নাগের উপর ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মাণ্ড শূন্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। বলরামকে অনন্তের অবতারস্বরূপ বলা হইয়াছে। যথা, বাঙ্গলায় অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে "আপনি অনন্তদেব ব্রজে বলরাম" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্য ধবলবৎ, সুতরাং বলরামকে শ্বেতকায় বলা হইয়াছে। আকাশে নীলবর্ণ প্রকাশ, সুতরাং বলরাম নীলাম্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ সর্ব্বভেদকারী সুতরাং ভেদকারী লাঙ্গলই বলরামের অস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলরামকে ঈশ্ব-রের সহোদর বলার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্য পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের সদৃশ।

কশ্যপ।

মহাবিদ্বান সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন যে, শূন্যের নাম কশ্যপ। আমা-দের বিবেচনায় ঐ ব্যাখ্যা প্রকৃত বোধ হয়, তবে একটী কথা এই যে, শূন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কশ্যপ বলিলে অর্থাৎ শূন্যাধি-ষ্ঠিত ঈশ্বরকে কশ্যপ বলিলে এবিষয়টী আরও বিশদরূপে বলা হয়। আর কেবল শূন্যকে কশ্যপ না বলিয়া আদি জ্যোতি প্রকাশিত শূন্য, অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্যাদি রচিত হয় নাই সেই সময়ের জ্যোতি প্রকাশিত শূন্যকে কশ্যপ নাম দিলে কশ্যপ-তত্ত্ব অধিকতর সঙ্গত হয়, যেহেতু মরীচির পুত্র কশ্যপ। মরীচি শব্দে জ্যোতি বুঝায়, কিন্তু এ জ্যোতি সূর্য্য-নিসৃত আলোক হইতে পারে না, কেন না সূর্য্য আবার কশ্যপের সন্তান। অনন্ত শূন্যকে যেমন অনন্তদেব বলা হইয়াছে, সেইরূপ আদি জ্যোতি-প্রকাশিত শূন্যকে কশ্যপ বলিলে কশ্যপ অন্তহীন নহে। কশ্যপের এক স্ত্রীর নাম অদিতি, অদিতে হইতে আদিত্য অর্থাৎ দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের যে শক্তিদ্বারা দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম অদিতি। কশ্যপের অন্যান্য ভার্য্যার নাম, দিতি, দনু, কদ্রু, বিনতা, সরমা, সুরভি, ইলা, সুরসা, ক্রোধ-বশা, তাম্রা, তিমি, পতঙ্গী, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, মুনি ও যামিনী। অর্থাৎ ঈশ্বরের যে শক্তি দ্বারা দিত্য অর্থাৎ এক প্রকার দুরাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম দিতি; যে শক্তি দ্বারা অন্য প্রকার দুরাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম দনু; যে শক্তি দ্বারা নাগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম কদ্রু; যে শক্তি দ্বারা অরুণ ও গরুড় অর্থাৎ প্রাতঃ সূর্য্য কিরণ ও প্রবল রৌদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম বিনতা; যে শক্তি দ্বারা শ্বাপদগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সরমা; যে শক্তি দ্বারা গো মহিষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সুরভি; যে শক্তি দ্বারা বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ইলা; যে শক্তি দ্বারা নরখাদক দুরাত্মা মানুষ অর্থাৎ রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির

নাম সুরগা; যে শক্তি দ্বারা সর্প উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ক্রোধবশা; যে শক্তি দ্বারা শ্যেন গৃধাদি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম তাম্রা; যে শক্তিদ্বারা জলজন্তুগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম তিমি; যে শক্তি দ্বারা পতঙ্গগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম পতঙ্গী; যে শক্তিদ্বারা অশ্বাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম কাষ্ঠা; যে শক্তি দ্বারা গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম অরিষ্টা; যে শক্তি দ্বারা অপ্সরা অর্থাৎ নানাপ্রকার জ্যোতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম মুনি; আর যে শক্তি দ্বারা শলভ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম যামিনী।

ইন্দ্র।

ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, কশ্যপ আদি জ্যোতি প্রকাশিত অন্তবৎ শূন্য। এখন ইন্দ্রতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতেছে। ইন্দ্র আবার কশ্যপ অপেক্ষাও অল্প পরিমিত শূন্য অর্থাৎ কেবল গগনমণ্ডল। তারকাবলীই তাহার সহস্র চক্ষুস্বরূপ, যেহেতুক সহস্র শব্দ অতিবহুত্ব ব্যঞ্জক মাত্র; এ প্রকার স্থলে উহাতে কেবল সহস্র সংখ্যাই বুঝায় না। ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র ও বাহন ঐরাবত এই দুইটীতে বজ্র ও মেঘ বুঝায়। ঐরাবত মেঘ, আর সৌদামিনী তাহার স্ত্রী, এই জন্য বিদ্যুৎকে ঐরাবতী বলে। ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহন, ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মেঘই ঐরাবত রূপে কল্পিত হইয়াছে। ইরা শব্দের এক অর্থ জল, ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, ইরাবৎ শব্দোৎপন্ন ঐরাবত জলবৎ অর্থাৎ জলযুক্ত কোন পদার্থ অর্থাৎ মেঘ। ইন্দ্রের এক নাম গোত্রভিৎ অথবা পর্ব্বতভিৎ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রের অস্ত্রস্বরূপ বজ্র দ্বারা পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করা যায়। ইন্দ্রের এক নাম বৃত্রহর, অর্থাৎ তিনি বৃত্র নামক অসুরকে হত করিয়াছেন। মহা বিদ্বান মোক্ষমূলার বলেন যে, বৃষ্টি নিবারক কোন অবস্থাপন্ন মেঘই বৃত্র, বজ্র দ্বারা তাহার বৃষ্টিনিবারকতা শক্তি নিরাকৃত হইয়া জল বর্ষণ হয়, এই জন্য ইন্দ্রকে বৃত্রহা বলা যায়। গগনমণ্ডল অতি মনোরম পদার্থ সুতরাং ইন্দ্রের বনও মনোহর হওয়া উচিত, অতএব ইন্দ্রের উপবনকে নন্দনকানন বলা হইয়াছে। গগনমণ্ডলের শক্তির নামই শচী। রামধনু গগনমণ্ডলে উদিত হয় বলিয়া উহার নাম ইন্দ্রধনু। বোধ হয় বিদ্যুদ্বিরহিত মেঘই উচ্চৈঃশ্রবা রূপে কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গগনমণ্ডলে অধিষ্ঠিত অবস্থায় ঈশ্বরকে ইন্দ্র বলে অথবা ইন্দ্র গগনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা ব্যাখ্যাত করিয়াছি যে, অনন্ত শূন্যের নাম অনন্তদেব, অন্তবৎ শূন্য বিশেষের নাম কশ্যপ এবং আরও অল্প পরিমিত শূন্যের নাম ইন্দ্র। কিম্বা ইহা বলিলেই বিষয়টী অধিকতর স্পষ্ট হয়, অনন্ত শূন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অনন্তদেব, অন্তবৎ শূন্য বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কশ্যপ এবং তদপেক্ষা অল্প পরিমিত শূন্যের অর্থাৎ গগনমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ইন্দ্র। অথবা ইহা বলিলে শূন্যতত্ত্ব যৎপরোনাস্তি বিশদভাবে ব্যক্ত হয় যে, কেবল অনন্ত আকাশব্যাপী অর্থে ঈশ্বরের নাম অনন্তদেব, কেবল অন্তবৎ আকাশব্যাপী অর্থে তাঁহার নাম কশ্যপ এবং কেবল গগনমণ্ডলব্যাপী অর্থে তাঁহার নাম ইন্দ্র। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় প্রশংসনীয় কৌশল সহকারে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় একটী গল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, ইন্দ্র গোতম ললনা অহল্যাকে হরণ করিয়াছিল। সামাধ্যায়ী মহাশয় ইহার অর্থ করেন যে, এস্থলে ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য, গোতম শব্দে চন্দ্র এবং অহল্যা শব্দে রাত্রি বুঝায়, সুতরাং ইন্দ্র অহল্যাকে হরণ করিল, ইহার এই অর্থ স্থির থাকিতেছে যে, সূর্য্য রাত্রি হরণ অর্থাৎ দূর করে। আমরা এ বিষয়ে সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সহিত সম্পূর্ণ রূপে এক মত নহি। আমাদিগের মতে ইন্দ্র এস্থলে গগনমণ্ডল, গগনমণ্ডল গোতম অর্থাৎ চন্দ্রের পত্নী অহল্যাকে অর্থাৎ রজনীকে হরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ তৎসহ একত্রে মিলিত হইয়াছিল। আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই লাভ হয় যে, উক্ত সমাগম নিবন্ধনই গগনমণ্ডল পাকতঃ সহস্র চক্ষুঃ অর্থাৎ তারারূপ বাহু সংখ্যক চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা প্রদর্শিত হয়, আর ইন্দ্র শব্দের সাধারণ অর্থই ঠিক থাকে। কেবল রজনী সমাগমেই গগনে তারারাজি বিরাজিত হয়। আর চন্দ্রের অনুপস্থিতি সময়েই তারকা সকল উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়।

পবন।

এখন পবন দেবতার বিষয় বলা যাইতেছে। পবন সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছুই নাই, তবে তাহার এই মাত্র বর্ণনা আছে যে, সে মৃগারূঢ় ধনুকধারী। হরিণ ও বাণ উভয়ই দ্রুতগামী, সুতরাং কবিকল্পনা পবনের বাহন ও অস্ত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যে মৃগ ও ধনুককে স্থির করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত। পবনের অর্থ এই হইল যে, ঈশ্বরকে কেবল বায়ুব্যাপী অর্থে ধরিলে তাঁহার নাম পবন। ইন্দ্র অদিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পবনকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্যে অবস্থাভেদে অবস্থান হেতু বায়ু উনপঞ্চাশ প্রকার হইয়াছে। গরুড় পবনের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় একটী গল্প আছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবন বহু চেষ্টা করিয়াও সুমেরুর কোন শৃঙ্গপাতনে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু গরুড় পাখসাটে সেই শৃঙ্গ নিপাতিত করিয়াছিল, ইহাতে পবন অপেক্ষায়ও গরুড়কে বলবান বলা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গরুড়ের অর্থ প্রবল রৌদ্র, সুতরাং উক্ত গল্পের এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে, বায়ুদ্বারা পর্ব্বত শৃঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু উত্তাপের দ্বারা উহা পর্ব্বত হইতে পৃথকীকৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। এস্থলে সূর্য্য ও মনুষ্যের প্রসিদ্ধ গল্পটী আমাদের মনে পড়িল। সূর্য্য ও পবনে পরস্পর অধিকতর বলবান বলিয়া স্পর্দ্ধা করাতে কোন বস্ত্রাবৃত মনুষ্যের বস্ত্র পরিত্যাগ করান দ্বারা তাহারা আপন আপন বল পরীক্ষা করা স্থির করিল, পবন মহা ঝড় উঠাইয়াও মনুষ্যকে বস্ত্রত্যাগ করাইতে পারিল না, কিন্তু সূর্য্য ক্রমশ উত্তাপ বৃদ্ধি করাতে তাহা মনুষ্যের অসহ্য হওয়াতে সে আপনার গাত্রবস্ত্র উন্মোচিত করিল। যাহা হউক, পবন অত্যন্ত বলবান।

সরস্বতী।

আমরা কিছু পূর্ব্বে বায়ুতত্ত্ব ব্যাখ্যানে নিযুক্ত ছিলাম। এখন বায়ু সাহায্যে উদ্ভূত বাক্যের ঈশ্বরী স্বরূপ সরস্বতী তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বাক্যের সহিত জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আছে, অতএব সরস্বতী কেবল

শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বটেন। বেদ ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যাও বাক্যের অধিপতি এই অর্থে পরমেশ্বরের নাম সরস্বতী। বেদের অধিপতি অর্থে তাঁহার নাম সাবিত্রী। সরস্বতীকে শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠিতা, শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা ও শ্বেতবীণাধারিণী বলার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যা দ্বারা মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, সুতরাং অজ্ঞান অন্ধকার স্বরূপ এবং বিদ্যা আলোক স্বরূপ, এবং আলোক স্বরূপ প্রকাশে শ্বেতবর্ণেরই প্রয়োগ আবশ্যক। সরস্বতী পুস্তক-হস্তা, কারণ পুস্তক সমূহই জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে,নিরাকার সরস্বতীর রূপ কল্পনা করিতে হইলে তাঁহাকে শ্বেতবর্ণাদি বিশিষ্টা বলিয়া কল্পনা করিলেই প্রশংসনীয় রূপক হয়। "ধর্ম্মতত্ত্বের" কোন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার বিহিত হওয়ার কারণ এই যে, সেই সময়ে বসন্তের ছায়া পড়ে এবং বসন্ত কালই সঙ্গীত বিলাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। বাস্তবিক সঙ্গীতেশ্বরীর আরাধনা বসন্তের প্রারম্ভেই হওয়া উচিত। সরস্বতী যে শাস্ত্রকারগণের মতে ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র; তাহা "বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী" ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

অগ্নি।

অগ্নিকুণ্ডমধ্যস্থ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আসনে অধিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণবৎ এবং পরিধান বস্ত্র অরুণবর্ণ, মস্তকে সপ্ত শিখা এবং পদতলে অজবাহন। অগ্নির মস্তকে সপ্ত শিখা কল্পনার কারণ এই যে, উহার সাতটী শিখা আছে, যাহাদিগকে কখন কখন সপ্ত জিহ্বা বলা হয়। এ দেশে অতি প্রাচীন কালাবধি অগ্নির অর্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে অতি বাহুল্য ভাবে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। এবং সকল যজ্ঞেই অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হইত, এই জন্য অগ্নির নাম হব্যবাহন, হুতভুক ও বীতিহোত্র হইয়াছে। পূর্ব্বে অতি যত্নপূর্ব্বক অনেকের গৃহে অগ্নি রক্ষিত হইত, তাহাতে প্রতিদিন আহুতি প্রদত্ত হইত। প্রথমত অগ্নি অতি অল্পে অল্পে জ্বলিতে থাকে, এই জন্য তাহার আসন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; অগ্নিকে অজবাহন বলার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি অতি তেজস্বী এবং ছাগলও অত্যন্ত তেজঃময় জন্তু, সুতরাং অগ্নির বাহন কল্পনা করিতে হইলে ছাগলকে উপযুক্তরূপেই নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে। অগ্নিব্যাপী অর্থে ঈশ্বরের নাম অগ্নি। স্ত্রীভাবে অগ্নির নাম স্বাহা।

সূর্য্য।

সূর্য্য রক্তবর্ণ, পদ্মহস্ত ও সপ্তাশ্ব সংযুক্ত এক চক্ররথে অধিষ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যমণ্ডলকে একটী চক্রের আকৃতিতে দৃষ্ট হয়, উহার সাতটী কিরণ আছে এবং উদয়মাত্রই পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এ স্থানে বক্তব্য এই যে, অনেকে বিবেচনা করেন আলোকে যে সাতটী বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রথমত ছারআইজাক নিউটন কর্ত্তৃক প্রিজম্ নামক স্ফটিক দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা সূর্য্যের সপ্তাশ্ব কল্পনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে, এবং এই সপ্তাশ্ব কল্পনা নিউটনের অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলব্যাপী এই অর্থে ঈশ্বরের নাম সূর্য্য।

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

কলির হিন্দুধর্ম্ম।

আচার্য্য ও শিষ্যের আলাপ।

শি। গুরুদেব, আমার গতি কি হবে? হায়, আমি যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নিতান্ত ম্লেচ্ছাচারী হয়ে পড়িছি! মন্দ অভ্যাস সকল ইচ্ছা করিলেও এখন আর পরিত্যাগ করিতে পারি না। অহো, আপনি কুলগুরু থাকিতে আমার এই দুর্দ্দশা হ'ল? আর্য্য সন্তান হয়ে কি না চণ্ডালের ন্যায় বিপথগামী হয়ে রইলাম!

আ। বাপু, সে জন্য খেদ কেন করিতেছ? তোমার ত এতে কোন অপরাধ দেখি না। ম্লেচ্ছ যখন দেশের রাজা, বিদেশীয় জ্ঞান সাহিত্য যখন বিদ্যা উপার্জ্জনের এক মাত্র উপায়, তখন এ প্রকার যথেচ্ছাচার কেনই না হইবে? অতএব শোক সম্বরণ কর, ইহারও প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে।

শি। কয়েক দিন হইতে মহাশয়ের মুখে আমাদের শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহাতে আমার চেতনা জন্মিয়াছে। কিন্তু দেব, আমরা গৃহী, পরাধীন ইংরাজ-রাজপুরুষগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা; ঋষিদের যেরূপ অনুশাসন বাক্য, তাহা কি আমার ন্যায় ব্যক্তি পালন করিয়া উঠিতে পারিবে? হায়! এমন সনাতন ধর্ম্ম আমার ভাগ্যে ঘটিল না। গীতা ভাগবতের যোগ ভক্তির সাধন কি আমা হতে সম্পন্ন হবে? হায় হায়! জীবন আমার বৃথাই চলিয়া গেল। দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে কি কোন সুবিধাজনক প্রণালী হতে পারে না?

আ। হাঃ হাঃ হাঃ! বাপু হে, তুমি দেখিতেছি নিতান্তই ধর্ম্মপিপাসু হয়ে প ড়ছ। সে জন্য চিন্তা কি আছে? আমাদের যে হিন্দুশাস্ত্র আছে, ইহা এক সমুদ্র বিশেষ। ইহাতে বৃহৎ তিমি মৎস্য হইতে সামান্য শুক্তিকা পর্য্যন্ত সমস্তই আছে। এমন উদার ধর্ম্ম কি আর হয়! এক দিকে মহোচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞান-সঙ্গত ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ সমাধি, অপর দিকে পৌরাণিক কর্ম্মকাণ্ড; যেটায় তোমার সুবিধা হয়, তাই কর্‌বে। কিন্তু বাপু, যবনান্ন কি ম্লেচ্ছভোজ্য, এ সকল ছাড়িতে হইবে। আর ত্রিসন্ধ্যা করিতে হইবে।

শি। সেই জন্যইত বিশেষ ভাবিত হয়েছি। অনেক দিনের অভ্যাস ছাড়ি কিরূপে? কুক্কুট মাংস ভিন্ন রাত্রিতে ভোজনই হয় না। প্রত্যহ ডাও ভাল লাগে না, মধ্যে মধ্যে হোটেল থেকে ব্যঞ্জনাদি আনিতে হয়। এ সকল দ্রব্যে যদি অরুচি জন্মিত তা হলে কোন ক্ষতি ছিল না, বড়ই উপাদেয় বোধ হয়। জাতিভেদ প্রথাটা কিন্তু মহাশয় মানুষকে বড় বিপদে ফেলে।

আ। সে সকল দ্রব্য কি বাড়ীতে প্রস্তুত হতে পারে না?

শি। বাড়ীতেইত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণে পারে না, যবন পাচক একজন রাখ্‌তে হয়েছে।

আ। বটে! হাঁ, কিছু কঠিন সমস্যা বটে। আচ্ছা আমি এর কোন বিধান শাস্ত্রে আছে কি না, দেখিব। বোধ হয় পাওয়া যাবে। "দ্রব্য মূল্যেন শুদ্ধতা" মনু বলিয়া গিয়াছেন। মদরিকা কি তুমি ব্যবহার করিয়া থাক?

শি। আজ্ঞে, কিছু কিছু। এখন অনেক কমিয়ে এনেছি। সেটুকুও ছাড়্‌তে পার্‌তাম, কেবল সেই লোকটীর অনুরোধে ঘ'টেউঠেনা।

আ। সে জন্য কিছু যায় আসেনা। এ সকল গুপ্ত ব্যবহাব, মনুষ্য মাত্রেরই আছে, তবে যত গোপনে হয় ততই ভাল। শাস্ত্র হতে এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ আমি দিতে পারি। তন্ত্রোক্ত সাধনে এ সমস্ত বিহিত বলেই ঋষিরা মেনে গেছেন।

শি। গান্ধর্ব্ব্য বিবাহ প্রথাটী কি শাস্ত্র-সম্মত নয়?

আ। শাস্ত্র সম্মত বটে, কিন্তু এখন অপ্রচলিত। উহাকে এখন অবৈধ বিবাহ বলিয়া ধরা যায়।

শি। তা ধরুন, মোদ্দা এতে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হয় না।

আ। না, তা কেন হতে গেল? চলন নাই এই মাত্র।

শি। তবে আমি এক দিন বক্তৃতা করিব। গীতা ভাগবত ভট্টি কুমার রঘু এ সকল এক প্রকার বেশ জানা হয়েছে। আমি বক্তৃতা করিব। লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। সর্ব্বদাই মনে ঐ চিন্তা।

আ। সাধু! সাধু! সাধু! বাপু, তোমার ধর্ম্মানুরাগ দেখে আজ আমারও চৈতন্যোদয় হ'ল। যথেষ্ট বিদ্যা উপার্জ্জন করেছ, এরূপ মতি কেনই বা না হইবে!

শি। আচ্ছা মহাশয়, প্রত্যহ তিন বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক না কর্‌লে কি হয় না? রবিবারে রবিবারে ছুটি আছে, সেই দিনত বেশ সুবিধা?

আ। সুবিধা বটে, কিন্তু শাস্ত্রে তার কোন বিধি দেখা যায় না।

শি। কেন ইংরাজেরাত রবিবারেই এ সব কাজ করে থাকে?

আ। হাঃ হাঃ হাঃ! বাপুহে, তোমরা ইংরেজি পড়ে কেবল ইংরাজি ধরণেরই কথা সব শিখেছ। ও ব্যাটারা পশুর জাত, ম্লেচ্ছ, ধর্ম্ম কর্ম্ম কি ওরা কিছু জানে? আমাদের দেখ মনু বলেছেন, খেতে শুতে সব কালে ধর্ম্ম। আহার পানের ন্যায় প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা বড় প্রয়োজন।

শি। তাত বুঝ্‌লাম, কিন্তু হয়ে উঠে কৈ! সকালে উঠ্‌লেই বেলা আট্‌টা বাজে। তার পর আধ সিদ্ধ দুইটী কুক্কুট ডিম্ব এবং চা না খেলে প্রাতঃকৃত্যাদি হয় না। তবে প্রাতঃসন্ধ্যা কিরূপে করি বলুন?

আ। তোমরা বন্য কুক্কুট কেন ব্যবহার কর না, সেত আমাদের শাস্ত্রের অভিপ্রেত! সে যা হোক, প্রাতে যদি না পার, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশ বার গায়ত্রী জপ করে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা এবং পূজাদি করিবে।

শি। সেও বড় অসুবিধা। স্নানের পর আহার; তার পরেই আফিসে যাওয়া, ইহার মধ্যে আর তিলার্দ্ধ সময় নাই। যেটুকু আছে তা পান তামাক খেতেই ফুরিয়ে যায়।

আ। আচ্ছা তাও যদি না ঘটে, তবে কার্য্যাবসানে সন্ধ্যাকালে জপ ধ্যান চিন্তা করিবে?

শি। হা ঠাকুর! আপনারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, কিছুত সংবাদ রাখেন না। আফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তার পর আর কি মনস্থির হয়? বরং তখন একটু সুরাপানে বিশেষ উপকারিতা আছে। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি হয়। তখন দুই পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ সালাপ কত্তেই ঘুম পায়।

আ। তাইত, তোমাদের উপযোগী ধর্ম্ম পাওয়া বড় কঠিন দেখিতেছি। আচ্ছা শাস্ত্র অন্বেষণ কর্‌ব, বিধান থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। মনু ত অনুসন্ধানের কিছুই বাকী রাখেন নাই।

শি। যেমন করেই হউক, আমার গতি করিতেই হইবে। আহা, এমন সনাতন ধর্ম্ম আমি পালন করিতে পারিব না! তা'হলে আর বেঁচে সুখ কি? হতভাগ্য পাষণ্ডেরা এমন হিন্দুধর্ম্মকে লোপ করিতেছে? আহা! আর্য্য ঋষিরা বনের ফল পাতা খেয়ে কষ্টে শাস্ত্র রচনা করে গেলেন, বিধর্ম্মী পাজি ব্যাটারা সব নষ্ট করে ফেল্‌লে! এ দুঃখত আর সহ্য হয় না। হে বশিষ্ঠ বাল্মীকি, হে শুক যাজ্ঞবল্ক্য, তোমাদের অবমাননা আর যে সহ্য করিতে পারি না দেব! পাষণ্ড নাস্তিকদিগকে তুমি চূর্ণ কর! হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ দশা আর যে সহ্য হয় না। হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া গেল! হিন্দুকীর্ত্তি লোপ হবে, আমরা বেঁচে থাকতে? হায়! হায়! বিন্দু বিন্দু শোণিতে হৃদ্দমনি, করে কি তাঁদের মান রাখিতে পারে, কত হৃদয়! বলি ও পাষাণ হৃদয়! এখনও তুমি দ্বিধা হলে না? (মূর্চ্ছা ও পতন) শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

জাতীয় আন্দোলন।

(প্রথম প্রস্তাব)

"He (Joseph Mazzini) was of those who recognise no law but that of conscience, and recur for aid to none but God." Memoir.

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে আন্দোলনের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত এই আন্দোলনের ভিতরে ভারতের ভাবী উন্নতির জীবনী শক্তির বিকাশ-প্রাপ্ত অঙ্কুরের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন; আবার কোন কোন পণ্ডিত এই বাহ্য-বিকাশ প্রাপ্ত হৃদয়-শূন্য আন্দোলনে হৃদয়ে ঘোরতর যাতনা অনুভব করিতেছেন, এবং সময়ে সময়ে হৃদয়ের বেদনা জলদ গম্ভীর স্বরে জগতের নিকট প্রচার করিতেছেন। জীবন-শূন্য আন্দোলন বায়ু-প্রক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া যায়; আর জীবন্ত জাতীয় আন্দোলন দেশকে স্বর্গ করিয়া দেয়। আন্দোলন—ঘাত প্রতিঘাত ভিন্ন মানুষ, মানুষ হয় না। আন্দোলন জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। প্রথম সোপান গাঁথিবার সময়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ভারতে আন্দোলন উঠিয়াছে, সুখের কথা। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে পরিণামে ইহাতে কুফল ফলিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আন্দোলন সাময়িক হুজুগে পর্য্যবসিত হইলে মঙ্গলের আশা থাকে না। সেই আন্দোলন চাই, যাহাতে হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়।

আমরা পরাজিত জাতিই হই, আর যাহাই হই, আমাদের রাজা ইংরাজ—সেই সমুদ্র-বেষ্টিত ব্রিটেনিয়ার রাণী ভারতের ভাগ্যদেবী, —বলে, ছলে, বা কৌশলে ইংলণ্ডের প্রতাপের বিজয়ভেরী ভারত-চিদাকাশে আজ নিনাদিত —গম্ভীর স্বরে, অতি গম্ভীরে! ইংলণ্ডের রাণী আজ ভারতেশ্বরী। এই জন্য কেহ মনে করিবেন না, ভারতেশ্বরীই ইংলণ্ডেশ্বরী। ভা-

রত্নেশ্বরী ভারতের সম্রাজ্ঞী—ভারতের রক্ষা-কর্ত্রী—পালয়িত্রী—ধ্বংশকর্ত্রী; ইংলণ্ডেশ্বরীর অন্য অর্থ, প্রজার সমবেত শক্তির ঘনীভূত সমষ্টি বা মিলন। একই জিনিষ দুই প্রদেশে দুই রকম—এক দেশে প্রজা-শাসক বা প্রজা-নাশক; আর এক দেশে প্রজা দ্বারা শাসিত বা রক্ষিত। এক দেশে একই শক্তি অতুল মহিমান্বিত—প্রতাপান্বিত [illegible] লের উপরে উন্নীত, আর এক [illegible] লের নিম্নে—সকল প্রজার সমবেত [illegible] প্রথাটী রক্ষিত বা জীবিত। এক দেশে রাজ্ঞী আপনিই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন, আর এক দেশে রাজ্ঞীর দ্বারা প্রজা সমষ্টি ক্ষমতা বা প্রভুতা বিস্তার করিতেছে। এক দেশে রাজ্ঞী প্রজার আশ্রয়, আর এক দেশে রাজ্ঞী স্বয়ং প্রজার আশ্রিত। ইংলণ্ডের কোটী কণ্ঠ, কোটী হৃদয় মিলিত হইলে আজ ইংলণ্ডেশ্বরীর সিংহাসন পৃথিবীর চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারে, আর এক দেশে মিলিত কোটী কণ্ঠকে, কোটী হৃদয়কে সম্রাজ্ঞী মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতে বিলীন করিতে পারেন। সংক্ষেপে এক দেশে রাজার হাসিতে প্রজা হাসে, অন্য দেশে প্রজার হাসিতে রাজা হাসে। এমনি অবস্থা। ভারত আর ইংলণ্ডকে যাঁহারা এক চক্ষে দেখেন, আমাদের মতে তাঁহারা দৃষ্টি শক্তি থাকিতে অন্ধ। এই দুই দেশের অবস্থা কেন পৃথক, এক কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াও কেন ভিন্ন দশা-প্রাপ্ত, ইতিহাসের মূলে সে তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়া যাঁহারা কেবলই ইংলণ্ডের আন্দোলন ভারতে আনিতে চাহিতেছেন,—তাঁহারা যে একদেশ-দর্শী, সে কথা আর ভাষায় ব্যক্ত না করিলেও চলে। ইংলণ্ড আজ ইংলণ্ড, ভারত আজ ভারত। ভারতকে আজ উন্নত করিতে হইলে, যে সাধনায় ইংলণ্ড সভ্য জগতের শির্ষস্থানীয়, ইংলণ্ডের সেই প্রকৃষ্ট সাধনার ছবি ভারতের সম্মুখে ধরা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা ভারতে আগমন করেন, এই জন্য তাঁহাদিগের দায়িত্ব অতি মহৎ। তাঁহাদের স্বভাবের কালিমায় ভারতের অঙ্গ মলিন হইলে, সে মলিনতা বিধৌত করিবার আর উপায় নাই। আদর্শ স্থানীয় শিক্ষা গুরু মন্দ হইলে, ছাত্রের জীবন কলুষিত হইবেই। ইংরাজচরিত্রের সামান্য ত্রুটিতে ভারতের মহা অনিষ্ট হইতে পারে, কারণ ইংলণ্ড ভারতের অদর্শ স্থানে দণ্ডায়মান। আর একটী কথা, ইংরাজ চরিত্রের আদি অন্ত ভারতের সম্মুখে থাকে না, কারণ পাঁচ সাত বৎসর পরে সকলেই দেশে গমন করে। যে কয়েকদিন ভারতে ইহাঁদিগকে দেখা যায়, সে কয়েক দিন কেবলই যদি স্বভাবের কালিমাময় অংশ প্রকাশ পায়, তবে তাহাতে দেশের অপরিশোধ্য অপকার হয়। এই জন্য ইংরাজ চরিত্রের দোষের কথা লইয়া সর্ব্বক্ষণই আলোচনার প্রয়োজন। তাহাতে ইংরাজগণ সতর্ক হয়—আমরাও সতর্ক হই। দোষ আর সংক্রামিত হইতে পারে না। কিন্তু আলোচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্ব্বদাই সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য। আপনাকে ভুলিয়া—দেশকে ভুলিয়া বৃথা হুজুগে মত্ত হওয়া কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ নিজের চরিত্র, দায়িত্ব ও দেশের অবস্থা ভুলিলে কোন আন্দোলনেই ফলের আশা থাকে না। মানুষ ভিন্ন পশুর কথায় কে কাণ দেয়? বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে যে প্রকার আন্দোলন চলিতেছে, ভারতে কখনই তাহা চলিতে পারে না। ইংলণ্ডে যে শক্তি, যে বীর্য্য, যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান, যে দর্শন, যে কাব্য, যে

জীবন, যে হৃদয়, যে বিক্রম, যে প্রভুতা, যে ধর্ম্ম, যে নীতি, যে ভারতে তাহা নাই, সে ভারত আজই ইংলণ্ডের সমান হইবে? কখনই সম্ভব নহে। এক জাতীয়ত্বের গুণে ভারতের সম্রাজ্ঞী ইংলণ্ডের রাণীই রহিলেন, সম্রাজ্ঞী হইতে পারিলেন না। কঠোর সাধনায় বহু শতাব্দী পরে ইংলণ্ড আজ সে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, বিনা সাধনায়, বিনা চেষ্টায় ভারত তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মহত্ত্ব ছিল, বীর্য্য ছিল, শক্তি ছিল, জ্ঞান ছিল, ধর্ম্ম ছিল, চরিত্র ছিল, তাহাতে কাপুরুষ, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ভারতের কি? যাহা ছিল, তাহা স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে—সে স্মৃতিতে অহঙ্কারী হইও না, অনুতপ্ত হও, সিংহের ঔরসে শৃগাল ভাবিয়া ব্যথিত হও। যে জাতিতে জনব্রাইটের ন্যায় শত শত মহাত্মা এই মুহূর্ত্তে জীবিত, সে জাতির সাধনার বল স্থির চিত্তে চিন্তা করিতেও আমাদের হৃদয় অসমর্থ। সামান্য মূর্খ কৃষক নিউটনের জ্ঞানকে ধারণা করিতে পারে না। ইংলণ্ডের সকল মহত্ত্ব আজও ইংলণ্ডে, ভারতে তাহার অল্পই প্রতিরূপ আছে। সকলই যদি ইংলণ্ডে রহিল, তবে কেবল জীবনহীন, শক্তিহীন আন্দোলনে ভারতের কি হইবে? আন্দোলনের পূর্ব্ব শক্তি অগ্রে সঞ্চয় করিতে হইবে,—অগ্রে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে,—অগ্রে চরিত্র লাভ করিতে হইবে—অগ্রে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে ব্যক্তি আন্দোলনে রত, তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁহার চরণ ধূলি মাথায় করি। কি করিলে মনুষ্যত্ব ভারতের ভাগ্যে সম্ভব হইবে, সে কথা পরে বলিব। এক্ষণ এই মাত্র বলি—ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতি লইয়া যে আন্দোলন চলিয়াছে—উহা প্রকৃত আন্দোলন নহে, উহা নিন্দাপ্রচারনীতি,—এই জন্য কলুষিত, নিন্দিত, সভ্য সমাজের অনাদৃত। তোমাদের ঘরের দোষ বা ত্রুটি লইয়া যখন আন্দোলন করিতেছি, সেই সময়ে আমার গৃহ যদি তদপেক্ষা অধিকতর নিন্দার জিনিষ হয়, তবে আমার সে আন্দোলনকে তোমরা কি বলিবে? যে আপনি দুর্দ্দমনীয় বিপুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, পশুর ন্যায়, কত সতীর সতীত্ব,—কার্য্যে এবং কল্পনায়, নষ্ট করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেছে না, সে কোকিলামুখের হৃদয়-বিদারক কাহিনী লইয়া ওয়েবের বিরুদ্ধে আর কেমন করিয়া আপন স্বর তুলিবে?—ইহা অসম্ভব। সে স্বর তুলিলেও তাহা হৃদয়ের স্বর নহে—তাহাতে শক্তি নাই, তাহাতে পদার্থ নাই। শক্তিহীন স্বর বায়ুতে মিশাইয়া যায়—মানব-হৃদয়ে তাহার কোন আধিপত্য নাই। আমার কর্ত্তব্য আমি করিব না, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করিতেছ না বলিয়া তোমাকে তিরস্কার করিব; এ কথার মূল শক্তিহীন, জীবন হীন। তোমার কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা অধিক, সুতরাং তুমি কর্ত্তব্য পালন করিতেছ না বলিয়া অনেকের অপকার হইতেছে, এ কথা তাহার বলিবার কি অধিকার, যে আপনি কর্ত্তব্য পালনের শক্তি পাইয়াও কিছুই কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না? আপনাকে সংশোধন করিতে কাহার অধিকার বা শক্তি নাই? আপন পরিবারকে উন্নত করিতে বা কাহার শক্তি নাই? অথচ এই বিস্তৃত ভারতে আজ গণনা করত, কত জন জিতেন্দ্রিয়—কত জন চরিত্রবান লোক আছেন!! সহরে যাও, নগরে যাও, পল্লিতে যাও, বাজারে যাও,—কোকিলামুখের

ওয়েব-কাহিনীর ন্যায় জঘন্য ঘটনা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক স্থানে ঘটিতেছে। একের ভাল অন্যের চক্ষে সয় না—এক জন অন্যকে অপদস্থ করিবার জন্য কত মিথ্যা নিন্দা প্রচার করিতেছে—এক জন আর এক জনের বুকে ছুরী হানিতেছে,--কত জাল, কত জুয়াচুরি, কত বদ্‌মায়েসী, কত ভ্রূণ হত্যা—কত ব্যভিচার—কত নরক ভারতের বায়ুকে কলুষিত করিতেছে, একবার স্মরণ কর! যে দেশে কলুষিত-চরিত্র পুরুষের অত্যাচারের ভয়ে কুলস্ত্রী ঘরের বাহির হইতে পারে না—ভয়ে জড়সড় হইয়া গৃহের কোণে সতীত্ব ধনকে অতি কষ্টে রক্ষা করে, সে দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চরিত্রহীনতার নিন্দা অগ্রে প্রচার করিবে,না অগ্রে দেশের লোকদিগকে চরিত্রবান করিতে চেষ্টা করিবে? অন্যের নিন্দা প্রচারে সুখ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মহত্ত্ব কি,পৌরুষত্ব কি? ওয়েব যে অপরাধে অপরাধী—ভারতের কোটী কোটী সন্তান সেই অপরাধে অপরাধী। যদি সংশোধনের কথা বলিতে চাও--অগ্রে এই কোটী সন্তানের সংশোধনের চেষ্টা করা কি উচিত নহে? আর যদি শাসনের কথা বল, তবে এই কোটী সন্তানের শাসন প্রণালী অগ্রে উদ্ভাবন কর না কেন? বর্ত্তমান সময়ে সকল আন্দোলন স্বদেশবাসীদিগকে লইয়া হওয়া উচিত। তুমি দেশের হিতৈষী, অগ্রে তুমি আপনাকে সংশোধন কর, পরে দেশকে সংশোধন করিও। আন্দোলন করিতে চাও—দেশের দোষ লইয়া আন্দোলন কর। অন্য দেশীয়ের দোষের কাহিনী প্রচার করিয়া কলুষিত দেশকে আরো নিরাশার সাগরে নিক্ষেপ করিও না। অন্যের মহত্ত্ব স্মরণে আত্মা উন্নত হয়, দোষ স্মরণে আত্মা অবনত হয়। ইংরাজের পশুত্ব স্মরণে ভারত কখনও উন্নত হইবে না; হয় ত,দেবত্ব স্মরণে হইবে। দেবত্ব স্মরণে মানুষ দেবতা হয়। ইংরাজের পশু ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা থাকুক, মহত্ত্বকে কোল পাতিয়া লও। যদি কেবলই পশুত্ব দেখ—তবে অগ্রে তুমি মানুষ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে কথা বল। অন্ধ অন্ধকে চালাইতে পারে না। ভারতে যদি আদর্শ না পাও, বিদেশের ম্যাট্‌সিনিকে স্মরণ কর, ব্রাইটকে স্মরণ কর, —মানুষের উচ্চ আদর্শ পতিত দেশের ঘরে ঘরে ধরিয়া দেখাও, আমরা কি, আর ইঁহারা কি? মানুষ দেবত্ব লাভে সমর্থ, এই কথা প্রচার কর। ইংরাজকে চরিত্রহীন দেখিলে হৃদয় বিষাদে মলিন হউক, সমবেদনার সমরানল গৃহে২ জ্বলিয়া উঠুক, অত্যাচার নিবারণের মঙ্গলময়ী শক্তি হৃদয়ে তবে ত সঞ্চিত হইবে! তবে ত হৃদয়ে হৃদয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠে সেই শক্তিস্ফুলিঙ্গ দীপ্তি পাইবে।—আমরা দেবতা হইব, এই প্রতিজ্ঞার রোল গৃহ ভেদ করিয়া ভারত-আকাশকে পূর্ণ করুক। আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলে অন্যের পশুত্ব অনায়াসেই সংশোধন করিতে পারিব। আজ যে আমাদের কথায় কাজ হয় না, ইহার কারণ, আমরা চরিত্রহীন, একতা-বিহীন, নির্জ্জীব জাতি; নচেৎ কে প্রতিবাদকে অবহেলা করিতে পারে? পরীক্ষায় শিক্ষা লাভ কর, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিলে কেহ আর ভারতের কথায় কর্ণপাত করিবে না। আমরা আপনারা মানুষ হইলে অত্যাচার যে অনেক কমিয়া যাইবে, ইহার ২টী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথমত—শুনা যায়,সাহেবেরা মফঃস্বলের হাকিমি পাইয়া যদৃচ্ছা ক্রমে লোকের প্রতি অত্যাচার করে। অত্যাচার করে!—কারণ

আমরা পশু। আমরা অত্যাচারের ক্ষেত্র যদি না হইতাম, তবে অত্যাচার কেমনে করিত? অত্যাচার করে, কারণ আমরা একতাবিহীন, নীতিবিহীন, সুতরাং দুর্ব্বল, —অধীনতা স্বীকার করিয়া করিয়া রক্তমাংস জড়ের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। নচেৎ সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে এক জন সাহেব সতীর সতীত্ব নষ্ট করে, বা কাহারও শরীরে বেত্রাঘাত করে—ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, একথা সংবাদপত্রের স্তম্ভে পড়িতে হইত না। সংবাদ পত্রে সে সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মানব সমষ্টির সমবেত বিবেক আততয়ীর মস্তকে লগুড় মারিয়া অত্যাচারের প্রতিবিধান করিত। এক জন সাহেব যে স্থানে, সহস্র জন স্বদেশী সে স্থানে; অথচ শুনা যায়, সাহেবেরা অত্যাচার করে!!—দোষ স্বদেশবাসীর—না দোষ সাহেবের?—সংবাদ পত্রে সাহেবের অত্যাচারের ক্রন্দনকাহিনী শুনিতে আর ইচ্ছা করে না!

দ্বিতীয়ত,—অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজ বাণিজ্য করিবার ছলনে ভারতের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভারতকে ঘোরতর দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। এ কথায় অনেক সত্য আছে—ভারত যে আজ শূন্যগর্ভ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু দোষ কাহার? সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। দুটী ফুল এক রকম নয়, দুটী বৃক্ষ এক রকম নয়, দুটী নক্ষত্র এক রকম নয়; দুটী পশু, দুটী পক্ষী, দুটী পুরুষ, দুটী স্ত্রী এক রকম নয়। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী—পৃথিবীতে কোটী কোটী সৃষ্ট বস্তু সকলই পৃথক পৃথক! কেন পৃথক পৃথক হইল? দুটী কারণ। একটী কারণ,—স্রষ্টার স্বরূপের পূর্ণবিকাশ বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিতে প্রতিফলিত, এক একটী বস্তু তাঁহার এক একটী ভাব প্রকাশ করিতেছে। আর একটী কারণ—প্রত্যেকপ্রত্যেকের মহত্ত্ব বুঝিবে, প্রত্যেকের বিশেষত্ব গ্রহণ করিবে,—প্রত্যেকে বিশ্বজনীন প্রেমে আবদ্ধ হইবে। তুমি ও আমি যে পৃথক, ইহার এক কারণ, বিশ্বজননীর এক ভাব তুমি প্রকাশ করিতেছ, আর এক ভাব আমি প্রকাশ করিতেছি; আর একটী কারণ,তুমিও আমার নিকটে শিক্ষার কিছু পাইবে, আমিও তোমার নিকটে কিছু পাইব; সুতরাং তোমাকে ও আমাকে মিলিতেই হইবে—আদান প্রদান করিতেই হইবে—পরস্পরকে পরস্পরে উপকারী বন্ধু জানিয়া ভালবাসিতেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু, প্রত্যেক পরমাণু বিশেষত্বে পরিপূর্ণ! কাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কাহাকে রাখিবে?—সকলেই মঙ্গলময় শিক্ষা-গুরু হইয়া যেন বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রদানের জন্য জগৎকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। ফুলকে ভালবাসিবে, ফলকেও আদর করিবে, চন্দ্রকে ভালবাসিবে, সূর্য্যকেও আদর করিবে,—কারণ, সকলের নিকটেই বৈচিত্র্যময়ী বিশেষত্ব শিক্ষার জন্য রহিয়াছে। সুখেও শিক্ষা, দুঃখেও শিক্ষা, সম্পদেও শিক্ষা, বিপদেও শিক্ষা। দুঃখে যাহা শিখি, সুখে তাহা শিখি না; সুখে যাহা শিখি, দুঃখে তাহা পাই না। সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য এই—প্রত্যেক অণু প্রত্যেক পরমাণুর বিশেষত্ব লইবে,সকলে সকলকে ভালবাসিবে—সকলে সকলের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিবে;—যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করিবে। এই সংসার মঙ্গলময় উদারতার রাজ্য—ঘৃণা বিদ্বেষের রাজ্য নহে। এখানে

চণ্ডাল ব্রাহ্মণ একই পদবীতে উপবিষ্ট—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু পক্ষী সকলেই সকলের শিক্ষা-গুরু। জগতের বিশেষ ভাব এই—যাহা দিবার, দেও; যাহা নিবার, তাহা নেও। যদি মানুষ হও, জগতের প্রত্যেকের বিশেষত্ব গ্রহণ কর, নচেৎ তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতকে সম্পূর্ণ করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই,—ইংলণ্ডকেও করেন নাই। আমেরিকা, আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—বিধাতার চারি প্রদেশ চারি প্রকার। এই চারি দেশই বিশেষত্বে পূর্ণ—বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, সাগর, প্রান্তর—পশু, পক্ষী, নর, নারী এই চারি প্রদেশের এক প্রকার নহে;—কত বিশেষত্বে, কত বৈচিত্র্যে পূর্ণ! বিধাতা যেন বলিতেছেন—আমেরিকা আসিয়ায় যাও, ইউরোপ আফ্রিকায় যাও, আফ্রিকা আমেরিকায় যাও, আসিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় যাও। সেই আদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া পৃথিবীর কত মনুষ্য, স্বজন পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কত সাগর কত পর্ব্বত পার হইয়া দেশ বিদেশে যাইতেছে—কত ভাব গ্রহণ করিতেছে—কত ধন রত্ন লাভ করিয়া বড় মানুষ হইয়া দেশে ফিরিতেছে। পৃথিবী এই প্রকার পরস্পরের বিশেষত্ব শিক্ষা করিয়া আজ জ্ঞানে,ধনে মানেও সভ্যতায় কত উন্নত হইয়াছে। ইংলণ্ড ভারতের বিশেষত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছে, বিশেষত্ব গ্রহণ করিতেছে—টাকা ও ছার জিনিষ, কত মহামূল্য রত্ন লইয়া দেশে ফিরিতেছে; দেশকে শূন্যগর্ভ করিতেছে। তাহাদের কর্ত্তব্য ত তাহারা করিতেছে, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য আমরা কি করিতেছি? তাহারা কত পাহাড় পর্ব্বত, সাগর উপসাগরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারতের বিশেষত্ব লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমরা বিদ্বেষে জ্বলিতেছে, কিন্তু ইংলণ্ডের বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে আমাদিগকে কে নিষেধ করিয়াছে? ইংলণ্ড ভারতে আসিয়াছে, ভারত আজ ইংলণ্ডে গেল না কেন? ইংলণ্ড ভারতের রত্ন লইয়া গেল, ভারত কেন বিদেশের রত্ন আনিল না? স্বাধীন বাণিজ্যের দ্বারা মুক্ত। ভারত দরিদ্র হইল, এই চীৎকার করিতেছ, ভাই, তুমি ভারতের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য সাগর পার হইয়া ইংলণ্ডে, আমেরিকায় যাও না কেন? তাহা তুমি পার না, কারণ, জাতিভেদের পূজা তোমার হৃদয়ের বড় প্রিয় জিনিষ!! ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ইংরাজ নহে; ভারতের জাতিভেদ প্রথা। দোষ ইংরাজের নহে, দোষ আমাদের। আমরা গোলামী করিব, তবুও বহির্বাণিজ্য করিব না। আমাদের কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য ভারতকে যে দারিদ্র্য-পীড়নে কাতর হইতে হইয়াছে, সে দোষ ইংরেজের মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে;—তাহাতে উদারতা নাই—বিশ্ব প্রেমের ভাব নাই,—মনুষ্যত্বের চিহ্ন নাই। আমাদের দোষেই ভারত আজ দরিদ্র।

উপরে যে সকল কথা বলা হইল,তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়,—অগ্রে আমাদিগকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত হইতে হইবে—জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সাধনের জন্য রাজনীতির আন্দোলন ও সমাজনীতির আন্দোলন একই সময়ে হওয়া উচিত। কিন্তু এ দুই আন্দোলনের পূর্ব্বে ধর্ম্মান্দোলন একান্ত প্রার্থনীয়। ধর্ম্মের কথা দূরে রাখিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন মানুষকে মানুষ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস আছে,ধর্ম্ম না থাকিলেও সমাজ ও রাজা মনুষ্যকে সৎপথে রাখিতে পারে। বাস্তবিক কি এ কথা সত্য? সমাজ বা রাজা মানবের কোন্ স্থান দর্শনে সক্ষম?—বাহিরের কার্য্য ভিন্ন অন্তরের কিছুই সমাজ স্পর্শও করিতে পারে না—ভাল কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারে না,মন্দ কার্য্যের জন্যও তিরস্কার বা শাসন করিতে পারে না। মনুষ্যের মহত্ত্ব কোথায়?—তাহা অন্তরে, না বাহিরে?—এক জন লোক ভাল কার্য্য করিল, ঐ কার্য্যটী তাহার মহত্ত্ব নহে, মহত্ত্বে পরিচয় মাত্র; ঐ কার্য্যের যে ইচ্ছার অঙ্কুর হৃদয়ে জন্মিয়াছে, তাহাতেই তাহার মহত্ত্ব। একজন লোক সৎকার্য্য করে না, আজন্ত হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে সৎ কার্য্যের ইচ্ছা দিলে সেই লোক কি মহৎ নহে?—আবার আর এক দিক দেখ, ওয়েব ও আমি। ওয়েবের কার্য্য অতি দূষিত, আমিও যদি এই মুহূর্ত্তে পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল নয়নের বিষময় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি; যদি এখনই তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া থাকে, তবে আমি কি অসৎ—নরাধম,পাষণ্ড নহি? মানবের মহত্ত্বও হৃদয়ে, পশুত্বও হৃদয়ে;—দেবত্ব সৎ ইচ্ছায়, পশুত্ব অসৎ ইচ্ছায়। ইচ্ছাতেই এ রাজ্যের পরীক্ষা। অন্তরকে গরলময় করিয়া বাহিরে সুধা মাখিয়া যে বেড়াইতেছি—অন্যের চক্ষে ধূলি দিয়া জয় ডঙ্কা বাজাইয়া ভবের বাজারকে আমি যে প্রতিধ্বনিত করিতেছি, আমাকে কি তুমি ভাল বলিবে, না মন্দ বলিবে? অন্যের দ্রব্য দেখিলেই চুরি করিতে ইচ্ছা হয়, অন্যের ভাল অবস্থা দেখিলেই হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হয়, অন্য সতী দেখিলেই রিপুর উত্তেজনা আরম্ভ হয়, এমন যে লোক, সে মানবাকারে পশু। অন্তর যাহার গরলময়,এমন পশুর শাসন কে করিতে পারে? বাহিরের ঘটনা ভিন্ন রাজা বা সমাজ মনুষ্যকে শাসন করিতে পারে না, অথচ সমাজে কত জঘন্য লোক বর্ত্তমান। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—পৃথিবীর অতি অল্প লোকের শাসনই সমাজ বা রাজা করিতে পারেন। এই জন্যই দেখা যায়, রাজার শাসন যতই বৃদ্ধি হয়, ততই গোপনে পাপ-কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয়—কাহাকে ধরা না পড়ে তাহারই চেষ্টা হয়, অন্তর শোধন করিতে চেষ্টা হয় না। কারণ হৃদয়ে যাহার পাপ-স্পৃহা বর্ত্তমান, সে কেমন করিয়া তাহাকে দমন করিবে? সে শক্তি কোথায়! সে বল কে দেয়?—সে উপদেশই বা কোথায় পাওয়া যায়? এই জন্য দেখা যায়, রাজার শাসন তীক্ষ্ণ হইলেও দেশের পাপস্রোত নিবারিত হয় না;—বরং আইনের জটিলতা ও কঠোরতার সহিত পাপের স্রোতও প্রখরতর হইতে থাকে। রাজার শাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানুষ যখন পাপস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল, তখন সামাজিক শাসনও শিথিল হইয়া পড়িল। কারণ সমাজের সকলেই যখন একদশাগ্রস্ত হয়, তখন কে কাহাকে শাসন করিবে? শাসনের শক্তি তখন আর মানুষের থাকে না। দোষী পিতার শাসনকে বালক তখন উপেক্ষা করে, দোষী ভ্রাতার আজ্ঞাকে ভ্রাতা তখন লঙ্ঘন করে; এই প্রকারে সমাজ ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল দশায় উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান ভারতেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামে যাও, নগরে যাও, পল্লীতে যাও,—রাস্তা, ঘাট, বাজার,যেখানে ইচ্ছা যাও, দেখিবে—মনুষ্যের ব্যবহারে আর মনুষ্যত্ব নাই—কেবলই পশুত্ব—ব্যভিচার,স্বেচ্ছাচার,

অনাচার, কদাচারের স্রোত কেবলই চলিয়াছে। রাজা দোষীকে ধরিতে পারে না—কারণ সাক্ষী জোটে না, সকলই মিথ্যা ও প্রতারণাময়। দোষী আদালতে মিথ্যা সাক্ষী ও ঘুষের দ্বারা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইতেছে। সমাজের সকল লোকই যখন পশুত্ব প্রাপ্ত, তখন পুলিসই বল আর বিচারালয়ই বল, এ সকল স্থানে আর সুবিচারের আশা থাকে না। মকর্দ্দমার বিচার ভাল হয় না, জিলার এক জন ইংরাজ বিচারকের কেবল দোষ নহে,—দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের। দেশী লোকের দোষে ধর্ম্মাধিকরণও বর্ত্তমান সময়ে অধর্ম্মের ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরের পাপ ইচ্ছা ত কাহারও ধরিবার শক্তিই নাই, বাহিরের বদ্‌মায়েসী ও জঘন্যতা এই প্রকারে সমাজ ও রাজার চক্ষুকে ফাকি দিতেছে! এক্ষণ দেশের আশা কোথায়? আন্দোলন চলিয়াছে বটে, কিন্তু সে আন্দোলনে কি কিছু ফলের আশা আছে? রাজনীতির আন্দোলন চাই,না প্রজা-নীতির প্রয়োজন? যাঁহারা আন্দোলন করিবে, তাহাদেরও অধিকাংশ নীতিহীন। দুঃখের কথা বলিব কি, দেশের কোন কোন দেশহিতৈষী সংবাদপত্রের সম্পাদকের বাড়ী পর্য্যন্ত মদ ও বেশ্যায় পূর্ণ! আমি হাহাকার করিতেছি, তুমিও করিতেছ—কিন্তু আমরা উভয়েই ঐ দশাগ্রস্ত—কলুষিত হৃদয় লইয়া ঘাস করিতেছি। ইংরাজের চক্ষের তৃণ দেখাইয়া দিতেছি, আমার চক্ষের তৃণ দেখিতেছি না। ইংরাজের দোষ দেখিতেছি, স্বদেশীর দোষ দেখিতেছি না; আমার নিজের দোষের কথাও ভাবিতেছি না। এই কারণে আন্দোলনও এক দেশদর্শী হইতেছে—বাহির দেখিয়া বাহির ধরিতে যাইতেছে, হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, হৃদয়ের ভাব ধরিয়া টানিতে পারিতেছে না। হৃদয়কে স্পর্শ কে করিতে পারে? হৃদয়কে সংশোধনই বা কে করিতে সক্ষম? একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন এস্থানে আর সকল শক্তি পরাস্থ। হৃদয়কে বলীয়ান করিতে ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ নাই—সংস্কৃত করিতেও ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ নাই। দোষের বিচারক আছেন, পরকাল আছে, ইহকালই লক্ষ্য নহে—ইন্দ্রিয়াদি দুদিনের, পৃথিবীর সুখ স্পৃহা দুদিনের, এ চিন্তা ভিন্ন মানুষ কখনও অন্তরকে শুদ্ধ রাখিতে পারে না। পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস বিনে মানুষ পবিত্র হইতে পারে না। বিবেকনির্দ্দেষ্ট আদেশ পালন ভিন্ন মানুষ সৎ হইতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্তরকে জীবন্ত করিতে,পবিত্র করিতে পৃথিবীতে আর কোন শক্তি নাই। এমন বল, এমন শক্তি আর কোথাও মিলে না। ধর্ম্মকে ভুলিয়া, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যে সমাজ চলিতে চাহে, সে সমাজ,এই কারণে, কখনও নির্দ্দোষ পুণ্য, শান্তি, পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয় না। পূর্ব্ব কালে ভারতে যে পবিত্রতা ছিল, সে কেবল ধর্ম্মভাব ছিল বলিয়া। সমাজ ও রাজার হৃদয় তখন ধর্ম্মে পূর্ণ ছিল; তখন দেশের লোক ধর্ম্মের অনাবিল পবিত্র শাসনে শাসিত ছিল। লোক ধর্ম্মের ভয়ে সৎ থাকিত, লোক ধর্ম্মের চিন্তায় তখন পবিত্র থাকিত। প্রজা ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া রাজাকে মানিত, রাজা ধর্ম্মের প্রতিনিধি বা অবতার হইয়া প্রজার বিচার করিতেন। প্রজার ভালবাসা রাজা পাইতেন, রাজার সৎইচ্ছা প্রজার মঙ্গল করিত। মানবের অন্তরে অন্তরে ধর্ম্মের মিল ছিল; ধর্ম্ম রাজ্যের পালন ও শাসন ধর্ম্মই করিত। ধার্ম্মিকের

চক্ষু সহজে তখন দোষীকে ধরিতে পারিত; দোষী তখন ধার্ম্মিকের নিকটে আসিয়া কম্পিত হইত। যে গ্রামে এক জন ধার্ম্মিক থাকিত, সে গ্রামের লোকের হৃদয় পাপ করিবার সময়ে কম্পিত হইয়া যাইত। সেই এক দিন ছিল, আর আজ এই এক দিন। আজ কথা উঠিতেছে, ধর্ম্ম ভিন্নও রাজ্য-শাসন চলিত পারে, সমাজ চলিতে পারে। ইংরাজ এই ধুয়া ধরিয়া যথেচ্ছা অত্যাচার করিতেছে, উচ্ছৃঙ্খল ভারত সেই অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া হা-হতোস্মি করিতেছে। এটী নাকি স্বাধীনতার যুগ। বাস্তবিক ইহা স্বাধীনতার যুগ নহে, স্বেচ্ছাচারের যুগ—উচ্ছৃঙ্খল দশা প্রাপ্তির যুগ। আজ যে আন্দোলন উঠিতেছে—ইহা যে জাতিভেদের আর এক মূর্ত্তি, তাহা কেহই ভাবিতেছেন না। যে দেশ জাতিভেদের অসংখ্য কষাঘাত-পীড়নে দুর্ব্বল,সেই দেশে ইংরাজকে এক অভিনব জাতিত্বে পৃথক করিবার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালির দোষ দোষ নহে, ইংরাজের সামান্য দোষও মহাদোষ, এই কথারই প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। দেশীয় জমীদার, দেশীয় ডেপুটী বাবু,উকীল বাবু, মোক্তার বাবু,মুন্সেফ বাবু, ক্ষুদ্র২ সবারের দল শিক্ষা ও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া যে সকল বীভৎস কাণ্ড করিতেছেন, তাহা কে দেখিবে, কে তাহার গণনা করিবে? তুমি সে কথা বলিতে যাও, তুমি দেশহিতৈষী নহ। ইংরাজের দোষ প্রচার কর, তবেই হইল!! হায়, মানুষ সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া এত অন্ধতায়ও পরিণত হইতে পারে?—হায়, সোণার মানুষ উদারতার বিশ্ব-বিস্তৃত প্রেম পরিহার করিয়া এত সঙ্কীর্ণতায়ও পরিণত হইতে পারে!! এ আন্দোলন, এ ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত একদেশদর্শী ইংরাজের দোষ প্রচারে ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমাদিগকে যাহা বলিতে ইচ্ছা কর, বল, আমরা যাহা সত্য বুঝিয়াছি, তাহা বলিবই বলিব। ভারতের এক্ষণও ইংলণ্ডের নিকট অনেক শিক্ষা করিতে হইবে—ইংলণ্ডের নিকট হইতে অনেক পাইতে হইবে। সামান্য সামান্য ব্যক্তিগত দোষের কথা ভুলিয়া ইংরাজ শাসন নীতি আলোচনা করিলে কি আমরা ইংরাজের উদারতা দেখিতে পাই না? সংসারে সৎ অসৎ দুই বর্ত্তমান। মধুকরের ন্যায় ফুলের গণনা না করিয়া মধু সংগ্রহ করিতে হইবে। অসারাংশ বাদ দিয়া সর্ব্ব স্থান হইতে সার গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরাজের মধ্যে এমন কিছু আছে, বাঙ্গালীর মধ্যে যাহা নাই। তাহাদের দোষ আছে, গুণ কি নাই? টমসনের যে উদারতা নাই, রিপনের তাহা আছে, জন ব্রাইটের তাহা আছে। স্বদেশকে মানি বলিয়াই বিদেশকে মানিতে হইবে, বিদেশের নিকট শিখিতে হইবে। স্বদেশও চাই, বিদেশও চাই। বিশেষতঃ বিদেশকে এমন উদার ভাবে ইংলণ্ডের ন্যায় আর কোন রাজা শাসন করিতে পারে নাই; ইহা স্মরণ রাখিয়া, ইহাদের মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর আমরা যাহাতে মানুষ হইতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন তাহা কখনও হইবে না। ধর্ম্মকে সমাজনীতির রাজা করিয়া লইতে হইবে,—রাজনীতিকে প্রজানীতি করিতে হইবে। ধর্ম্মেই চরিত্র, ধর্ম্মেই বীর্য্য, ধর্ম্মেই একতা হইবে। ধর্ম্মেই পুণ্য, ধর্ম্মেই বল, ধর্ম্মেই নীতি সঞ্চারিত হইবে। ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজার দল যখন ধর্ম্মবীর ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বিবেকের আদেশ পালন

করিতে, উত্থিত হইবে,—তখন এমন কোন্ রাজা আছে, যাহার অধর্ম্মের সিংহাসন টলিবে না?—কোন্ ওয়েব আছে, পাপ কার্য্য করিয়া যে সমাজে দণ্ডিত না হইয়া বাস করিতে পারিবে? বিবেক যখন মানুষের রাজা হয়, তখনই মানুষ স্বাধীন হয়। বিবেকের কথা মতে যে চলে, কোন রাজার সে অধীন নহে। বিবেক যখন মানব রাজ্যের রাজসিংহাসন পাইবে, তখন দোষী ব্যক্তি সমাজে নিন্দিত, দণ্ডিত না হইয়াই পারিবে না। নিন্দিত হইয়া সে চরিত্র সংশোধন করিবে। পুণ্যময় শ্রীক্ষেত্রে আর তখন জাতি-ভেদ থাকিবে না। পরশমণির স্পর্শে মাটী তখন সোণা হইয়া যাইবে। চরিত্রের সংস্পর্শে বনের পশুরও চরিত্র ভাল হইবে। পুণ্যের সংস্পর্শে মানুষের পাপ চিন্তা তিরোহিত হইবে, ধর্ম্মের মিলনে অধর্ম্ম ভয়ে পলায়ন করিবে। ভারতে ধর্ম্ম-শূন্য রাজনীতির আন্দোলনের অর্থ আমরা বুঝি না—তাহাতে ভারতের সর্ব্বনাশ করিবে। রাজনীতি ও সমাজনীতির মূল ধর্ম্মনীতি—সেই নীতিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যদি ভারত ধর্ম্ম পায়, তবেই সকল পাইবে;—যদি বিবেকের কথা মত চলিতে পারে, তবেই স্বাধীন হইবে; যদি চরিত্র পায়, তবেই একতা সম্ভব হইবে। নচেৎ ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, বৈষম্য, অত্যাচার, ও অধীনতার যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, ইহা থামিবে না, ইহা থামিবার নহে। ভাই ভারতবাসি, কেবলই হুজুগ করিবে, একবার কি ভারতের মূল শক্তির সেবা করিবে না?—শক্তি সাধন কর—তবেই আন্দোলনে ফল পাইবে, তবেই চরিত্র পাইবে, তবেই স্বাধীনতা পাইবে। তবেই সমাজ স্বর্গ হইবে, তবেই ইংরাজ পরাস্ত হইবে,—দেশ পুণ্যক্ষেত্র হইবে। *

নবলীলা।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাকাতের মাঠে।

অনাথনগরের নীচে একটী ক্ষুদ্র নদী। অপ্রশস্ত নদী,—স্রোত অতি প্রবল। জোয়ারে তীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে স্রোত কৃষকের ধান-ক্ষেতে প্রবাহিত হয়। ধান ক্ষেতের একধারে নদী, একধারে অনাথনগরের নিবিড় অরণ্য। অরণ্যের পশ্চিমে অনাথনগর। ঐ অরণ্যের নীচেই প্রবল স্রোত ধান-ক্ষেতে প্রবাহিত। ধানগাছের গলায় গলায় স্রোত। স্রোতের কলকল রবে নিত্য অরণ্য পুলকিত। ধান গাছের সহিত স্রোতের কতই কোলাকুলি—কতই রঙ্গ—কতই ভাব। এ দৃশ্য দেখে, অনিমেষ নয়নে নিস্তব্ধ অরণ্যের বৃক্ষরাজি, আর দেখে অরণ্যের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ। আর কে দেখে, পাঠক তুমি শুনিবে? স্থির হও, বলিব।

* বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আশু ফল লাভের সম্ভাবনা, সে বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সায়ংকাল উপস্থিত—অরণ্যের পশু পক্ষী বন কাঁপাইয়া ডাকিতেছে;—যেন প্রলয় উপস্থিত! এক শ্রেণীর ডাকের পশ্চাতে আর এক শ্রেণীর ডাক, তাহার পশ্চাতে আর শ্রেণীর ডাক—সকল ডাকের মিলিত স্বর নীলিমা সায়ং সান্ধ্য-গগনে উঠিয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে! সকল পরিশ্রম আকাশে বিলীন হইতেছে! ডাকিয়া ডাকিয়া হিংস্র জন্তুগুলি বন ছাড়িয়া গ্রামেরদিকে ছুটিতেছে, গ্রাম হইতে পক্ষীগুলি উড়িয়া উড়িয়া বনে আশ্রয় লইতেছে। সূর্য্যের রশ্মি নিবিয়া গিয়াছে—দূর দূরান্তর হইতে গাঢ় অন্ধকার কোল প্রসারিত করিয়া আসিতেছে। সেই আঁধার দেখিয়াই পশুপক্ষী যেন ভয়ে ডাকিতেছে। আঁধারে সব একাকার করিতেছে, সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আপন ক্রোড়ে করিতেছে, সীমাবদ্ধ ভাবকে অসীম করিতেছে,—বিশেষত্বকে ডুবাইয়া একত্বে পরিণত পূরিতেছে—বৃক্ষ ফল ফুল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নরনারী সেই আঁধারে সব একাকার। এ দৃশ্য দেখিতেছে, আকাশ হইতে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলী, আর ঐ অরণ্যের মধ্য হইতে কে দেখিতেছে, পাঠক, শুনিবে? স্থির হও, বলিব।

ঐ নদীর অপর পারে ডাকাতের বিস্তৃত মাঠ। মাঠে বৃক্ষ নাই, জঙ্গল নাই, বসতি নাই, সব পরিষ্কার। মাঠের এক দিকে নদী, আর দুপ্রহরের দূরে লোকের বসতি। মাঠের শব্দ মাঠেই লয় পায়, গ্রামে যায় না, গ্রামের শব্দ মাঠ পার হয় না। দিবসে এই মাঠে খেলে রৌদ্র, রাত্রে খেলে অন্ধকার বা জ্যোস্না, যখন যাহার পালা, সেই তখন খুব খেলে। দুপ্রহরের সময় কাহার সাধ্য এই মাঠের রৌদ্র ভেদ করিয়া গমন করে, রাত্রেই বা কাহার সাধ্য এই জনপ্রাণীহীন নীরব প্রান্তরের আঁধার ভেদ করে। অতি প্রত্যূষ ভিন্ন রৌদ্রের ভয়ে মাঠে কেহ পাড়ী ধরে না, সন্ধ্যার সময় কেহ এমাঠে হাটে না। আজ হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে দুই জন লোক এই মাঠের মধ্যে পড়িয়াছে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, এ সময়ে এ মাঠে প্রায়ই ডাকাতি হইত। দুই জন লোকের একজন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ। স্ত্রীলোকটী মাঠের সকলই জ্ঞাত ছিল, তাঁহার ধারণা ছিল, বেলাবেলি মাঠ পার হওয়া যাইবে, খেয়া মিলিবে; কিন্তু শরীরের অবসন্নতা প্রযুক্ত তেমন হাটা হয় নাই, তাই মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী লোকের মনে হইতেছে, যদি দস্যুর হাতে প্রাণ বাঁচে তবুও খেয়া মিলিবে না, সুতরাং রাত্রে শীতে বা বন্য জন্তুতে প্রাণ লইবে। অত্যন্ত ভয়ে জড়সড় হইয়া স্ত্রীলোকটী ছুটিতেছে। ছুটিতেছে কিন্তু পা চলিতেছে না, পশ্চাৎ দিক হইতে কে যেন গতিরোধ করিতেছে। স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া চাহিল, দেখিল ঘোর আঁধার চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতেছে; পশ্চাতের দিকে চাহিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকের চলিবার শক্তি রহিত হইল, ক্ষণকাল বসিল। প্রায় অর্দ্ধদণ্ডের পর স্ত্রীলোকের প্রাণে একটু সাহস জমিল, মনে হইল, কে যেন সঙ্গে আছেন, কে যেন রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকটী সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে বুঝিল, কে যেন অতি নিকটে। একটী পুরুষ বেলা থাকিতে মাঠের মধ্যে দূর হইতে লোক দেখিয়া, মাঠে পাড়ী ধরিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোক দেখিয়া চলিতেছিল, সন্ধ্যার পরে আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। নিকটে

আসিলে স্ত্রীলোকটী বুঝিল, এক জন মনুষ্য, পুরুষটীও বুঝিল একজন মনুষ্য ধরিয়াছি। কিন্তু এমনি অন্ধকার,কে পুরুষ,কে স্ত্রীলোক, উভয়ে তাহা জানে না। কাছে আসিলে স্ত্রীলোকটী অগ্রে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

পুরুষ উত্তর করিল, আমি পুরুষ, নাম বলিলে চিনিবে না।

স্ত্রীলোক।—কোথায় যাইবে?

পুরুষ।—অনাথপুরে।

স্ত্রীলোক।—কোথা হইতে আসিয়াছ?

পুরুষ।—অনেক দূর হইতে,—তুমি চিনিবে না। তুমি কে?

স্ত্রীলোক।—আমি স্ত্রীলোক, নাম বলিলে তুমি চিনিবে না।

পুরুষ বলিল,নাম শুনিব, না চিনি তবুও বল তোমার নাম কি?

স্ত্রীলোকটী একটু ভাবিয়াই বলিল, আমার নাম করালী, কেমন সুখী হইয়াছ?

পুরুষ বলিল, করালী নাম আমি শুনিয়াছি, তুমিই কি 'করালী'।

স্ত্রীলোকটী মনে মনে হাসিল, প্রতারণা করিয়া ঠকায়েছি ভাবিয়া মনে মনে হাসিল; পরে বলিল, আমিই করালী, কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই।

পুরুষ বলিল, করালীকেও আমি ভয় করি না, আমরা পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি না।

স্ত্রীলোকটী লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ করালীকে ভয় করিত না অনাথপুরের দুই তিন দিন নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে এমন লোক ছিল না, বলিল, তুমি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ?

পুরুষ বলিল, তাহা বলিব না।

স্ত্রীলোকটী বিস্মিত ভাবে বলিল, করালীকে ভয় করিতেছ না? এখনই তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইব, পরে নাক কাণ কাটিয়া এই মাঠে ছাড়িয়া দিব।

পুরুষ। তাহা পারিবে না, ক্ষমতা থাকে, কাছে এস।

করালী অপ্রতিভ হইল, বলিল, তোমার খুব সাহস, তবে তুমি অগ্রে চলিয়া যাও না কেন?

পুরুষ এবার বিপদ গণিল, কারণ সে পথ চিনিত না; বলিল, যখন ইচ্ছা হইবে তখনই যাইব।

স্ত্রীলোক বলিল, স্ত্রীলোকের নিকটে ইচ্ছা করিয়া যে পুরুষ দাঁড়ায়, সে পাষণ্ড! তুমি চলিয়া যাও।

পুরুষ এবার অপ্রস্তুত হইল, বলিল, তোমাদের দেশে এ প্রকার পাষণ্ড কি নাই?

স্ত্রীলোক।—অনেক আছে। কিন্তু তাতে তোমার কি? আমি বুঝিয়াছি, তুমি এদেশী লোক নহ, বিদেশী লোকেরা নাকি স্ত্রীলোকদের খুব সম্মান করে, তাই বলিলাম।

পুরুষ।—আমি এখনই যাইতাম, কিন্তু আমি নিরুপায়, এই প্রদেশ আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই একা যাইতে পারি না। তোমাকে অনাথপুরের যাত্রী বলিয়া লোকনাথপুরে শুনিয়াই তোমার পশ্চাৎ আসিয়াছি, তোমার সঙ্গ ধরিয়াই এত দূর আসিয়াছি। এক্ষণ যদি পথহারা পথিককে পথ না দেখাও, তোমার অধর্ম্ম হইবে।

স্ত্রীলোক।—যদি ধর্ম্মকে আমি মানিয়া না চলি?

পুরুষ।—ধর্ম্ম না মানিতে পার, কিন্তু দয়াকে না মানিয়া পার না। পথ দেখাইতে হইবে, কারণ আমি কৃপাপ্রার্থী নিরাশ্রয়।

স্ত্রীলোকটী নত হইল, বলিল, তবে তুমি আমার সহিত এস, খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ; যদি নৌকা না পাওয়া যায়, তবে উভয়ে একত্রে নদীতীরে থাকিব। এ মাঠে বড় ভয়।

পুরুষ বলিল, নদীতীরে থাকিতে ইচ্ছা নাই, যে প্রকারে হউক নদী পার হইতেই হইবে, যে প্রকারে হউক অনাথপুরে যাইতেই হইবে, নৌকা না পাই নদী সাঁতরাইব।

করালী মনে মনে পুরুষের সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, পুরুষটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খেয়াঘাটে—পান্সীতে!

খেয়াঘাটে খেয়া নৌকা মিলিল না, কিন্তু ঘাটে তিনখানি পান্সী বাঁধা রহিয়াছে, পথিকেরা দেখিল। একখানি নৌকার ছইয়ের ভিতর হইতে মনুষ্যের স্বর বাহির হইতেছিল, পথিকেরা চুপি চুপি পান্সীর ধারে যাইয়া কাণ পাতিয়া কথা শুনিল।

প্রথম আরোহী বলিতেছে, এত পরনিন্দা ভাল নহে, আপন দোষ শোধন করাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয়।—নিন্দাই আমার ব্রত, লোককে ভাল করিতে হইলে এ ব্রত অবলম্বন করিতেই হইবে, পথ এক ভিন্ন দুই নহে।

প্রথম।—তুমি কি, তাহা কি ভাবিবে না? ভিতরে বিষ পূরিয়া বাহিরে সুধা মাখিয়া কত কাল কাটিবে? একই ভাবে কি চিরকাল যাইবে? ধন মানে, জ্ঞান গৌরবে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, শক্তি সামর্থ্যে তোমাপেক্ষা উন্নত লোক কি বাঙ্গালায় নাই? তুমি কাহাকেও কেয়ার কর না, কিন্তু তোমাপেক্ষা অধিক শক্তি কি আর কাহারও নাই?

দ্বিতীয়।—আমি আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও গণিব না—এই ভাবেই জীবন যাইবে। শক্তি কাহারও থাকে, আমার সমকক্ষ হউক! বুদ্ধি কাহারও থাকে, আমার চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলুক! জ্ঞান কাহারও থাকে, আমাকে চিনিয়া লউক! বল কাহারও থাকে, আমাকে পরাস্থ করুক! কেবলই কল্পনার কথা শুনিয়া ভীত হইব কেন? শক্তির পরীক্ষা আজই হইবে—মানুষ কেহ দেশে থাকে, আমার সমক্ষে আসিয়া জয় লাভ করুক।"

করালী আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, নৌকা কোথাকার?

মাজী চিৎকার করিয়া বলিল, বিষ্ণুপুরের নৌকা।

করালী পুনঃ বলিল, নৌকা কোথায় যাইবে?

মাজী উত্তর করিতেছিল এমন সময়ে ছইয়ের ভিতর হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—নৌকা আজ রাত্রে এই নদীতেই থাকিবে, পরে যেখানে ইচ্ছা, যাইবে।

করালী বলিল,—আমাদিগকে পার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, তোমরা কে গা?

করালী বলিল,—আমি বিবসনা, সঙ্গে বিদেশী লোক, আমরা উভয়েই অনাথপুরে যাইব, পার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—নৌকায় এস, পার করিব।

করালী নির্ভয়ে অগ্রে নৌকায় পা ফেলিল, পরে বিদেশীও নৌকায় উঠিল। নৌকায় উঠিয়া করালী আলোকে দেখিল, বিদেশী একজন বলিষ্ঠ শ্বেতকায় পুরুষ।

সাহের নৌকায় উঠিল দেখিয়া নৌকার

দ্বিতীয় ব্যক্তি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—না, দুজনকে পার করিতে পারিব না, এক জন নামিয়া যাও।

করালী বলিল—তবে আমিই যাই, কারণ বিদেশীকে পার করিতেই হইবে—অতিথিকে অগ্রে সাহায্য করাই ধর্ম্ম। আমি নামিয়া যাইতেছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—তোমাকেই পার করিব, ম্লেচ্ছকে তীরে নামাইয়া রাখিব—পাষণ্ডকে পার করিব না।

সাহেব সঙ্গিনীর মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইল, বলিল, ইহাকে কখনই রাখিয়া যাওয়া হইবে না—আমিও থাকিব না, সুতরাং উভয়কেই পার করিতে হইবে।

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—যদি পার করিতে হয়, তবে উভয়কেই পার করা যাইবে, কিন্তু বড় ভয়ের কথা। অনাথপুরের ঘাটে আজ রাত্রে নৌকা রাখা বিষম ব্যাপার!

সাহেব বলিল—কোন ভয় করিবেন না, পার করুন!

দ্বিতীয় ব্যক্তি সাহেবের কর্ক্কশস্বরে উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—পার করিব না, ম্লেচ্ছ দূর হ। নৌকা থেকে নাম্।

করালী বলিল, ম্লেচ্ছ দেশের রাজসিংহাসন পাইয়াছে, রাজভক্ত ভারত সাহেবের গোলামী-ব্রত লইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্যবসা ছাড়িয়া মদ্ ধরিয়াছে,—আফিসে কর্ম্ম লইয়াছে,—ইংরাজের সাহিত্য পড়িতেছে; আবার সাহেব বলিয়া ঘৃণা? এ ঘৃণা বাহিরের, অন্তরের নহে। যদি ঘৃণা থাকে, মাথার দিব্বি, সাহেবকে নামাইয়া দেও।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বেশ পরিবর্ত্তিত ছিল, করালীর বেশও পরিবর্ত্তিত ছিল, নচেৎ উভয়ে হয়ত উভয়কে চিনিতে পারিত। বিপদের সহিত সহবাস করিতে করিতে করালী এত সাহস পাইয়াছে যে, কাহাকেও আর ভয় নাই, কথা বলিবার সময়ে একটুও সঙ্কুচিত হইল না। সদর্পে আত্মাভিমানে বলিল,—শক্তি থাকে সাহেবকে নামাইয়া দেও।

করালীর কথা নৌকা খানিকে যেন তোলপাড় করিয়া তুলিল। কেহ কোন উত্তর করে না দেখিয়া ভিন্ন কামরা হইতে তৃতীয় ব্যক্তি বাহির হইয়া বলিল,—সাহেবও জানি না, বাঙ্গালীও জানি না, উভয়েই নৌকা হইতে নামাইব। এই বলিয়া ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সজোরে করালীকে টানিল।

করালী বলিল—মারিবে, মার; যে রাগের অধীন, তাহাকে কিছু না বলাই উচিত। মারিতে ইচ্ছা করিয়াছ, মার, কিন্তু নৌকা হইতে নামিব না।

সাহেবের প্রাণে স্ত্রীলোকের অপমান সহ্য হইল না, আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল—চক্ষু ভেদ করিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, হস্তোত্তোলন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নাসিকার উপরে বলপূর্ব্বক বিরাশির ওজনে এক ঘুষি মারিল।

করালী এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, মনে মনে বিপদ গণনা করিল, পার হইবার পথে বড়ই বিঘ্ন দেখিতে লাগিল; সাহেবের পা ধরিয়া বলিল, সাহেব, পায়ে পড়ি, ক্ষমা কর, প্রহারে উপকারের প্রত্যাশা নাই, জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কার্য্য সিদ্ধির আশা কারা যায় না। ক্ষান্ত হও, নচেৎ পারের উপায় নাই।

সাহেব বলিল, পারে আমি যাইব না, এমন নরাধমের নৌকায় আমি পার হইব না, এই বলিয়া সাহেব নৌকা হইতে নামিবার উপক্রম করিল।

এই ঘটনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটিল। ঘুষি মারার পরেই ঐ নৌকা হইতে ইঙ্গিত হইল, অমনি নিকটের নৌকা হইতে সশস্ত্র লোক আসিয়া সাহেব ও করালীকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং নৌকা খুলিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন মস্‌জিদে—অনাথিনী!

অনাথপুরের সেই অরণ্যে একটী প্রাচীন মস্‌জিদ্! মস্‌জিদ্‌টীর তিন দিক জঙ্গলে বেষ্টিত, এক দিকে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। চতুর্দ্দিকই ঘোরতর জঙ্গল—জঙ্গলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাস। দীর্ঘিকার জল অতি গভীর, নীলবর্ণ, তাহাতে পোষা কুম্ভীর বাস করে। মস্‌জিদে একটী ফকীর থাকে, আর একজন স্ত্রীলোক থাকে। ফকীরের ডাকে জলের কুম্ভীর স্থলে উঠে, স্থলের ব্যাঘ্র জলে নামে। ফকীর দিবসে ভিক্ষায় যায়, রাত্রে মস্‌জিদে আগমন করে। মস্‌জিদ্ নির্জ্জন। বন্য পশু পক্ষীর স্বর ভিন্ন আর সেখানে কোন রব শুনা যায় না। মস্‌জিদ্‌টী অতি প্রাচীন—চুন সুরখি খসিয়া পড়িতেছে, স্থানে স্থানে ইষ্টকও খসিয়াছে। মস্‌জিদের উপরে অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ, ভিতরে চর্ম্মচটিকা, চড়ুই, আরসুলা, টিকটিকী গিরগিটীর বাসা। চর্ম্মচটিকার দুর্গন্ধে মস্‌জিদ্ পূর্ণ। মস্‌জিদের ভিতরে দিবসে অতি কষ্টে আলোক যায়; রাত্রের ত কথাই নাই। আজ তায় অমাবস্যার রাত্রি। সন্ধ্যার সময়ে অনাথপুরের নদী ও অরণ্যকে যে আঁধার ঘেরিয়াছে, সেই আধার ঘনীভূত হইয়াছে!

দিগন্তব্যাপিনী করালময়ী আঁধারের কোলে সেই ভগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, প্রাচীন মস্‌জিদ নিস্তব্ধ ভাবে বিরাজিত। মস্‌জিদের ভিতরে একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে—তৈলাভাবে মৃদু দীপ মৃদু মৃদু জ্বলিয়া মস্‌জিদের উদাসীনত্ব, প্রাচীনত্ব, জীর্ণত্ব যেন প্রচার করিতেছে,—যেন বলিতেছে—কালের অনন্ত প্রবাহে সব ভাসিয়া যাইতেছে, আমিও যাইতেছি। যেন বলিতেছে—যাইবার জন্যই যাহার জন্ম, তাহার আর আসক্তির দারুণ মর্ম্মদাহ প্রাণে রহিবে কেন?—তাহার প্রাণ আবার সংসার-প্রেমে বাঁধা পড়িবে কেন? যেন বলিতেছে—আমি যাই, তোমরাও চল,—অথবা আমি অগ্রে যাই, তোমরা পশ্চাৎবর্ত্তী হও! যেন বলিতেছে,—রূপ দেখিয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে মমতা হইতেছে?—মোহমায়ার স্বপ্ন দেখিয়া মোহিত হইয়াছে?—এ মোহ ভাঙ্গিবে—এ মমতার জাল এক দিন ছিড়িবে!! ক্ষীণ দীপালোকের নিকটে বসিয়া নীরবে এই জীবন্ত উপদেশ শুনিতেছে—একটী স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকটীর নয়নের কোলভরা জল—সেই জল অজ্ঞাতসারে বুক ভাসাইয়া বহিতেছে! সে মনে মনে ভাবিতেছে,—বিধি যদি সকলই লইবার জন্য সৃজন করিলেন, তবে এ পোড়া হৃদয়ে আজও আসক্তির অঙ্কুর কেন রহিল?—স্ত্রীলোকটীর পরিধেয় বস্ত্র অস্থি মলিন, অতি জীর্ণ—শরীর বসন অপেক্ষাও মলিন—মাটীর শরীরে মাটীর আধিপত্য! উজ্জ্বলরূপ অপরিষ্কারে মলিন হইয়া গিয়াছে। শরীরের রূপে বাহিরের ময়লা এক পোঁচ দিয়াছে—আর এক পোঁচ দিয়াছে অন্তরের চিন্তা। দারুণ চিন্তা রূপ ডুবাইতে বড়ই মজ্‌মুত। শরীরের

কান্তি গিয়াছে, তেজ গিয়াছে, কেবল কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। না ধরিয়া উঠিতে পারে না, লাঠী ভর না করিয়া চলা দুষ্কর। চুল বাঁধে না, তেল মাখে না, শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে না—চক্ষের জল পোঁচে না। মাটীতে বসে, মাটীতেই শোয়। তেল জল ও যত্ন ভিন্ন কেশের যে দশা হয়, তাহাই হইয়াছে, অতি রুক্ষ—ভায় মধ্যে মধ্যে জটা ধরিয়াছে। যে এতদূর আসক্তিশূন্য হইয়াছে—সে ক্ষীণ দীপালোকের ধারে, সেই নিস্তব্ধ অরণ্যের ভগ্ন মস্‌জিদে বসিয়া ভাবিতেছে—"আজও আসক্তি রহিল কেন?—মা সর্ব্বমঙ্গলা নিলেন ত সকলই নিলেন না কেন?—আশা রহিল কেন? সর্ব্বস্ব হারাইয়াও আমি আমিত্ব শূন্য হইয়া তাঁহাতে ডুবিতে পারিলাম না কেন? ফকীর আশ্রয়দাতা—আমার কত উপকারই সে করেছে, এখানেও স্বার্থ!! পর উপকারেও স্বার্থ! মানুষের স্বার্থের চিন্তা ডোবে না কেন?—মা সর্ব্বমঙ্গলা কি আমার জীবন উপহার লইবেন না?—এ শরীর, এ মন, এ হৃদয় তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিব; হৃদয়ে এই সাধ! এই সাধ কি পূরিবে না?—মায়ের পূজা ছেড়ে মহম্মদে কি আমার মতি যাইবে?—ফকীরের চেষ্টাই কি সফল হইবে?—যে শরীরে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত; সেই দেহে মুসলমানত্ব প্রবেশ করিবে?—যবনের প্রতি ঘৃণা হইতেছে?—না ঘৃণা নহে; যবনান্ন গ্রহণে ত আমি কাতর নহি; কিন্তু স্বধর্ম্ম কেন পরিত্যাপ করিব?—পরিত্যাগ করিব,—অত্যাচারে—প্রহারে—ভয়ে? হিন্দুর শোণিতে কি তেজ নাই—হর গৌরী নামের কি মাহাত্ম্য নাই? মা সর্ব্ব মঙ্গলার কি শক্তি নাই?—তা কখনই পারিব না। শরীরের প্রতি কেন আসক্তি থাকিবে, শরীর যায় যাবে। মৃত্যু আসে আসুক। পৃথিবীতে চিরকাল কে থাকিবে?—সব যাইবে। আমিও যাইব। মা সর্ব্বমঙ্গলার চরণে আমাকেও আমি ভাসাইব!! মায়ের আশীর্ব্বাদ বক্ষে ধরিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিব।"

সেই নিস্তব্ধ ভগ্ন মস্‌জিদে উপবিষ্ট হইয়া সেই দীনা আশা-পূর্ণ বিশ্বাসে, বিশ্বাস-পূর্ণ আশাতে ভগবতীর নাম জপ করিতে লাগিল। সাশ্রুনয়নে প্রেম-বিহ্বল ভক্তিতে মা সর্ব্বমঙ্গলার চরণ বন্দনা করিল। রাত্রি গভীর হইতে চলিল, ফকীর তখনও মস্‌জিদে ফেরে নাই। অনাথিনী সনাথিনীর চরণকে বিপদের অবলম্বন করিয়া বসিল।

অনাথিনী স্ত্রীলোকটী কে?—পাঠক, তাহা পরে জানিবে।

বঙ্গের ভূমি সংক্রান্ত স্বত্বের ইতিবৃত্ত।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত লইয়া যেরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তাহাতে বঙ্গীয় প্রজা এবং ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিলে বোধ হয় তাঁহারা বিরক্ত হইবেন না; এই আশায় আমরা এই ক্ষুদ্র বিবরণটী লইয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে, ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, তার পর ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, বঙ্গীয় প্রজা এবং ভূম্যধিকারী কখন কি স্বত্ব ভোগ করিয়াছেন, তাহাই আমরা ক্রমশ আলোচনা করিব। আমাদের প্রথম প্রবন্ধে কেবল মুসলমান সময়ের অবস্থা সমালোচনা করিলাম।

বঙ্গ দেশে আজ কাল প্রজা বলিলে কেবল কৃষিজীবী রায়ত, এবং ভূম্যধিকারী বলিলে কেবল সাধারণত জমীদারদিগের কথাই অনেকে বুঝিয়া থাকেন। যাঁহারা এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা মধ্য শ্রেণীর লোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আমরাও সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই তিন শ্রেণীর লোককে উল্লিখিত তিন নামেই এপ্রবন্ধে উল্লেখ করিব; অর্থাৎ—

ভূম্যধিকারী—গবর্ণমেণ্টের অব্যবহিত নিম্নতর ভূমিতে স্বত্ববান্ যে ব্যক্তি; যথা জমীদার, খারিজা তালুকদার, নাখিরাজদার, ইনামদার, জায়গিরদার, আয়মাদার।

প্রজা—ভূমিতে স্বত্ববিহীন কৃষিজীবী রায়ত, যথা,কর্ষা, কোর্ফা,উট্‌বন্দী, বর্গাইৎ।

মধ্য শ্রেণীর লোক বা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী—উল্লিখিতরূপ ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে কোন প্রকারের স্বত্ববান্ লোক, যথা—পত্তনীদার ও সৎ তালুকদার, নিমও সৎ তালুকদার, যোৎদার, হাওলাদার, নিম হাওলাদার, ইত্যাদি।

স্থানভেদে, স্থানীয় রীতি ভেদে ভূম্যধিকারী এবং মধ্য শ্রেণী লোকের স্বত্ব এবং ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে; সে বিষয় আমরা পরে সবিশেষ আলোচনা করিব। আগে দেখা যাউক যে, ইংরেজের হাতে শাসন ভার পতিত হইবার পূর্ব্বে, এই তিন শ্রেণীর লোকের কি অধিকার ভোগ করিতেন।

যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আর্য্যশাসনকর্ত্তৃগণ আর্য্য নিয়মে শাসন দণ্ড পরিচালিত করিতেন, সে সময়ে বঙ্গদেশ কি প্রণালীতে শাসিত হইত, তখন ভূমির সহিত প্রজার কি সম্বন্ধ ছিল, কিরূপে জমাবন্দী হইত, কি নিয়মে রাজস্ব সংগৃহীত হইত, আজ তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ নয়। পৌরাণিক তত্ত্বের বিশেষ গবেষণাদ্বারা, অনুমান সাহায্যে এক প্রকার মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় বটে; কিন্তু আজ তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিশেষ সময় অতিবাহিত করায় আমরা বিশেষ কিছু ফলোদয় দেখিতে পাই না। আজ আমরা যে স্বত্ব যে অধিকার বঙ্গদেশের প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণকে

উপভোগ করিতে দেখিতেছি, তাহা সমুদয়ই ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি কর্ত্তৃক সৃষ্ট; মুসলমান প্রণালীই তাহার মূল ভিত্তি; এবং ১৭৬৫ সালে বাদসাহ সাহা আলম কর্ত্তৃক প্রদত্ত সনন্দ বলে কোম্পানি যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, সে ক্ষমতা মোগল প্রদত্ত, সুতরাং মোগল শাসন সময়ের প্রচলিত আইনের অধীন। আজ বঙ্গীয় ভূমি সংক্রান্ত কোন কথার মীমাংসা করিতে হইলে, মোগলদিগের সময়ের প্রচলিত আইন অবলম্বন করিয়াই তাহার মীমাংসা করা উচিত।

মুসলমানেরা এ দেশীয় লোক নহে, তাঁহারা জেতা, হিন্দুরা বিজিত। এ দেশে আসিয়া যদিও তাঁহারা শাসন প্রণালী সম্বন্ধে হিন্দুদিগের রীতিনীতি সর্ব্বত্র যথা সাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন, তথাপি মুসলমান শাসনের কয়েক শতাব্দী মধ্যেই হিন্দু-শাসন-রীতিনীতি মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, ইংরেজ যখন এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন, তখন বিশুদ্ধ হিন্দু প্রণালীতে এদেশে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত না। সুতরাং আমরা হিন্দু শাসন কালের ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত আলোচনা করা সম্প্রতি আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

যখন পাঠান বংশীয় রাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেন, সে সময়ে সমুদয় বঙ্গদেশ তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল না। স্থানে স্থানে জমীদারেরা, স্বাধীন রাজার ন্যায়, নিজ নিজ অধিকারের অন্তর্গত স্থান শাসন সংরক্ষণ করিতেন। এই সমুদয় জমীদারগণ যে সকলেই এক নিয়মে কর লইতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে প্রথম জমীদারী প্রথা কখন সৃষ্ট হইল, আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, পাঠান শাসন সময় কালে, বঙ্গদেশে যে সময় সেই অরাজকতা হইত, সেই সময়েই জমীদারগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ইহাঁদের মধ্যে যাহারা বার ভূঁয়ে নামে বঙ্গদেশে পরিচিত, তাঁহারা কেহই কার্য্যত বাদসাহের বা বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তৃগণের শাসন স্বীকার করিতেন না; একজনে অপরের অধিকারে অদণ্ডিত ভাবে অত্যাচার করিতেন, এবং নিজ নিজ শাসনের অন্তর্গত স্থানে ফৌজদারি আদালত সমুদয়ই তাঁহাদের নিজদিগের হাতে ছিল। দুর্ভাগ্যবশত ইহাদিগের বংশাবলীর যে ইতিবৃত্ত রক্ষিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদিগের পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ, দান ধ্যান, পুষ্করিণী খনন, কীর্ত্তি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য ব্যতীত রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন কথাই পাওয়া যায় না।

পাঠান শাসন সময়ের মধ্যে এক সের সাহার শাসনকালে রাজস্বের প্রকৃত বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বঙ্গদেশের যে যে অংশ প্রকৃত পক্ষে মুসলমানের অধিকার স্বীকার করিত, তিনি সেই সেই অংশকে কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই শাসনকর্ত্তৃগণ জমীদারদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন, জমীদারেরা আবার প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিতেন; ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্যের ¼ এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া ভূমির বন্দোবস্ত করা হয়। এ বন্দোবস্ত জমীদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল; সের সাহা প্রজা ওয়ারী বন্দোবস্ত করিয়া জমীদারদিগকে রাজস্ব হইতে নানকর প্রদান করেন না; এবং জমীদার যে প্রজার নিকট হইতে কি পরিমাণ আদায় করিতে পারিবেন, সে সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত করা হয় না। এইরূপে বঙ্গীয় প্রজা সম্পূর্ণরূপে আইনতঃ জমীদারের অধীন হইয়া পড়িল। কিন্তু এ সময়ও জমীদারদিগকে ভূস্বামী বলা যায় না; তাহারা নিজদিগের জমীদারী দান বিক্রয় করিতে পারিতেন না।

আকবর সাহের সময় রাজা তোদরমল দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তই বঙ্গীয় বিখ্যাত ওয়াশীল তুমার জমা। এই বন্দোবস্তের সময় রাজা অগ্রে বঙ্গদেশের সমুদয় ভূমি মাপিয়া প্রজার ভূমির কর, উৎপন্ন শস্যের তিনাংশের একাংশ নির্দ্ধারিত করেন। প্রজার সহিত এই বন্দোবস্ত হইল; প্রজা এই নির্দ্দিষ্ট খিরাজ-কর প্রদান করিয়া ভূমি ভোগ করিতে পারিবে, জমীদার তাহাকে ভূমি হইতে কর আদায় করিলে কখনও দূর করিতে পারিবেন না। প্রজারা নিজ যোৎ দান বিক্রয় এবং রেহান দিবার ক্ষমতা স্পষ্টত প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিয়ার সাহার বন্দোবস্তের সঙ্গে রাজা তোদরমলের বন্দোবস্তের একটী বিশেষ পার্থক্য এই, সিয়ার সাহা জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত করেন, অথচ জমীদারকে কোন প্রকারের ভূস্বামিত্ব প্রদান করেন না; রাজা তোদরমল প্রজাকে ভূমিতে এক প্রকার অধিকার প্রদান করিয়া প্রজার সহিতই বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে এক কোটি সাতলক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়।

প্রতি বৎসর জমাবন্দীর গোলযোগ এড়াইবার নিমিত্ত, তিনি সমুদয় ভূমি আউয়েল, দয়েম, সুয়েম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন, এবং প্রজা ওয়ারি চিটানুসারে এই সমুদয় ভূমির বন্দোবস্ত হইল। এ সময়ে বঙ্গীয় জমীদারেরা এক প্রকার রাজ কর্ম্ম-চারীর মধ্যে ভুক্ত হইলেন। তাঁহারা নাজিমের অধীনে শান্তিরক্ষক এবং দেওয়ানের অধীনে রাজস্ব-সংগ্রহকারক, এই দুই ক্ষমতা লইয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ের জমীদারদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আইনি-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা প্রায়ই কায়স্থ, বাদসাহের আবশ্যক মত, তাঁহারা ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪২৩০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা দ্বারা বাদসাহার সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সময়ে জমীদারগণ যে নানকর ভোগ করিতেন, সে কেবল কর সংগ্রহের বেতন নহে। এই ব্যয়-বহুল অশ্ব পদাতি প্রভৃতি যে তাঁহারা রক্ষা করিতেন, নানকরের কতকাংশ তাহারই নিমিত্ত দেওয়া হইত। তখন কত অংশ যে কিসের নিমিত্ত দেওয়া হইত, সে সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম যখন দেখিতে পাই না, তখন বোধ হয়, জমীদারদিগের কার্য্য-কারিতা ও ক্ষমতা প্রভৃতি দেখিয়া সুবাদারের অনুরোধানুসারে জমীদারের নানকর নির্দ্দিষ্ট হইত। এ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত লেখক যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম,——

"যাহার দখলে কোন জমী থাকে, জমীদার শব্দের প্রকৃতিগত অর্থে তাহাকেই জমীদার বলা যাইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষে জমীদার বলিলে অনেক সময়ই অনতি-বিস্তৃত ভূমিতে স্বত্ববান্ ব্যক্তিদিগকে বুঝা যায়, এবং অধিকাংশ সময় কোন জেলার অন্তঃর্গত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধি বা প্রধান ব্যক্তিকে বুঝা যাইতে পারে। এই প্রকারের ব্যক্তিগণ মোগল রাজত্বের সময়ে বিভাগীয় শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক রাজস্ব সংগ্রহার্থ

নিযুক্ত হইতেন; এবং তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত প্রচলিত হারে ফিস্ বা নানকর জমী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। যাহার প্রতি যেরূপ কার্য্যভার থাকিত, তাহাকে সেই পরিমাণে নানকর ও ফিস্ দেওয়া হইত; তাহারা নানকর জমীর রাজভাগ মাত্রগ্রহণ করিতেন। হিন্দু সময়ের প্রথানুসারে এই সমুদয় কর্ম্মচারীর পদ ক্রমে তাহাদের পুরুষ পুরুষানুক্রমে সকলে ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পরে যখন মুসলমানশাসন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আপনা আপনি জমীদারেরা স্বাধীন হইয়া বসিলেন। পূর্ব্বে যে সমুদয় সৈন্য সামন্ত রাজার কার্য্যার্থ ও শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তাহাদের অধীন ছিল, এখন সেই সৈন্য লইয়াই আবার রাজার বিরুদ্ধে নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাজাকে বেদখল করিয়াও তাহারা পৈতৃক দখলী জমী ব্যতীত অপর জমী হইতে রাজ-ভাগের অধিক কর গ্রহণ করিতে পারিতেন না।" Central India, Vol II. Page 7.

মুসলমান অধিকার কালে জমীদার প্রকৃত প্রস্তাবে কি ছিলেন, তাহা আমরা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

এই সময় বঙ্গীয় প্রজাদিগের অবস্থাও ভাল ছিল। মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, অনেক গৃহস্থই বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতকে সুবর্ণপাত্রে আহার করিতে দিত; এবং প্রজাদিগের কিস্তিতে দেয় কর নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজেরা আসিয়া দিয়া যাইত।

সুলতান সুজার শাসন সময়ে একবার পুন বন্দোবস্ত হয় বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-ভুক্ত ভূমি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যে সমুদয় স্থান মোগলদিগের অস্ত্রবলে সম্প্রতি বিজিত হইয়াছিল, কেবল সেই সমুদয় স্থানেরই তিনি বন্দোবস্ত করেন। সে বন্দোবস্ত ও রাজা তোদরমলের বন্দোবস্তের প্রণালী অবলম্বনে করা হয়।

ইহার কোন বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়; জমীদার কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না সত্য, কিন্তু বাদসাহ ইচ্ছা করিলে প্রতি বৎসর কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। তবে সে বৃদ্ধির অবশ্য একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল। এই সীমা বাদসাহ আলম গিরের ফারমানে অতি স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে,—

"They shall settle for such a rate that the ryots may not be ruined by the lands: and they shall not on any account exact beyond the value of half the produce, notwithstanding any particular ability to pay more. In a place where neither *asher* nor *khiraj* is fixed, they shall take what has been agreed for, provided that in *khiraj* it does not exceed half the produce in money, that the ryots may not be ruined."—P. 75.

"প্রজা (রায়ত) যাহাতে ভূমির নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত না হয়, এইরূপ ভাবে আমিলেরা বন্দোবস্ত করিবে; প্রজা ভূমির উৎপন্ন জিনিসের অর্দ্ধাংশের বেশী রাজকর দিতে সমর্থ হইলেও কোন কারণেই যেন অর্দ্ধাংশাপেক্ষা বেশী কর আদায় করা না হয়। যে স্থানে আসার বা খিরাজ কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেস্থানে রায়ত যে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই তাহারা আদায় করিবে; কিন্তু খিরাজ যেন ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশের মূল্যাপেক্ষা বেশী না হয়; রায়তেরা যেন উৎসন্ন না যায়।"

বাদসাহের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি এই আদেশ হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত মোগলেরা আদায় করিতেন, কিন্তু বন্দোবস্ত প্রজাদিগের সহিতই হইত। উল্লিখিত ফারমানে ১৬ দফায় লিখিত আছে,—

"Every one who is not the hereditary proprietor of such *khiraj* land, whether infidel or Mussulman, having bought it, or taken it in mortgage shall receive the profits with permission of Government. *From whatever is produced on that land, they shall exact the settled rate of tribute, provided it be not more than half of the produce; in which case they shall reduce it: but if it is less than the third, they shall increase it as far as they deem fit*".—Page 78.

"যাহারা উত্তরাধিকারসূত্রে উল্লিখিত রূপে খিরাজ জমীর মালিক নহে, কিন্তু মর্টগেজ সূত্রে বা খরিদ সূত্রে মালিক হইয়াছে, তাহারা মুসলমানই হউক, আর কাফেরই হউক, গবর্ণমেণ্টের আদেশ গ্রহণান্তর জমীর উপস্বত্ব তাহারা ভোগ করিবে। জমীর উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নির্দ্দিষ্ট রাজকর আমিনেরা গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহা যেন উৎপন্নের অর্দ্ধাংশের বেশী না হয়, অর্দ্ধাংশের বেশী হইলে, তাহারা কর কমাইয়া দিবে, কিন্তু ⅓ অংশের কম হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক বৃদ্ধি করিবে।"

ইহাতে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, প্রজাই প্রকৃত পক্ষে ভূস্বামী ছিল, কিন্তু উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত দিয়া তাহাকে এই স্বামিত্ব স্বত্ব রক্ষা করিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিলে কেহ তাহাকে ভূমি হইতে বেদখল করিতে পারিত না, এবং প্রজা নিজ জমী দান করিতে, বিক্রয় করিতে ও রেহান দিতে পারিত। নূতন মালিককে কেবল বাদসাহের অনুমতি লইতে, অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকারীর নাম খারিজ করাইয়া নিজ নাম দাখিল করাইতে হইত।

মুরসিদ কুলি খাঁ যখন বাঙ্গালায় দেওয়ান নাজিমের পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন বঙ্গীয় প্রজার পরম সুখের দিনের উদয় হইল। তিনি সমুদয় জমীদারদিগকে বাকী করের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা তহশীল আরম্ভ করিলেন; নিরন্ন প্রজাকে মূল ধন পর্য্যন্ত রাজকোষ হইতে প্রদান করিয়া, কৃষি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ করিলেন, সে সময় বঙ্গদেশে প্রজাই প্রধান, জমীদার বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

পরে আলিবর্দ্দি খাঁ যখন সরফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া বঙ্গের সুবাদার হইলেন, সে সময়ে আবার জমীদারদিগের অদৃষ্ট ফিরিল। তিনি সমুদায় বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন নাই, কাযেই দেশীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা না করিয়া চলা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর। তিনি জমীদারদিগের মধ্য হইতে দুই চারি জনকে মন্ত্রী স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং অপর জমীদারদিগের প্রতিও যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু ভূমি সম্বন্ধে জমীদারদিগের যে অধিকার ছিল, তাহা কিছুই বৃদ্ধি করিলেন না।

ইহার পর সিরাজউদ্দৌলা, মিরজাফর্ এবং মিরকাশিমের সময়েও জমীদার ভূমির উপর কোন নূতন স্বত্ব স্বামিত্ব প্রাপ্ত হন নাই।

এখন আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বঙ্গীয় জমীদার কেবল সরকারী কর সংগ্রহকারক কর্ম্মচারির পদ ভোগ করিতেন। ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক প্রথানুসারে এই পদ ক্রমে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বংশীয়েরাই ভোগ করিত। কোন জমীদারকে মুসলমান শাসন কালে আমরা কোন রকমেই মালিকী

স্বত্ব উপভোগ করিতে দেখি না। যদি জমীদারগণের ভূমিতে কোন স্বত্ব থাকিত, তবে জমীদারগণ বাকী করের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধেও এত গোলযোগ হইত না; সুবাদার তাঁহাদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়াই নিজের বাকী কর আদায় করিয়া লইতে পারিতেন। জমীদারগণ প্রকৃতপক্ষে ভূস্বামী থাকিলে, আরঙ্গজেব যখন মুরসিদ কুলি খাঁর শাসন সময়ে সমুদয় জমীদারী জমীদারদিগের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন, তখন তাহাদের মালিকি স্বত্বের নিমিত্ত অবশ্য কোন না কোন প্রকারের ক্ষতি পূরণ করিতেনই, কিন্তু আমরা কোন কাগজপত্রে তাহার কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। তবে মোগলদিগের সময়ে জমীদারদিগকে ভূমিতে কোন না কোন প্রকারের স্বামিত্ব স্বত্ব অবশ্য দেওয়া হইয়াছিল, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সুবিজ্ঞ সম্পাদক এবং জমীদার পক্ষের মুখপাত্র অপরাপর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিগণ কেন যে এ কথা বলিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। স্পষ্ট প্রমাণের সম্মুখে অকারণ অনুমান কোন রূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, জমীদারই যদি কর সংগ্রহকারক ছিলেন, তবে আমিল এবং মালগুজারগণ কি করিত? আমিল দেওয়ানের অধীনস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহারা জমীদারদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া লইতেন, এবং যথা সময়ে জরিপ করিয়া জমীদারদিগের সহিত জমাবন্দী করিতেন। মালগুজার এরূপ ক্ষমতার কর্ম্মচারী ছিলেন না, তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কর আদায় করিতেন; কখন কখন তালুকদারগণও মুসলমান সময়ে মালগুজার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। (গ্লাডুইনস্ বেঙ্গল) জমীদার সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষমতার কর্ম্মচারী, তিনি রাজস্ববিভাগে আমিলের অধীন, শান্তি রক্ষার বিভাগে ফৌজদারের অধীন ছিলেন।

মুসলমান সময়ে বঙ্গীয় কৃষি প্রজার ভূমিতে যে স্বামিত্ব ছিল, সে কথা আর অস্বীকার করা যায়না, তাহারা নিজ স্বত্ব বিক্রয় করিতে এবং রেহান দিতেও পারিত, কিন্তু তাহাদের জমা উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধ মূল্য পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আমিলদিগের হাতে ছিল, কিন্তু জমীদার এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। আমারা পূর্ব্বে যে যে প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহা হইতেই আমাদের মীমাংসার সারবত্তা দেখিতে পাইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

ভারতের ভবিষ্যৎ।

ভারতবর্ষ বহুশতাব্দী হইতে পরাধীন। কত জেঙ্গিসখাঁ, কত টাইমুর যে ইহার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এতদিন পরাধীন থাকিয়াও হিন্দুজাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই; অথবা ভিন্ন রীতিনীতি ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জয়ীজাতির সহিত মিলিত হয় নাই। যে আভ্যন্তরীম শক্তির প্রভাবে এতদিন হিন্দুজাতি প্রতিকূল শক্তি

সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, একদিন তাহারই প্রভাবে আবার সে স্বাধীন হইয়া পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিবে, আবার শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া, আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষয়িত্রী হইবে। এ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক নহে। সমাজতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। পরাধীন জাতির তিন প্রকার মাত্র পরিণাম সম্ভব হইতে পারে। (১ম) জিত জাতির সমূলোচ্ছেদ (২য়) জিত ও জেতার মিলনে নূতন জাতির উৎপত্তি (৩য়) কালসহকারে জিতজাতির পুনরায় স্বাধানতা লাভ। আমরা এত অসভ্য নই যে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণের মত বিনাশ প্রাপ্ত হইব। যে কারণে মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতিতে আদিমজাতি বিনষ্ট হইতেছে, ঋষিদিগের তপস্যাবলে, সে প্রকার কোন চিহ্ন হিন্দু জাতিতে দৃষ্ট হয় না। যে অবস্থার ফলে জিত ও জেতা এক সমাজভুক্ত হইতে পারে, তাহাও এখানে, অন্তত এসময়ে বর্ত্তমান নাই। মুসলমানের রীতি-নীতি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের বিরোধী ছিল; সেই জন্যই হিন্দু মুসলমান একত্রীভূত হয় নাই। বরং অল্পসংখ্যক মুসলমানের, ভবিষ্যতে, হিন্দু সমাজভুক্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আবার দেখিতে পাই, ইংরাজজাতি হিন্দুজাতি হইতে কত বিভিন্ন। সে সকল কথা এখানে বলিবার সময় নাই। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করা যায় যে, আমরা জেতার সহিত এক সমাজভুক্ত হইতে পারিব না।

যদি ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে, হিন্দুজাতির কখনও বিনাশ নাই—অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্য্যন্ত কোন কারণই দেখা যায় নাই, কিম্বা তাহারা কখনও বিজেতাদের সহিত মিলিয়া এক সমাজভুক্ত হইতে পারিবে না—তহা হইলে অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, হিন্দুগণ আবার স্বাধীন হইবে।

অতএব যদি কখন সৌভাগ্য বলে ভারত তাহার অতীত সম্পদ, তাহার বিনষ্ট স্বাধীনতা পুন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন ভারতের কি অবস্থা হইবে? ভারত অতি বৃহৎ দেশ, ইহার বিস্তৃতি কম নহে। রুসিয়া বাদ দিলে সমস্ত ইউরোপ অপেক্ষা ভারত বৃহৎ হইবে। এই বিস্তীর্ণদেশে একটীমাত্র জাতি বা একটীমাত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বাস করে না। ক্ষুদ্র ইউরোপ টুকুতে তেরটী প্রথম শ্রেণীর উন্নত, সভ্য রাজ্য আছে,—বলিতে গেলে তাহারাই আজকাল সমস্ত পৃথিবীর নেতা। আর সেই প্রকার বিস্তীর্ণ ও সেইরূপ লোকপূর্ণ ভারতে কি তত উন্নত দশটী রাজ্যেরও স্থান হইতে পারে না? ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, একা শিখ ও মহারাষ্ট্র সম্প্রদায় এবং একা মহিসুররাজ অপ্রতিহত-প্রভাবে ইংরাজদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত সশঙ্কিত রাখিয়াছিল। বাস্তবিক এক্ষণে ভারতে অনেক জাতি ও উপজাতি বাস করে। তাহাদের ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা বোধ হয় দুই শত হইতেও অধিক হইবে; তাহাদের ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের সংখ্যাও ততোধিক। দেশভেদে, ভাষাভেদে ও ধর্ম্মভেদে এদেশে এত অধিক বিভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বাস করে যে, তাহাদের সংখ্যা করা সহজ নহে। এদেশে ক্রমান্বয়ে হিন্দু, সিথিয়ান, পাঠান, তুর্কি ও মোগলেরা আসিয়া এদেশকে জয় করিয়া বাস করিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে, স্থান ভেদে ও অবস্থা ভেদে, ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায় বিভাগ হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সংখ্যাই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখনকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় তিনভাগ লোক হিন্দুজাতিভুক্ত। মুসলমানের সংখ্যা ইহার এক ভাগের অপেক্ষাও অল্প হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষের অধিকাংশ সম্প্রদায়ই এই দুই জাতির—বিশেষত হিন্দুজাতির অংশ মাত্র। তবে এই বিস্তীর্ণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাস করায়, বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হওয়ায়, এবং হয়ত বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের কোন বিশেষ সংশ্রব না থাকায় এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার, ব্যবহার,ব্যবসা, আকৃতি, গঠন, ভাষা, রীতি, নীতি, চরিত্র, বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায়ই অত্যন্ত পৃথক। এই ভারতবর্ষেই সভ্যতার চরম উৎকর্ষের পরিচয় এবং অসভ্যতার পরিষ্কার নমুনা পাওয়া যায়।

অতএব ভারতভূমি আয়তনে মহাদেশের মত বৃহৎ—ইহাতে সকল প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান, এখানে নানা প্রকার ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি থাকায় এবং এখানকার সম্প্রদায়ের সংখ্যা অসংখ্য হওয়ায়,ভারত কিরূপে এক সমাজ বা এক জাতিভুক্ত হইতে পারে? এই জন্য অনেকের বিশ্বাস এই যে, ভারত স্বাধীন হইলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে; ভারতবাসীরা কখন একজাতি হইতে পারিবে না। একথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, একজাতীয়ত্বের লক্ষণ কি, কি কি গুণ থাকিলে কোন সম্প্রদায়কে একজাতি মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এক ভাষা, একরূপ ধর্ম্ম, এক জাতি হইতে উৎপত্তি, এক চতুঃসীমার অন্তর্গত থাকা, এক প্রকার ঐতিহাসিক ঘটনার অধীন থাকা অর্থাৎ এক রাজার শাসনাধীন থাকা এবং পূর্ব্বস্মৃতি, এই গুলিই জাতীয়ত্বের প্রধান কারণ। এই সকল গুণ গুলি কেন একজাতীয়তা সম্পাদন করে? তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, ইহাদের দ্বারা সেই জাতির প্রত্যেকের মনের ভাব, তাহাদের স্বার্থ প্রভৃতি সমুদয়ই এক পথে নীত হয়, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি হয় এবং একতা সংস্থাপিত হয় এবং তাহাতেই জাতীয় বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়। দেশের অবস্থা সমালোচন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,আধুনিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লিখিত জাতীয়তার উৎপাদক কারণ অতি অল্পই আছে। একরূপ পূর্ব্বস্মৃতি,এক চতুঃসীমার অন্তর্গত থাকা এবং এক শাসনাধীন থাকা ব্যতীত এই সমস্ত ভারতীয় সম্প্রদায়ের এক জাতি হইবার অন্য কোন কারণ লক্ষিত হয় না। বোধ হয় এই জন্যই বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ভারতহিতৈষী ব্রাইটসাহেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, যখন এ দেশের ইংরাজ শাসন শেষ হইবে, যখন ভারত আবার স্বাধীন হইবে, তখন মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে—তখন বর্ত্তমান ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইবে এবং পরিশেষে অবস্থানুসারে সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং পরস্পরের মধ্যে কোন সংশ্রব থাকিবে না।

কিন্তু এ বিষয়ের কোন মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমাদের আর একটী বিষয়ের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে জাতীয়ত্ব সংস্থাপনের যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,সে গুলি বাস্তবিক মুখ্য কারণ নহে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে গুলি হইতেই আমাদের মনের ভাব একপথে নীত হয়,

নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়—তাহাতে পরস্পরের সহানুভূতি বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে তাহা হইতেই একতা সংস্থাপিত হয়। একতাই জাতীয়ত্বের মুখ্য কারণ—একতাই জাতীয় জীবনের বীজ স্বরূপ। অতএব যদি অন্য কোন গৌণ কারণে এই মুখ্য কারণ একতা সংস্থাপিত হয়,তাহা হইলে উক্ত গৌণ কারণগুলির পরিমাণ অনুসারে আমাদের জাতীয়ত্বও সংস্থাপিত হইবে। বিশেষত পূর্ব্বে যে কয়টী গৌণ কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে—সেগুলি সাধারণত স্বাধীন দেশেই ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। এক শাসনাধীনতা স্বাধীন দেশে একতা সংবর্দ্ধনের কারণ; কিন্তু পরাধীন দেশে তাহার শক্তি ও তাহার ফল অন্য প্রকার। বিজিত দেশের পরাধীনতা দ্বারা সমস্ত অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সেখানে বিজেতাদের উৎপীড়নে, অথবা তাহাদের স্বার্থপর শাসনে বিজিতদের স্বার্থ একবারে যায় যায় হইয়া উঠে। সুতরাং সে অবস্থায় আমাদের স্বার্থ ও মনের ভাব এক পথে নীত হইয়া যে সমদুঃখীর সহানুভূতি বৃদ্ধি করিবে—তাহাতেই আমাদের একতা সংস্থাপিত হইতে পারে, ইহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের বলে, কতকগুলি একতাসূচক ঘটনার বলে, আমাদের জাতীয় বন্ধন যে কতক পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইংরাজী ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইতেছে—ইহার দ্বারা আমাদের দেশের এক-ভাষার অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়া পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইতেছে। বাণিজ্য ব্যবসায় বিস্তারের সহিত ভারতের সর্ব্বস্থানে গতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। রেলওয়ে, খাল ও প্রশস্ত সুগম পথ প্রস্তুত হওয়ায় যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধাও হইয়াছে। ডাকের সুবন্দোবস্ত, টেলিগ্রাফের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় সর্ব্বত্র সংবাদাদি প্রেরণ করা বড়ই সহজ হইয়াছে। সংবাদ পত্রের দ্বারা পরস্পরের মনোভাব জানাইতে পারা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে—সিবিল-সার্ভিস আন্দোলনে, বা সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস লইয়া আন্দোলনে সমস্ত দেশ এক প্রকার স্বার্থে বিশিষ্টরূপ আকৃষ্ট হইতেছে। বিশেষত সম্প্রতি ইলবার্ট বিল উপলক্ষে কতকগুলি অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক ঘটনাদ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল,তাহাতে সমস্ত ভারতবাসী একরূপ স্বার্থে আকৃষ্ট হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সহানুভূতি, যেরূপ আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে যে সমস্ত ভারত সম্পূর্ণরূপে একসূত্রে বদ্ধ হইয়া একজাতিতে পরিণত হইবে, তাহার বিলক্ষণ আশা হইতেছে। এইরূপ একতা সংসাধিত হইবার নানা কারণ সত্ত্বেও যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গণ পরস্পর একত্রিত হইয়া একজাতীয়ত্বে পরিণত হইবে না, তাহা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে।

কিন্তু এইরূপ একতা সংস্থাপনের দ্বারা যতদূর জাতীয় সম্মিলন হওয়া সম্ভব, তাহাতে কখনই ভারতের মত বৃহৎ মহাদেশ স্বাধীন ভাবে এক শাসনাধীনে থাকিতে পারে না। বাস্তবিক এরূপ অবস্থা স্বাভাবিক নহে। আর কোন উপায়ে এত বিস্তীর্ণ দেশকে এক শাসনাধীনে রাখিলেও, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ এবং সে দেশের সকল স্থানের সমান উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং একতা

সংস্থাপন হইলেও এবং তাহা হইতে কতক পরিমাণে একজাতীয়ত্ব সংস্থাপিত হইলেও ভারত কখনও এক শাসনাধীনে থাকিবে না,—অতএব সেরূপ চেষ্টা বা আশা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

কিন্তু যদি এমন কোন রূপ অবস্থা হয় যে, ভারতবর্ষ দশ কি পনরটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে স্বাধীন ভাবে তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করে, অথচ অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে পরস্পরে মিলিত হইয়া—পরস্পরে একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে এ সকল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। ঠিক এই উপায়েই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াও পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া একজাতি হইয়াছে। এখন বোধ হয় তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। আমাদেরও মনে আশা হয়, যদি আমরা এখন হইতেই আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলিকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা ও যত্ন করি, তাহা হইলে আমরাও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের মত বিভিন্ন হইয়াও মিলিত থাকিব—বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও, বিভিন্ন শাসনের অধীনে থাকিয়াও আমরা একজাতি হইতে পারিব। এই প্রকারে ক্রমে আমাদের লুপ্তপ্রায় জাতীয় শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিব—এবং কালক্রমে আমরা আবার পূর্ব্বকালের মত জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে পরিগণিত হইব। যাহা হইক, সে কাল্পনিক বিষয়ের এক্ষণে বিস্তারিত উল্লেখ আবশ্যক করে না। যাহাতে উত্তর কালে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না হইয়া—পরস্পরে একতা-সূত্রে বদ্ধ হয়—তাহার জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে আমাদের মধ্যে একতা সংস্থাপনের চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

পৌরাণিক কোমত্ ধর্ম্ম।

ইউরোপীয়েরা যে মিথ্যাবাদী, বোধ হয় একথা বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষে যখন ইংরাজেরা অকুতোভয়ে প্রচার করিতেছে যে, তাহারা জগতে একটা পরাক্রান্ত জাতি; শিক্ষায়, সাহসে, সম্পদে ও বলে তাহারা বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহাদের সত্যবাদিত্বের দৌড় কত দূর। কেনা জানে যে, ইহারা যত যুদ্ধ করিয়াছে, কোন যুদ্ধেই ভারতবাসীকে পরাজিত করিতে পারে নাই, তবুও মিথ্যা রটনা করিয়াছে যে, তাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, ভারতকে পদানত করিয়াছে। ধর্ম্ম আছেন, এরূপ মিথ্যাবাদিত্বের ফল পরলোকে পাইবেন। আমরা ক্ষমাশীল জাতি, ধর্ম্মপরায়ণ জাতি, ইহার জন্য যবনের সহিত কলহ করা অসঙ্গত বোধ করি। ইংরাজদিগের মত ফরাসীরাও যে মিথ্যাবাদী, তাহার প্রমাণ স্বরূপে একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ফরাসীরা প্রচার করেন যে, তাঁহাদিগের দেশে অগস্ত্য কোমত্ নামে এক দার্শনিক পণ্ডিত

জন্মগ্রহণ করেন! ফরাসীরা কিছু নির্ব্বোধ প্রতারক; নামের সকল অংশ উল্টাইয়া দিতে পারে নাই। অগস্ত্য টুকু রাখিয়াই ধরা পড়িয়াছেন; ভাষান্তরিত হইয়া যদিও একটু রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কে না জানে যে, এক ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন, ঋষি অগস্ত্য সূর্য্যদেবের গমনাগমনের সুবিধার জন্য শিষ্য বিন্ধ্যকে প্রণত রাখিয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া যান। এ গল্পের অন্যান্যাংশ মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ঋষি অগস্ত্য যে, সহসা একদিন বিন্ধ্য পার হইয়া চলিয়া গেলেন, এ কথার মধ্যে কোন ভুল নাই। অগস্ত্য কোথায় গেলেন? কোথায়ও যে গেলেন, ইহাত নিশ্চিত, তবে কেমন করিয়া বলিবে যে, তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না? বিশেষত সম্প্রতি আমরা ভূগর্ভে এক খানি পাথর পাইয়াছি, তাহাতে যে সকল শ্লোক লিখিত আছে তদ্দ্বারা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি জাহাজে চাপিয়া লবণাম্বু সুরাসর্পী প্রভৃতি সপ্তসাগর পার হইয়া বহু দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসর পরে এমন কোন শীতপ্রধান দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে চন্দ্রবিন্দুর বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। এ কোন দেশ? শীতপ্রধান দেশে, চন্দ্রবিন্দু-প্রচুর সে কোন দেশে? যদি ভাষাভিজ্ঞতা থাকে তবে কে না বলিবে যে, ইহা নিশ্চয় ফ্রান্সদেশ। আর ইহাও যখন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, যে সময়ে অগস্ত্য সেই দেশে গমন করেন, সে পৌরাণিক যুগের ২। ৩ সহস্র বৎসর পরে, তখন কি নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গেল না যে, অগস্ত্য ঋষি ভারত পরিত্যাগ করিয়া শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে গিয়া উপস্থিত হন? আরও কথা আছে। অগস্ত্য ভারতবর্ষে অবস্থান কালে একবার সাগর গণ্ডুষ করিয়াছিলেন; পুরাণাভিজ্ঞেরা ইহা জানেন। সাগরকে গণ্ডুষ করা, নাস্তিক্য ধর্ম্মমত প্রচার করা প্রভৃতি কারণে লোকে তাঁহাকে কুমতি আখ্যা দিয়াছিল, সুধু তাহাই নহে, ভারতে তাঁহার অবস্থান করাও কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় সেই কারণেই তিনি এমন পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যবনাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, যখন, ফরাসীরা খুব নাস্তিকতা প্রচারের জন্য প্রসিদ্ধ, তখন ঐ দেশেই তাঁহার গমন অধিকতর সম্ভব। ফ্রান্সে তাঁহার এই কুমতি নাম, কোম্ত্ বা কোমতি, এই রূপ উচ্চারিত হয়। যেরূপ অকাট্য যুক্তিতে, দার্শনিক গবেষণায়, পৌরাণিক সূক্ষ্মতায় এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এ সকল স্থিরীকৃত হইল, তাহাতে কাহারও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে না। তবে এখন বুদ্ধিমান পাঠকেরা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সেই অগস্ত্যই যে অগস্ত কোমৎ তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। আর্য্য-ঋষি ভিন্ন কাহার মস্তকে এত মস্তিষ্ক, এবং কাহার মস্তিষ্কে এত বুদ্ধি যে নব ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে? আমাদেরই গৌতমের ন্যায়-শাস্ত্র মিল ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন, আমাদেরই দর্শন, আমাদেরই বিজ্ঞান আজ ইউরোপীয় শাস্ত্রাদিতে প্রতিফলিত এবং অনুকারিত। আমাদিগের ঋষিদিগের যজ্ঞের কয়লা লইয়াই ইংরেজেরা গাড়ী চালায়। ভারত ভিন্ন সম্পূর্ণ মনুষ্য কোথায়? কাজেই জানা গেল যে, কোমৎ বলিয়া কোন ফরাসী যে কোন নবধর্ম্মের প্রচার করিবেন, ইহা তত বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষত

যখন সেই সময়ে ঋষি অগস্ত্য সেই দেশে বাস করিতেছিলেন, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন নিষ্প্রয়োজনীয় যে, তাঁহার বর্ত্তমানে আর কেহ সাহস করিয়া কোন কথা বলিবে বা লিখিবে।

যাহা হউক, পৃথিবীর হিতসাধনার্থ, স্বদেশেই হউক বিদেশেই হউক, ঋষি অগস্ত্য বা অগস্তি কোমৎ বিশুদ্ধ শান্তিপ্রদ মানব দেবীর পূজা প্রচার করেন। এই মানব-দেবীর পূজায় স্ত্রী পূজাই সর্ব্ব প্রধান। আমি যখন ঋষির এই নবধর্ম্ম-মাহাত্ম্য কৃপাময়ী হারিয়ৎ মার্ত্তিনুর প্রসাদে অবগত হইলাম, ইচ্ছা হইল এতদনুসারে কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেখিলাম, বিদেশে প্রচারিত হওয়ায় পূজা পদ্ধতি কিছু বিদেশী রকম দাঁড়াইয়াছে; কাজেই, যদি সহসা জানুপাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গৃহিনীর পদতলে বসিয়া তাঁহার গুণের সমালোচনা করি—হয়ত ব্যাপারটা কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তখন চিন্তা করিতে লাগিলাম, দেশী প্রথায় কি করিয়া এই মহাপূজা পদ্ধতি প্রচলিত করি! ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখি, গৃহিনী ঝাঁটা হস্তে গৃহ-পরিষ্কার করিতেছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে, অজ্ঞাত অপরাধে প্রতিবেশিনীদিগকে, আহার চায় বলিয়া সন্তানদিগকে, এবং অলঙ্কারের অল্পতা প্রযুক্ত আমাকে, এবং হুঁছুট খাইয়াছেন বলিয়া মাতা বসুন্ধরাকে, অর্থাৎ সংক্ষেপে, জগৎ শুদ্ধ সকলকে তিরস্কার করিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ দেশীয় প্রথায় পূজার একটা সুবিধা দেখিয়া সেই স্থানে জানুপাতিয়া বসিয়া গৃহিনীর উদ্দেশে স্তোত্র পড়িতে লাগিলাম। বলিলাম;—"হে দেবি, তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু; পৌরাণিক সময়ে যে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, আজি সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ! সধবার চিহ্নরূপে যে শাঁকা ও খাড়ু পরিয়াছ, উহা তোমার শঙ্খ চক্র; হস্তের ঝাঁটা তোমার গদা; পদ্মের আর অভাব কি, তোমার মুখ পদ্ম, করপদ্ম; এবং আপাতত ভক্তের পক্ষে শ্রীপাদপদ্ম। হে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-ধারিণি! তুমি তিরস্কার করিতেছ, উহা তিরস্কার নহে, সুধা বৃষ্টি। তবে যাহারা অসুর, তাহাদিগেরই ভাগ্যে উহা গরল হইতেছে, নচেৎ আমার মত ভক্তদিগের পক্ষে উহা নিশ্চয়ই সুধা।" আমি এইরূপে নানা প্রকারে স্তব স্তুতি করিতেছি, এমন সময় গুরুতর ইন্দ্রিয়বোধ হইতে লাগিল। উঠিয়া দেখি, পৃষ্ঠে কাঁটা ফুটিলে যেমন রক্তপাত হয়, তেমনি রক্ত পড়িতেছে; ছেলে বলিল, বাবা, মা তোমাকে ঝাঁটা পিটিয়াছেন। সে কথা বিশ্বাস হইল না; আর হইলেই বা কি, দুঃখ ত ভবিষ্যৎ সুখের দূত স্বরূপ, অথবা মহাজনের ভাষায়, The sufferings and difficulties are incidental to progress: আমি কষ্ট পাই, লেও এ পদ্ধতি কাপুরুষের মত পরিত্যাগ করিলাম না। দেশীয় ঋষির সম্মানার্থ কবে ভারতের গৃহে মানব দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হইবে? কবে পৃথিবীতে স্বর্গ আসিবে?

শ্রীকোমত শিষ্য

সুন্দর বনের প্রজা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

শরৎ ফুরাইল, পূজার আমোদ এক বৎসরের জন্য শেষ হইল। অন্ন-চিন্তা সুন্দরবনের প্রজাদিগকে আবার আসিয়া গ্রাস করিল। পূজার পূর্ব্বে যে ধান ও টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, তাহা ৫। ৭ দিবস পরেই ফুরাইয়া আসিল। নায়েব প্রভৃতি জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারিগণ কেহই কাছারীতে নাই; সকলেই পূজার সময়ে বাটীতে গিয়াছেন। এ দিকে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির পরে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের প্রথমে প্রায় সকল প্রজাকেই কাঠ কাটিতে বাদায় যাইতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না, কারণ কার্ত্তিক মাসে মহাজনের কতক টাকা এবং জমীদারের রাসের কিস্তির খাজনা না দিলে রক্ষা নাই। পূজার পূর্ব্বে যে ধান ও টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, বাদায় যাইতে হইলে বাটীতে মেয়ে ছেলেদিগের আহারের সংস্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে; এবং নিজেদেরও আহারীয় সমস্ত সঙ্গে লইতে হইবে; কাযে কাযেই ধান এবং টাকার জন্য নায়েব মহাশয়ের বাটীতে পর্য্যন্ত সকলে নৌকা করিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

নায়েব মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া নায়েব মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল,—'কত্তা' হাপনারা আ'সে বাড়ী বয়েচাও (বসিয়াছ), ওদিরি পূজোর আগে যে ধান দে (দিয়া) আইলে তাতো শ্যাষ হ'লো এখন কি গোরগুষ্টি (সমস্ত পরিবার) নাখাতি পা'য়ে মারা যাব; আবরা বাদায়ই বা কি খা'য়ে যাই। বাদায় না গেলি (যাইলে) হাপনাগের টাহাই বা দ্যাব কোবাতে। আর চাড্ডে (চারিটা) ধান টাহা নাদিলি হবে না।' নায়েব মহাশয় বিরস মুখ আঁধার করিয়া, যেন প্রজার দুঃখের কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, বলিতে লাগিলেন, তা'কি বা করি, এখন কার্ত্তিক মাস জমীদার টাকা কিছুতেই দিবেন না। তবে ধান যাহা চাও পাইতে পার; আমি পত্র দিতেছি, গ্রামের রক্তানের নিকট চাবি আছে, গোলা হইতে ধান দিবে, কিন্তু খবরদার পৌষমাসে সুদে আসলে শোধ করিতে চাও। প্রজারা নায়েব মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল,—'দোহাই কত্তার বাওয়ালি* দাদন কিছু না দিলি এবরা আমরা রেহাৎ (নিতান্ত) মারা পড়্ব। নায়েব মহাশয় সময় বুঝিয়া, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া পরে বলিলেন যে, তাহা আর আমি কি করিব। জমীদার এখন টাকা কিছুতেই দিবেন না। তবে এক উপায় আছে; আমাদের পাড়ার একজন টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট হইতে লইয়া দিতে পারি। কিন্তু সোয়াই সুদে হইবে না; প্রতি টাকায় যদি মাসে ৵০ আনা করিয়া সুদ দিতে পার; এবং কাঠ বিক্রয় করিয়াই

* বনে কাঠ কাটিতে যাইবার এবং আসিবার জন্য পথ খরচের স্বরূপ যে টাকা কর্জ্জ করে, তাহাকে বাওয়ালি দাদন বলে।

আগে তাঁহার টাকা শোধ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে পাইতে পার। কি করে, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি আগত প্রায়। এই সংক্রান্তিতে কৃষকদিগের বড় আমোদ, নানা প্রকার পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে ও ধানের সাধ দিতে হইবে, এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই বনে কাঠ কাটিতে যাইতে হইবে, এ জন্য টাকা নহিলে নয়, কাযে কাযেই ৵০ সুদই স্বীকার করিয়া টাকা লইয়া হাটে যাইয়া সংক্রান্তির * পিঠার জন্য কলা গুড় এবং ধানের সাধ দিবার জন্য সোলার নির্ম্মিত ফুল সকলের অগ্রে কিনিয়া, পরে বাদায় যাইবার জন্য প্রায় ২০। ২৫ দিনের উপযুক্ত তৈল, লবণ তরকারি, হাঁড়ি, জলের পাত্র (বাদায় যাইবার সময় ইহাদের বাটী হইতে জল লইয়া যাইতে হয়, কারণ বাদার জল অত্যন্ত লবণাক্ত) ইত্যাদি লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইল।

নায়েব মহাশয়ের পত্র রক্তানের নিকট দিয়া, তথা হইতে ধান লইয়া বাটীতে আসিলে ক্রমে মেয়েরা চাউল প্রস্তুত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সংক্রান্তিও আসিল। সকলেই আনন্দিত। প্রতি বাড়ীতে নানাপ্রকার পিষ্টক হইতেছে, ছোট ছোট ছেলেরা ২।১ খানি চুরি করিয়া ঘরের আড়ালে দাঁড়াইয়া খাইতেছে। ইষ্ট কুটম্ব, জামাই বৈবাহিকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; যথা সময়ে আসিয়া তাহারা নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদের সহিত আহার করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটী চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল, সকলেই পূর্ব্বদিনের ন্যায় শয়ন করিল। কিন্তু আজ বালক, বৃদ্ধ, যুবক প্রভৃতি কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। রাত্রি থাকিতে সকলেই উঠিবে, যুবক ও বৃদ্ধগণ ধানের সাধ দিতে যাইবে, বালক বালিকাগণ মশা, মাছি তাড়াইবে; এই আমোদে এবং চিন্তায় আর কাহারও চক্ষে সমস্ত রাত্রিতে নিদ্রা বসিল না। এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল দেখিয়া যুবক এবং বৃদ্ধগণ সোলার ফুল, চাউলের গুঁড়া এবং নল লইয়া ধানের সাধ দিতে চলিল। পরে ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্ন লিখিত কয়েকটী কথা উচ্চৈস্বরে স্বর করিয়া বলিতে বলিতে চাউলের গুঁড়া ছড়াইতে লাগিল।

"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আ'সে,
মানক্ষ্মী (লক্ষ্মী) গভ্ভে ব'সে, *
সাধ † খাও বর দ্যাও—হে—
আরের ধান নটী পটি,
আমার ধান বায়ান্ন পটী,
মানক্ষ্মী সাধ খাও—হে—

এইরূপে যাহার যে কয়েক খানা ক্ষেত থাকে, প্রত্যেক ক্ষেতে সাধ দিয়া পরে বাটী আসিল। এইত গেল যুবক এবং বৃদ্ধদিগের কথা। বালকেরাও সকালে সকালে উঠিয়া এক এক খানি কুলা এবং একখানি লাঠি হাতে লইয়া বাটীর সকল ছেলে এবং অল্পবয়স্ক মেয়েরা পর্য্যন্ত দলে দলে প্রতি বাড়ীর মশা মাছি নিম্ন লিখিত কথা কয়েকটী বলিয়া

* সংক্রান্তির বা মাসের শেষদিন, বিশষে আশ্বিন এবং পৌষ মাসের শেষ দিনকে ইহারা সারান বলে এই সারান্ ইহাদের একটী পর্ব্ব বিশেষ।

* এই সময়ে ধানের গাছে থোড় গজাইতে থাকে।

† গর্ভবতী স্ত্রীলোককে যেমন সাধ দেয়, সেইরূপ ইহারা ধান গাছকে লক্ষ্মীর ন্যায় ভাবিয়া গর্ভে থোড় দেখিয়া আশ্বিন মাসের শেষ দিন সাধ দেয়।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলা বাজাইয়া তাড়াইতে লাগিল।*

"এবাড়ীর পোকোড় মাকোড় আর বাড়ী যা, শুয়োর শেল মা'রে খা'য়ে † দূ—উ-র—হ—

বালক বালিকারা উক্তরূপে পর পর তিন চারি বাটীতে মশা মাছি তাড়াইয়া শেষে বাটীতে ফিরিয়া আসিল। বাটীতে আসিয়া আগুন করিয়া হাতে পায় সেক দেয়, এবং কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া হাতে পায়ে লেপন করে। ইহাদের বিশ্বাস, এই প্রকার করিলে শীতকালে শীতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ইহারা শীতকালেও বিনা [illegible] জার্ম্মা ব্যবহার করে না। পরে কিছু বেল কইলে নাটার (ম্যালেরিয়া নাশ[illegible] বন্দুবোর লতা) ডোগা বাটীয়া বটী[illegible] ত [illegible] প্রত্যেকে একটী করিয়া খায়। এইরূপে সংক্রান্তির আমোদ প্রমোদ শেষ করিয়া প্রত্যেক বাটী হইতে প্রায় ২।১ জন করিয়া বাদায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরিধেয় কাপড় গুলি গৃহিনীকে একটু ক্ষার দিয়া কাচিয়া দিতে বলিল। কর্ম্মকার বাটীতে যাইয়া নিজ কুড়ালী ধার করিয়া আনিল। পাথেয় সমস্ত প্রয়োজনমত সংগ্রহ করিয়া কার্ত্তিক মাসের ২রা হইতে ৫।৬ জন করিয়া এক এক নৌকা ভাড়া করিয়া বাদায় যাত্রা করিতে লাগিল। বাটী হইতে যাইবার সময় বাটীর মেয়েরা ক্ষুদে পীর, বনবিবী প্রভৃতি বনদেবীর কত ভোগ মানিতে লাগিল, কেহ বলিতে লাগিল, 'বনবিবী যদি আমাদের তেঁনারে বাদা হইতে বেঅব্যেঘাতে (বিনাবিপদে) আন তালি (তাহা হইলে) সবা আনার (সওয়া এক আনার) ভোগ দ্যাব। এইরূপ কেহ বা স্বামীর, কেহ বা পুত্রের, কেহ বা ভ্রাতার মঙ্গল কামনা করিয়া দেব দেবীর নিকট পাঁঠা, হাঁস ইত্যাদি নানা প্রকার ভোগ মানিতে লাগিল।

মেয়েরা দেবতাদিগের নিকট আপন আপন আত্মীয়ের জন্য যে এত প্রার্থনা করে; তাহার কারণ, বাদায় গেলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর দ্বারা পদে পদে জীবন নাশের সম্ভাবনা, ইহা জানিয়াও ইহারা যাইতে বাধ্য হয়। যাহারা বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল তাহারা বাদায় না যাইয়া নিকটস্থ বিল হইতে মেলে (এক প্রকার লম্বা ঘাস বিশেষ) কাটিয়া আনিয়া তাহা দ্বারা মাদুর প্রস্তুত করিয়া নিকটস্থ হাটে বা ব্যাপারিদিগের নিকট খুব অল্প মূল্যে বিক্রয় করে। এদিকে ব্যবসায়ী ভিন্ন আর খরিদার বড় মিলে না। এই মেলের মাদুর কলিকাতায় যেটা তিন চারি আনায় বিক্রয় হয়, ইহারা এখানে সেটা পাঁচ ছয় পয়সায় বিক্রয় করে। এই রূপে মাদুর বিক্রয় করিয়া অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত অতি কষ্টে সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করে, এবং জমীদারের উৎপীড়নেও খাজানাও কিছু কিছু দেয়।

এদিকে কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিবার জন্য দলে দলে নৌকায় উঠিয়া ২।৩ দিন নৌকা

* সুন্দর বনে মশা মাছি প্রভৃতি নানা প্রকার পোকায় ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে শীত কালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বড় কষ্ট দেয়। সেই জন্য ইহাদের বিশ্বাস আশ্বিন মাসের শেষ দিনে ঐ প্রকারে মশা মাছি তাড়াইলে তাহারা দেশ হইতে দূর হয়; নহিলে শীতকালে থাকে। কিন্তু আমরা বিশেষ জানি, অল্প অল্প শীত পড়িলেই মশা মাছি ইত্যাদি শীতে অনেক মরিয়া যায়, অবশিষ্ট গুলি বনের ভিতর শুষ্ক পাতার নিম্নে শীতের কয়েক মাস কাটায়।

† সুন্দরবনের প্রজাদিগকে বন্যশুকর এবং ব্যাঘ্রে সময়ে সময়ে বড় উৎপাৎ করে বলিয়া ইহারা এই সময় শত্রু-নাশের চেষ্টা পায়।

চালাইয়া ঘোর বাদার মধ্যে উপস্থিত হইল। ইহারা বাটী হইতে আসিবার সময় পথ হইতে ৪।৫ নৌকায় মিশিয়া, এক জন করিয়া ফকীর বা সাঁইদার সঙ্গে আনে। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, ফকীর সঙ্গে থাকিলে বাদায় হিংস্র জন্তুতে কিছু করিতে পারিবে না। এই সকল ফকীর প্রায়ই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা বাদা এবং মনুষ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করে। বনের ফল খাইয়াই প্রায় জীবন ধারণ করে, তবে কাঠ কাটিতে যাইবার সময় আর বনের ফল খাইতে হয় না; যাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তাহারাই আদর করিয়া খাওয়ায়। ফকীরগণ চারি দিকে লম্বা লম্বা সুন্দরি কাষ্ঠ দিয়া ঘেরিয়া তাহার মধ্যে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট ইহারা নানা প্রকার বুজরুকি দেখায় এবং তাহাদিগের উপর ইহাদের অত্যন্ত প্রতিপত্তি। কাঠুরিয়াদিগের মধ্যে সকলেই এক প্রকার কাঠ কাটিবার জন্য বাদায় যায় না। কোন দল জ্বালানি কাঠ কাটিতে, কোন দল সুন্দুরির গুঁড়ি কাটিতে যায়। এজন্য সকল দল এক বাদায় উঠে না। যাহারা যে প্রকার কাঠ কাটিবার ইচ্ছা করে, সেই প্রকার কাঠ যে বাদায় অধিক পাওয়া যায়, তাহারা সেই বাদার নিকটে যাইয়া নদীর মধ্যে নৌকা নঙ্গড় করিয়া বাদায় উঠিবার জন্য ফকীরের অনুমতি প্রার্থনা করে। ফকীর কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া পরে কাঠুরিয়াদিগকে নানা প্রকার দেব দেবীকে ভোগ মানিতে আদেশ করিয়া বাদায় উঠিতে বলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও উঠিয়া কাঠুরিয়াদিগকে নানা প্রকার সাহস প্রদান করে। কাঠুরিয়াগণ ফকীরের আদেশানুসারে ভোগ মানিয়া বাদায় উঠিয়া প্রথমে সুন্দরির সরু অথচ লম্বা লম্বা গাছ দিয়া একটা মেট্ ঘিরিয়া লয়। এই মেট্ এরূপ ঘন করিয়া ঘিরে যে, তন্মধ্যে কোন রূপ পশ্বাদি প্রবেশ করিতে পারে না। কাঠুরিয়াগণ দিনের বেলায় কায করিতে করিতে যখন পরিশ্রান্ত হয়, তখন ঐ মেটের ভিতর গিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করে এবং সন্ধ্যা হইলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নৌকায় ফিরিয়া আইসে। আবার পর দিন সকলে সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় কাঠ কাটিতে বাদায় উঠে।

ক ঘুরিয়াগণ বাদায় যাইয়া প্রত্যেক সমাপ্তি উচ্চৈয়ার স্থানে "সরাও" এই শব্দটী ব্যবহার করে। যেমন, কাহাকেও ভাত খাইতে বলিতে হইলে, "ভাত খাও" না বলিয়া 'ভাত সরাও" বলে। ইহারা অন্যমনস্ক হইয়া কাঠ কাটিতেছে, এমন সময়ে বনের মধ্যে যদি শুকনা কাঠি ভাঙ্গিবার মত "মট্" শব্দ হয়, অমনি তাহারা বাঘ আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সঙ্গীদিগকে "ওরে! মট্‌কী * ভাঙ্গিতেছে" এই কথা বলিয়া সতর্ক হইতে বলে এবং নিজেরাও সতর্ক হয়। নিকটে নৌকা বা মেট্ থাকিলে সেই খানে যাইয়া পালায়। আর দূরে থাকিলে সকলে এক স্থানে একত্র দল বাঁধিয়া দাঁড়ায়। এদিকে বাঘও আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আর পালাইতে

* ব্যাঘ্র যখন শিকার অন্বেষণ কতি থাকে এবং শিকার লক্ষ্য করিয়া তদ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই সময়ে অতি চুপে চুপে পা ফেলিয়া হাঁটিতে থাকে। ইহাতেও যদি দু এক খানা শুষ্ক সরু কাটি পায়ের নীচে পড়িয়া "মট্" করিয়া উঠে, তবেই ব্যাঘ্র মহাশয় মহা বিরক্ত হইয়া কাটি খানি চিবাইয়া ফেলাইয়া দেন।

না পারিয়া নিরুপায় হইয়া হস্তস্থিত কুড়ালি দ্বারাই বাঘের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সামান্য কুড়ালি দ্বারা আর কতক্ষণ যুদ্ধ চালাইবে, কাযেই অনেক সময়ে দলস্থ এক জনকে ছাড়িয়া দিয়া অব্যাহতি পাইতে হয়! কেহ বা দয়াময় ঈশ্বরের অযাচিত কৃপাগুণে কোন গতিকে বাঁচিয়া যায়!! লর্ড লীটনের কীর্ত্তি অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন হওয়া অবধি এই রূপে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে! কারণ, অস্ত্র আইন হওয়ার পূর্ব্বে প্রায়ই সুন্দরবনবাসীরা ঘরে ঘরে একটী করিয়া বন্দুক রাখিত এবং বাদায় যাইতে হইলে, প্রত্যেক নৌকায় ২।৩ টী বন্দুক লইয়া যাইতে পারিত। কাষ্ঠ কাটিবার সময় যখন বনে উঠিত, তখন বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিয়া নিকটে রাখিত, বাঘ আসিলেই তৎক্ষণাৎ বন্দুক ছুড়িয়া বাঘ তাড়াইয়া দিত, অথবা একেবারেই তাহাকে হত্যা করিয়া কতক্ষণের জন্য নিষ্কণ্টক হইতে পারিত; কিন্তু এখন আর সে "যো" নাই। কাযে কাযেই ইহাদিগকে নিরুপায় হইয়া জানিয়া শুনিয়াই কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বাদায় যাইতে হয়। অনেকের এই যাওয়াই শেষ যাওয়া; আর ফিরিয়া আসিতে হয় না!! এইরূপ নানা প্রকার বিঘ্ন বাধার মধ্যে ১০।১৫ দিবস কাঠ কাটিয়া লইয়া, জ্বালানি কাঠ হইলে, দেশের কোন বড় হাটে বিক্রয় করে। কলিকাতার কাঠের আড়তদার সকল উক্ত হাঠ সকল হইতে অল্প মূল্যে কাঠ ক্রয় করিয়া কলিকাতায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। খুঁটী বা গুঁড়ি হইলে, হাটে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের মহাজনের নিকট বিক্রয় করে। সুন্দরবনের নিকটে যে সমস্ত ভদ্র লোক মহাজন বাস করেন, তাঁহারা এই সময়ে অল্প মূল্যে উক্ত কাঠ ক্রয় করিয়া রাখেন, সময়ে কলিকাতায় পাঠাইয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। যত দিন ধান না পাকে, তত দিন ইহারা এইরূপ বাদা হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। কোন দল দুই বার, কোন দল তিন বার, এই রূপে বাদা হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। প্রত্যেক বার কাঠ বিক্রয় করিয়া বাদায় যাইবার সময় এক এক বার বাটী হইয়া যায়। এবং বাদায় যে ২।১ জনকে বাঘে খায় তাহাদের স্থানে বাটী হইতে অন্য লোক লইয়া যায়। এই সময় প্রায়ই বাঘের হাতে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসে যখন ইহারা কাঠ কাটা শেষ করিয়া বাটী আসে; তখন নায়েব মহাশয়গণও সময় বুঝিয়া গ্রামে আসিয়া টাকার জন্য ইহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। গালাগালি তিরস্কার, সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া টাকা আদায় করিতে ত্রুটি করেন না। নায়েব গোমস্তাদিগের দেনা দিয়া যাহা কিছু থাকে তদ্দ্বারা অতি কষ্টে অগ্রহায়ণ মাসের অবশিষ্ট কয়েক দিন চালাইয়া ধান পাকিবার আশায় বসিয়া থাকে।

সংস্কার।

পুংসবন ও অনবলোভন।

শীর্ষকোক্ত পুংসবন ও অনবলোভন, এই দুইটী কার্য্য গর্ভাধানের পর দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় মাসে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে। গর্ভের সংস্কার হইবে, কোন রূপ অনিষ্ট হইবে না, গর্ভস্থ ভ্রূণশরীর নির্ব্বিঘ্নে পুংঅবয়বে গঠিত হইবে, এই প্রত্যাশায় উক্ত কার্য্যদ্বয় অনুষ্ঠিত হইত। "পুমান্ সূয়তে অনেন" অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে গর্ভিণী পুংঅপত্য প্রসব করে, সেই শাস্ত্র বিহিত কার্য্যের নাম "পুংসবন।" পঞ্চগব্য বা পঞ্চামৃত ও ২ মাষা দধি একত্রিত ও মন্ত্রপূত করিয়া শুভদিনে ও শুভ নক্ষত্রে গর্ভিণীকে খাওয়ান হইত, এতদ্ভিন্ন তদ্দিবসে অন্যান্য দৈব কার্য্যও করা হইত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পারস্কর, বিষ্ণু, জাতু কর্ণ ও পরাশার প্রভৃতি সূত্রকার ও সংহিতাকার সকলেই এই দুই সংস্কারের উপদেশ করিয়াছেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যের বিধান অনুসারে প্রথমে পুংসবন, তৎপরে অনবলোভন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। যথা—"অথাস্যৈ মণ্ডলাগার ছায়ায়া মানীতা মোষধীংনশুঃ করোতি।"[আশ্বলায়নগৃহ্যদেখ। পুংসবন ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পর সেই দিনেই সেই গর্ভবতীকে মণ্ডন গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট করাইয়া ঔষধি প্রয়োগ করিবেক।

অনবলোভন শব্দটী বৈদিক; ইহার লৌকিক সংস্কৃত অনবলোপন। লোপেনর ছন্দোঃ বিধানক্রমে ভ হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—

"অনবলুপ্যতে গর্ভোঽনেন" যাহার দ্বারা গর্ভের অনবলোপ অর্থাৎ অবিনাশ হয়; তাহাই অনবলোপন, বৈদিক নিয়ম অনুসারে অনবলোভন। অনবলোভন-সংস্কারের—"পৌত্রমঘংসা নিমায়ম্।"

এই মন্ত্রের "পুত্র সম্বন্ধি পাপ যেন তোমাকে না প্রাপ্ত হয়" ব্যবস্থাও উক্তবিধ সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

সীমন্তোন্নয়ন।

এটীও গর্ভসংস্কার কারক কর্ম্ম। ইতর ভাষায় ইহাকে "সেমন্তন" বলে। আপশুম্বের মতে ইহা কেবল মাত্র প্রথম গর্ভের চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য। সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ইহার প্রথম গর্ভের সপ্তম মাসেই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,"ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ" ষষ্ঠমাসে অথবা অষ্টমমাসে সীমন্ত সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে হোম ও কতকগুলি ঔষধ বন্ধন করা হইয়া থাকে, এবং গর্ভ সংস্করণ করাই ইহার মুখ্য অভিপ্রায়। আর্য্য ঋষিরা এতৎ প্রসঙ্গে সূতিকাগার সম্বন্ধে যেরূপ বিধি ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব উত্তম। তাঁহারা বলেন যে, সূতিকাগারটী গৃহের অগ্নিকোণে অর্থাৎ পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে প্রস্তুত করা এবং তাহা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। যথা—

"ঐন্দ্রেতু বিক্রমস্থানং আগ্নেয়ে সূতিকা গৃহম্।
যাম্যায়াং শয়ন স্থানং বায়ব্যাং পশু মন্দিরম্॥
কৌবের্য্যান্তু ধন স্থানং ঐশান্যাংদেবতা লয়ম্॥
[বশিষ্ট।

ব্যায়ামাভ্যা স গৃহ পূর্ব্বদিকে, সূতিকাগৃহ অগ্নি কোণে, শয়নগৃহ দক্ষিণদিকে, পশুশালা বায়ুকোণে, ধনাগার উত্তরদিকে এবং দেব মন্দির ঈশান কোণেই করিবেক।

পারস্কর বলিয়াছেন যে,——

"প্রবিশেৎ সূতিকাগারং কৃত রক্ষং সমন্ততঃ।
প্রাগদ্বার মথবা স্থদৃঢ়ং শুভম্॥"
[শুভমিতি বায়ু সঞ্চরনাদি না রহিতম্
পত্রীকৃতং স্থদৃঢ় মিতি ভগ্নত্বাদি দোষ রহিতম্]

ভাঙা না হয়, ছেঁদা ফুটো না থাকে, বায়ু সঞ্চারণ হয় ও শুকনো খট্ খটে হয়, পূর্ব্বদিকে কিম্বা উত্তরদিকে দ্বার থাকে, চতুর্দ্দিকে রক্ষা বিধান থাকে, আসন্ন প্রায় নারী এরূপ সূতিকা গৃহেই প্রবেশ করিবেন। এই স্থানে আর একটী অদ্ভুত উপদেশ আছে। কি? তাহা শুনুন।

"এরণ্ড মূল চূর্ণেন সঘৃতেন তথৈবতাম্।
সুখ প্রসবনার্থায়পশ্চাৎ কায়েঽনুলেপয়েৎ।"
[পারস্কর।

সুখ প্রসবের নিমিত্ত সূতিকাগৃহের পিছু দিকে ঘৃত মিশ্রিত এরণ্ড (ভ্রাণ্ডা) মূলচূর্ণের প্রলেপ দিবেক। এরণ্ড মূল চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সূতিকা গৃহের বেড়ায় প্রলেপ দিয়া তদ্গৃহে বাস করিলে সে নারী সুখে প্রসব করিতে পারে, ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা জানি না। এরূপ অনুষ্ঠান কেহ করেন নাই। কাহাকেও আমরা করিতে দেখি নাই; সুতরাং উহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন রূপ মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। ফল কোন্ ঔষধির দ্বারা কি কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা নির্ণয় করা অস্মদাদির দুঃসাধ্য।

জাত কর্ম্ম।

পুত্র জন্মিলে, পিতা অমনি আনন্দে আপ্লুত হইলেন। ভারতবাসী হিন্দুর বিশ্বাস যে, প্রত্যেক মনুষ্যই তিনটী ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাবৎ সেই ঋণ পরিশোধ না হয়, তাবৎ সে পাপী। বিশেষত পিতৃ ঋণ মুক্ত হওয়া গৃহস্থ ব্যক্তির ভাগ্য-সাধ্য; ভাগ্যবান্ না হইলে পিতৃ ঋণ অপাকৃতন হয় না। পুত্র হইলেই পিতা পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হন, পুত্রের মুখ দর্শন করিলে তাঁহার "পুৎ" নামক নরক হয় না। পুন্নামক নরক ত্রাণের নিমিত্ত ও পৈতৃক ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত হিন্দুরা পুত্র কামনা করেন এবং তজ্জন্যই তাঁহারা পুত্র হইলে বিবিধ উৎসব করেন।

" জাতমাত্র কুমারস্য মুখমস্যাবলোকয়েৎ।
পিতা ঋণাদ্বিমুচ্যতে পুত্রস্য মুখদর্শনাৎ॥"
[বশিষ্ঠ স্মৃতি দেখ।

পিতা জাতমাত্র শিশুর মুখ দর্শন করিবেন; কেন না পুত্র মুখ দর্শন করিলে পিতা পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হন।

এই জাতকর্ম্ম সংস্কার পূর্ব্বে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিলে জানা যায়। পুত্র জন্ম হইলে পিতা প্রথমে স্নান, পরে পুত্র মুখাবলোকন, সেই সময়ে পিতৃ লোকের উদ্দেশে ও কুমারের মঙ্গল বৃদ্ধির উদ্দেশে "বৃদ্ধি" নামক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেন।

"জাতে পুত্রে পিতঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।"
[সম্বর্ত্ত।

পুত্র জন্মিলে পিতা বস্ত্রসহ অবগাহন করিবেন, এইরূপ বিধান আছে।

"দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব পুত্রে জাতে দ্বিজন্ম নাম্
আযান্তি তস্মাত্তদহঃ পুণ্যং পূজ্যঞ্চ সর্ব্বতঃ॥"
[সংস্কার ময়ুখ।

দ্বিজকুলে পুত্র জন্ম হইলে তৎকালে তথায় দেবগণ ও পিতৃগণ আগমন করেন,

তৎকারণে সে দিনটী পুণ্য, পবিত্র ও প্রশংসনীয়।

মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন—

"জাতমাত্র কুমারস্য জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
স্তন প্রাশনতঃ পূর্ব্বং নাভিকর্ত্তনোহপিবা॥"

পুত্র জন্ম হইলে তাহার জাতকর্ম্ম সংস্কারটী স্তনপানের পূর্ব্বে কিম্বা নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে করিবেক, শাস্ত্রে ইহা বিহিত হইয়াছে।

"তত্র দ দগৎ সুবর্ণস্তু ভূমিং গাং তুরগং রথম্।"
[সংস্কার ময়ূখ।

পুত্র জন্ম হইলে তৎসময়ে সুবর্ণ, ভূমি, গো, অশ্ব, ও যান দান করা কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সমস্তই গর্ভ সংস্কার মূলক; কিন্তু এই জাতকর্ম্ম সংস্কারটী প্রসূত শিশুর গর্ভানুক্রমণ জনিত দোষ নাশক বলিয়া অনুমিত হয়।

"গর্ভানুপায় দোষানামপনুত্যৈ শিশুংপিতা।
প্রাশয়েন্মধুনা সার্দ্ধংসাজ্যংহৈমরসংশুভম্।'
[আশ্বলায়ন।

শিশু জন্মিবামাত্র তাহার নুপার দোষের অর্থাৎ প্রসব বৈকৃত জনিত দোষের অথবা গর্ভযন্ত্রণা জনিত বিকার বিশেষের বিনাশ জন্য বা দূরীকরণ জন্য পিতা তাহাকে সুবর্ণ ঘৃষ্ট মধু মিশ্রিত ঘৃত অঙ্গুলির দ্বারা খাওয়াইবেন।

'কুমারং জাতংপুরা অন্যৈরালম্ভাৎসর্পি
মধুনা হিরণ্য নিকষংহিরণ্যেন প্রাশয়েৎ॥"
[আশ্বলায়ন গৃহ্য।

কুমার ভূমিষ্ট হইবা মাত্র, অন্য ব্যক্তি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে, মধু মিশ্রিত ঘৃতে সুবর্ণ ঘর্ষণ করিয়া,তাহা সুবর্ণ শলাকার দ্বারা সেই সদ্য-প্রসূত শিশুকে প্রাশন করাইবেন।

"অনামিকয়া সুবর্ণান্তর্হিতয়া মধু ঘৃতে প্রাশয়তি ঘৃতঞ্চ।" [কাত্যায়ন সূত্র।

সুবর্ণাচ্ছাদিত আনামা অঙ্গুলির দ্বারা মধু মিশ্রিত ঘৃত প্রাশন করাইবেক।

আশ্বলায়ণ, গোভিল, গর্গ ও কাত্যায়ণ প্রভৃতি মুনিগণ সদ্য-প্রসূত শিশুকে সুবর্ণ ঘৃষ্টে মধু মিশ্রিত ঘৃত বা ঘৃতযুক্ত ও মধু মিশ্রিত সুবর্ণ রস পান করাইতে বলিলেন কেন? এই কার্য্যের দ্বারা ভূমিষ্ঠ শিশুর কিরূপ সংস্কার হয়? কি কি দোষের শান্তি হয়? তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। দ্রব্যগুণ তত্ত্বজ্ঞ কোন আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত যদি এই কার্য্যের বা এই প্রয়োগের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ইহার যৎকিঞ্চিৎ গূঢ় মর্ম্ম উদ্ভাবন করিতে পারেন, অন্যে নহে।

আমরা যদি এই কার্য্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, প্রসূত শিশুকে মধু মিশ্রিত ঘৃত প্রাশন করাইলে তাহার কণ্ঠনালী সংশুদ্ধ হয়, তৎকারণে সে স্বাস্থ্য অনুভব করে, বিনা ক্লেশে স্তন্য পান করিতে পারে এবং স্বাস্থ্য সূচক কণ্ঠ নিনাদ ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়।

এই কার্য্যের দ্বারা শিশুর বক্ষঃস্থ শ্লেষ্মাবরণ নষ্ট হইয়া যায় এবং অবরুদ্ধ মল মূত্রাদিও অপসৃত হইয়া যায়। কাযে কাযেই শিশু শুস্থতা অনুভব করিয়া নিরাপদ হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে দশ দিন পর্য্যন্ত অতি সাবধানে রাখা আবশ্যক। জন্ম দিন হইতে ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবসে ভয়ানক পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে। মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,——

'জননাৎ সপ্তমে চাহ্নি মৃত্যুরায়াতি যাতকঃ।
দিনে দিনে চ রক্ষেয়ং কর্ত্তব্যায়ুর্বি বৃদ্ধায়॥'

জন্ম হইতে সপ্তম দিবসে শিশুর ঘাতক আগমন করেন, তন্নিমিত্ত তাহাকে প্রথম

দিন হইতে সপ্তম অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিনই রক্ষা বিধান অনুসারে রক্ষা করিবেক। বলি, হোম, ঔষধি বন্ধন, সূতিকাগারের সংস্কার, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রক্ষাবিধান আছে। পূর্ব্বকালে ক্যাষ্টরএল খাওয়ান, প্রসূতিকে চা পান করান, ফ্লানেল পরান, ছিল না। এখনকার ন্যায় ভৈষজ্য চিকিৎসাও ছিল না। বলি, হোম, অগ্নিরক্ষণ, ঔষধি বন্ধন, ও কথিত প্রকারের সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিলেই তৎকালে রোগ সম্ভাবনা বিদূরিত হইত এবং সঞ্জাত রোগও উপশান্ত হইত। তৎকালের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ঐরূপেই হইত।

নাম করণ।

জাতকর্ম্ম সংস্কারের পর এক মাস পর্য্যন্ত নাম করণ সংস্কারের কাল গৃহ্য পরিশিষ্টকার বলেন, এক বৎসর পর্য্যন্ত নাম করণ সংস্কারের কাল থাকে। পিতা শুদ্ধ সিদ্ধ হইয়া বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক পুত্রের (কন্যা হইলে কন্যার) শাস্ত্রানুযায়ী নাম প্রদান করিবেন। পূর্ব্বে এখনকার রমণীমোহন, নটবর, রসময়, রসরাজ, মৃণালিনী, সরোজিনী, নলিনীবালা, নাম ছিল না। নাম প্রদান সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক গুলি নিয়ম প্রতিপালিত হইত। নিয়মানুযায়ী নাম হয়ত সুশ্রাব্য হইত না, না হইলে তাহা রাশি নাম হইয়া থাকিত, ডাকিবার জন্য পৃথক একটী ডাক নাম রাখা হইত। রাশ্যাশ্রিত নাম, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান কালেই উল্লিখিত হইত, অন্য সময়ে তাহা অব্যক্ত থাকিত।

"নাম চাস্মৈদদ্যাদ্যোষব দাদ্যংন্তরস্থ মভিনিষ্ঠানান্তং দ্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা দ্ব্যক্ষরং প্রতিষ্ঠাকামশ্চতুরক্ষরং ব্রহ্মাবর্চ্চসকামো যুগ্ম্যানি ত্বেব পুংসাং অযুগ্যানি স্ত্রীনাম্॥"
[আশ্বলায়ণ গৃহ্য।

বর্গের প্রথমবর্ণ, দ্বিতীয়বর্ণ, জিহ্বামূলীয় উপধানীয় বর্ণ, শ, ষ, স, এই গুলি অঘোষ এবং অবশিষ্ট ঘোষবর্ণ। য, র, ল, ব, এ গুলি অন্তস্থ বর্ণ, এবং বিসর্গ অভিনিষ্ঠান বর্ণ। এই সকল বর্ণ যুক্ত দ্ব্যক্ষর কিম্বা চতুরক্ষর নাম রাখা কর্ত্তব্য।

"দেবতানাংবিশেষেণ পিত্রোর্বা নাম শস্যতে।
নৈব কার্য্যং নৃপাদীনাং নাম জীবন হেতুতঃ॥
পূর্ব্বঃ পরস্য বর্ণস্য হীনস্যাপি ন ধারয়েৎ॥"
(প্রয়োগ পারিজাত।

দেবতা সম্বন্ধীয় নাম ও পৈতৃক সম্বন্ধীয় (বংশ সম্বন্ধীয়) নামই প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত নামই রাখিবেন। রাজার নাম রাখিবেন না। হীন বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের নাম রাখিবেন না, অথবা আপন অপেক্ষা নীচ বর্ণের নামও ধারণ করিবেন না। এখন যদি কেহ প্রয়োগ পারিজাতের বিধান অনুসারে এবং মনুর নিয়ম অনুসারে নাম রাখিত, তাহা হইলে নাম শুনিয়াই সে ব্যক্তি কোন বর্ণ তাহা বুঝা যাইত, কিন্তু ধোপা, নাপিত, কলু, সকলেই সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহর্ষি মনু ব্রাহ্মণের মঙ্গল বোধক নাম,ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য্য-বোধক-নাম, বৈশ্যের ধন বোধক নাম এবং শূদ্রের সেবাদি-বোধক নাম রাখিবার অনুমতি করিয়াছেন। যথা—

"মঙ্গল্যংব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম।
বৈশ্যস্যধনসংযুক্তং শূদ্রস্যতুজুগুপ্সিতম্॥"

কর্ণবেধ।

জন্মকাল হইতে দশম, দ্বাদশ কিম্বা ষোড়শ দিবসে সেই প্রজাত শিশুর কর্ণবেধ সংস্কার করিবেক। প্রতিবন্ধক থাকিলে ষষ্ঠ

সপ্তম ও অষ্টম মাসে কিম্বা পূর্ণ সম্বৎসরেও উক্ত সংস্কার করিতে পারিবেক।

"শাত কুম্ভময়ী সূচী বেধনে ত শুভপ্রদা।
রাজতী বারটী বাপি যথা বিভবতর শুভা।"

[সংস্কার ময়ুখ।

সুবর্ণ নির্ম্মিত সূচীর (সুঁচের) দ্বারা কর্ণ বেধন (কাণ ফুটাইয়া দেওয়া) করিলে শুভ হয়। বিভব অনুসারে রজত সূচী ও লৌহ নির্ম্মিত সূচীর দ্বারাও কর্ণবেধ ক্রিয়া শুভদায়ক হইয়া থাকে।

হিন্দু মাত্রেরই কর্ণবেধ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাণ ফুটাইতে হইবে। কর্ণবেধ না হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব হয় না, কর্ণ বেধ না হইলে হিন্দু হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে অধিকারী হয় না। হিন্দুরা এই মাত্র জানে, কিন্তু কাণ ফুটাইয়া দেওয়ায় শিশুর বাস্তবিক কোন সংস্কার বা সংশোধন হয় কি না, কোন রূপ সুফল বা উপকার হয় কি না, তাহা কেহ জানে না, অনুসন্ধানও করে না। ফল কোন উপকার না থাকিলে ঋষিরা কর্ণবেধ সম্বন্ধে অত কঠোর অনুশাসন করিতেন না। কি উপকার তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু আমরা ঐ কার্য্যের দ্বারা মৃত-বৎসা নারীর মৃত বৎসতা নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। যাহাদের সন্তান বাঁচে না, তাহারা যদি সন্তান হইবামাত্র তাহার কর্ণবেধ অর্থাৎ কান ফুটাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে সন্তান অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

নিষ্ক্রামণ।

তৃতীয় মাসে অথবা চতুর্থ মাসে শিশুর নিষ্ক্রামণ সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হয়। যথা

"অত ঊর্দ্ধং তৃতীয়ে মাসি নিষ্ক্রমণিকা।"

[শঙ্খ লিখিত।

"চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।" [যাজ্ঞবল্ক্য।

তৃতীয় মাসে কিম্বা চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ সংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে।

শ্রীরামদাস সেন

অজ্ঞেয়তাবাদ ও নাস্তিকতা।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, এক জ্ঞানময়ী শক্তি অনন্ত ভুবনে কার্য্য করিতেছে। বিশ্বকার্য্যে শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল স্থলেই শক্তির সত্তা এক মূল সত্য বলিয়া পরিগণিত।* জ্ঞান ও ইচ্ছা হইতে শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই শক্তি কার্য্য করিতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ইচ্ছা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

* আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, জ্ঞান ও ইচ্ছা ভিন্ন শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে,—ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি কার্য্য করিতেছে বলিলেই জ্ঞান ও ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে বলিতে হইবে। আমাদের এই সিদ্ধান্তটী কেহ কেহ অযুক্ত ও অসার বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা আমাদের যুক্তির ভুল প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে ভ্রান্তিপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত, অবশ্য, আমরা উহার সমর্থন করিব। আত্মশক্তি হইতেই

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, জগতের যেখানে শক্তি, সেইখানেই জ্ঞান ও ইচ্ছা বর্ত্তমান, বলিলে কি ভৌতিক উপাসনা ও সর্ব্বপ্রকার জড়োপাসনা সমর্থন করা হয় না? বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, তারা, সূর্য্য সকল পদার্থেই জ্ঞানময়ী শক্তি বর্ত্তমান, বলিলে কি বৈদিক সময়ের আর্য্যগণের ন্যায় সর্ব্বভূতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা প্রতিষ্ঠিত করা হয় না? বাস্তবিক মনুষ্য আদিম অবস্থায়, প্রকৃতির অন্তর্গত উপকারী ও প্রভাবশালী সমুদয় পদার্থেই দেবত্ব আরোপ করিয়া থাকে। পবন দেবতা, বরুণ দেবতা, অগ্নি দেবতা, চন্দ্র দেবতা, সূর্য্য দেবতা প্রভৃতি এই রূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বভূতে জ্ঞানময়ী শক্তি বর্ত্তমান বলিলে সেই আদিম ভৌতিক দেবতাগণকে পুনর্জ্জীবিত করা হয় না?

এ প্রকার আপত্তির কোন কারণ নাই। যদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থে অথবা প্রাকৃতির বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠান স্বীকার হয়, তাহা হইলে আদিম ভৌতিক উপাসনা পুনরুদ্দীপিত করা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান কি বলিতেছে? শক্তি সংরক্ষিণী ("Conservation of energy") নামক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া দিতেছে যে, এক বিশ্বব্যাপিনী শক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করিতেছে; স্বতন্ত্র শক্তি কোথাও নাই। পর্ব্বতে কি ভূগর্ভে, নদীতে কি সমুদ্রে, মরুভূমিতে কি শস্যক্ষেত্রে; নগরে

যে শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্লেটো হইতে মার্টিনো পর্য্যন্ত অনেক ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন। মায়াবাদী বরক্লি এই সত্যটী অতিপরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত হর্শেল ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। স্পেন্সরও যে একথা স্বীকার করেন, তাহা গতবারে প্রদর্শন করিয়াছি। "দেবীভাগবত" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও এই দার্শনিক তত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আত্মশক্তি হইতেই যে বিশ্বব্যাপিনী জ্ঞানময়ী শক্তিতে উপনীত হওয়া যায়, জ্ঞানী মার্টিনো ইহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"It is true, that of the reciprocal propositions, "We push against the wind," The wind pushes against us" we know the force named in the first with a closeness not belonging to our knowledge of the other. We cannot identify ourselves with the wind as our own *nisus* is identified with us. We go out on an energy: We return home on a thought. But that thought is only the reflex of the energy; it has, and can have, no other type. Our whole idea of *Power* is identical with that of *will* or reduced from it. That which, in virtue of the principle of causality, we recognize as immanent in nature, is homogeneous with the agency of which we are conscious in ourselves. Dynamic conceptions have either this meaning, or no meaning. cancel this, and you cut them at the root, and they wither into words; and your knowledge cast out into dry places, has to take refuge again with co-existences and successions. Whatever authority attaches to the law of causality at all, attaches to it, presumably at least, in its intuitive form.—Phenomena are the expression of living energy, and cannot be reduced within narrower limits, unless by express disproof of coincidence between its natural range and its real range. Till that disproof is furnished, the ONE POWER stands as the UNIVERSAL WILL." Modern materialism: by James Martineau L. L. D D. D. Principal, Manchester College.

কি জঙ্গলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই শক্তি। যে শক্তি আমার পদতলশায়ী বালুকারাশিতে, সেই শক্তিই কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জে বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই শক্তি এক; দুইশক্তি কোথাও নাই। সুতরাং আমাদের যুক্তিতে শত শত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুনর্জ্জীবনের আশঙ্কা নাই। জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একমাত্র।

এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি,—"আদ্যাশক্তি ভগবতী," জগতের প্রাণরূপে "জলস্থলশূন্যে সমানভাবে" বিরাজমান। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমভাবে দেখিতেছেন;—ইনি ত্রিনেত্রা। দশদিক্ রক্ষা করিতেছেন,—ইনি দশভূজা। ইনি চিরদিন জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে, দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে সবলতা, কদর্য্যতার পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্য, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি চাতুর্য্য, দুর্নীতির পরিবর্ত্তে সুনীতি আনয়ন করিয়া সংসারকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে ধাবিত করিতেছেন, ইনি চিরদিন মহাপ্রভাবে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন;—ইনি সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী। ইনি জ্ঞানদাত্রী, ধনদাত্রী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী;—ইনি স্বয়ংই স্বরসতী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক ও গণপতি।

এই নিখিল ভুবনব্যাপিনী, অসীম অনন্ত রূপিনী, রূপবিবর্জ্জিতা, সর্ব্বরূপ প্রকাশিনী, ত্রিনেত্রা, দশভূজা, অসুর নাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী মহাদেবীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা॥

বিশ্বের প্রাণরূপা বিশ্বব্যাপিনী এই মহাশক্তিকে যে ব্যক্তি মৃত্তিকা তৃণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে বদ্ধ করিতে ও তথা হইতে বিসর্জ্জন করিতে চায়, তাহার কি মহাভ্রম! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, প্রতিমার সম্মুখে, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পুরোহিত যখন এই মহাবাক্য আবৃত্তি করেন, বুঝেন না তিনি কি বলিতেছেন? যে দিন হিন্দুসমাজে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে, সেইদিন চিরদিনের জন্য হিন্দুহৃদয় হইতে পৌত্তলিকতা দূরে পলায়ন করিবে। অনন্ত শক্তিকে যে পরিমিত স্থানে বদ্ধ করিতে চায়, সে অন্ধ, কিন্তু যে আবার অনন্ত শক্তিকে অন্ধ বলিয়া মনে করে, তাহার তুল্য অন্ধ আর কেহই নাই।

বাইবেল গ্রন্থে আছে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপনার প্রতিকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক রসিকতাপ্রিয় সন্দেহবাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদী বিদ্রূপ করিয়া বলেন, পরমেশ্বর আপনার প্রতিকৃতিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন নাই; মনুষ্য আপনার প্রতিকৃতিতে পরমেশ্বরকে গঠন করিয়াছে। জ্ঞান, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানবীয় গুণ আরোপ করিয়া আদিশক্তিকে মানবের তুল্য করিয়াছে;—সেই মহান্ শক্তির মহান্‌ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে আপনার ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছে।

এই সকল কথায় কি কিছু সত্য নাই? থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে, যদি মহিষের ঈশ্বরজ্ঞান থাকিত, সে মনে করিত যে, পরমেশ্বর এক প্রকাণ্ড মহিষ; তিনি স্বর্গের মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহার যদি সয়তানের জ্ঞান থাকিত, সে মনে করিত যে, সয়তান একপ্রকার কুৎসিত, দুষ্ট মহিষ। ঈশ্বর মহিষের সহিত তাহার সর্ব্বদাই বিবাদ হইতেছে।

মানুষ যে আপনার দুর্ব্বলতা ও পরিমিত ভাব উপাস্য দেবতায় আরোপ করে, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দেবতা আহার করেন, বস্ত্র পরিধান করেন, নিদ্রা যান, মল মূত্র পরিত্যাগ করেন, বিবাহ করেন, বংশরক্ষা করেন, স্ত্রীপুরুষে ঝকড়া করেন, যুদ্ধ করেন, প্রতিহিংসা করেন, তোষামোদবাক্যে ভুলিয়া যান; সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, আবার তজ্জন্য অনুতাপ করেন, ক্রোধে অন্ধ হন, আবার স্তুতিবাক্যে জল হইয়া যান।

মানুষ অনেক পরিমাণে আপনার উপাস্য দেবতায় আপনার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা আরোপ করে, স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া কি পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, বলিতে পারিব না? বিশুদ্ধ জ্ঞান, নির্দ্দোষযুক্তি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী সর্ব্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তি, এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কোন প্রকার নাস্তিকতা এই মহান সত্যকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

পরমেশ্বরকে জ্ঞান, প্রেম, প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট বলিলে কি তাঁহার গৌরব হ্রাস করা হয়? কে বলিল যে,জ্ঞানময় প্রেমময় প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে পরমেশ্বরকে মানুষের গুণ দেওয়া হয়? দেবতাতে মনুষ্যের গুণ আরোপ করা হয় না, মনুষ্যে দেবত্ব স্বীকার করা হয়। মানব-প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে ব্যক্তি দেবত্ব দেখিতে না পায়, তাহার তুল্য অন্ধ আর কে আছে? পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময় বলিলে তাঁহার গৌরব হ্রাস করা হয় না, মানুষের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়। পিতার মত পুত্র, ইহাতে পিতার অপমান কি? স্পেনসর বলেন যে, যদি এরূপ মনে করা যায় যে, ঘড়ির চেতনা আছে ও সে আপনার নির্ম্মাতাকে ঠিক আপনার মত স্প্রিং চক্র প্রভৃতি বিশিষ্ট একটী যন্ত্র মনে করিতেছে, তাহা হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকে সচারাচর যেরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহারই অনুরূপ দৃষ্টান্ত হয়।

একটী ঘড়ির স্থানে দুইটা ঘড়ি কল্পনা করিয়া মার্টিনো উক্ত কথাটীর সদুত্তর দিয়াছেন।* আমরা তিনটা ঘড়ির কল্পনা করিব। প্রথম ঘড়ি পৌত্তলিক; দ্বিতীয়টা একেশ্বরবাদী, এবং তৃতীয়টা অজ্ঞেয়তাবাদী।

পৌত্তলিক ঘড়ি বলিল;—আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি একটা বড় ঘড়ি; আমাদের যেমন স্প্রিং চক্র প্রভৃতি আছে, তাঁহারও সেইরূপ আছে; আমরা যেমন সর্ব্বদা টিক্ টিক্ করিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিতেছেন; আমরা যেমন দুইটা কাঁটাদ্বারা সময় ঠিক্ করিয়া দি, তিনিও সেইরূপ করেন।"

একেশ্বরবাদী ঘড়ি একথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল;—"এরূপ বলা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আমাদের যিনি নির্ম্মাতা তিনি আমাদেরই মত ঘড়ি, এইরূপ স্প্রিং প্রভৃতি বিশিষ্ট, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। তবে

* Essays, theological and Philosophical নামক গ্রন্থে Science, nescience, and faith শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

যখন দেখিতেছি যে, আমাদের মধ্যে জটিল কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একথা বলিতেই হইবে যে, আমাদের নির্ম্মাতার জ্ঞান আছে। কৌশলে জ্ঞান প্রকাশ পায়; নির্ম্মাতা অবশ্য জ্ঞান-বিশিষ্ট।".

অজ্ঞেয়তাবাদী ঘড়ি বলিল,—"ইহা অতি অযুক্ত ও অসার কথা। আমাদের মধ্যে কৌশল আছে বলিয়া আমাদের সৃষ্টি কর্ত্তা বুদ্ধি বা জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। না বুঝিয়া না জানিয়া এমন কথা কেন বলিতেছ? আমাদের মধ্যে যে সকল কৌশল রহিয়াছে, উহা বিকাশের নিয়মানুসারে (Evolution) ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। অবশ্য কোন শক্তি হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, কিন্তু সে শক্তির বিষয় আমরা কিছুই জানি না,—উহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় "

এ স্থলে একটা নাস্তিক ঘড়ি কল্পনা করা যাইতে পারিত। সে বলিত, "নির্ম্মাতা আবার কি? আমাদিগকে কেহ সৃষ্টি বা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? কোন প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতা আছে বলিয়া মনে করা, একটা অমূলক কল্পনা মাত্র। হায়! কবে ঘড়ি জাতি এই মহাভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে! কিন্তু এ স্থলে এরূপ কল্পনার প্রয়োজন নাই।

এখন দেখুন, ঘড়ির দৃষ্টান্তের সহিত কোন্ মত অধিকতর সংলগ্ন হয়। উপমা কিছুই প্রমাণ করে না; তথাচ কেবল উপমা বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ঘড়ির উপমা, অজ্ঞেয়তাবাদীর মত অপেক্ষা, একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মের (Theist) মতই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করে।

মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কিনা, **এই গুরুতর প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি?** পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণ উপনিষদে ইহার উত্তর দিয়াছেন;—

"নাহংমন্যেসুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ।

"আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।"

আমার পরিমিত হৃদয় মনে অনন্তস্বরূপের ধারণা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সামান্য একটী ঘটিতে কেমন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর ধরিবে? কিন্তু আমার হৃদয় মন যত টুকু, অনন্ত পরমেশ্বরের ততটুকু ভাব কি ধারণ করিতে পারিব না? ঘটির আয়তন যতটুকু, প্রশান্ত মহাসাগরের ততটুকু জল কি উহাতে ধরিবে না?

শিশু কি জানে তাহার পিতার কত জ্ঞান, কত ক্ষমতা? তথাচ কি সে তাহার পিতাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারে না? তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি হস্ত দিয়া পিতার পদদ্বয় ধরিতে পারে না? জ্ঞানী, ক্ষমতাবান্ পিতার বিষয় ক্ষুদ্র শিশু কিছুই বুঝিতে পারে না; তথাচ "আমার পিতা" বলিয়া তাহার হৃদয়ের ভালবাসা ও আনন্দ কি প্রকাশ করিতে পারে না? হে জগতের পিতামাতা! তুমি অনন্ত অগম্য হইয়াও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া নিরুপম আনন্দ দান করিতেছ! ধন্য তুমি; ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য তোমার অনুগ্রহ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কে তুমি চমকি যাও?

কোথাকার পথহারা তারা?
লাবণ্য লহরি-ধারা——
দিশেহারা—মাতোয়ারা?
তমোহরা শশী?
ভব-ঘোরা রবিকর?
ধারা-সারা জলধর?
চপল চপলতর?
চপলা রূপসী?

কোথাকার রূপের বিকার?
বিষাদিনী বীণার ঝঙ্কার?
দুঃখীর মুখের হাসি?
বিধবার রূপরাশি?
বরিষার পূর্ণ শশী?
কে তুমি ললনে?
কে তুমি, আপন—পর,
চেন চেন কণ্ঠস্বর—
স্বদেশের সাধা গলা—
প্রণয় প্রসূন মালা।
কে, রূপসী, সন্ন্যাসীর ধ্যানে?
কল্পনে, করুণাময়ি,
কবির স্বপনে?

কোন্ অলক্ষিত ছায়া?
কার মূর্ত্তিমতী মায়া?
কোথাকার মরুবারি?
শ্মশানের ফুল?
কোন্ অকূলের তরী?
সাগরের কূল?
কোন্ পাষাণের স্বেদ,
পাতকি-প্রাণের বেদ,
অনলের উদার আতসী?
কার প্রেম প্রতিধ্বনি,
বিজনের মন্দাকিনী,
প্রকৃতির প্রতিরূপ রাশি?

আমোদিনী—বিষাদিনী—
অনুরাগী—উদাসিনী—
প্রেমাধিনী—তাপসিনী—
কে মানিনী—ভিখারিণী—
অচেনা—বেদেশী!!

কোথাকার তমোহরা তারা?
লাবণ্য-লহরি-ধারা—
দিশেহারা মাতোয়ারা?
রবিশশী হাসি?
এ আঁধারে জোর ক'রে
নিরাশার ঘন-ঘোরে—
কে তুমি চমকী যাও?
চপলে, রূপসি?

শ্রীসরোজকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সদ্যজাত শিশু।

নিস্তব্ধ রজনী ঘোরা, আঁধার দিগন্ত জোড়া,
শব্দ-শূন্য ঢেউ-শূন্য সুস্থির সাগর!
অনাদি হা'রিয়ে গেছে, অনন্ত মিশিয়া আছে,
দিশাহারা সীমাহারা সশঙ্ক অম্বর!

আঁধারের কোলে প'ড়ে, মিশেছে আঁধারস্তরে
তারা শশী রবি আঁখি রয়েছে বুজিয়া!
অফুরন্ত কাল-স্রোত, অচল চকিত-মত,
ভাবিতে কল্পনা-দীপ যায়রে নিবিয়া!

(২)

আঁধারের বুক চিড়ি, স্বপনের কচি পরী,
স্বর্গের অস্ফুট ফুল মন্দার কলিকা ;
স্বর্গের প্রভায় আঁকা, স্বর্গের সুরভি মাখা,
ঊষার রশ্মিটী ভাঙ্গা, সাঁজের দীপিকা ;
সাঁজের আকাশে তারা, মধুর কিরণ ভরা,
অফুটন্ত হাসি টুকু দেববালিকার,
জ্যোতির বিন্দুটী হেন, ছুটিয়া পড়িলি যেন,
মা বাপের বুকে ঢালি সুখ পারাবার।

(৩)

গুপ্তনিধি কোথা ছিলি,কোথায় দিভিরে ঢালি,
ময়ুর কিরণ ফোঁটা আঁধারের বুকে ?
কোন্ খণি খালি ক'রে, কাঙ্গাল মানব ঘরে,
এলিরে এ জনমটা কাটাইতে দুখে ?
এ বাজারে তোর দর, বুঝিবে কি মূর্খ নর ?
অগণ্য রাজার ধন, তুচ্ছ তোর কাছে।
পবিত্র মাণিক তুই, স্থান নাই কোথা থুই ?
পাপের গরলে ডুবি ধরাটা ম'রেছে ! !

(৪)

আজি কি জনম তোর ? যে বলে,সে মূর্খ ঘোর।
দারুণ আঁধার ভেদি দুর্ব্বল নয়ন,
পশেনারে সেই দেশে ; আলোক আঁধারে মিশে,
কল্পনার ডানা ভেঙ্গে হয়রে পতন !
হৃদয় ছুটিয়া ধায়, কিছু দূরে চ'লে যায়,
আঁধার পাষাণে ঠে'কে হয় খান খান !
আঁধারের পর পারে, কবিতা সুধার ধারে,
মহা কবি কলমেতে ছিলি বিদ্যমান।

(৫)

মহান্ সঙ্গীত ধারা, অনন্তের বুক ভরা,
ক্ষুদ্র পরাণটী তোর, অফুটন্ত বোল !
যতই ফুটিবে স্বর, উঠিবে সপ্তম'পর,
বাজিবে নিখিল যন্ত্রে মহাঘোর রোল !
নিশীথ অম্বর ছে'য়ে, ঊষার অনিলে ব'য়ে,
ছুটিবে তরঙ্গ তুলি কতই সঙ্গীত ;
গরল সুধায় মাখা, আশার আলোকে লেখা,
নিরাশার বিষ-পোরা বিষাদের গীত।

(৬)

কত ছবি এঁকে এঁকে, তিলেক পলক থেকে,
সুখের জোছনা বুকে বিষাদ আঁধারে ;
স্বপনের খেলা মত, মায়ার মুরতি যত,
চপলায় লাজ দিয়া মুছে বারে বারে !
প্রভাত কিরণ মাখি, হাসির রেখাটী আঁকি,
কত ফুল ফুটি ব'লে ফুটিল না আর ;
তপন উদিবে ব'লে, আশা দিয়ে গেল চ'লে ;
জীবনের মহাগান অশেষ অপার !

(৭)

উচল অচলে চড়ি, চাঁদের গলাটী ধরি,
আকাশের তারা তুলি গাঁথিলাম মালা ;
আদরে পরিতে হাসি, ছুটিল কিরণ রাশি,
ভুবন ভরিয়া গেল চমকি উজলা !
উচল কমিয়া গেল, অচল সাগর ভেল,
তুফান বহিল তাহে ঘিরিল আঁধার ;
চপলাও নি'বে গেল, শুধু বাজ গরজিল,
জীবনের মহাগান অশেষ অপার !

(৮)

সমুদ্র গরজি গায়, থমকি গিরি দাঁড়ায়,
অশনি ধ'রেছে তান, প্রলয় বাজায় ;
তারা গ্রহ রবি লয়ে, উল্কা ধূমকেতু ব'য়ে,
বিহ্বল ব্রহ্মাণ্ড ছু'টে শূন্য বক্ষে ধায় !
গাইছে মানব গান, অনন্তে প'ড়েছে মান,
জীবনে খাদের ঘর, ফাঁক এ সংসার ;
ললিত ভৈরব রাগ, মৃত্যু নিশীথে বেহাগ,
জীবনের মহাগান অশেষ অপার !

(৯)

ক্ষুদ্র এ পরাণ ল'য়ে, মহাগান কণ্ঠে ব'য়ে,
ক্ষুদ্র পাখিটীরে শিশু, উড়িলি গগনে ;
ঊষার কিরণ ঘটা, উজল কনক-ছটা,
শত ধারে ক্ষরিতেছে, প'ড়েছে বদনে !

ক্ষুদে দুটী পাখা তুলে, প্রভাত সমীরে দুলে,
সুরভির কোলে শুয়ে কুসুম চুমিয়া ;
হেসে হেসে গাও পাখি,যে কদিন আছে বাকি,
কেবলি গাইও পাখি, মরিও গাইয়া।

(১০)

পূর্ণিমার সুধাকর, বরিষি সুধার ধার,
কোটি কোটি তারা সঙ্গে গাইবে যখন,—
সোণালি মেঘের বাস, পরি সাঁজের আকাশ,
কানন কুসুম সঙ্গে গাইবে যখন,—
প্রভাত সাঁজের কোলে, মধুর মধুর বোলে,
পাখী গুলি পাখা তুলি গাইবে যখন,—
ললিত মধুর রাগে, পরাণের অনুরাগে,
হৃদয়ের শত কণ্ঠে গাইও তখন।

(১১)

অযুত আগ্নেয় গিরি, প্রলয়ের তান ধরি,
অগ্নিময় ধাতু স্রোতে গাইবে যখন,—
নিদাঘের তপ্ত বুকে, দাবাগুন কোটি মুখে,
ভীষণ দাপটে গর্জ্জি গাইবে যখন—
ঝঞ্ঝা বাজ ভূকম্পন, শিলা বৃষ্টি বরিষণ,
মৃত্যুর করাল স্বরে গাইবে যখন—
সে আঁধারে মগ্ন হয়ে, হৃদয় বীণাটী লয়ে,
গেও পাখি, শত কণ্ঠে গাইও তখন।

(১২)

গাইতে জনম গান, যত দিন আছে প্রাণ,
জীবনের মহাগীতি গাবি তত দিন ;
মৃত্যুর ওপারে গিয়া, এ আকাশ ছাড়াইয়া,
নবীন গগনে গান ছড়াবি নবীন।
নদী যদি ভোলে গান, পাখী যদি ছাড়ে তান,
প্রভাত সমীর যদি না গায় সঙ্গীত ;
তোর কণ্ঠ শত ধারে, প্রেমের অমৃত ধারে,
গায় যেন গায় শিশু তোর যত গীত।

শ্রীসদানন্দ তর্কবহ্নি।

যোগী অমর-সূনু।

R. W. Emerson, the American Transcendentalist.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানপ্রদীপ্ত, সভ্যতা-মণ্ডিত, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিভূষিত এমার্সন কেন 'যোগী' আখ্যায় আখ্যাত হইলেন ? এই প্রশ্ন সহজেই পাঠকের মনে উদিত হইতে পারে। যোগী বলিলে সাধারণত ব্যাঘ্র চর্ম্ম-পরিহিত, বিষয়ে অনাসক্ত, বিভূতি বিমণ্ডিত, যোগাসনে সমাসীন ব্যক্তি-কেই বুঝা যায়। এমার্সন সে শ্রেণীর যোগী নহেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে যে যোগ পর্য্যবসিত, এমার্সন সেই মহা-যোগে যোগী। বিলাসের লীলাভূমি আমে-রিকার শুষ্ক মরুতে এ হেন নক্ষত্র কিরূপে উদিত হইল ? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, বহুদূর প্রসারিত, মধ্যাহ্ন তপনের ঘোরতর তাপে বিদগ্ধ, বালুকাময় মরুভূমিতে জলাশয় ও তাহার পার্শ্বে সুগন্ধ কুসুম-দাম বিকশিত দেখিলে পথিকের মন যেরূপ আনন্দে বিহ্বল হয়, ঘোর তমসাচ্ছন্ন নৈশ-গগনে শশীর প্রকাশ দেখিলে হৃদয় যেরূপ আহ্লাদে গলিয়া যায়, বর্ত্তমান কর্কশ ও নীরস সভ্য সমাজে এমার্সনের ন্যায় দেবো-পম,ঋষি-তুল্য ব্যক্তির আবির্ভাবেও মন তেমন আনন্দে উৎফুল্ল, বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও আশায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে। কবিত্ব-সুলভ হিন্দুর মন আপনা হইতেই এই ভাবে বিভোর হইয়া উঠে। বাস্তবিকই—এমা-র্সন অমরসূনু (দেব-পুত্র)। দেবভাব

তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়, চিন্তার প্রত্যেক তরঙ্গে, ও রচনার প্রত্যেক বাক্যে প্রতিফলিত। দেবতায় আমরা যে সকল গুণ কল্পনা করি, এমার্সনে তাহার সমস্তই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। মনুষ্য-হৃদয় স্বভাবতই কবিত্ব-প্রিয়, কবিত্ব কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকের জীবনে প্রতিভাত হয়। এমার্সনে এইভাব সম্যকরূপে বিকশিত হইয়াছিল। অবশ্য একথা সত্য, যে ছন্দোবন্দে তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন না। ছন্দোবন্দই যে কবিতা নহে, তাহা এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না; কারণ তাহা হইলে ওয়ার্ডছওয়ার্থ, কিটছ্ ও শেলি এত আদরের জিনিষ হইত না। এমার্সন ছন্দোবন্দে কবিই নন্, কিন্তু হৃদয়ের যে প্রবল তৃষ্ণা, প্রকৃতির অন্তস্তলে নিমগ্ন না হইয়া নিবারিত হইতে চায় না, যে তৃষ্ণা কেবল আধি-ভৌতিক জলে নিবারিত হয় না, আধ্যাত্মিক পানীয় যাহার নিবারক, সেই তৃষ্ণা এমার্সনের হৃদয়ের স্তরে স্তরে বর্ত্তমান ছিল; তাই তিনি কবি। তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের কবি ছিলেন না, তিনি সার্ব্ব-ভৌমিক কবি, আত্মা ও প্রকৃতিই তাঁহার কবিত্বের বিষয়। যে দুরবগাহতত্ত্বে নিমগ্ন হইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দার্শনিকেরাও পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, সেই সমস্ত তত্ত্বে তিনি কবি-জনোচিত কল্পনা ও অমানুষী প্রতিভা-বলে অবগাহন করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। কবি স্বতঃই সৌন্দর্য্য-গ্রাহী, ও শোভানুসন্ধিৎসু। এমার্সন প্রভূত পরিমাণে সৌন্দর্য্য পান করিতেন। এক শ্রেণীর কবি আছেন, যাঁহারা শক্তির উপাসক; জলপ্রপাতের ভৈরব গর্জ্জন, রণ-বীরের রণোচ্ছাস প্রভৃতি শক্তি-সম্পন্ন ব্যাপার তাহাদের কাম্য ও উপাস্য; কিন্তু নির্ঝরিণীর মৃদু মন্দগতি, সাধু ব্যক্তির শান্ত মৃদুল বাক্য তাঁহাদের প্রীতি-কর নয়। কিন্তু এমার্সন যেমন শাক্ত তেমনি বৈষ্ণব ছিলেন। সাধারণ লোকে যে সমুদয় বিষয়কে কবিত্বের অনুপযোগী মনে করে, তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেও কবিতার প্রাণ—শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন; জীবনের অতি সামান্য ঘটনার মধ্যেও ঐশী শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইতেন এবং আত্মার বিচিত্র প্রক্রিয়া সন্দর্শন করিতেন। কবি সেলি যেমন আকাশ ও পর্ব্বতের প্রণয় সম্ভাষণ, সাগরের উর্ম্মিমালার প্রেমালিঙ্গন, সৌর-কিরণ ও পৃথিবীর সুখ-মিলন দিব্য-নেত্রে দেখিতে পাইতেন, এমার্সনও সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের পরিণয়, আত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইতেন। এ সমস্ত তাঁহার অনুমান কি কল্পনার বিষয় ছিল না, এ সমস্ত তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত বিষয় ছিল। প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি কত মধুর—

"The impossible shall yet be done,
And, being two, shall still be one.
As the wave breaks to foam on shelves,
Then runs into a wave again,
So lovers melt their sundered selves,
Yet melted would be twain."

প্রেমজগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, কেন না দুই এক হয়ে যায়। যেমন তরঙ্গ ফেন-সমূহে পরিণত হইয়া আবার তরঙ্গেই পর্য্যবসিত হয়, প্রেমিকেরা তেমনই দ্রব হইয়া বহুধা বিভক্ত হয়, আবার সেই দ্রবীভূত পদার্থ দ্বিধা হয়।

আবার স্থানান্তরে কবি কেমন যত্নের সহিত প্রেমের অপব্যবহার হইতে প্রেমিকদিগকে সতর্ক করিতেছেন,—

"Love's hearts are faithful, but not fond,
Bound for the just, but not beyond;
Not glad, as the low-loving herd;
Of self in other still preferred,
But they have heartily designed.
The benefit of broad mankind."

এদিকে সংসারে অনাসক্ত যোগীর ন্যায় তিনি বলিতেছেন,—

"Good-bye, proud world! I am going home.
Thou art not my friend, and I'm not thine."

ভগবদ্ভক্ত এমার্সন সংসারের ভ্রূকুটীতে উত্ত্যক্ত হইয়া বলিলেন, "ওহে গর্ব্বিত সংসার, তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি, আমার স্বীয় ভবনে যাই, তুমি আমার বন্ধু নও, আমিও তোমার বন্ধু নই। আমি আমার জননীর শান্তি-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আর বৃথাড়ম্বর, ধন-গর্ব্ব আমার নিকট প্রীতিকর বোধ হয় না।" বিলাসের লীলা-ক্ষেত্র, আড়ম্বরের রঙ্গভূমি আমিরিকায় ঈদৃশ ঋষিতুল্য ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব বড়ই প্রীতিপ্রদ। ইহা অতীব চমৎকার দৃশ্য! ভগবদ্প্রেম ও সংসার-বৈরাগ্য, পাশ্চাত্য জ্ঞান, কার্য্য-কুশলতা ও সংসারিকতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

এমার্সন দার্শনিক। যদি সূক্ষ্ম ভাবে দেখা যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রতীতি হইবে যে, এমার্সন অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক। জড়বাদীর সূক্ষ্মানুসন্ধান, প্রত্যক্ষ-বাদীর নিশ্চয় জ্ঞান, ও হিন্দু দার্শনিকের অধ্যাত্ম ভাব সমস্তই এমার্সনে পরস্পর-অবিরোধী ভাবে বর্ত্তমান। অথচ তিনি কোন প্রচলিত দার্শনিক প্রথার অন্তর্নিবিষ্ট নহেন, তাহার অবলম্বিত দার্শনিক প্রথা 'এমার্শনি প্রথা' (Emersonism) বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই তিনি কোন না কোন নিগুঢ় অর্থ অভিব্যক্ত দেখিতেন। জগতের প্রত্যেক বিষয়ই না কোন কোন আভ্যন্তরীণ বিষয়ের জ্ঞাপক-চিহ্ন (Symbol) বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ঐ যে স্রোতস্বিনী মৃদুমন্দগমনে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, উহা কি মানবের জীবনের গতির অনুরূপ নয়? এসমস্ত তিনি কবিতার বিষয় মনে করিতেন না, ইহাই তাঁহার দর্শন। তিনি বেদান্ত-দার্শনিক প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার মত অনেক পরিমাণে বৈদান্তিক মতের অনুবর্ত্তী ছিল। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ রূপে জানিতে চাহেন; তাঁহারা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত আত্মবোধ ও এমার্সনের Over soul নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিবেন!

এমার্সন বলিতেছেন,—

"All goes to show that the soul in man is not an organ, but animates and exercises all the organs; is not a function, like the power of memory, of calculation, of comparison but uses these as hands and feet; is not a faculty, but a light; is not the intellect or the will, is the back ground of our being, in which they lie,—an immensity not possessed and that can not be possessed."

এদিকে শঙ্করাচার্য্য ঠিক সেই কথাই অতি সংক্ষেপে লিখিতেছেন,—

"দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণং।
তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা॥"

এমার্সন যেমন বলিলেন যে, আত্মা কোন যন্ত্র নহে, কিন্তু সমস্ত যন্ত্রকে চালিত ও নিয়মিত করে, অথবা আত্মা স্মৃতি, গণনা, প্রভৃতি কোন বৃত্তি নহে, কিন্তু সমস্ত বৃত্তি

নিচয়কে হস্ত পদাদির ন্যায় ব্যবহার করে; বুদ্ধি কি ইচ্ছা নহে, কিন্তু আমাদের সমস্ত জীবন যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগ-স্থিত যন্ত্রী, তাহাদের নিয়ামক রাজা; ভগবান্ শঙ্করও তেমনি বলিলেন,—আত্মা, দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, রাজার ন্যায় ঐ সমস্ত বৃত্তির নিয়ন্তা ও সাক্ষী।

আত্মা যে সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ, অন্য কিছুর সাহায্যে যে তাহার জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, ইহা এমার্সন পুনঃ২ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন,—"স্ববোধে নান বোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ। নদীপস্যান্য দীপেচ্ছা তথা সাত্ম প্রকাশনে॥"

আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু, এমার্সনের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও প্রাচীন আর্য্যগণের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে এত সৌসাদৃশ্য আমাদিগের নয়ন সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন যে, আমরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। শত শত নদ নদী, যোজক প্রান্তর, দেশ ও মহাদেশে, আর্য্য ঋষিগণের ভাব ও মার্কিন যোগীর ভাবকে বিভিন্ন করিতে পারে নাই, শত সহস্র বৎসরেও তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে নাই। আর পারিবেই বা কেন? তাঁহাদের আত্মা ত সময় ও দেশের অতীত (Beyond time and space)। সমস্ত গুলি সাদৃশ্যের উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে, যাঁহাদিগের সমস্ত বিষয় জানিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগকে আমরা এই মহাত্মার গ্রন্থ নিচয় ও আর্য্য-দার্শনিকদিগের মত সমূহ যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার রচনা এমনি মধুর যে, যাহার মন একবার ঐ মধু পানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তৃপ্তি উহাতেই সম্পন্ন হয়। এক সমালোচক বলিয়াছেন যে, সেই খানিই উৎকৃষ্ট উপন্যাস, যাহা যত অধিক পাঠ করি, ততই রসাল প্রতীয়মান হয়। আমরা বলি, সেই দর্শনই দর্শন, যাহা কেবল কঠোর, যুক্তি ও তর্কের উপর বিন্যস্ত না হইয়া হৃদয়ের কবিত্ব ও কোমলতার উপর স্থাপিত এবং যত অধিক বার পাঠ করা করা যায়, ততই উহা প্রীতিকর বোধ হয়। এমার্সনের দর্শন সেই শ্রেণীর। সাধারণত প্রচলিত দর্শন-নিচয় যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আমাদের তর্ক-বুদ্ধির তৃপ্তিসাধন করে, কিন্তু যে সমস্ত মর্ম্ম-স্পর্শক্ প্রশ্ন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশকে আলোড়িত করে, তাহার উত্তর দানে অসমর্থ। কিন্তু এমার্সন যুক্তিমার্গ পরিহার করিয়া ভাব-মার্গে সেই সমস্ত তত্ত্বের উদ্ধার করিয়াছেন। কবিত্ব ও দর্শন তাঁহাতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়াতেই তাঁহার পথ এত সুগম হইয়াছিল। ভাগবত্কার এ সম্বন্ধে এমার্সনের প্রতিযোগী। তিনি ঐ শ্রেণীর দার্শনিক, যিনি বিশ্লেষণ সংগঠন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন না করিয়া এক দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিতেন। তাঁহার রচনার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে অনেক গ্রন্থেও শেষ করা যায় না; এমন কি, এক এক পংক্তি লইয়া এক এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যায়। আমরা সাধারণ ভাবে কয়েকটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। এমার্সনের ভাষা তত সুসংস্কৃত নয়, তেমন ওজস্বিনীও নয়, কিন্তু ভাব, যাহা ভাষার প্রাণ, তাহা এতই উচ্চ যে, পড়িতে পড়িতে, তিনি কোন্ ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইতে হয়, এবং ঐ ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার রচনায় এমন কিছু আছে, যাহাতে চিত্তকে একেবারে ভুলাইয়া ফেলে; এমন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে, যাহাতে

প্রাণকে উন্মত্ত করে, আত্মাকে উন্মেষিত করে, মত গুলিকে সংস্কৃত করে, ভাবগুলিকে প্রসারিত করে। তাঁহার বাক্যগুলি গ্রন্থবন্ধনের ন্যায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখে মুখে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার রচনাও ইংরেজী ভাষায় অতুলনীয়। এক কার্লাইল তাঁহার সহিত এক দৃষ্টিতে অনেক বিষয় দেখিতেন। কার্লাইলের ভাষা জল-প্রপাতের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় পাঠকের মনে বিস্ময়োৎপাদন করে; এমার্সনের ভাষা নির্ঝরিণীর কুলু কুলু নাদের ন্যায় পাঠকের মনে প্রীতির সঞ্চার করে। কার্লাইলের ভাষা বিদ্যুৎ-যন্ত্রের ন্যায় এক অননুভূতপূর্ব্ব শক্তি সংক্রা[illegible]রে, এমার্সনের ভাষা মৃদু মৃদু সঞ্চারে এক অনির্ব্বচনীয় শান্ত ভাব উৎপাদন করে। কার্লাইল ও এমার্সন উভয়েই শক্তির উপাসক ছিলেন, কার্লাইল কেবল প্রচণ্ড শক্তিরই পূজা করিতেন, এমার্সন সে শক্তিরও পূজা করিতেন, অতি সামান্য ঘটনায়ও যে শক্তি প্রকটিত হয়। উভয়েই প্রতিভা-পূজক ছিলেন। যে প্রতিভা স্বীয় বিকাশে জগৎকে মাতাইয়াছে, যে প্রতিভা লোকের চিন্তা-রাজ্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে, যে প্রতিভা লোকের মনকে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মদিরায় প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে, কার্লাইল সেই প্রতিভার উপাসক ছিলেন, কিন্তু এমার্সন, যে প্রতিভা আরণ্য কুসুমের ন্যায় চতুর্দ্দিক সৌরভলহরীতে আমোদিত করিয়া শুকাইয়া যায়, যে প্রতিভা বাষ্পযন্ত্র আবিষ্কারেও প্রয়োজিত হয়, সামান্য ঘটপটাদি নির্ম্মাণেও ব্যয়িত হয়, সে প্রতিভারও পূজা করিতেন। এমার্সনের হৃদয় সর্ব্বদা প্রেম পরিপূর্ণ থাকিত। যে প্রেম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে সংবদ্ধ না হইয়া জগতের সমস্ত নরনারীতে প্রসারিত হয়, যে প্রেম কেবল মনুষ্যে নিবদ্ধ না হইয়া সামান্য পশু পক্ষীতেও বিস্তৃত, যে প্রেম তাহাতেও পর্য্যবসিত না হইয়া বৃক্ষ লতাদিতে গড়াইয়া পরে, এমার্সন সেই প্রেমের অধিকারী ছিলেন। এবিষয়েও তিনি আর্য্য-ঋষিদিগের সমতুল ছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঋষিদিগের আশ্রম-বর্ণনা কত সুন্দর। মার্জ্জার, এণক-শিশু, শুক প্রভৃতি পশু পক্ষী এবং সহকার, দেবদারু প্রভৃতি তরু, ও মাধবী লজ্জাবতী প্রভৃতি লতার প্রতি ঋষি ও ঋষিকন্যাদিগের কত স্নেহ ছিল। এমার্সনেরও ঠিক সেইরূপ ছিল। এমার্সনের জীবনের কার্য্যাবলী ও তাঁহার রচনায় প্রকটিত মত সমূহের এত সামঞ্জস্য যে, দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য যেন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের গূঢ় আন্তর্ভৌমিক ক্রিয়া সমূহের অস্ফুট ধ্বনি। এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় যে, লোকের বাক্য ও জীবনগত কার্য্যের সম্পর্ক অতি অল্প, কিন্তু এমার্সন সম্বন্ধে এ কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। তিনি এমন সহৃদয়তা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞান-লিপ্সা ইউরোপ প্রভৃতির পাশ্চাত্য জ্ঞান-সমূহে নিবৃত্তি করিতে পারিত না, এসিয়ার দুরধিগম্য শাস্ত্র ও কাব্য নিচয়ও তাঁহার পঠনীয় ছিল। হিন্দু-দর্শন ও ভাগবত, মুসলমান-কাব্য সাদী ও হাফেজ তাঁহার অতি আদরের জিনিষ ছিল। সাদী সম্বন্ধে তিনি এমন এক মনোহর কবিতা লিখিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় এক আশ্চর্য্য আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়।

তাঁহার জীবন যে কেবল মানবের কমনীয়

বৃত্তি নিচয়েব সম্পূর্ণ বিকাশেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা নহে; যে সমস্ত ভাব ও বৃত্তি বীর্য্য-সম্পন্ন, জ্বলন্ত হুতাশনবৎ বীর হৃদয়েই শোভা পায়, যোগী এমার্সনের জীবনে তাহারও অপ্রতুল ছিল না। যাঁহারা দাসত্ব প্রথা ধ্বংশের প্রাক্‌কালীন আমেরিকার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যে সমস্ত পুণ্য শ্লোক মহাত্মারা ঐ প্রথা উন্মূলনের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন কত বিঘ্ন-সমাকুল হইয়াছিল। যাঁহার বজ্র-নির্ঘোষ-তুল্য ধ্বনি একদিন দাস-ব্যবসায়ীদিগের ত্রাসের কারণ হইয়াছিল, সেই মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার, একদা আশ্রয়বিহীন হইয়া এমার্সনের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেনে। এমার্সনের দ্বার অবারিত ছিল,দাসব্যবসায়ীদিগের ভ্রূকুটী তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য-পথ হইতে একপদও বিচলিত করিতে পারে নাই।

বিনয় তাঁহার জীবনের এক অমূল্য ভূষণ ছিল। জগতের সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, যেমন অলোক-সামান্য প্রতিভা তাঁহাদের জীবনের এক আশ্চর্য্য উপাদান, বিনয়ও তাহার অন্যতম। এমার্সনের বিনয় সাধারণ সীমা অতিক্রম করিয়াছিল ; তিনি, "আমি" এই শব্দ প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন,তাহার পরিবর্ত্তে 'এই ব্যক্তি" (The person) এই কথা ব্যবহার করিতেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের নূতন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জগতের সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতির পক্ষে যে নিউটন যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন,আমি বেলাভূমিতে কেবল উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞানের অনন্ত জলধি আমার সম্মুখে রহিয়াছে। পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিগণ বিনয়ের অবতার স্বরূপ।

মানবের জ্ঞানের চরম অবস্থা—বিস্ময় ; কার্লাইল এই বিস্ময়-প্রকাশকে আরাধনা বলিয়াছেন। যখন যোগী যোগনেত্রে বিশ্ব-রাজ্যের কৌশল ও শৃঙ্খলা বিলোকন করেন, তখন তাঁহার অস্তিত্ব সেই কৌশলপূর্ণ শৃঙ্খলা-সমন্বিত প্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। এমার্সনের বিস্ময় ও প্রকৃতি-জ্ঞান সেই শ্রেণীর ছিল। জড়বাদীরা যেমন জড় জ্ঞানে ক্ষিপ্ত হইয়া, বিশ্বসংসারে জড় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না,—আত্মা তাঁহাদের নিকট আকাশ-কুসুম ; এমার্সনও আবার জড়ের ম[illegible] আত্মা ভিন্ন কিছুই দেখিতেন না। তাই বলিতেছি যে তিনি বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও প্রণালী অবজ্ঞা করিতেন,তাহা নহে ; সেই সমস্ত নিয়মের প্রতি তাঁহার অহেতুকী শ্রদ্ধা ছিল। যদি পশ্চিম দেশে এই যোগী প্রবরের কেহ সমকক্ষ হন,তবে তিনি কার্লাইল। কথিত আছে, উভয়ে উভয়ের প্রতি সমাকৃষ্ট হইয়া, একদা এক স্থানে মিলিয়া ছিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ থাকিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিবার সময়ে উভয়েই বলেন,"আমাদের জীবনে এমন মধুর সংলাপ আর সম্ভোগ করি নাই।" রত্নেই রত্ন চিনে, আত্মাই আত্মা চিনে, এই সামান্য ঘটনাটী এ কথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

হে ভারতবাসি, চিরকাল তোমরা কাব্য প্রিয়, কবিত্ব তোমাদের জীবনেব অদ্বিতীয় আভরণ, আধ্যাত্মিকতার জন্য তোমরা জগদ্বিখ্যাত, তোমরা কি এই ঋষিপ্রবরকে উপযুক্ত সম্মান করিবে না ? যদি বিজন অরণ্য-মধ্যে এক ছড়া কুসুমহার পাও, তবে কি তাহা যত্নের সহিত কুড়াইয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে না ? কেবল স্বদেশ প্রেমিকতার ভাণ করিলে চলিবে না, যে সমস্ত গুণে আর্য্যগণ এক সময়ে জগতে বন্দনীয় ছিলেন, সেই সমস্ত গুণ ও ভাব যেখানে পাও, সেই খানে গমন কর ও সেই সমস্তকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লও ; তবেই না আর্য্য-গৌরব রক্ষিত হইবে ! সমস্ত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, তাঁহারা এই মহাত্মার গ্রন্থ নিচয় পাঠ করেন। মানুষকে, মানুষ বলিয়া পূজা করিতে কোনই দোষ নাই। প্রত্যেক মানুষেই দোষ আছে, এমার্সনেও আছে। গুণ গ্রহণেই মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা ; তজ্জন্যই আমরা এমার্সনের দোষের উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস।

নবলীলা।

তৃতীয় খণ্ড।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বার্থের ছায়া!

ক্ষণকাল পরে সেই নিস্তব্ধ নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া ফকীর মস্‌জিদে ফিরিয়া আসিল। ফকীর সকল চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছে ; সে বলিত, সে ভবিষ্যৎ-বক্তা। ভবিষ্যৎবক্তা কি না, তাহা জানি না, কিন্তু অদ্যকার সকল চক্রান্ত সে বুঝিয়াছে। ফকীরের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, গলায় বাস্তকীর মালা ;—দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—মস্তকের কেশ পাকিয়াছে,—পাকিয়া কতক পড়িয়া গিয়াছে, কতক আছে। আকৃতি দীর্ঘ, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ নহে। ফকীর দরজা খুলিয়া মস্‌জিদে প্রবেশ করিল। অনাথিনী পায়ের শব্দেই বুঝিয়াছিল, ফকীর আসিয়াছে ; সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ফকীরের পাদ-বন্দনা করিল। ফকীর বলিল, আজ কি লোকনাথপুর হইতে কোন লোক এসেছিল ?

অতিমৃদু স্বরে অনাথিনী বলিল,—'কিছুই জানি না। একাকিনী সমস্ত দিন মস্‌জিদেই ছিলাম।'

ফকীর।—আর কোন দিন কোন লোক এসেছিল ?

অনাথিনীর শরীর সিহরিয়া উঠিল, নির্ভয়ে বলিল,—লোকনাথপুরের রাণীর পরিচারিকা করালী একদিন এসেছিল।

ফকীর।—কেন আসিয়াছিল, তা জান ?

অনাথিনী।—জানি। আমার অনুসন্ধান লইতে এসেছিল।

ফকীর।—তোমার কথা তাহারা কেমনে জানিল ?

অনাথিনী।—তাহা কিছুই জানি না।

ফকীর।—করালী তোমাকে কি বলিয়াছিল ?

অনাথিনী সে কথা বলিবার সময়ে একটু ভাবিল, পরে বা কপালে থাকে ঘটিবে, মনে করিয়া বলিল—"বলিয়াছে আমার—ইচ্ছা হইলে লোকনাথপুরের রাণী কৃপাময়ী আমাকে এইস্থান হইতে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছেন!

ফকীর অবিচলিত গম্ভীরভাবে পুনঃ বলিল,—তুমি কি বলিলে ?

অনাথিনী বলিল, বলিলাম, ইচ্ছা নাই ? আমার প্রতি তাঁহার কৃপা হইলে আমি বাঁচিব!

ফকীরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিল তোমার ইচ্ছা কি?

অনাথিনী।—ইচ্ছা, প্রাণান্তেও মুসলমানের পাণিগ্রহণ করিব না। আমি বুঝিয়াছি, নিঃস্বার্থ ভাবে পৃথিবীর কোন লোকই পরোপকার করিতে পারে না।

ফকীর।—যদি তাহাই বুঝিয়াছ, তবে আবার লোকনাথপুরের রাণীর শরণ লইবে কেন? তাহার হাতেও ত তোমার অমঙ্গল ঘটিতে পারে!

অনাথিনী।—পারে, সে কথা সত্য! কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। যখন অমঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিব, তখন তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিব; এখন তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইলেই বাঁচি।

ক্রোধে ফকীরের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বলিল, আমার নিকট হইতে তুই যে উপকার পাইয়াছিস্, তাহার প্রতিশোধ কি দিবি না? দিতেই হইবে; নচেৎ চণ্ডালিনি, তোকে আবার সেই বিপদে ফেলিব।

অনাথিনী।—তুমি সকলই পার। উপকার করিয়া যে তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে চায়, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কথা আজ থাকুক, এক্ষণ তুমি কি চাও?

ফকীর একটু স্থিরভাবে বলিল,—তুমি এই কোরাণের শরণ লও, এই ইচ্ছা; ইহাই চাই।

অনাথিনী।—তাহা প্রাণান্তেও পারিব না। ইহা ভিন্ন আর কি চাও?—আমার শক্তিতে আর যাহা দিবার থাকে, দিব।

ফকীর।—তুমি একাকিনী থাকিবে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে, তোমার বিবাহ দিতে চাই।

অনাথিনী।—তাহাও পারিব না। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতে পারি, তবুও ইহা পারি না।

ফকীর।—কেন পারিবে না?—তুমি ত যুবতী!

অনাথিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফকীর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, সকল কথা তোমাকে বলিব না। যাহাতে সম্মতি দিতে পারিব না, সে কথায় কাজ কি?

ফকীর।—বলপূর্ব্বক তোমার সম্মতি লইব; তুমি কি আমার সহিত বলে পারিবে?

অনাথিনীর চক্ষের জল মাটীতে পড়িল, বলিল, কিছুই করিবার আমার শক্তি নাই। তবে মা সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাকিতেছি, তাঁহাকে যদি বৃথাই ডাকা হইয়া থাকে, তবে নয়, নিজে অকূল সমুদ্রে ভাসিব। অকূলে ভাসিয়াও নূতন শিক্ষা পাইব। দুঃখ ও কষ্টকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্য ভুলিতে পারি না। ভবিষতের অনিষ্টের কথা ভাবিয়া কখনই বিবেক-বিরুদ্ধ কথায় সায় দিতে পারি না।

ফকীর।—তুমি একান্তপক্ষে যদি বিবাহই না কর, তবে যে সর্ব্বস্বের কথা বলিলে, তাহাই আল্লার নামে লিখিয়া দেওনা কেন?

অনাথিনী বলিল, আমি দুঃখীর মেয়ে, আমার সর্ব্বস্বের অর্থ টাকা কড়ি নহে, আমার কিছুই নাই; তোমাকে কি দিব?

ফকীর।—যদি কিছু থাকে, তবে তাহাই লইব, কিছু না থাকে, পাইব না, সেত আমারই ক্ষতি, তোমার দিতে বাধা কি?

অনাথিনী—আচ্ছা, আমার যাহা আছে সকলই তোমাকে দিলাম।

ফকীর।—কথায় হইবে না। কোরাণ স্পর্শ করিয়া লিখিয়া দেও।

অনাথিনী কোরাণকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া কলম ধরিয়া লিখিল—"অনাথপুরের ফকীরের আল্লার নামে আমার যাহা কিছু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সম্পত্তি আছে, সকলই দিলাম।" লিখিয়া বলিল, কোরাণকে আমি মানি না; কিন্তু তাহা স্পর্শ না করিলেও আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না, ঠিক জানিবে।

ফকীর মৃদু মৃদু হাসিল, বলিল, এই কঠিন প্রতিজ্ঞা কি তুমি প্রতিপালন করিতে পারিবে?

অনাথিনী।—মা সর্ব্বমঙ্গলার আশীর্ব্বাদে পারিব।

ফকীর।—মনে আপনাকে দরিদ্র ভাবিতেছ, তাই মনে একটুও কষ্ট হইতেছে না; বোধ হয়, তোমার সম্পত্তির বিষয় জ্ঞাত থাকিলে কখনই এরূপ করিতে না; কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে মত দিতে, তবুও সম্পত্তি দিতে না।

অনাথিনী।—তোমার যেমন বিশ্বাস তেমনই থাকুক। মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, ইহাই মঙ্গল। তবে আমি এক্ষণ বিদায় হই। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে? তবে আমি যাই?

ফকীর।—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। ইচ্ছা হইয়া থাকে, মস্‌জিদ্ পরিত্যাগ করিয়া যাও।

অনাথিনী সজলনেত্রে ফকীরের পানে চাহিল, সে দৃষ্টিতে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল, চাহিয়া বলিল, সত্যই যাইতে বলিতেছ? প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিতেছ?

ফকীর আর কথা না বলিয়া মস্‌জিদের বাহিরে গেল। অনাথিনী ক্ষণকাল মস্‌জিদে বসিয়া ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিল। পরে নির্ভয়ে সেই গাঢ় রজনীতেই মস্‌জিদ হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া বাহির হইল। বাহিরে যাইয়া ফকীরকে আর দেখিল না; সুতরাং একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করিল। কেহই দেখিল না, দেখিবার লোক তখন সেখানে ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশার গভীর উত্তেজনায়!

গৌরবিনী নির্ভয়ে মস্‌জিদের বাহিরে আসিল। কাহার আদেশ, কে সহায়, তাহা কিছুই বুঝিল না, তবুও এমনি অবস্থা হইল, মস্‌জিদে থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম,—স্বার্থ, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, উপকারীর হৃদয়ে এই সকলের আধিপত্য ও বিস্তৃতি দেখিয়া প্রাণ আকুল হইয়াছে, অধর্ম্মের দুর্গ হইতে বলপূর্ব্বক কে যেন অনাথিনীকে বাহির করিল। ক্ষীণ দেহে নবতেজ, নবস্ফূর্ত্তি চমকিতেছে—মলিনতা ঘুচিয়া দিয়াছে—মাথার রুক্ষকেশগুলিও যেন নির্ভয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে—অবলা অনাথিনী বাহিরে নামিয়া গাঢ় অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিল। সপ্ত পৃথিবী আশায় মাতিয়া অনাথিনীর চতুর্দ্দিকে যেন ঘুরিতে লাগিল। হৃদয়ের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে মনে মনে ভাবিল,—আমি কে যে পাপীকে ঘৃণা করিতেছি?—আঁধার গৃহের চির আঁধারে আমি, আমার মনে কেন ঘৃণা হইতেছে? পাপী পাপীকে ঘৃণা করিবে?—আমা দ্বারা একটী পাপীও যদি উদ্ধার হইত, মা সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীপাদপদ্মে সহস্র সহস্র কুসুমাঞ্জলি দিতাম! তবে যাইব না! ফকীরের সহিত কি তবে মিলিব? মিলিব, বিবাহ-সূত্রে,—পাপসূত্রে? মা সর্ব্বমঙ্গলা জানেন, আমা

দ্বারা তাহা হইবে না! পাপে আমি পাপ মিশাইব না—অধর্ম্মে অধর্ম্ম মিলাইব না! আমিই বা মিলাইতে কে? সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলের রাজ্যে অধর্ম্ম পাপ থাকিবে না। আমি ত তাঁহারই, এ দাসী ত তাঁহারই! আকাশের নক্ষত্র, অরণ্যের বৃক্ষ, তোমরা সাক্ষী—আমি আমার নহি! যে দিন হইতে দৈববাণী শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার এ পরাণি তাঁহাকে দিয়াছি;—তিনিই রাখিয়াছেন, তিনিই রাখিবেন, তিনি ভিন্ন সকলই অসার। মা, তবে তুই কাছে আয়! অনাথিনীর হৃদয়রতন—জীবন ধন, তুই প্রাণে আয়, পথ দেখাইয়া তুই আমাকে এই আঁধার পার করিয়া লইয়া চল। মাতৃ-হীনার মা, তুই আঁধার পার কর,—তুই মঙ্গলের পথে, শান্তির পথে, ধর্ম্মের পথে লইয়া চল। অনাথিনী অশ্রুতে বদন ভাসাইয়া আঁধারকে লক্ষ্য করিয়া পাগলের ন্যায় এই প্রকারে কত কথা বলিল। পাগলের ন্যায় মাতাকে কত তিরস্কার করিল, কত ভৎর্সনা করিল। পরে যখন বল পাইল, তখন আঁধারের মধ্যে ঝাঁপ দিল। যে আঁধার বন্য ব্যাঘ্র, বন্য হিংস্র-জন্তুতে পূর্ণ, সেই আঁধারে ঝাঁপ দিল।

ফকীর বাহিরে যাইয়া একবার অরণ্যের দিকে চাহিল, আর একবার চাহিল—আপনার হৃদয়ের পানে। চাহিয়া মনকে জিজ্ঞাসা করিল—এই খানেই কি বাসনার নিবৃত্তি?—এই খানেই কি আশার পরিসমাপ্তি? আমার পক্ষে পরিসমাপ্তি হইতে পারে—দরিদ্র ফকীর অতুল ঐশ্বর্য্য পাইল, ইহাই যথেষ্ট; কিন্তু অন্য সকল সহযোগী কি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবে?—কাফের বধের আয়োজন ত ব্যর্থ হইবার নহে! ধর্ম্মের আদেশ—বলে, ছলে বা কৌশলে কাফেরকে পরাজিত করিতেই হইবে। ধর্ম্মবীর সহযোগীরা কখনই একথার অন্যথা করিবে না; সুতরাং আমি অবিশ্বাসের কার্য্য করিব না। যে ঐশ্বর্য্য শান্তিতে ভোগ করিতে পারিব না, সে ঐশ্বর্য্যের মায়ায় কেন বৃথা অবিশ্বাস ও অধর্ম্ম ক্রয় করিব? এই বলিয়া ধীরে ধীরে ফকীর মস্‌জিদে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া দেখিল মস্‌জিদ্ শূন্য। দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বক্ষে করাঘাত করিল, অদৃষ্টের নিন্দা করিল। এ সকল করিয়াও দারুণ হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্তি হইল না,—দুঃখে ও নিরাশয় হৃদয়ে আরো আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের শরীরে তেজ সঞ্চারিত হইল, বীর্য্য উদ্দীপিত হইল। মুসলমানের মস্তিষ্কে ক্রোধ অধিকার বিস্তার করিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। ফকীর বিষাদপূর্ণ ক্রোধে মস্‌জিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে তিনবার হুঙ্কার করিল। সে হুঙ্কারে নিস্তব্ধ অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইল—বৃক্ষে বৃক্ষে সে ভীষণ হুঙ্কার শব্দিত হইল—পশু-পক্ষী সশঙ্কিত হইয়া জাগিল। হুঙ্কারের পর মুহূর্ত্তেই চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রধারী মুসলমান সম্প্রদায় পঙ্গপালের ন্যায় অরণ্যকে বেষ্টন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জটিল পথে জটিল হৃদয়।

আরোহীরা যখন নৌকা খুলিয়া দিল, তখন পথিকেরা বড়ই বিপদ গণনা করিল; সাহেব বুঝিল, কাজটী বড় ভাল হয় নাই। সাহেব আপন ত্রুটী বুঝিয়া আরোহীদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, বলিল,—তোমাদের পায়ের জুতা আমার মাথায় ছোঁয়াও, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

একজন আরোহী বলিল—পাষণ্ড, কি করিয়াছিস্, এই দ্যাখ্? বলিয়া আহত ব্যক্তিকে ধরিয়া দেখাইল।

সাহেব বলিল,—অন্যায় করিয়া অধর্ম্ম কি নিয়াছি, পাপের ফল ঈশ্বরের নিকট পাইব; তোমাদের পায়ে পড়ি, পার করিয়া দেও, অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা কর।

অন্য আরোহী সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বলিল,—যে ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করাই ধর্ম্ম, সুতরাং ক্ষমা করিব। এ দস্যুর নৌকা নহে, এ পাষণ্ডের নৌকা নহে। এই বলিয়া অনাথপুরের ঘাটে নৌকা ভিড়াইতে মাজীদিগকে বলিল।

প্রথম আরোহী বলিল, তা কখনই হইবে না, প্রতিশোধ না তুলিয়া কখনই পাষণ্ডকে ছাড়িব না; যা হবার, হবে।

কথায় কথায় দুই আরোহীর মধ্যে ক্ষুদ্র বিবাদ বাধিল। প্রথমে মুখামুখী, পরে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইল। নৌকার সমস্ত আরোহী দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল পথিকদিগকে ক্ষমা করিয়া পারে পৌঁছাইয়া দিতে চাহে; আর দল তাহা দিতে চাহে না, প্রতিশোধ তুলিতে চায়। দুই দলে বিষম বিবাদ বাধিল।

সাহেব সুফলের আশা করিল। স্বপক্ষ দলের লোকেরা সাহেবের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল। হস্তের বন্ধন মুক্ত হইয়া সাহেব আপনার দলে যোগ দিল। যোগ দিয়া পলাসির সমরের ন্যায় এ যুদ্ধে জয়ী হইল। সাহেবের দল জয়ী হইল, নৌকার বিপক্ষ দলের অনেক লোক আহত হইল, কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, কেহ বা মৃতের ন্যায় নৌকা-তলে পড়িয়া প্রাণ রাখিল। মাজীরা জয়ী দলের কথা রাখিতে বাধ্য হইল, ধীরে ধীরে নৌকা বহিয়া অনাথপুরের পারঘাটায় নৌকা ভিড়াইল। সাহেব ও করালী আরোহীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তীরে নামিল।

তীরে অবতরণ করিয়া সাহেবের হৃদয়ে একটু চিন্তা উঠিল, কারণ পথ অপরিচিত, চতুর্দ্দিক ঘোর আঁধারে ঘেরা। সাহেব জানিত, লক্ষ্য স্থানে সেই রাত্রে না গেলে চলিবে না, বিষম বিপদ ঘটিবে, সুতরাং চিন্তাতে একটু ভয় মিশ্রিত হইল। চিন্তাকাতর, ভয়বিহ্বল সাহেবের মুখ মলিন হইল, কিন্তু সে মলিনতা করালী দেখিতে পাইল না। তীরে নামিয়া করালী সাহেবকে বলিল,—তুমি কোন্ পথে যাইবে?

সাহেব।—আমি পথ চিনি না।

করালী।—তুমি কোথায় যাইবে?

সাহেব।—আমি অনাথপুরের অরণ্যে যাইব।

করালীর প্রাণ একটু চঞ্চল হইল, বলিল, অরণ্যে কোথায় যাইবে?—সেখানে কি লোক আছে?

সাহেব।—আমি সংবাদ পাইয়াছি, সেখানে লোক আছে।

করালী।—কত লোক আছে?

সাহেব।—মাত্র দুইজন; একটী স্ত্রীলোক, একটী পুরুষ।

করালীর বিস্ময় ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল, বলিল, তুমি সেখানে কেন যাইবে? সে অরণ্যে বড় বাঘের ভয়, তুমি এই আঁধার রাত্রে সেখানে যাইবে কেন?

সাহেব বলিল,—যাইব, উদ্দেশ্য আছে, কর্ত্তব্য আছে! আমি বাঘের ভয় করি না। তোমার দ্বারা আজ অনেক উপকার পাইয়াছি, আর একবার পথ দেখাইয়া উপকৃত কর।

করালী কি ভাবিয়া পথ দেখাইতে অস্বীকার করিল, সরলভাবে বলিল,—সাহেব, তুমি সেখানে কি জন্য যাইবে, না বলিলে আমি তোমাকে পথ দেখাইব না। তোমার এ উপকার আমার দ্বারা হইবে না।

সাহেবের মনেও একটু সন্দেহ হইল, সাহেব আপন উদ্দেশ্য গোপনেই রাখিল। সুতরাং করালী বিদায় লইয়া আপন পথে চলিল। কপটতাকে আশ্রয় করিয়া সাহেব বিষম বিভ্রাটে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গগনস্পর্শী ভীষণ হুঙ্কারে।

করালী চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া আঁধারের কোলের একটী ঝোঁপের ভিতরে হঠাৎ লুকাইল। লুকাইয়া থাকিয়া বুঝিল, পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সাহেবও সেই পথেই আসিতেছে। যখন করালী চলিতেছিল, তখন অন্যের পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল না, যখন নিজ পায়ের শব্দ থামিল, তখন অন্য পদশব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইল। কিন্তু সে শব্দও সহসা নিবিয়া গেল। আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই;—সে শব্দও নাই, সে সাহেবের হাটুনিও নাই। করালীও থামিল, কাজেই একটু পরে সাহেবের গতিও রোধ হইল। করালী সকল বুঝিল। সাহেবের সাহস পরীক্ষা করিতে করালীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল; তখনি টিক্ টিক্ করিয়া দুইবার শব্দ করিল। শব্দ করিবামাত্র পার্শ্বের জঙ্গল হইতে দুইজন লোক মশাল জ্বালিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

করালী গম্ভীর ভাবে আদেশ করিল—ঐ ডাকুর শিরচ্ছেদন কর্, দুরভিসন্ধি করিয়া আমার পশ্চাতে আসিয়াছে।

লাঠিয়ালেরা হুকুম পাইবামাত্র ঢাল সুল্‌পি লইয়া সাহেবের নিকটবর্ত্তী হইল।

সাহেব নির্ভয়ে বলিল, কি চাও?

লাঠিয়ালেরা গর্জ্জিয়া বলিল, তোর মাথা কাট্‌ব, পাজি, কোন্ সাহসে এই অরণ্যে ঢুকিয়াছিস্?—আজ কাহারও নিস্তার নাই—কালীমায়ীর প্রসাদে আজ ম্লেচ্ছের বংশ ধ্বংশ কর্‌ব। এই বলিয়া উভয়ে অস্ত্রোত্তোলন করিয়া সাহেবের উপরে পড়িল।

সাহেব বলিল, ভীরু. এতই কি কাপুরুষ আমি? এই বলিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া হস্তদ্বারা উভয়ের বেগরক্ষা করিয়া উভয়কে সাপটিয়া ধরিয়া নিমেষের মধ্যে হাটুরতলে ফেলিল; পরে বলিল,—এখনই প্রাণ লইতাম; কিন্তু কি কাজ, হিন্দুর সহিত আমার বিবাদ নাই; মুসলমান ধ্বংশই ব্রত; হিন্দুর উদ্ধারই জীবনের কর্ত্তব্য!

করালী নির্ব্বাক হইয়া সাহেবের বল, সাহস, দয়া, ক্ষমাগুণ সকলই পরীক্ষা করিল। করালী সাহেবের নিকটে যাইয়া বলিল, সাহেব, মিনতি করি, তুমি রাত্রে এজঙ্গলে কি করিবে, বল?

সাহেব বলিল, তোমাকে বলিলে তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর?

করালী।—স্বরূপে বলিতেছি, তাহা করিব না, প্রাণ গেলেও বিশ্বাস ঘাতকতা করিবনা।

সাহেব।—এদেশী লোকেরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে না; তুমি যে পারিবে, বিশ্বাস কি? এ দেশী লোকেরা সাধারণত প্রতারক।

করালীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিল, সাহেব, সাবধান হইয়া কথা বলিও, সমগ্র জাতিকে প্রতারক বলিবার তোমার কি অধিকার?

সাহেব।—যাহা সত্য, তাহা বলিবই, ভয় কাহার?—অবলার ভয়ে সত্য গোপন করিব?—প্রতারণা বাঙ্গালীর চরিত্রের ভূষণ, বাঙ্গালী নরাধম জাতি। তুমিও সেই জাতির একজন, তোমাকে বিশ্বাস কি?

ক্রোধে করালীর সর্ব্ব শরীর যেন জ্বলিতে লাগিল, ঘৃণা আত্মগ্লানিতে হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উচ্চরবে বলিল, সাহেব অপেক্ষাও বাঙ্গালী প্রতারক? প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তবেশে এদেশে প্রবেশ করেছিস্, কোন মুখে তুই এই কথা বলিলি?—দেশের প্রতি আমার মমতা থাকে, এখনই তোর প্রতিশোধ দিব। এই বলিয়া করালী আবার ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত করিবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে দেখিতে দেখিতে অনেক লাঠিয়াল করালীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

করালী বলিল, এই যে ম্লেচ্ছকে দেখিতেছ, ইহাকে অগ্রে বাঁধিয়া প্রহার কর, পরে অরণ্যের চতুর্দ্দিকে যাইয়া অরণ্যের মধ্যে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান কর। রাণী কৃপাময়ীর এই আজ্ঞা।

লাঠিয়ালেরা বলিল, বনের সর্ব্বত্রই লোক রহিয়াছে, কোন আশঙ্কা নাই। এই বলিয়া সাহেবকে ধরিতে অগ্রসর হইল। সাহেব এবার নিরুপায় হইল। এত লোকের সহিত বৃথা যুদ্ধে জয়ী হইবার আশা ছিল না, সুতরাং কোন চেষ্টাই করিল না। লাঠিয়ালেরা সাহেবকে দৃঢ়তর রূপে বন্ধন করিতে লাগিল। এই সময়ে অরণ্যভেদ করিয়া ফকীরের ভীষণ হুঙ্কার আকাশে উঠিল। সে হুঙ্কারে করালীর প্রাণ চমকিল, লাঠিয়াল-শ্রেণীর শরীর কম্পিত হইল।

করালী সাহেবের হাত ধরিল, বলিল, সাহেব, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি, তুমি আমার পক্ষে থাকিবে?

সাহেব বলিল,—তোমার আবার পক্ষ কি?

করালী নির্ভয়ে বলিল, এই যে দল দেখিতেছ, রাণী কৃপাময়ীর আদেশে,মুসলমানের হস্ত হইতে হিন্দুর মেয়েকে উদ্ধার করিতে, ইহারা এই অরণ্যে আসিয়াছে;—আমার অধীনে থাকিয়া ইহারা কার্য্য করিবে। তুমি আমার পক্ষে থাকিবে?

সাহেব বুঝিল, উভয়ের একই উদ্দেশ্য। সাহেব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে করালীকে বার বার ধন্যবাদ দিল, পরে বলিল, আমি তোমারই পক্ষে। স্বরূপে বলিতেছি, আমি তোমারই পক্ষে।

এই কথা বলা হইতে না হইতে করালী বুঝিতে পারিল, মুসলমানেরা অরণ্য বেষ্টন করিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিপদ—ঘনীভূত।

মুসলমানেরা অরণ্য বেষ্টন করিয়া বুঝিল, অরণ্যে অসংখ্য লাঠিয়াল প্রবেশ করিয়াছে। কেমন করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাহারা ভাবিল না, ভাবিতে সময় পাইল না। না পাউক, তাহারা বুঝিল, আজ আর সকলের দেহে প্রাণ থাকিবে না, বুঝিল—কাফেরের রক্তে আজ অনেক মুসলমানের রক্ত মিশিবে। যে সময়ের কথা ও যে স্থানের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে সেস্থানে মুসলমানদিগের মধ্যে ভয়ানক বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল। রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না ছিল, কিন্তু মনে ধর্ম্মের বল, শরীরে তেজ বা বীর্য্য ছিল না। বিলাসিতার চরম অবস্থায় ইংরাজগণ

কর্ত্তৃক মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল;—পরাজিত হইয়াও সুখস্পৃহা কমে নাই—রিপু-চাঞ্চল্য বিদূরিত হয় নাই। মুসলমান-বংশ সিরাজের চরিত্রের ছায়ায় যেন প্রতিবিম্বিত ও অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। বিলাস যেখানে, সেখানে বল বীর্য্য থাকিতে পারে না, ধর্ম্মহীনতা যেখানে, সেখানে সাহস ও ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। মুসলমানদিগের মধ্যে তখন ভীরুতা, ও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছিল। ভীরুতাতে ছিল প্রবঞ্চনা, দুর্ব্বলতাতে ছিল রিপুর উত্তেজনা। তাহারা দেশকে ভীত রাখিত—দস্যুবৃত্তি করিয়া, তাহারা পরাক্রম দেখাইত—দুর্ব্বল সতীর সতীত্ব অপহরণ করিয়া। বাঙ্গালার সেই এক দিন ছিল। মন্দ বলি, আর যাহা বলি, ইংরাজ-শাসিত বাঙ্গালায় আজ আর এক দিন উপস্থিত। সে কথা এখন থাকুক। মানুষ থাকে, বুঝিবে; পশু থাকে, কেবলই পরনিন্দা করিবে; ভালকেও ভাল বলিবে না। অরণ্য বেষ্টন করিয়া মুসলমানেরা বড়ই বিপদ গগণা করিল। একটী রমণীর জন্য এত প্রাণ যাইবে, একটী কাফেরের জন্য এত মুসলমান ধ্বংশ হইবে, এই চিন্তা উপস্থিত হইল। চিন্তা হইল—জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না; কষ্ট যথেষ্ট হইবে, কিন্তু সুখ ঘটিবে না। বিলাসপ্রিয় জাতির চিন্তায় ভীরুতা মিশিল, ভীরুতাতে কাপুরুষতা একত্রিত হইল। মুসলমানেরা উপায়ন্তর না দেখিয়া অরণ্যে আগুন লাগাইয়া দিল। চৈত্র মাসের অরণ্য—অতিশুষ্ক। বৃক্ষের লতা শুষ্ক হইয়া মাটীতে পড়িয়া স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে;—কত লতা, কত তৃণ, কত ঘাস, যাহা বর্ষাকালে জন্মিয়াছিল, তাহা এক্ষণ মরিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে। সেই সকলে আগুন লাগিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অরণ্যের ঘনীভূত আঁধারকে ঘনীভূত আলোক পরাজয় করিল,—বন আলোকিত হইল। বনের পশু পক্ষীর প্রাণ আতঙ্কে উড়িয়া গেল, আত্মরক্ষার জন্য সকলে স্থানান্তরে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে জীব জন্তু দিশে-হারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগুনে পড়িতে লাগিল। ব্যাঘ্র ও হরিণ এক পথেই ছুটিল—সর্প আর নকুল এক গর্ত্তেই ঢুকিতে লাগিল। অরণ্য ভরা মানুষ—আর অরণ্য ভরা আলোক। দাবাগ্নিতে বায়ু ক্রমেই উষ্ণ হইয়া ভয়ে যেন আকাশে উঠিতে লাগিল,—দূরের বায়ু আসিয়া অমনি সখাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। শুষ্ক পত্র পুড়িল, ছোট ছোট শুষ্ক বৃক্ষও পুড়িল, পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও পুড়িতে আরম্ভ হইল। কত কালের কত পদার্থ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল,—কত কীট পুড়িল, কত পতঙ্গ পুড়িল, কত পক্ষী পুড়িল, কত পশু পলাইতে না পারিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিল। সে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু লাঠিয়াল-শ্রেণীর প্রাণ উড়িয়া গেল। যে যে দিকে সুবিধা পাইল, পলায়ন করিল। ধানক্ষেতের হাঁটু জলে নামিয়া অনেকে প্রাণ বাঁচাইল। বোরো ধান গাছ তখন গর্ভবতী, সে সকলের দুর্দ্দশার আর কিছু বাকী থাকিল না; পদ-মর্দ্দনে অনেক গাছ মরিল। মুসলমানেরা আগুন দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সুতরাং তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না। করালী ও সাহেব কি করিল? ফকীরই বা কোথায় রহিল, আর আমাদের নিরাশ্রয়া অনাথিনী এ বিপদে বাঁচিল কি মরিল, সে সকল কথা পরে বলিব।

মানব ও ইতর প্রাণী।

"We were able unreservedly to affirm that the more perfect organic natures under which we include Pisces, Amphibia, Mammalia, and at the head of these last Man. have all been formed on one original plan that is only slightly modified in its very constant details here and there and is still improving and altering generation after generation." Goethe.

মনুষ্য কত নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে কত উচ্চে উঠিয়াছে, এই তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রভূত আনন্দ হয়। অতীত হীনাবস্থার সহিত বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার তুলনা করিলে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল, অনুমান করা যাইতে পারে। এক দিন দেবতারও দেবত্ব, মনুষ্যত্বের তুলনায়, অসুরত্ব রূপ প্রতীয়মান হইবে। পূর্ব্বের পশুজীবন ভবিষ্যতের তুলনায় অতি ঘৃণিত বটে, কিন্তু যে মানবীয় শক্তি পদ-দলিত কর্দ্দমে উৎপন্ন হইয়া নিজগুণে অরুন্ধতির মৌলিমণি স্পর্শ করিতে ক্ষমবান, সে কি দেব-দুর্লভ শক্তি নয়? মনুষ্য এখন জীবশ্রেষ্ঠ, সময়ে আবার শ্রেষ্ঠতর হইবে। সে জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মানবীয় প্রকৃতি অন্যান্য জীব প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইব যে, এক দিন মনুষ্যের অবস্থা নিকৃষ্ট জীবের অবস্থা অপেক্ষা উন্নত ছিল না. এক দিন মনুষ্য ও পশু-প্রকৃতি একবিধরূপে গণ্য হইত, এখন কেবল পরিমাণ বিভিন্নতা, প্রকার ভিন্নতার ভ্রম জন্মাইতেছে। বস্তুত, প্রথম অবস্থার মানব-প্রকৃতি, পশু-প্রকৃতি হইতে প্রকার ভেদে ভিন্ন ছিল না।

কৃষিলব্ধ শস্য চির দিন মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। কৃষি জীবন উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। তাহার পূর্ব্বে বৃক্ষের ফল মূল ও পশু পক্ষীর মাংসে, মনুষ্য আপনার উদর পূর্ণ করিয়া দিনপাত করিত। পশু পক্ষীদিগেরও উপজীব্য ফল, মূল ও মাংস। সুতরাং উপজীব্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে কোন প্রকার ভিন্নতা নাই। তবে পশু পক্ষীগণ ফল মূল মাংস অপক্ক অবস্থায় ভক্ষণ করে, মনুষ্য অগ্নি সংযোগে রন্ধন করিয়া খাইতে শিখিয়াছে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন মনুষ্য অগ্নির ব্যবহার জানিত না, জানিলেও রাত্রিতে পশু-তাড়ন ও শীত নিবারণের উপায় স্বরূপ ভিন্ন অগ্নির অন্যবিধ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারে নাই। রন্ধন ব্যবস্থা উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। ফুয়েজি জাতি মাছ ধরিয়াই তাহাকে কাণকুয়ার কাছে এক কামড় খাইতে দেয়, তাহাতেই মাছটীর মৃত্যু হইলে সমস্ত মাছটী কাঁচা খায়। কখন কখন মরা তিমি মৎস্য পাইলে, যতই পচা ও দুর্গন্ধ হউক না কেন, দল বাঁধিয়া সকলে সাগর তটেই অপক্কাবস্থায় উদরসাৎ করে। ফুয়েজি স্ত্রীলোক ও বালকেরা কুকুরের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া শীল মৎস্যের কাঁচা মাংস উদরসাৎ করে। মাজিলন পাটাগোনীয়দিগকে পক্ষী মাংস কাঁচা খাইতে দেখিয়াছিলেন। তরুস্কি মোগলেরা মাছ, শীল, ও গো মাংস কাঁচা খায় এবং তাহাদিগের পেটের ভিতর মুখ পুরিয়া রক্ত চুষিয়া থাকে। তির্ব্বতবাসীরাও কাঁচা মাংস খাইয়া থাকে। আবিসিনীয়দিগকে খাওয়ার সময় গরুর গা হইতে মাংস কাটিয়া কাঁচা খাইতে দেখা গিয়াছে। বুশমান ও

হটেন্‌টটেরা জল হস্তী মারিয়া তাহার নাড়ি-ভুড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া কাঁচা খায়।

আবার আহার্য্যের পর পরিধেয় সম্বন্ধেও ঐ রূপ দেখিতে পাইবেন। শীত নিবারণ হেতুই পরিধেয়ের উদ্ভাবনা হইয়াছিল, লজ্জা নিবারণ হেতু নহে। বর্ব্বর ও পশুর লজ্জা সমান। যাহারা বস্ত্র ব্যবহার করিতে জানে, তাহারাও কেবল শীত নিবারণ উদ্দেশে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, পরিধেয়াদির কারুকার্য্য মস্তিষ্কের ব্যাবৃত্তির ফল, বুদ্ধি শক্তির বিকাশের ফল নানা জাতীয় অসভ্য লোকেরা এখনও পশু ও বানরদিগের ন্যায় উলঙ্গাবস্থায় বাস করিতেছে। উড়িষ্যাবাসী জুয়াঙ্গজাতী উলঙ্গ থাকে, ফুয়েজি ও অষ্ট্রেলিয়েরা কেবল শীত কালে বস্ত্র ব্যবহার করে, অন্য সময় উলঙ্গ থাকে, সাধারণত স্ত্রীলোকেরা লজ্জা নিবারণ উদ্দেশে প্রথমে বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। তাস্মেনিয়ার স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে, কিন্তু বসিবার সময় চরণাচ্ছাদনে লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। নব কালিডোনীয় ও হটেন্টট্ স্ত্রীলোকেরা কৌপীন পরিয়া থাকে, কিন্তু পুরুষেরা উলঙ্গাবস্থায় দিনপাত করে। এই নবকালিডোনিয়ার কুমারীদিগের বস্ত্র পরিধানের অধিকার নাই, কেবল বিবাহিতাবস্থায় বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে। মধ্য-আফ্রিকার অশীর জাতি এবং মধ্য আমেরিকার চৈমা জাতি বস্ত্রের ব্যবহার জানে, কিন্তু তাহারাও অবিবাহিতা যুবতীদিগকে বস্ত্র পরিধান করিতে দেয় না। আবার কোন কোন দেশে পুরুষেরা বস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সকলেই উলঙ্গ থাকে। টিনিটী দ্বীপে ও মধ্য আফ্রিকার লারি নগরে এই রূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ব্বরদিগের লজ্জাহীনতার শত শত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। পলিনেসিয়ার স্ত্রীলোকেরা দুই টুক্‌রা বস্ত্র পরে। কিন্তু জলে নামিবার সময় বস্ত্র দ্বয় পরিহার করিয়া উলঙ্গ হইয়া সাঁতার দিয়া জাহাজে উঠে, বেড়ায়, মাস্তুলে চড়ে। সাণ্ডিচ্ দ্বীপে স্ত্রীলোকেরা কাপড় মাথায় বাঁধিয়া, জাহাজে আসিয়া সকলের সমক্ষে পরিধান করে। টাহিটী দ্বীপে উলঙ্গ হইয়া থাকা নারীদিগের ভদ্রতার লক্ষণ। নব-সিথিরিয়ার খ্রীষ্টান রমণীগণ, যেখানে লোক বেশী চলাচল করে, সেই খানে আসিয়া বস্ত্র পরে। আপিঞ্জি জাতির রাণীকে একজন সাহেব এক খণ্ড বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। বস্ত্র খণ্ড পরীক্ষা করিবার জন্য, রাণী, সাহেবের সমক্ষেই পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, নূতন বস্ত্র খানি পরিধান করিয়াছিলেন। কামস্কাট্‌কার রমণীগণ কাহারও সমক্ষে সন্তান প্রসব করিতে লজ্জা বোধ করে না। মেণ্ডোজা নগরে নরনারী উলঙ্গ হইয়া একত্র নদী জলে স্নান করে।

বিবাহ সম্বন্ধে বর্ব্বরদিগের অপেক্ষা অনেক জাতীয় পশু পক্ষী শ্রেষ্ঠ। বর্ব্বরেরা কাহারও সমক্ষে স্ত্রী-সংসর্গ করিতে লজ্জা বোধ করে না। বর্ব্বর সমাজের সতীত্ব, পশু সমাজের সতীত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। অনেক জাতির মধ্যে আদৌ বিবাহের প্রথা নাই, যে কাহারও সহিত যেখানে সেখানে যথেচ্ছা সংসর্গ করা হয়। মা, বোন, খুড়ী, পিশি কাহারও সংসর্গ নিন্দনীয় নহে। যেখানে বিবাহের প্রথা আছে, সেখানেও বিবাহে ভালবাসা আবশ্যক হয় না। বস্তুত দাসীপণা করিবার জন্যই স্ত্রী প্রধানত আবশ্যক। জোর করিয়া দখল করিলেই অধিকাংশ সমাজে বিবাহ করা হয়।

বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব বিভিন্ন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহারাও কুমারী অবস্থায় বা স্বামীর আদেশ মতে, অথবা আপন ইচ্ছামত ব্যভিচার করা নিন্দনীয় মনে করেনা। "মানব প্রকৃতি" গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান গিয়াছে। বর্ব্বরের লাঠি মারিয়া বলপূর্ব্বক বিবাহ করা অপেক্ষা, পশুপক্ষীর মধ্যে প্রচলিত, কণ্ঠস্বরের মাধুরীবলের চাকচিক্য, দৈহিক বল বা শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মন ভুলাইয়া বিবাহ করিবার পদ্ধতি কত উন্নত! একজাতীয় পক্ষী (Birds of Paradise) রমণীর মন ভুলাইবার জন্য বাসস্থান অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করে, এবং বাসগৃহের সম্মুখে ফুল ফল সাজাইয়া মনোরম করিয়া রাখে। একটী ফুল শুকাইলে, সেটী ফেলিয়া দিয়া, আর একটী তাহার স্থানে বসাইয়া দেয়। পারিসের সভ্য যুবক এইরূপ আয়োজন করিয়াই বিলাসিনীর প্রণয় প্রার্থনা করিয়া থাকে। কোন কোন পশুর মধ্যে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত থাকিলেও অনেকের মধ্যে এক পত্নীত্ব প্রচলিত। বানরেরা বহুপত্নী গ্রহণ করে, কিন্তু পক্ষীগণ সাধারণত একমাত্র দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে কেবল গরিল্লা, রোমন্থনকারীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই, শ্বাপদদিগের মধ্যে কেবল শীল ও সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে কেবল ময়ূর ও কেজাণ্ট এবং মাছের মধ্যে কেবল ষ্টিকলবাক বহুপত্নীক। আবার পশুপক্ষীর দাম্পত্য প্রণয় সাধারণত বর্ব্বরদিগের অপেক্ষা অধিক। বর্ব্বরেরা সামান্য কারণে পতি পত্নী পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, পশুপক্ষীর মধ্যে এ প্রথা নাই বলিলেও চলে। বর্ব্বরেরা সামান্য কারণে লাঠি বা প্রস্তর আঘাতে প্রণয়ীর ভবলীলা সঙ্কোচ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিরহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কোন কোন পশুপক্ষীর মধ্যে দেখা যায়। যে সকল পক্ষী বৎসরে২ বিভিন্নদেশ পর্য্যটন করে, তাহাদিগেরই মধ্যে সতীত্বের কিছু অভাব দেখা যায়। কিন্তু "কপোত কপোতীর" দাম্পত্য প্রণয় মানব সন্তানের আদর্শ। পক্ষান্তরে, যে সকল অস্বাভাবিক কার্য্য নবকালিডোনিয়া, নবজিলণ্ড, পলিনেসিয়া মেক্সিকো, গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশে সাধারণত সাধিত হয়, বা হইত, পশু পক্ষীর মধ্যে তাহা ক্বচিৎ দেখা যায়। মনুষ্য কি সন্তান-স্নেহে পশুপক্ষীকে পরাভূত করে? সাধারণত কর্ম্মক্ষম হইলে সন্তানের সহিত পশু পক্ষীর কোন সংশ্রব রাখিতে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সন্তানের প্রতি ইতর প্রাণীর স্নেহের পরিমাণ, বর্ব্বরদিগের কথা দূরে থাকুক, সভ্য মানবের অপেক্ষাও কিছু পরিমাণে ন্যূন নহে। পক্ষান্তরে নানা জাতীয় বর্ব্বরদিগের মধ্যে সন্তান-স্নেহের লেশ মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। মণ্টেগ, একটী রেন পাখীকে, সন্তানের আহার সঞ্চয়ে প্রতিদিন ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছিলেন। ডেলফট্ নগরে আগুন লাগিলে, সন্তানদিগকে লইয়া পলাইবার উপায় না দেখিয়া, একটী সারস পক্ষী, সন্তানগণের পার্শ্বে বসিয়া অনসনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে পারিস অবরোধ করিয়া জার্মানেরা যে সকল গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার একটী নগর, মধ্যস্থ এক গোলাঘরে পড়িয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। সেই গোলাঘরে একটী পারাবৎ কয়েকটী ডিম্ব পোষণ করিতেছিল।

গোলা ফাটিবার ভয়ঙ্কর শব্দ ডিম্ব পার্শ্ব হইতে তাহাকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। শ্বেত ভল্লুক, শিকারীর কুকুর ও গুলি দ্বারা বারম্বার আহত হইলেও আপন যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সন্তানকে রক্ষা করে। লিবিংষ্টোনের সহচরগণ, মধ্য আফ্রিকায় একটী হস্তীকে বর্ষা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিলেও সে আপন সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই। বানরেরা মনুষ্যের অতি নিকট কুটুম্ব। সেই জন্য মনুষ্যের কতকগুলি দোষও অধিকার করিয়াছে। বানরী সন্তান পালনে বিরত হইলে কামড়াইয়া সন্তানকে বধ করে, না হয়, বৃক্ষদেহে সবলে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেয়। অন্য সময়ে বানরীরাও সন্তানকে প্রভূত স্নেহ করিয়া থাকে। নানা দেশে বানর ও বন মানুষদিগকে গুলি মারিয়া দেখা গিয়াছে, তাহারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতেও মুমূর্ষু অবস্থায় সন্তানদিগকে বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় শিকারীর গুলির বাহিরে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তারপর প্রাণ দিয়াছে।

পক্ষান্তরে মানব সমাজে কি ভয়ঙ্কর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাস্‌মেনিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার রমণীগণ যৌবন-সুখ উপভোগ করিবার জন্য বিবাহের কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রূণাবস্থায় সন্তানকে হত্যা করিয়া থাকে। তাহারা সভ্য-জাতির ঔষধাদি জানে না। কাহারও গর্ভ হইলে একটী বৃদ্ধা আসিয়া গর্ভের উপর ক্রমাগত লাঠি মারিতে থাকে, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধ হয়।

নব কালিডোনিয়ার বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেই বারম্বার ভ্রূণ-হত্যা করিয়া থাকে, সে জন্য কেহ নিন্দা করে না। ফর্ম্মোসা দ্বীপে ছত্রিশ বৎসর অতিক্রম না করিলে কাহারও সন্তান প্রসবের অধিকার নাই, করিলে রাজাকেও সমাজের নিকট দণ্ড পাইতে হয়। হড্‌সন উপসাগরের উপকূলবাসীদিগের মধ্যে ভ্রূণ-হত্যা বড় প্রচলিত ছিল। লাপ্লাটা দেশে পৈশুয়া রমণীগণ দুইটীর অধিক সন্তান প্রসব করিতে পারে না, অম্বরা জাতির মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত। অরিনোকো তট-বাসিনী রমণীগণের বয়স খুব অধিক না হইলে, সন্তানের মা হইবার অধিকার পায় না।

কেহ বা ভ্রূণাবস্থায়, কেহবা প্রসব মাত্র সন্তানকে হত্যা করে, এই উভয়বিধ শ্রেণীর মধ্যে কে সভ্যতর, নির্ণয় করিতে আমার সাধ্য নাই। মেলানেসিয়ার সর্ব্বত্র শিশু বধ প্রচলিত ছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও তাসমেনিয়া এই অপরাধে বিশেষ অপরাধী। আমরা যেমন ছাগল দিয়া বাঘ ধরি, দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা তেমনি করিয়া সন্তান খাইতে দিয়া সিংহ ধরে। নহিজার তটে ফলিডকিও সেলিগাম্বিয়া দেশে, অতি সামান্য দ্রব্যের বিনিময়ে, লোকে সন্তান বিক্রয় করিয়া থাকে। পলিনেসিয়া, সাণ্ডিচ্, টাহিটি, টিকোপিয়া, ও রাডিক দ্বীপে শিশুহত্যার প্রাদুর্ভাব অদ্যপি অসামান্য। দক্ষিণ আমেরিকায় যরুকারি মক্সাস জাতি শিশু সন্তানকে বনে ফেলিয়া দেয়, অথবা মাটীতে পুতিয়া ফেলে। রেড্‌স্কিন জাতি মায়ের মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহের সহিত জীবন্ত সন্তানকে কবর দেয়। আমেরিকা ও কামেস্কাট্‌কার এস্কিমোজাতি শিশু রুগ্ন বা দুর্ব্বল হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলে। গ্রীণলাণ্ডের এস্কিমোরা জীবন্ত সন্তানকে মার মৃত দেহের সহিত কবর দেয়। চীন ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে

সন্তান পরিত্যাগ অদ্ভুত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত না। মার্কোয়েসস্ দ্বীপপুঞ্জে সন্তান কর্ম্মক্ষম হইলে, পশু পক্ষীর ন্যায়, মানবীয় পিতা মাতা তাহার সহিত আর কোন সংশ্রব রাখে না।

গুরুগণের প্রতি স্নেহ ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, পশু পক্ষীর মধ্যে অতি অসামান্য দেখিতে পাওয়া যায়। পিপিলিকার সোঁ ছিঁড়িয়া দেখা গিয়াছে, তাহার স্বজাতীয়েরা আপন আপন লালা দিয়া তাহার ক্ষত নিবারণ করে, আহতকে পিপিলিকাগণ বহিয়া লইয়া যায় এবং সুশ্রূষা করে। মৌচাকের রাণীমা বিপন্ন হইলে দাসানুদাসেরাও তাঁহার বিপন্মুক্তির সাহায্য করে। কেনারী পক্ষীরা বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য আত্মীয় স্বজনকে চঞ্চুপুটে আহার দেয় এবং শিশু সন্তানের ন্যায় লালন পালন করে।

কি ইতর প্রাণীর মধ্যে, কি মানব সমাজে, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্যের দুর্দ্দশা সর্ব্বত্র শোচনীয়। মেলিনেসিয়ার সর্ব্বত্র বৃদ্ধ ও পীড়িতদিগকে হত্যা করিবার রীতি প্রচলিত। নব কালিডোনিয়ায় বৃদ্ধ পিতামাতাকে দূরে নির্জ্জনে ছাড়িয়া আসিতে হয়। উহাদিগকে জীবন্ত কবর দিবারও বিধি আছে। ফিজিবাসীগণ, অকর্ম্মণ্য না হইতে হইতেই পিতা মাতাকে হত্যা করা, বড় পুণ্য কর্ম্ম মনে করে। ইহারা জ্ঞাতি বন্ধু সকলকে ডাকিয়া উৎসব করিয়া পিতা মাতাকে ফাঁসি দেয়। মাচাপি কাফ্রিরা বৃদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দেয়, অনাহারেই তাহাদের মৃত্যু হয় এবং শৃগাল বায়সেই তাহাদের মৃত-দেহের সৎকার করে। পলিনেসিয়ার লোকেরাও, বৃদ্ধ ও রুগ্নদিগকে তাড়াইয়া দেয়, বা কবরে নিহিত করে। আমেরিকায় আট জাতি বৃদ্ধদিগকে হত্যা করিয়া থাকে। এক সময়ে এই রীতি আমেরিকার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিলেও বলা যায়। এস্কিমোরা বরফ চাপাইয়া বা ফাঁসি দিয়া বৃদ্ধদিগকে বধ করে। ইটোনামো জাতি গলা টিপিয়া রোগীর যন্ত্রণা ঘুচাইয়া দেয়। আহার্য্য না মিলিলে ফুয়েজি জাতি বৃদ্ধাদিগের মাংসে ক্ষুধানল নির্ব্বাণ করে! কামস্‌কাট্‌কার লোকেরা পিতা মাতাকে বধ করিয়া কুকুরদিগকে খাইতে দেয়, আবার কোরিয়াক ও শুকটী জাতি পিতা মাতাকে হত্যা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। তিব্বত-বাসীরা পীড়িতের সুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না, সংক্রামক ব্যাধি হইলে ত কথাই নাই। সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও বৃদ্ধ ও পীড়িতের প্রতি যত্ন সর্ব্বত্র সমান নহে। মাসাগেটীরা বৃদ্ধদিগকে কবর দিত, সার্ডিস্ বাসী এক জাতি লাঠীর আঘাতে বার্দ্ধক্যের দুর্দ্দশা শেষ করিত। পূর্ব্বে বাক্ট্রীয়া দেশে বৃদ্ধ ও পীড়িতদিগকে কুকুর দ্বারা খাওয়ান হইত। আবেসীয়রা পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনকে বিক্রয় করিত। প্রভুর বিরহে যখন পশু পক্ষীকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখি, তখন এই সকল মনুষ্যকে কি শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি? সভ্য-মনুষ্য হৃদয়ের কোমলতার জন্য বিখ্যাত। যখন পশু পক্ষীর আক্রমণ-কারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আক্রান্তের সহায়তা করে, যখন সামান্য কীট পতঙ্গ দুর্ব্বহ ভার তুলিবার জন্য পরস্পরের সাহায্য করে, যখন আহতের সেবা, পীড়িতের সুশ্রূষা, অতিথিকে আশ্রয় দান, ইতরজীবের মধ্যে অসামান্য নহে, তখন দয়া পরোপকার প্রভৃতি কোমলতর প্রবৃত্তি তাহাদের নাই, কে বলিবে? আবার যে কোমলতা মনুষ্যকে

দেবতায় পরিণত করে, সে কোমলতা অসভ্য সমাজে অতি বিরল। বস্তুত যে বিষয়েই তুলনা করি, মনুষ্য ও ইতর প্রকৃতির প্রকার ভিন্নতা কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

অষ্ট্রেলিয়েরা, পতঙ্গের অপেক্ষা মনুষ্যের জীবন অধিক মূল্যবান মনে করেনা। কেহ তাহাদের অপ্রিয় হইলে সেই জাতীয় যাহাকে পায়, ইহারা তাহারই প্রাণবধ করিয়া ক্রোধের শান্তি করে। মেলেনিসিয়ার কুত্রাপিও, কাহারও নরহত্যা করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ দৃষ্ট হয়না। পশু পক্ষীর ন্যায় মনুষ্য বধ করিয়া কতজাতি উদর পূর্ণ করে, নরবলি নামক প্রবন্ধে তাহা দেখান গিয়াছে। লোটী নামে এক জন আপন স্ত্রীকে হত্যা করিয়া, সেই হতভাগিনী কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নিতেই তাহাকে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল। আসাণ্টি প্রভৃতি আফ্রিকিক নিগ্রোরা নর-জীবন পশু পক্ষীর জীবন অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করে না। অতি সামান্য উৎসবে এই সকল জাতি শত শত লোককে বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া বধ করে। সিনিগাম্বিয়ার নিগ্রোরা অতিশয় জীঘাংসাশীল। মধ্য আমেরিকার কএকটী জাতি ভিন্ন আমেরিকার সকল আদিম জাতি, সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রক। নিকলো-কণ্টি বলেন,মালাকা দেশে কেহ এক একখানি তরবারি পাইলে সম্মুখে যাহাকে দেখিবে, তাহার উপর তরবারির গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে। পোলিনেসিয়ায়, ইচ্ছা হইলেই রাক্ষসের মত যন্ত্রণা দিয়া,যে,যাহাকে হউক, বধ করিবে। বনচারী তুর্ক্কমান জাতি যথার্থই রাক্ষস। সভ্য য়ুরোপীয়েরা অসভ্যদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করে, তাহা দেখিলে আর বিশ্বাস হয় না যে, মনুষ্য সহজে পশু প্রকৃতি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে লক্ষ্য কর, একজন শিকারী একটী প্যারটকে হত্যা করিলে, অপরেরা হত হইলেও মৃত কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই পলাইবে না; কাঁদিবে, চিৎকার করিবে, সাহায্য করিবার চেষ্টা দেখিবে, শেষে নিতান্ত নিরূপায় হইলেই চলিয়া যাইবে। সাজারিরদিগের মধ্যেও এইরূপ কোমলতা দেখা যায়। একজন এক জোড়া প্যারট পুষিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রী বাতগ্রস্ত হইলে স্বামী চারি মাস তাহাকে চঞ্চুপুটে আহার দিয়াছিল এবং ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহাকে শয়ন স্থানে পৌঁছাইয়া দিত। অবস্থা যতই খারাপ হইতে লাগিল, তাহার যত্নেরও তত বৃদ্ধি হইল, ওদিকে মৃত্যু নিকট জানিয়া, উপায় বিফল হইতেছে দেখিয়া সতত রোদন করিত। যখন স্ত্রীর মৃত্যু হইল, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েক দিন পরে সেও প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। আরিষ্টিলেরা পীড়িতদিগের সুশ্রুষা করিয়া থাকে।

মৃত আত্মীয়স্বজনকে আমরা দেবতার ন্যায় ভক্তি করি। জীবিত অবস্থায় যাহাই হউক, মৃত্যু হইলে আর তাহার বিরুদ্ধে কুভার পোষণ করি না। মৃত আত্মীয়ের প্রতি দেবতুল্য সম্মান প্রদর্শন করি, কেহ কেহ অবজ্ঞাসূচক কিছু করিলে বড় ব্যথা পাই। কিন্তু অপর পক্ষে পশু পক্ষীগণ মৃতের প্রতি কোন যত্ন বা সমাদর করে এরূপ দেখি নাই। ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আগামীবারে প্রাপ্ত পুস্তকাদির সমালোচনা কর যাইবে।

বিশ্বসৃষ্টি।

এই সুমহৎ বিশ্বব্যাপার দেখিয়া, স্বভাবতই, লোকের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হয় যে, এ বিশ্ব কিরূপে উদ্ভূত হইল। যিনি সরলভাবে এই তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—কোন প্রকার কাল্পনিক মীমাংসায়, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন নাই, তিনিই দেখিয়াছেন যে, এ কি মহা সমস্যা। বহু বহু গবেষণায় যে উত্তর পাওয়া যায়,সে উত্তর ও উত্তরই নহে—একটী নূতন প্রশ্নমাত্র। এইরূপে মীমাংসার পরিবর্ত্তে, এক প্রশ্ন শতধা, সেই শত প্রশ্ন সহস্রধা, এবং সেই সহস্র আবার শেষে অনন্তে মিশিয়া অনন্ত প্রহেলিকার শ্রেণী বাঁধিবে। কে তুমি, কতটুকু বুদ্ধির অধিকারী যে, সেই অসীম প্রহেলিকার কণামাত্রও ব্যাখ্যা করিবে? কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক, কত ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ যে, এই বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রশ্ন কর যে, হে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, আপনি কি এই জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের বা জন্মতত্ত্বের বা বিকাশতত্ত্বের কোন মীমাংসা বলিতে পারেন? বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন,—"দেখ, এটাত অতি সহজ কথা; প্রথমে এ সংসারে, অনন্ত বিক্ষিপ্ত পরমাণুরাশি ইথার-সাগরে ভাসিতেছিল; দৈবাৎ এক দিন তাহারা কাঁপিয়া উঠিল; সেই কম্পনের ফলে উত্তাপ, এবং তাহা হইতেই নানা প্রকার জগৎ সৃষ্টির আইন-নিচয়, রক্তবীজ অসুরের দলের মত, সহসা অনুদ্ভূত জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইল।" এইরূপ আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সমুদায় এখানে বলিবার স্থান নাই। স্থূল কথা এই যে, এই জগৎ রূপান্তরে অনন্তকালই রহিয়াছে; কেহ ইহাকে সৃষ্টি করে নাই; বিক্ষিপ্ত পরমাণু, বা পৃথিবীর উপাদান সমূহ আপনি উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবী প্রভৃতি লোকে পরিণত হইয়াছে। এখন বুঝিয়া দেখি, এ কথাটার অর্থ কি? প্রথমত, কোন একটা পদার্থ আপনা আপনি চলিতেছে, আপনা আপনি কাজ করিতেছে, উন্নত হইতেছে,একথাটা কেমন কেমন লাগে, অর্থাৎ কথাটার ধারণা হয় না; আপনা আপনি কিছু চলে, বা কাজ করে, এমন একটা কিছু দেখিলে তবে বড় বিষয়ে, অবোধ্য ব্যাপারে, অন্তত সাঙ্কেতিক প্রণালীতে, এ বিষয়টা কি, তাহার একটা ধারণা হইলে হইতে পারে। কলের গাড়ী আপনি চলে, ঘড়ি আপনি চলে, ইহা দেখিয়াছি; কিন্তু কলের গাড়ী বলিলেই ড্রাইভার ভাবি, ঘড়ি ভাবিলেই নির্ম্মাতা ভাবি; কৈ এমন কোন জড় পদার্থ ত দেখি নাই, যাহা আপনি চলে? তবে এ ধারণা কেমন করিয়া করিব যে, এ বিশ্ব ব্যাপারটা আপনা আপনি চলিতেছে? আচ্ছা, কোন রকম করিয়া না হয় ভাবিলাম যে, হাঁ এ জগৎটা যেন হোমরের কলের মানুষের মত আপনা আপনি চলিতেছে। কিন্তু তবুও ত গোল মিটিল না। ১ম কথা—জগৎ অনন্তকাল হইতে আছে, এ কথাটারও ধারণা হয় না; কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, তোমার ধারণা কথাটা বড়ই বিরক্তিকর; তুমি ধারণা করিতে পার

আর নাই পার, কিন্তু কথাটা ঠিক! আমি বলি, যদি কথাটা ধারণার অসম্ভব, তবে জগৎ-তত্ত্ব মীমাংসার সময়ে ওটা লাগান কি যুক্তি-সঙ্গত? আরও কথা আছে; প্রশ্ন এই যে, জগৎ কেমন করিয়া উদ্ভূত হইল? এখন যদি ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জগতের প্রাণ-ভূত ভূতগুলি, অথবা রূপান্তরিত পরমাণুপুঞ্জ এবং ইথারাদি পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান সময়ে এইরূপে জগৎরূপে স্থিত; তবে কি এ প্রশ্নোত্তরের এই সারমর্ম্ম দাঁড়াইল না;—"এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ এ কেমন করিয়া জন্মিল; না—ইহা কল্য, বা পরশ্ব, বা শতাব্দী, বা সহস্রাব্দী পূর্ব্বেও ছিল"—অর্থাৎ কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা আজ দেখিতেছি, তাহা যদি তুমি অনন্ত শতাব্দীর পশ্চাতেও অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাও, তবুও কি তাহার উৎপত্তিতত্ত্ব আজিকারই মত প্রহেলিকাময় হইয়া রহিল না? তবে ব্যাখ্যা হইল কৈ? আসল কথা, বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় ইহার উত্তর নাই। আর এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই,—"জগৎ আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছে।" কথাটার ভাবার্থ বুঝাইতেছি। ইত্যবসরে বলিয়া লই যে, ইউরোপীয় Pantheists এবং আর্য্য অদ্বৈতবাদীগণ এই সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থন করেন। আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার অর্থ কি? কিছুই ছিল না, অথচ কিছু উৎপন্ন বা সৃষ্ট হইল; এখন কে কাহাকে সৃষ্টি করিল? প্রথমত দেখি, আমরা এ কথাটার কতদূর ধারণা করিতে পারি। এমন কতকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহাতে বুঝিতে পারি যে, অনেক পদার্থ আপনি আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অদৃশ্য বাষ্পরাশি হইতে মেঘের উৎপত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতেও কোনরূপে আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিতেছে, এরূপ ভাবিয়া লইতে পারি। কিন্তু এইরূপ অবস্থা ব্যতীত আর কোনও রকমে আপনি আপনাকে সৃষ্টি করে, ইহা দেখি নাই; দেখিবার কদাচ সম্ভাবনা নাই, সুতরাং বুঝি না, কাজে কাজেই ধারণাও হয় না, এবং সেই কাল্পনিক ভিত্তির উপর একটা কিছু প্রতিষ্ঠিতও করিতে পারি না। যতদূর বুঝি, তাহাতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, অদৃশ্য অবস্থায় এই জগৎ এমন এক অবস্থায় ছিল, অথবা এমন কিছু ছিল, যাহার গর্ভে, বটবীজের গর্ভে বটবৃক্ষের ন্যায়, এই জগৎ বাস করিতেছিল। একেবারে শূন্য অর্থাৎ অকিছু,—একটা কিছু বিশেষের সৃষ্টি করিলেন, ইহাত বুঝিতে পারি না! আবার সুধু তাহাই নহে; জগৎ আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ অন্য কথায় ঈশ্বর জগৎরূপে প্রকাশিত;—এ কথার গর্ভে আর একটা কথা মানিয়া লইতে হয় যে, সেই আদি অনুভূত জগতের মধ্যে বা কারণের মধ্যে এমন এক আইনের বাধ্যবাধকতা ছিল, যাহাতে ক্রমবিকাশে তাহাকে এই নূতন বা বর্ত্তমান জগৎরূপে প্রকাশিত হইতে হইয়াছে। একটা আইনের বাধ্যবাধকতা, পদার্থের অস্ফুটশক্তি, এবং তাহা হইতেই জগৎ, অথবা সেইগুলিই জগৎ, ইহার অর্থ কি? অর্থ,—বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি। কেননা জগৎও যাহা, কারণও তাহাই। বিনা কারণে কার্য্য, এ কথা সম্পূর্ণ মানব-ধারণার অতীত কথা। কারণ ভিন্ন কোন্ কার্য্য আমরা বুঝি না। তবে অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন যে, সেই কার্য্য এবং কারণ উভয়ই

যখন ঈশ্বর, তখন আর কথাটায় গোল বাঁধিল কেন? আমরা বলি যে, যখন প্রশ্ন এই, জগৎ উৎপত্তি হইল কি প্রকারে, তখন জগৎকে ঈশ্বর বলিলেও ত সহসা ছাড়িব না; তখনও সেই জগৎ বা জগৎ স্থানীয় ঈশ্বরের কারণ কি—ইহা জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িব না। তাহার উত্তর কি দিবে? এই অস্ফুটশক্তি-বিশিষ্ট জগৎ বা ঈশ্বর কোথা হইতে আসিল? যদি আবার তাহার পশ্চাতে আর এক শক্তি দণ্ডায়মান করাও, অনন্ত শ্রেণীতে সেই শক্তিসমূহ পরে পরে দাঁড়াইবে—উত্তর মিলিবে না। ব্যাখ্যা হইবে না।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌দিগের মুখে সাধারণত এ পর্য্যন্ত কি উত্তর পাওয়া গিয়াছে। এ শ্রেণীর সাধারণ উত্তর, সৃষ্টি-কর্ত্তা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; ঈশ্বর স্বতন্ত্র থাকিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রশ্ন এই যে, এজগৎ কেমন করিয়া উদ্ভূত হইল? উত্তর, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এক সৃষ্টিকর্ত্তা এই জগৎ গড়িয়াছেন। তার পর প্রশ্ন; কিরূপে গড়িলেন; কুম্ভকার যেমন ঘট গড়ে, সেইরূপ? অর্থাৎ অসৃষ্ট উপকরণ লইয়া কি, ঈশ্বর এই জগৎ গড়িয়াছেন? উপকরণ যদি অসৃষ্ট এবং সেই উপকরণ হইতেই যখন জগৎ, অথবা সেই উপকরণই যখন জগৎ, তবে আর জগতের উৎপত্তির তত্ত্বের মীমাংসা হইল কৈ? যদি বল, কিছুই ছিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই "অকিছু"—হইতে জগৎরূপ "কিছু" উৎপন্ন হইয়াছে; দেখা যাক্, তাহাতেও উত্তর পাওয়া যায় কি না। "কিছু ছিল না" এ শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের উপকরণ ত ছিলই না, তাহা ছাড়া অন্ধকার বা আলোকেরও কিছু ছিল না; এবং সুধু তাহাই কেন, এই দিগন্তব্যাপী আকাশ বা শূন্য স্থল, তাহাও ছিল না; সৃষ্ট হইবার সময়ে এ সকলি সৃষ্ট হইয়াছে। "না ছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত-প্রসারি" এ বর্ণনা কিন্তু সৃষ্টির আদি সময়ের বর্ণনা নহে। কারণ সৃষ্টি হইলে "আঁধারের" ও সৃষ্টি চাই, "ঘোর দিগন্তের" ও সৃষ্টি হওয়া চাই। এখন ভাব দেখি, সময় ছিল না, স্থান ছিল না, অন্ধকার ছিল না, আলোক ছিল না। কিছু ধারণা হইবে? কিছুই বুঝিতে পারিবে না। কিছুই ধারণা হইবে না। সৃষ্টির আরম্ভ স্থান কিছুই বুঝিবে না; সৃষ্টি তত্ত্বও কিছুই বুঝিবে না। কেবল ইহাই জানিবে, এ জগৎ রহিয়াছে। কবে, এবং কিরূপে উৎপন্ন হইল, ইহা জ্ঞাত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কথা এখানেই ফুরায় নাই; আবার জিজ্ঞাসা করি, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র সেই স্রষ্টার স্রষ্টা কে?

আমাদিগের এই শেষ প্রশ্ন হইতে আবার এক দার্শনিক কুটিল তর্ক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; তাহা এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তার পরে আবার যখন সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবিতে হয়, তখনও কথাটার মীমাংসা নাই। অতএব জগতের আদিকারণ ভাবাও অসঙ্গত। কিন্তু এমীমাংসাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, কোন কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি কখনও ভাবিতে পারি না। তখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিতেছে, এ জগতের কারণ কি? অবশ্যই কিছু ভাবিতে হইবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় যাহাকে কারণ বলিয়া ভাবিতে হইবে, তাহাকে আদিকারণ না বলিলে আর তোমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে না। এবং তদ্ভিন্ন আর কিছু বুঝিতেও

পার না। আমরা ত এমন কথা বলিতেছি না যে, সেই আদিকারণ কেমন; সেই আদিকারণ কখন কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিলেন; আমরা কেবল বলিতেছি, যেমন এক দিকে সৃষ্টির ব্যাখ্যা এবং ঈশ্বরের ব্যাখ্যা অসম্ভব; অন্য দিক হইতে আবার তেমনি বলিতেছি যে, ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বর হইতে জগতাদির উদ্ভব না মানাও অসম্ভব। জানি না, কিরূপে সৃষ্টি হইল, জানি না, স্রষ্টা কিরূপ? বুঝি না যে,দেশের উৎপত্তি বা কারণের উৎপত্তির অর্থ কি? কিন্তু আবার এ কথা জানি যে, আমরা এবং এই জগৎ অবশ্যই (যেরূপেই হউক) এক আদি অজ্ঞাত শক্তি হইতে, অথবা নামান্তরে ঈশ্বর হইতে প্রসূত হইয়াছি। বিনা কারণে এ সকল হইয়াছে, এ ভাবনা অসম্ভব। জগৎ ঈশ্বর রূপে প্রকাশিত, এ কথা বলিবার কোন যুক্তি নাই, এ কেবলি কল্পনা। যাহা বুঝি তাহা এই টুকু যে, এক অসীম অজ্ঞাত মহাশক্তি হইতে, এই সীমাময়, এই প্রত্যক্ষীভূত, কিয়ৎ পরিমাণে শক্তিবিশিষ্ট জীবসমূহ এবং জগৎ প্রসূত এবং তদ্দ্বারা চালিত ও নিয়মিত। ইহা ব্যতীত যাহা কিছু ভাবিবে, সকলি কল্পনা। ফুৎকারে আকাশ ও আলোকের জন্ম, ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টি, এ সকলি কল্পনার খেলা। পরমাণু অনন্তকাল রহিয়াছে, ইহাও অসার কথা। সুধু ইহাই বুঝি যে, আমরা আছি। এবং যখন আছি, তখন হইয়াছি। প্রশ্ন হইল; আমরা কোথা হইতে প্রসূত হইলাম? ইহার এক এবং শেষ উত্তর, কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তি হইতে সকলে জন্মিয়াছি। তাহার পর প্রশ্ন এই যে, সে শক্তি কেমন, এবং তিনি কবে সৃষ্টি করিলেন—কিরূপে সৃষ্টি করিলেন? ইহার আর—উত্তর নাই। এখানে বিজ্ঞান মুগ্ধ, এখানে দর্শন মুগ্ধ। এই শক্তি আদিকারণ, এই শক্তি ঈশ্বর-শক্তি। এই আদিকারণের জ্ঞান, এবং জগৎ ও জীবের সেই আদিকারণ হইতে প্রসূত হওয়ার চিন্তা বা ভাব, মানুষের অস্তিত্বের সহিত এমনি মিশ্রিত যে, বাঁচিয়া থাকিলেই এ ভাব থাকিবে; সূক্ষ্মদর্শী হইতে গেলেই আদিকারণ মানিতে হইবে। একথা উড়াইয়া দিবার কথা নয়। আজি যিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তাশীল বলিয়া আদৃত, সেই মহামতি দার্শনিক স্পেন্সার এই সকল কথা বিশেষরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন।

উপসংহার কালে আমরা যাহা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহা একবার বলিয়া শেষ করি। আমরা দেখাইয়াছি যে, বিশ্বসৃষ্টির কোন তত্ত্ব আমরা জানি না। কেবল জানি যে, এ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে; ঈশ্বর এ বিশ্বের স্রষ্টা। কিন্তু কিরূপে, কখন, কি অবস্থায় যে সৃষ্টি হইল, ইহা ধারণার অতীত। সহস্র গবেষণায়ও ইহার কোন মীমাংসা হইতে পারে না।

প্রেমাবতার বা ম্যাট্‌সিনি।

পণ্ডিতেরা বলেন, হৃদয়ের শক্তি পৃথিবীর সকল শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাঁহারা বলেন, হৃদয়শক্তি পৃথিবীর মূলশক্তি, আর সকল শক্তি তাহারই ছায়া বা প্রতিকৃতি। হৃদয়শক্তির প্রাবল্যেই মানুষ দেবতা বা ঈশ্বরাবতার। হৃদয়শক্তির অপর নাম প্রেম-

শক্তি। এক প্রেমের বিকাশে আত্মায় পরমাত্মায় যোগ, আর এক প্রেমের বিকাশে জগতের নরনারী, জীবজন্তু সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সহিত আত্মার ঘনিষ্ট যোগ। মানুষ কে?—ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, কীটাণুবৎ—দুর্ব্বল—শক্তিহীন। কোটী কোটী সৃষ্ট-পদার্থের একটী ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানবসমাজ—সিন্ধুর এক বিন্দু। এক একটী মনুষ্য আবার সেই বিন্দুর এক অংশ। বিন্দুরও পরিমাণ করা যায়, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, স্বতন্ত্র ভাবে এত ক্ষুদ্র যে,তাহার পরিমাণও হয় না। যখন অগণ্য চন্দ্রতারকাখচিত নভোমণ্ডলের দিকে তাকাই, আর তাকাই বিস্ময়পূর্ণ বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র এই পৃথিবীতলে, তখন মনে হয়, মানুষ কে যে, তাহাকে গণনা করিব?—মানুষ কোথায়?—বিন্দু তখন সৃষ্টিসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যায়, তাহার পরিমাণও করা যায় না। পরমাণুকে বিভিন্ন করিতে করিতে শেষে এত সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয় যে, তাহাকে কল্পনাও করা যায় না। অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম—অতি সঙ্কীর্ণ মানুষকে বিভিন্ন অবস্থায় চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে,—সৃষ্টির সহির তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র। পরমাণু মিলিতে লাগিল,—মিলিতে মিলিতে পাহাড় হইল, পর্ব্বত হইল—নদ হইল, নদী হইল—সকল মিলিয়া সৃষ্টিসিন্ধু উৎপন্ন হইল। ক্ষুদ্র মানব-পরমাণুও মিলিতে লাগিল, মিলিতে মিলিতে কত বড় মানব-সমাজ হইল। কত ক্ষুদ্র জিনিষ কত বড় হইয়াছে। কতই জ্ঞান, কতই বিজ্ঞান, কতই দর্শন, কতই কাব্য মানুষের মস্তক হইতে নির্গত হইতেছে। সমষ্টিতে মানুষ কত বড়। দশ জনের জ্ঞান আমার চতুর্দ্দিকে আছে বলিয়াই আমি শিখিতেছি—দশ জনের চিন্তাস্রোত আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়াই, সেই স্রোত ধরিয়া, চলিতেছি। বংশ পরম্পরার জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্মবল, চরিত্রবল আমাকে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া অগ্রসর করিতেছে বলিয়া, আজ এত উন্নত হইয়াছি। ক্রমে যে পৃথিবী উন্নত হইতেছে, সে এই জন্য, একের সাহায্য অপরে পাইয়াছে। সমষ্টির সমবেত শক্তি ভিন্ন মানুষ অতি ক্ষুদ্র—অতি অনুন্নত। যদি পৃথিবীর কোন মানুষ কোন মানুষের জন্য না ভাবিত—মস্তক খাটাইয়া কোন মানুষের জন্য কিছুই জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া না রাখিত,—সামাজিক, বা ধর্ম্মনৈতিক, পারিবারিক বা পারলৌকিক কোন তত্ত্বই যদি না রাখিয়া যাইত, তবে পৃথিবী কখনই আজ এত উন্নত হইত না। একের বলে, অপরের বল, একের জ্ঞানে, অপরের জ্ঞান বৃদ্ধি। পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিতেই হইবে। গৃহেই থাক, আর গৃহের বাহিরই হও—যদি মানুষ হইতে চাও, পরস্পরের দান গ্রহণ করিতেই হইবে। উপেক্ষার রাজ্য এখানে নাই। মহাসিন্ধুর মহাবিন্দু পৃথক থাকিতে পারিবে না; মিলিবেই মিলিবে। মিলিতে মিলিতে, পাইতে পাইতে, লইতে লইতে, পৃথিবী আজ কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, জ্ঞান গরিমায় কত বড় হইয়াছে। স্পেন্সার বিলাতে বসিয়া প্রদান করিতেছেন, আমি এখানে বসিয়া লইতেছি, কেশবচন্দ্র ভারতে বসিয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন,—পৃথিবী তাহা লইতেছে, ও লইবে। সকল মানব-পরমাণু মিলিয়া মিশিয়া এক মহাসিন্ধু, সেই সিন্ধুর নাম সমাজ। সমাজে যে আজ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ তুলিয়া বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাইয়া

সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা জানি; কিন্তু তাহা স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমাজ এক—অকূল সমুদ্র। খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ—সব মিলিয়া এক মহাসিন্ধু। সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ—সব একাকার। আদান-প্রদান চলিতেছে—প্রাণে প্রাণে বিনিময় হইতেছে—সাম্প্রদায়িকতার শক্তি পরাস্থ হইতেছে, এক মহাবাণীর দুর্জ্জয় নিনাদে সব মিলিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। বিন্দু উঠিতেছে—সিন্ধুতে মিশিতে। বুদ্ বুদ্ জন্মিতেছে—পৃথকত্ব নাশ করিয়া সিন্ধুতে মিলিতে। এক সূত্রে সকল বাঁধা পড়িয়াছে। সত্যযুগে কলিযুগে, দ্বাপরে ত্রেতায় দুশ্ছেদ্য দৃঢ় বন্ধন। শতাব্দীতে শতাব্দী দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা। কালিদাস সেক্ষপিয়র, শঙ্করাচার্য্য আর বুদ্ধদেব, নিউটন আর গ্যারিবল্ডি, চৈতন্য আর যিশুখ্রীষ্ট, ম্যাট্‌সিনি আর পার্কার—সকলেই এক দুচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ—সেই শৃঙ্খল আবার বর্ত্তমান নরনারীকে অলক্ষিত ভাবে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। এই যে সূত্র, এই যে বন্ধন, ইহা মহাবন্ধন—মহামায়ার মহামায়া-বন্ধন, ইহারই অপর নাম প্রেম। প্রেমই প্রথম বন্ধন, জ্ঞান পরে। প্রেমে মিলিলাম—তবে জ্ঞান পাইলাম। জড়জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া মনুষ্য বিজ্ঞান পাইল, জীবজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া দর্শন পাইল। প্রেম আদিতে ছিল, তাই আর সকল ঘটিল, আর সকল মিলিল। প্রেম মূলে ছিল—তাই সকলে পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে পারিল—জ্ঞানী হইতে সক্ষম হইল। প্রেমে জগৎ বাঁধা ছিল বলিয়া বর্ত্তমান শতাব্দী অতীত শতাব্দীর অর্জ্জিত বস্তুর উত্তরাধিকারী হইল—পুত্র পিতার ঐশ্বর্য্য পাইল। ক্ষুদ্র মানুষ এক প্রেমেতেই এত উচ্চ মনুষ্যত্বে আজ অধিষ্ঠিত। মানুষ প্রেমের অবতার—তাই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব—জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বিদ্যা বুদ্ধিতে আজ এত উন্নত। এই যে প্রেমের মহাসমুদ্র—অলক্ষিত—অথচ উজ্জ্বল,—ঢেউ-শূন্য, অথচ বিহ্বল; এই সমুদ্রে মানুষ পড়িয়া মিলিয়া কেবলই পান করিতেছে। ক্ষুদ্র মানব-পরমাণু সকল একবার পান করিয়া পৃথক হইতেছে,—হইয়া আপন অস্তিত্ব জগতে প্রচার করিতেছে, আবার স্বাতন্ত্র্যকে সাগরে ডুবাইতেছে। একবার আমি আমিত্বে আসিতেছি, আবার তোমাতে ডুবিতেছি—জগতে ডুবিতেছি—কূল কিনারা ভুলিয়া অকূলে মিশিতেছি। সব পরমাণু পৃথক, আবার সব পরমাণু একাকার। একবার সকলে আদান প্রদানের জন্য মিলিতেছে, আবার সকলে পৃথক হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার মিলিতে মিলিতে, ডুবিতে ডুবিতে, পান করিতে করিতে, এক এক জন, মহামায়ার মহা প্রেমে মত্ত হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র পরমাণু যেন সেই সিন্ধুতে একেবারে মিলিয়া যাইতেছে। আপনার অস্তিত্ব জগতের অস্তিত্বে মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের আপনার বলিবার আর কিছুই থাকিতেছে না—সমস্ত জগৎ তাঁহাদের আপনার হইয়া যাইতেছে; অথবা তাঁহারা জগতের হইয়া যাইতেছেন। এমনই হইয়া যাইতেছে যে, মানুষ সে চিত্র দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে আর স্বার্থ নাই—কেবলই পরার্থ; সঙ্কীর্ণতা নাই কেবলই উদারতা,—সীমা নাই, কেবলই অসীমের লীলাখেলা,

দেখিয়া মানুষ চমকিত, বিস্মিত হইয়া যাইতেছে। মানুষ মানুষের সে অপরূপ দেখিয়া আর তাঁহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না। মানুষের বুদ্ধি বিদ্যা পরাস্থ হইয়া যাইতেছে—চিন্তা ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইতেছে—অবাক হইয়া মানুষ মানুষদিগকে প্রেমের অবতার না বলিয়া ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। বুদ্ধদেব, নানক, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট এই জন্য আজ জগতে—ঈশ্বরাবতার। এই কারণেই আজ আবার কোন একদেশদর্শী বাঙ্গালার পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। অসীমে সীমাত্ব আছে, সিন্ধুতে বিন্দুত্ব আছে, কিন্তু সীমা ও বিন্দুতে অসীম সীমা-প্রাপ্ত,—সিন্ধু বিন্দু-প্রাপ্ত। বিন্দু বলিলে সিন্ধুকে বুঝায় না। বিন্দুতে সিন্ধুর অংশ আছে—থাকিতে পারে, কিন্তু বিন্দুই সিন্ধু নহে। এই কথাটী পৃথিবীর নরনারী বুঝিতে পারিল না। বৃক্ষে ঈশ্বর, ফলে ঈশ্বর,—ফুলে ঈশ্বর,—জলে ঈশ্বর, স্থলে ঈশ্বর আছেন, সত্য কথা; কিন্তু তাই বলিয়া ফুলকেই ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরের কিছুই বলা হইল না;—সিন্ধু সেখানে বিন্দু হইয়া গেল; অনন্তপূর্ণস্বরূপ সেখানে সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। আমাতে জ্ঞান আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে জ্ঞান এই রক্তমাংস নহে। আমাতে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাই বলিয়া আমিই ঈশ্বর নহি। বিন্দু সিন্দুর অংশ, কিন্তু বিন্দুকে সিন্ধু বলিলে সিন্ধুর কিছুই বলা হইল না। এ কথাটী অনেকে বুঝে নাই, আজও অনেকে বুঝিতেছেন না। বুঝিতেছেন না বলিয়াই, আজও চৈতন্য এবং যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। সে যাহা হউক, মানুষ যে আপনার অস্তিত্ব জগতের সহিত মিশাইয়া এক করিয়া দিতে পারে, সে কথা ঠিক;—মানুষ যে আপন স্বার্থকে পরার্থ করিয়া লইতে পারে, তাহা নিশ্চয়। যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন স্বার্থ-বিবর্জ্জিত অনেক মহাত্মা জন্মিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বার্থ-বিবর্জ্জিত, পরদুঃখে কাতর, ভোগ-বিলাস-বিরত ম্যাট্‌সিনি ইহার জলন্ত দৃষ্টান্তের স্থল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রেমের অবতার মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি। এক প্রেমেতে ম্যাট্‌সিনি দরিদ্র ও অসহায় হইয়াও প্রভূত শক্তিশালী—জ্ঞানী—পৃথিবীর পূজ্য। এই মহাত্মার উদ্দেশে প্রবন্ধারম্ভে শত শত প্রণাম। ইনি প্রাতঃস্মরণীয়,—ইনি প্রতিভাশালী বীর,—ইনি শক্তি। যে শক্তি প্রভাবে ইতালি আজ পুনরুত্থিত, ইনি সেই শক্তির অবতার।

ম্যাট্‌সিনিকে প্রেম-খনি বলিলেও চলে, ম্যাট্‌সিনি বলিলেও চলে। জীবনের অতি প্রত্যুষে—ফুটন্ত বাল্যকালে এই প্রেমের লীলা-খেলা আরম্ভ হইল। যখন ম্যাট্‌সিনি ষষ্ঠ বৎসর বয়সের শিশু, তখন একদা জননীর সহিত উপাসনালয়ে গিয়াছিলেন। সিঁড়ির উপরে একটী বৃদ্ধ ভিক্ষুক উপবিষ্ট ছিল। ম্যাট্‌সিনি দেখিবামাত্র ব্যগ্র হইয়া ভিক্ষুকের নিকটে যাইয়া গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং জননীকে কাতর-স্বরে বলিলেন, "মা ইহাকে কিছু দেও।" শিশুর প্রথম সংসার-দর্শনের দিনের এই আশ্চর্য্য ব্যবহার, এই মধুর কথা জননীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল—সে কথা জননী জীবনে কখনও ভুলিলেন না। বৃদ্ধ ভিক্ষুক চমকিত হইয়া জননীকে বলিল—"Love him well, lady; he is one who will love the people." পৃথিবীর বালকগণ যখন ধূলি-খেলায়

মত্ত থাকে, ম্যাট্‌সিনির প্রাণে তখনই প্রেমের এমনি আবরণ পড়িল। বালকের খেলা হইল, দুঃখীর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করা,—আমোদ হইল, দুঃখীকে সাহায্য করা। বাড়ীতে ভিক্ষুক আসিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ম্যাটসিনির জননী ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় না করিতেন, ততক্ষণ বালকের মন সুস্থ হইত না—চক্ষের জল থামিত না। ম্যাটসিনি বিষাদ ও দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন; গল্প শুনিতে শুনিতে চক্ষের জল পড়িত। মাতৃ-ক্রোড় প্রেমবিকাশের প্রথম স্থল; সেই মাতৃ-ক্রোড়ের প্রতি ম্যাট-সিনির অপরাজিত ভালবাসা ছিল,—সে ভালবাসা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। বাল্যকাল হইতে মায়ের মুখ-ছবি ম্যাটসিনির সকল দুঃখের সান্ত্বনা ছিল। ম্যাটসিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"মাতার অকৃত্রিম ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আমি পৃথিবীর জন্য অশ্রু ফেলিতে শিখিয়াছিলাম!" নির্ব্বাসনের অবস্থায় মাতার কথা মনে হইলেই অলক্ষিত ভাবে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। এমন ভাল-বাসার বস্তুকেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রসন্ন চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! এক দিন প্রহরীরা ম্যাটসিনিকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ম্যাটসিনির পিতা সে সংবাদ শুনিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া সন্তানকে দেখিতে আসিলেন; প্রহরীদিগের অত্যা-চারে ম্যাটসিনির সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইল না, ম্যাটসিনি লোকের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "মাকে বলিও, আমি কয়েক দিবস পরেই ফিরিয়া আসিব, কোন ভয় নাই।" নির্ব্বাসনের অবস্থায় মাতার নিকট পত্র লিখিতে দিত না, কিন্তু ইহা ম্যাটসিনির প্রাণে সহিত না, তিনি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া মাতার নিকট সর্ব্বদাই সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিয়া পাঠাইতেন। মাতা কাঁদিতেছেন, ইহা ম্যাটসিনির প্রাণে বড়ই কষ্ট দিত। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"More powerful upon me than any advice or any danger, were the exceeding grief and anxiety of my poor mother, had it been possible for me to have yielded, I should have yielded to that" আবার দেখ, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এমন দেবদুর্ল্লভ মাতৃপ্রেমকেও ম্যাটসিনি তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন। দারুণ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একস্থলে ম্যাটসিনি বলিতেছেন,—"My own mother—blessed be her memory!—with the earnest deep sighted love that looks forward to the future, had prepared me to stand, unshaken in the midst of every misfortune." কি গভীর প্রেমের কথা!!

বাল্য-খেলা শেষ হইলে, স্কুলের খেলা আরম্ভ হইল,—মাতৃ-প্রেমের পার্শ্বে সেখানে বিকাশ পাইল—এক দিকে প্রতিভা, আর এক দিকে সুহৃদ-প্রেম। "In school he was loved and respected by his fellow-students, for his good qualities of head and heart." স্কুলের বালকদিগের প্রতি অত্যাচার দেখিলে ম্যাটসিনির চক্ষের জল সম্বরণ হইত না। কাহারও অভাব দেখিলে সে অভাব দূর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; আপনার পাঠ্যপুস্তক, পরি-ধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিতরণ করিতেন। স্কুলে থাকিতে থাকিতেই স্বদেশ ইতালির কালিমাময় চিত্র তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। ইতালির দুর্দ্দশা—দুঃখ দারিদ্র্য—বিদেশীর অত্যাচার—ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতার অপলাপ দেখিয়া প্রাণে দারুণ জ্বালা আরম্ভ হইল। বালকের মুখ মলিন,

পরিধেয় বস্ত্র মলিন। দিবসে, রজনীতে—ভিতরে, বাহিরে এক প্রবল চিন্তাস্রোত ম্যাট-সিনিকে আক্রমণ করিল। যৌবন আগমন করে—মনুষ্যকে বিলাসী করিতে, সুখে মাতা-ইতে; ম্যাটসিনির যৌবন আসিল—হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম-হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিতে। কি করিলে মানবসমাজের অভাব দূর হইবে, কি করিলে ইতালি স্বাধীনতা পাইবে, কি করিলে সাধারণ লোকের উন্নতি হইবে, এই চিন্তা ম্যাট্‌সিনির প্রাণকে যৌবনের প্রারম্ভেই আক্রমণ করিল। তিনি লিখিয়াছেন;—"My spirit was crushed by the impossibility I then felt of even conceiving by what means to reduce it to action……in the midst of the noisy, tumultuous life of the scholars around me, I was sombre andabsorbed, and appeared like one suddenly grown old. I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country... Matters went so far that my poor mother became terrified lest I should commit suicide." এই মলিন হৃদয় ও মলিন চিত্রের দারুণ প্রেমের টানে, স্কুলের ছাত্রবর্গ ম্যাট্‌সিনির সঙ্গ-ছাড়া হইত না, স্কুলের ছুটী হইলে ম্যাট্‌সিনির বাড়ীতে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইত। প্রাণে দেশের অধী-নতার চিত্র, বাহিরে ছাত্রদের জীবনের অভাব, ম্যাটসিনিকে মাতাইয়া তুলিল। লোকের অভাব দেখিলে, তাহা দূর করিতে না পারিলে আর সুস্থ হইতে পারিতেন না। স্কুলের পাঠ এক প্রকার শেষ হইলে, প্রথমে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, কিন্তু শব-ছেদনে ম্যাট্‌সিনির পীড়া হওয়ায়, তাহা পরিব্যাগ করিয়া আইন পড়িয়া নব্য-উকীল হইলেন। ম্যাটসিনি যখন উকীল হইলেন, তখন পিতা মাতার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। কিন্তু তিনি ওকা-লতি কি করিবেন?—উকীল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—পিতা মাতার আশা ভরসার মূল উচ্ছেদ করিয়া, দেশের জন্য জীবনকে কেমন করিয়া উৎসর্গ করিবেন, কেমন করিয়া লোকের সেবা করিবেন। ইতালিতে ওকা-লতির যে দুই বৎসর দরিদ্রদিগের মক-র্দ্দমা অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, সে দুই বৎসর ভাল ভাবেই গেল,—দুঃখীর চক্ষের জল কতক নিবারণ করিতে পারিলেন, সমদুঃখী দরিদ্রদিগের অভাব দূর করিতে পারিয়া কতক সুস্থ হইলেন। এই সময়ে তিনি দেশোদ্ধারের জন্য প্রতি-ষ্ঠিত একটী গুপ্ত সভায় যোগ দান করিলেন। সে সভায় যোগ দিয়া তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না;—কারণ, সে সভার সভ্য-গণের ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কিন্তু এ সভার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পূর্ব্বেই, তিনি উক্ত গুপ্ত সভা-সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধে, সেভনার দুর্গে ছয় মাসের জন্য বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় ইতালির অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র তিনি আবিষ্কার করিলেন—"উপরে ঈশ্বর, নিম্নে মানব-সন্তান, ইহার মধ্যে আর কোন মধ্য-বর্ত্তী নাই। অনন্তের ধ্যান ভিন্ন মানবের আর পবিত্রাণের পথ নাই। ধর্ম্মবল ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের আর সহায় সম্বল নাই। মানব কেবল রাজার অধীন নহে, আচার ব্যবহার, টাকা কড়ি, বিলাস প্রলোভন—পৃথিবীর এই সকলে মিলিয়া মানুষকে দারুণ অধীনতায় পূরিয়া রাখিয়াছে; ইহাদের হস্ত হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে হইলে ধর্ম্ম ভিন্ন আর উপায় নাই।" এই চিন্তা ম্যাট-সিনির মনে সেই সেভনার ক্ষুদ্র দুর্গে উদিত হইল। সেভনার ক্ষুদ্র গৃহের এক দিকে অনন্ত আকাশ, অন্য দিকে সুবিস্তৃত

সমুদ্র,ম্যাটসিনের প্রাণে অনন্তের ভাব জমাইয়া দিল। জ্বলন্ত নিরাশার মধ্যে আশা পবন বহিল ;—মনে উদিত হইল—"All great national enterprises have even been originated by men of the people, whose sole strength lay in that power of *faith* and of *will* which *neither* counts obstacles nor measures time." এই চিন্তাতে সিংহের বল হৃদয়ে সঞ্চিত হইল ;—মানুষ ঈশ্বরের সন্তান—ধর্ম্মযাজক বা রাজার অধীনতার হস্ত হইতে অবশ্য মুক্তি পাইবে, চেষ্টা করিলে সকল প্রকার অসম্ভব সম্ভব হইবে, এই চিন্তায় বিভোর হইয়া লিখিলেন—

"And I saw Europe, weary of scepticism, egotism, and anarchy, accept the new faith with acclamations" "Such" he says, "were my thoughts in my little cell at Savona ;" অন্য স্থলে ৪০ বৎসর পরে লিখিতেছেন—"I think the same thoughts still, on broader grounds, and with maturer logic in the little room, no longer than that cell, wherein I write these lines. And during life they have brought upon me the title of Utopist and madman, together with such frequent disenchantments, and outrage as have often caused me—while yet some hopes of individual life yearned within me—to look back with longing and regret to my cell at Savona between Sea and Sky, and far from the contact of men."

কারাবাসের অবস্থায় কখনও ম্যাটসিনি ক্ষুণ্ণচিত্ত হন নাই ; কর্ত্তব্য পালন করিয়া মরিতে পারিলেও সুখ, সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত। বন্দীভাবে ছয় মাস অতীত হইলে, ফ্রান্স দেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। ফ্রান্সের মার্সিলিস নগরে গুপ্তভাবে তিনি "নব্য-ইতালি সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন,এবং ঐ নামে এক খানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের নামে নব্য-ইতালিকে উৎসর্গ করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভের এক মাত্র উপায়, স্বাধীনতার বীজ বপন করিলেন। কিন্তু নব্য-ইতালি ধর্ম্ম-শূন্য স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হইয়া গঠিত হইল না। কেবল স্বাধীনতাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের লেখা কত সুন্দর !—

"Liberty is but a *means*. Your task is to found the Universal Family, to build up the City of God, and unremittingly to labour towards the active, progressive fulfilment of His great work in Humanity."

মানুষ ভাই ভাই,—বড় ছোট সকলেই ঈশ্বরের সন্তান,—ভেদাভেদ নাই—রাজা প্রজা নাই—সকলই অনন্ত উন্নতিশীল, সকলেই এক পথের পথিক। সকলকে মিলাইয়া ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। 'নব্য-ইতালির' কঠোর নিয়মাবলীতে ম্যাটসিনি আপনি অগ্রে নাম লিখিলেন—চিরজীবনের জন্য ইতালির এবং মানব সন্তানের উদ্ধারের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাটসিনি জন্মগ্রহণ করেন, নবা-ইতালির ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়া ম্যাটসিনিকে জীবনে যে কষ্ট সহ্য করিতে হইল, তাহা আর সংক্ষেপে কি বলিব ! ছলনায়, লোকের অত্যাচারে সমস্ত জীবন প্রায় কারাবাসে ও নির্ব্বাসনেই অতিবাহিত হইল। নির্ব্বাসনে থাকিয়াও মানবের উন্নতির চেষ্টা করিতেন, শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেন, সংবাদপত্রে লিখিতেন, সাধারণের কলুষিত জীবনকে সংস্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেন,—মানুষের কল্যাণের জন্য সেখানেও অবিরত পরিশ্রম করিতেন। উপবাস—অনাহারে ম্যাটসিনিকে জীবনের অনেক সময় থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও পরোপকারের

কথা বিস্মৃত হন নাই। মানুষ মানুষের নিকট উপকার পাইয়াও প্রত্যুপকার করে না, ম্যাটসিনি শত্রুতার জ্বালা যন্ত্রণা আজীবন ভোগ করিয়াও পরোপকারে ব্রতী রহিলেন। লোকের সামান্য উপকার করিতে যাইয়া একটু ক্ষতি হইলে, মানুষের প্রাণ হিংসা-পীড়নে অধীর হয়, ম্যাটসিনি সমস্ত জীবন কত কষ্ট সহ্য করিলেন—পরের উপকারের জন্য ! স্বার্থত্যাগ ম্যাটসিনির প্রতি শিরায় শিরায়, প্রতি ধমনীতে ধমনীতে লেখা। কি এক গভীর প্রেমের খেলায় মত্ত, কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হইত না। ম্যাটসিনির জীবন-কাহিনীর প্রতি ঘটনায় সেই প্রেমের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সামান্য প্রবন্ধে আর কত ঘটনার উল্লেখ করিব ! জীবনে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তবু এক দিনের জন্যও মুখ মলিন হয় নাই,—সদাই প্রসন্ন, সদাই গম্ভীর মুখ,—কারাবাসও যেন ম্যাটসিনির স্বর্গবাস। প্রসন্ন চিত্ত—প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়, সেখানেও দুঃখীর দুঃখ যন্ত্রণা অপনয়নে ব্রতী। নির্ব্বাসনেও হৃদয়ের অপরাজিত দয়া। জীবনের কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর নরনারীকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই বলিতেন,—'Say not I, but we,' এই কথা ম্যাটসিনির জীবন-বাক্য ছিল,—কেবল আমি নহি, আমরা সকলে। ম্যাটসিনির মাতা কষ্টের কথা শুনিয়া সন্তানের জন্য যাহা পাঠাইতেন, তিনি কয়েদীদিগকে প্রসন্ন চিত্তে তাহা বিতরণ করিতেন, আপনি উপবাস করিয়াও অন্যের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। রাস্তার লোক ধরিয়া ধরিয়া উপদেশ দিতেন। যুবা বৃদ্ধ সকলে সে উপদেশ শুনিত। নির্ব্বাসনের অবস্থায় যখন দুঃখ কষ্ট ভীষণ রবে ম্যাটসিনিকে আক্রমণ করিল, 'রোমের প্রভু' বন্ধু লক্ষ্য পথ পরিত্যাগ করিলেন। এই নিকে পরামর্শ দিয়াছিল ; কিন্তু—কয়েক ভাহাদিগকে অটলভাবে বলিতে—"শরীর অব- you love me, let me die with Rome —আমার এই ইচ্ছা, রোমের উন্নতির চিন্তা লইয়া যেন মরিতে পারি। ইহাপেক্ষা প্রেমের জীবন্ত বাক্য আর কি হইতে পারে !!

এক সময়ে ম্যাটসিনির মনে সন্দেহের রেখা উদিত হইল,—আমি যাহা করিতেছি, ইহাই কি ঠিক ? ভাবিতে ভাবিতে কূল কিনারা পাইলেন না—চতুর্দ্দিক আঁধারময় বোধ হইল। ম্যাটসিনি সেই চিন্তায় উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ! গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতেন—পাগলের ন্যায় জানালার নিকটে ছুটিতেন ; এই ভাবে কিয়দ্দিবস গত হইল। কিয়দ্দিবস পরে চিন্তা করিয়া কূল পাইলেন, বিবেকের স্পষ্টবাণী শুনিলেন,—সুস্থ হইলেন। বিবেকের আদেশে কর্ত্তব্যের দৃঢ় জ্ঞান প্রাণে উদিত হইল ;—ক্ষুদ্র প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আপন দলের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"You are cowards, unfaithful to your own future, if, in spite of sorrows and delusions, you do not pursue it to the end. * * * Whether the sun shine with the serene splendour of an Italian morn, or the leaden corpse-like hue of the northern mist be above us, I cannot see that it changes our duty." বলিতেন,কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া যে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কে ? সূর্য্যের প্রখর রশ্মিই দীপ্তি পাউক, কিম্বা প্রবল ঝড়ই বহুক,বুঝি না, কেন কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিব। কঠোর কর্ত্তব্য বোধে ম্যাটসিনি আজীবন জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিলেন—মানবের উদ্ধা

সমুদ্র,ম্যাটসিণিকে ভাসাইলেন; আপন সুখ-ইয়া দিল। পিতার স্নেহের মধুর সম্ভাষণ, পবন বহিল তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল great nation যখন মত্ত হয়, তখন এমনি been orig[illegible] হয়। ম্যাটসিনির মাতার মুখ-ছবি wh[illegible] জীবনের বড় প্রিয় জিনিষ ছিল। কিন্তু মানবজাতির প্রেমের অনুরোধে তাহাকেও তুচ্ছ করিলেন,—জগতে নিঃস্বার্থ ভাবের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই রাখিয়া গেলেন!—

"But even were these consolations denied me, I believe I should still be what I am."

অনেকের বিশ্বাস, ম্যাটসিনি সঙ্কীর্ণ দেশ-উদ্ধারের জন্যই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিছুই করেন নাই। এ কথাটী অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। ম্যাটসিনি সর্ব্বদাই মানবজাতির কল্যাণের কথা বলিতেন। প্রতি কথা, প্রতি চিন্তাতে—মানবজাতির কিসে উন্নতি হইবে, এই ভাব স্ফূরিত। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন। আপন দেশ-সংশোধনের চেষ্টা করিতেন, এই জন্য যে, এক দেশ উদ্ধার হইলেই অন্য দেশের উদ্ধারের সম্ভাবনা হইবে। তাঁহার নিজের ভাষা এই,

"In labouring for our own country, we labour for humanity."

মানবের মঙ্গলের কথা তাঁহার জীবন-ভূষণ ছিল। ম্যাটসিনির বিশ্বাস ছিল, সমগ্র দেশের উন্নতি করিতে হইলে, এক সীমাবদ্ধ স্থান হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। আপনার দেশকে,আপনার পরিবারকে এবং আপনাকে সংশোধন করিলেও মানবজাতির কল্যাণের জন্য অনেক করা হইল। কারণ, এতগুলি লোক সংশোধিত হইলে, দৃষ্টান্তানুকরণে পৃথিবীর অনেক উপকার হইবে। অন্তত ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর যে অপকার হইত, তাহা না হইলেও পৃথিবীর অনেক উপকার। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্পেন্সার ঠিকই বলিয়াছেন;—

"Since the goodness of a society ultimately depends on the nature of its citizens; and since the nature of its citizens is more modifiable by early training than by anything else; we must conclude that the welfare of the family underlies the welfare of society."

আপনার জন্য ম্যাটসিনি আর কিছুই রাখিলেন না—আপনার সর্ব্বস্ব দেশের উদ্ধারের জন্য, মানবসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিলেন। উদার প্রেমিক সন্ন্যাসী বলিতেছেন,—

"I bade a long, sad farewell to all individual hopes for me on earth. I dug, with my own hands, the grave, not of my affections,—God is my witness, that now, grey-headed, I feel them yet as in the days of my earliest youth—but of all the desires, exigences, and ineffable comforts of affection, and I covered the earth over that grave, so that none might ever know the Ego buried beneath."

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দুঃখ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়াও মানবের হিত চিন্তায় রত রহিলেন। অত্যাচারী রাজার অত্যাচার একদিকে, ম্যাটসিনির অধ্যবসায় ও চেষ্টা অপরদিকে। গোপনে কত সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিলেন, কত বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলেন। গোপনে গোপনে কত লোককে মাতাইয়া তুলিলেন। একজনের প্রেমে ইতালি মাতিয়া উঠিল—দুর্ব্বল প্রাণে বল ও সাহস আসিল। বিলাসী বিলাস পরিত্যাগ করিয়া দলে যোগ দিল, বৃদ্ধ নববলে

বলীয়ান হইয়া ম্যাটসিনির সহায় হইল। যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিল। কত যুদ্ধ কত বিদদের পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমে স্বাধীনতন্ত্র ঘোষিত হইল;—ম্যাটসিনির জীবনের সুখের দিন উপস্থিত হইল। পবিত্র রোম সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—"Rome was to me, as, in spite of her present degradation, she still is, the temple of humanity. From Rome will one day spring the religious transformation, destined, for the third time, to bestow moral unity upon Europe."

কিন্তু লোকের চক্রান্তে ম্যাটসিনির সুখের স্বপ্ন ফুরাইল, আবার যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইল, শেষ ফল এই হইল,—স্বাধীন ইতালিতে আবার রাজতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। দারুণ যন্ত্রণায় ম্যাটসিনির হৃদয় একেবারে আচ্ছন্ন হইল। শেষ-জীবনের কষ্ট ম্যাটসিনির আর ঘুচিল না—সকল চেষ্টা পরাস্ত হইল। বিষাদে মগ্ন হইয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে সিসিলীতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আবার বন্দী হইলেন। ঈশ্বরের কৃপায় একটী রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে এবার মুক্ত হইলেন। মুক্ত হইয়া বাল্যক্রীড়াস্থল—জীবনের আশা-স্থল রোমকে সজল নয়নে দূর হইতে জন্মের মত দেখিয়া যাত্রা করিলেন। ইতালি "Profaned by monarchy," দেখিতে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইলেন। জেনোবাতে মাতার গোর-স্থান, তীর্থ স্থানের ন্যায়, দর্শন করিয়া, ইংলণ্ডে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন, স্থির করিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে কর্ত্তব্যপরায়ণ ম্যাটসিনি দেশের কথা ভুলিয়া অনেক দিন থাকিতে পারিলেন না—কর্ত্তব্যের মর্ম্মদাহ সেখানেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এবং জুগালোতে ফিরিয়া আসিয়া 'রোমেরপ্রজা' নামক পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। এই খানেই জীবনের শেষ অভিনয় হইল—কয়েক বৎসর অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। অবসন্নতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আবার বৃদ্ধ বয়সে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর অল্প পর্ব্বতের দারুণ দুর্ব্বহ শীত সহ্য করিতে পারিল না; ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফুস্‌ফুস-প্রদাহে আক্রান্ত হইয়া ৬৭ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। জনপ্রাণী-হীন প্রদেশে, চিরনির্ব্বাসিত অমরাত্মা শরীরকে পরিত্যাগ করিল। মৃতদেহ জেনোবাতে আনীত হইল, এবং সেইখানে অস্থিপঞ্জর প্রোথিত হইল। ম্যাটসিনির জীবন এইভাবে শেষ হইল। মাটীর শরীর মাটীতে পড়িয়া রহিল। প্রেমের শেষ-লীলা সেদিন জন্মের মত নিবিয়া গেল। প্রেমে যে জীবন আরম্ভ—প্রেমের অনুরোধ পালনেই সেই জীবন শেষ হইল। মৃত্যুর পরে লোকেরা বুঝিল, কি সোণার পাখী উড়িয়া পলাইল। সামান্য লোক হইয়াও লোকের এত ভালবাসা পাইয়াছিলেন যে, মৃতদেহ যখন গোর-স্থানে নীত হইতে লাগিল, তখন ৮০ সহস্র লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চতুর্দ্দিক হইতে ক্রন্দনের রোল বিশাল আকাশে অমরাত্মাকে ধরিতে উঠিল। দীনদুঃখীর প্রাণ অধীর হইল। সাধারণ লোকের এমন ভালবাসা আর কে কবে পাইয়াছে?

ম্যাটসিনি এখন স্বর্গে,—প্রেমের অবতার প্রেমময়ীর চরণাশ্রয়ে শান্তি লাভ করিয়াছে। ম্যাটসিনির ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রেমিক ধার্ম্মিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না। জগতের উদ্ধারের জন্য, এক দিন প্রাণ ভাসা-

ইয়াছিলেন—খ্রীষ্ট ;—আর সে দিন, চক্ষের সম্মুখে, প্রাণ ভাসাইলেন—ম্যাটসিনি। শয়নে, স্বপনে, চলনে, উপবেশনে, আহারে বিহারে, প্রেমবিহ্বল ম্যাটসিনি ক্ষীণ কণ্ঠে গাইলেন—কেবল ঈশ্বরের নাম। ভোগ-বিলাস-প্রলোভন-অনাসক্ত—ইন্দ্রিয়-সুখ-চাঞ্চল্য-বিরহিত বীর, অবিচলিত ভাবে স্বদেশের—সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য, তাঁহাদের চরণতলে জীবনকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন। কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন খাটিয়াই মরিলেন। যেমন মুখে বলিতেন, "God created us, not to contemplate, but to act. He created us in His own image, and He is *Thought* and *Action*, or rather, in Him there is no Thought which is not simultaneous Action." কার্য্যেও তেমনি করিতেন।—কেবল চিন্তার জন্য নহে—ঈশ্বর কার্য্যের জন্য আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপন প্রকৃতিতে মানুষকে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাতে কার্য্য এবং চিন্তা একত্র সম্মিলিত, অথবা তাহাতে কার্য্যশূন্য চিন্তা নাই। "ক্ষুদ্র মানব-শিশু গম্ভীরভাবে এই কথা বলিলেন,—এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত এ কথার জীবন্ত-সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ম্যাটসিনিকে কর্ত্তব্যের অবতার বলিলেও চলে, কিম্বা প্রেমের অবতার বলিলেও হয়। প্রেম আর কর্ত্তব্য একত্রে। যেখানে প্রেম নাই—সেখানে কর্ত্তব্য নাই। মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলে আর তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণ কাঁদিবে কেন? প্রাণ না কাঁদিলে প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের উপকার করা যায় না। জীবনে কর্ত্তব্য-পালনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এবং লেখনীতে অবিনশ্বর অক্ষরে 'মানবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে অমৃতময় ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিলেন। আজ তাঁহার সেই গম্ভীর প্রসন্ন মুখ পৃথিবীর অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখনীর অমৃতবর্ষী কথা লহরী মানবের চক্ষুকে তৃপ্ত করিতেছে ;—স্বর মিলাইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভাষা আজও পৃথিবীর প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে। সাধারণ লোকদিগের জন্যই ম্যাটসিনির জন্ম, তাহাদের উন্নতির জন্যই জীবন-পাত, এবং তাহাদের উন্নতির জন্যই লেখনী ধারণ। মুখে বলিতেন, একই কথা—কি করিলে দেশের সাধারণ লোকের উন্নতি হইবে,—কেমনে মানুষ ধার্ম্মিক হইবে ; লেখনীতে লিখিতেন তাহাই—কিসে সাধারণ লোকের মঙ্গল হইবে, কি করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার লেখার প্রতি পংক্তি ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ। এমন পৃষ্ঠা নাই, যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই। এমন একটী প্রবন্ধ নাই, যাহাতে মানবের উন্নতির কথা নাই। 'মানবের-কর্ত্তব্য' নামক প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে তাহার জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব, বিশ্বাস ও প্রেমের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে। উহা এতই সুন্দর যে, এক ছত্র রাখিয়া আর এক ছত্র তুলিয়া উপহার দেওয়া যায় না। এমন আশ্চর্য্য জিনিষ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার কার্য্য ছিল না, ঈশ্বর ভিন্ন কথা ছিল না। আপন জীবনে যাহা, অন্যকেও তাহাই বলিতেন—"Be your country your Temple. God at the summit; a people of equals at the base."

একমাত্র পরব্রহ্মই মুক্তির সোপান—তিনিই আশ্রয়, তিনিই গতি, ইহাই তাঁহার প্রাণগত বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বর ও আত্মা, ইহার মধ্যে আর কোন মধ্যবর্ত্তী নাই, এইটী প্রাণের কথা ছিল। সরল বিশ্বাসীর

সরল কথা,—"There is not, there cannot be, infallibility either in Man or Powers * * * there is not and there cannot be, need of any interpreter between God and man." সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল সময়েই অনন্তের ভাব তাঁহার প্রাণকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। ম্যাটসিনি যদি খ্রীষ্ট সমাজের লোক হইতেন, আজ তাঁহার গৌরবকাহিনীতে পৃথিবী টলমল করিত। আমাদের বিশ্বাস,—লুথার ও সেণ্টপলের জীবন অপেক্ষাও ম্যাটসিনির জীবন ভক্তিবিশ্বাসে অনেক উন্নত, কিন্তু খ্রীষ্ট বিশ্বাসবিরোধী বলিয়া আজ ম্যাটসিনির নাম অনাদৃত। ম্যাটসিনি এক মাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন ; সাম্প্রদায়িকতার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন ; পৌরহিত্য-প্রথার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। মানুষ মানুষের দাস হইবে—সম্প্রদায়ের দাস হইবে, গুরুর দাস হইবে—ইহাও তাঁহার সহ্য হইত না। মানুষকে ঈশ্বরাবতার বলিতে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন, "*We own but one Master in heaven,—God.* and but one interpreter of His law on earth,—the People." মানুষ পরস্পর ভাই ; ভাই ভাইয়ের উন্নতি করিবে—ভালবাসিবে—মানবজাতির কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিবে। মানব জাতির উন্নতির চেষ্টাই মানবের এক মাত্র কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য-পালনই মানবের লক্ষ্য—কর্ত্তব্যের মূলে ঈশ্বর। তাঁহার নিজের ভাষা এই,—"This principle is Duty. We must convince men that they are all sons of one sole God, and bound to fulfil and execute one sole law here on earth: that each of them is *bound to live, not for himself, but for others* ; that the aim of existence is, not to be more or less happy, but to make themselves and others more virtuous ; that to struggle against injustice and error (wherever they exist), in the name and for the benifit of their brothers, is not only a *right* but a Duty ; a duty which may not be neglected without sin, the duty of their whole life." 'একমাত্র কর্ত্তব্য পালনের জন্য মানবের সৃষ্টি। মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, এবং প্রত্যেকে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের জন্য দায়ী। জীবন আপনার জন্য নহে, পরের জন্য। আপনার সুখ-লাভের জন্য জীবন-ধারণ নহে,—কিন্তু অন্যকে সুখী করা ও আপনাকে ও অন্যকে নীতিপরায়ণ করার জন্যই জীবন। এ কর্ত্তব্য সকলকেই পালন করা উচিত। যিনি পালন না করেন, তিনি মহাপাপে পাপী।' কি উদার কথা, কি উচ্চ নীতি! এমন উদার কথা উচ্চ প্রেমিক ভিন্ন কে বলিতে পারে? কেইবা বুঝিতে পারে? মানুষ কেবল পরের জন্যই জীবন ধারণ করিবে, একথার জীবন্ত দৃষ্টান্তই বা কয়জনে দেখাইতে পারে? প্রেমিক ভক্ত বলিতেছেন ;—

"Preach duty to the Classes above you, and fulfil, as far as in you lies your own. Preach virtue, sacrifice, and love ; and be yourselves virtuous, loving, and ready for self-sacrifice."

"স্থানান্তরে—And so long as you are ready to die for Humanity, the life of your country will be immortal."

কত কথাই বা তুলিব, আর কত কথাইবা বলিব। যাঁহার লেখার প্রতি পংক্তিতে প্রেমের অস্ফুট ছায়া, কথার প্রতি অক্ষরে প্রেমের অপূর্ব্ব জ্যোতি, তাঁহার কথা অপ্রেমিক আমরা, আর কি বলিব? যিনি তাঁহার লেখা কখনও পাঠ করেন নাই, তিনি আমাদের কথায় তাঁহার প্রেমের কিছুই আভাস পাই-

বেন না, এই চিন্তায় প্রাণে আঘাত লাগিতেছে। কথা ফুরাইয়া যায়, অথচ ভাব প্রকাশ হয় না, এ দুঃখ কোথায় রাখিব?

ম্যাটসিনি প্রেমিক ছিলেন, ইহাই অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য। উচ্চ অঙ্গের প্রেমিকই উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানী। ম্যাটসিনির জ্ঞান এবং অন্যান্য গুণ আজ কাল সভ্যজগতের চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে। এমন কি, ম্যাটসিনির ন্যায় উচ্চ রাজনীতিজ্ঞ উনবিংশ শতাব্দীতে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এ কথা অনেক মহা মহা পণ্ডিতগণ বলিতেছেন। ম্যাটসিনি যে মহা পণ্ডিত ছিলেন, সে কথাও অনেকে বলিতেছে। অনেকে বলিতেছে, ভবিষ্যতে অনেকে আরো বলিবে। প্রেম ও ধর্ম্ম ভাবের কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, আমাদের দ্বারা তাহার কিছুই হইল না। প্রেমহীন-জীবন প্রেমিক-জীবনের গুণ কীর্ত্তনে কেমনে সক্ষম হইবে? বিনীত ভাবে প্রার্থনা, ম্যাটসিনির গভীর প্রেমতত্ত্ব এই মলিন ভাষায় পড়িয়া তাঁহার প্রতি কেহ বিরক্ত হইবেন না। তিনি ভগবৎপ্রেম ভক্তিতে মানব সমাজের আদর্শ ও পূজ্য।

এক দিন, শক্তির বিষয় ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, মানুষ ক্ষুদ্র, কি মানুষ মহৎ! মানুষ ক্ষুদ্র তখনই—যখন মানুষ আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। মহৎ তখনই, যখন প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষের প্রাণ অন্যকে আলিঙ্গন করে—অন্যের অশ্রু মুছাইয়া দেয়—পর-দুঃখ-অপসরণে জীবনকে বলি দেয়। প্রেম-হীনতায় মানব ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। এক প্রেমে মানুষ অতি উচ্চ, অতি মহৎ। প্রেমের বন্যা যে জীবনে প্রবাহিত, সে জীবন কি না করিতে পারে?

লোকে বলে, অর্থ নাই, বল নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, পৃথিবীর কি কার্য্য করিব? আমরা বলি, কার্য্য করি না, কারণ আমাদের ইচ্ছা নাই, প্রেম নাই। প্রেমেই ইচ্ছা, ইচ্ছাতেই কার্য্য। ইচ্ছা করিয়া দেখ, পাহাড় পর্ব্বত সমান বাধাবিঘ্ন চলিয়া যাইবে। অর্থহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন একা ম্যাটসিনি ইতালিতে সে দিন কি করিয়া গেল, একবার চিন্তা কর। সূত্রধরের সন্তান একাকী পৃথিবীতে কি করিয়া গিয়াছে, চিন্তা কর। টাকাতে পৃথিবীর কার্য্য হয়, যে মনে করে, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর নাই। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন—"আমি সকল করিতে পারি, এই জন্য যে, আমার কিছুই নাই।" প্রেমেই টাকা, ইচ্ছাতেই কার্য্য। ধর্ম্মের কথা নহে, এ সংসারের সোজা কথা। টাকা অগ্রে সঞ্চয় করিয়া কেহ পৃথিবীর কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারিয়াছে, শুনিয়াছ কেহ? টাকা সঞ্চয় কর—আরো বাসনার আগুন বাড়িবে। কে খাওয়াইবে, কে দিবে, কে পরাইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া যে অস্থির হয়, সে পৃথিবীর কি কার্য্য করিবে? প্রেমে ভাবনা আসে না;—কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে, এই মাত্র জানি, না করিলে প্রাণ অস্থির হয়, এই মাত্র বুঝি, আর কিছুই জানি না; এই প্রকার দৃঢ়তার সহিত যে কার্য্য করিতে যায়, সেই সিদ্ধ হয়। যিনি মঙ্গলময়ী, তিনিই অভাব পূর্ণ করিবেন; আমরা কেবল কার্য্য করিব—খাটিব—মরিব। যার মা আনন্দ, তার ঘরে চিন্তা, বিষাদ—নিরানন্দ থাকিবে না। সে মহানন্দ—সচ্চিদানন্দ। প্রেমে অনুপ্রাণিত হও—আর সকল ভাবনা চলিয়া যাইবে। প্রেমে পূর্ণ হও, সকল জ্ঞানলাভ হইবে। প্রেমে পূর্ণ হও, সকল অভাব

দূর হইবে। বিশ্ব-জননী উপরে, নিম্নে মানব সন্তান। তাঁহার প্রেমে রঞ্জিত হইয়া ভ্রাতা ভগিনীর জন্য প্রাণকে ভাসাও, দুঃখীর অশ্রু মুছাইতে ধাও। আপনাকে ভুলিয়া অন্যের জন্য জীবনকে উৎসর্গ কর। করিয়া দেখ—অসাধ্য সাধিত হয় কি না? অপ্রেমিক, তুমি করিবে ভাবিতেছ?—মূর্খ মানব, দূর হও। বিশ্ব-প্রেম অবতীর্ণ না হইলে কিছুই পারিবে না। প্রেমের সাধনা কর। পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া জল বাহির কর, তবে ত অসাধ্য সাধিত হইবে। শিক্ষা বিস্তারের কথা বল, একতা বল, জ্ঞান বল, সকলের মূলে প্রেম; প্রেমই শক্তি, প্রেমই মুক্তি। প্রেমেই বল, প্রেমেই জ্ঞান। প্রেমহীন মানুষ পশু, প্রেমেই মানুষ দেবতা। সিন্ধুতে বিন্দু হইয়া ডুবিয়া প্রেমে রঞ্জিত হও,—বিশ্বের অন্তরালে যে চিদ্‌ঘন আনন্দ—সদানন্দ-স্রোতে প্রবাহিত, তাহাতে নিমগ্ন হও। নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশ উদ্ধারের জন্য আর কোন শক্তির প্রয়োজন নাই—কেবল প্রেম চাই। 'সবে ধন নীলমণিকে' পাইলেই হয়। আর কিছুই চাই না—কেবল প্রেম। প্রেম আসিলে জ্ঞান অবতীর্ণ হইবে—বুদ্ধি অবতীর্ণ হইবে, কল্যাণ অবতীর্ণ হইবে, মঙ্গল অবতীর্ণ হইবে, অর্থ ঐ বিশাল আকাশ হইতে নামিবে। মানবের যদি কোন কিছুর অভাব থাকে, তবে সে অভাব কেবল প্রেমের—বিশ্ব-প্রেমের—উদার প্রেমের। সেই প্রেম, যে প্রেমে ভেদাভেদ, জাতিভেদ ও সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাশ করে। সেই প্রেম, যাহাতে ধনী দরিদ্রের গণনা থাকে না। সেই প্রেম, যাহা পাইলে মানুষ চুপ করিয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। সেই প্রেম, যাহা পাইলে মানুষ অন্যের অশ্রু মুছাইতে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হয়। যোগী ঋষিদের যে প্রেম ছিল না, তাহা চৈতন্যের ছিল; তাহা খ্রীষ্টের ছিল, তাহা ম্যাটসিনির ছিল। যে প্রেমে কর্ত্তব্যবোধ জন্মায় না, সে প্রেম প্রেম নহে। যে প্রেমে কার্য্য নাই, তাহা প্রেমের অপভ্রংশ মাত্র,—সে প্রেমে জীবন নাই, তাহা শুষ্ক, তাহা মৃত প্রেম। প্রেমচাঁদ নিতাই গৌরের প্রেম দেখ, আর প্রেম দেখ প্রেমিক ম্যাটসিনির। "মানুষ আয় তোকে বুকে পূরি—আয় তোর চক্ষের জল মুছাই, আয় দুজনে মিলিয়া ভগবৎ-প্রেমের গান গাই।' এই ভাবে পূর্ণ হইয়া একবার হরির গান গাইল সোণার কণ্ঠে—গৌর আর নিতাই, আর সেদিন গাইল—ম্যাটসিনি। ঈশ্বর প্রেম সিন্ধু; সেই সিন্ধুতে—খ্রীষ্ট, গৌরাঙ্গ, নিতাই, ম্যাটসিনি, বিন্দু। প্রেম-সিন্ধুর কৃপায় মানুষ বিন্দু হইয়া পৃথিবীতে কি কাণ্ড বাধাইয়া গেল, মানুষ একবার ভাব, একবার চিন্তা কর।

বঙ্গের ভূমিসংক্রান্ত স্বত্বের ইতিবৃত্ত।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

মুসলমানদিগের শাসন সময়ে জমীদারগণ যে কেবল কর-সংগ্রহ-কারক মাত্র ছিলেন, তাঁহাদের জেম্মা ভূমিতে যে তাঁহাদের কোন প্রকার দান বিক্রয়ের স্বত্ব ছিল না, একথা যে আমরা আজ নূতন বলিতেছি, এরূপ নহে; পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে আমরা কয়েক জন বিখ্যাত লোকের মত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জমীদারদিগের পূর্ব্বে ভূমিতে কি স্বত্ব স্বামিত্ব ছিল, সে বিষয়ে যতই সন্দেহ থাকুক না কেন, তারপর দেশীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং কাল সহকারে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে বিষয় যতই অনির্দ্দিষ্ট হউক না কেন; আমরা বিশেষ রূপ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলাম যে, মোগলদিগের শাসন-কালে জমীদারদিগের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল, তৎসম্বন্ধে আর কোন প্রকারের সন্দেহ বা অনির্দ্দিষ্টভাব থাকিতে পারে না। দেশীয় প্রথানুসারে তাঁহারা এক প্রকার ভোগ দখলি স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেন; কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে যে তাঁহাদের হাত হইতে জমীদারী ছাড়াইয়া নিতে পারিবেন না, কোন আইন দ্বারা বা চুক্তি দ্বারা এরূপ ভাবে গবর্ণমেণ্ট কোন স্থলেই বাধ্য হন নাই। জমীদারেরা কি পরিমাণ কর দিবেন, তাহাও রাজার ইচ্ছা এবং মতানুসারে নির্দ্ধারিত হইত, এবং এই বিষয়ে মোগলেরা প্রায়ই মত চালাইতেছেন।" কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ডিস্প্যাচ্, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

"১৭৭২ সনে হৌস অব কমন্সে যে সমুদয় সাক্ষ্য গৃহীত হয়, তাহা হইতেই জানা যায় যে, জমীদারগণ কেবল রাজস্ব সংগ্রহকারক গোমস্তা ছিলেন, ভূমিতে তাঁহাদের মালিকী স্বত্ব ছিল না।" এ মেময়ার অন্ দি ল্যাণ্ড টেনিউর এণ্ড প্রিন্সিপেলস্ অব টেক্সেসন্ নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকা।

"রায়তেরা প্রত্যেকে এবং গ্রামের সর্ব্ব সাধারণেই উত্তরাধিকার-সূত্রে দখল করিত। যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে দেয় কর প্রদান করিত, ততদিন তাহাদিগকে কেহই বেদখল করিতে পারিত না। কেবল যে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহারা এই স্বত্ব ভোগ করিত, এরূপ নহে, হস্তান্তর করার অধিকারও তাহাদের ছিল, তাহারা ইচ্ছামত বিক্রয় বা দান করিতেও পারিত।" মিল সাহেব-কৃত ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৩য় খণ্ড ২৭৩ পৃঃ।

কমন্সগণ ১৮৩২ সনে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে যে পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে টমাস ফোর্টস্ক সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি কিরূপে জানিলেন যে, প্রজার স্বত্ব নির্দ্দিষ্টই আছে?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আমি, এসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় মুসলমান সময়ের বিধান সমুদয় আলোচনা করিয়াছি, মুসলমানদিগের আইনে প্রজাকে "রুবুল উরুজ" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, উক্ত শব্দের অর্থ ভূমির স্বামী বা অধিকারী। প্রজার ভূমির স্বত্ব, বিবৃত করিবার সময়ে প্রজাকে (মালিক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, ইমাম অর্থাৎ শাসনকর্ত্তৃগণ প্রজার (প্রজা ব্যতীত অপর তৃতীয় পক্ষের কোন স্থলেই উল্লেখ নাই) সহিত খিরাজ বা রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিবার কালে বলিয়াছেন যে "ইত্যাদি ২৩০৬ প্রশ্নের উত্তর।" এইরূপ অনেক লোকের মুখেই শুনিতে পাই, জমীদার, মুসলমান শাসন সময়ে, করসংগ্রহক কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। বাদসাহদিগের ফারমানে দেখিতে পাই, প্রজারা নিজের দখলী জমী দান বিক্রয় করিত, এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে ভূমি ভোগ করিত, প্রজার সহিত সরকারী কর্ম্মচারীগণ খিরাজের বন্দোবস্ত করিতেন, সেই নির্দ্দিষ্ট খিরাজ আদায়ের ভার জমীদারের প্রতি

থাকিত। জমীদার উত্তরাধিকার সূত্রে এই ভার প্রাপ্ত হইতেন বটে, কিন্তু রাজকীয় কোন বিধানে বা আদেশে তাহাদের এই অধিকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ নাই, এবং জমীদারগণ ইচ্ছা করিলে যে, নিজের এই অধিকার বিক্রয় করিতে পারিতেন, তাহারও কোন প্রমাণ পাই না। তখন কিরূপে সত্যের অপলাপ করিয়া বলি যে, জমীদার চিরকালই ভূমিতে নির্ভূয় স্বত্বাধিকারী।"

হিন্দু এবং মুসলমান সময়ে রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর বন্দোবস্ত।

আর্য্য-শাসন সময়ে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র যে প্রণালীতে রাজভাগ সংগৃহীত হইত, মুসলমান রাজগণ তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই; কেবল দুই একটী কর্ম্মচারী বৃদ্ধি করিয়া ও দুই একটী কর্ম্মচারীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে তত সুবিধা হইবে না; সুতরাং হিন্দুদিগের প্রণালী অবলম্বন করাই উচিত। প্রকৃত পক্ষে এ সম্বন্ধে আর্য্য-বিধান-কর্ত্তা যে প্রণালী, সেই অতি পুরাকালে, নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশেও সে প্রণালীকে সমধিক কার্য্যকরী বলিয়া অনেক বহুদর্শী পণ্ডিতেরাও মনে করিতেছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশে আসিয়া সেই পুরাতন প্রণালীর বিনাশ সাধন করিয়াছেন বলিয়া, সার ডবলিউ ওয়েডারবারণ কত আক্ষেপ করিয়াছেন। কর্ণেল গ্যালোয়ে, ব্রিগ, কোলব্রুক, মিল, ম্যাল্কলম্ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ—যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয় কতক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সে পৌরাণিক প্রথার কত প্রশংসা করিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দেশের অবস্থা বিশেষ রূপে জানিতেন না, অর্দ্ধসভ্য হিন্দুদিগের নিকটও যে সুসভ্য ইংরেজের অনেক শিক্ষা করিবার আছে, একথা তাঁহার মনে উদয় হইল না, তিনি সেই অতীত-স্মৃতি পৌরাণিক প্রথাকে এক লেখনীর আঘাতে বিনষ্ট করিলেন, এবং দেশের শত শত পৌরাণিক স্বত্ব বিনাশ করিয়া নূতন স্বত্বের সৃজন এবং নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। সে যাহা হউক, আমাদের মুসলমান শাসন-কর্ত্তাগণ বিজেতা ইংরেজদিগের অপেক্ষা দেশের অবস্থা অনেক ভালরূপ জানিতেন, তাঁহারা হিন্দুদিগের প্রণালীতে সমধিক সুবিধা দেখিলেন, এই নিমিত্তই সে প্রণালীর অতি অল্পমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, সেই প্রণালীই প্রচলিত রাখিলেন। হিন্দু শাসন-প্রণালীর কোন কোন অংশ মুসলমানেরা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সে বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। হিন্দুদিগের শাসন কালে কি প্রণালীতে কর সংগৃহীত হইত, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক। করের পরিমাণ, হিন্দু রাজগণ ভূমিজাত শস্যের, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতেন। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

পঞ্চাশৎ ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু-
হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা
১৩০ শ্লোক।

টীকাকার হারিতের মতানুসারে, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উল্লিখিত

শ্লোকের নিম্নলিখিত রূপে অনুবাদ করিয়াছেন।

"পশু এবং সুবর্ণের মূল্য অব্যাহত রাখিয়া যে লাভ হইবে, রাজা তাহা হইতে পঞ্চাশৎ ভাগ গ্রহণ করিবেন। ঐ রূপ ধান্যের ষষ্ঠ অষ্টম অথবা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন। ভূমির উৎকর্ষ, অপকর্ষ এবং কৃষ্যাদি ক্লেশের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ, এই ত্রিবিধ ভাগ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" কল্পদ্রুম ৪র্থ ভাগ-সপ্তম সংখ্যা।

লভ্যাংশের অংশই যে কেবল রাজভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, উল্লিখিত শ্লোকে আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই না; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের অর্থের সহিত যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, তবে লভ্যাংশের অংশই যে রাজভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটী এই ঃ—

"যথাল্পাল্প মদ্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎস ষট্‌পদাঃ
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাৎরাজ্ঞাব্দিকঃ-করঃ॥" ১২৯ শ্লোক।

"যেমন জলৌকা, বৎস ও ভ্রমর অল্পে অল্পে রক্ত দুগ্ধ ও মধুপান করে, সেরূপ রাজা, মূলধনের উচ্ছেদ না করিয়া, রাজ্য হইতে অল্পে অল্পে বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন।" ঐ ঐ ঐ

এইরূপ মূলধন বাদে যে লাভ থাকিত, বাণিজ্য দ্রব্য এবং কৃষিজাত পদার্থের রাজভাগ, কেবল সেই লাভ হইতেই নির্দ্দিষ্ট অংশানুযায়ী সংগ্রহ করিতে হইত। এবং তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্তই রাজা নিম্নলিখিত রূপ কর্ম্মচারীগণকে নিযুক্ত করিতেন।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্র পতিমেবচ॥
মনু ১১৫ শ্লোক।

প্রথমে গ্রামে গ্রামে এক এক অধিপতি নিযুক্ত করিবে। পরে দশ গ্রামের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ একজন; (এইরূপ দুইজন কর্ম্মচারীর উপর) বিশ গ্রামের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ একজন, (এইরূপ বিশ গ্রামী পাঁচ জন কর্ম্মচারীর উপর) শত গ্রামের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ এক জন, এবং (এই রূপ শতগ্রামী ১০ জন কর্ম্মচারীর উপরে) সহস্র গ্রামের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবে। (বন্ধনির মধ্যস্থিত কথা গুলি আমাদের লিখিত।)

এই সমুদয় কর্ম্মচারীগণ রাজভাগ হইতে নিজদিগের বেতন গ্রহণ করিতেন। ইহাদিগের বেতন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিক স্তান্য বাপ্নুয়াৎ॥
দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানিচ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিপুরং॥

গ্রামাধিপতি গ্রাম্যলোক কর্ত্তৃক প্রত্যহ দেয় অন্নপান এবং ইন্ধনাদির রাজভাগমাত্র নিজে প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ মদ্য, মাংস, পিষ্টক, কাট ইত্যাদির যে কর, প্রত্যহ গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইবে, গ্রামাধিপতি নিজ বেতন স্বরূপ তাহাই গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত, স্বর্ণ ও পশু প্রভৃতির কর, এবং ভূমিজাত শস্যাদির বার্ষিক দেয় রাজভাগ তিনি গ্রহণ করিবেন না। দশগ্রামের অধিপতি এক কুল ভূমি, (বারটি গরু দ্বারা দুই খানি হাল চসিয়া যত ভূমি আবাদ করা যায়) বিশগ্রামের অধিপতি ঐ প্রকারের পঞ্চ কুল ভূমি, শত গ্রামের অধিপতি এক খানি গ্রাম, এবং সহস্র গ্রামাধিপতি একখানি পুর (হাট বাজারের সহিত কোন নগর) ভোগ

করিবেন। এই সমুদায় স্থানের রাজার লভ্যাংশ তাঁহারা পাইতেন, এইরূপই বুঝিতে হইবে। নচেৎ মোট উৎপন্ন কিম্বা মোট আয় অর্থ করিলে, শত গ্রামাধিপতি, এক শত গ্রামের যে রাজভাগ আদায় হইত, তাহাপেক্ষাও বেশী বেতন পাইতেন। কারণ রাজভাগ, মূলধন বাদে উৎপন্নের লাভাংশের ১/৫½ অংশ মাত্র, সুতরাং তাহা মোট উৎপন্নের প্রায় শতাংশের একাংশ এবং মোট গ্রাম্য লাভের প্রায় ৩২ বত্রিশ ভাগের এক ভাগ। এইরূপ বেতন দিলে, সহস্র গ্রামের অধিপতিকে বেতন দিয়া আর রাজ কোষে পাঠাইবার কিছুই থাকে না। সে যাহা হউক, এই সমুদয় কর্ম্মচারীর উপরে আবার একজন কার্য্য কুশল সুদক্ষ সচিব নিযুক্ত হইতেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামের কার্য্য এবং প্রত্যেক কার্য্য-কারকের কার্য্য বিশেষ রূপে পরিদর্শন করিতেন। মনু সংহিতার ১২০ শ্লোকে এই কর্ম্মচারীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যথাঃ—

তেষাং গ্রাম্যানি কার্য্যানি পৃথক্ কার্য্যা-
চৈবহি।
রাজ্ঞোন্যেঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানিপশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥

হিন্দুদিগের শাসনকালে উল্লিখিত কর্ম্মচারীগণের হাতে কর নির্দ্ধারণ করা এবং কর আদায় করা, এ উভয় প্রকারের ভারই থাকিত। ইহাঁরাই আবার শান্তি রক্ষা করিতেন। ইঁহারা ধর্ম্মাধিকরণের বিচারকগণ হইতে পৃথক ছিলেন, কিন্তু পোলিস এবং রেবিনিউ সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য ইঁহাদের হাতেই থাকিত। প্রত্যেক পঞ্চগ্রামির অধীনে অল্প সংখ্যক লোক থাকিত, শত গ্রামির অধীনে আরো অনেক বেশী সৈন্য থাকিত, সহস্র গ্রামির অধীনে প্রায় এক রেজিমেণ্ট সৈন্য থাকিত, মনুসংহিতায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান শাসন সময়ের মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণও ধর্ম্মাধিকরণ এবং তাহার বিচারকগণকে কেবল আইনের অধীনে রাখিলেন; কিন্তু শান্তি রক্ষা এবং কর বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিলেন; আবার সে বিভাগেও, কর নির্দ্ধারক এবং করসংগ্রাহক এই দুইটী নূতন বিভাগ করিয়া কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিলেন। কিন্তু এই শেষোক্ত উভয় বিভাগেরই ভার দেওয়ানের হস্তে প্রদত্ত হইল। এবং তাঁহার অধীনে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইল।

১ম কর নির্দ্ধারক	২য় কর সংগ্রাহক
আমিল (কালেক্টর)	আমিল
কাননগু	জমীদার
পরগণা কাননগু	পাটোয়ার
পাটোয়ার	দেশ লেখক
দেশ লেখক	

১ম বিভাগে হিন্দু সময়ের এক গ্রামী মুসলমান সময়ে দেশ লেখক, পঞ্চ গ্রামী পাটোয়ার, দশ গ্রামী এবং বিংশতি গ্রামী পরগণা কাননগু, শত গ্রামী কাননগু এবং সহস্র গ্রামী আমিল নাম ধারণ করিলেন। ২য় বিভাগে, এক গ্রামী দেশ লেখক, ৫ গ্রামী পাটোয়ার, শত গ্রামী জমীদার এবং সহস্র গ্রামী আমিল আখ্যা ধারণ করিলেন। কিন্তু জমীদারদিগের পক্ষে আমিলের নিকট কর প্রদান করা তখন বড় সহজ কথা ছিল না, সমুদয় বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল মাত্র বর্দ্ধমান-বীরভূম, মুরসিদাবাদ এবং ঢাকা এই চার স্থানে চার জন আমিল ছিলেন; সুতরাং জমীদার এবং আমিলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাননগু গণও কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এই

ক্ষমতা তাহাদিগের হাতে প্রদত্ত হইল। বাকী করের নিমিত্ত দেওয়ান, আমিল, কাননগু এবং জমীদারকে যথেষ্ট শাসন করিতেন। মুসলমান লেখকগণের গ্রন্থ হইতে গ্লাডুইন সাহেব যে সমুদয় অনুবাদ করিয়াছিলেন,তাহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেওয়ান উক্ত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বাকী করের নিমিত্ত কত অত্যাচার করিত। (See Gladwin's narratives of Bengal. p. 59.)

এই সময়ে জমীদারগণ কেবল কর সংগ্রহ করিতেন, কর নির্দ্ধারণের ক্ষমতা পরগণা কাননগুয়ের হস্তে ছিল। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পাটোয়ার এবং প্রজার পক্ষ হইতে দেশ-লেখক একত্র হইয়া জমাবন্দী ঠিক করিতেন, এবং উক্ত বন্দোবস্তী কাগজের এক প্রস্ত নকল, প্রজাদিগের নিমিত্ত, দেশ লেখকের হাতে থাকিত; আর এক প্রস্ত পরগণা কাননগুয়ের আফিসে এবং অপর প্রস্ত জমীদারের সেরেস্তায় পাঠান হইত। জমীদার এই কাগজ অনুসারে তহশীল করিয়া, নির্দ্দিষ্ট নিজের নানকর বাদে, অপর টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিতেন।

এখন পাঠক মহাশয় বিচার করিয়া দেখুন, এ অবস্থায় ভূমির প্রকৃত মালিক আমরা জমীদারকে কিরূপে বলি?

আলিবর্দ্দি খাঁ যখন নিজের ধূর্ত্ততা বলে দেওয়ান নাজিমের পদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি নানা প্রকার শত্রু দলে পরিবেষ্টিত, তিনি আর প্রতি বৎসর জমাবন্দি করা তত সুবিধার বিষয় মনে করিলেন না। সেই সময়ে আবার জমীদারগণও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন, তখন অল্প দিন মাত্র জমীদারেরা এক জমাবন্দিতে কর আদায় করিতেন। কিন্তু সে সময়ও তাঁহাদের হাতে, প্রজার সহিত জমাবন্দি করিবার ক্ষমতা, প্রদান করা হয় নাই। এবং বাদসাহের আইন পায়ে-ঠেলিয়া, সেরূপ বন্দোবস্ত করার ক্ষমতাও আলিবর্দ্দি খাঁর ছিল না।

কোম্পানির দেওয়ানি।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ইংরেজের চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর হইতেই বণিক ইংরেজ, সেরকষা, মনকসার হিসাব ছাড়িয়া রাজস্বের তালিকা লইয়া ব্যস্ত হইলেন, এই বৎসর হইতেই রাজশ্রী পতিত মুসলমান-ভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ইংরেজ-ললাটকে আশ্রয় করিল। এই বৎসর ইংরেজ, বাদসাহ সাহা আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ,বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন, সুতরাং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে ক্ষমতাবলে এ দেশের রাজস্ববিভাগের বন্দোবস্ত করিলেন, সে ক্ষমতা দেওয়ানের ক্ষমতা মাত্র। এখন দেখা যাউক, যে এই দেওয়ানি ক্ষমতা প্রকৃত প্রস্তাবে কি?

মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ অনেক বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কাহারও কিছু করিবার অধিকার ছিল না। বাদাসহগণ রাজস্ব সম্বন্ধে যখন যে আদেশ করিয়াছেন, তাহার কোন আদেশই মুসলমানদিগের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দী নহে। মুসলমান রাজগণের ক্ষমতা চিরদিনই মুসলমান ব্যবস্থার অধীন ছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং মুসলমান বাদসাহের দেওয়ানের ক্ষমতাও যে উক্ত ব্যবস্থার অধীন ছিল, সে কথার উল্লেখ করাও অনাবশ্যক। বাদসাহের যে ক্ষমতা ছিলনা, তাঁহার দেওয়ানের তাহাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সুতরাং বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ান কোম্পানি বাহাদুর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের যে, রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে মুসলমান ব্যবস্থার অধীন ছিলেন, পাঠকগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। তবে কোম্পানির দেওয়ানি এবং ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানদিগের দেওয়ানির মধ্যে একটী বিশেষ প্রভেদ আছে, সে প্রভেদটী এই,—ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানদিগের পদ চিরস্থায়ী ছিল না, কোম্পানি বাদসাহ প্রদত্ত ফারমানে এইপদ চিরস্থায়ীরূপে ভোগ করিবার অধিকার পাইলেন। দ্বিতীয়তঃ—ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানগণ রাজকোষে প্রতিবৎসর কত টাকা পাইবেন,তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না; কোম্পানি বাহাদুর দেওয়ান হইয়া এই মর্ম্মে কবুলিয়ত দিলেন যে, প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ টাকা বাদসাহের রাজকোষে প্রদত্ত হইবে, রাজস্ব রীতিমত আদায় হউক বা নাই হউক, রাজস্ব বিভাগের ব্যয় অধিকই হউক আর অল্পই হউক, কোম্পানি বাদসাহকে সুবা বঙ্গ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর দিবেনই দিবেন। এই সত্বে উভয় পক্ষ আবদ্ধ হইলেন, চুক্তির এক পক্ষে সম্রাট সাহআলম এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ চিরদিনের জন্য কোম্পানিকে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান পদে নিযুক্ত রাখিতে স্বীকৃত হইলেন, অপর পক্ষে বাদসাহের রাজস্ব বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক দেওয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, সমুদয় ব্যয় বাদে বাদসাহকে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই প্রভেদ ব্যতীত, দেওয়ান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ানদিগের ক্ষমতার মধ্যে আর কোন প্রভেদই থাকিতে পারে না। সুতরাং দেওয়ান কোম্পানিও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ানদিগের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ব্যবস্থার অধীন ছিলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

উপন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আজ কাল সাহিত্য-সংসারে নভেল বা উপন্যাস অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে। অতি অল্পদিন হইল নভেলের সৃষ্টি হইয়াছে; পূর্ব্বে সামান্য উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বালকেরা বৃদ্ধ পিতামহীর আশ্চর্য্য অলৌকিক গল্প যেরূপ আগ্রহের সহিত শুনিতে ভালবাসিত, সেইরূপ পূর্ব্বে লোকে সামান্য উপন্যাসের যথেষ্ট আদর করিত। এই সকল শিল্প-চাতুর্য্য বা রচনা-পারিপাট্য-বিহীন উপন্যাসে, অদ্ভুত ঘটনা, অদ্ভুত লোক, এমন কি দেব-দৈত্য পর্য্যন্ত বর্ণিত হইত। কেবল গল্পমাত্র অদ্ভুত ও অলৌকিক হইলেই চিত্ত আকর্ষণ করিত,—উপন্যাসের বিশেষ প্রশংসা হইত। কখন বা কেবল যুবক যুবতীর সামান্য প্রণয়কাহিনী মাত্রই পাঠকবর্গকে পরিতৃপ্ত করিত। এইরূপ গল্প এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, আজি পর্য্যন্ত এরূপ উপন্যাসের বিলক্ষণ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এখন সেদিন গিয়াছে। ফিল্‌ডিং নূতন

ধরণে প্রথম নভেল লিখিলেও বিলাতে সার ওয়ালটর স্কট হইতেই প্রকৃতপক্ষে নভেল যুগ আরম্ভ হয়। তাহার পর লেখকের উপর লেখক নভেল রচনা করিয়া বিলাতি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। যদি ইংরাজি সাহিত্যকে যুগ বিভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীকে নিশ্চয়ই নভেল-যুগ বলিতে হইবে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া এতদূর উন্নত হইয়াছে যে, তাহা মনে হইলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এত উন্নতির প্রধান কারণ—ইংরাজি সাহিত্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি সাহিত্যের নভেলযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজি সাহিত্যের সংঘর্ষে, ইংরাজি ভাবের অনুকরণে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে নভেলযুগ আরম্ভ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বাঙ্গালা ভাষায় বাবু ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "নব বাবু বিলাস" ও "নব বিবি বিলাস" এই দুই খানিই প্রথম নভেল। তাহার কিছুদিন পরে টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সময় হইতে প্রকৃত নভেলযুগ আরম্ভ হয় নাই। তাহার পর বঙ্কিম বাবু 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন। সেই দিন হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে একপ্রকার হুলস্থূল পড়িয়া গেল—সেই দিন হইতেই নভেলের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িল,—সেই দিন হইতেই বাঙ্গলায় নভেল-যুগ আরম্ভ হইল।

আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় নভেল লেখার মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর রাশি রাশি নভেল বাহির হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের মধ্যে প্রায় সমস্তগুলিই অপাঠ্য। সাধারণতঃ অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকেই নভেল লিখিয়া থাকেন। পুরাকালে মিসরদেশে ঈশ্বরাদেশে মুষা যেমন অনন্ত অসংখ্য ভেক সৃষ্টি করিয়া ঘর দ্বার, পথ ঘাট, সমস্তই ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সে মারিভয়ে যেমন সকল মিসরবাসীই যথেষ্ট বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল—আমরাও সেইরূপ অসংখ্য নভেল ও নভেল-লেখকের দ্বারা একান্ত জ্বালাতন হইয়াছি। এ সকল নভেল-লেখকদের বিশ্বাস যে,নভেল লিখিতে বিশেষ বিদ্যা, পরিশ্রম, গবেষণা বা অনুসন্ধান কিছুই আবশ্যক করে না। পরস্পরের সাধারণ কথাবার্ত্তা একত্র গ্রথিত করিয়া তাহার সহিত গ্রন্থকারের নিজের কিছু রসিকতা মিশাইয়া দিলেই নভেল লেখা হইল। নভেল কি—তাহার উদ্দেশ্য কি—তাহার অভিপ্রায় কি—তাঁহারা এসমস্ত কিছুই জানেন না। সুতরাং তাঁহাদের লিখিত অসার উপন্যাসগুলির কোন কিছু উপযোগিতা নাই। আমাদের দেশের নভেল লেখকগণের মধ্যে কেবল দুই চারি জন মাত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা নভেলের প্রকৃত স্রষ্টা বঙ্কিম বাবুই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃত কবিত্বশক্তি বুঝিতে হইলে, নভেলের নভেলত্ব, অথবা তাহার প্রকৃত তত্ত্ব, বুঝা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অলৌকিক ঘটনা-পূর্ণ উপন্যাসই প্রথমে নভেল মধ্যে পরিগণিত হইত। ইহা ব্যতীত সে সময়ে আর অন্য প্রকার নভেল ছিল না। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আলৌকিক ও অপ্রাকৃত ঘটনা অথবা অস্বাভাবিক মানব চরিত্র বর্ণনার পরিবর্ত্তে

স্বাভাবিক ঘটনা ও প্রকৃত মানুষের বিষয় বর্ণনা করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। কিন্তু এসময়েও মানুষের অপ্রাকৃত ও অলৌকিকের উপর আস্থা দূর হয় নাই। সুতরাং এই সকল উপন্যাসগুলিতেও অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার অভাব ছিল না। এই গুলিকে ইংরাজিতে রোমান্স বলা হয়। ফ্রান্সদেশে রোমান্স ভাষায় এইরূপ উপন্যাস প্রথম লিখিত হয় বলিয়াই, ইহাদিগকে রোমান্স বলিত। তাহার পর রোমান্স লিখিবার পরিবর্ত্তে, ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া নভেল লেখা আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডে স্কটই প্রথমে ঐতিহাসিক নভেল লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐতিহাসিক নভেলের আর একটু সুবিধা এই ছিল যে, ইহার দ্বারাও পাঠকবর্গের অলৌকিকও অপ্রাকৃতের স্পৃহা কতকটা নিবারিত হইত; কারণ, এই শ্রেণীর নভেলের লিখিত রাজা অথবা বীর পুরুষদিগের চরিত্র অথবা তাহাদের কার্য্যাবলী সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধারণ এবং কতকটা আশ্চর্য্যজনক বোধ হইত। কখন কখন আবার এই সকল নভেলে অলৌকিক ও আশ্চর্য্য ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্ব কালের চলিত রোমান্সে পরিণত করা হইত। সৌভাগ্যক্রমে নভেলের এ অবস্থা ইংলণ্ডে অধিক দিন থাকে নাই। ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক নভেলের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্য নভেল, এবং তৎপরে ক্রমোন্নতির দ্বারা, নভেলকে যতদূর স্বাভাবিক, যতদূর মনুষ্য চরিত্র পরিচায়ক, ও যতদূর মনুষ্য চরিত্রের মূলসূত্র-জ্ঞাপক করা যাইতে পারে, ততদূর উন্নত উৎকৃষ্ট নভেলের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রকৃত নভেল কাহাকে বলে—একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নভেলগুলি সামান্য উপন্যাস মাত্র ছিল। তাহাতে গল্প ব্যতীত আর কিছুই থাকিত না। সামান্য গল্পের পর রোমান্স, তাহার পর ঐতিহাসিক নভেল, তাহার পর ক্রমোন্নতি দ্বারা নভেল বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে। এই অবস্থায় নভেল কত উন্নত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একদিকে দেখিতে গেলে, আধুনিক নভেলকে সমাজের দর্পণ বলা যাইতে পারে। এরূপ নভেলগুলি সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিচিত্র বিশেষ। সমাজে প্রত্যহ যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সাধারণ লোকসমাজে নানারূপ অবস্থায় যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, নভেলে তাহাই দেখান হয় মাত্র। মনুষ্যের সহিত ঘটনা-বিশেষের সম্বন্ধ কিরূপ, কোন্ কোন্ সময়ে (বা ঘটনায়) কোন স্বভাবের মানুষ কিরূপ কার্য্য করে, মানুষের সহিত মানুষের বা সাধারণ ঘটনার সম্বন্ধ কি, এই গূঢ়তত্ত্ব এই রূপ নভেলে দেখান হইয়া থাকে। কেবল মাত্র মানুষের—বাহ্যজগতের সহিত ও তাহার সংশ্লিষ্ট অবস্থা সমূহের সহিত সম্বন্ধ দেখানও এরূপ নভেলের উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে মনুষ্যের মানসিক অবস্থা, তাহার আধ্যাত্মিক ভাবও বুঝাইতে চেষ্টা করা হয়। সুতরাং নভেল কেবল সমাজের দর্পণ নহে, আমাদের মনেরও দর্পণ স্বরূপ বলিতে হইবে। আমাদের মনে কত সময়ে কত নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়—কত নূতন সত্য হৃদয়ের মধ্যে দেখা দেয়, কিন্তু হয়ত সমাজের ও অত্যাচারের ভয়ে, সমাজের কদর্য্য অবস্থা দেখিয়া আবার কোথায় পলাইয়া যায়। কত সময়ে মন মধ্যে এমন কত নূতন ভাব উদয় হয়, যাহা কথায়

ব্যক্ত হয় না। নভেলে সেই সকল ভাব গুলির—সেই সব সত্যগুলির পূর্ণ বিকাশ করিয়া দেয়। এক সুরে বাঁধা দুইটী তারের একটীকে বাজাইলে আর একটী যেমন সহানুভূতিতে বা আনন্দে বাজিয়া উঠে, নভেলে সেই সব ভাবের বিকাশ দেখিলে, আমাদের মনেরও সেই ফোটো ফোটো-অস্ফুট ভাবগুলি—সেই ধরি-ধরি-ধরিতে-পারি-না ভাবগুলি—স্ফূর্ত্তি পাইয়া সানন্দে বাজিয়া উঠে। নাটক-লেখকের মত নভেল-লেখকেরও প্রকৃত কবি হওয়া চাই, নতুবা তাঁহার নভেল লেখাই বৃথা।

এতক্ষণ দেখাইলাম যে, নভেল সমাজের ও আমাদের মনের দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু নভেল এক্ষণে সুধু দর্পণ নহে—নভেল আজ কাল সমাজ-বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুধু সমাজের চিত্র ও হৃদয়ের চিত্র দিলেই নভেল সম্পূর্ণ হয় না,—সুধু সে চিত্রে আলোক অন্ধকার দিয়া ছায়াপাত করিলেই বা বর্ণের গভীরতার ন্যূনাধিক্য করিয়া দিলেই নভেলের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল না, সে সমাজের মূল শাখা, প্রশাখা সমুদয়ই দেখাইতে হইবে। সমস্ত জগৎই কঠোর কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি, কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই ঘটে না; অদৃষ্ট বা chance এক্ষণে কেহ বিশ্বাস করে না। তবে সে কার্য্যকারণ সূত্র সকলে দেখিতে পায় না—সকলে সকল বিষয়ের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, যিনি কবি, যিনি প্রকৃত দ্রষ্টা, (Seer)—তিনি ইহা দেখিতে পান। নভেল-লেখক সেই গূঢ় মর্ম্ম আমাদের বুঝাইয়া দেন। মানুষের যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সহিত অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—মানুষ যেরূপ এক organism, সমাজ যেরূপ এক organism, নভেলও সেইরূপ একটী complete organism।—ইহার প্রত্যেক অংশ অন্যান্য অংশের সহিত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট—প্রত্যেক অংশই কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব-সংসারের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি—নভেলজ্ঞ কবির আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলের (Design and art) প্রকৃত পরিচয়। প্রকৃত নভেলে, সমাজের, মনুষ্য চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে—তাহাতে কার্য্য-কারণ সূত্র আবদ্ধ করিতে—সমাজ ও মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ (analyse) করিতে চেষ্টা করা হয়। এই রূপে সমাজের মূলতত্ত্ব স্থির করাই আধুনিক নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

নভেল এত উচ্চ, এত শিল্পচাতুর্য্যপূর্ণ, এত প্রয়োজনীয় হইলেও, এত অল্প দিন পূর্ব্বে যে ইহার সৃষ্টি ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার কারণ কি? ইহার এত উপযোগীতা থাকিলেও এত দিন কেন ইহার সৃষ্টি হয় নাই? ইহার উত্তর দেওয়া বোধ হয় সহজ নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নভেলে প্রকৃত সমাজতত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করা হয়। সুতরাং যত দিন সমাজ-বিজ্ঞান না হইয়াছিল, যত দিন সমাজকে—মনুষ্য জীবনকে বিজ্ঞানের অন্তবর্ত্তী করা না হইয়াছিল, তত দিন নভেল লেখা সম্ভব ছিল না। পূর্ব্বে মনুষ্যের মনের যে গূঢ় রহস্যের কথা বলিয়াছি, যে গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভেদ করা আজ কাল নভেলের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা করিবা নাটকে ও কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহার জন্য স্বতন্ত্র নভেল সাহিত্যের আবশ্যক হয় নাই। সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান (science of life and society) নভেলের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যত দিন সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) ও

জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) প্রকৃততত্ত্ব না স্থির হইয়াছিল, তত দিন প্রকৃত নভেল লেখা সম্ভব ছিল না। পুরাকালের সামান্য উপন্যাস হইতে ঐতিহাসিক নভেল পর্য্যন্ত, নভেলগুলিকে সামান্য উপন্যাসেরই মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক নভেলের পর যে আধুনিক নভেল লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত নভেল। গেটে, ভিক্টর হুগো, বা জর্জ ইলিয়ট নভেল লিখিয়া কবিদিগের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, এবং সমাজের প্রকৃত শিক্ষক রূপে আজ কাল সকলের নিকটই আদৃত হইতেছেন। এই কারণেই ইউরোপীয় সাহিত্যে এত অল্প দিন হইল নভেল-যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

নভেলের মূলসূত্র কি—কিসের উপর নভেলের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে? যে সকল বিষয়কে প্রকৃত পক্ষে নভেলের প্রাণ বলা যায়, এবং যাহার উৎকর্ষানুসারে নভেলের উৎকর্ষ, এবং যাহাতে নভেলরচয়িতার কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আমরা এস্থলে বর্ণনা করিব। নভেলের প্রথম মূলসূত্র—উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত এবং ঘটনাবলীর দ্বারা কোন বিশেষ সত্য প্রমাণ করাই এই শ্রেণীর নভেলের মুখ্য অভিপ্রায়। অধিকাংশ নভেলই কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই রচিত হইয়া থাকে। সমাজের, বা শাসন-প্রণালীর কোন বিশেষ দুষণীয় প্রথার প্রকৃত দোষ, দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিলে যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়, এমত আর অন্য কিছুতেই সম্ভব নহে। কেবল উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের উপকারিতা অনেক অধিক। নভেল-লেখকগণ অনেক সময়েই এই সত্য অনুসরণ করিয়া, সামাজিক, লৌকিক বা রাজনৈতিক প্রথার দোষ সকল প্রমাণের জন্য এই উপায় অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব অনুসারে, অথবা যে পরিমাণে সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, তদনুসারে নভেলও প্রশংসিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে দাস ব্যবসায় অত্যন্ত দূষণীয় এবং অত্যাচার-মূলক, এই সত্যপ্রমাণের জন্য ষ্টো, Uncle Tom's Cabin নামক নভেল লিখিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।) সেইরূপ, লিটন, ফাঁসি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, ও তাহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া উচিত, এই কথা প্রমাণের জন্য (Paul Clifford) নামক নভেল লিখিয়াছেন। ইহা অপেক্ষাও মহত্ত্বর ও অধিকতর উচ্চদরের নভেল, গেটে-লিখিত (Wilhelm Meister); এতে সমাজের মূলতত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্যমূলক নভেলগুলির আনুষঙ্গিক গুণ থাকিলে, নভেলের মধ্যে তাহারা উচ্চস্থান পাইয়া থাকে। সচারাচর নভেলের মধ্যে যে সকল নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কখন কখন দৃষ্টান্তের দ্বারা যে সকল নীতি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত নীতিগুলি প্রমাণ করা নভেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, এবং এ শ্রেণীর নভেলকে উদ্দেশ্য-মূলক বলা যায় না। এ গুলির আনুষঙ্গিক স্ফূর্ত্তি হয় মাত্র। উদ্দেশ্য-মূলক নভেলে, প্রায়ই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন এক প্রধান নীতি বা সত্য, দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উদ্দেশ্য-প্রধান নভেলের আর তাদৃশ আদর নাই। কারণ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলেই, উদ্দেশ্য-প্রধান নভেলের আর তাদৃশ আদর থাকে না। বিশেষত

এই সকল নভেলের আনুষঙ্গিক গুণ না থাকিলে, তাহার গৌরবও অধিক দিন থাকা সম্ভবপর নহে।

চরিত্রচিত্রকেই নভেলের দ্বিতীয় মূল-সূত্র বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক চরিত্র-চিত্রই নভেলের প্রধান অঙ্গ। ইহাকে নভেলের প্রাণ না বলিলেও আমরা ইহাকে নভেলের মজ্জা বলিতে পারি। এই চরিত্রচিত্র প্রধানত চারি প্রকার। প্রথম, সাধারণ চরিত্রচিত্র। আমরা সংসারে সর্ব্বদা যে সকল লোক দেখিতে পাই, তাহাদিগের চরিত্র সুস্পষ্ট অঙ্কিত করাই এই সমস্ত নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য। সচরাচর গার্হস্থ্য নভেলগুলিতে এই প্রকার চরিত্রচিত্র অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

কোন্ প্রকার চরিত্রের লোক, কোন্ বিশেষ ঘটনায়, সংসারে কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা দেখান—অর্থাৎ ঘটনামাত্র উপলক্ষ করিয়া চরিত্রের স্ফূর্ত্তি ও বর্ণনা করা—এই সকল নভেল-লেখকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। চরিত্র বর্ণনা—বা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে চরিত্র বিশেষের কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা—এই শ্রেণীর নভেল-রচয়িতাদিগের যেরূপ উদ্দেশ্য, ঘটনাবিশেষের দ্বারা, সাধারণ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ অনুসারে, চরিত্র বিশেষের বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন, এ শ্রেণীর লেখকগণের তাদৃশ বর্ণনীয় বিষয় নহে। ইহাঁদের মতে ঘটনাবলীর বর্ণনা দ্বারা কোন্ চরিত্রের লোক কিরূপ কার্য্য করে, তাহা সুস্পষ্ট অঙ্কিত করিতে পারিলেই,—চরিত্রচিত্র বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। যদি সেস্থলে ঘটনা বিশেষের দ্বারা কোন চরিত্রের পরিবর্ত্তন বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে প্রকৃতরূপে ঘটনা উপলক্ষ করিয়া চরিত্র বর্ণনা করা হইল না, বরং চরিত্রচিত্রের স্ফূর্ত্তি না হইয়া অসম, অপ্রাকৃত ও শিল্প-নৈপুণ্য-বিহীন বলিয়া দূষিত হইল। পূর্ব্বকার গ্রন্থকারগণ সেই সময়ের প্রচলিত দার্শনিক মতানুসারে, ঘটনা বিশেষের যে চরিত্র পরিবর্ত্তনে ক্ষমতা আছে, তাহা বড় স্বীকার করিতেন না। সুতরাং ঘটনা বিশেষের ঘটিত চরিত্র-পরিবর্ত্তন চিত্রিত করা তখনকার প্রথা ছিল না। তখন মানবমনের স্বাধীন ইচ্ছা, (Free will) প্রাকৃত শক্তি, ও প্রাকৃত ঘটনার উপর মনুষ্যমনের ক্ষমতা বিশ্বাস করা হইত।

নাটকে কার্য্যের দ্বারাই মনুষ্যচরিত্র অঙ্কিত হয়। ঘটনাপ্রধান নভেলে—ঘটনার প্রাধান্য ও মনুষ্যমনের উপর তাহার কতকটা আধিপত্য স্বীকার করা হয়, এবং সেই অনুসারে মনুষ্যের উপর তাহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে দেখাইয়া দেওয়া হয়, এবং এই উপায়ে চরিত্রের স্ফূর্ত্তি করা হয়! নাটকে মনুষ্য চরিত্রের প্রাধান্য—প্রাকৃত ঘটনার উপর মনুষ্য-হৃদয়ের প্রভাব—মনের উপর বাহ্যিক ঘটনার অল্পমাত্র প্রভাব ও সম্বন্ধ দেখান হইয়া থাকে। অর্থাৎ নভেলে, মনের উপর ঘটনার বা বাহ্যিক জগতের উপর মনের আধিপত্য, এবং নাটকে বাহ্যিক জগতের উপর মনের আধিপত্য, বিশেষরূপে বর্ণিত হয়। উৎকৃষ্ট নাটকে যেরূপ সকল ঘটনাতেই চরিত্রের উৎকর্ষ, অর্থাৎ বাহ্য জগতের সহিত চরিত্রের নির্লিপ্ত অবস্থা রক্ষা করা হয়—মানবমনের স্বাধীনতা, মানব-চরিত্রের বাহ্যিক ঘটনা সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা দেখান হয়,—সেইরূপ উৎকৃষ্ট নভেলে মনুষ্যচরিত্রের সহিত বাহ্য ঘটনার সম্বন্ধ, মনুষ্য চরিত্রের উপর বাহ্যজগতের প্রভাব এবং কিরূপ ঘটনা পরম্পরা সাহায্যে

কিরূপ চরিত্রের সৃষ্টি বা পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই দেখান হইয়া থাকে। নাটকে বাহ্য-জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থির করা, অথবা প্রকৃত চরিত্র বর্ণনা করা ব্যতীত আরও এক উদ্দেশ্য আছে। নাটকে মনের গূঢ় ভাব, মনের ঘাত প্রতিঘাত, সুখ দুঃখ, আশা ভয়, বাহ্য জগতের দ্বারা মনের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি, মনের কার্য্য প্রণালী,—তাহার চিন্তা-প্রণালী—তাহার বৃত্তিগুলির গতিপ্রণালী, সমস্তই বুঝাইতে চেষ্টা করা হয়। সত্য-রাজ্যের লৌহতোরণ উৎঘাটিত করিয়া, মনকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়া, তাহার অতুল সৌন্দর্য্য মনকে দেখান হয়। সুতরাং নভেলে ও নাটকে এই প্রভেদ বড়ই গুরুতর। মনুষ্য লইয়া নাটক, এবং বাহ্যজগৎ লইয়া নভেল। তবে কার্য্য-ক্ষেত্রে এই প্রভেদ বিশদরূপে রক্ষিত হয় না। যাহা হউক, নভেলে আমরা যে প্রথম শ্রেণীর চরিত্রচিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে সচরাচর বাহ্যজগতের সহিত মনুষ্য চরিত্রের সম্বন্ধ ভালরূপে দেখান হয় না। তাহাতে মনুষ্য-চরিত্র কিরূপে সৃষ্টি হয়, তাহা বিবৃত করা হয় না। মনুষ্য চরিত্রের মূল-সূত্র কি—মনুষ্য চরিত্র পরিবর্ত্তনের কারণ কি—কোন্ ঘটনা কোন্ প্রকার মনের উপর কিরূপ কার্য্য করে—এই সকল আবশ্যকীয় দার্শনিকতত্ত্বের, দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত, এ শ্রেণীর নভেলে করা হয় না। এ প্রকার নভেলে, কেবল নানা প্রকার চরিত্র বর্ণনা এবং ঘটনা বিশেষে সেই সমস্ত চরিত্র কিরূপ কার্য্য করে, তাহাই দেখান হয় মাত্র। এই শ্রেণীর নভেল কতক পরিমাণে নাটকের মত।

দ্বিতীয় প্রকার চরিত্রচিত্র, অধিকতর আয়াসসাধ্য। কাল্পনিক প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (ideal) চরিত্র বর্ণনা করাই এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নভেলের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে যেরূপ স্বাভাবিক চরিত্র মাত্র চিত্রিত করা হয়, সেইরূপ এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নভেলে, মানবচরিত্র বর্ণনায় নূতন প্রকার (অথবা সচরাচর যেরূপ সংসারে পাওয়া যায় না এরূপ) চরিত্র কল্পনা করিয়া, ঘটনা পরম্পরা দ্বারা সেরূপ চরিত্রের কার্য্য-প্রণালী বর্ণনা করা হয়, এবং সেই সঙ্গে চরিত্রের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করা হয়। এইরূপ চরিত্র-চিত্রেও বাহ্য ঘটনার সহিত মানব-প্রকৃতির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দর্শাইয়া, সেইরূপ চরিত্রের মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র কল্পনাশক্তির সাহায্যে এই নূতন প্রকার অসাধারণ চরিত্র বর্ণনা করা হয় মাত্র। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর নভেল, ও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নভেলে পার্থক্য তত অধিক নাই। তবে এই শ্রেণীর চরিত্রচিত্রে গ্রন্থকারের অসাধারণ কল্পনা ও কবিত্বের আবশ্যক করে। অধিকাংশ নভেলেই এই দুই প্রকার চরিত্র চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্কট, লিটন প্রভৃতি অধিকাংশ খ্যাতনামা নভেল-রচয়িতাই এই পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ নভেলগুলি, বাস্তবিকই, সংসারের ও মনুষ্যচরিত্রের দর্পণস্বরূপ। ইহাতে প্রকৃত চরিত্রের প্রতিবিম্ব যত প্রতিফলিত, যত পরিষ্কার ও যত উজ্জ্বল হয়, ততই চরিত্রচিত্রের শিল্পচাতুর্য্য অধিকতর প্রশংসিত হয়।

এই স্থলে, নাটক ও নভেলের প্রকৃতিগত প্রভেদ না জানিলে নভেলের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে না। সাধারণ চরিত্রচিত্র—নাটক ও নভেল, উভয়েরই উদ্দেশ্য। তবে নাটকে যে ঘটনাবলীর দ্বারা চরিত্র

চিত্রিত করা হয়, তাহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। নভেলে ঘটনাবলীর প্রতি, ও স্বভাব-বর্ণনার প্রতি, অপেক্ষাকৃত অধিক দৃষ্টি রাখা হয়; নাটকে মনুষ্য-চরিত্র বর্ণনাই কেবল এক মাত্র উদ্দেশ্য। নাটকে চরিত্র স্ফূর্ত্তি করিবার স্থান থাকে না। সুতরাং যে সকল ঘটনার দ্বারা চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহা নাটকে দেখান হয় না। সুতরাং নাটকে সংগঠিত মনুষ্যচরিত্র লইয়া, তাহাকে ঘটনার সম্মুখে রাখিয়া, তাহার কার্য্য দেখান হয় এবং সেই সঙ্গে চরিত্রও বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সে যাহা হউক, আজ কাল উৎকৃষ্ট নভেলে সচরাচর এ প্রকার চরিত্রচিত্র অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিয়াছি ত যে, প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রের মতানুসারে নভেলের চরিত্র চিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রানুযায়ী মতানুসারে, মানুষের মনের স্বাধীনতা (free will) অর্থাৎ বাহ্য-জগতের সহিত মনের নির্লিপ্ত অবস্থা, সাধারণে বিশ্বাস করিত, সে সময়ে নভেলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত হইত মাত্র, অর্থাৎ কেবল বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মানুষ বিশেষে কিরূপ কার্য্য করে, তাহাই দেখান হইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নাটকগুলির প্রধানত ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। উৎকৃষ্ট নাটক যে সময়ে লিখিত হয়, তখন প্রচলিত দার্শনিক মতও এই প্রকার ছিল। এই জন্য প্রথমে নাটক ও নভেলে এ প্রকার প্রভেদ অধিক দেখা যাইত না। তাহার পর দার্শনিক মতের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। ইউরোপে কতকগুলি খ্যাত-নামা দার্শনিক পণ্ডিত, পূর্ব্ব-প্রচলিত মতের পরিবর্ত্তে, বাহ্য ঘটনার সহিত মনের সম্বন্ধ, এবং বাহ্য ঘটনা—মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টি বা পরিবর্ত্তন করিবার প্রধান কারণ (law of necessity) এই মত প্রচলিত করেন। নভেল-রচয়িতাগণও এই সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব প্রণালী অনুযায়ী চরিত্র চিত্র ত্যাগ করিয়া নূতন প্রকারের চরিত্র চিত্র আরম্ভ করিলেন। এই নূতন প্রকারে চরিত্র চিত্র বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, এক্ষণকার দার্শনিকদিগের মত আর একটু বিশদ করিয়া বুঝা উচিত। মনুষ্য চরিত্র কতকগুলি কারণের সমবায় ফল মাত্র। পূর্ব্বে যেরূপই থাকুক না কেন, এক্ষণে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, চরিত্র সংগঠনে প্রধানত দুইটী কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমটী পিতামাতার মানসিক বৃত্তি, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে Heridity বলেন, আর দ্বিতীয়টী আনুষঙ্গিক অবস্থা পরম্পরায়। আমরা ভাষা কথায় বলিয়া থাকি যে, পিতামাতার গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে যে এই মত সপ্রমাণিত হইয়াছে, তাহা আমরা হয়ত জানি না। অবস্থা পরম্পরায় যে কিরূপে চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহা এক্ষণে বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক নাই। একটী উদাহরণ দিলে, ইহার অর্থ কতকটা বুঝা যাইবে। মনে কর, এক জন আজন্ম কাল দস্যুগৃহে পালিত হইয়াছে, সামান্য অর্থলোভে নিরাশ্রয় পথিকদিগকে তাহার পিতা মাতা অবাধে হত্যা করিয়াছে,—তাহা সে বরাবর স্বচক্ষে দেখিতেছে। এ অবস্থায় দয়াবৃত্তি তাহার মনে উদয় হওয়া সম্ভব নহে। সেও আশৈশব দস্যুবৃত্তি করিতে বা হত্যা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। তবে যদি তাহাকে অন্য প্রকৃতির লোক হইতে দেখ, তবে কারণ অনুসন্ধান কর—নিশ্চয়ই দেখিবে, তাহার সংসৃষ্ট অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংসারে অনন্ত কোটী ঘটনা বা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক লোকে কত কোটি অবস্থার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। আবার প্রত্যেক মনুষ্যেরই এই সংসৃষ্ট অবস্থা পরম্পরা ভিন্ন প্রকার। সুতরাং সেই অবস্থা গুলির দ্বারা তাহার যেরূপ চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহাও ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক মনুষ্যের মুখাবয়ব যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন,—চরিত্রও সেইরূপ বিভিন্ন। এই চরিত্র সংঘটনকারী ঘটনা গুলিকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম, আধিভৌতিক External অবস্থা; দ্বিতীয়—আমাদের আধ্যাত্মিক বা মানসিক Internal অবস্থা। এই মানসিক অবস্থার মধ্যে যদি পৈত্রিক মানসিক বৃত্তি গুলি ধরিয়া পাওয়া যায়, তবে Heridity স্বতন্ত্র বিভাগ, আবশ্যক করে না। যাহা হউক, এ সমস্ত কথা এস্থলে বিস্তারিত বলিবার আবশ্যক নাই।

যদি অসংখ্য ঘটনা বা অবস্থা দ্বারা চরিত্র সংগঠিত বা পরিবর্ত্তিত হয়, তবে চরিত্র-চিত্রে তাহা অনুসন্ধান করা একরূপ অসাধ্য বলিয়া আপাতত বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে, কতকগুলি মূল কারণেই প্রধানত চরিত্র সংগঠিত করে। আনুষঙ্গিক সামান্য কারণগুলি চরিত্রকে অতি সামান্য পরিমাণে বিকৃত করে মাত্র। চরিত্র যতই সংগঠিত হইতে থাকে—যতই দৃঢ় হইতে থাকে—ততই সে চরিত্র সামান্য ঘটনার বা সামান্য শক্তির দ্বারা বিচলিত হইতে পারে না। কতকগুলি ঘটনা দ্বারা চরিত্র সংগঠিত হয় বটে, কিন্তু যখন একবার ভাল রূপে সংগঠিত হইয়া যায়, যখন সেই সমস্ত শক্তি প্রভাবে চরিত্রের অন্তর্ভূত শক্তি বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহা অন্য ঘটনার শক্তির বেগ নিরোধ করিতে পারে। সুতরাং এই নিরোধ শক্তির পরিমাণ করিয়া, আমরা প্রকৃত চরিত্র-তত্ত্ব জানিতে পারি। চরিত্র যত মহৎ, যত উচ্চ দরের হইবে, ততই অবাধে ঘটনাবলীর প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নভেল-লেখকগণ এইরূপ সংগঠিত চরিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে তাহার উপর ঘটনাবলীর ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। চরিত্র উৎকৃষ্ট হইলে তাহার উপর ঘটনাবলীর প্রভাব অল্প হইবে। চরিত্র অপকৃষ্ট হইলে, তাহার উপর ঘনাবলীর প্রভাব অধিক হইবে। উৎকৃষ্ট বা আদর্শ চরিত্র-লেখকগণ এই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রভাব অধিক করিয়া দিয়া তাহার গুরুত্ব, তাহার শক্তি বাড়াইয়া দিয়া, আদর্শ-চরিত্রকে তাহার মধ্যে অটল রাখিয়া, চরিত্রের উৎকর্ষ প্রমাণ করেন। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রকে একেবারে দার্শনিক সত্যের বিরোধী বলা যায় না।

তবে এ প্রকার চরিত্র-চিত্রে কিরূপে চরিত্র সংগঠিত হয়—কি কি কারণের উপর চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে, তাহা দেখান হয় না। চরিত্র মোটামুটি স্থির করিয়া লইয়া তাহাতে কতক পরিমাণে অন্তর্ভূত শক্তি কল্পনা করিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নভেল-লেখকগণ ঘটনাবলীর সাহায্যে তাহার পরীক্ষা করেন। ঘটনাবলীর সহিত চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে, আকর্ষণ বিক্ষেপণে, যে কার্য্য পরম্পরার সৃষ্টি হয়, তাহার দ্বারাই চরিত্র বুঝাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্র, এ শ্রেণীর চরিত্র চিত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। তবে, যে সকল নভেল-

লেখকগণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার (Free will) উপর নির্ভর করিয়া,ঘটনাবলীর দ্বারা চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না,এরূপ বিশ্বাস করিয়া, সকল শ্রেণীর ঘটনা মধ্যে চরিত্রকে অটল ও স্থির রাখিয়াছেন, তাঁহারা কতক পরিমাণে দর্শন-সম্মত সত্য পথ অনুসরণ করেন নাই।

আর একটী কথা এই যে, পূর্ব্বে সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারই কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ করা হইত না। তখন অদৃষ্টের (Fate or chance) উপর অনেক ঘটনাই আরোপ করা হইত। মনুষ্যচরিত্রও এই (Chance) বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, ইহাই লোকের মনে বিশ্বাস ছিল। সুতরাং সেই শ্রেণীর নভেলেও এই বিশ্বাসের বহুল পরিমাণে আভাস পাওয়া যায়। এই জন্য, তখনকার নভেলে, বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নভেলে,মনুষ্য চরিত্র কিরূপে সংগঠিত হয়, কোন্ কার্য্যকারণ নিয়মানুসারে মনুষ্য চরিত্র সংগঠন করে, তাহা দেখাইবার জন্য আদৌ চেষ্টা করা হইত না। অদৃষ্টের উপর মনুষ্য চরিত্র সংগঠনের ভার দেওয়া হইত।*

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

* এই স্থানে মনুষ্য চরিত্র সংগঠন সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের যে মত আছে, তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষিরা বলেন যে, পিতামাতার স্বভাব এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট অবস্থা পরম্পরার উপরই কেবল চরিত্র গঠন নির্ভর করে না। তাঁহারা পুনর্জন্ম ও অদৃষ্ট বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মত এই যে, এক জন্মে লোকের যে সমুদয় সংস্কার বদ্ধমূল হয়, আত্মাও সেই সংস্কারে জড়ীভূত হয় এবং পর জন্মে তাহার ফল ফলিয়া থাকে—ইহাকেই আমরা অদৃষ্ট বলি। সে যাহা হউক, আধুনিক কোন নভেলে এই সংস্কারের কোন আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এ কথা আমাদের এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

নিরাকারের ধ্যান।

নিরাকারের পূজা সম্ভব কি অসম্ভব, এই কথা লইয়া বঙ্গপ্রদেশে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এক নিরাকার-ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা অবশ্য নিরাকারের পূজাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু মধ্য হইতে একদল পণ্ডিত উঠিয়া তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, পৌত্তলিক দেবদেবীর পূজা প্রচার করিয়া আপনাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। সাধারণ লোকমণ্ডলী উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেহ বা ধর্ম্ম-রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, কেহ বা সুবিধামত যে কোন দলে যোগদান করিতেছেন। দলাদলির ইতিহাসের এক অভিনব পরিচ্ছেদ, বঙ্গপ্রদেশে অভিনীত হইতেছে। কোন্ কথা সত্য, ইহার আলোচনায় সকলেরই অধিকার সমান। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, বলিতেছি।

ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকেই কতকগুলি শক্তি দিয়াছেন। শরীর সম্বন্ধে কতকগুলি, হৃদয় ও মন সম্বন্ধে কতকগুলি। শক্তি দিয়াছেন, এবং তাহা পরিচালনার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন। পরিচালনার স্থান দিয়াছেন, আবার কতকগুলি অধিকার দিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার মানবের চিরসম্পত্তি;—তাহা যতদিন আছে, মানুষ ততদিন আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেই থাকিবে। শক্তিগুলি আপন অধিকার-ক্ষেত্রে উপযুক্ত রূপ পরিচালনা করিয়া করিয়া দিন দিন উন্নত হইতেছে। একদিন যে শক্তি সকলের কেবল অঙ্কুর মাত্র শিশু-মানবে ছিল, তাহাই কাল-সহকারে কত বড় হইতেছে। শরীরও বড় হইতেছে, মনও বড় হইতেছে। জরায়ু-গর্ভের ভ্রূণ আর বিংশ বৎসরের যুবক, উভয়কে চিন্তা কর, মানবের শক্তির কত উন্নতি হইয়াছে,বুঝিতে পারিবে। প্রকৃতির শক্তি, মানবের শক্তি-সকলের বিকাশের প্রায় সর্ব্বদাই সহায়তা করিতেছে; কিন্তু কখনও কখনও ভুল ক্রমে মানুষ আর প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতেছে,—জল বায়ু কখনও কখনও মানবের শক্তি-স্বাধীনতায় বাধা দিতেছে। তখনই তুমুল সংগ্রাম বাধিতেছে। বাহিরের বিষ যখন মানব শরীরের শক্তি-বিকাশের প্রতিবন্ধক হইয়া শরীরে ঢুকিল, তখনই শরীর-নিহিত এক শক্তি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, রোগের সময় শরীরের স্বাভাবিক শক্তি, অনেক স্থলে, বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে। যে দ্রব্যে শরীরের অপকার হইবে, তাহা আহার কর; দেখিবে, যতক্ষণ তাহা বাহির না হয়, ততক্ষণ আর শরীর স্থির হয় না; ভেদ, বমি,প্রস্রাব, ঘর্ম্ম, এই সকল উপায় দ্বারা সেই বিষকে বাহির করিয়া দিবেই দিবে। অস্ত্র দ্বারা হাত কাট, কিয়দ্দিবস পরে দেখিবে, আপনা আপনি তাহা যোড়া লাগিয়া যাইবে। রোগ আর কিছুই নহে, ভিতরের শক্তির সহিত প্রকৃতির বিরোধী শক্তির সংগ্রাম মাত্র। প্রকৃতির শক্তির সহিত সংগ্রামে, শরীরের শক্তি যখন পরাস্ত হয়, তখনই ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়; নচেৎ নহে। এ গুলি বিজ্ঞানের অভ্রান্ত সত্য। মন সম্বন্ধেও কতকগুলি অভ্রান্ত সত্য আছে। মানসিক উন্নতির সহায়তার জন্য প্রকৃতিতে অনেক পদার্থ রহিয়াছে। সেই সেই পদার্থ সকল অবিরত মানব-মনের উন্নতির সহায়তা করিতেছে; কিন্তু কখন কখন প্রতিরোধও করিতেছে। যখন প্রতিরোধ করিতেছে,তখনই মন আপন বীরত্ব লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। কখন মানসিক শক্তি পরাস্ত হইতেছে, কখনও বা প্রকৃতির শক্তি পরাস্ত হইতেছে। যখন মানসিক শক্তি পরাস্ত হইতেছে, তখন মানুষ প্রকৃতির নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া আপন উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছে। কিন্তু অনেক সময়েই মন আপন পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। বিরোধী শক্তির অত্যাচার, মানব-শরীরই বল, কিম্বা মনই বল, ইহারা কেহই সহ্য করিতে পারে না। নিগূঢ়রূপে প্রকৃতির সকল বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, মানুষ স্বাধীন, কোন প্রকার অধীনতা তাহার অসহ্য। স্বাধীনতার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকই সে সহিতে পারে না। স্বাধীনতা কাহাকে বলে?—যে শক্তি মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। আপনার বিশেষ২ পথে হাটিতেই মানুষ সদা লালায়িত। প্রতিরোধ, অবরোধ সে সহিতে পারে না। পৃথিবীতে যত রোগ, যত ধর্ম্মযুদ্ধ, যত সাধারণ যুদ্ধ, এ সকলই স্বাধীনতার পথের প্রতিবন্ধকের চরম ফল। মানুষ কেন স্বাধীনতার জন্য লালায়িত? কারণ, ইহাই উন্নতির একমাত্র সহায়; বিশেষত্ব লাভের প্রধান সোপান।

শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র কি, তাহা প্রত্যেক

মানুষেরই বুঝিবার শক্তি আছে। স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সকলেই আপন আপন লক্ষ্য, আপন আপন পথ বাছিয়া লইতে সক্ষম। ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি সকলেরই আছে, সকলেই ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে পারে। এমন এক শক্তি মানুষের ভিতরে আছে, যে অবিরত মঙ্গলের ক্ষেত্র মানুষকে দেখাইয়া দিতেছে। সকল সময়েই সে শক্তির স্পষ্ট আদেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। দক্ষিণে যাইব, কি বামে যাইব? জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে। ছোলার ডাইল খাইব, কি মুশুরির ডাইল খাইব? লোভ-স্বার্থ পরিহার করিয়া জিজ্ঞাসা কর, স্পষ্ট উত্তর পাইবে। এটী ধর্ম্ম, কি ওটী ধর্ম্ম? জিজ্ঞাসা কর, স্পষ্ট উত্তর শুনিতে পাইবে। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝিবার যে ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি মানবের সহায়, সেই শক্তি না থাকিলে আজ পৃথিবীতে সত্য অসত্য, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম লোকে বাছিয়া লইতে পারিত না। এই যে শক্তি মানবের প্রাণে, যাহাকে ভাষায় বিবেক-শক্তি বলা যায়, এই শক্তি অনবরত মানুষকে আপন আপন বিশেষত্বের পথে লইয়া যাইতেছে। প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ পথে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেকের আবিষ্কৃত সত্যে ঘনীভূত মিলন দেখা যাইতেছে। এই জন্য পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন, ঈশ্বর-বাণী-বিবেকের কথা সকলের একরূপ—বিবেকের আবিষ্কৃত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সত্য একরূপ। কিন্তু অনেক স্থানে সামান্য সামান্য বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে সকল বিবেকের কথা নহে; সে সকল ব্যক্তিগত ভাবের অর্জ্জিত ফল মাত্র। সে সকল কথা এখানে থাকুক। বিবেক মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন, বিশেষ বিশেষ পথে লইয়া যাইয়া আবার একস্থানে মিলাইতেছে। পথে হাটিবার সময়ে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু লক্ষ্য স্থানে যাইয়া দেখা যাইতেছে, সকলেই একস্থানে আসিয়াছে। আপন আপন পথে, বিবেকের কথা মতে চলিলে, মানবের কখনও বিচ্ছেদ বা অমঙ্গল ঘটে না। শিক্ষা, অবস্থা ও জল বায়ু-অর্জ্জিত ব্যক্তিত্ব বিবেকের স্থানকে অধিকার করিলেই মানবের অমঙ্গল ঘটে; নচেৎ বিবেক মানবকে বিভিন্ন পথে চালাইলেও পরিণামে একই লক্ষ্যে উপস্থিত করিবে। বৈষ্ণব, শাক্ত, খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বৌদ্ধ, সকলকেই একস্থান মিলাইবে। কিন্তু মানুষের এই যে বিবেকের স্বাধীনতা, পৃথিবীর লোকেরা, গুরুগিরি বজায় রাখিবার জন্য, এই স্বাধীনতাকে অপহরণ করিয়া বড়ই গণ্ডগোল বাধাইয়া দিতেছে। ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম আনিতেছে, পুণ্যের স্থানে পাপ-গরল উৎপন্ন করিতেছে! করিতেছে, কিন্তু তবুও ধর্ম্মের জয় হইতেছে—বিবেকের জয় হইতেছে,—মানবের আবিষ্কৃত সত্যে ঘনীভূত মিলন দেখা যাইতেছে। মানুষ পৃথিবীর অর্জ্জিত ব্যক্তিগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আপন বিবেকের কথা মতে চলিয়া, যদি প্রাণগত বিশ্বাসের সহিত মাটীকে শক্তির অবতার বলিয়া বা বৃক্ষকে জ্ঞানের অবতার বলিয়া বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিতে পূজা করে, তবে তাহাতেও তাহার অমঙ্গল নাই। কারণ, অনাবিল প্রেমভক্তির পথে চলিতে চলিতে, শেষে, সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় তাঁহাকে নিরাকার শক্তি-সিন্ধুর নিকটে আসিয়া মস্তককে অবনত করিতেই হইবে। কিন্তু শিক্ষা, সমাজ, অবস্থা যদি তাহাকে ঐ জ্ঞানে উপস্থিত করিয়া থাকে, তবে তাহার অমঙ্গল ঘটিবেই ঘটিবে। কারণ বিবেক তখন মলিন

হইল, স্বাধীনতার স্থানে সংসারের আধিপত্য হইল। সংসারের কথায় ধর্ম্ম হয় না, বিবেক-বাণীকে আধিপত্য না দিলে, ধর্ম্ম টিকে না। ধর্ম্ম পলায়ন করিলে মানবের মঙ্গল আর কোথায় রহিল? মানুষ আপনার প্রাণগত বিশ্বাসে যদি স্পষ্ট কোন পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রেমভক্তিতে পূজা করে, তবে তাহার অমঙ্গল হইবে না; কিন্তু যে জন কাহারও কথা মতে করে, তাহার অমঙ্গল হইবেই; কারণ সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইল। স্বাধীনতা ভিন্ন মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের আর নেতা নাই। স্বাধীনতার মূলশক্তি বিবেক। আপন বিবেকের কথায়, যে পৌত্তলিকতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, তাহার অমঙ্গল নাই। ঈশ্বরের কৃপায়, এক প্রেমের বলে, ধর্ম্মের পথে সে অটল থাকিতে পারিবে—সংসারের পাপ প্রলোভন—অমঙ্গল তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। কিন্তু অর্জ্জিত বিশ্বাসে যে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহার পদে পদে বিপদ ঘটিবে। ভিতরের জ্ঞান বিশ্বাস ও প্রেম ভিন্ন মানুষ দৃঢ় ও অটল থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর-জ্ঞান এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি, স্বতই, মানবের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীর আদি সময় হইতেই এই জ্ঞান, এই ভক্তি ছিল। এ জ্ঞান, এ ভক্তি, অর্জ্জিত নহে। এই জ্ঞান ভক্তির অঙ্কুর আদি সময় হইতে মানবের অন্তরে নিহিত দেখিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাপণ্ডিত হাবার্ট স্পেন্সার পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া গিয়াছেন। আদি সময় হইতে ঈশ্বরের সত্তাবোধ (Consciousness of God) যদি মানবের প্রাণে না থাকিত, তবে মানুষ কখনও ধর্ম্মের নামে মাতিত না। এই সত্তাবোধের পথ বিবেক সর্ব্বদাই পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে। এই জন্যই, আজও পৃথিবী, সকল শক্তির পরাক্রমকে পরাজয় করিয়াও, প্রেম পুণ্যের বিজয় নিশান, অপ্রতিহত প্রভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছে। এই যে ঈশ্বরের সত্তাবোধ, ঈশ্বর-বোধ, ইহা কি প্রকার, ক্রমে দেখাইতেছি।

মানুষ আকার-বিশিষ্ট, আবার মানুষ নিরাকার,—আকারে নিরাকার, নিরাকারে আকার। হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মানুষ আকার বিশিষ্ট; আবার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি বিভূষিত মানব নিরাকার। শরীর আকার বিশিষ্ট, আত্মা ও মন নিরাকার। শরীরে আত্মা, আত্মায় শরীর। পৃথিবীতে এই আকার ও নিরাকারের এমনই যোগ, একের রোগে অপরকে আক্রমণ করে। শরীরের পীড়ায় মনের ধারণা শক্তি হ্রাস হয়; মনের পীড়ায় শরীর শুষ্ক হয়, বল হ্রাস হয়। এই যে যোগ, এ এক মহাযোগের মিলন। মানুষ মানুষের আর কিছুই ভাবিতে পারে না, ভাবে কেবল—শক্তি—কেবল গুণ। এই যে আকার-বিশিষ্ট নিরাকার মানুষ, ইহার শরীর জড় বস্তুর সমষ্টি; কিন্তু ভাব ত জড় কি? জড়ের বিস্তৃতি, রূপ, গন্ধ, পরিমাণ প্রভৃতি যাহা ভাবিবে, সে সকলই নিরাকার। ভাবে যে, সে আপনিই নিরাকার; এই জন্য ভাবে যাহা, তাহাকেও নিরাকার করিয়া নিরাকার আত্মা চিন্তা করে। বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে—কিছু জড়ের গুণ ভিন্ন আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। গুণ নিরাকার। আকারকে নিরাকার করিয়া, নিরাকার মানুষ, চিন্তা করিতেছে, ধারণা করিতেছে। চিন্তা কর, বুঝিবে, গুণ ভিন্ন জড়ের আর কিছুই বুঝিবার শক্তি নাই। মায়াবাদীরা এই জন্য

জড়ের খেলাকে তোজের বাজির ন্যায় মনে করেন। বাস্তবিক, জড়ের ভিতরে এক মহা-শক্তির ঢেউ প্রবাহিত, তাহাকে নিরাকার বই আর কিছুই ভাবা যায় না।

অনেকে বলেন, নিরাকার আকারের মধ্যেই প্রকাশিত; জড় না থাকিলে নিরাকার ভাবা যাইত না। কোন অবস্থায় ভাবা যায় কি না, জানি না; কিন্তু এই শরীরধারী মানুষ যে পারে না, তাহা নিশ্চয় অনুমান হয়। কারণ, নিরাকারে আকার ব্রহ্মাণ্ডময় দেখিতেছি;—ইন্দ্রিয় পরীক্ষা ভিন্ন এই পৃথিবীতে নিরাকার গুণের ধারণার শক্তি আত্মার দেখিতেছি না। আকারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা, নিরাকার আত্মা, জ্ঞান, প্রেম-লাভ করিতেছে; আবার যাহার মধ্য দিয়া সে জ্ঞান পাইতেছে, সে সকলই আকার-বিশিষ্ট। শক্তির পরিচয় পাইতেছি—আকারের মধ্য দিয়া। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, পাইতেছি যাহা, তাহা নিরাকার; পাইতেছে যে, সেও নিরাকার। নিরাকার আত্মা আকারের মধ্য দিয়া নিরাকারকে ভাবিতেছে। মানুষ মানুষকে ভালবাসে। কি ভালবাসে?—আকারকে, না গুণকে? আকারসমষ্টির গুণকে ভালবাসে। গুণ-শূন্য আকার কল্পনাও করা যায় না। গুণ-শূন্য আকার মানুষের ভালবাসা পায় না। যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান জগতে দেখা যায়, এ সকলেরই গুণকে মানুষ ভালবাসে। গুণ আপনি নিরাকার। চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে, আকারের ভিতর দিয়া মানুষ কেবলই নিরাকারকে ধরিতেছে। আকার কই—আকার কোথায়? সকলই নিরাকার—সকলই গুণের সমষ্টি মাত্র;—সকলই শক্তির অলক্ষিত তরঙ্গ মাত্র। পৌত্তলিক, তুমি আকার ভাব ত দেখি? সে সাধ্য নাই। আকার দেখিতেছ বটে, কিন্তু প্রাণে যাহা পাইতেছ, তাহা নিরাকার; যাহা ভাবিতেছ, তাহা নিরাকার; প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাকে মন্দিরে আনিতেছ, তাহা নিরাকার; যাহার অবর্ত্তমানে মাটীর পুতুলকে জলে ভাসাইতেছ, তাহা নিরাকার। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিব, আকারের ভিতর দিয়াই নিরাকারের জ্ঞান পাইতেছি। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, সাগর উপসাগর, ফল ফুল ভিন্ন ভিন্ন আকার ধরিয়া কেবলই নিরাকারের শিক্ষা দিতেছে। সৃষ্টি-সিন্ধুকে মন্থন করিয়া কেবল নিরাকার গুণের শিক্ষা পাইতেছি। অনন্ত সৃষ্ট পদার্থ অনন্ত রূপ ধরিয়া মানুষকে কেবল অনন্ত নিরাকার গুণ শিক্ষা দিতেছে। যদি বল, যাহার মধ্যে যে গুণ পাইলাম, তাহাকে সেই গুণের জন্য পূজা করি। সে প্রকার শক্তির পূজা সকলেই করিয়া থাকে, চিরকাল করিবে। কিন্তু এক বস্তুর মধ্যে অনন্তের সকল গুণ কখনই পাইবে না। সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেক বস্তু বিশেষ বিশেষ শক্তির বিন্দু। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থকে পূজা করিতে চাও কর, কিন্তু একটীকেও যদি পরিত্যাগ কর, তোমার পূজা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সকল জড়জগৎ মন্থন করিয়া যত শক্তি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্ত গুলিকে যদি এক স্থানে একত্রিত করা যাইত, তবে পূজার বড়ই সুবিধা হইত। কিন্তু অনন্ত শক্তি, অনন্ত গুণ রাশি কোন সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ হয় না। মানুষ আপনিই পরিমিত, সীমাবিশিষ্ট, অসীমের বিন্দুকণা ভিন্ন তাঁহার নিজের ধারণা করিবার কোন শক্তিই নাই। পৃথিবীর কোন পরিমিত পদার্থই অনন্তের ভাবে পূর্ণ হইতে পারে না।

এক্ষণে কেহ যদি মনে করেন, এক খানি দশভুজা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে সকল শক্তি আছে, ইহা কল্পনা করিয়া লইলেই হইল। জড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও নিরাকার গুণ, এখানেও নিরাকার গুণ কল্পনা করিব। প্রকৃত পক্ষে ইহা কি সম্ভব? কল্পনায় কি পূজা হয়? পূজার উপকরণ প্রেমভক্তি যাহা কিছু, কল্পনায় তাহার কিছুই হয় না। কল্পনায় ভয় হয় না, কল্পনায় ভক্তি হয় না, কল্পনায় ভালবাসা হয় না, কল্পনায় বিস্ময় হয় না। কল্পনা কর, তুমি যেন অকূল সাগরে ডুবিতেছ, করিয়া দেখ ত, মনে ভয় হয় কি না? কল্পনা কর—যেন তোমাকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিতেছে; দেখত প্রকৃত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে কি না? কল্পনা কর, তোমার মৃত পিতা তোমার সম্মুখস্থিত গৃহের দেয়ালে বর্ত্তমান, দেখ ত দেয়ালকে ভাল বাসিতে পার কি না? কল্পনা কর, তোমার যেন একটী পুত্র জন্মিয়াছে, দেখ ত প্রকৃত পুত্র-স্নেহের উদয় হইয়াছে কি না? কল্পনা কর, চৈতন্যের ভ্রাতৃভাব তোমার গৃহ-পালিত কোন পশুতে আবির্ভূত, দেখ ত সেই পশুকে ভক্তি করিতে পার কি না? কল্পনা কর, এক অকূল আলোক-সমুদ্র হইতে অপূর্ব্ব বেশে এক আশ্চর্য্য জ্যোতি নামিতেছে, দেখত, মনে বিস্ময় হইতেছে কি না? কল্পনায় এ সকল হয় না। প্রকৃত ঘটনা-পরীক্ষা ভিন্ন, ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও প্রীতির উদয় হয় না। আগুনের দাহিকা-শক্তি যে কখনও পরীক্ষা করে নাই, সে আগুনের ঐ শক্তিকে কখনই কল্পনা করিতে পারে না। এই প্রকার জগতের সকল শক্তি। প্রত্যক্ষীভূত না হইলে কোন শক্তিরই অস্তিত্ব কল্পনায় ধারণা হয় না। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ যে না দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ধারণা করিতে পারিবে না। দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়া, তবে ধারণা হয়। এক পদার্থের শক্তি, অন্য পদার্থ দেখিয়া ধারণা হয় না। বৃক্ষে যে শক্তি, জলে তাহা ধারণা হয় না, আগুনে যে শক্তি, ফুল দেখিয়া তাহা ধারণা হয় না। পক্ষান্তরে, অনন্তপদার্থ-পুঞ্জকে পরীক্ষা করিয়া, অনন্ত শক্তির ধারণা করা, সীমাবদ্ধ মানবের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। মানব যতই পরীক্ষা করুক না কেন, চিরকালই অশিক্ষিত। এই জন্য, এক প্রতিমায় অনন্ত শক্তিকে কল্পনা করিতে পারা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্যত্র যে মানুষ শক্তির বিকাশ দেখিয়াছে, কেবল সে, শক্তির কতক কল্পনা করিতে পারিলে পারিতে পারে, কিন্তু অন্যে তাহা কখনই পারিবে না। অন্যের নিকট প্রতিমা যে বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত, তাহারই গুণ প্রকাশ পাইবে; তাহাতে যাহা নাই, তাহা কখনই ধারণা হইবে না। লোকে অন্যত্র যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, সে শক্তিকে প্রতিমায় কল্পনা করিয়াও, তাহাকে প্রেমভক্তিতে পূজা করিতে পারে না; কারণ কল্পনায় প্রেমভক্তির উদয় হয় না।

কোন এক সীমাবদ্ধ স্থানে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান কখনই থাকিতে পারে না। এই জন্য, সৃষ্ট পদার্থের সকলের মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নহে; মানুষ নহে, পশু নহে, পক্ষী নহে, চন্দ্র নহে, সূর্য্য নহে। সীমাবদ্ধ যে, সে কখনই অনন্তের পূর্ণত্ব ধারণ করিতে পারে না। বিন্দু কখনও সিন্ধুকে ধরিতে পারে না। এই জন্য একথা

ঠিক, মানুষ কখনই অনন্ত ঈশ্বরকে হৃদয়ে পূর্ণ ভাবে ধারণা করিতে পারিবে না; কিন্তু সিন্ধুর এক বিন্দু অবশ্য ধারণ করিতে পারিবে। সমুদ্রে অগাধ জল, আমার যেমন পাত্র, আমি তেমনি তুলিতে পারিব, এ শক্তি আমার আছে। পাত্রানুসারে মানুষ শক্তি সাগরের বিন্দু বিন্দু ধরিতেছে। মানুষ জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতার বিন্দু পরিমাণে অধিকারী হইতেছে; কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ কিছুই মানুষ কখনও পায় নাই, কখনও পাইবে না। এই জন্য, এক জন মানুষ আদর্শ নয়, একটী কোন বস্তুই আদর্শ নয়। আদর্শ নয় বলিয়া, তাহাতে কিছুই নাই, এমন কথা হইতে পারে না। সমস্ত সাগরকে গণ্ডূষ করিয়া শুষিতে পারি না বলিয়া, এক বিন্দু জল পান করিতে পারি না, তাহা নহে। বিন্দু বিন্দু করিয়াই মানুষ শক্তি পান করিতেছে;—যত পান করিতেছে, ততই তৃষ্ণা বাড়িতেছে, সুতরাং ক্রমেই অধিক পান করিতেছে। পান করিতে করিতে ছুটিয়াছে, অনন্তের মধ্যে ডুবিতে। পৃথিবীর প্রথম দিন হইতে এমনি করিয়া অনন্তের বিন্দু বিন্দু লোকে ধারণ করিতেছে। কল্পনা নহে, কথার কথা নহে, মানুষ বাল্যকাল হইতে শক্তি লইয়া খেলা করিতেছে, বাল্যকাল হইতে নিরাকারের শিক্ষা পাইতেছে। গুণ সমষ্টি জ্ঞান হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, ভাব হইয়া সেখানে জমাট বাঁধিয়া থাকিতেছে। মানুষ এমনি করিয়া কত জ্ঞান পাইয়াছে,—সেই জ্ঞান পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পৃথিবীর সন্তানেরা আবার ভোগ করিতেছে। কিন্তু তবুও অনন্তের কূল পাইতেছে না। কত বৎসর গেল, কত শতাব্দী গেল, তবুও যেই অকূল, সেই অকূলই রহিল। অকূলে পড়িয়া মানুষ কত হাবুডুবু খাইল, তবুও তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। অনন্ত শক্তি সাগরকে কে অতিক্রম করিতে পারিবে? সীমাবদ্ধ জীবের তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। নিরাকার মানুষ জড় দেখিয়া নিরাকার জ্ঞান লাভ করিতেছে, জড়ের শক্তি দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়া নিরাকার ভাব সঞ্চয় করিতেছে। যাহা প্রত্যক্ষ পাইতেছে, কল্পনায় কখনই তাহা পাওয়া যায় না। ভবের হাট হইতে মানুষকে স্থানান্তরিত করিতে যদি মানুষের শক্তি থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতে, মানুষ কল্পনা করিয়া কিছুই পাইত না। নিরাকার আত্মা কেবল নিরাকার লইয়াই সর্ব্বক্ষণ মত্ত রহিয়াছে। সীমাবদ্ধ জীব কেবলই অনন্তের ভাব-সাগরের কল কল নিনাদ শ্রবণ করিতেছে। আকার নাই, কল্পনা নাই, সকল মিলিয়া মিশিয়া এক নিরাকার শক্তি-সাগর। তাহার কতই বিচিত্র তরঙ্গ, কতই বিচিত্র বুদ্‌বুদ্। মানুষ তাহাই বাল্যকাল হইতে ভাবিতেছে, তাহাই দেখিতেছে, তাহাকেই বিস্ময়-পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিতেছে। মূর্খ মানুষ, আকারের পূজার কথা কি বলিতেছ? কল্পনার পূজার কথা লইয়া কি যুক্তিশূন্য তর্ক করিতেছ? একবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হও; বুঝিবে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন কল্পনায় কোন জ্ঞান, কোন শক্তির ভাবই ধারণা হয় না; বুঝিবে, আকার আকার নহে, সকলই নিরাকার। জড় জড় নহে—নিরাকার শক্তির তরঙ্গ মাত্র। জড়ও শক্তি, আমি ও শক্তি, তুমিও শক্তি। শক্তি-সাগর, অনন্ত নিরাকার। সেই সাগরের বুদ্‌বুদ্ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু। সেই নিরাকারের ধ্যানেই মানুষ নিমগ্ন,—তাঁহার ধ্যানেই বিভোর, তাঁহার জ্ঞানেই উন্মত্ত। বিবেক অবিরত মানুষকে এই কথাই বলিতেছে। বিবেক নিয়ত মানুষকে এই নিরাকার ধ্যানের পথেই টানিতেছে। প্রকারান্তরে ইহাকেই পেন্সার (Consciousness of God) ঈশ্বরের সত্তাবোধ বলিতেছেন। ইহা আদিতে ছিল, ইহা শেষেও থাকিবে। মূর্খ মানুষ যতই অহঙ্কারী হউক না কেন, নিরাকারের ধ্যান পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিবার কাহারও শক্তি নাই। সকল চূর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ নিরাকারের পূজা, নিরাকারের ধ্যান ছাড়িতে পারিবে না। কারণ ইহাই আরম্ভ, ইহাই শেষ।

প্রকার বা পরিমাণ ভেদ?

মৃত্যু কি, কোন কোন ইতর প্রাণীর সে জ্ঞান আছে। প্রভুর শব পার্শ্বে শয়ন করিয়া কুকুরেরা প্রাণত্যাগ করে, দেখা গিয়াছে। পারিস পশু বাটীকায় একটী সিংহীর সহিত একটী কুকুরের অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছিল। সিংহীর মৃত্যু হইলে কুকুরটী অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। মাণিক জোড় প্রভৃতি কয়েক শ্রেণী পারটকে পতি পত্নী বিয়োগে প্রাণত্যাগ করিতে দেখা যায়। এমন এক শ্রেণী লামা আছে, যাহারা জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিলে পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারে; এবং তখন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পূর্ব্ব পুরুষের কঙ্কাল-রাশির সহিত আপনাদিগের অস্থি মাংস সংযোগ করে। একটী পিপীলিকার মৃত্যু হইলে অন্য পিপীলিকাগণ তাহার কবর দেয়।

পক্ষান্তরে, নানাজাতীয় লোকে মৃত্যু কি, বুঝেনা, এবং মৃতদিগকেও আহার দিবার চেষ্টা করে। পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে, ইতরেতর জীবদিগের ন্যায় তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। কাখারিরা আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ মাঠে ফেলিয়া দেয়, ছাগল ও ব্যাঘ্রেরাই তাহাদের সৎকার করে। বুশমানেরাও মৃত দেহ যথা ইচ্ছা ফেলিয়া দেয়। নবজিলণ্ড-বাসীরা যুদ্ধ-হত আত্মীয় স্বজনকে ভক্ষণ করে, এবং সন্তানেরা মৃত পিতা মাতাকে উদরসাৎ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বট্টাজাতি বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ এইরূপে সৎকার করিত। মার্কোপোলোর মতে, ভারতবর্ষীয় কোন কোন জাতির মধ্যে, এবং হেরদোতসের মতে, য়ুরোপের কোন কোন স্থানে এই রীতি প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপে বৃক্ষ মূলে বা জল গর্ভে মৃতদেহ ফেলিয়া দিত। নানা শ্রেণীর মোগলদিগের মধ্যে মাঠে বা জলে মৃতদেহ ফেলিয়া দিবার রীতি ছিল। তিব্বত-বাসীরা আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ বায়স ও গৃধিনীদিগকে খাইতে দেয়। হিন্দু ও গ্রীকদিগের মধ্যে কুকুর দিয়া মৃতদেহ খাওয়াইবার রীতি এক সময়ে প্রচলিত ছিল; তাতারেরা মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া পশু পক্ষীদিগকে খাইতে দেয়। হির্কানিয়া দেশে মৃতদেহ খাওয়াইবার জন্য লোকেরা কুকুর পুষিত। বাক্ট্রিয়া দেশে কেবল মৃতদিগের কেন, কুকুরেরা দুর্ব্বল বৃদ্ধ পীড়িতদিগেরও সৎকার করিত। পার্শিরা অদ্যাপি কুকুর ও গৃধিনী দ্বারা মৃতদেহের সৎকার করাইয়া থাকে। শ্যামদেশে সাধারণ লোকে অদ্যাপি মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া কুকুরদিগকে খাইতে দেয়। পঞ্জাবে কালা-

শিয়েরা আপনারাই পিতা মাতার মৃতদেহ ভক্ষণ করিত। কত টাকা পাইলে তাহারা মৃতদেহ দাহ করিতে পারে, দরায়ুস এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল।

সকল মনুষ্যের বুদ্ধি, ইতরপ্রাণীর বুদ্ধি অপেক্ষা উন্নত নহে। পিপীলিকা, মৌমাছি, বীবর, কুকুর, হস্তী প্রভৃতির বুদ্ধি অনেক মনুষ্যের বুদ্ধি অপেক্ষা উন্নত। পূর্ব্বে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতেই বর্ব্বরদিগের বুদ্ধি বৃত্তির এক প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা কোন নূতন জিনিষ দেখিলে কিছু মাত্র উৎসুক্য প্রকাশ করে না। তাসমেনিয়ার লোক কোন এক বিষয়ে কিছুক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ দিতে পারে না। এক জন তাসমেনিয় নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া জাহাজ বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। নবকালিডোনিয়ার লোকে আপন দেশের নাম জানে না। বুশমানেরা গাড়ীর ছোট চাকাকে বড় চাকার ছেলে বলিয়া মনে করে। ফুয়েজিরা কুক সাহেবের জাহাজে চড়িয়া কত নূতন জিনিষ দেখিয়াছিল। কিন্তু কোনটাই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বাটুকুদো জাতীয় এক ব্যক্তি যেহিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডাক্তারি শিখিয়াছিল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমাও পাইয়াছিল। কিন্তু দেশে পৌঁছিয়া সমুদ্রতটে বেশ ভুষা সকলি ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া স্বজাতীয়ের সহিত বাস করিয়াছিল। সাধারণী ও পঞ্চানন্দ সম্পাদক দ্বয়ের মতে এটি "জাতীয়তার" আদর্শ। আটদিগকে একটী কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা না করিলে, তাহারা প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, এবং দুতিনটী কথা বুঝিতেই তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। টাহিটী-বাসীরা আপনাদের বয়স বলিতে পারে না। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা ইহারা স্মরণ রাখিতে পারে না। পোলিনেসিয়ার লোকদিগকে য়ুরোপীয় আচার ব্যবহার শিখাইয়া দেখা গিয়াছে, তাহারা সে শিক্ষা রক্ষা করিতে পারে না। একটু বড় হইলেই বন্যভাবে বন্যদিগের সহিত মিশিয়া যায়। নিগ্রোরা দুচারিটী কথার উত্তর দিয়া একবার ঘুমাইয়া লয়—মাথা ঠাণ্ডা না করিলে আর উত্তর দিবার ক্ষমতা হয় না।

বানরেরা লাঠি ব্যবহার করে, ইট ছুড়িয়া মারে, পাথর দিয়া বাদাম প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খায়, আবশ্যক হইলে মাচা বাঁধিয়া গাছের শাখায় বাস করে। বীবর, পিপীলিকা, উই, ও মৌমাছি যেরূপ সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে, অনেক সভ্য লোকেরও সেরূপ করিবার ক্ষমতা নাই। অন্যান্য ইতরপ্রাণীর বুদ্ধি শক্তির একটু পরিচয় লওয়া যাউক। তৈল বা মধু বোতলে অল্প থাকিলে ইঁদুরেরা যদি লাঙ্গুল দ্বারা তাহা স্পর্শ করিতে না পারে, তবে ছোট, ছোট ইট কি পাথরের টুকরা বোতল মধ্যে ফেলিয়া দেয়, তখন খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে উঠিলে লাঙ্গুলের সহায়তায় সমস্ত চুরি করে। ইঁদুরেরা নদী পার হইয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে, এরূপ দেখা গিয়াছে। খাদ্য দ্রব্যগুলি নদীতটে একত্র করা হইলে, একখণ্ড কাষ্ঠের বা শুষ্ক গোবর চাপের উপর উঠাইয়া দিয়া কাষ্ট খণ্ড জলে ভাসাইয়া দেয়, এবং সকলে হাত দিয়া উহা ধরিয়া ভাসিতে থাকে এবং লাঙ্গুলদ্বারা হালের কার্য্য করিয়া নদীপার হইয়া যায়। মহিষ, বৃষ ও শূকরেরা দল বাঁধিয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ঙ্কর শ্বাপদদিগকেও আক্রমণ করিয়া হত্যা করে।

একজন একটী শূকরী পুষিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন তাহার এক একটী সন্তান বধ করিতেন, এরূপ দুইদিন করিলে দেখা গেল শূকরী বনমধ্যে সন্তান গুলিকে লুকাইয়া একাকিনী ফিরিয়া আসিয়াছে। শিকারের সময় দেখা যায় যে, মৃত বা আহতদিগকে রোমন্থ হরিণেরা, শৃঙ্গের উপর তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। যে সকল বৃক্ষ বা লতা হরিণেরা মুখ দিয়া ধরিতে পারে না, পশ্চাতের দুইটী পায়ে ভর দিয়া উচ্চ হইয়া সেই সকল বৃক্ষের শাখায় শৃঙ্গ জড়াইয়া নাড়া দেয়, ফল গুলি নাড়া পাইয়া তলায় পড়িলে কুড়াইয়া খায়। পাহাড়ের উপর সংকীর্ণ পথে দুইদিক হইতে দুইটী ছাগল উপস্থিত হইলে, ঠেলাঠেলি করিয়া পড়িয়া গেলে উভয়েরই প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা; এমন অবস্থায় একটী শুইয়া পড়ে, অপরটী তাহার পিঠের উপর দিয়া চলিয়া যায়। একজন সাহেব কতকগুলি ছাগল পুষিয়াছিলেন। যদি কোন দিন আহারের সময় অতীত হইত, ছাগলেরা তাঁহার দ্বারে আঘাত করিত। প্রথম প্রথম কোন অতিথী আসিয়াছে ভাবিয়া, সাহেব দ্বার খুলিয়া দিতেন—শেষে আর দ্বার খুলিতেন না। তখন ছাগলেরা ঘণ্টা বাঁধা দড়িতে শৃঙ্গ জড়াইয়া নাড়া দিত। অতিথী দ্বারে আসিয়া ঘণ্টা বাজাইলে দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, ইহা তাহারা দেখিয়াছিল। প্রাট্ সাহেবের একটী অশ্ব, পায়ের লাল পড়িয়া গেলে, লাল বাঁধেরবাড়ী স্বয়ং যাইয়া লাল বাঁধাইয়া আসিত। একদা একটী বিবি সহসা নদী গর্ভে পতিত হইয়াছিলেন, নিকটে কেহই ছিল না সুতরাং, জলগর্ভে তাঁহার মৃত্যু হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। মাঠে চরিতে চরিতে একটী অশ্ব, রমণীর এই মহাবিপদ দেখিতে পায়। সে ছুটিয়া আসিয়া কাপড় মুখে ধরিয়া বিবিকে টানিয়া লইয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। একটী কাণা অশ্বের সন্তান হইয়াছিল। অনেক সময় না দেখিতে পাইয়া, পদদলন করাতে সন্তানটী মরিয়া যায়। বারান্তরে সন্তান হইলে, যখন তাহার নড়িবার চড়িবার আবশ্যক হইত, তখন সে বিশেষ তদন্ত করিয়া পদ চালন করিত, সে জন্য একদিনও সন্তানের গায়ে সামান্য আঘাত লাগে নাই। বোধ হয়, অশ্বেরা কিয়ৎ পরিমাণে হিসাব রাখিতে পারে, যে সকল অশ্ব পাঁচবার করিয়া ট্রাম্ গাড়ী টানে, চারিবার পর্য্যন্ত তাহারা নীরবে কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া থাকে, পঞ্চমবার গৃহে যাইবার সময়, দ্রুতপদে ধাবমান হয়, চীৎকার করিতে থাকে এবং নানা আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ করে। একটী অশ্ব ও একটী গর্দ্দভে বড় বন্ধুতা ছিল। গর্দ্দভটীকে প্রাঙ্গনে ছাড়িয়া গৃহস্বামী অশ্বটীকে গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, অথচ প্রতিদিন প্রত্যুষে উভয়কে একত্র দেখা যাইত। সকলে নিদ্রিত হইলে, অশ্বটী ভিতর দিকের অর্গল খুলিয়া ফেলিত, তখন গর্দ্দভ ঐরূপে বাহিরের অর্গল খুলিয়া দিত। অষ্ট্রেলিয়েরা কুকুর দ্বারা কাঙ্গারু শিকার করিয়া থাকে। কাঙ্গারুর তলপেটে একটী ঝুলি থাকে; বিপদে আপদে সন্তানেরা সেই ঝুলি মধ্যে আশ্রয় লয়। কুকুরে জননীকে ধরিতে পারিলে এরূপ অবস্থায় সবংশে লোপ হইবার সম্ভাবনা; এজন্য অভাগিনী প্রাণপণে দৌড়িবার সময় এক একটী সন্তান দূরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। আপনি শত্রু হস্তে হত হইলেও নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কা থাকে না। যদি কোন ক্রমে শত্রু হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন ফিরিয়া আসিয়া সন্তানগুলি সংগ্রহ করে। দেলবার প্রদেশে এক ব্যক্তি একটী কাক পুষিয়াছিলেন। কাকটী তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। সহসা একদিন সে কোথায় চলিয়া যায়। এই ঘটনার এগার মাস পরে, ভদ্র লোকটী কয়েক জন বন্ধুর সহিত মাঠে বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটী কাক উড়িয়া যাইতে যাইতে দল ছাড়িয়া তাঁহার কাঁধে বসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু। একজনের বাড়ীর দ্বারে একটী কুকুর বাঁধা থাকিত. কেহ দ্বারে আসিলে কুকুরটী চীৎকার করিত। সেইখানে একটী কাকাতুয়া থাকিত, দৈবাৎ কোনদিন কুকুর অনুপস্থিত থাকিলে, আগন্তুক দেখিবা মাত্র পাখীটী কুকুরের স্বরে চীৎকার করিয়া সকলকে সতর্ক করিত। পাখীরা মহিষের মত স্বপ্নে অভ্যস্ত পাঠ উচ্চারণ করে, এবং একটী গান গাইতে গাইতে একটী কথার ভুল হইলে, বার বার উচ্চারণ করিয়া কথাটী মনে করিয়া লয়। মাঝখানের একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, সব কথাগুলি স্মরণ করিতে পারে। নানাপ্রকার প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া কোন কোন জাতীয় পক্ষীকে তিন বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে দেখা গিয়াছে; এবং কোন কোনটীকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে দেখা গিয়াছে। পক্ষীগণ কুলীন ব্রাহ্মণের মত আভিজাত্য-প্রিয়। একদল হংসের মধ্যে একটী বিজাতীয় হংস ছিল, তাহাকে সকলে সঙ্গে লইয়া বেড়াইত, কিন্তু কেহ তাহার প্রণয় প্রার্থনার প্রশ্রয় দিত না। অবশেষে এক বৃদ্ধা হংসী বার্দ্ধক্য হেতু অন্ধ হইলে আশ্রয় অভাবে তাহার আশ্রয় লয়। বিজাতীয় হংসটী অন্ধস্ত্রীর চঞ্চু ধরিয়া সরোবরে লইয়া যাইত, ধরিয়া ধরিয়া সাঁতার দেওয়াইত, আবার যত্ন সহকারে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আপনি স্নানাহার করিত। পক্ষীজাতির স্বজন-প্রিয়তা সামান্য নহে। দলস্থ একটী আহত হইলে, বায়সেরা কি প্রকার কোলাহল করে, সকলেই জানেন। সেই সময় বন্দুক দেখাইয়াও তাহাদের ছত্র ভঙ্গ করিতে পারা যায় না। আবার অনুচরেরা কখন কখন আহতকে লইয়া পলায়নও করে। একা না পারিলে, দুইজনে দুইটা ডানা ধরিয়া লইয়া যাইতেও দেখা গিয়াছে। একজনের বাড়ীতে একটী কাকাতুয়া ও একটী বিড়াল ছিল। একদিন কোন কারণে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। দণ্ড দুই তিন পরে কাকাতুয়া আদর করিয়া "মেনি মেনি" করিয়া ডাকিতে লাগিল। মেনি তখন ছুটিয়া বিবাদ মিটাইতে গেল। যখন খুব কাছে গিয়াছে, তখন কাকাতুয়া এক বাটী দুধ বিড়ালের গায়ে ঢালিয়া দিয়া পাখা বিস্তার করিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। পাখীরা বড় অনুসন্ধিৎসু। যাঁহারা মহাসাগর মধ্যস্থ জনশূন্য দ্বীপে নৌকা মগ্ন হইলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, পাখীগুলা গা ঘুঁটিয়া দেখিয়া যায় যে, এই আগন্তুকেরা কোন জাতীয় পদার্থ। কোন কোন জাতি পক্ষী, খেলিবার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করে। উহাদের লীলাগৃহে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। অবস্থা বিশেষে পক্ষীদিগের কার্য্য কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চঞ্চুদ্বারা খাদ্য দ্রব্য ভাঙ্গিতে না পারিলে, আকাশ হইতে পাথরের উপর ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ করিয়া লয়। অনেকে পরের সঞ্চয়ে উদর পূর্ণ করে, কাঠ-ঠুক্‌রা পাখী দুদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং কোটরের মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ করে। গিলেমট পাখী জলের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাছ গুলি একত্র করিয়া, শেষে একবার ছোঁ মারিয়া অনেকগুলি ধরিতে পারে। অনেক জাতি, পোকার বাসা বা গাছের ফল ধরিয়া নাড়া দেয়; যখন পোকা গুলি দেখিতে আসে, ব্যাপার টা কি, অথবা বীজগুলি ছড়াইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। কোন কোন পাখী পিঠের উপর সন্তান লইয়া উড়িয়া যায়। বন্যায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হওয়াতে, দুইটী কাদাখোঁচা পাখীকে, বাসাটী মুখে ধরিয়া উচ্চতর স্থানে লইয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল। মনুষ্য জানিতে না পারে,এজন্য কোন কোন পক্ষী নীড়চ্যুত নিবার কণা ও বিষ্ঠা পর্য্যন্ত যত্নের সহিত গোপন করে। আফ্রিকাদেশে, একজাতীয় পক্ষী সহস্রে সহস্রে মিলিয়া একটি বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে বাস করে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত, এবং ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে স্বতন্ত্র পরিবার মধ্যে যথেষ্ট আত্মশাসন দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

কল্পনা বিদায়।

১

কল্পনে লো বাল্য-সহচরি,
কোথা যাবি মোরে পরিহরি?
হেসে খেলে দুইজনে
বেড়েছি আনন্দ মনে,
আজি সখি, কেন যাবি তু'রে,
কে আছেরে এ আঁধার পুরে?
তোরি যতনের ধন,
হৃদয় নন্দন বন
শুকায়ে যে যাবে একেবারে?
তবু ছেড়ে যাবি কি আমারে?
সুন্দরি লো, পরাণ তোমার
কেন হেন পাষাণ আকার?

২

সেই কমনীয় দেহ;
কোথা সে বাল্যের স্নেহ?
নির্ম্মমতা এত কোথা শিখিলে স্বজনি,
কেন ছেড়ে যাবি আজি আঁধারি পরাণি?

৩

কাছে আয় বাল্য-সহচরি,
এলাইয়া মোহন কবরী,
সেই পাগলিনী বেশে,
উন্মত্ত-মাধুরী হেসে,
কুসুম-কোমল-স্নেহ আনন্দে বিতরি,
আয় পরাণের কাছে কল্পনার সুন্দরি।

৪

ঢাল সখি, সন্ধ্যার শান্ত্বনা,
ঢাললো ঊষার উদ্দীপনা,
জাগ্রত স্বপন-সুখে
ঢলে পড়ি তোরি বুকে,
ভুলি যত প্রাণের যাতনা!!

৫

তুই বিনে কে আছেরে আর,
বাল্য সখি, কল্পনে আমার,
যাতনার দগ্ধ চিতে
শান্তির সলিল দিতে,
নিরাশায় করিবারে আশার সঞ্চার?
তাই বলি ছেড়ো নাকো সখিগো আমায়।

নবলীলা।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাষাণ গলিল।

গভীর গর্জ্জন করিয়া ফকীর যখন বুঝিল, স্বপক্ষের লোকেরা অরণ্য বেষ্টন করিয়াছে, তখন আপনি 'মঞ্জিল আছানের-রূপ' ধরিয়া, প্রজ্জ্বলিত দীপ হাতে লইয়া অরণ্যে বাহির হইল। মস্‌জিদ হইতে বাহির হইলেই তিন দিকে সেই ঘনীভূত অরণ্য, এক দিকে সেই প্রাচীন দীঘী। মস্‌জিদ হইতে অরণ্যের ভিতরে কোন দিকেই পথ নাই। ফকীর অরণ্য ভেদ করিয়া যাতায়াত করিত বটে—কিন্তু এমনি সঙ্কেতে আসিত যে, কোন প্রকার পদ-চিহ্ন পড়িত না। নূতন লোক মস্‌জিদে আসিলেই অরণ্যে পথ পড়িত। অনাথিনী আর কখনও অরণ্যে যায় নাই। সঙ্কেতও জানিত না, সুতরাং যে দিকে চলিল, সেই দিকেই পথ পড়িল। ছোট ছোট ঘাসের মস্তক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, পরিষ্কার পথ করিয়া দিল। গাঢ় অন্ধকার, অচেনা পথ; বৃক্ষের পাতায় পাতায়, ডালে ডালে, কণ্টকে কণ্টকে, ঠেসাঠেসি হইয়া ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। পদে পদে সেই সকল অনাথিনীর শরীরে আঘাত করিতে লাগিল, তবু উৎসাহে মাতিয়া অনাথিনী অতি দ্রুতবেগে ছুটিল। কণ্টক বিঁধিয়া ও হুহুটের আঘাতে শরীরের অনেক স্থান হইতে রক্ত বাহির হইল। পায়ের নীচে কাঁটা বিঁধিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, শরীরের স্থানে স্থানে চিড়িয়া রক্ত বাহির হইল। কিন্তু কোন দিকেই অনাথিনীর মন নাই। সর্ব্ব শরীরে রক্তের প্রবাহ ছুটিল! মস্তকের রুক্ষ চুল এলাইয়া পড়িয়াছে—গভীর মুখ, সর্ব্ব শরীর রক্তময়! পরিধেয় বস্ত্র ছিড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে,—যাহা আছে, তাহাও রক্তময়। রুক্ষকেশা, রক্তময়ী, বিবসনা কোথায় চলিয়াছে?—কোন্ আশ্রয়ে? আশ্রয় কোথায়?—সহায় কে?—নিজে সে কিছুই জানে না। তবুও দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। এমন দ্রুত যাইতেছে যে, বন্য জন্তু সকল ভয়ে পলাইতেছে, অরণ্যের বৃক্ষ সকলের সকল প্রকার চেষ্টা পরাস্ত হইল, কোন রকমেই অনাথিনীর গতিরোধ হইল না। অরণ্যের যে দিকে নদী, সেই দিকে অরণ্যের পরিসর কিছু অল্প। সৌভাগ্যক্রমে অনাথিনী সেই দিকেই গিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অনাথিনী বারো আনা আন্দাজ অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়াছে; এমন সময়ে, সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে একটী ক্ষীণ আলো দেখা গেল। আলো?—না সুখের স্বপ্ন! অনাথিনীর সর্ব্ব শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে—আর সেই ঘর্ম্ম রক্তের সহিত মিশিয়া সর্ব্ব শরীরকে আবৃত করিয়াছে। সে মূর্ত্তি, ভীষণ মূর্ত্তি;—সে মূর্ত্তি, দুঃখের জ্বলন্ত ছবি;—সে মূর্ত্তি ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিকৃতি! আলো দেখিয়া অনাথিনী ইষ্টদেবতাকে আবার স্মরণ করিল—চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া মাটীতে পড়িল! ইহারই মধ্যে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে, আর একটী আলোক-রেখা বৃক্ষের ভিতর দিয়া আসিল। আলোকের সহিত পায়ের শব্দ পৌঁছিল। পায়ের শব্দে বুঝা গেল, কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে। অনাথিনী ফিরিয়া দেখিল, কে যেন তাহাকেই ধরিতে আসিতেছে। মনে কোন

প্রকার ভয় হইল না। ইচ্ছা করিলে অনাথিনী ছুটিয়া সম্মুখের আলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত, কিন্তু সে ইচ্ছা হইল না, নির্ভয়ে সেই খানে দাঁড়াইল! সে সাহস কথায় চিত্রিত হয় না, সে মূর্ত্তি তুলিকায়ও অঙ্কিত হয় না! অনাথিনী পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, ফকীর উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। ফকীর আর সে ফকীর নাই—উগ্র মূর্ত্তি—ক্রোধাবতার—শরীর ফাটিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। অনাথিনী দূর হইতে বলিল,—"তুমি আসিতেছ, আমি দাঁড়ায়েছি, ভয় নাই, এস, পলাইব না। উপকারী বন্ধুর ভয় কি? এস, কখনই পলাইব না।" স্নিগ্ধ স্বর—বিষাদমাখা ভাঙ্গা স্বর,—পরিশ্রান্ত দুঃখিনীর করুণ স্বর, ফকীরের ক্রোধাগুনে যেন জল নিক্ষেপ করিল। অনাথিনীর নির্ভরের কথা, 'এস, পলাইব না;' ফকীরের প্রাণে বাজিল। যে প্রাণে গরল, সে প্রাণে সুধার ছিট পড়িল। ফকীর আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিল, ভাবিল, ছি, কেমনে ইহার জন্য হৃদয়ে গরল ধারণ করিতেছি? মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভাব হইল। যখন পরিবর্ত্তন হয়, এমনি করিয়াই হয়। এ পরিবর্ত্তন দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রাণে সহিবে কেন? তাহারা যেন জ্বলিয়া উঠিল;—রিপুগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল! বেগ কমিল, কিন্তু তবুও উন্মত্ত ফকীর আপনার ক্রোধের লাগাম টানিয়া একেবারে থামাইতে পারিল না। নিবিতে নিবিতে অগ্নিখণ্ড অনাথিনীর কাছে আসিল। আসিয়া পাগলের ন্যায় অনাথিনীর হাত সজোরে ধরিল, বলিল—পাপীয়সি, কোন্ সাহসে চলিয়াছিস? এত দিন পরে আজই তোর সর্ব্বনাশ করিব!

বৃদ্ধ ফকীর দূর হইতে ভাল দেখিতে পায় নাই, নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া এই কথা বলিল, আর অনাথিনীর সেই বেশ, আর সেই দুঃখমাখারূপ দেখিল।

মানুষের শরীরে বিধাতা রক্ত মাংস দিয়াছেন, আবার হৃদয়ে প্রেমও দিয়াছেন,—রিপু দিয়াছেন, আবার দয়া প্রভৃতি বৃত্তিও দিয়াছেন। সে চিত্র দেখিয়া ফকীরের শরীরের রক্ত মাংস জল হইয়া গেল, হৃদয়-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। দেখিল—অনাথিনীর সর্ব্বশরীর রক্তে ও ঘর্ম্মে প্লাবিত, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, পা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে! গা চিড়িয়া রক্ত পড়িতেছে! কি দৃশ্য! ফকীরের পাষাণ হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। চক্ষু হইতে সহানুভূতি-ব্যঞ্জক অশ্রু, ধারাবাহী হইয়া, পড়িতে লাগিল।

অনাথিনীর হস্ত যখন ফকীর সজোরে ধরিল, তখন অনাথিনীর জ্ঞান আর রহিল না, অচেতন হইয়া ভূতলশায়িনী হইয়া পড়িল।

ফকীর ইত্যবসরে দেখিল, পশ্চাৎদিক হইতে আগুন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর ভাবিবার সময় না পাইয়া, অনাথিনীকে ক্রোড়ে করিয়া, সম্মুখের আলোকের দিকে চলিল। চক্ষু হইতে অলক্ষিত ভাবে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অকূলের তরী!

সেই আলোক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে আসিতেছিল। ধান্‌ক্ষেতের মধ্যে একখানি পান্‌সি নৌকাতে দীপ জ্বলিতেছিল। পান্‌সি নৌকা কোথা হইতে কখন

আসিয়াছে, তাহাতে কে আছে, এসকল আর ফকীর ভাবিতে সময় পাইল না। ক্লান্ত কলেবরে, অশ্রু-প্লাবিত বুকে অনাথিনীকে পুরিয়া দ্রুতবেগে সেই নৌকায় উঠিল। নৌকার মাজীগুলি মুসলমান, ফকীরের বেশ দেখিয়া সেলাম করিয়া বলিল, আপনারা কোথায় যাইবেন?

ফকীরের তখন ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছিল, শ্বাসভাঙ্গা স্বরে বলিল, কোথাও যাইব না, বনে আগুন লাগিয়াছে, তাই তোমাদের নৌকায় প্রাণ বাঁচাইতে আসিয়াছি। কোন ভয় নাই, স্থান দেও; আমি এই মস্‌জিদের ফকীর।

মাজীরা ভয়ে জড়সড় হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ফকীরকে স্থান দিল।

দেখিতে দেখিতে অনেক লাঠিয়াল প্রাণ বাঁচাইতে ধান ক্ষেতে নামিল। অরণ্যের পশ্চিম দিক অগ্রে পূর্ণ হইল, ক্রমে ক্রমে নৌকা পর্য্যন্ত লোকের ভিড় পৌঁছিল। নৌকাখানি পূর্ব্ব কোণে ছিল। লোকের গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসিতে,মৃদু স্রোতের ন্যায়, লোকপ্রবাহ পূর্ব্বকোণে পৌঁছিল। সেই ভিড়ের মধ্যেও একজনের জন্য বিস্তৃত স্থান রহিয়াছে। করালী সেই ভিড়ের মধ্যে রাজরাণীর ন্যায় রহিয়াছে, সাহেব পার্শ্বে। এই লোকপ্রবাহের নীচে জল প্রবাহ, উপরে অগ্নি-প্রবাহ। এতলোকের সম্মুখে অরণ্য পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল; কেহ বাঁচাইল না। কতকালের উৎপন্ন কত কত বৃক্ষ পুড়িয়া অঙ্গার হইতে লাগিল!

নৌকার মৃত্তিকানির্ম্মিত ক্ষুদ্র দীপ ক্রমে নিবু নিবু বোধ হইতে লাগিল। অরণ্যের বড় বড় বৃক্ষে যখন আগুন লাগিয়া উঠিল, তখন সকল আঁধার বিধৌত হইল। দুর্জ্জয় আলোকরাশি ঘনীভূত আঁধারকে ধৌত করিল—সকল পরিষ্কার হইল,—সকল দিক ফর্‌সা হইয়া উঠিল। সেই আলোক-সাগরের নিকটে ক্ষুদ্র দীপালোক আরো ক্ষীণ হইল। চতুর্দ্দিক এমনই হইল, ঠিক যেন দিবসের আলো। সে আলোকে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারিল। ফকীর একটু সুস্থ হইয়া দেখিল, নৌকার চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। দেখিল, লোকের ভিড়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক—অপূর্ব্ব বেশে রহিয়াছে। ফকীর বুঝিল, যাঁহারা মস্‌জিদ্ লুণ্ঠন করিয়া অনাথিনীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল, এ তাহাদেরই দল। ফকীরের হৃদয়ে তখন দয়াস্রোত প্রবাহিত। সে দয়ার নিকট ক্রোধের উদ্দীপনা পরাস্ত হইয়াছে। যে দয়ার অনুরোধে বিপদসাগর হইতে অনাথিনীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই দয়ার উত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই একদিন, আর এই একদিন। স্মৃতি-পটে সে আলেখ্য আর এ আর আলেখ্য মিলিল। ঘনীভূত অরণ্যে আশ্রয়-হীনার সেই জ্যোতি-ভাঙ্গা-রূপ, আর অদ্যকার এই রক্তময় শরীরের বেশ, ফকীরের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত করিল। ফকীর স্নেহভরে করালীকে আসিতে ইঙ্গিত করিল, করালী নির্ভয়ে নৌকার ধারে আসিল। ফকীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি ধন্য, কারণ তুমি ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট করিয়াছ।' করালী চাহিয়া দেখিল, এক অপূর্ব্ব জ্যোতি পাষাণ-হৃদয় ফকীরের সে আলোক-বিধৌত-অশ্রুর ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে। দেখিল, ফকীর উপবিষ্ট, তাহার ক্রোড়ে রক্তপ্লাবিত একটী রমণী—অচেতন অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে। করালী

তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণও অস্থির হইল, অজ্ঞাতসারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। ফকীর বলিল,—তুমি যথেষ্ট করিয়াছ; পুরুষে যাহা পারে না, তুমি সামান্য স্ত্রীলোক হইয়াও তাহা করিয়াছ! এক ভগ্নীর জন্য তুমি জীবনতুল্য মান সম্ভ্রমকেও তুচ্ছ করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলে! তোমার নাম চিরকাল ভগ্নি-স্নেহের আদর্শ হইয়া থাকিবে! আপনার সুখকে এমনি করিয়া পরের জন্য উৎসর্গ করিতে অতি অল্প লোকেই পারে! আমি অতি নরাধম, অতি জঘন্য চরিত্রের লোক! আমি এই বৃদ্ধবয়সে রিপুর উত্তেজনায়, ধর্ম্মের নামে যে পাপ ক্রয় করিয়াছি, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি চিরকালের জন্য ডুবিয়াছি! তোমার চরিত্রের সংস্পর্শে আমার উদ্ধারের কি উপায় হইবে? ভগ্নিকুলে তুমিই ধন্য, তুমি করালী নহ, তুমি কুলকামিনী। এ জীবনে ওনাম আর ধরিও না। ফকীর আবার বলিল,—রাণী কৃপাময়ীও ধন্য। লোকনাথপুরের অধিশ্বরী হইবার তিনিই উপযুক্ত পাত্রী; লোকের কল্যাণের জন্য এমন উদারভাব আর কোথাও দেখি নাই। স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে কৃপাময়ী যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব অপরাধ অপনীত হইয়াছে; কৃপাময়ী স্ত্রীকুলে ধন্য, আমি সকল জানিয়াছি, সকল বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, দৈব বিড়ম্বনায় আমার বুদ্ধি,ধর্ম্ম কর্ম্ম,জ্ঞান, লোপ পাইয়াছিল, তাই এমন সোণার পাখীকে আমার হৃদয়-কারাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। আমি নরাধম—সুলোচনা স্বর্গের পরী, আকাশের চাঁদ—সতী কুলের আদর্শ? এমন জিনিষকে আমি কোন প্রাণে ডুবাইতে চাহিয়াছিলাম? গোরাচাঁদ অপেক্ষাও আমি নরাধম! আর রাখিব না—তোমার জিনিষ তুমিই গ্রহণ কর! তোমার জীবন তোমাকেই দিব, তোমার ধন তোমার কোলেই থাকিবে! তোমার ক্রোড় স্বর্গতুল্য,—এ মন্দার-কুসুম তোমার ক্রোড়েরই উপযুক্ত! গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ফকীর হৃদয়ের আবেগে অনাথিনীকে করালময়ীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিল। ভগ্নীর সে শরীরও নাই, সেরূপও নাই, সকলই গিয়াছে—জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। শরীরে যে কিছু রক্ত ছিল, আজ তাহা সেই অস্থি কয়েক খানিকে প্লাবিত করিয়াছে। কুলকামিনী রক্ত-মাখা কঙ্কালময়ী ভগ্নীকে ক্রোড়ে করিল। সে যে কি ভাবের চিত্র;— সে যে ভালবাসার কি মধুময় চিত্র, সে যে স্বার্থ-ত্যাগের কি মনোমোহন মিলন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না।

কুলকামিনী ভগ্নীকে ক্রোড়ে করিয়া সেই নৌকায় বসিলেন। ভগ্নি-প্রেমের জীবন্ত ছবি, সেই আলোক-প্লাবিত লোক-প্রবাহ দেখিয়া অবাক হইল।

সাহেব দেখিল, করালময়ীর রূপ যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। সে বীর্য্য, সে সাহস, সে অধ্যবসায়, সকল যেন নিমেষের মধ্যে নিবিয়া গেল। স্নেহের অপরাজিত মহিমায় করালময়ী কুলকামিনী রূপ ধরিয়া বসিয়াছেন! অশ্রু-প্রবাহে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গিয়াছে; বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে! সাহেব সে আদর্শ-চিত্র দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে নীরবে ধন্যবাদ দিল।

কুলকামিনীর অনুরোধে, সাহেবও সেই নৌকায় উঠিল, এবং আর যত লোকদের কিছুই

BLEED THROUGH.

তত লোক উঠিল। কুলকামিনীর আদেশে নৌকা লোকনাথপুরের উদ্দেশে খুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিল। নৌকার পশ্চাৎ দিকে নিশানে লেখা ছিল, "রাণী কৃপাময়ীর কৃপাতরী।" সেই নিশান জ্যোতিমাখা পবন-তাড়নে মৃদু মৃদু দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল, নৌকা ধীরে ধীরে ন দীতে পাড়ী ধরিল।

হদ্দ জবাব।

ভাদ্র মাসের নব্যভারত পত্রিকায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক—প্রতিবাদ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা অবশ্যই পাঠকগণ দেখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে আমরা সুযোগ্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর ভ্রান্তমত, অসার যুক্তি ও অসত্য উক্তি সকল যথা সাধ্য প্রদর্শন করিয়াছি। কল্পনার সেপাইগণ দলে দলে কোমর বাঁধিয়া, আসিয়া সত্যগুলিকে গলা টিপিয়া বধ করিতেছে দেখিয়া, আমরা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই; কারণ আমরা জানি যে, একজন লোক যতই জ্ঞানী বা প্রতিভাশালী হউন না কেন, তিনি কখনই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন না যে, তাঁহার মত সত্য এবং অভ্রান্ত। সুতরাং বিষয়গুলি যত সমালোচনার অগ্নিতে পুড়ে, ততই সত্যগুলি খাটি হয়। সেই জন্যই ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সাহিত্য-বিষয়ক সমালোচনা ও বাদানুবাদের এত আদর। আমরাও অমিশ্র ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধারের জন্য তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। সত্যবটে, কোন অপরিহার্য্য কারণ বশত আমাদের প্রবন্ধের শেষাংশের ভাষা একটুকু কর্কশ হইয়াছিল; কিন্তু আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, প্রবন্ধই আমাদের আক্রমণের বড় বিষয় ছিল, লেখককে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই বলি নাই। গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রচারে" কবি বঙ্কিম বাবু আমাদের কথার উত্তর দিয়াছেন কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বে, আমরা তৎসংসৃষ্ট গুটিকতক কথা পূর্ব্বে বলিয়া লই।

বঙ্কিম বাবু বলেন যে, তিনি প্রচার ও নবজীবনে নিয়ম ক্রমে লিখিতেছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মমত সকল আদি ব্রাহ্মসমাজের অভিমত নহে, সুতরাং তিনি আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হন। প্রথম আক্রমণকারী তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিতীয় আক্রমণকারী আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু; ইহাঁরা উভয়ই ধর্ম্ম বিষয় লইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন। তৃতীয় আক্রমণকারীর কথা পরে বলিব, চতুর্থ আক্রমণকারী আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিম বাবু নাকি প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা কহিবার জন্য দ্বাপর যুগের ডিজ্‌রেলীর আশ্রয় গ্রহণ করেন; রবি বাবু সমস্ত বঙ্গবাসীর পক্ষ হইয়া মিথ্যার বিরুদ্ধে নাকি ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহার উত্তর দিতে যাইয়া—স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার ডুরিতে পান্‌সীর গলুয়ে জাহাজের হাল বাঁধিয়া, মিথ্যা কথা কহার অর্থ, সত্য পালন করিয়াছেন। এ কথাটা

আমাদের নিকট কেমন কেমন বোধ হইয়াছে, তাই উল্লেখ করিলাম। নচেৎ রবি বাবুর পক্ষ হইয়া আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক করে না।

তৃতীয় আক্রমণকারী আমি; আমার সঙ্গে পুরাতত্ত্ব লইয়া দুই একটা কথা চলিয়াছিল; ইহার সহিত আদিসমাজের কোন সম্পর্ক নাই। বঙ্কিম বাবু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেখিয়াছেন যে, আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। তবে নিশ্চয়ই আমি আদিসমাজের উত্তেজনায় তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য, নব্যভারতের ভিতর দিয়া, তাঁহাকে ঢিলা পাট্‌খিলাটা মারিয়াছি। ভাদ্রমাসের নব্যভারতে আমার প্রবন্ধটী বাহির হয়, আমি আশ্বিনমাসে সমাজের সহকারী সম্পাদকের ভার প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং পাঠকগণ দেখিতে পাইলেন, যখন আমি এই প্রবন্ধটী লিখি, তৎকালে ঐ কার্য্যের সহিত আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। যে সকল কথা থাকুক। বঙ্কিম বাবু আমাদিগকে কি বলিয়াছেন, শুনুন। তিনি আমাদের, প্রতিবাদের বিন্দুমাত্রও উত্তর দেন নাই; কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধারে নিযুক্ত হইয়া, গুরুর আসনে বসিয়া, 'প্রচারের' (ধর্ম্ম প্রচারের) মধ্যদিয়া, আমাদিগের প্রতি যে সকল সুরুচি-সম্পন্ন, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া গেল। "প্রচারের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামক একজন লেখক ইহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি আদিব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি, ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য নায়েব, কি, কি, আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইহাঁর কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার ২।১ স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন, দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই, কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধের ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। * * * *" আবার বলিতেছেন। "চতুর্থ আক্রমণ আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দ্বারা হইয়াছে। গালি গালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালি গালাজে প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই,—প্রার্থনা মন্দির হইতে আনিয়াছেন। * * * আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছো হাটার ভাষা এত দূর পৌছে না। * * * সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিতেছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে লাগাইতে পারিবার সম্ভব ছিল না।" পাঠক দেখিলেন, আমাদের প্রতি কেমন সুসজ্জিত আইন আদালতের ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি, মুখ্য কথার উত্তর না দিয়া, আমাদিগকে এইরূপ ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই

বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তবে নানা কারণে আমরা বাধ্য হইয়া দুই একটা কথা বলিলাম। বঙ্কিম বাবু জানিতে চাহিয়াছেন, আমি নাএব কি না। সাহিত্যজগতে নাএব বা ডিপুটীর পরিচয়ের কোন আবশ্যকতা দেখি না। আমরা বঙ্কিম বাবুকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে এইরূপ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, গালিগালাজ করিতে দেখিয়া আমাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। তিনি আমাদিগকে অযথা গালি দিয়াছেন, তাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে কিছুই বলিতে চাহি না। তিনি বিজ্ঞ, তিনি জ্ঞানী, তিনিই এই বিষয় বিচার করিবেন। হাতে লিখনি ধারণ করিলে সকলেই, আর কিছু পারুক আর না পারুক, অন্তত গালি দিতে পারে। আমরা ঐ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া লেখনীকে কলুষিত করিতে চাই না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। পতাকা—সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র; শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে;—প্রায়ই চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে। প্রবন্ধ সকলের রুচি মার্জ্জিত, ভাব উদার, ভাষা সহজ-বোধ্য।

২। চিকিৎসা সম্মিলনী—মাসিক পত্রিকা, ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির ও কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। সহজ বাঙ্গলায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকা খানি দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়, আমরা ইচ্ছা করি।

৩। অষ্টাঙ্গ হৃদয়—মহামতি বাগ্‌ভট প্রণীত চিকিৎসা সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাগ্‌ভট সর্ব্বাদিম সংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহাতে যে আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় মূল গ্রন্থের সারভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক সূত্রে গ্রথিত নয়, এই ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার বশত অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও এই শাস্ত্রের প্রতি বিরক্তি দেখা যায়। চঞ্চলতাই এই কুসংস্কারের কারণ। দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান, দেশীয় ভাষায় বিশুদ্ধ রূপে প্রচলিত না হইলে, এই সংস্কার কখনই দূর হইবে না। এই জন্য, যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের বঙ্গানুবাদ সুন্দর হইতেছে।

৪। মোক্ষমূলর কৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি।—শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও মালাবারি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ পুস্তক খানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের আদি ভূমি, এই ভূমিতে ধর্ম্ম কিরূপে উৎপত্তি হইয়া কিরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা সবিস্তার রূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই।

৫। বিবিধ-সন্দর্ভ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত; বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন হইতে সংগৃহীত। এখানি বাঙ্গলা ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাঙ্গলা ভাষায় ভাল পাঠ্য পুস্তক নাই বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পুস্তক খানি পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল,—আবেগপূর্ণ,—উৎসাহপূর্ণ। প্রবন্ধগুলিতে শব্দাড়ম্বর নাই—অর্থ,শূন্য-কথা নাই,—ভাবশূন্য পদ নাই। প্রবন্ধ সকলের রুচি মার্জ্জিত,ভাব সংস্কৃত। এরূপ পুস্তকের সর্ব্বত্র আদর হওয়া প্রার্থনীয়।

৬। ভাব-সঙ্গীত।—শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত। বিনামূল্যে বিতরিত। ইহাতে অনেক গুলি ভাবপূর্ণ সঙ্গীত আছে; কিন্তু বর্ণাশুদ্ধি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইল।

৭। গৃহ-লক্ষ্মী—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। শুনিয়াছি, এই পুস্তকের অত্যন্ত আদর হইয়াছে;এই কারণে এই পুস্তকের দোষের উল্লেখ না করি, এই জন্য বিশেষ রূপ অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এ পুস্তকে প্রশংসার কথাও আছে, নিন্দার জিনিষও আছে। একের উল্লেখ করিতে পারিলাম না বলিয়া, অন্যের উল্লেখও করিলাম না তবে একথা না বলিয়া পারিলাম না যে, নির্লজ্জের ন্যায় গ্রন্থকার আপন পুস্তকের প্রশংসা আপনিই করিয়াছেন।

৮। গৃহিণীর কর্ত্তব্য।—শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা আজ কাল শিক্ষা-তৃষিত হইতেছেন; এই সময়ে তাঁহাদের জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু উপদেশ কি সকলেই দিতে পারে? আজ কাল যাঁহারা অবলাবান্ধব, অবলা-গুরু বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাঁহাদের এই একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে সকল উপদেশ সাধারণত রমণীগণের অবোধ্য, সে সকল উপদেশ না দিলেই ভাল হয়। গৃহিণীর কর্ত্তব্য মোটের উপর মন্দ হয় নাই। শিবনাথ বাবুর গৃহধর্ম্ম এই সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ, আমাদের মতে, গৃহিণীর কর্ত্তব্য সাহিত্য-জগতে তাহার পরে স্থান পাইবার যোগ্য। পুস্তক খানির ভাষা এবং ছাপা ভাল হয় নাই।

৯। চারুনীতি পাঠ।—শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। গ্রন্থকার নীরস সত্য প্রচার না করিয়া, দৃষ্টান্তের সাহায্যে নীতি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া, বাস্তবিকই বঙ্গ সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ পুস্তকের বিশেষ অভাব আছে।

১০। সাধক-জীবনী—চৈতন্যচরিত। শ্রীবেণীমাধব বকৃসী দ্বারা প্রকাশিত। চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত যত সংগৃহীত হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু নূতন কোন কথা সংগ্রহ না করিয়া, এক খানি নূতন জীবন-চরিত প্রকাশ করিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা বঙ্গ ভাষায় এক খানি অমূল্য গ্রন্থ। এই চৈতন্যচরিত তাহার সংক্ষিপ্ত সার মাত্র। চিরঞ্জীব শর্ম্মার গ্রন্থের ন্যায় তত হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। আমরা গ্রন্থকারের এরূপ গ্রন্থ রচনার চেষ্টার প্রশংসা করিতে পারি না।

১১। শিশু কবিতা—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। ভাষা সরল। যে উদ্দেশ্যে লিখিত, গ্রন্থকারের সে উদ্দেশ্য সফল হইলে আমরা সুখী হইব।

১২। শরৎকুমারী বা আদর্শ বঙ্গ-মহিলা।—বণিকযন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। শরৎকুমারীকে আদর্শ

বঙ্গমহিলা না বলিলে আমরা সুখী হইতাম, কারণ, যাহাকে তাহাকে আদর্শ বলিলে, এ-কথাটার প্রকৃত সৌন্দর্য্য থাকে না। গ্রন্থকারের ভাষা ও লেখার অপরিপক্কতা দেখিয়া বোধ হইল, লেখক নূতন ব্রতী; তাঁহাকে আমরা নিরুৎসাহিত করিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, পুস্তকখানিকে ভাল করিয়া সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করা উচিত ছিল।

১৩। বঙ্গ-গৃহ।—শ্রীসীতানাথ নন্দী, বি, এ, প্রণীত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। সীতানাথ বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির নিকট যাহা আশা করা যায়, তাহা এ পুস্তকে না পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সরোজিনীর কাহিনী পড়িয়া হিন্দু সমাজের প্রতি বিরক্তি জন্মেনা, কিন্তু সরোজিনী ও সতীশের প্রতিই ঘৃণা জন্মে। সরোজিনীর স্বামীর চরিত্রের বিশেষ দোষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই, এরূপ স্থলে সতীশের অনুরাগ-বিষকে হৃদয়ে পূরিয়া রাখিয়া, আত্মীয়স্বজনের মনে দারুণ কষ্ট দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? স্বাধীনতা স্বর্গের জিনিস, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা নহে। সরোজিনীর সেই অল্প বয়সে, ভাল মন্দবুঝিবার শক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছিল; সেই সময়ে আত্মীয়দিগের মতকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সরোজিনী স্বেচ্ছাচারিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন-বিবাহ প্রথা বাঙ্গলায় প্রচলিত নাই বলিয়া যে, বাঙ্গলায় ভগ্নী-স্নেহ, কন্যা-স্নেহের অভাব আছে, আমরা তাহা মনে করি না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক পিতা মাতা কার্য্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভালবাসার অভাব নাই। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন,—অপরিপক্ক বয়সে বর কন্যার উপরে বিবাহের সম্পূর্ণ মতামতের ভার না রাখিয়া, পরিণত-বুদ্ধি স্বার্থচিন্তা-বিবর্জ্জিত অভিভাবকদিগের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত। সে যাহা হউক, যে পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও বিশদরূপ হয় নাই। শুনিলাম, এই গ্রন্থখানি মেরি-কার্পেণ্টার-গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমরা যতদূর জানি, মেরিকার্পেণ্টার-গ্রন্থাবলী বঙ্গমহিলাদের জন্যই প্রচারিত হইয়া থাকে। বঙ্গগৃহ, অভিভাবকেরা পাঠ করেন, করুন, বঙ্গমহিলাদের কখনই পাঠ করা উচিত নহে। এরূপ স্বেচ্ছাচার-পূর্ণ প্রেম-বিচ্ছেদময় গ্রন্থপাঠে মহিলাদের কোনই উপকারের সম্ভাবনা নাই। যে সে পুস্তককে এই গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিলে, হিন্দুসমাজের লোকের মনে দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইবে। আমরা কর্ত্তব্যের কঠোর অনুরোধে এ সকল কথা না বলিয়া পারিলাম না। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর হইয়াছে; ছাপা পরিষ্কার হইয়াছে।

১৪। নারী-নীতি—শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। উপদেশগুলি সমস্তই হিন্দুধর্ম্মনীতির অনুমোদিত। মন্দ হয় নাই; কিন্তু ভাষা বড়ই কঠিন ও কর্কশ হইয়াছে।

১৫। মিশর যাত্রী বাঙ্গালী—শ্রীশ্যামলাল মিত্র প্রণীত। এই গ্রন্থখানি সাহিত্য-সংসারের এক উজ্জ্বল রত্ন। এরূপ সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর হয় নাই।

১৬। বিজ্ঞান প্রবেশ,—শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভাষা সরল; বৈজ্ঞানিক মতগুলি আধুনিক।

১৭। গৃহ-মুকুর।—রুচি অতি জঘন্য।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ।

যে সময়ে শাক্যসিংহের অভ্যুদয় হয়, তখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে এবং দক্ষিণাপথের প্রধান অংশে, আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল;—দুর্ভেদ্য জঙ্গল, এবং দুস্তর প্রবাহিনী অতিক্রম করিয়া আর্য্য সন্তান চারিদিকে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আর্য্যগণের এই আধিপত্য বিস্তার সে সময়েও অল্পদিনের নহে। কেন না, তখনও তাঁহারা অনার্য্যদিগের সহিত এত ঘনিষ্ঠ যে, অনার্য্যেরা তাঁহাদিগের আনুগত্যে বিকৃত হইয়াছে, আর্য্য আচার ব্যবহার, আর্য্যধর্ম্ম কর্ম্ম তাহারা অনুকরণ করিয়াছে। এবং উভয় জাতির কুটুম্বিতা সম্বন্ধে, কোন কোন স্থানে শঙ্করবর্ণ, শঙ্করাচার ও শঙ্কর ধর্ম্ম পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যে এই শঙ্করতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাই মগধে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও প্রতাপ এত অধিক হইয়াছিল।

বৈদিক ধর্ম্মের পবিত্রতা পঞ্চনদে যত যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল, এমন আর কোথায়ও নহে। ভারতবর্ষে আর্য্যগণের প্রথম উপনিবেশ পঞ্চনদে স্থাপিত হইয়াছিল, পবিত্র সলিলা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সৈকত পুলিনে অধিকাংশ বৈদীক ছন্দব্রাহ্মণের জন্ম। পঞ্চনদ সহজে সে ঋক্‌সঙ্গীত বিস্মৃত হইতে পারে নাই। মগধে যখন জাতি বিভেদাদির কঠোরতা, স্বর্গের কমনীয়তা ও অবাচীর ভীষণতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল; তখনও পঞ্চনদবাসী অকলঙ্কিত-শোণিত আর্য্যসন্তান, সেই সরল কৃষি-জীবীর বৈদিক ধর্ম্ম, অগ্নি, বৈশ্বানর, বায়ু পর্জ্জন্য উষা ও অদিতির গুণগান করিয়া পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

পঞ্চনদ ভারতবর্ষে আর্য্য সন্তানের প্রথম উপনিবেশ। সে রাজ্য তখন আফগানস্থান-বাহিনী কুভা (কাবুলনদী) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহারও উত্তর দিগবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড আর্য্য সন্তানের প্রথম বাসস্থান। চক্ষুযানদী ও কাশ্যপ সমুদ্রের পূর্ব্ব, কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিম, কুভা এবং পঞ্চনদের উত্তরে এইদেশ অবস্থিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে, এই স্থানকে, উত্তরকুরু প্রভৃতক বা আর্য্যবাস নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ প্রাচীন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজ্য অন্বেষণে দিকদিগন্তে ধাবমান হন, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বিভিন্ন দেশ-প্রচলিত আর্য্য ভাষার সমালোচনা করিলে জানা যায়, সেই প্রাচীন আর্য্যখণ্ডবাসী আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যেও প্রকৃতি-পূজা প্রচলিত ছিল, অগ্নি আদিম সমাজের প্রধান আয়ুধ, পশুতাড়না নিবারণের প্রথম উপায়, জীবসমাজে নর-সন্তানের মহত্বের প্রথম লক্ষণ। অগ্নি-আর্য্যনিবাসের রক্ষাকর্ত্তা, কৃষ্ণত্বচ অসুরগণের তাড়য়িতা। যখন আর্য্য-সমাজে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয় নাই, তখনও অগ্নি বৈশ্বানরের উপাসনা আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল। অগ্নির ন্যায় সূর্য্য সহজেই আদিম সমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। অন্ধকারে নানা প্রকার বিপৎপাতের সম্ভাবনা। দুর্ভেদ্য জঙ্গলবাসে, অনার্য্য অরাতিগণ, অন্ধকারের সুবিধা পাইয়া, ধনপ্রাণ সর্ব্বনাশ করে;

তদপেক্ষা ভীষণতর শ্বাপদগণ অকুতোভয়ে আক্রমণ করিয়া, সন্তান সন্ততি, পালিত পশু বা ক্ষেত্রের শস্য সকলই বিনাশ করে। তাহাতে আবার সেই অন্ধকারে অগ্নি প্রজ্বালন ভিন্ন অন্য উপায় বনবাসীর নিকট অজ্ঞাত। কাজেই ভয়-প্রবণ আদিম আর্য্য, নিশাকে সন্তুষ্ট রাখিতে, সাধ্যমত পূজা করিত। কিন্তু তাঁহাদিগের কাছে সর্ব্বশঙ্কা-বিনাশিনী, সুখময়ী সুন্দরী ঊষা, এবং তাঁহার দয়িত দিবাকরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দেবতা ছিলেন। ঊষাও সূর্য্যের গুণগানে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ উন্মত্ত হইতেন। অগ্নি, বৈশ্বানর, ঊষা, সূর্য্য, নিশি ও দিবার ন্যায়, তাঁহারা চন্দ্র, তারা, মরুৎ, বরুণ, বাত ও পর্জ্জন্যেরও পূজা করিতেন। প্রাচীন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, দিক্‌বিদিক্ প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, আর্য্যগণ পিতৃ দেবতাদিগকে ঋভুনামে পূজা করিতেন। পিতৃপূজা, ধর্ম্মবিকাশের প্রথম সোপান হইলেও, ধর্ম্মবিবর্ত্তনের সকল স্তরেই অল্প বা বহু পরিমাণে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সমাজিক অবস্থা অনুসারে, ধর্ম্ম বিকাশের বিভিন্নতা শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়, তবে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বনচারী অবস্থায় পিতৃপূজা, কৃষিজীবনে প্রকৃতি-পূজা এবং বণিকজীবনে প্রেমময় একেশ্বর পূজা, প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যজাতি কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বনচারী অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল, বলা যায় না। যখন আর্য্য সমাজে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয় নাই, তখনও তাহারা কৃষিজীবী। তখনও তাহারা পরিবার বদ্ধ হইয়া, ভাই ভগ্নী, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী, দেবর, শ্বশুর শ্বশ্রূ, স্নুষা জামাতৃ ও নপ্তৃনপ্তী প্রভৃতিসহ একত্র সুখে বাস করিত। বনবাসীগণ তখন বর্ব্বর নহেন; তাঁহারা হললাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া যবাদি শস্য উৎপাদন করিতেন, গোমুখ সারমেয় হরিণ অশ্ব মেষ অজা শূকর গর্দভ প্রতিপালন করিতেন, বস্ত্র পরিধান করিতেন, পাত্রে করিয়া আহার্য্য সামগ্রী সুপক্ক করিয়া লইতেন; শস্যচর্ণ বা জীর্ণ করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিতেন, দ্বারসংযুক্ত সুন্দর গৃহে বাস করিতেন, লৌহ রজত প্রভৃতি ধাতু ব্যবহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। এমনকি, শত্রু শাসনার্থে ধনুর্ব্বাণ ভিন্ন, অসি পরশু প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিতেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বর্ব্বরদিগের ন্যায় কণ্টকশঙ্কুল বন মধ্যে গতায়াত করিতেন না। সে সমাজে যথেচ্ছাচার ছিল না, বিশ-পতি (রাজা) সকলকে সুশাসনে শাসিত করিতেন। অদ্যাপি কত অনার্য্য জাতি দুই তিনটী পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা করিতে পারে না, কিন্তু সেই প্রাচীন আর্য্য সমাজের সন্তানগণ একাদিক্রমে এক শত গণনা করিতে পারিতেন; পদার্থ সকলের এক একটী নাম নির্ব্বাচন করিতেন, আবার একতা স্থাপনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, একজনে যে নাম, যে সংখ্যা, যে সত্য উদ্ভাবন করিতেন, সমগ্র আর্য্য সমাজ একবাক্যে তাহাই গ্রহণ করিত। যাঁহারা মানব প্রকৃতির মানসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, আদিম বন্য অবস্থা হইতে বিচ্ছেদের পূর্ব্বের আর্য্যসমাজ কত উন্নত ছিল।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশে, উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর, আর্য্যগণ, মানসিক ও সামাজিক অবস্থার আরো উৎকর্ষ সাধন করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। উত্তরকুরু ও সপ্তসিন্ধুর প্রাকৃতিক অবস্থা স্বতন্ত্র; উত্তরকুরু শীতপ্রধান, সপ্তসিন্ধু গ্রীষ্ম প্রধান। উত্তরকুরুর মালক্ষেত্র অনুর্ব্বরভূমি, কিন্তু সপ্তসিন্ধু নদী-মাতৃকা, উর্ব্বরতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। অবকাশ, চিন্তাশীলতার জনয়িত্রী; চিন্তাশীলতা, উন্নতির প্রসূ। উত্তরকুরুর মালক্ষেত্র, পশু চারণের পক্ষে উপযোগী বটে, কিন্তু কৃষিজীবীর পক্ষে তাদৃশ সুবিধাজনক নহে। সপ্তসিন্ধুর জঙ্গল উৎছন্ন করিলে অগ্রসর ভূমি খণ্ডে বহু পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারিত, গোচারণের প্রশস্ত প্রান্তর কোথায়ও মিলিত না। উত্তরকুরু প্রদেশে আর্য্যগণ, অনার্য্যদিগকে প্রতিবাসী বিবেচনা করিতেন, কিন্তু, আর্য্যাবর্ত্তে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, অনার্য্যদিগকে অরাতিরূপে গণ্য করিতেন। শত্রুর প্রতি ঘৃণা সহজসিদ্ধ, শত্রুর আচার ব্যবহার সকলই নিন্দনীয়। পরাজিত দাসের সহিত মিত্রতা অবমান-সূচক। শত্রুমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া, শত্রুতা নিবারণ ধন সম্পত্তি রক্ষার এবং প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, আর্য্যদিগকে তাহার সকলই করিতে হইয়াছিল। সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনে আর্য্য জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন অঙ্গ বা উন্নত, কোন অঙ্গ বা অবনত হইয়া পড়িল। স্থান ও সমাজ গুণে কালক্রমে একই বংশীয় আর্য্য সন্তানের মধ্যে এত পার্থক্য জন্মিয়াছে যে, রোমক ও গ্রীক্, কেল্‌ট ও টিউটন, লিথুনীয় ও পারশিক প্রভৃতি জাতি যে, ভারতবাসী আর্য্যগণের জ্ঞাতি ভ্রাতা, একথা কে বিশ্বাস করিবে? বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন অবস্থায় বাস করিয়া, একই বংশীয়গণের প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যগণের সমাজ ও ধর্ম্ম-বিবরণ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা যখন সপ্তসিন্ধু প্রবেশ করেন, তখন নিবিড় জঙ্গলে সপ্তসিন্ধু পরিপূর্ণ ছিল। অরণ্যানী অগ্নিদগ্ধ করিয়া বনভূমির উপকণ্ঠে, কিয়ৎ পরিমাণ ভূখণ্ড পরিষ্কৃত করিয়া, আর্য্যসন্তানগণ সেই স্থানে একত্র বাস করিতেন। অল্পকাল মধ্যে একটী উপনিবেশ শতধা হইয়াছিল; অথবা নূতন নূতন সম্প্রদায় উত্তরকুরু হইতে আসিয়া, নূতন নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন সূক্ত সকলে, দূর দূর গত বিভিন্ন রাজার অধীনে, বিভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা কখনও বা পরস্পরের মধ্যে এবং কখনও বা অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রামাদি করিতেন। শত শত আর্য্যগ্রাম ও আর্য্যপুরী সংস্থাপিত হইয়াছিল। যেখানে বাস নির্দ্দিষ্ট হইত, সেই স্থানের সুবিধা এবং উপাদানের সুলভতা অনুসারে, মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা বাস করিতেন। মৃত্তিকা অগ্নি দগ্ধ করিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ করিবার প্রক্রিয়া তাঁহাদের অনবগত ছিল না;—কেন না—স্তম্ভদ্বার, এবং বাতায়ন-শোভিত সুপ্রশস্ত রাজপ্রাসাদাদির অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজধানী সকল, দুর্গের ন্যায় সমকেন্দ্র করিয়া, প্রস্তর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হইত। রাজাদিগের অধীনে পুরপতি ও গ্রামণিগণ, নগর ও গ্রাম সকল শাসন করিতেন, তাঁহাদিগের ও সেনানীগণের গৃহ-সৌষ্ঠব বড় সামান্য রকম ছিল না।

উত্তরকুরুর শীতপ্রধান দেশে মৃগত্বক ও মৃগলোমে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, আর্য্যগণ দেহ আচ্ছাদন ও শীত নিবারণ করিতেন। সপ্তসিন্ধুর গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত চিক্কণ বস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। সপ্তসিন্ধু দেশে অদ্যাপি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কার্পাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে আর্য্যগণ কার্পাশ বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিয়াছিলেন। পুরুষগণ উষ্ণীষ ও উত্তরীয় এবং রমণীগণ কঞ্চুক ব্যবহার করিতেন। সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে, লৌহ, রজত, তাম্র ও সুবর্ণের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মুক্তাদি বিবিধ রত্নে অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। তাঁহারা সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া, বিনিময়ের সৌকার্য্য সাধন করিবার উপায় শিখিয়াছিলেন। নিষ্ক নামে এক প্রকার কাঞ্চন মুদ্রার উল্লেখ ঋগ্বেদের প্রাচীন মণ্ডলে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতদিন আর্য্যগণ, জ্ঞাতি কুটুম্ব মিলিয়া, সমানে সমানে উত্তরকুরু প্রদেশে বাস করিতেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। যখন বিজয়ীর বেশে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, অনার্য্যদিগকে পদানত করিয়া অনার্য্যমণ্ডলে আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তদবধি বিজেতা ও বিজিত, দ্বিজ ও শূদ্র, এই দুইটী জাতি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়াছিল। কালক্রমে, যাহারা সমরকুশল, বলিষ্ট ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, তাহারাই সমাজ মধ্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। যে সময়ে সর্ব্বদা বিবাদ কলহের সম্ভাবনা থাকে, সে সময়ে যোদ্ধৃগণের সমাদর অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধে যাহারা নেতা, তাহারা সাধারণ যোদ্ধৃগণ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত; সেনাপতি ও ও সৈন্য কখনও সমপদস্থ হইতে পারে না। সাধারণ লোককে সে সময়ে বিশ বলিত। এই সময়ে, ক্ষত্রিয়গণ, সর্ব্বপ্রধান; সাধারণ লোকেরা ও বৈশ্যগণ তাহাদিগের নিম্নে। আর্য্য সমাজ, এই সময়ে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, এই তিন জাতিতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ নামে স্বতন্ত্র একটী পুরোহিত শ্রেণী তখনও ছিলনা। সকলে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করিত, পারিবারিক কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইলে, পরিবারের জ্যেষ্ঠকে তাহা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কালক্রমে যতই ধর্ম্ম কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ছন্দোমন্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ লোকের দুরধিগত হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনার্থ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে রাজ সরকারে যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ এক এক জন পুরোহিতের আবশ্যক হয়। ইহাঁরাই বৈদিক ঋষি। পক্ষান্তরে যুদ্ধাদির আবশ্যকতার যত হ্রাস হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয়গণের সমাদর তত অল্প হইতে লাগিল। এই সময়ে, ব্রাহ্মণগণ, এক দিকে রাজান্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সাহায্যে, ক্ষত্রিয়গণের, অপরদিকে জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ করিয়া, সাধারণ বৈশ্যগণের সমাজে সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ সকল যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি ছিল। কোথায় কোথায়ও শঙ্কর বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধ হয় অথর্ব্ববেদ আর্য্য-শূদ্রদিগের শাস্ত্র।

বৈশ্যগণ, আবশ্যক মত, যুদ্ধ করিত, নতুবা কৃষিকার্য্যেই তাহাদের দিন পাত হইত। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, তন্তুবায়, প্রভৃতি নানা ব্যবসায়াবলম্বী লোকের উদয় হইয়াছিল। সে প্রাচীন সময়ের শ্রম বিভাগ পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অন্তর ও বহির্বাণিজ্য সামান্য রূপ ছিল না। পোতারোহণে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া, তখনও আর্য্য সন্তান বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুসরণ করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সপ্তসিন্ধু দেশে সে সময়ে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এক রাজ্য হইতে অন্যরাজ্যে যাইবার জন্য, প্রসস্তবর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছিল। এক একটী উপনিবেশে এক এক জন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন, প্রত্যেক দরবারে পুরোহিত, দূত, মাগধ ও প্রণিধি থাকিতেন। রাজার অধীনে সেনাপতি সুরপতি ও গ্রামণীগণ, সেনা, নগর ও গ্রাম শাসন করিতেন। অপরাধীর রীতিমত বিচার হইত। বংশ পরম্পরায় শ্রুত, শাস্ত্র বা ঋত অনুসারে, দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা হইত, প্রজা খাজনা দিত, রাজা প্রজাকে রক্ষা ও পালন করিতেন। অসভ্য সমাজোচিত বহু বিবাহ তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই, রাজ পরিবারে বহু বিবাহ করিবার রীতি ছিল। কখন কখন সয়ম্বর প্রথানুসারে রাজকর্ম্মচারীগণের বিবাহ হইত। সাধারণ লোকের মধ্যে বিধবার বিবাহ হইত। সেনাপতিগণ রথী, পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেন। যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তাঁহারা অগ্নিবৈশ্বানরকে সম্মুখে লইয়া, শত্রু যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। বৈদিক সময়ের আলোচনা করিবার সময়, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ ও ব্রাহ্মণ সকল রচিত হইতে শত শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। যে সময়ে ব্রাহ্মণ সকল রচিত হইয়াছিল, তখন আর্য্যসেনা, যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা হস্তে প্রবেশ করিত। যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রেরও উন্নতি হইয়াছিল, ধনুর্ব্বাণ ভিন্ন পরশু, অসি, তোমর, গদা, চক্র ভল্ল, খদি প্রভৃতি বিভিন্ন অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোদ্ধৃগণ বর্ম্মও ব্যবহার করিত।

যুদ্ধ বিদ্যায় ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ অসামান্য উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ সেই রূপ জ্যোতিষ, আয়ুর্, গণিত, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার অদ্ভুত আলোচনা করিয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্র সে সময়ে তাঁহারা কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, কিছু পরেই দেখা যাইবে।

বৈদিক সমাজের এই চিত্র অতি অসম্পূর্ণ। শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া উত্তরকুরু সমাজের যে অস্ফুট চিত্র আমরা অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার সহিত তুলনা করিলে যাইবে, সপ্তসিন্ধু সমাজের অবস্থা কত উন্নত। কিন্তু সামাজিক ক্রমবিকাশ যত শীঘ্র হয়, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ তত শীঘ্র হয় না। উত্তরকুরু ও সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যগণের আধ্যাত্মিক অবস্থার পার্থক্য তত অধিক, নহে। উত্তরকুরু সমাজে পিতৃ ও প্রকৃতি-পূজা প্রচলিত ছিল। সপ্ত সন্ধুবাসী আর্য্যগণ প্রকৃতি-পূজা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিন্তাশীলতা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল, কূট রহস্যের আলোচনায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, অস্পষ্ট অননুভূত ভাবে কেহ কেহ, এক ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাও বলা আবশ্যক যে, বৈদিক হিরণ্যগর্ভ "যোদেবেষু আদি দেবঃ একঃআসীৎ" আমাদের বর্ত্তমান ঈশ্বর নহেন। এক এক সূক্ত

যেমন অদ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভের আভাষ পাওয়া যায়, সূক্তান্তরে আবার নানা দেবতার পূজাও দেখা যায়। এক জন ঋষি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা, ভৌম ব্যোম এবং স্বর্গীয়, তিন সমভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতার হিসাবে, অগ্নি, সোম, পর্জ্জন্য, মরুৎ, অশ্বিন, সূর্য্য, ঊষা, বরুণ প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবগণকে গণনা করা হয় নাই। আর এক জন ঋষি, দেবতার সংখ্যা তিন সহস্র, তিন শত, একোণ-চল্লিশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সহস্র সহস্র দেবতা প্রত্যেকে স্বাধীন, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। তথাপি দেবমণ্ডলীতে শ্রেণী বিভাগের উদ্যোগ করা হইয়াছিল। উত্তরকুরু মণ্ডলে পিতৃ বা ঋভুগণ, প্রাকৃতিক দেবতাদিগের সমতুল্য ছিলেন। বৈদিক সমাজে ঋভুগণের সমাদর অসামান্য ছিল। তথাপি প্রাকৃতিক দেবতাগণের অনেকে যতদিন [illegible] অধিকার করিয়াছিলেন। স্থান ভেদে দেবতাদিগকে, ভৌম, ব্যোম ও স্বর্গীয়, এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত। অগ্নি ভৌম দেবতা, মরুৎ ব্যোম দেবতা, সূর্য্য স্বর্গীয় দেবতা; প্রকৃতিগুণে, মরুৎ সূর্য্য বৈশ্বানর ক্রমে সোম ও বরুণের ঊর্দ্ধে উঠিতেছিলেন। যে ইন্দ্র আধুনিক হিন্দু দেবতার রাজা, সপ্ত সিন্ধু মণ্ডলে তাঁহার জন্ম; উত্তরকুরু প্রদেশে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান হিন্দু দেবতাদিগের উপর ইন্দ্রের যে আধিপত্য, বৈদিক সমাজেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। তথাপি কাহাকেও স্পষ্টরূপে উচ্চ সিংহাসন দেওয়া হয় নাই। এখনও ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সিংহাসনে বসাইতেন। এবং বিভিন্ন আর্য্য-রাজ্যে, বিভিন্ন পুরোহিত, আপন রুচি ও বিশ্বাস অনুসারে, বিভিন্ন দেবতাকে অধিকতর সম্মান করিতেন, কিন্তু কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সকল দেবতাই সমগুণ বিশিষ্ট ছিলেন।

বৈদিক আর্য্যগণ বলদৃপ্ত বিজয়ী, তাঁহারা নূতন দেশে নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সুখের পরিবার, সুখের সংসার, সুখের রাজত্ব; পৃথিবী তখন প্রফুল্লতাময়ী। জীবন তখন আনন্দের উৎস। ভৌতিকতা, মায়া, নশ্বরতা প্রভৃতি দুশ্চিন্তা হৃদয়ে জাগ্রত হইবার কোন অবসর পায় নাই। দেবগণ আনন্দপূর্ণ, দেবতাদিগের সহিত সুখের সম্বন্ধ। এস বস খাও লও, কিছু দিয়া যাও, এই রূপ মিত্র কথায় তাঁহারা দেবতাদিগকে উপাসনা করিতেন। যে দেবতার প্রকৃতি কিছু রুক্ষ দেখিতেন, পায়স পিষ্টক ও সোমরস উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। পাপ বা নরক, এ সকল কুকথা সে আনন্দ বাসরে উদ্ভূত হয় নাই। দেববাস স্বর্গভূমি, তখন অধিকতর সুখ বিভবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অমরত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তা তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। মৃত্যু চিন্তা, পাপভয়, পুণ্য, পরকাল ভাবনা, দীনতার লক্ষণ। যখন দারিদ্র্যের পদাঘাতে পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, তখনই হৃদয়ে এ সকল দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়। বৈদিক সময় আনন্দময়, দেবতা আনন্দময়, আনন্দময় আর্য্য সন্তান। 'আনন্দং ব্রাহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনঃ।' তথাপি যে, কেহই আত্মার অমরত্ব পরকাল ও পাপপুণ্যের চিন্তা করে নাই, এমন নহে। এক শতাব্দীর লোক, যাহা ভাবে নাই, অন্য শতাব্দীর লোক তাহা ভাবিয়াছিল। আনন্দময় সংসারে আনন্দোৎসব নিত্য-

ঘটনা। বৈদিক রমণীর সহস্র ব্রতের ইয়ত্তা ছিল না; বৈদিক পুরুষ, পাক্ষিক, মাসিক, চতুর্মাসিক, বাৎসরিক, কত যজ্ঞই যে করিতেন, কে সংখ্যা করিবে? যখন 'আনন্দ রহো' সকলের আশীর্ব্বাদ, তখন জ্ঞাতি বন্ধু লইয়া উৎসব করিবার জন্য সহস্র ক্রিয়া কলাপের উদ্ভব। বৈদিক সমাজ কর্ম্মকাণ্ড পূর্ণ, তখন সন্ন্যাস পরিব্রজ্যার জন্ম হয় নাই। তখন বৈরাগ্যের কোন কারণ ছিল না। ব্রাহ্মণ সকল বৈদিক ক্রিয়া কলাপের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বৈদিক যুগ, কর্ম্মকাণ্ডের যুগ; জ্ঞান কাণ্ড পরে আসিতেছে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

শোক।

সকলকেই এ জগৎ সংসার হইতে পর্য্যায়ক্রমে এক দিন বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, এ সত্য নিত্য-প্রত্যক্ষ এবং অবিসম্বাদী। কেহই ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিতে অক্ষম নহেন। কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি অজ্ঞ, কি জ্ঞানবান্, কি নির্ব্বোধ, কি বুদ্ধিমান্, সকলেরই নিকট এ সত্য সমান সমুজ্জ্বল। কিন্তু জীবনে ক্রমাগত দেখিয়া, শুনিয়া, ভুগিয়া ও বুঝিয়া, এই সত্য আমাদের নিকট যতই অমোঘ বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, আমরা তথাপি শোকে কাতর হই। কেন হই, তাহা বুঝি না। মূর্খলোকে বুঝে না, বলিয়া আমরা সময়ে সময়ে জ্ঞান গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু জ্ঞানবান্-কেও যথা সময়ে, মূর্খ অপেক্ষা এ সম্বন্ধে অধিক সুবিবেচক বলিয়া বোধ হয় না। রাসেলাসের পণ্ডিত ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। যাহা হউক, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে মূর্খ ও অজ্ঞ লোক অপেক্ষা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের ভাব গোপনের ক্ষমতা অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু কোন ভাব গোপন করা হইয়াছে বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব নাই, এমত বলা যাইতে পারে না। বরং এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, বুদ্ধিমান লোকে শোকে ধীরতা রক্ষার জন্য ভাব গোপন করিতে যাইয়া, আত্মার সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, অবশেষে মূর্খ লোক অপেক্ষাও অধিকতর উন্মত্ত কুহর পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রকৃতির গতি, একবারে রোধ করিতে চেষ্টা করা, বাতুলতামাত্র। শোকের সময় উপস্থিত হইলে মূর্খ লোকে তাহার বেগ সম্বরণ করিতে না পরিয়া, কিয়ৎকাল চীৎকার পূর্ব্বক রোদন করে, ইহাতে প্রকৃতির পথ পরিষ্কৃত হয়। হৃদয়ের বেগ ছুটিয়া বাহির হইয়া পুনর্ব্বার হৃদয়কে শান্ত করে। রোদনই হৃদয়-গতির প্রশস্ত পথ। অশ্রুধারায় হৃদয়ের বেগ প্রত্যক্ষীভূত হয়। কষ্টের অবসান করিবেন মনে করিয়া যিনি এই গতি ও বেগ রহিত করিতে চেষ্টা পান, তিনি কষ্ট দূর করা দূরে থাকুক, সেই চেষ্টা দ্বারা তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া প্রকৃতি-বিরোধের প্রতিফল হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। সবিস্তারে সে বিষয়ের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে নিরপেক্ষ পাঠক বোধ করিয়াছেন যে, শোক সম্বরণ কিছুতেই হয় না। শোক প্রকাশের যে সকল বাহ্যিক চিহ্ন বা লক্ষণ আছে, তাহা

লোপ করিলেই যে শোক ফুরাইল, বুঝিতে হইবে, এমন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে শোক ফুরান যায় না। শোকের সহিত যুদ্ধ করা সাজে না। শোক সংস্বরণ করিব বলিয়া কৃতকল্প হইলে, তাহাতে কেবল শোক প্রকাশের স্বাভাবিক চিহ্ন গুলিরই লোপ সাধন করা হয় মাত্র, প্রকৃত শোকের কিছুই হয় না। তবে কি লোকে শোকাভিভূত হইয়াই কাল কাটাইবে? শোকের বেগ অসম্বরণীয় বলিয়া কি সহ্য করিবারও চেষ্টা করিবে না? ফলতঃ সহ্য করা না করা, আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে। শোকের সময় ইচ্ছা করিলেই যে শোক সহ্য করা যাইবে, উহার ইচ্ছা না করিলেই যে সহ্য করা যাইবে না, এমত কোন কথা নাই। মনুষ্যের সহিষ্ণুতা সময়-ব্যাপী। সময়ের ব্যাপ্তিতেই সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়। প্রকৃত শোক নিবারণের ঔষধই সময়।

সময় কি? সহিষ্ণুতাই বা কি? মানুষ বাঁচিয়া থাকে কেন? কেবল কি দিন গণিবার জন্য? না সহিয়া থাকিবার জন্য? পাঠক বিরক্ত হইও না। বস্তুত মানুষ কেবল এই দুইয়ের জন্যই বাঁচিয়া থাকে। নচেৎ কল্য যে ব্যক্তি হৃদয়ের ধন প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রকে কালসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে, আজ সে আহারান্বেষণ করে কেন? কল্য তাহার যে ভাব দেখিয়াছি, আজ সে ভাব নাই কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রকৃতি দয়াময়ী, দয়া করিয়া শোক হইতে শান্তিতে লইয়া চলিয়াছেন। রোদনে ও অশ্রুবর্ষণে ছিন্ন-হৃৎপিণ্ড পিতারও শান্তি জন্মিতেছে, শোক সহ্য হইয়া আসিতেছে। তারপর বিস্মৃতি, কালের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলই ভুলিতে পারিতেছি। এমন যে শৈলসম পুত্রশোক, তাহাও বিস্মৃত হইয়া আবার আপন আপন গন্তব্য পথে ছুটিতেছে; ইহা কি প্রকৃতির দয়া নহে?

বলিতে পার, প্রকৃতি যদি দয়াময়ী, তবে এ নিষ্ঠুরতা কেন? যাহা নিবারণ হয় না, তাহার উদ্দীপনা কেন? এ কি প্রকৃতির দয়া না নিষ্ঠুরতা? বস্তুত এই সকল ভাবিয়াই পণ্ডিত প্রবর জনষ্টুয়ার্ট মিল, তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে, প্রকৃতির অশেষ দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং প্রকৃতির প্রতি হন্তার জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত ইহা তাঁহার একদেশদর্শীতার ফল মাত্র। তিনি কেবল প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার বিষয়ই ভাবিয়া গিয়াছেন, তাহার কোমলতা ও মধুরতার পরিচয় পান নাই। এজন্য আমরা তাঁহার এতৎ সম্বন্ধীয় চিন্তা, পক্ষপাতে দূষিত মনে করিতে পারি।

আমাদের দেশে প্রকৃতির বর্ণনা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা একবার পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে ইচ্ছা করি। তিনি জনষ্টুয়ার্ট-মিলের লিখিত প্রকৃতি প্রবন্ধের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য বুঝিয়া লইবেন, আর উক্ত গভীর ধ্যান-পরায়ণ মহাত্মা কিরূপ বিচার্য্য বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছেন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা আমাদের তন্ত্র, পুরাণ, ইত্যাদির সার সংগ্রহ করিয়াই কয়েকটী কথা বলিব, হয়ত তাহাতে আমাদের কল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠক মহাশয় দেখিবেন, কল্পনার আলোই আদিম আলো। জ্ঞানালোক বহু দিন পরে বিকীর্ণ হইয়াছে।

প্রকৃতি কালী-রূপিনী। কালী আমাদের আরাধ্যা দেবতা। আমরা ইঁহার মূর্ত্তি

গড়িয়া পূজা করিয়া থাকি। মহাকাল-শবরূপে পদতলে প্রপতিত। কালের বক্ষে পা দিয়া চতুর্ভুজা কালী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, চারি হস্তে চারিটী কার্য্য সাধন হইতেছে;—এক হস্তে অসি, আর হস্তে মুণ্ড; এক হস্তে বর, আর হস্তে অভয়। আমাদের মা কালী ও মা অভয়া এইরূপে বিরাজিতা। এক দিকে নিষ্ঠুরতা ও শ্যামল, অন্য দিকে বদান্যতা ও মায়া। ঠিক প্রকৃতির প্রতিকৃতি। গলদেশে মুণ্ডমালা ঝুলিতেছে, নরের পাপ কলুষিত হস্তগুলি দ্বারা কটিদেশ সজ্জিত হইয়াছে। এইরূপে নরের সংহার সাধন করিতে করিতে প্রকৃতি ধাবমানা, কিন্তু যাই পদতলে পতি (কাল) পতিত দৃষ্ট হইল, অমনি দেবীর গতিরোধ, দন্তে জিহ্বা কাটিয়া লজ্জায় অধোবদনা। * বস্তুতঃ কালের সঙ্গে প্রকৃতি-কালীর এইরূপই লীলা। কাল অনাদি অনন্ত,—প্রকৃতির আধার। প্রকৃতি, শাসন ও শান্তি মূর্ত্তিমতী। এ কল্পনার মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, একবার আর্য্য ঋষিগণের কার্য্য স্মরণ করা আবশ্যক। আমাদের দেব দেবীগণের নামেই প্রকৃতি তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। এ অভ্রান্ত সত্য, তর্কে পরাজিত হইবার নহে।

কালে জীবের সংহার সাধিত হইতেছে। সৃষ্টি যে নিয়মে হয়, লয়ও সেই নিয়মাধীন। যাহা নিষ্ঠুরতার কারণ, তাহাই দয়ার উৎস। সুখ ও দুঃখ, এক কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়। তবে এত ভাবি কেন? শোকেই বা উন্মত্তবৎ আচরণ করি কেন? পাঠক বলিতে পারেন, প্রকৃতির ইচ্ছা। যাঁহার ইচ্ছায় হাসি, তাঁহার ইচ্ছাতেই কাঁদিতে হয়। প্রকৃতি স্বরূপিনী কালী করাল অসি ধরিয়া আমাদের কাল ফুরাইয়া দিতেছেন, আর অমনি তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালার মুণ্ডসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। একটী হাতে অনবরত ঝুলিতেছে; এক দিকে ভয়, অন্য দিকে অভয়; এক দিকে আশা ও বিশ্বাস, অন্য দিকে স্মৃতি ও কল্পনা। আশায় দিন গণিত হয়, বিশ্বাসে সান্ত্বনা জন্মায় ও প্রবোধ পাওয়া যায়। সান্ত্বনা ও প্রবোধ ভিন্ন, জীবন ভার বহন করে সাধ্য কার? আশা ভিন্ন সুখ কোথায়?

বস্তুত আশাই জীবনের প্রকৃত মরীচিকা। আশায় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, আমাদিগকে দুর্ব্বহ ভার সহ টানিয়া লইয়া যায়। জীবন গত না হইলে আর আশার কুহক শেষ হয় না। এই নিমিত্ত নিদারুণ শোকেও আমাদিগের সান্ত্বনা আছে। হৃদয়ের ধন একটী গিয়াছে, আর একটী তাহার স্থল পূরণ করিবে, এই কল্পনায় আমরা শোকে প্রবোধ পাইয়া থাকি। বস্তুত যে এ জগৎ হইতে—আমাদের সঙ্গ হইতে চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এক দিকে বিস্মৃতি ও অন্য দিকে আশা দ্বারা প্রতারিত না হইলে, তাহার শোক সহ্য করা যায় কি? পাঠক যত প্রকার শোক পাইয়া থাকেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। প্রথমাবস্থায় তাহার বেগ যেরূপ অসম্বরণীয় ছিল, এখন আর তাহা নাই। কেন নাই? যাহাকে হারাইয়াছিলেন, তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন কি? তবে শোক কিসে দূর হইয়া গেল? যদি শোক এই প্রকার অস্থায়ী, তবে তাহার জন্য এক সময়ে পাগল হই কেন?

সকলই সময়ের গুণ। ভক্তি, প্রীতি, ও স্নেহ ডোরেই আমরা জগতে বাঁধা রহিয়াছি। বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিতে বা বুঝা-

* এই সময় হইতেই পৃথিবীতে সভ্যতার আবির্ভাব।

ইতে হইলে, আকর্ষণের উল্লেখ করিতে হয়। ভৌতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইয়া তাহার অনেক প্রকার তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝা গিয়াছে, মনোজগতেও একটী আকর্ষণ আছে। তাহাকেই আমরা তিনটী মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইয়া থাকি,—ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহ। সকলেই এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, গ্রহ উপগ্রহাদির ন্যায় জগতে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছেন। এই আকর্ষণ ছিন্ন হইলেই আর ঘুরিতে হয় না, তখন গতি এক দিকেই হইতে থাকে, সে কালের দিক্,—অনন্ত অনন্ত কাল। সে দিকে চলিলে আর বিশ্রাম নাই, আর ভাবনা নাই।

যে কালের দিকে চলিতে পারে, সেই যথার্থ শোক-জয়ী। কেন না, তাহার বন্ধন এক কালীন ছিন্ন হইয়াছে। ইহাকেই আমাদের বুদ্ধদেব মুক্তির অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বৈদিক ক্রিয়া কলাপ গ্রাহ্য করিতেন না। হিন্দু ধর্ম্মের পৌত্তলিকতায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কি বিদ্বেষ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম ভুলিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। আমাদের পৌত্তলিকতার পুতুল—মহামায়া, আদ্যাশক্তি, বীর প্রসবিনী প্রকৃতি-রূপা। মহাদেব, দেবাদিদেব। কল্পনায় দেবত্বের আর উচ্চ আসন নাই। তিনি ভিখারী, অথচ কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী। তিনি সন্ন্যাসী, অথচ প্রকৃতি-রূপিনী ভগবতী তাঁহার গৃহিণী। এই গৃহিণী মায়া দ্বারা সর্ব্বদাই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি সেই আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বদাই মহাযোগে নিমগ্ন। এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার নাম মহা যোগী, মহেশ্বর। মহামায়া যাঁহার গৃহিণী, তিনিই মহাযোগী কি চমৎকার ভাব! প্রকৃতি ও কালের এই সংসার। আমরা যত ক্ষুদ্র হই না কেন, আমরাও এই সংসারের সংসারী।

সেই নিমিত্তই বলি যে, আমাদের আকর্ষণ আছে আমরাও সৌর জগতে মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় আমাদের আকর্ষণে বাঁধা আছি। সেই জন্যই অধিকাংশ লোকই সংসারী। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, কত আকারে আমাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছে; স্থূল কথায়, বন্ধন দৃঢ় করিতেছে। সময়ে সময়ে ইহার দুই একটী বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহাতে কি? হৃদয় এককালীন উৎপাটিত (মৃত্যু) না হইলে বন্ধনের শেষ নাই। ইহাকেই আমরা ভব বন্ধন বলিয়া থাকি। আমাদের দেবতার নিকট ভববন্ধন মোচনের জন্য কতই প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু সে আমাদের মূঢ়তা মাত্র। প্রকৃতির নিয়মে বন্ধন ছিন্ন হয় বলিয়াই আমাদের এ অভিমান। নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থনা কেবল অভিমান মাত্র। প্রকৃতি মাতৃবৎ কোমলতার সহিত ছিন্ন-বন্ধন আবার যোজনা করিয়া দিতেছেন। আমরা বন্ধন ছেদের ভয়ে তাহা প্রার্থনা না করিলেও, দয়াময়ী প্রকৃতি দেবী, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আবার বন্ধন ক্রিয়া সাধন করিতেছেন, তিনি কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়িতে চাহেন না। মাতা কি কখনও সন্তানের স্নেহ ভুলিতে পারেন? আমরা পরিণামদর্শী নর, ভূত দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতেছি, এবং উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিতেছি, না মা, প্রকৃতিদেবী, ক্ষমা কর, আর তোমার স্নেহে কাজ নাই! মা, তোমার সকলই প্রতারণা! তোমার সৃজিত আশা প্রতারণা তোমার প্রদত্ত

কল্পনাও প্রতারণা। সন্তানের সঙ্গে এ প্রতারণা কেন মা! তুমি দিয়াও সুখী কর না, লইয়াও শেষ কর না। কেবল কি দুঃখ তুষানলে ক্রমে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই নরের সৃষ্টি?

হরের সংসারে আমরা এই প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিতেছি। হর শ্মশানবাসী শিব, সন্তানকে তিনি কখনই গৃহী হইতে বলেন না। তাঁহার আকর্ষণ শ্মশানের দিকে। সর্ব্বশোকের অবসানও শ্মশানে। শোকের উৎপত্তি স্থান, গৃহে। যেখানে মমতা, সেখানেই শোক। মায়াময়ী মহাদেবী সর্ব্বদাই আমাদের গৃহে বিরাজমানা, আমাদের সংসারের ভাবনা ভাবিতেছেন; কেমনে আমরা গৃহী হই, কেমনে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারি, সেই শৃঙ্খলা সাধন করিতেছেন। বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শনের উন্নতি সাধন করিতেছেন। মহামায়ার মায়ায় ভুলিয়া, আমরা বাস-গৃহ পৃথিবীকে কত প্রকারে সাজাইতেছি। কোন স্থানে নগর বসাইতেছি, কোন স্থানকে কাটিয়া নদী বহাইতেছি, ডাঙ্গা ভাঙ্গিয়া ডহর করিতেছি, ডহর পূরাইয়া ডাঙ্গা করিতেছি। ইহাতেই জীবনের সুখ। মাতার ক্রোড়ে শিশুর ক্রীড়ার ন্যায়, আমরা এই প্রকারে প্রকৃতির ক্রোড়ে গৃহকর্ম্ম করিতেছি।

শোকে আমাদিগের এই ক্রীড়া ক্ষণিক ভঙ্গ হয়। তখন পিতাকে মনে পড়ে। মাতার চাতুরী বুঝিয়া পিতাকে ডাকিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু শ্মশানে না গেলে পিতার দর্শন পাওয়া ভার। শ্মশানেই ঔদাস্যের সূচনা, সুতরাং মায়ার প্রভাব তথায় আর খাটে না। তথায় শিব বর্ত্তমান, ভগবতীর তিরোধান। কোথায় ঐশ্বর্য্য? কেবল অস্থিস্তূপ, ভস্মরাশি! চারিদিকে ভূতের নৃত্য। ভূতকাল ভৈরব নিরাশা। তখন কেবলই মনে পড়ে, ভূত,—কালভূত ও পঞ্চভূত। উভয় ভূতের মিলন কি আশ্চর্য্য!

আজ ভারত অর্দ্ধ শ্মশান ও অর্দ্ধ গৃহ। মা আছেন মায়া আছেন, সুতরাং ভারতে গৃহকর্ম্ম আছে, অন্ন বস্ত্রের ভাবনা আছে। আবার শ্মশান আছে, শিবও আছেন। শ্মশান নহে, মহা শ্মশান। এখনও দুই একটী শবদাহন চলিতেছে। রাবণের চিতা চিরকালই জ্বলিতেছে, একথা ভারতবাসী কাহারও নিকট নূতন নহে। আবার আজি কাহার শব, দাহন জন্য আনিয়া উপস্থিত করিতেছে? হিন্দুত্বের না হিন্দু সমাজের? ভাই পাঠক, * হিন্দুত্বের সহিত আমাদিগের কি সম্পর্ক ছিল? আইস এখন হিন্দুত্বের সৎকার করি। আর, যদি ইচ্ছা হয়, আইস এই মহাশ্মশানে বসিয়া একবার প্রাণভরিয়া পিতাকে ডাকি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, সকলেই এই পথে পিতার সমীপে গমন করিয়াছেন, এদিকে রাবনের চিতা জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণ হয় না। ভারতবাসী যদি হিন্দুত্বের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে, আইস অন্ত্যেষ্টির কার্য্যে যোগদান করিয়া, সকলে মিলিয়া একবার হিন্দুত্বের সৎকার করি। শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতে নাই, শ্মশানে ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। আর যদি হিন্দুত্বের শব সাধন করিয়া এই শ্মশানে বসিয়াই সিদ্ধ হইতে পার, তবে মাতার চাতুরী ও পিতার ভৎর্সনা উভয়ের হাত হইতেই নিস্তার পাইতে পারিবে! আইস, আমরা শব সাধনা করি; ভারতে একতা নাই, যোগ নাই, এই যোগের সুসময় উপস্থিত। এমন দিন আর হবে না, আইসমিলিয়া যাই!!

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

* পাঠক যদি ভাবুক হন, তবে অবশ্য বুঝিতে পারিবেন, যে, রাবণের চিতা আমাদের স্মৃতি, যদ্দ্বারা অতীত ঘটনা মনে হয়।

দেবতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চন্দ্র

চন্দ্র, কুন্দ পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং রথারূঢ়। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করে এবং তন্মণ্ডলও চন্দ্রাকার, সুতরাং চক্র বিশিষ্ট রথকেই তাহার বাহন কল্পনা করা হইয়াছে। অনেকের মতে চন্দ্র যে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত,এই মতটী আধুনিক। কিন্তু "সুষম্না নামকোরশ্মিঃ পুষ্ণাতি শিশির-দ্যুতিং" এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, উক্ত মত প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। একদা চন্দ্র, বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিল. সেই পাপে সে কলঙ্কী হইয়াছে। এই পৌরাণিক বিবরণের কোন বাস্তবিক মূল থাকিতে পারে। হয়ত পুরাকালে ভারতবর্ষে এপ্রকার কোন জ্যোতিষ মত প্রচলিত ছিল যে তদনুসারে তারা নামক কোন বিশেষ নক্ষত্র অথবা বৃহস্পতি গ্রহেরই চন্দ্রের সংযোগ বিশেষে কলঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্রের উৎপত্তি, তিন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এক মতে সমুদ্রমন্থনে, অন্য মতে বিধাতার মননে, এবং তৃতীয় মতে অত্রি মুনির চক্ষুদ্বারা চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। "মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন" এই বচনে মন দ্বারাই চন্দ্রের উদ্ভব সূচিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত তিন স্থলেই, বিধাতার মনন, চন্দ্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, যেহেতুক ঐ তিন প্রকারেই বিধাতার ইচ্ছা সঞ্চালন আবশ্যক। অত্রিমুনিকে শিবাবতার বলা হইয়াছে, সুতরাং অত্রি-নেত্র হইতে চন্দ্রের উদ্ভব বলিলে, এই বুঝায় যে, শিবের নেত্র হইতে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। যথা "চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতমিত্যাদি।" ইতি তন্ত্রসার শ্লোকার্দ্ধঃ। চন্দ্র, অর্ক, ও অগ্নি, মহাদেবের এই তিন চক্ষু। অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটী নক্ষত্রকে চন্দ্রের স্ত্রীকল্পনা করিয়া রোহিণীনক্ষত্র ও চন্দ্র সম্বন্ধীয় একটী পৌরাণিক বিবরণ আছে। তাহা এই,চন্দ্র অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা রোহিণীকেই সমধিক প্রীতি করে, এই দেখিয়া রোহিণীর ভগিনীগণ তাহাদিগের, পিতা দক্ষের নিকট, আপন আপন মনস্তাপ জ্ঞাপন করিলে, দক্ষ অভিশাপ দিলেন, চন্দ্র ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইবে। পরে চন্দ্র আবার উক্ত স্ত্রীগণকে সমুচিত প্রীতি করিতে লাগিল দেখিয়া, তাহারা দক্ষকে শাপ মোচন করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু দক্ষ বলিলেন, আমার কথা ব্যর্থ হইবে না, অতএব আমি বরও প্রদান করিতেছি যে, চন্দ্র ক্রমান্বয়ে ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে বোধ হয়, পুরাকালে ভারতবর্ষে এপ্রকার মত প্রচলিত ছিল যে অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি, নক্ষত্র ও চন্দ্রের সম্পর্ক বিশেষ দ্বারা চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিত। চন্দ্র মণ্ডলব্যাপী, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম চন্দ্র।

নক্ষত্র

দক্ষ, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি আপনার সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আর রূপকের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয় না, কেন না অশ্বিনী প্রভৃতি যে নক্ষত্র ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। চন্দ্রের সহিত উহাদিগের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া, উহাদিগকে তাহার স্ত্রী বলা হইয়াছে। অগ্নিবর্ণ ছয়টী তারাই কৃত্তিকা, এই কৃত্তিকা দেবীদের নামানুসারেই স্কন্দের নাম কার্ত্তিকের ও ষড়ানন হইয়াছে। কার্ত্তিকেয় ছয়জন কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধ্রুব একটী বিখ্যাত নক্ষত্র, আর বিষ্ণুপুরাণে উত্তানপাদকেও নক্ষত্রপুঞ্জের এক অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সাতটী নক্ষত্রই সাতজন ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু,বশিষ্ট,অঙ্গিরা। এই সাত নামে সাতজন প্রকৃত মুনি স্বীকার করাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, কেন না যে ঋষিসপ্তক সপ্তর্ষি মণ্ডল প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ সপ্ত তারাকে আপনাদের নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর, ইহারা যে তারা, ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। অরুন্ধতী বশিষ্টের স্ত্রী ও নক্ষত্র বিশেষ। সৌর ভাদ্রের সপ্তদশ দিবসে নক্ষত্ররূপে অগস্ত্যোদয় হয়, ইহাতে অগস্ত্য শব্দে এক নক্ষত্রও বুঝায়।

গরুড়।

ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে একস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রৌদ্রের নামই গরুড়। অরুণ প্রাতঃকালীন সূর্য্য-জ্যোতি, সুতরাং প্রবল রৌদ্র অর্থাৎ গরুড়কে যে তাহার কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, গরুড়কে সকলে অগ্নিবর্ণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। উহাতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গরুড়ের শরীর ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। রৌদ্র প্রকাশেরও এই নিয়ম। প্রথমত অল্প অল্প রৌদ্র হয়, তাহার পরে উহা ক্রমে ক্রমে অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও গরুড়ের পক্ষের কিছু হানি হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বজ্রাঘাত দ্বারাও সূর্য্য-জ্যোতির কিছুমাত্র ক্ষতি হইতেপারে না। গরুড় চক্ষুর নিমেষেই অনেক দূরে গমন করিতে পারিত, ইহাতে এই সূচিত হইয়াছে যে, জ্যোতির গতি যৎপরোনাস্তি দ্রুতবেগবিশিষ্ট। এই গতির নিমিত্তই গরুড় ও অরুণকে পক্ষী বলা হইয়াছে। সুমেরু পর্ব্বতের উপরে, গরুড় ও পবনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবনের ভয়ানক পরাক্রমেও সুমেরু পর্ব্বতের কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু গরুড়ের পাকসাটেই উহার এক শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে অভিপ্রেত হইয়াছে যে, এ প্রকার স্থলে বায়ু অপেক্ষা উত্তাপের শক্তিই অধিকতর ফল প্রসব করে। এ পর্য্যন্ত গরুড় সম্বন্ধে কেহই কিছু ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু বোধ করি গরুড়কে যে সূর্য্য-জ্যোতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলাম, ইহাতে কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কোন পণ্ডিতই কিছু আপত্তি কবিবেন না।

কার্ত্তিকেয়।

কেবল সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম কার্ত্তিকেয়। যুদ্ধদেবের অতি তেজোময় হওয়া উচিত,সুতরাং কার্ত্তিকেয়কে অগ্নির পুত্রও বলা হইয়াছে। কৃত্তিকা নামক অগ্নিবর্ণ ছয়টী নক্ষত্র, ঐ অগ্নির পুত্র অথবা মহাদেবের পুত্রকে পালন করিয়াছিল, এই জন্য তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় ও ষড়ানন হইয়াছে। অগ্নির মত তেজোবিশিষ্ট দেবতার অগ্নিবর্ণা পালয়িত্রী কল্পনা

করাই যুক্তিসঙ্গত। যোদ্ধা ও সুন্দরবর্ণ ময়ূরই কার্ত্তিকেয়ের উপযুক্ত বাহন। যোদ্ধারা উত্তমরূপে সজ্জিত, অর্থাৎ বেশভূষাদি-বিশিষ্ট হইয়া উত্তম বাহনেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে; সুতরাং যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের রূপ ও বাহনাদি কল্পনা করিতে হইলে, তাঁহাকে অতি সুন্দর পুরুষ ও সুন্দর বাহন আরূঢ় বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয়।

অশ্বিনীকুমার।

আমার যেন স্মরণ হয়, মোক্ষমূলর অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঊষা ও গোধুলী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাই আমার নিকট সঙ্গত বোধ হয়। যেহেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সূর্য্যের যমজ পুত্র বলা হইয়াছে, ও যমজ পুত্রের প্রায় একরূপ হয়, এবং ঊষা ও গোধুলীও প্রায় একরূপ। ঊষাতেও যেমন অস্পষ্ট আলোক, গোধুলীতেও সেই প্রকার। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেববৈদ্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঊষা ও গোধুলী এই কালদ্বয় স্বাস্থ্যজনক, ভ্রমণের প্রশস্ত সময়। প্রত্যুত স্বাস্থ্যলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা ঊষা ও গোধুলী সময়ে, বিশেষতঃ ঊষাকালে ভ্রমণ অত্যন্ত উপকারজনক জ্ঞান করিয়াই, তাহা করিয়া থাকে। আর উত্তরমুখস্থা অশ্বিনীরূপা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার দুই নাসিকা দিয়া সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্ব আর পশ্চিম দিক দ্বারা, কল্পিত অশ্বিনীর দুই নাসিকা কল্পিত হইয়াছে এবং ঊষা পূর্ব্বদিক্ হইতে ও গোধুলী পশ্চিম দিক্ হইতে উৎপন্ন হয়।

বরুণ।

কেবল জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম বরুণ। বরুণ পাশহস্ত, মৃগারূঢ়, শঙ্খস্ফটিকবৎ বর্ণযুক্ত ও মহাবল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বরুণকে পাশহস্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল জীব জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে, অথবা অনেকক্ষণ জলমগ্ন থাকিয়া কষ্ট পায়, তাহাদিগের এ প্রকার বোধ হয় যেন কেহ তাহাদিগকে ফাঁসি দিতেছে। জল দ্রুতগামী, সুতরাং বরুণ মৃগারূঢ়। জলের বর্ণ ধবল, সুতরাং বরুণ শঙ্খস্ফটিকবৎ বর্ণযুক্ত, এবং জলের বেগ প্রবল, এই জন্য বরুণ মহাবল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গঙ্গা।

কেবল গঙ্গানদী ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম গঙ্গা। গঙ্গা মৎস্যগর্ভা, সুতরাং ইনি মকরের উপরে অধিষ্ঠিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কখন কখন জলমাত্র অর্থেও গঙ্গাশব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা "জলমেব জহ্নুতনয়া ভূয়েব বারাণসী।" অর্থাৎ জলই গঙ্গা ও পৃথিবীই কাশী।

দুর্গা।

মূল প্রকৃতিকে, ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি বা মায়া শক্তিবলে। পঞ্চ ভূতাদি জড় পদার্থ সমষ্টিকেও প্রকৃতি বলে। দুর্গা মূল প্রকৃতির এক অংশ। ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ও দুর্গতিনাশকারী, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম দুর্গা। জড় জগৎ পর্ব্বত সকল দ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আর পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতএব দুর্গাকে পার্ব্বতী ও হিমালয়নন্দিনী বলে। গঙ্গাকেও হিমালয় নন্দিনী বলে, যেহেতু উহা হিমগিরি হইতে নিসৃত হইয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত রহিয়াছে। এই জন্যই দুর্গাকে গঙ্গার সপত্নী কহে। কিন্তু মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থেই সচরাচর ঈশ্বরকে দুর্গা

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দশ বাহুই সেই মহাশক্তির পরিচায়ক। পরাক্রমাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহই উপযুক্ত বাহন। দুর্জ্জন বা অসুরেরাই জগতের প্রধান দুর্গতির কারণ, অতএব দুর্গা অসুর নাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াই, এক প্রকারে দুর্গতিনাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন নানা প্রকার দুর্গতি আছে, তখন অন্য প্রকার দুর্গতিনাশিনী অর্থেও দুর্গাকে দুর্গা বলা যায়। শারদীয়া দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে সরস্বতী ও কার্ত্তিকেয়াদির মূর্ত্তিও প্রদর্শিত হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তি হইতেই যখন যুদ্ধশক্তি উৎপন্ন হয়, তখন যুদ্ধদেবতা কার্ত্তিকেয়কে দুর্গার পুত্র বলা যায়। যখন ঐ মহাশক্তি হইতেই দুর্গতি ও বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন সিদ্ধিদেবতা গণেশও দুর্গার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই প্রকারে বাক্‌শক্তি ও জ্ঞানশক্তি দ্বারাও দুর্গতি দূর হয় বলিয়া এবং উহা মহাশক্তির এক অংশ বলিয়া, সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতি ও দুর্গার সহিত প্রদর্শিত হয়। মহাশক্তির অংশ, এই বলিয়া শোভা ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীও, দুর্গার সমভিব্যাহারে পরিদৃষ্ট হয়। মহাশক্তি বলিয়া দুর্গাকে, নিদ্রা, ক্ষুধা, লজ্জা, তুষ্টি, অনলের দাহিকাশক্তি, ভাস্করের প্রভাশক্তি, চন্দ্রের শোভাশক্তি, জলের শীতলতা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-শক্তি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়—শক্তি, তপস্বীর তপস্যাশক্তি, ক্ষমাবানের ক্ষমাশক্তি, ধরণীর ধারণী ও শস্য প্রসবিনী শক্তি, প্রভৃতি বলিয়া স্তব করা হইয়াছে ও হইয়া থাকে। শাস্ত্র তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মৃণ্ময়ী দুর্গা মূর্ত্তিকে দুর্গা জ্ঞান করে, কিন্তু জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরকেই অবস্থা বিশেষে দুর্গা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, "গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী। সাবিত্রীচ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা॥" অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতি ও সাবিত্রী। দুর্গাকে তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে। যথা "তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" হিন্দুশাস্ত্রের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, উহাতে ঈশ্বরের নাম লইয়া অতিপ্রসঙ্গ করা হইয়াছে। যথা, নারায়ণের সহস্র নাম, শত নাম, ষোড়শ নাম, অষ্ট নাম ইত্যাদি। এই প্রকারে দুর্গারও সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরের নাম লইয়া এত প্রসঙ্গ করা হইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই একটী পৃথক নাম লওয়ার বিধি দেওয়া হইয়াছে। যথা, "ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রজাপতিং॥" ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম বিহিত হইয়াছে। যথা "অব্যাদজোঙ্ঘ্রি মণিমাং স্তব জান্বজ্যোরু। যজ্ঞোচ্যুত কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ॥' ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন কালে রক্ষার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নাম বিহিত হইয়াছে। যথা 'পারাহ্নষ্যং দিনে বিষ্ণু প্রাতনারায়ণোবতু। মধুহা চাপরাহ্লেচ সায়ং রক্ষত মাধবঃ॥' ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্নস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান কথিত হইয়াছে। যথা, মানস হ্রদে মৎস্য, হস্তিনাপুরে গোবিন্দ, কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজ, হিমাচলে শূল বাহু, অবন্তি নগরে বিষ্ণু, বারাণসীতে কেশব, মর্ত্তালোকে অগস্ত্য, ভূবলোকে গরুড়, স্বর্গলোকে বিষ্ণু, জম্বুদ্বীপে

চতুর্ব্বাহু ইত্যাদি। শিব ও রাধিকারও সহস্রনাম কথিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য দেবের সময়ে ঈশ্বরের নামের যে প্রকার অভ্যধিক আলোচনা হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই। এ বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সহিত হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে, অনর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ অপরাধ। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে, হেলায় নাম গ্রহণও মহাপুণ্যজনক। চৈতন্যদেবের সময়ে মহাভাগবত হরিদাসঠাকুর প্রত্যেক দিবসে তিনলক্ষবার হরিণাম জপ করিতেন। অদ্যাপিও অনেক হিন্দু, প্রতি দিন শত শতবার ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকেন। নাম জপের এত প্রাবল্য ভারতবর্ষভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশেই দেখা যায় না। ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়েরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহত্ব অপেক্ষা ঈশ্বর প্রেমিকত্বই অধিক ভালবাসে।

দুর্গাকে প্রকৃতির অংশ বলিয়াও শাস্ত্রে অনেক স্থানে তাঁহাকে স্বয়ং প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতিকে কখন কখনও কৃষ্ণ ও রাধা, কখন কখন শিব ও দুর্গা এবং কখন কখন লিঙ্গ ও যোনি বলা হইয়াছে, যোনি পূজা বলিলে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহা যে ভাবে গ্রহণ করে, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কখনই তাহা সে ভাবে গ্রহণ করে না। উক্তস্থলে সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের সমবায়ের নামই যোনি এবং ঐ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি।

পুরুষের সে প্রকার দশাবতার বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ প্রকৃতির ও দশাবতারের বর্ণনা আছে। যথা, "কৃষ্ণরূপা কালিকাস্যাৎ রামরূপাচ তারিণী। বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তি স্যান্মীনো ধুমাবতী ভবেৎ॥" ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাদ্বরাহশ্চৈব ভৈরবী। সুন্দরী যামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বামনো ভুবনেশ্বরী॥ কমলা বৌদ্ধরূপাস্যাৎ দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপিণী।' ইত্যাদি। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মুণ্ডমালা তন্ত্র।

ছান্দোগ্যোপনিষদে মহাশক্তি বিষয়ক একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। যথা, এক সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ মোহবশত আপনাদিগকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতেছিলেন তদ্দর্শনে ভগবান্ এক অনির্ব্বচনীয় কোটিচন্দ্র সুন্দর সন্নিত জ্যোতিঃপুঞ্জ রূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন আমি মাতরিশ্বা আমি সকল বস্তুকেই উড়াইতে পারি। জ্যোতিঃপুঞ্জ এক তৃণ সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন এই তৃণ টুকু উড়াও। বায়ু কোন ক্রমেই তাহা উড়াইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎপর অগ্নি উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে; উত্তর করিলেন, আমি অনল, আমি সকল বস্তুই দগ্ধ করিতে পারি। জ্যোতিপুঞ্জ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত তৃণ দগ্ধ করিতে বলিলে অগ্নি উহা দগ্ধ করিতে অপারগ হইয়া লজ্জিত হইলেন। কাত্যায়নী তন্ত্রের মতে এই জ্যোতিঃপুঞ্জ পরে চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী রূপে বিনয়াবনত দেবগণের সমক্ষে কয়ৎকাল প্রকাশিত থাকিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই জগদ্ধাত্রী ও দুর্গার রূপান্তর বিশেষ।

কালীকে দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্না বলা হইয়াছে। যথা, "দুর্গার ললাটে জাতা জলদবরণী।" কালী দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এ বাক্যের এই তাৎপর্য্য যে ললাটের সঙ্কোচনেই ক্রোধ ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া, সদা ক্রোধান্বিতা, রণরঙ্গিনী করাল-বদনা কালীকে দুর্গার ললাটে সম্ভবা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক কালীও দুর্গার রূপান্তর বিশেষ। ক্রোধাবস্থাপন্না শক্তিকেই কালী বলা হইয়াছে। ভয়ানক ভাবান্বিতা বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম কালী। এই জন্য কালীর বিবিধ প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা ও ভৈরবী, এ সকলেরই অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। পাঠকগণের জ্ঞানার্থ একটী ধ্যান দেওয়া যাইতেছে। উমারধ্যান—"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥ সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাবোর্দ্ধপাণিকাং॥ মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধির চর্চ্চিতাং॥ কর্ণাবতাং সতানীতশবযুগ্ম ভয়ানকাং। ঘোর দংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং॥ শবানাং কর সংঘাতৈঃ কৃতাকাঞ্চীং হসন্মুখীং সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাং॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীং। বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাং॥ দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বি কচোচ্চয়াং। শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং॥ শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালে নচ সমং বিপরীত রতাতুরাং॥ সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধিদাং॥" ছিন্নমস্তার ধ্যান আরও ভয়ানক। বাস্তবিক কালীর মূর্ত্তি, অস্ত্র, অনুচরী, ডাকিনী, যোগিনী, এবং আলয় ভূতশ্মশান, সকলই ভয়ানক ভাবের অবতার বিশেষ। কালী সংক্রান্ত সকল বিষয়ই যেমন ভয়ানক, সেই রূপ আবার কৃষ্ণসংক্রান্ত সকল বিষয়ই আনন্দপ্রদ। কৃষ্ণের মূর্ত্তি মনোহর, হস্তে আনন্দজনক শব্দকর মুরলী, প্রিয়তমা আনন্দরূপিনী রাধিকা, মনোহর বেশধারিণী সখিগণের মধ্যে কেহ বীণাহস্তা, কেহ বংশীহস্তা, কেহ রবাববাদনতৎপরা, কেহ মৃদঙ্গহস্তা, ও কেহবা খঞ্জরীবাদন তৎপরা। সংক্ষেপত তাহারা নৃত্যগীত-পরায়ণা, সর্ব্বপ্রকার বাদ্য যন্ত্র বাদনে নিপুণা এবং শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি আপন অঙ্গশোভাসংবর্দ্ধক পরিধেয় বস্ত্রে সুশোভিতা। কালীর মূর্ত্তি ও সংগ্রাম রূপ কার্য্য উভয়ই ভয়ানক। কৃষ্ণের মূর্ত্তি ও নৃত্যগীতরূপ কার্য্য উভয়ই মনোহর। কালীর উপাসকেরা যেমন সকল প্রকার ভয়ানক ভাবের একত্র সমাবেশ করিতে যারপর নাই যত্নপরায়ণ হইয়াছেন, সেইরূপ কৃষ্ণের উপাসকগণও, আনন্দজনক ভাবসংগ্রহে, যিনি যেস্থান হইতে পারিয়াছেন, তিনি সেই স্থান হইতে উপকরণ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কালীর বাসস্থান ভয়ানক শ্মশান, কৃষ্ণের বাসস্থান মনোহর বৃন্দাবন। কালীর হস্তে ভয়ানক খড়্গ। কৃষ্ণের হস্তে মনোহর মুরলী। কালীর কলেবর রুধির লিপ্ত। কৃষ্ণের শরীর চন্দন-চর্চ্চিত। কালী ঘোররবা। কৃষ্ণ মিষ্টালাপী। কালী রণরঙ্গিনী; কৃষ্ণ নৃত্যগীত পরায়ণ। কালীর গলদেশে মুণ্ডমালা। কৃষ্ণের কণ্ঠে কুসুমহার। সংক্ষেপত কালীর ভয়ানক বেশ। কৃষ্ণের মূর্ত্তি মনোহর। কালীর উপাসক নানাপ্রকার প্রাণী বলিদান করে; কৃষ্ণের উপাসনায় বলি নিষিদ্ধ। কালীর পূজাকাল অমাবস্যা তিথি এবং ঘোররূপা রাত্রি। মৃতদেহে উপবিষ্ট হইয়া, শ্মশানে তাঁহার সাধন সম্পন্ন করিতে হয়। পূজার বাদ্যযন্ত্র ঢক্কা, ও উপ-

হার পুষ্প রুধিরবর্ণ জবা। তান্ত্রিকেরা, বাহ্যত, আবার পঞ্চ মকার দ্বারা ভয়ানক সাধন প্রণালীরও বিধান করিয়াছেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ও মৈথুন, এই পঞ্চ মকারের প্রায় প্রত্যেকেই, বাহ্যত, এক এক ভয়ানক সাধন প্রণালী। বাহ্যত, বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ভাব অত্যন্ত নির্ম্মল ও উচ্চ। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসু তাঁহার "হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম" নামক পুস্তকে পঞ্চমকার সম্বন্ধে আগমসারের যে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐস্থানে মদ্য সামান্য মদ্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ, মাংস সামান্য মাংস নহে, কিন্তু জিহ্বা সংযম, মৎস্য সামান্য মৎস্য নহে, কিন্তু শ্বাস নিরোধ, মুদ্রা সামান্য মুদ্রা নহে, কিন্তু আত্মাতে পরমাত্মা মুদ্রিত আছেন এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান, মৈথুন সামান্য মৈথুন নহে, কিন্তু জীবাত্মাতে পরমাত্মার বিরাজ।

ক্রমশঃ।

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

ভূপৃষ্ঠে পরিবর্ত্তন।

এই ভূপৃষ্ঠে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ধারণা করা মানব মনের সাধ্যাতীত। অনন্ত কালসাগরে ভাসমান এই পৃথিবীর উপর, প্রত্যেক কাল-তরঙ্গ, কোন না কোন নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। কালের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে কে? আণ্ডিস বল, আল্‌প্‌স্ বল, হিমাচল বল, আজি দুই দিন ইহারা প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আশ্রয়স্থান স্বরূপ ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যখন এই সকল মহান প্রস্তর স্তূপের একটী পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুটী সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এদিকে আবার অলক্ষিত ভাবে, কতশত দ্বীপ, পর্ব্বত-শিখর সকল বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত সাগরের অগাধ জলের মধ্যে অলক্ষিত ভাবে নিজ মস্তক ক্রমে ক্রমে উত্তোলোন করিবে। কত শত স্থানে ভীষণ আগ্নেয় গিরি সকল, ভূগর্ভ হইতে গলিত প্রস্তর সকল ভূপৃষ্ঠোপরি উদ্গার করিয়া, এই পরিবর্ত্তনের সহায়তা করিবে। কত স্থানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার খণ্ড সকল, ধীর গতিতে অথচ প্রবল পরাক্রমে, পর্ব্বতোপরি হইতে মহাসাগরের দিকে ধাবিত হইবে এবং পথে যে কোন দ্রব্য পড়িবে, ঘর্ষণ ও পেষণ দ্বারা তাহাতে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটাইবে। হয়ত কত স্থান ভূমিকম্প দ্বারা স্ফীত হইয়া উঠিবে এবং অপর স্থান সকল তজ্জন্যই আবার নিম্নতা প্রাপ্ত হইবে। এই সকল পরিবর্ত্তন যে এখনও ঘটিতেছে, এবং ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, অতীতের ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে এক বাক্যে ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। যদি স্বাভাবিক নিয়মের ঐক্যভাবের প্রতি মানব মনের বিশ্বাস স্বাভাবিক হয়, তবে কে না স্বীকার করিবেন যে, অতীতের অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, কল্পনার অতীত পরিবর্ত্তন সকল এখনও ভূপৃষ্ঠে ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে।

আমরা যদি সুন্দরবনের ন্যায় কোন নদী

মুখের নিকটস্থ স্থান খনন করিয়া দেখি, তবে সেই মৃত্তিকার মধ্যে একরূপ গঠন দেখিতে পাই না। প্রথমে হয়ত কিছুদূর কর্দ্দম দেখিতে পাই; তৎপরে এক স্তর বালুকা, তন্নিম্নে মৃত্তিকা, আবার তন্নিম্ন হইতে বালুকাস্তর দেখি। এইরূপে উপর্য্যুপরি মৃত্তিকা ও বালুকারাশি স্তরীভূত দেখিতে পাই। এই সকল স্তরের মধ্যে আবার সামুদ্রিক ও অন্যান্য জীবের, এবং বিবিধ বৃক্ষের কঙ্কাল সকল পাওয়া যাইতে পারে। এই সব স্তর যে নদী জলে ভাসমান মৃত্তিকা ও বালুকায় গঠিত, তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

মৃদঙ্গার স্তরভিন্ন, সকল প্রকার স্তর নির্ম্মাণ কেবল জলের মধ্যেই সম্ভব। সুতরাং যেখানেই আমরা এই স্তরময় মৃত্তিকা বা প্রস্তর দেখিতে পাই না কেন, তাহা যে এক সময়ে জলের মধ্যে নিহিত ছিল, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না। বিশেষত কখন কখন এই সকল স্তরের মধ্যে প্রস্তরীভূত সামুদ্রিক জীব কঙ্কাল সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কৌতুকাগারে যে প্রকাণ্ড কচ্ছপের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, সিবালিক্ পর্ব্বতের উপরি ভাগ হইতে সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, তাহা একটী সামান্য কৌতুককর দ্রব্য নহে। হিমালয়ের উপর হইতেও এই প্রকার অনেক কঙ্কাল সংগৃহীত হইয়াছে। ইহারা স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে যে, আজি যে হিমাচল ও সিবালিক পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়া, পৃথিবীর আশ্রয় দণ্ড স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এমন একদিন ছিল, যখন ইহাদের উন্নত শিখরের উপর, মহাসাগরের তরঙ্গমালা খেলা করিত। এই সকল পর্ব্বত যেপ্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা প্রথমে নদীজলে ভাসমান বালুকা দ্বারা সাগর গর্ভে সংগঠিত হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহাদের স্তরের গঠন সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্তরমধ্যে জীব-কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোন স্থলেই যে বালুকাদি স্তরীভূত হইলেই প্রস্তর আকার ধারণ করে, এমন নহে। যখন স্তরীভূত বালুকারাশি কথঞ্চিত উত্তপ্তাবস্তায় অত্যন্ত গুরুভার বস্তু দ্বারা পেষিত হয়, তখনই এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। সহজেই বুঝিতে পারা যায় সমুদ্রের তল দেশে, জলের চাপে এরূপ প্রস্তর গঠিত হইতে পারে। যথায় অল্প জলের নিম্নে স্তর সংগঠিত হয় তথায় প্রস্তর দেখা যায় না; কেবল মৃত্তিকা ও বালুকা প্রভৃতি দেখা যায়।

আর একপ্রকার প্রস্তর খাসিয়া পর্ব্বত প্রভৃতি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে দেখা যায় ইহা দেখিতে উজ্জ্বল এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বচ্ছ। অভ্র ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।—জীব-সকলের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্ভবত ইহা পূর্ব্বে স্তরীভূত (Stratified) প্রস্তর ছিল, কিন্তু উত্তাপ ও জলের ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত (Metamorphosed) হইয়া, এরূপ উজ্জ্বল, ও কথঞ্চিৎ স্বচ্ছ আকার ধারণ করিয়াছে।

জলের নিম্নে গঠিত হইলে, প্রস্তরের পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার গঠন দেখা যায়। কিন্তু তদ্ভিন্ন উত্তাপের ক্রিয়া দ্বারাও অন্যরূপ প্রস্তর প্রস্তুত হয়। আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নুৎপাত কালে, গলিত প্রস্তর ও ধাতু স্রোত প্রবল বেগে পর্ব্বতমুখ হইতে উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। এই গলিত প্রস্তর ও ধাতু শীতল হইলেই, স্বাভাবিক প্রস্তরের আকার ধারণ করে। এই প্রকার প্রস্তরে (Volcanic)

জীবদেহ চিহ্ন থাকা অসম্ভব। ইহা অত্যন্ত কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ। নাগপুর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ইহা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, কোন অতীত সময়ে, এই সকল স্থান, অগ্ন্যুৎপাত-জনিত ভীষণ উত্তপ্ত গলিত-ধাতু-প্রস্তর স্রোতে দগ্ধ হইয়াছিল। কখন কখন নিম্নে স্তরীভূত প্রস্তর থাকিলেও তদুপরি আগ্নেয় গিরি নিস্থত প্রস্তর রাশি অবস্থিত দেখা যায়। সম্ভবত এই সকল অগ্ন্যুৎপাত সমুদ্রগর্ভে হইয়াছিল। অদ্যাপি প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে এরূপ অগ্ন্যুৎপাত অনেক সময় ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু অগ্নির ক্রিয়া দ্বারা আর একপ্রকার প্রস্তর (Granite) উদ্ভূত হয়, ইহা আগ্নেয়-গিরিনিস্থত প্রস্তরের ন্যায়, স্তরীভূত প্রস্তরের উপর অবস্থিত হয় না; কিন্তু তাহার নিম্নে দেখা যায়। কখন বরফ, বৃষ্টি, প্রভৃতির ক্রিয়া দ্বারা পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ স্তরীভূত প্রস্তর স্থানান্তরিত হইলে, তন্নিম্নে এই প্রকার কঠিন আগ্নেয় প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা দেখা যায়, স্তরীভূত প্রস্তরের মধ্যে উক্ত প্রস্তর রাশি (Granite) সমাহিত রহিয়াছে। ইহা উত্তপ্ত তরলাবস্থায় ভূগর্ভে ছিল। পরে কোন গহ্বর দ্বারা, ভূগর্ভ হইতে অধোদিক দিয়া, স্তরীভূত প্রস্তর রাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। কাল ক্রমে শীতল হইয়া কঠিন প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। কখন কখন ইহার নিকটস্থ স্তরীভূত প্রস্তর, উত্তাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, স্বচ্ছ আকার ধারণ করে। এপ্রকার প্রস্তর (Granite) অত্যন্ত কঠিন।

ভূপৃষ্ঠে প্রধানত এই চারিপ্রকার প্রস্তর দেখা যায়। আমরা ইতঃস্তত যে কোন প্রস্তর দেখি না, তাহা ইহাদের কাহারও অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে দুই প্রকার (স্তরীভূত ও তৎপরিবর্ত্তন জনিত প্রস্তর) জল যুক্ত স্থানে সংগঠিত; অপর দুই প্রকার প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্ত, ও তরল অবস্থায় ভূগর্ভে ছিল। কিন্তু ক্রমে শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে। পরে এক প্রকার আগ্নেয়গিরি মুখে নিস্থত হইয়া ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে (Volcanic), অপর প্রকার ভূগর্ভ হইতেই স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠের স্তর সকলকে কথঞ্চিৎ স্থানান্তরিত করিয়া, তাহাদের স্থানাবরোধ করিয়াছে (Granite)। সর্ব্বাপেক্ষা স্তরীভূত প্রস্তরই বিশেষ কৌতুককর পদার্থ; কারণ ইহাতেই আমরা পরিবর্ত্তনের লক্ষণ সকল বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিতে পারি।

প্রথমে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রস্তর খণ্ড সকল, বরফ ও বৃষ্টির ক্রিয়া দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইলে প্রবল নদীস্রোতে তাহারা চূর্ণ চূর্ণিত হয়; এবং তদ্দ্বারা বাহিত হইয়া অনন্ত সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই সাগরের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে আবার তাহারা স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া, কোন দূর দেশে দ্বীপাদির গঠনে সাহায্য করে।

কখন কখন সামুদ্রিক জন্তু বিশেষ ইহার সহায়তা করে। যে সকল পদার্থ জলে দ্রব থাকে, তাহারা সমুদ্রের তলদেশে পড়িতে পারে না। চূর্ণ এবং অন্যান্য ক্ষার ইহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু এ সকল পদার্থ দ্বারা প্রথমে অসংখ্য জলজন্তুর অস্থি ও আবরণাদি প্রস্তুত হয়; পরে যখন ঐ জন্তুগণ প্রাণত্যাগ করে, তখন উহাদের শরীর সমুদ্রতলে পতিত হয়। এইরূপে কোন কোন প্রকার প্রস্তরের সৃষ্টি হয়। খড়ি তন্মধ্যে প্রধান। ইহা ফোরামিনিফিরা নামক ক্ষুদ্রসামুদ্রিক জীবের স্তূপাকার কঙ্কাল বিশেষ মাত্র। অদ্যিও আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রভূত পরিমাণে এই পদার্থ সঞ্চিত হইতেছে। কালে হয়ত ইহাই ভূমির উপর উঠিবে, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ পর্ব্বতরূপে শোভা পাইবে। প্রবাল কীট নির্ম্মিত প্রবালদ্বীপ, ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত।

এইরূপে ভূপৃষ্ঠে, পরীক্ষা করিলে, স্তরের উপর স্তর অবস্থিত দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আমরা জগতের অতীত ইতিহাস পাঠ করি। মানবের বৎসরাদি দ্বারা সে অতীতকে পরিমাণ করা যায় না। সামান্য বৎসর অথবা শতাব্দির সহিত তুলনায়, সে অতীতকে অনন্ত বলা যাইতে পারে। তবে এই কালকে কয়েকটীযুগে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ম যুগে ছয়টী স্তর গঠিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তিনটী সর্ব্বনিম্নস্তরে, অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর দেহের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। চূর্ণ প্রস্তর, ও প্রবালাদিও ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪র্থ স্তরে মৎস্যের চিহ্ন পাওয়া যায়; এবং পঞ্চমস্তরে তাল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ দেখা যায়। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথমযুগে অতি সামান্য সামান্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১ম যুগের স্তর

(১) লরেন্সিয়ান (২) কেম্ব্রিয়ান, (৩) সিলিউরিয়ান (৪) ডিভোনিয়ান (৫) কার্বোনিফেরস্, (৬) পার্থিয়ান।

২য় যুগ (১) ট্রায়াসিক্, (৩) উলাইটিক, (৩) ক্রিটেসস।

(১) প্লিওসিন (১) ইয়োসিন (৩) মিয়োসিন।

দ্বিতীয় যুগে তিনটী প্রধান স্তর। এই তিনটীর মধ্যে সরীসৃপের প্রস্তরীভূত দেহ দেখা যায়। * এই সকল দেহ বালুকাসংযুক্ত জলে নিমগ্ন ছিল। পরে যেমন স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা, দেহস্থ পরমাণুগুলি এক একটী করিয়া জলে নির্গত হইয়াছিল, অমনি জলস্থ বালুকা, তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই রূপে ক্রমে সমস্ত জীব দেহটী প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে।

এই যুগে এমন কতকগুলি সরীসৃপ জাতীয় জীবের প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া যায়, যেরূপ জীব এক্ষণে জগতে জীবিত নাই। ইক্থিওসরস্ ও প্লিসিওসরস্ নামক দুই প্রকার মৎস্যভুক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি অনেকাংশে কুম্ভীরের ন্যায়; কিন্তু কুম্ভীর অপেক্ষা আয়াতনে অনেক বড়। শেষোক্ত প্রকার জীবের গল দেশ, শরীরের অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়। ইহাদের কঙ্কালের নিকটে কখন কখন প্রস্তরীভূত মৎস্যাস্থি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ইহারা মৎস্যভুক ছিল। টেরোড্যাক্টাইল্ নামক আর এক প্রকার উড্ডীয়মান সরীসৃপ তখন জগতে ছিল। ইহাদের আকৃতি বাদুড়ের ন্যায়; কিন্তু এত বৃহৎ যে, একটীর প্রত্যেক পাখার পরিমাণ ২১ ফিটের অধিক।

সরোরি নামক আর এক প্রকার জীবদেহের অবশিষ্টাংশ এই স্তরে পাওয়া যায়। ইহার গঠন সরীসৃপ ও পক্ষীর মধ্যবর্ত্তী সরীসৃপের ন্যায়, লাঙ্গুল পক্ষীর ন্যায় পালকে শোভিত।

শেষোক্ত দুই প্রকার জীবের দেহাবশেষ পরীক্ষা করিলেই সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, এই জগতে সরীসৃপের পর পক্ষী একবারে

* কুম্ভীর এক প্রকার সরীসৃপ জাতীয় জীব।

জন্মগ্রহণ করে নাই। ক্রমবিকাশদ্বারা সরী সৃপের আকার ক্রমে পক্ষীর আকারে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয়যুগে তিনটী স্তর। ইহাতে মানব ভিন্ন, অন্যান্য অনেক স্তন্যপায়ী জীবের প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া যায়। পক্ষীগণ এযুগেই তাহাদের প্রকৃত আকার প্রাপ্ত হয়। ক্রমবিকাশদ্বারা জীবদেহ বানরের আকার ধারণ করে।

৪র্থ যুগে মানবের আবির্ভাব। এই সময় হইতেই আমরা এই পৃথিবীর অধিকারী হইয়াছি। কে জানে কবে প্রথমে মানব পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল? আমারা তাহা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারি না।

এই সময়ের মধ্যে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব জাতি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিল, আবার তাহাদের বংশাবলী লোপ পাইল। আমরা সকলেই এরূপ এক মহা পশুর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, কলিকাতার কৌতুকাগারে দেখিয়াছি। এই পশু হস্তীজাতীয়। এক্ষণে ইহা দেখা যায় না। এই প্রকার আরও কত শত জীবজাতি এই যুগে জন্মিয়াছে, ও লোপ পাইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তথাপি পৃথিবীর বয়ক্রমের সহিত তুলনায়, এযুগ মূহুর্ত্ত মাত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহা এত অল্প যে, এযুগে প্রথম অবধি আজি পর্য্যন্ত একটীও স্তর গঠিত হয় নাই। এই সকল ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। মানুষ কত কল্পনা করিবে? কল্পনা কতদূর যাইতে পারে? যতদূর যাউক, এই পৃথিবীর একটী পরমাণুরও ইতিবৃত্ত আয়ত্ত করিতে পারে না। যত ভাব, যত কল্পনা কর, শেষে দেখিতে পাইবে, তথাপিও যেন কত কি অবশিষ্ট রহিয়াছে। এ কাল-সাগর সন্তরণ করা ক্ষুদ্র-শক্তি মানবকল্পনার অসাধ্য।

ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

কোন্ ইংরাজ সর্ব্ব প্রথম ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। হেক্‌লিয়ট তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংগ্রহে দেখাইয়াছেন যে, রাজা অলাফ্রডের শাসনকালে তিনি "সারবর্ণের বিসপ সিগিলমাছ" কে পূর্ব্বদেশে প্রেরণ করেন। ইনি সেণ্টটমাসের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাজদত্ত উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। কিন্তু বিসপসাহেবের ভারতাগমন সম্বন্ধে, অনেকের সন্দেহ আছে। যাহা হউক, তৎপরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমরা কোন ইংরাজকে ভারতে দর্শন করিতে পাইতেছি না।

খ্রীষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে, বিখ্যাত ইংরাজ নাবিক ড্রেক জগত পর্য্যটন করিয়া ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশ-ঘোষণা হইতে লাগিল। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ্ স্বয়ং তাঁহার জাহাজে আসিয়া 'নাইট' উপাধিদ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সাধারণ ইংরাজমণ্ডলী পর্য্যটনব্রত গ্রহণে সমুৎসুক হইলেন। সফোক্ নিবাসী টমাস্ কেবেন্‌ডিস আবার পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। তিনি ড্রেকের ন্যায় সমুদ্রপথে বাহিরে বাহিরে জগৎ পর্য্যটন করিয়া, উত্তমাশা অন্তরিপ ঘুরিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

এবার আমাদের পরিব্রাজক ফিচ সাহে-

বের সময় উপস্থিত হইল তিনি কেবল অসীম অনন্ত জলরাশির বক্ষে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ মধ্যে বিচরণ করিয়া, স্বজাতির ভাবী উন্নতির পথ প্রদর্শন জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ষ্টিবেন্‌স নামক জনৈক ইংরাজ, পর্টুগীজদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া গোয়ায় আসিয়াছিলেন। দরিদ্র ইংলণ্ডবাসী ভারতের ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্বদেশবাসীদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন;—

"ভারতের বনে পাখী গায় গান,
স্বর্গ মেঘ মাখা ভারত বিমান,
হেথাকার লতা ফুল ফলে ভরা,
স্বর্ণ-শস্যময়ী হেতাকার ধরা।"

ষ্টিবেন্‌সের চিটীতে আমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। হা বিধাত, তুমি কেন ভারতকে অতুল ধনরত্নের অধিকারিণী করিয়াছিলে? ভারতের স্রোতস্বতীতে কেন স্বর্ণরেণু প্রবাহিত করিয়াছিলে? ভারতের পর্ব্বত-গহ্বরে কেন তুমি হীরকাদি রত্নসমূহ লুক্কায়িত রাখিয়াছিলে? ভারতের অরণ্য কেন ফুল ফলে পূর্ণ করিয়াছিলে? ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তর কেন শস্য দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলে? ভারত মরুভূমি হইলে কোন দস্যুই ইহার দিকে নেত্রপাত করিত না।

ষ্টিবেন্‌সের চিটী পাঠ করিয়া ইংলণ্ডবাসীগণ ভারতে আসিবার সহজ পথ আবিষ্কার ও স্বর্ণভূমি-ভরতবর্ষ দর্শনের জন্য একান্ত লোলুপ হইলেন। একদল ইংরাজ ভূমধ্যসাগর দিয়া—সিরিয়া, আলিপ্পো ও বাগ্‌দাদনগর হইয়া, অরমাজ্ দ্বীপ এবং তথা হইতে দীর্ঘপোতারোহণে মলয়াবার উপকূলে উপ- হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রলফ্ ফিচ্ ও জন নিউবেরি এই দলের নায়ক হইলেন। তাঁহারা রাজ সমক্ষে আপনাদের অভিলাষ জানাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ্ অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক, ভারতেশ্বর আকবরের নিকট একখানা চিটী দিয়াছিলেন।

ফিচ্ সহচরগণের সহিত ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন। আলিপো ও বাগ্‌দাদ হইতে নিউবেরি সেই সেই স্থলের বাণিজ্য বিষয়ক বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা অরমাজে আসিয়া কারারুদ্ধ হন। সেই স্থান হইতে তাঁহারা গোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গোয়ায় আসিয়াও তাঁহারা পুনর্ব্বার অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ হন। প্রায় একমাস তাঁহারা ঐ অবস্থায় ছিলেন। পরে পর্টুগিজগণ তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র লেখাইয়া লইলেন যে, তাঁহারা গবর্ণরের বিনা অনুমতিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তৎপরে প্রায় পাঁচ মাস তাঁহারা গোয়ায় অবস্থান পূর্ব্বক সামান্য ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। ইংরাজগণ গোয়া পরিত্যাগের প্রার্থনা করিয়া গবর্ণরের নিকট আবেদন করিলেন। সেই আবেদনের উত্তরে তাঁহারা যে আদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের ভয়ানক আতঙ্ক হইয়াছিল। অগত্যা তাঁহারা গোয়া হইতে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আপ্রিল পলায়ন করিলেন।

বেলগ্রাম অতিক্রম করিয়া তাঁহারা হীরকাদি রত্নসমূহের বিবিধ বাণিজ্য স্থান দর্শন পূর্ব্বক অবশেষে বিজয়পুর রাজধানীতে উপনীত হন। এই স্থানে তাঁহারা হিন্দু দেবমন্দিরের জাক জমক দর্শনে বিস্মিত হইয়া-

ছিলেন। তাঁহারা বলেন, ইহার নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে অনেক মন্দির ও দেবতা আছে, সেই সকল, গরু, বানর, ময়ূর ও ভূতের আকৃতি বিশিষ্ট। বোধ হয়, ইংরাজগণ শিবের বৃষ, মহাবীর হনুমান ও কার্ত্তিকের বাহন প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া এরূপ লিখিয়াগিয়াছেন।

এক্ষণ হইতে ফিচের লেখাই আমাদের প্রধান অবলম্বন, সুতরাং আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ফিচ বলেন, তিনি বিজয়পুরপতির ঐশ্বর্য্য ও যুদ্ধগজ দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি গোলকন্দায় গমন করেন। তথাকার রাজধানী একটী মনোহর নগরী, তাহার ঘর গুলি প্রায়ই ইষ্টক ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত। সেই রাজ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, তাহার চতুর্দ্দিকে হীরকের আকর। তিনি সেই স্থানে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তাহার অনতিদূরে মসলিপত্তন নামে এক সুন্দর বাণিজ্যোন্নত নগরী আছে।

ফিচ গোলকন্দা হইতে খান্দেশের রাজধানী ব্রহ্মপুরে গমন করেন। তিনি বলেন, এই রাজ্য অত্যন্ত উর্ব্বরা ও লোক পরিপূর্ণ। কিন্তু ঘরগুলি প্রায় মৃত্তিকা ও খড় নির্ম্মিত। বর্ষাকালে এই দেশের পথ ঘাট একবারে অগম্য হইয়া পড়ে। এই স্থানে ভারতের সর্ব্বনাশকারী বাল্য বিবাহ প্রথম দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ৮।১০ বৎসরের একটী বালককে ৫।৬ বৎসরের একটী শিশু কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করা হইয়া থাকে। বোধ হয়, ফিচ কোন একটী ধনী পরিবারের বাল্যবিবাহ দর্শন করিয়াছিলেন। এজন্যই তিনি বাল্য বিবাহের আড়ম্বর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।*

তথা হইতে গমন করিয়া ফিচ মালবদেশের প্রাচীন রাজধানী মণ্ডলনগরী দর্শন করেন। তিনি বলেন, এই নগর পর্ব্বতপোরে সংস্থাপিত ও শত্রুর দুরাক্রম্য। আকবর ক্রমাগত দ্বাদশবৎসর চেষ্টা করিয়া এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। ফিচের লেখা পাঠ করিয়া এস্থলে বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া রাণী দুর্গাবতীর অপূর্ব্ব ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। যাহা হউক, আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সেই সকল কথা পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিব। সেই স্থান দর্শন করিয়া তিনি আগ্রায় গমন করিয়াছিলেন। আগ্রা নগরের অতুল ঐশ্বর্য্যের তিনি অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাহার সেই সকল বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। তিনি বলিয়াছেন যে, এই নগরী ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন হইতেও উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন যে, এই সময় মোগল সম্রাট

* ভারতের সর্ব্বত্রই বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু সকল স্থানের বাল্যবিবাহ তত দূর অনিষ্টকর নহে। উড়িষ্যাবাসী করণ-কায়স্থ ব্যতীত অন্য সকল জাতিতে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু তাঁহারা বাল্য বিবাহের পরেই বর কন্যা স্বতন্ত্র রাখেন, বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে পরস্পর সাক্ষাত হইতে পারে না। অসভ্য মিতাই (মণিপুরীয়া)দিগের মধ্যেও আমরা এই প্রথা দর্শন করিয়াছি। যদি কখনও মিতাইদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ হয়, তাহা হইলে রজদর্শনের পূর্ব্বে কখনও স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাত হইতে পারে না। বঙ্গদেশীয় গোঁড়াগণ যদি একান্তই বাল্য বিবাহ পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অন্তত তঁহারা এই প্রথাটী অবলম্বন করিলেও দেশের অনেক মঙ্গল হইতে পারে।

ফতেপুরে বাস করিতেছিলেন। ফতেপুর যদিও আগ্রার ন্যায় তত সুন্দর নহে, কিন্তু তদপেক্ষা আরও বৃহৎ। এই দুই নগরীর মধ্যবর্ত্তী পথ, বাজারের ন্যায় এরূপ লোক পরিপূর্ণ যে, তাহাকে সহর বলিয়া ভ্রম হয়। ক্ষুদ্র (কিন্তু) স্বর্ণখচিত ও বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা আবৃত গোসকটে আরোহণ করিয়া দেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া ফিচ বিস্মিত হইয়াছিলেন। যমুনাতীরে তিনি ব্রাহ্মণদিগের স্নান পূজা তর্পণাদি দর্শন করিয়া, তাহার আশ্চর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি উলঙ্গ যোগী সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমি কতকগুলি উলঙ্গ ভিক্ষুক দর্শন করিয়াছিলাম; তন্মধ্যে এক জন অদ্ভুত জন্তু বিশেষ। তাহার দাড়ি ভয়ানক লম্বা, তাহার চুল শরীরের মধ্য ভাগ অতিক্রম করিয়া বিলম্বিত রহিয়াছে। তাহার নখগুলি ২ ইঞ্চ লম্বা, সে তাহার শরীরের কিছুই কাটিয়া ফেলে না। সে কোন কথা বলে না। এমন কি, স্বয়ং রাজা কোন প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর দেয় না।" তিনি ব্রাহ্মণদিগকে "জু" হইতেও অধিক শঠ, প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দিয়াছেন।

ইংরাজ ভ্রমণকারিগণ সকলেই আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু উইলিয়ম লিডোর নামক বণিক আকবরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তথায় রহিলেন। আকবর তাঁহাকে একখানা বাড়ী ও ঘোড়া এবং পাঁচ জন দাস দিয়াছিলেন। তিনি রাজসরকার হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আকবরের সহিত অবশ্যই ফিচের কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু কি কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি লিখিয়া যান নাই।

আগ্রা হইতে ভ্রমণকারী, গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থিত প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে কাশীতে গমন করেন। তিনি কাশীর বাণিজ্য, দেবমন্দির, অট্টালিকা ও হিন্দুদিগের কুসংস্কার ইত্যাদি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কাশীতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পৌত্তলিকতা অত্যন্ত অধিক প্রবল বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই নগরের সর্ব্বত্রই বিবিধ আকারের প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনটীই দেখিবার বস্তু নহে। তিনি বলেন "তাহার অধিকাংশই কৃষ্ণ বর্ণ ও সুদীর্ঘ নখযুক্ত এবং পিত্তলের হস্তযুক্ত। কোন কোনটীর বাহন, ময়ূর ও অন্যান্য দীর্ঘ নাসাযুক্ত পক্ষী। কোনটার এটা—কোনটার ওটা আছে, কিন্তু কোনটারই মুখ সুন্দর নহে। এ সকল কাল ও ভূত সদৃশ, বিকট মুখ, তাহাদিগের কর্ণ মণিমুক্তাদ্বারা জড়িত, তাহাদের চক্ষু ও দন্ত স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত। এই বিকট প্রতিমা গুলির পূজাদি, বিচিত্র ও আশ্চর্য্যজনক। বিশেষত হিন্দুদের গঙ্গাস্নান আরও কৌতুহলজনক দৃশ্য। তাহারা জলে নামিয়া উপাসনা করে, ডুব দিয়া স্নান করে এবং দুহাত পূর্ণ করিয়া জলগ্রহণ করে, (কথাটা তর্পণ) কেহ বা ১৫।১৬টী পাত্র লইয়া পূজা করে, এবং একটী হইতে অন্যটীতে জল ঢালে; তখন ঘণ্টা বাজায় এবং পাত্রগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া নানা কথা বলিতে থাকে। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া তাহারা দেবতার নিকট যাইয়া বলি প্রদান

করে এবং এই কার্য্যকে তাহারা অত্যন্ত পবিত্র বিবেচনা করে।

ফিছ সাহেব সতীদাহ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, যেসকল স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে অপারগ হয়, তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যখন দেশবাসী কোন ব্যক্তি পীড়িত হয়, তখন তাহাকে প্রতিমার নিকট সমস্ত রাত্রি রাখা হয়, যদি ইহাতেও কোন আরোগ্য চিহ্ন পরিলক্ষিত না হয়, তবে এক খানা ভেলায় করিয়া জলের নিকট লইয়া যায় ও জলে ভাসাইয়া দেয়। (বোধ হয় সাপেকাটা মরা জলে ভাসাইয়া দিতে ফিছ দর্শন করিয়াছিলেন।)

ফিছসাহেব কয়েকটা বিবাহ উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয়ের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, আদ্যোপান্ত বিকৃত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাশীর বর্ণনা আমরা যাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং বিবাহ উৎসবের তিনি যে বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম; সংক্ষেপে বিবাহের একটী অঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে। বর ও কন্যা পক্ষীয় লোকেরা বৎস সহ একটী গাভী লইয়া আসে, পরে একজন বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ও পুরোহিতকে লইয়া জলে গমন করে। পাত্রী বরের হাত ধরে। সকলে মিলিয়া গাভীর লেজ ধরে। তৎপর একটী পাত্র হইতে গাভীর লেজে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বর ও পাত্রীর কাপড়ে গ্রন্থি বাঁধিয়া দেয়। তৎপর তাহারা দরিদ্রকে কিছু দান করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে গাভী বৎস দান করে। তৎপরে প্রতিমার নিকট যাইয়া টাকা পয়সা দিয়া মাটীতে গড়াগড়ি যায়।

কাশী হইতে ফিছ পাটনায় গমন করেন। তিনি বলেন, পাটনা একটী বৃহৎ নগরী। কিন্তু তাহার ঘরগুলি মাটী ও খড়ের নির্ম্মিত। সর্ব্বদা এই প্রদেশে অত্যন্ত ডাকাতের ভয়, ডাকাতেরা দলবদ্ধ হইয়া আরবদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করে। অলস লোকেরা সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া সাধারণ লোককে প্রতারণা করে। একজন বাজারের মধ্যে ঘোড়ার উপরে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, লোকেরা আসিয়া তাহার পদবন্দনা করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাকে একজন মহাত্মা বলিয়া বিবেচনা করিল। কিন্তু আমি তাহাকে একজন অলস বলিয়া স্থির করিলাম।

কিছুদিন পরে বাঙ্গলার রাজধানী তণ্ডায় গমন করেন। এই সময় তণ্ডা আকবরের অধীন ছিল। তিনি তণ্ডা হইতে কুঁচরাজ্যে গমন করেন। আমরা এস্থান তাঁহার বর্ণনার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"আমি বাঙ্গালা হইতে কুঁচদিগের দেশে যাই। তণ্ডা হইতে এই রাজ্যের রাজধানী ২৫ দিবসের পথ। এই দেশের রাজা হিন্দু; তাঁহার নাম সুকল কন্‌সি (শুক্ল গোঁসাই) তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত এবং কোচিন চীন হইতে অনেক দূরে অবস্থিত নহে। কারণ ঐ দেশাবাসীরা বলে যে, সেই স্থান হইতে তাহাদের দেশে মরিচ আমদানী হয়। এই রাজ্যের প্রধান বন্দর "কোচি গাঠা" (চিকাকাটা) গ্রামের চতুর্দ্দিকে বাঁস ও বেতের দ্বারা বেষ্টিত। ইহার অগ্রভাগ সরু এবং মাটীতে পোতা। এই সকল

(বাঁস) ছাড়িয়া দিলে সমস্ত দেশ প্রায় হাঁটু জলে পূর্ণ হয়। সুতরাং কোন মানুষ যাইতে পারে না। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা জল বিষাক্ত করে। এস্থানে রেসম, মৃগনাভি ও সুতার কাপড় পাওয়া যায়। অধিবাসীদিগের কাণ অত্যন্ত বড়। এবং শৈশবাধিই এইরূপ কাণ বড় করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। এই স্থানের অধিকাংশ লোকই হিন্দু। তাহারা কোন প্রাণীবধ করে না। পশু পক্ষীদিগের জন্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে, এই গুলি বৃদ্ধ কিম্বা অচল হইলে মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত পালন করে। যদি কেহ কোন জীবিত জন্তু তথায় লইয়া যায়, তবে তাহারা তাহা ক্রয় করিয়া ঐ চিকিৎসালয়ে রাখিয়া দেয়, অথবা ছাড়িয়া দেয়। পিপীলিকাকে তাহারা খাইতে দেয়। তাহাদের যাহা কিছু সম্পত্তি, সে কেবল একমাত্র বৃক্ষের ফল। ইহা তাহারা প্রায় সকল সময়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে।"

তৎপর তিনি পর্টুগিজদিগের বাণিজ্য স্থান হুগলীতে আইসেন। তথা হইতে উড়িষ্যা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই দেশের সীমান্ত ভাগ বন জঙ্গলে পূর্ণ, অতি অল্পই লোকালয় দেখা যায়। তথাকার তৃণগুলি মনুষ্য হইতেও উচ্চ। সেই জঙ্গলে অনেক বাঘ আছে। এই প্রকার অরণ্যময় দেশেও তিনি একটী বন্দর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম "এন্‌জিলি" (হিজলী) সুমত্রা, মলাক্কা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে জাহাজ সকল বাণিজ্যার্থ এস্থানে সমাগত হয়।

তৎপর তিনি সপ্ত গ্রামে আসিয়া ত্রিপুরায় গমন করেন। তখন ত্রিপুরা নাম মাত্র স্বাধীন নহে, সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফিছ বলেন যে, চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া ইহা বলিয়াই মনে মগদিগের সহিত, ত্রিপুরার প্রশান্ত ভাব, সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। মগ রাবণের ত্রিপুরার রাজা হইতে পরাক্রমশালী শিষ্টের তিনি বারম্বার চট্টগ্রাম অধিকার করায় সক্ষম হইয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি বাণিজ্য-উন্নত চট্টগ্রাম দর্শন করিয়া বাকলায় (চন্দ্রদ্বীপ) গমন করেন। বাকলাপতি জমীদার নহেন, তখন বাকলার রাজা ছিলেন। তিনি আধুনিক উপাধি-প্রাপ্ত "মহারাজাধিরাজ" দিগের ন্যায় রাজা নহেন, কাশ্মীর সিন্ধিয়া হোলকর প্রভৃতির ন্যায় নাম মাত্র সামন্ত রাজা। বাকলার সম্বন্ধে ফিছ লিখিয়াছেন—

"আমি চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় যাই। এই দেশের রাজা হিন্দু। তিনি বন্দুক ও কামান ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী। তাহার রাজ্য, বিস্তৃত ও উর্ব্বরা। এখানে অনেক চাউল, কার্পাস ও রেসমী বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজ্যের ঘর গুলি সুন্দর ও উচ্চ, পথ গুলি প্রশস্ত। অধিবাসী অধিকাংশই উলঙ্গ। কেবল এক টুকরা কাপড় দ্বারা কটীদেশ ও তাহার নিম্নভাগ আচ্ছাদিত। স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠ ও হস্ত, রৌপ্যালঙ্কার দ্বারা পরিপূর্ণ। পায়ে রৌদ্র কিম্বা তাম্র-নির্ম্মিত একপ্রকার অলঙ্কার ও গজদন্ত নির্ম্মিত রিং (মল)।"

বাকলা হইতে ফিছ শ্রীপুরে গমন করেন, তিনি বলেন, এই রাজধানী গঙ্গা-স্রোতে অবস্থিত। রাজার উপাধি "চৌধুরী।" দেশীয় রাজাগণ সকলই তাঁহাদের সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এখানে এত নদী ও দ্বীপ আছে যে, তাহারা একটী হইতে অন্যটীতে পলায়ন করিলে, আক-

করে এবং এই ক তাঁহাদের কিছুই করিতে
পবিত্র বিবেচনা নানে কার্পাস বস্ত্র প্রচুর
ফিছ সাস্তত হয়।

করিয়া পর তিনি সুবর্ণ গ্রামে গমন করেন। বলে বলেন, শ্রীপুর হইতে সুবর্ণগ্রাম ৬লিগ দূরে অবস্থিত। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র এই স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই দেশের প্রধান রাজা ঈশা খাঁ। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং খ্রীষ্টানদিগের প্রতি সদয়। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নবেম্বর অর্ণব পোতারোহণে পিগু প্রদেশে যাত্রা করেন। তৎপর ফিছ, পিগু রাজধানী দর্শনার্থ মলাক্কা দ্বীপে গমন করেন। এই সময় পর্টুগীজগণ বাণিজ্য দ্বারা সেই স্থানে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন। মলাক্কা অবস্থান কালে তিনি চীন ও জাপান সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তথা হইতে সিংহল দ্বীপে গমন করেন। সিংহল হইতে কোচিন দর্শন করিয়া ফিছ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ইংলণ্ডবাসিগণ তাহার নিকট ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্যের সুবিধার কথা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ দিল্লীশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। বারান্তরে আমরা প্রথম ইংরাজ দূতের ভারতাগমন পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ভবভূতি।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত গ্রন্থ সমূহ, সংস্কৃত ভাষায় এক একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ভাষার উৎকর্ষে, কল্পনার বিকাশে, এবং ভাবের গভীরতায়, তাঁহার রচনা সংস্কৃত ভাষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় কেন, তাঁহার সমকক্ষ কবি, জগতের সকল দেশের সকল ভাষাতেই দুর্লভ। তিনি স্বভাব বর্ণনে যেমনই নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মানব চরিত্র চিত্রনে তেমনই অনুপম ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ শ্যাম অথচ ভীষণ গম্ভীর মধ্যারণ্য ভূভাগের বর্ণনা পাঠ করিলে যেমনই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়, বহু যোজন বিস্তৃত, শ্বাপদ-কোলাহল-পরিপূর্ণ এবং বৃহৎকায় সর্পগণের দীর্ঘশ্বাসে নিরন্তর উত্তপ্ত সেই প্রকাণ্ড কাননের দৃশ্য যেমনই প্রত্যক্ষবৎ হৃদয়ে উদিত হয়, তেমনই, অপ্রাপ্ত-যৌবনা বালিকা সীতার মুখমণ্ডলবর্ণনা পাঠ মাত্র পাঠকের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক করিয়া দেয়। কিন্তু তাঁহার অধিকতর প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি কেবল জগতের শোভা ও সৌন্দর্য্য মাত্র লইয়া প্রতিভা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেন নাই। সংস্কৃত কবিগণের সাধারণ দোষ এই যে, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই জগতের সৌন্দর্য্যের জন্যই কাতর। তাঁহারা এরূপ ভাবে আপন আপন বর্ণনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, যেন জগতে সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা নাই। অথবা থাকিলেও তাহা প্রতিভাশালী ব্যক্তির নিকট আদরের সামগ্রী নহে। জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহাতে চিত্ত মুগ্ধ হয়, যাহাতে বহিরিন্দ্রিয় সমূহ অথবা অন্তরিন্দ্রিয় বিমোহিত ভাবে তদ্গত থাকে, তাঁহারা তাহার বর্ণনায় লেখনী নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমার মধুময় কিরণ, মলয় বায়ুর হিল্লোল, কুসুমিত লতার নৃত্য, যুবতীর আবেগময়ী বিলাসদৃষ্টি, ইহাদিগেরই বর্ণনায় তাঁহারা আপন আপন কাব্য অথবা নাটক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যাহাতে হৃদয় বিস্মিত হয়, অন্তরিন্দ্রিয় বিকশিত হয়, মহানের সত্তা অনুভব করিয়া হৃদয়ে মহান ভাব ধারণ বরিতে শিক্ষা করে, তাঁহাদিগের গ্রন্থে এ সকলের অতি গুরুতর অভাব। তাঁহাদিগের রচনা কুসুমশোভিত উপবনের ন্যায়। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তোমার শরীর শীতল হইবে, সুগন্ধে তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হইবে, তুমি উল্লসিত হৃদয়ে আবেগ-ময় অন্তরে ভাবিবে কি সুন্দর, কি তৃপ্তিপ্রদ! কিন্তু ভবভূতির রচনাকুসুম মণ্ডিত উপবন নয়, তাহাতে কুসুমের কোমলতা ও সুগন্ধের অভাব নাই, কিন্তু তাহা অক্ষুণ্ণ মহাসাগরের অনুরূপ। ভাবুকের চক্ষে চাহিয়া দেখ, তুমি বিমোহিত হইবে। সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য, বুঝিতে পারিবে না, কল্লোলে তোমার কর্ণ বধির হইবে, সেই বিস্তৃত বারিরাশির উপর সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত দেখিয়া তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। সে শোভা অনন্ত, নিত্য নূতন এবং তাহার বিশালতা ও মহত্ত্ব অনুভব করিলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তুমি কত ক্ষুদ্র ও কত সঙ্কীর্ণ। অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের কল্পনা যেমন স্বল্পপরিসর ও ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে সন্নিবিষ্ট, ভবভূতির সেরূপ নয়। তাঁহার বর্ণনা সর্ব্বব্যাপিনী, ও কল্পনা সর্ব্বগ্রাসিনী। বিভিন্ন বস্তু ও বিভিন্ন চরিত্র, তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ঐশী শক্তি সম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। রামচন্দ্রের রাজোচিত প্রশান্ত ভাব, অদূরদর্শী ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণ রাবণের বিপদ্‌কালে অনবধানতা, মহামতি বশিষ্ঠের সুধীর প্রশান্ত প্রকৃতি, এবং জামদগ্ন্যের রুষভাবপূর্ণ আত্মগরিমা, রাজর্ষি জনকের সত্ত্ব গুণান্বিত অপত্য স্নেহ, সকলই তাহার বর্ণনীয় বিষয়। জগতের সকল বস্তুই তাহার নিকট সমান আদরণীয়। ভাবুকের ন্যায়, প্রকৃত কবির ন্যায়, তিনি জগতে যাহা কিছু দর্শনীয় পদার্থ দেখিতে পাইয়াছেন, অমনিই তাহার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার পাঠকগণের নিকট তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত করিবার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার বর্ণনা গুণে সকল বস্তুই মোহকর ভাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়। কি দণ্ডকারণ্য ভূভাগ, কি কুসুম-শোভিত কদম্বতরু, কি মেঘালঙ্কৃত পর্ব্বতমালা, কি গদ্‌দনাদি গোদাবরী বারি, কি চিতালোকময় ভীষণ শ্মশান ভূমি, তাঁহার বর্ণনা গুণে সকল পদার্থই সমভাবে আনন্দপ্রদ, বিস্ময়কর, অথবা ভয়াবহ। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহার রচনা সর্ব্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জিত। তিনি অনার্য্য-বংশীয় রাবণ, সম্পাতি, এবং বালীরাজার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, অথচ তাহাতে ঘৃণা বা অসূয়া প্রকাশিত করেন নাই। বৌদ্ধ তপস্বিনী, অথবা তন্ত্রসেবিকা কপালকুণ্ডলার চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া, অযথা ও অপ্রাসঙ্গিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই। নাটককারের পক্ষে এটী একটী সামান্য প্রশংসার কথা নহে। বিভিন্ন বংশীয় অথবা বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া, তাহা-

দিগকে অপ্রাকৃত দোষে ও অস্বাভাবিক গুণে বর্ণিত করিবার লোভ, অনেকেই সম্বরণ করিতে সক্ষম হন্ না। এদোষ মানবজাতির মধ্যে অতি সাধারণ; কিন্তু যিনি আর্য্য অথবা অনার্য্য, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র, শত্রু অথবা মিত্র, সকলকেই নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করিতে পারেন, তিনি যথার্থই আমাদিগের প্রশংসার পাত্র। যিনি জগতের আদি কবি ও চ্ছন্দঃ প্রণেতা, সেই মহাত্মা বাল্মীকির গ্রন্থও এই সাম্প্রদায়িকতা দোষ বর্জ্জিত নহে। তিনি রাবণ ও তাহার অনুচরগণকে অনার্য্যোচিত অতি বীভৎস ও কঠোর গুণে অলঙ্কৃত করিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। রাম ও তাহার অনুচরগণকে তিনি যেরূপ সস্নেহ নয়নে অবলোকন করিয়াছেন, রাবণ ও তাঁহার অনুচরগণের প্রতি তাঁহার তদ্রূপ ভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকির এরূপ প্রবণতা নিতান্ত অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। যখন রামায়ণ প্রণীত হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের বাস অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালীক। আর্য্যবংশ তখনও দাক্ষিণাত্যে লব্ধপ্রসরা হইতে পারেন নাই। অনার্য্যগণ তখন পর্য্যন্তও বিলক্ষণ বলবান্। তাহাদিগের প্রভুত্ব হ্রাস করিবার জন্য আর্য্যগণকে তখনও ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইতেছিল। সুতরাং জেতাজিতভাব পরস্পরের মধ্য হইতে, তখনও পর্য্যন্ত দূরীভূত হয় নাই। জেতাগণ অনার্য্যগণের বেদনিন্দিত কুৎসিতাচরণ তখনও অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য অনার্য্যবংশীয়েরা যেরূপ উদ্যম ও প্রয়াস পাইতেছিল, এবং তাহা প্রতিহত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যেরূপ গুরুতর চেষ্টা করিতে হইতেছিল; তাহা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের হৃদয়ে জাগরূপ ছিল। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে শত শত বার ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইতেছিল; এবং পবিত্র আর্য্যশোণিত, কলুষিত অনার্য্য শোণিতের সহিত মিশ্রিত করিতে হইতেছিল। সুতরাং সেই "অযজ্ঞ" "অযাজ্য" "দস্যু" সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহারা যে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাল্মীকি ত এই আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থে যে একটু সাম্প্রদায়িক ভাব থাকিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। কিন্তু বাল্মীকির সময়ে অনার্য্যগণের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ভাবের কারণ থাকিলেও, তৎপরবর্ত্তী কবিগণের সেরূপ ব্যবহারের কোনও কারণ লক্ষিত হয় না।

বাল্মীকির পরবর্ত্তী সময়েও, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকগণের প্রতি, ব্রাহ্মণলেখকগণ সময়ে সময়ে যেরূপ তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদিগের ক্রিয়কলাপ, আচার ব্যবহার যেরূপ ঘৃণিত বর্ণে বিচিত্র করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই প্রশংসনীয় নহে। অলৌকিক প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্য্য হইতে কুমারচরিত-প্রণেতা দণ্ডী পর্য্যন্ত অনেকেই, প্রাসঙ্গিকই হউক অথবা অপ্রাসঙ্গিকই হউক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের প্রতি অবকাশমত ঘৃণা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা কোনক্রমেই এরূপ রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। ইংরাজগণ যদি সিপাহীবিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়া চিরদিনই ভারতবর্ষীয়দিগকে নির্য্যাতন করেন, অথবা ভারতবর্ষীয়গণও যদি ইংরাজ সম্প্রদায় বিশেষের ইলবার্টবিল বিসম্বাদ কালীন অযথা ব্যবহার স্মরণ করিয়া

চিরদিনই তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান থাকেন, এবং যদি তাঁহারা সময়ে সময়ে পরস্পরের প্রতি কটু বর্ষণ করিয়া ও স্ব স্ব কুল্ ক্রমাগত সামাজিক আচারের অযথা বর্ণন করিয়া চিরদিনই বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে এই উভয় জাতিরই অধঃপতন ও অবনতি ভিন্ন অপর কি শুভ ফল সমুৎপন্ন হইতে পারে? ভবভূতির পূর্ব্ব অথবা পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভাবের অশুভকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ সকল বিষয়ে ভবভূতির উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। অনার্য্যগণের মধ্যেও তিনি যে দুই একটী আর্য্যোচিত গুণ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা অসত্যকে সত্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে ইচ্ছা করি না, তবে যাহাতে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, তাহা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। ভবভূতির জীবনচরিত সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত কেবলই তাঁহার প্রশংসা করিয়াই আসিতেছি; ইহাতে যে তাঁহার রচনার মধ্যে নিন্দা করিবার কোন কথাই নাই, কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন। কিন্তু প্রস্তাবের প্রারম্ভ নিন্দা অথবা প্রশংসার স্থান নহে, অগ্রে একজনের সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া, পরে নিন্দা অথবা প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য। তবে আমরা ভবভূতির দোষ অপেক্ষা গুণের অংশ অনেক অধিক দেখিতে পাই বলিয়াই হউক, অথবা আমাদিগের অন্তঃকরণ তাঁহার সহৃদয়তা গুণে বিমুগ্ধ বলিয়াই হউক, আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভেই তাঁহার দুই চারিটী প্রশংসার কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। শুদ্ধ আমরা কেন, যে কেহই নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার গ্রন্থ নিচয় পাঠ করিবেন, তিনিই তাঁহার ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় হইবেন, এবং তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে হৃদয়ের পবিত্র প্রীতি উপহার দান করিবেন।

বড় আক্ষেপের বিষয় যে, বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের নিকট ভবভূতির তত সমাদর নাই। তাঁহারা তাঁহার রচনার গভীর ভাব ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার কিছুতেই প্রশংসা করেন না। যাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি কেবলই বর্ণ যোজনা ও চ্ছন্দ নৈপুণ্যেই পর্য্যবসিত, তাঁহারা ভবভূতিকে এরূপ শ্রেণীর কবিগণ অপেক্ষাও নিম্ন স্থান প্রদান করেন। এরূপ করাই নিতান্ত সম্ভব। বঙ্গদেশে প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ তর্ক-প্রধান দেশে হৃদয়ের তত সমাদর নাই, সুতরাং যিনি হৃদয়ের কবি, তাঁহার যে সমাদর হইবে না, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? আজি ইয়ুরোপ খণ্ডে শাক্যসিংহের পূজা হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি একরূপ অপরিচিত।

সাধারণের নিকট যে ভবভূতির তাদৃশ সমাদর নাই, ইহাতে আমরা বাস্তবিকই কিছুমাত্র বিস্মিত হই না। ব্যাস বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিলে, (তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁহাদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় অন্য কবির তুলনা হয় না) নব কবিগণকে আমরা সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া মনে করি।

এই তিন শ্রেণীর মধ্যে, প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব শক্তি সহৃদয়তায় পরিপূর্ণ, তাঁহাদিগের অধিকার হৃদয়ের উপর। সে কবিত্বে চঞ্চলতা অথবা সম্ভোগ স্পৃহার চিহ্ন মাত্র নাই,

তাহা গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ, অথচ অন্তর্ভেদী। কালিদাস ও ভবভূতি এই শ্রেণীর কবি এবং ইহার সৃষ্টি উত্তররামচরিতের সীতা ও শকুন্তলা। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ কবিগণের প্রভুত্ব, প্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয় বৃত্তির উপর। তাহাতে যে সহৃদয়তা নাই, তাহা নয়, তবে তাহা যেন কামনা এবং ভোগ-লালসায় পরিপূর্ণ, তাহাতে আকর্ষণ আছে সত্য, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়জনিত ও মোহপূর্ণ। এই শ্রেণীর কবি, গীত গোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেব ও মৃচ্ছাকটিক প্রণেতা শূদ্রক। এবং ইহার সৃষ্টি রাধিকা, এবং বসন্তসেনা। তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণের ক্ষমতা বুদ্ধিবৃত্তি মূলক। ইহাতে নৈপুণ্য আছে সত্য, কিন্তু মৌলিকতা নাই, ভাষা প্রয়োগ নৈপুণ্যতা আছে, কিন্তু ভাবের সমাবেশ নাই;—পাষাণময়ী দেবী প্রতিমার মত, শিল্পকৌশলে হৃদয় মোহিত হইবে, বাহ্য সৌন্দর্য্যে নয়ন আকর্ষণ করিবে, কিন্তু অভ্যন্তর শূণ্যময়, তাহাতে হৃদয় নাই, মধুরতা নাই, কোমলতা নাই। বহির্দ্দেশের ন্যায় অন্তরও কাঠিন্যে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষার যে সকল কবি শব্দালঙ্কারের ও বর্ণ যোজনার জন্য প্রসিদ্ধ, আমরা তাঁহাদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। এবং এই তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণের সৃষ্টি (মানব প্রকৃতি নয়) "খড়্গবন্ধ" "নৌকাবন্ধ" "মুরজ বন্ধ" প্রভৃতি কবিতা। বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এ দেশে এই তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণেরই আদর অত্যন্ত অধিক। সংস্কৃতব্যবসায়ীগণ এইরূপ কবিতারচনে ও অধ্যাপনেই স্বীয় স্বীয় গুণবত্তার বিচার করিয়া থাকেন, সুতরাং যেখানে "শাকোটকের" এত সমাদর, সে খানে "চ্যুত চন্দনের" গৌরব থাকিবে কেন? এক্ষণে অনেকেই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই একই শ্রেণীর অর্থাৎ হৃদয়ের কবি, তবে একের এত সমাদর, অন্যের এত অনাদর কেন? আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাব নিতান্ত দীর্ঘ হইল বলিয়া আমরা এক্ষণে সে প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম। আশা করি যে, ভবিষ্যতে ও প্রস্তাবান্তরে তাহার আমূলত পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম হইব। তবে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, কালিদাসের কবিতা অনায়াসবোধ্য, তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়গুলি সাধারণের সুপরিচিত, শ্রবণ মাত্রেই হৃদয় তন্নিষ্ঠ হয়, সে কবিতার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় তন্ত্রী বাজিতে থাকে; কিন্তু ভবভূতির কবিতা দুরবগাহ ও জটিল। তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় সাধারণের কল্পনার দূরবর্ত্তী। পাঠ মাত্র অর্থ উপলব্ধি হইলেও, ভাবের জন্য পাঠকের চিন্তাশীলতার সাহায্য আবশ্যক করে। তবে কালিদাস যে সাধারণের এত পরিচিত এবং ভবভূতি অপরিচিত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কালিদাস আমাদিগের অধিষ্ঠিত এই সৌর মণ্ডলের দীপ্তিময় সূর্য্য; তাঁহাকে দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণের আবশ্যক করে না, তাঁহার তেজোবত্তার পরিচয় পাইবার জন্য যন্ত্র বিশেষের সাহায্যের প্রয়োজন করে না; তিনি স্বত প্রকাশিত ও স্বত পরিচিত। কিন্তু ভবভূতি জগতান্তরের অধিষ্ঠাতা সূর্য্য বিশেষ। সাধারণের নিকট তিনি ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র মাত্র। তাহার আলোক, তাহার তেজস্বীতা অতি অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু যিনি ভাবুকের ন্যায়, জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায়, তাঁহার গুণবত্তার পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, এই ক্ষুদ্রকায় আলোক, নক্ষত্রমাত্র নহে; ইহা এই

সুবিস্তীর্ণ সৌর মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ও নেতা সূর্য্যাপেক্ষা অন্যূন জগদন্তরের সমুপাস্য দেবতা বিশেষ। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ভবভূতি বিষয়ক প্রস্তাব লিখিতে গিয়া আমাদিগের প্রারম্ভটী ক্রমশই দীর্ঘ হইতে চলিল। হয়ত এই অতি-দীর্ঘতার জন্য এ প্রবন্ধ চিরদিনই অপঠিত থাকিবে। কিন্তু ভবভূতির জীবনচরিত ও গ্রন্থ সমূহ সমালোচনা করিতে হইলে, আমাদিগের বিবেচনায়, পূর্ব্ব হইতে যে কয়টী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা না বলিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। এই কারণে প্রবন্ধের এরূপ অতি-দীর্ঘতা আমাদিগের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য্য। এই উপন্যাস প্লাবিত দেশে, জীবনচরিত গ্রন্থের তত সমাদর নাই; তাহাতে আবার যিনি বহুদিন পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি কলাপ, এমন কি নাম পর্য্যন্তও অনেকের নিকট অপরিচিত, তাঁহার দীর্ঘজীবনী কি কেহ পাঠ করিবে? কিন্তু কেহ পাঠ করিবে কি না, পূর্ব্ব হইতে তাহা ভাবিয়া লিখিতে হইলে, অনেক গ্রন্থকারকেই চিরদিনের জন্য লেখনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং সে বিষয় আমাদিগের বিবেচ্য নহে। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, যে জাতি চির হতভাগ্য, শত শত বৎসর পরপদদলিত, সেজাতি আত্মাদর করিতে জানে না। আর যাহারা আত্মাদর করিতে না জানে, তাহারা কি কখন স্বজাতিশ্রেষ্ঠগণের গৌরব বুঝিতে পারে? কখনই নহে। তবে ভবভূতির জীবনী যে সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে, সে আশা কোথায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

বসন্ত-সমীর।

(১)

আহা! কারে দিব প্রাণ!
—আমি আর রবনা ধরায়,
উড়ি ২ যাইব কোথায়!
বিশ্বমনে মিলাইব কায়;—
বসন্ত-সমীরে, প্রাণের অন্তরে,
কত প্রাণ ফুটিল নূতন,
আহা, কি ফুটিল সুষুপ্ত অন্তরে!
বুঝি ডুবিলাম অজ্ঞাত সাগরে।

(২)

কি সুখ স্বপন আজি বহে চারি ধারে,
মত্ত প্রাণ বুঝিতে না পারে!
জগত বসন্ত-ময়,
জগত সুগন্ধ ময়,
জগত উৎসব স্রোতে আজি নিমজ্জিত,
চরাচর বিশ্ব আনন্দে জড়িত।
মুখে মুখে প্রীতি-ভার,
প্রতি বক্ষে প্রীতি-হার,
চিত্তস্রোত ছুটে অনিবার;
আহা, কোথা অনন্ত-সাগর!

(৩)

আজি বিশ্ব এক প্রাণ,
এক গতি, এক জ্ঞান,
একটী অনন্ত-তীর্থে করিছে প্রয়াণ,
"আয়, আয়," বলি সবে করিছে আহ্বান।
বহিল সুসমীরণ,
ছুটিল পথিকগণ;

চাহিল না সংসারে ফিরিয়া,
চলিল অনন্ত বিশ্ব অনন্তে চাহিয়া।

(৪)

প্রাণে প্রাণে আজি, কত আলিঙ্গন,
জড়ে জড়ে কত, জীবন্ত ঘর্ষণ;
জাগিল অনন্ত প্রাণ,
ছুটিল অনন্ত প্রাণ,
প্রাণময় বিশ্ব চরাচর;
প্রান্তরে, কাননে, হৃদে প্রাণের ঝঙ্কার।

(৫)

প্রকৃতিগো! কোথা আজি করিব প্রয়াণ,
কার লাগি বিলাইব প্রাণ?
নহি আজি দীন হীন,
কুটিল, কৃপণ, ক্ষীণ,
স্বার্থ-মগ্ন মানব সন্তান;
অকাতরে বিলাইব প্রাণ।
আজি আমি বিশ্বময়,
শোক চিন্তা দূরে লয়,
নাহি দ্বন্দ্ব আমার অন্তরে;—
বুঝি মিলিয়াছি, প্রকৃতি-অন্তরে!

(৬)

আজি প্রাণ প্রকৃতির করে,
আজি প্রাণ অনন্ত-সংসারে;
শত খণ্ডে প্রাণ ধায়,
শত মুখে আশা গায়,
কেমন করিয়া আর বহিব এ কারাগারে?
"আয়, আয়," বলি ঐ কে যেন ডাকিছে
মোরে!

(৭)

কে লইবে প্রাণ?
প্রকৃতি গো! কে লইবে আমার অন্তর?
আমি যে তরল আজি,
ভাল মন্দ নাহি বুঝি,
তোমার অনন্ত স্রোতে মগ্ন,—বহমান,
প্রাণে আর নাহি কিছু ভার।
একটী বাসনা মাত্র আছে লুকাইয়া,
কে লইবে আমারে চাহিয়া!

(৮)

ফুল-রেণু যায় দিক্ দিগন্তর,
বসন্ত-অনিল তারে লইবে অন্তরে!
কে লইবে আমারে অন্তরে?
কারে প্রাণ দিব উপহার?
বড়ই বাসনা, আমি রহিবনা আর!
কোথা যাই! কোথা যাই!
কিছু যেন বুঝি নাই!
কোথা যাই অনন্তের সনে,
কোথা যাব অনন্ত-প্রয়াণে!
হে অনন্ত জীবন্ত আকাশ!
হে অজ্ঞাত বসন্ত নিশ্বাস!
আজি মোরে লও উপহার,
লও লও এ ক্ষুদ্র অন্তর।
দিক, কাল, ধর্ম্ম, তত্ত্ব, রহস্য, চেতন,
প্রাণ, মন, আত্মা, গতি, মুকতি, নির্ব্বাণ!
হে অজ্ঞাত, অচিন্তিত!
হে আঁধারে নিমজ্জিত!
লও লও এ ক্ষুদ্র পরাণ,
রাখ এক দীন আকিঞ্চন।
আমি আর রবনা ধরায়,
বিশ্ব-মনে মিলাইব কায়;
বসন্ত-সমীরে প্রাণের অন্তরে,
কত ভাষা ফুটিল নূতন;
আহা! কি ফুটিল সুষুপ্ত অন্তরে,
বুঝি ডুবিলাম অজ্ঞাত সাগরে!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

সমাজ-সংস্কার ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ।

সংস্কার সম্বন্ধে, আমরা সকল সমাজেই ভিন্ন মতাবলম্বী তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই।

এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সামাজিক পরিবর্ত্তন মাত্রেরই ঘোর বিরোধী। ইহাঁরা ভূত কাল লইয়াই বিব্রত। সে কালের যাহা কিছু, সকলই ইহাঁদের নিকট ভাল; একালের যাহা কিছু, সমুদায়ই মন্দ। সমাজে যখনই কোন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাঁরা অমনি ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠেন, এবং সেকালের দোহাই দিয়া, একালের পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করিতে থাকেন। ইহাঁরা বলেন—"যাহা আছে তাহাই থাকুক, যে ভাবে সমাজ চলিতেছে, সেই ভাবেই চলুক, আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, আমরা কোন্ কীটের কীট যে, সেই সকল মহাত্মাদের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর সংশোধন করিতে অগ্রসর হই? সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিলে, সমাজের সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। অতএব সংস্কার করিতে গিয়া, ব্যস্ততা প্রযুক্ত, মঙ্গল করিতে না পারিয়া প্রণালী কাটিয়া অমঙ্গলরূপ কুম্ভীর গৃহে আনয়ন করিবার প্রয়োজন কি?" দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা, ঠিক ইহাদের বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে, বর্ত্তমানই সর্ব্বস্ব, ভূতকাল কিছুই নহে। ইহাঁরা বলেন, "সমাজে যাহা কিছু আছে, সবই ভাঙ্গ, অট্টালিকা বনিয়াদ সমেত উৎপাটিত করিয়া ফেল, বর্ত্তমান কালোপযোগী নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভ্রমে পড়িয়া যে সকল কুনিয়ম সংস্থাপন ও কুসংস্কার রাশি বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহার আমূল সংস্কার ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই।" প্রথম সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ অনুকরণ মাত্রেরই ঘোর বিরোধী, কিন্তু অনুকরণ শেষোক্ত শ্রেণীর নিকট অতি আদরের সামগ্রী। অনুকরণই ইহাঁদের তপ, যপ, ধ্যান ও ধারণা। ইহাঁরা অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া, সামাজিক প্রথা সমূহের আমূল সংস্করণের পক্ষপাতী। ইহাঁরা কখন কখন, আপনাদের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, ভূতকালকে অনেক সময় স্নেহের চক্ষে দেখেন বটে, কিন্তু ভূতকাল অনেক সময় ইহাঁদের হস্তে পড়িয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ইহাঁদের অধ্যবসায় যথেষ্ট আছে, কিন্তু ধৈর্য্যের বড়ই অভাব। ভূতকালের কুক্ষিগত রত্নগুলিকে, এক দিনেই বর্ত্তমান কালের অধিকারে আনয়ন করিবার জন্য, ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। প্রথম সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ, সময়ের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু ইহাঁরা তাহার ঠিক বিপরীত, সময়ের উপর ইহাঁরা এক মুহূর্ত্তও নির্ভর করিতে চাহেন না। ইহাঁদের মতে সময়ের সাহায্য গ্রহণ যে শুধু অনাবশ্যক, তাহা নহে, পরন্তু বিস্তর ক্ষতিজনক। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা অবস্থাগত শক্তির অন্ধ উপাসক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত শক্তির নির্ব্বোধ স্তাবক। দুই হস্তে দুই প্রকার শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া, ইহাঁদের মধ্যে কেহই কার্য্য করিতে চাহেন না। এইবার তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি-

দিগের কথা বলিব। ইহারা দুই সীমার মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ভূতকালের সহিত বর্ত্তমান কালের বিবাহ দিবার জন্য লালায়িত। ইহঁারা নিরবচ্ছিন্ন অবস্থাগত শক্তির উপাসক নহেন, ব্যক্তিগত শক্তিরও অন্ধ সেবক নহেন, ইহঁারা প্রাগুক্ত দুই শক্তির মধ্যে সখ্যতা বিধান করিয়া কার্য্য করিতে অভিলাষী। ইহঁারা স্কটলণ্ডীয় দার্শনিক বেন্ সাহেবের ন্যায়, সমস্তই সময় ও অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া, "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" এইরূপ ভাবিয়া স্থানুবৎ উদাসীন থাকেন না, অথচ সময় ও অবস্থাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আপনার শক্তিকেই জগতের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন না। ইঁহারা ভূতকালের রত্নগুলির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করেন, এবং অপহৃত রত্নরাজির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া, ধৈর্য্যের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, অথচ বর্ত্তমান কালের ভাল ভাল বস্তুগুলিও ইহঁারা হাতছাড়া করিতে চাহেন না। ইহঁারা অনুকরণের বিরোধী নহেন, ইহঁারা এইমাত্র বলেন যে, অনুকরণ করিবার সময় যেন আমাদের চক্ষুগুলি মুদ্রিত না থাকে। ইহঁারা আরও বলেন—"যাহা কিছু ভাল, তাহাই আমরা সংগ্রহ করিব, তা কে জানে অতীতকালের, আর কে জানে বর্ত্তমান সময়ের,—কে জানে স্বদেশের, কে জানে বিদেশের।" তাঁহাদের মতে যাহা জীর্ণ করা যায় না, তাহা আহরণ করিয়া উদরসাৎ করা কর্ত্তব্য নহে, এরূপ করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবারই সম্ভাবনা।

সম্প্রদায় ত্রয়ের মত সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। কোন্ মত সমীচীন, কোন্‌টা বা অসমীচীন, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। আবহমান কাল কোন সমাজই এক নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে না। সামাজিক ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা কর, স্পষ্টই দেখিবে, সকল সমাজেই যুগে যুগে সময়োপযোগী প্রথা সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী অমঙ্গলজনক বা অকর্ম্মণ্য নিয়মগুলি সংস্কৃত বা একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যিনি বর্ত্তমান কালের হিন্দু সমাজের সংস্কার করিতে গিয়া, মনু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মনীষীগণের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। মনু-প্রমুখ মহর্ষিগণ বিজ্ঞ, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও দূরদর্শী ছিলেন, স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বদর্শী ছিলেন না, সুতরাং সহস্রাধিক বর্ষ অগ্রে, সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী সমাজের মঙ্গল হেতু বিধি প্রস্তুত করা, তাঁহাদের সাধ্যের অতীত কার্য্য। হাজার বৎসর পরে কি ঘটনা ঘটিবে, সমাজের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা না জানিয়া, হাজার বৎসর অগ্রে কি তাহার বিধি প্রদান করা যায়? এই রূপ অসম্ভব কার্য্য, কেবলমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শীর পক্ষেই সম্ভবে। মনু স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই যে, সুদূর অবস্থিত ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী তদানীন্তন অসভ্য, উলঙ্গ, আমমাংসভোজী ব্রীটনদিগের বংশধরগণ, কখন জ্ঞানদৃপ্ত সভ্যতা-শীর্ষস্থানীয় সুবিস্তৃত ভারতবর্ষে আসিয়া একাধিপত্য বিস্তার করিবে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা, প্রাচ্য সভ্যতার আসন অধিকার করিয়া বসিবে। মুসলমানগণের প্রবল প্রতাপ অবলোকন করিয়া, কেহ কেহ এই পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, কালে ভারতবর্ষ যবনদিগের অধিকারে আসিবে। পরে কি ঘটিবে, তাহার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবিদিত থাকিয়া, পূর্ব্বেই তাহার জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ণ করা বাতুলতা ভিন্ন,

আর কি হইতে পারে? আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মনু-প্রমুখ শাস্ত্রকারগণ, তাঁহাদের সময়ের সমাজ সুন্দররূপে পরিচালনের জন্য, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের সমাজকে চালাইবার বাসনা এক দিনের জন্যও তাঁহাদের মনকে বিচলিত করে নাই। প্রাচীনকালের শাস্ত্রকারগণ-প্রণীত বিধিদ্বারা, যিনি বর্ত্তমান কালের সমাজ শাসন করিতে চাহেন, তিনি শৈশব কালের আহার ও পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা যারপর নাই সুন্দর বলিয়া, যৌবন ও বার্দ্ধক্যকালেও তাহা পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হয়েন না। অথবা, ইহা বলিলেও অন্যায় বলা হয় না যে, চিনদেশের শাসন তন্ত্র দ্বারা যেমন ব্রীটিশ রাজ্য শাসিত হইতে পারে না, মনু-প্রমুখ শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা দ্বারাও তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের হিন্দু সমাজকে শাসন করা যায় না। স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে, সকল নিয়মই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সামাজিক ইতিবৃত্তগুলি যিনিই নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা তিনি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, বাল্য বিবাহের তিরোধান, বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্ত্তন সকল, সম্পূর্ণ রূপে অবস্থাগত শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অকর্ত্তব্য। আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান সময়োপযোগী বিধি সমূহ প্রণীত না হইলে, হিন্দুসমাজ অচিরকাল মধ্যে উৎসন্ন দশায় উপনীত হইবে। অধিকদিনের কথা নহে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, হিন্দু সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান কালে আর সেরূপ নাই; অথচ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের প্রচলিত বিধি গুলি সমাজে আজও কার্য্য করিতেছে, দেখিতেছি। ইহাতে হইতেছে কি? না—হিন্দু সমাজের গ্রন্থিগুলি দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজের কয়টী বিধি বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ পালন করিয়া থাকেন? কয়টী হিন্দু, শাস্ত্রের বিধিগুলি যথাযথ রূপে প্রতিপালন করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন? প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রূপে, হিন্দু-সন্তান, ম্লেচ্ছদ্বারা প্রস্তুতীকৃত সুরা অবাধে সেবন করেন, অখাদ্য ভোজন, অস্পৃশ্য বারবনিতা-বিলাস করিয়া থাকেন। এরূপ রাশি রাশি পাপ হিন্দু সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে, শাস্ত্রীয় শাসন এ স্থলে অকর্ম্মণ্য। হিন্দু দলপতিগণ ইহা জানেন, দেখেন, কিন্তু কি কষ্ট, তাঁহারা ভ্রমেও ইহার প্রতিবিধানের এক বারও চেষ্টা করেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের আদেশ মত তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ আর কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহে, কাজেই তাঁহারা মূকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। অথচ সময়োপযোগী শাস্ত্রীয় বিধি সকলের সংস্কার সাধন করিয়া ঊন্মার্গগামী হিন্দুসমাজকে ধ্বংশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। কি পরিতাপ! যাঁহারা, সমাজের মস্তক বলিয়া সর্ব্বদা অভিমান করেন, এরূপ নিন্দিত ভাব তাঁহাদের শোভা পায় না। যদি এমন বুঝিয়া থাক যে, প্রাচীন কালের শাস্ত্র, নব্য সম্প্রদায়কে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইতেছে না, নব্য সম্প্রদায় পদে পদে, মুহূর্ত্তে

BLEED THROUGH

মুহূর্ত্তে পদস্খলিত হইয়া পড়িতেছে, রাশি রাশি সামাজিক নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া পদে পদে অপরাধী হইতেছে, তাহা হইলে, এরূপ স্থলে, সেই সকল পুরাতন বিধিগুলি যথাযথরূপে সংস্কৃত, পরিবর্ত্তিত ও বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া লওয়া কি সমাজ-হিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? যে সকল বিধি প্রতিপালিত হইতেছে না, বা শাস্ত্রীয় আদেশ মত অধুনা যে সকল বিধি প্রতিপালন করা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পরিবর্ত্তে যে সকল বিধি সকলে মান্য করিয়া হিন্দু সমাজের গৌরব রক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ বিধির প্রবর্ত্তন, কি বর্ত্তমান সময়ে প্রার্থনীয় নহে?

অনেক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন—"যদি আমাদের দেশে সকলে হিন্দু ধর্ম্ম মানিয়া চলিত, তাহা হইলে দেশের এ দুর্গতি দেখিতে হইত না, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ যদি তাঁহাদের পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহা হইলে সকলেই সর্ব্বাংশে সুখী হইতে পারিত।" হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক আদেশ মান্য করিয়া চলা, বর্ত্তমান কালে এক প্রকার অসম্ভব। সম্ভব হইলেও, দেশের ভয়ানক অনিষ্টকর। এবং স্ব স্ব জাতির ব্যবসাতে, প্রত্যেক হিন্দুর পুত্র পৌত্রাদিক্রমে নিযুক্ত থাকা, ততোধিক অসম্ভবপর ব্যাপার। পাঠকগণ! চমকিত হইবেন না। প্রণিধান পূর্ব্বক বিষয়টী আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহার সত্যতা স্পষ্টই হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে। যাঁহারা এক ভাবে সমাজকে আবহমান কাল পরিচালিত করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত মনুষ্য আর কুত্রাপি নাই। ইতিহাস যাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া প্রতিদিন আমাদিগকে দেখাইতেছে, হৃদয়-নিহিত মানসিক বৃত্তি গুলি হৃদয়ের কর্ণমূলে যে সকল কথা প্রতিমুহূর্ত্তে বলিতেছে, সে সকলকে তাঁহারা পাদদলিত করিয়া, সমস্ত বিষয়ে অন্ধ ও সকল কথায় বধির হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুরূপ এক ভাবে সমাজকে চিরদিন চালাইতে চাহেন। সামাজিক ইতিবৃত্ত নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সনাতন হিন্দুসমাজে, যুগে যুগে, বিবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আর্য্যগণ যেরূপ অবস্থায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যদি সেইরূপ অবস্থায় হিন্দুসমাজ চিরকাল বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম, এক ভাবে সমাজকে চিরদিন পরিচালিত করা বিলক্ষণ সম্ভব বটে। কিন্তু রাশি রাশি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া হিন্দুসমাজ গমন করিয়াছে, এবং যখন যেরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সময় উপযোগী শাস্ত্রও প্রণীত হইয়াছে। এই কারণ প্রযুক্তই আমরা সাগরবৎ মহান্ হিন্দুশাস্ত্রে নানা মুনির নানা মতের কথা শুনিতে পাই। একের শাসন অন্যের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, অথচ সমস্ত মতই, সকল শাসনই, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত। বৈদিক কালের সমাজের অবস্থা যেরূপ, পৌরাণিক সময়ে সেরূপ নহে, তন্ত্রের প্রাবল্যকালে ইহার অবস্থা আবার বিভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাভারতের হিন্দু ও রামায়ণের হিন্দুর মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান রহিয়াছে। এইরূপ রাশিকৃত বিভিন্নতা দৃষ্টেও যিনি হিন্দুসমাজকে এখন এক ভাবে রাখিতে চাহেন, তাঁহাকে আমরা ভ্রান্ত ও অন্ধ বলিব না ত কি বলিব? আর এক কথা। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের অস্থি মজ্জায় যেরূপ প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে আর শূদ্রগণের চক্ষে আবরণ বাঁধিয়া, ব্রাহ্মণগণের সেবায় চিরদিন নিযুক্ত রাখা, কোন ক্রমেই সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইংরাজজাতিকে ভারত হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতিকে স্ব স্ব জাতিগত কার্য্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে, এখন কি আর সে উন্মীলিত চক্ষুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সহজ কথা? কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে সকলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন কে তাহাদের নিকট হইতে সেই স্বাধীনতা-রত্ন বলপূর্ব্বক হরণ করিতে সাহস করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা হিন্দুগণের মনকে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং জাতির কার্য্যে আবদ্ধ থাকিয়া, কেহই আর স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিতে চাহে না। চাহিবেই বা কেন? অল্পই হউক বা অধিক পরিমাণেই হউক, মানুষ মাত্রেই স্বার্থের দাস, অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও উন্নতির ভিখারী। সে তাহার ঘৃণিত অল্প আয়-বিশিষ্ট জাতীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বার্থ, সুখ ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবে কেন? তাহার মার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত মনোবৃত্তিনিচয় আর তাহাকে এক কার্য্যে বদ্ধ রাখিয়া, সুখ ও শান্তি প্রদান করিতে, বর্ত্তমান কালে, কোন মতেই সমর্থ হয় না। এখন ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলে, কোন ব্যবসারই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। বিজ্ঞান-শিক্ষা, অর্থ ও যন্ত্রাদি ব্যতীত, শূন্য মস্তকে ও রিক্ত হস্তে, বিজ্ঞানালোকে আলোকিত, ইংলণ্ড বা মার্কিনের সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা, সম্ভবপর নহে। কিন্তু প্রতিযোগিতা ব্যতীত কোন কার্য্যেরই উন্নতি হয় না। ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা লাভ করা আবশ্যক। উপযুক্ত অর্থ ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অভাবে, ভারতীয় তন্তুবায় বা কর্ম্মকারকুল প্রায় নির্ম্মূল হইতে চলিল। উদর পূরিয়া আহার না জুটিলে, কেবল শ্রেষ্ঠতর বর্ণের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য, কেন তাহারা জাতিগত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে? অর্থ ব্যতীত উদরপূর্ত্তি হয় না, কাজেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, যে দিকে অর্থ আছে, সেই দিকেই ছুটিতে হয়। জাতীয় কার্য্যে বদ্ধ হইয়া থাকিলে চলে কৈ? এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে সম্বলহীন, অর্থহীন তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতি জাতিদিগকে, তাহাদের পিতৃপৈত্যমহিক অনুচিত কার্য্য বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত রাখিতে পারা এক প্রকার অসম্ভব।

আজ কাল যে রূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে বিলাতে গমন না করিলে, কোন কার্য্য সহজে সংসিদ্ধ হয় না। বিলাত গমন না করিলে রাজ-সংসারে উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্বদেশের উন্নতি সাধন এক প্রকার সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। অধিক কি, বিলাতে আন্দোলন ব্যতীত ভারতবাসীগণের ন্যায়ানুমোদিত স্বার্থ গুলিও সুরক্ষিত হয় না। কি বিজ্ঞান, কি কৃষি,

কি ব্যবসা, কি আইন, কি চিকিৎসা শাস্ত্র, বিলাত গমন ব্যতীত কিছুই সুন্দর রূপে শিক্ষা করা যায় না। মুসলমানগণ যখন ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা ও বিধাতা ছিলেন, ভারতবাসীগণের তখন সমুদ্র পার হইয়া ভিন্ন দেশে গমন করিবার আবশ্যক ছিল না, গৃহে বসিয়াই তখন তাহাদের সকল সাধ পূর্ণ হইত। রাজ সম্মান, ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু উপভোগের সামগ্রী, ভারতে বসিয়াই তখন প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সময়, ভারতের সকলই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। বিলাতগমনের উপর ভারতবাসীগণের ভাবী উন্নতি, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বিলাত গমনের ঘোর বিরোধী। শাস্ত্র মাথার দিব্য দিয়া, হিন্দু সন্তানকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিতেছে। প্রাচীনকালের শাস্ত্র, ভারতবাসীগণের ভাবী মঙ্গলের পথে, অভেদ্য অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই অন্তরায়টী কি চিরদিন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অচলবৎ অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, ভারতবাসীমাত্রেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করিবে? কিম্বা বর্ত্তমান কালের শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ, বর্ত্তমান সময়োপযোগী ব্যবস্থা সকল প্রণয়ণ করিয়া, অভেদ্য প্রাচীরটীকে ভাঙ্গিয়া, ভাবী মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া, ভারতবাসী মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইবেন? এই রূপ যে দিক্ দিয়াই দেখ না কেন, প্রাচীনকালের হিন্দুশাস্ত্র, বর্ত্তমান কালের হিন্দু সন্তানগণের উপকারের পরিবর্ত্তে সর্ব্ব প্রকারে তাহাদের সমূহ অপকারই সাধন করিতেছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বেই তাহা বিবৃত করিয়াছি। সামাজিক ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছি যে, আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি গুলি বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ দ্বারা বহুবার সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে সময়ের যে ব্যবস্থা উপযোগী বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহারা সেই সময়ে সেই রূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, হিন্দুসমাজকে ধ্বংশের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রভূত বলসম্পন্ন শাক্যসিংহ-বিলোড়িত ধ্বংসপ্রায় সমাজকে সুকৌশলে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সেইরূপ সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রথা অবলম্বন করিয়া আর একবার পতনোন্মুখ হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। প্রাচীন কালের প্রজ্ঞাসম্পন্ন শাস্ত্রকারদিগের ন্যায়, এই হিতকর প্রথা অবলম্বন করিলে, হিন্দুসমাজের মহত্ত্ব রক্ষিত হইবে, অথচ সেই সঙ্গে মাতৃভূমি ভারতের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। হিন্দু সমাজের বন্ধন সকল যেরূপ শিথিল হইয়া আসিতেছে, যদি এরূপ কোন উপায় অচিরে অবলম্বিত না হয়, আমরা দূরদর্শীর ন্যায় বলিতে পারি, হিন্দু সমাজের পতনের দিন সন্নিকট হইতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন শক্তিই সে অবশ্যম্ভাবী পতনের হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অবস্থাগত শক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান না হইয়া যদি ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ, তাঁহাদের ব্যক্তিগত শক্তি ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, নব উদ্যমের সহিত একবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব গৌরব তাহা হইলে সর্ব্বাংশে সুরক্ষিত হয়। কিন্তু পুরাতন না হইলে কেহ কি কখনও কাঙ্গালের কথায় কর্ণপাত করেন? কথায় বলে, "কাঙ্গালের কথা বাসি হইলেই খাটে।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাকড়াশী।

নবলীলা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নর-পিশাচের কার্য্য!

সেই দ্বিপ্রহরা গভীর রজনীতে কালীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া, নিরাশ অন্তরে গোরাচাঁদ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিল;—গরলের উপরে আরো গরল ঢালিল,—হিংসার উপরে আরো হিংসার মাত্রা চড়াইল,—ক্রোধের উপরে আরো ক্রোধাগুন জ্বালিল। গোরাচাঁদ ধনীর সন্তান,—টাকা ও বিলাসের পুত্র। টাকাতেই মান সম্ভ্রম; গোরাচাঁদ মান সম্ভ্রমে গোপালপুরে সর্ব্বজনপূজিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা টাকার প্রলোভনে গোরাচাঁদের মন যোগাইয়া চলে; ইয়ারেরা, দুষ্টঅভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার উপায় জানিয়া, গোরাচাঁদকে খোসামুদী করে। গোরাচাঁদের দল, সামান্য দল নহে; গোরাচাঁদের দলের ভয়ে গোপালপুরের সকলে কাঁপিত। গোরাচাঁদের ভয়ে সকলে কাঁপিত, কিন্তু গোরাচাঁদ কাঁপিত, কমলমণির ভয়ে। গোরাচাঁদ কমলমণির প্রণয়াসক্ত। কমলমণি রাণী, গোরাচাঁদ তাহার পদানত! গোরাচাঁদ কি তবে সুলোচনার পিতা? গোরাচাঁদ মনুষ্যাকার পশু,—গোরাচাঁদ নর-পিশাচ। কমলমণির যৌবনে ভাটা পড়িয়াছে, গোরাচাঁদের দুর্দ্দম্য পিপাসা আর নিবৃত্তি হয় না। শিশুর কোমলরক্ত পিপাসায় পাষণ্ড মাতিয়াছে। সে সকল কথা লিখিতে ঘৃণা হয়। সুলোচনার পিতা মাতাকে, মানুষ, তবে একবার দেখ। গোরাচাঁদ পিতা, কমলমণি মাতা। গোরাচাঁদ দুহিতার প্রণয়-ভিখারী! মানুষে ও পশুতে কি কিছু বিভিন্নতা আছে? পশুতে যাহা পারে না, মানুষে তাহাও পারে! মানুষ লিপ্ত হইতে পারে না, মজিতে পারে না, পৃথিবীতে এমন পাপ অতি অল্পই আছে। গোরাচাঁদের দারুণ বাসনার তাড়নে, কমলমণি, সুলোচনাকে তাঁহার চরণে বাঁধিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে! সুলোচনা রমণীকুলে দেবীবিশেষ, কখনই তাহা সহিতে পারেন না, সম্বল-হীনা একমাত্র প্রাণকে লইয়া বিপদের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুলোচনার প্রাপ্তির আশায়, গোরাচাঁদের প্রাণ বিভোর। সেই সুলোচনাকে যখন মিলিল না, তখন গোরাচাঁদ উন্মত্তের ন্যায় হইল। দেখিল, কমলমণিও ফাঁকী দিয়া গিয়াছে। বুঝিল, মেয়ের মমতায় মায়ের প্রাণ মজিয়াছে।

গোরাচাঁদ হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য হইল। সেই গভীর রাত্রে, দলের সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। বিনোদ বাবুর প্রতি বড়ই বিরক্ত হইল, বুঝিল, সকল চক্রান্তের মূলে বিনোদ। প্রথমে বিনোদকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টায় বিনোদকে পাওয়া গেল না। বিনোদের অবর্ত্তমানে, বিনোদের আত্মীয় স্বজনদিগের উপর গোরাচাঁদের নয়ন পড়িল। টাকা, মান সম্ভ্রম, ও পাশব-বল একত্রিত হইয়া সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগিল। মাম্‌লার উপর মাম্‌লায় সুরেশ একেবারে জেরবার হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গোপালপুরে সুরেশচন্দ্র আর টিকিতে পারিলেন না। অনন্ত-দেবী ইত্যবসরে বিনোদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে

না পারিয়া ভাবিয়া২ রোগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। বৃদ্ধার শরীর, রোগের ঘর ; রোগ-সহচরগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া অনন্ত-দেবীকে একেবারে জীর্ণশীর্ণ করিয়া ফেলিল ; সকল সম্পত্তি, সকল শক্তিকে আপন ক্রোড়ে পূরিল। অনন্তদেবী ঔষধ মুখে তুলিলেন না ; তাঁহার বাঁচিতে আর ইচ্ছা ছিল না। মরিবার পূর্ব্বে গুপ্ত ধনের কতক ব্যয় করিয়া কন্যাদের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, আর অবশিষ্ট ধন, বিনোদের স্ত্রী শান্তময়ীকে দিলেন। শান্তময়ীর প্রতি তাঁহার বড় ভাল ভাব ছিল না। কিন্তু বিনোদের সম্পত্তি অন্যকে দিয়া, মৃত্যু-সময়ে অধর্ম্ম ক্রয় করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। স্বামীর আদেশ পালন করিবার জন্য, অনন্ত দেবী আপন বাসনাকে বলি দিয়া, সমস্ত ঐশ্বর্য্য শান্তময়ীকে দান করিলেন এবং তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন ;—বলিলেন, "মা, স্বামীর মতের বিরুদ্ধে আর কখনও চলিও না, বিনোদের মত স্বামী কয় জন পায়? তুমি আমার হৃদয়ের ধনকে যত্ন করিও।" মেয়েদের বিবাহ ভাল পাত্রে হইল না, দলাদলিতে, গোরাচাঁদের চক্রান্তে সকল পাত্র যখন ফিরিল, তখন অগত্যা, বিনোদের অনুরোধকে অবহেলা করিয়া, অনন্তদেবী, অপাত্রে কন্যাদিগকে সমর্পণ করিলেন। সে কষ্ট প্রাণে বড়ই বাজিল, সে কষ্ট রোগের সহায়তা করিল। এই উভয়-বিধ কষ্টে, অনন্তদেবী, অনন্ত রাজ্যের উদ্দেশে, অল্প দিনের মধ্যেই ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। বিনোদের ভালবাসার মধ্য-বিন্দু এতদিনে তিরোহিত হইল। মাতৃ-ক্রোড়, প্রেম শিক্ষার প্রথম সোপান, এতদিনে বিনোদকে ফাঁকী দিল! বিনোদ কিছুই জানিল না। কি অমূল্য রত্ন পলায়ন করিল, বিনোদ তাহা জানিতে পারিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। অনন্তদেবীর মৃত্যুর পর গোরাচাঁদ সাহসে আরো উদ্দীপ্ত হইল। অনন্ত-দেবীর স্বভাবের গুণে অনেকেই, বাহিরে না হউক, মনে মনে ভয়-বিহ্বল ছিল, মনে মনে অনেকেই জলন্ত ধর্ম্মভাবপূর্ণ জন-নীকে মান্য করিত। হৃদয়ের নিভৃত স্থানে অনেকে জননীকে পূজা করিত। এক অনন্ত দেবীর জীবন ধারণে, অনেকে পাপ কর্ম্ম করিবার সময়ে ভয়ে কাঁপিত। সেই জননী অনন্তদেবী যখন সংসার বন্ধন কাটিয়া মুক্ত হইলেন, তখন গোরাচাঁদের দলে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, সকলে এক প্রাণ এক মনে যোগ দিল। সুরেশ্চন্দ্রের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না, সকলেই ঘৃণার চক্ষে তাহাকে দেখিত অত্যাচারিত প্রজারা পর্য্যন্ত গোরাচাঁদের দলে যোগ দিল। অনন্তদেবী যে প্রজা বিদ্রোহ দেখিয়া জীবন-ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্রোহ, মৃত্যুর পরে, ভীষণাকার ধারণ করিল। সুরেশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে গোপালপুর ক্ষেপিয়া উঠিল। গোরা-চাঁদের ইঙ্গিতে, সুরেশচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে সপরিবারে ধনে প্রাণে নিহত হইলেন। দস্যুরা বাড়ী লুটিল, সুরেশচন্দ্রকে সপরিবারে প্রাণে মারিয়া মাটীতে মিশাইল। সুরেশ-চন্দ্রের বাড়ী ঘর ক্রমে ক্রমে আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া পড়িল। যে যাহা পাইল, সকল লইয়া গেল। জানালা দরজা, গৃহের ইট পর্য্যন্ত খসাইয়া, লোকেরা চুরি করিল। কাল-ক্রমে বিনোদের বাড়ী জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে বিনোদের পিতার সাধের ভবন, সর্প প্রভৃতির আবাসস্থান হইয়া উঠিল। স্মৃতি-ময় সকল চিহ্ন, ক্রমে বিস্মৃতি-আঁধারে ডুবিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে

গোরাচাঁদের চক্রান্তে, বিনোদ বাবুর গোপালপুরের বাড়ী আঁধারে মগ্ন হইল। হিংসা ও ক্রোধের বিজয় নিশান, বিনোদের ভগ্নপুরীর ইষ্টকে ইষ্টকে প্রোথিত হইয়া উড়িতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের আশ্রয়।

বৃষ্টির জলে বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে, শরীর কাঁপিতেছে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তবুও সুলোচনার গতি থামিল না। 'আমার সহিত আইস'—বিনোদের এই কথাকে সুলোচনা বেদবাক্য মনে করিল। ভাবিল, কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া কি, জীবনকে পাপে ডুবাইব? দুঃখ পাইব বলিয়া কি 'আত্ম' রত্নকে ভাসাইয়া দিব? তা কখনই পারিব না। এই প্রতিজ্ঞাকে বুকে বাঁধিয়া সুলোচনা চলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চলিল, কিন্তু তবুও অরণ্য অতিক্রম করিতে পারিল না। বাস্তবিক পথ অধিক হাটা হয় নাই, সুলোচনা সমস্ত রাত্রি কতকটা স্থানে ঘুরিয়াছেন। রজনী অবসান হইয়া আসিল, পাখী কুলায় ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। উড়িয়া উড়িয়া, ডাকিতে ডাকিতে, ক্লান্ত হইয়া আবার বৃক্ষে বসিতে লাগিল। বৃক্ষে বসিয়া ডাকিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন শূন্যে উঠে, শূন্যে ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া আবার বৃক্ষে বসে। এমনি করিয়া, যে আঁধার টুক ছিল, তাহাকে সকলে মিলিয়া চিৎকার করিয়া তাড়াইল। প্রত্যুষ, সে চেঁচামেচি শুনিয়া বিস্ময়ে উপস্থিত হইল—বৃক্ষের ভিতর দিয়া আলোক দেখা যাইতে লাগিল। সুলোচনা আলোক ধরিয়া অরণ্যের বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখি-লেন, কৃষকেরা ক্ষেত্রের ধারে, ছোট ছোট ছাউনির বাহিরে বসিয়া তামাকু খাইয়া, নিদ্রায়িত শক্তি সকলকে উদ্দীপিত করি-তেছে। অরণ্যের সে ধারে প্রকাণ্ড মাঠ, অরণ্যের গায়ে গায়ে কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাউনি। ছাউনি সকলের দরিদ্রবেশ দেখিয়া বোধ হয়, বারমাস সেখানে কেহই থাকে না, চাষের সময়ে কৃষকেরা আসিয়া জঙ্গলের বৃক্ষ পত্র দিয়া এই সকল কুড়ে প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অতিকষ্টে মাথা রাখে। স্ত্রী পরিবার কেহই নাই—কেবল পুরুষশ্রেণী। কৃষকেরা সকলেই মুসলমান,—পরিধানে নেংটী, মুখে দাড়ি, হাতে হুকা। কৃষ্ণকায় পুরুষশ্রেণী, দরমা এবং ছোট ছোট বস্তা পাতিয়া, হাঁটুর উপর বসিয়া গিয়াছে। একের হুকা অন্যে ধরিতেছে, অন্যের হুকা অপরে টানিতেছে। কত সাধ পূরিতেছি। মধ্যে মধ্যে হুকা লইয়া একটু একটু কথা কাটাকাটীও হইতেছে। পিতার হাতের হুকা শিশু জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে, শিশুর হুকা পিতা কাড়িতেছে। দেখিতে সকলেই প্রায় একরূপ, কাহারও দাড়ি ছোট, কাহারও বড়, এই মাত্র প্রভেদ। রৌদ্র, শরীরের কান্তিকে একেবারে কালির ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! তাহাতে আবার ময়লা চিরকালের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতেছে। জলবিহীন স্নানে তাহা ধৌত হয় না, তেল খাইয়া খাইয়া আসনকে আরো দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসি-তেছে। কত কালের কত মৃত্তিকা, তৈলাসিক্ত হইয়া, সে সকল কৃষকের শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তৈলসিক্ত মাটী ঘর্ম্মের সহিত নেংটীর বস্ত্রে মিশিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে! রূপের সহিত দুর্গন্ধও বাড়িতেছে! ইহাতেই কৃষকদের কত আনন্দ।

এত অল্প সুখের প্রত্যাশী বাঙ্গলার কৃষকদেরও নাকি পেট ভরে না। সুলোচনা তাহাই দেখিলেন। তামাকু খাইয়া কৃষকেরা হাঁড়ি হইতে পান্ত ভাত বাহির করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাসনে ভাগে ভাগে রাখিল। কোন পাত্রে এক ছটাক, কোন পাত্রে আধপোয়া চাউলের ভাত পড়িল। তাহাই, দলে দলে বসিয়া,কৃষকেরা খাইতে লাগিল। কেবল ভাত আর লবণ; মধ্যে মধ্যে এক একটী লঙ্কা দেখা গেল। কৃষকদের কষ্ট দেখিয়া সুলোচনার চক্ষের জল পড়িল, আপন কষ্ট যন্ত্রণা সকলই চলিয়া গেল। একজনের ধারে যাইয়া কাতর-স্বরে সুলোচনা বলিলেন, তোমরা শুধু ভাত কেমন করিয়া খাইতেছ?

কৃষক।—মা, শুধু ভাতই বা পেট ভরিয়া পাই কই?

সুলোচনা বলিলেন, তোমরা ক্ষেতে যে ধান পাও, তাতে পেটের ভাত হয় না?

কৃষক।—তা হয় না,ফকীরেব খাজনা দিতে, কর্জ্জ টাকার সুদ দিতে, আবার জমীদারের নায়েব গোমস্তার পার্ব্বনী দিতেই প্রায় সকল যায়,যাহা থাকে, তাহাতে সমস্ত বৎসর কুলায় না।' ফকীরের কথা চুপি চুপি বলিল, বোধ হইল, ফকীর নিকটেই ছিল। সুলোচনা পূর্ব্বদিন কিছুই আহার করেন নাই, তাহাতেই কত কাতর হইয়াছেন, ইহারা বারমাস উদরন্নের জন্য এত লালায়িত। অর্দ্ধাহারেই ইহারা পরিতুষ্ট; আপনার সহিত ইহাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, আর সুলোচনার হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত লাগিতে লাগিল। কৃষকেরা সুলোচনার ভাব দেখিয়া চমকিত হইল, গোপনে গোপনে নানা কথা কাণাকাণি করিয়া পরস্পরে বলিতে লাগিল।

সুলোচনা বলিলেন, আমি তোমাদের পাতের দুটী ভাত খাইব, দিবে কি?

গুরুলোকের পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। সুলোচনা কৃষকদের নিকটে এক মহা শিক্ষা পাইয়াছেন, উচ্ছিষ্ট অন্নাহার করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা হইল।

কৃষকেরা বলিল, আমরা মুসলমান, নিকৃষ্ট জাতি, আমাদের পাতের ভাত খাইলে আপনার জাত্ যাবে।

সুলোচনা।—আমার জাত্ গিয়াছে; তোমাদের পাতের ভাত খাইয়া তোমাদের জাতেই উঠিব। এই বলিয়া সুলোচনা পাতের নীচে যে দুই একটী ভাত পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া মুখে দিলেন। কৃষকেরা দেখিয়া অবাক্ হইল। লজ্জা পাইয়া কৃষকেরা যার ঘরে যত ভাল দ্রব্য ছিল, আনিয়া সুলোচনাকে উপহার দিল। সুলোচনা সকল পাত্র হইতে একটু একটু লইয়া আহার করিলেন। কৃষকেরা সুলোচনার অমায়িক ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিল। যথা সময়ে সকলে মাঠে চলিয়া গেল, কিন্তু একটী বৃদ্ধ আসিয়া সুলোচনার নিকটে বসিল। কৃষকেরা সকলে পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধকে রাখিয়া মাঠে গেল। বৃদ্ধ সুলোচনার সহিত মোটা ভাষায় অনেক আলাপ করিল। সুলোচনা সরল-প্রাণ বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট অনেক কথা বলিলেন। বৃদ্ধ সকল কথা শুনিয়া বলিল, আমি তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইব, সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই।

সুলোচনা তাহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কৃষকেরা সকলে যখন মাঠে চলিয়া গিয়াছে, তখন কমলমণি আর সেই পুরোহিত, হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে

দেখিয়া সুলোচনার শরীর শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সুলোচনা মৃদুস্বরে বলিলেন, মা, এখানেও তুই? কমলমণির শরীরে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল, বলিল, রাক্ষসি, জাত্ মান সব ডুবালি, তবুও আমার কথা শুনিলি না? দেখিব, আজ তোকে কে রাখে? এই বলিয়া কমলমণি সুলোচনার মাথার চুল ধরিল। পুরোহিত ইত্যবসরে সুলোচনার হাত ধরিল, এবং উভয়ে সুলোচনাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কর্ষিত ভূমির উপর দিয়া সুলোচনাকে যখন টানিয়া লইয়া চলিল, তখন বৃদ্ধ, দুঃখের মর্ম্মদাহে, এক গভীর হুঙ্কার ছাড়িল। হুঙ্কারে সমস্ত মাঠ প্রতিধ্বনিত হইল। দেখিতে দেখিতে মাঠের অসংখ্য কৃষক উপস্থিত হইল। হুঙ্কার ছাড়িয়াই বৃদ্ধ কমলমণির চুল ধরিল, ক্রোধে বলিল, এতই তেজ? এখনই দেখাব।

চারিদিক হইতে যখন অসংখ্য কৃষক আসিতে লাগিল, তখন কমলমণি অপ্রতিভ হইল। হইয়া, ক্ষমা চাহিল। সুলোচনা বৃদ্ধের পা ধরিয়া বলিল, ইনি আমার মা, ইঁহাকে কিছু বলিও না।

বৃদ্ধ মুসলমান বলিল, তোমার মা নহেন, পিশাচিনী, এর জন্য আবার মায়া কি?

সুলোচনা পুন বলিলেন, আমার মা! আমার মা! আমার মা!

কৃষকেরা সে কথা শুনিল না, বৃদ্ধের আদেশে কমলমণিকে, যতদূর পারিল, কৃষকেরা অপমান করিল। পুরোহিতের কাণ কাটিয়া, এবং কমলমণির নাক কাটিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। কমলমণি অপমানে, লজ্জায় ও কষ্টে মৃতবৎ হইয়া আবার অরণ্যের ভিতরে চলিল। জীবনের অবশিষ্ট দিন লোকের সেবা করিয়া কাটাইবে ভাবিয়া দেশান্তরে চলিল। সেই হইতে গোরাচাঁদের মুখ আর দেখিল না; সেই হইতে গোপালপুরে আর ফিরিল না। কমলমণির হস্ত হইতে এই প্রকারে উদ্ধার করিয়া,সেই বৃদ্ধ মুসলমান নিরাপদ স্থানে সুলোচনাকে লইয়া চলিল। এই নিরাপদ স্থান, সেই ভগ্ন মস্‌জীদ। এই বৃদ্ধ মুসলমান—সেই ফকীর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নব-ব্রত।

সুরেশচন্দ্র ও জননী অনন্তদেবীর পরলোক গমনের পর, গোরাচাঁদের রক্ত একটু শীতল হইল; গোরাচাঁদ একটু সুস্থির হইল। গোপালপুরের দলাদলি এক্ষণ একটু থামিয়াছে,—একটু শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সুলোচনার সকল সংবাদ পাইয়াছে। গোরাচাঁদ দলাদলি ভুলিয়াছে, সুরেশচন্দ্রের কথা ভুলিতে পারিয়াছে, কিন্তু সুলোচনার কথা ভুলিতে পারে নাই। গোরাচাঁদ আজ কাল সুলোচনার উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্দ্দমনীয় রিপুর উত্তেজনায় পাষণ্ড নদীতে নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে!

অনন্তদেবীর মৃত্যুর পর, শান্তময়ী স্বামীর ধন লইয়া, পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। লোকের চক্রান্তে ভুলিয়া, আপনার যে মহৎ অনিষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা কিছুকাল পরেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন! বিনোদের ন্যায় স্বামী পাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, হতভাগিনী এতদিন পরে উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিয়াছেন,—কিন্তু বড় বিলম্বে। সোণার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে,—সোণারপাখী পিঞ্জরা ভাঙ্গিয়া

পলায়ন করিয়াছে! শাশুড়ীর মৃত্যুর পর, তাঁহার জীবনগত মহত্ত্বও শান্তময়ী বুঝিতে পারিলেন। হতভাগিনী অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন বটে, কিন্তু অনুতাপে হৃদয় মন জর্জ্জরিত হইল। অনুতাপ না থাকিলে,মানুষ বুঝি বা সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। অনুতাপের মর্ম্মদাহ মানবপ্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে না আসিলে, বুঝি বা মানুষ নিরাপত্তিতে সংসারের সুখ ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু মানবের সে ইচ্ছা, সে সাধ পূর্ণ হয় না। পাপ করিলেই অনুতাপ! শান্তময়ী ঐশ্বর্য্য পাইলেন বটে, কিন্তু সুখ বিদায় লইল, দারুণ চিন্তা হতভাগিনীকে বড়ই মলিন করিয়া ফেলিল। হতভাগিনী কুপ্রবৃত্তিকে আর জীবনে প্রতিপোষণ করিতে পারিল না; লুকাইয়া যে জঘন্য কার্য্য করিয়া সুখ পাইয়াছিল, স্বাধীন হইয়া আর সে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইল না। ধন পাইয়া লোক অহঙ্কারে স্ফীত হয়, আসক্তিতে মগ্ন হয়, সুখ-আশায় বিভোর হয় বটে; কিন্তু শান্তময়ী ঐশ্বর্য্য পাইয়া দরিদ্র হইল, মনে দারুণ বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হইল। বিনোদের অর্থ—স্বর্গের জিনিষ, আমি নরকের কীট, তাহা স্পর্শ করিব কেন? বিনোদ দেবতা, আমি পিশাচিনী। আমি দেবতার পূজা করিতে পারিলাম না ত রহিলাম কেন? দেবতাকে প্রাণে পাইয়াও যে তাহার পূজা না করিল, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কে? শান্তময়ী এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া বুঝিলেন—বিনোদ, পরের চিন্তায় বিভোর—আপন স্বার্থ-বিবর্জ্জিত; আর আমি আপনার লইয়াই ব্যস্ত! সুলোচনা—আর স্বর্গের কুসুম, একই জিনিষ! এমন মেয়ে আর ত দেখি নাই! আমার সুখের জন্য, অম্লান চিত্তে বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিল! উঃ, মানুষে যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি! আমার ন্যায় নর-পিশাচিনী আর কোথায় আছে? আমার নরকেও স্থান নাই! এই প্রকার চিন্তায় শান্তময়ীর প্রাণ অস্থির হইল, মুখ মলিন হইল। সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইবে, মনে হইল। শান্তময়ী, শাশুড়ীর কথাকে জীবনের মূল মন্ত্র করিলেন। সুলোচনাকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই অবস্থায় তিনি পিত্রালয়ে আসিলেন। শান্তময়ী, পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা, ঐশ্বর্য্যবান্ লোক। তনয়া যখন বাড়ীতে আসিল, তখন পিতামাতার মনে অপার আনন্দ হইল। তনয়ার ইচ্ছায়, তাঁহাদের ইচ্ছা মিশিল, তনয়ার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহারা ব্রতী হইলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে পরলোকে গমন করিলেন। তাহাদের উইলানুসারে শান্তময়ীই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। শান্তময়ী জীবনের অবশিষ্ট দিন, স্বামীর মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই, দিবারাত্রি ব্যস্ত রহিলেন। শান্তময়ী পিতামাতার ঐশ্বর্য্য লইয়া, লোকনাথপুরের কৃপাময়ী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গোরাচাঁদের আশা—নির্ব্বাণ!

রাণী কৃপাময়ীর কৃপাতরীতে,—ভগ্নীর কোলে ভগ্নী—কুলকামিনীর কোলে সুলোচনা;—বিশ্বাসের কোলে নির্ভর,—শক্তির কোলে মুক্তি,—ভক্তির কোলে প্রেম। সাহেব ফকীরের কথায় উভয়কে চিনিয়াছেন,—সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। যাহা কখনও দেখা হয় নাই, যাহা অন্য কোন দেশে দেখা যায় নাই, সাহেব কৃপাতরীতে, সে অপরূপ মনোহর চিত্র দেখিল। যাহার মায়ায়, শ্মশানবাসী শিব গৃহী, তাহা সাহেব অনিমেষ নয়নে দেখিল। যে আসক্তিতে বিনোদ উদাসীন—সংসার-বিরাগী, এত দিন পরে, এণ্ডারসন সে আসক্তিকে চিনিল। যাহার জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পথে পথে, বনে বনে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া এণ্ডারসন অনাথপুরে আসিয়াছিলেন, এতদিনে সে অমূল্য ধন মিলিল। এণ্ডারসনের সকল পরিশ্রম আজ সফল হইল! গঙ্গা-যমুনা একত্রে মিলিল। এণ্ডারসনের চক্ষু সে দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইল; জীবনধারণ সার্থক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এণ্ডারসন বিনোদের নিকট সবিশেষ সংবাদ লইয়া ছিলেন, কিন্তু গোপালপুরে পৌঁছিয়া যখন শুনিলেন বিনোদের বাড়ী ঘর সকলই ধূলিসাৎ হইয়াছে, সুরেশচন্দ্র ও অনন্তদেবী, দুঃখের সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তখন প্রাণে যেন দগ্ধ শলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। গোপালপুরে সুলোচনার কোন সংবাদ না পাইয়া বিনোদের শ্বশুর বাড়ী গমন করিলেন। শান্তময়ী তখন প্রাণের গরল ঢালিয়া ফেলিয়া, স্বামীর মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার পূর্ব্বের কুস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, শান্তময়ীর যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখদর্শন করিতেও এণ্ডারসনের ইচ্ছা হইল না। তিনি নানা জনের নিকট সুলোচনার তত্ত্ব বিশেষ রূপ অবগত হইলেন, এবং তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য একাকী ব্রতী হইলেন। যে রজনীতে, সেই নির্জ্জন মাঠে, করালীর সহিত এণ্ডারসনের সাক্ষাৎ হয়, সেই রাত্রিতে সুলোচনার বিবাহ হইবে, এরূপ কথা ছিল। উভয়েরই প্রতিজ্ঞা ছিল, যে প্রকারেই হউক, সেই রাত্রেই সুলোচনাকে উদ্ধার করিবে। সে সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে! উভয়ের ইচ্ছা মিলিয়া উদ্ধারের কার্য্য সমাধা করিয়াছে। এখন ভগ্নীর কোলে, বিষাদমাখা ভগ্নী দেহ,এণ্ডারসন দেখিলেন। জীবনের সকল কষ্ট, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন তিরোহিত হইল।

যথা সময়ে কৃপাময়ীর কৃপাতরী, লোকনাথপুরের ঘাটে পৌঁছিল। কৃপাময়ীর নিকট সুলোচনার উদ্ধারের সংবাদ পৌঁছিল। কৃপাময়ীর আনন্দের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে মহোল্লাসের স্রোত পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিকে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সুলোচনার দেহ কৃপাময়ীর আশ্রয়ে নীত হইতে লাগিল! এত দিন পরে কুলকামিনীর প্রাণে যেন শান্তির উৎস প্রবাহিত হইল।

এদিকে হঠাৎ, লোকনাথপুরের সেই বিস্তৃত ময়দান ভেদ করিয়া, ক্রমাগত লোক আসিতে লাগিল। এণ্ডারসন পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, আজিও গোরাচাঁদ সুলোচনাকে আত্মাধীনে আনয়ন করিবার জন্য বিষম ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত আছে, পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, আজও প্রভূত অর্থরাশি হতভাগ্য এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতেছে। লোক-প্রবাহ দেখিয়া, হঠাৎ তাহার মনে গোরাচাঁদের কথা জাগিল। করালীও এতক্ষণ পরে সেই পান্সী নৌকার অভিসন্ধি বুঝিল! এতক্ষণ পরে বুঝিল, সেই নৌকাতেই গোরাচাঁদের দলবল লুক্কায়িত ছিল। করালী আর ভা-

তাঁহাদের"পূজা বলি চরুসত্র" প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন ও রোগীদিগের আশ্রয়, ঔষধ ও সেবা সুশ্রূষা নির্ব্বাহ জন্য "তীরভক্ত" * প্রদেশস্থিত কক্ষ বিষয়ির † অধীন মকুতিকা গ্রাম "ভগবন্ত শিবভট্টারক-মুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্ত" হইয়াছিল। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী।

শারদ জ্যোৎস্নার মত ফুট ফুটে, পাঁচ বছরের একটী দুধের মেয়ে পিতৃ-পার্শ্বে ঐ দাঁড়াইয়া,—পিতার দুটী আঙুল ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। ফুল্ল মল্লিকার মত প্রফুল্ল মোলাম মুখ খানি দেখিতে দেখিতে ঈষৎ আকুঞ্চিত ও স্ফীত হইল কেন? আহা, ডাগর ডাগর চোখ দুটী যে অশ্রুভরে ফেটে যায়! চোখের জল শতধারে ঠিক্‌রে পড়িল! কেন? মেয়ে ফুলে ফুলে গুমুরে গুমুরে কাঁদে কেন? পিতা দয়াবান কিন্তু কার্য্যকুশল বিষয়ী লোক। জনৈক অবাধ্য ইতর প্রজাকে কিঞ্চিৎ প্রহারের আদেশ করিয়াছেন। তাই মেয়ের দুই চোখে শতধারা। মেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদিতেছে। এ মেয়ে কে? ইনি শৈশবে শরৎসুন্দরী।

অপর চিত্র দেখ ঐ;—কিশোর-বয়স্কা, ত্রয়োদশ বর্ষিয়া, উন্মুক্ত-কবরী-বন্ধন, আলুলায়িত কুন্তল-রাশি ভূ-পতিত, বিদ্যুৎবৎ ভূমি-শয্যায় শায়িত ঐ বালিকা কে? ইনি রাজ্যেশ্বরী রাজ-বনিতা, বালিকা বিধবা শরৎসুন্দরী। চোখের জলে পৃথিবী ভাসাইতেছেন!!

তৃতীয় দৃশ্যে দেখ ঐ,—যৌবনে যোগিনী-পবিত্র ব্রহ্ম-চারিণী, সংসার-সুখ, সংসার-শান্তি মাত্র বিরহিতা সংসারবাসিনী রাজরাণী। মহারাণীর পরিধানে থানের ঠেঁটি। যুবতী জঞ্জাল বোধে কৃষ্ণ কুন্তলরাশি কাটিয়া ফেলিয়াছেন! মা আমার দিবা রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ করেন। সে আহার স্বহস্ত-সিদ্ধ মুষ্টিমেয় আতপ তণ্ডুল! মাতা নিদ্রা যান ভূমি-শয্যায়, শীত নিবারণ করেন সামান্য কম্বল গায়ে দিয়া। মায়ের জীবনের একমাত্র চিন্তা, ভগবানের পূজা আর পতির ধ্যান! কার্য্য, কেবল দান। ব্রত-উপবাস, দান ধ্যান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আর চোখের জল, আহা এই সব সামগ্রীর সমষ্টি ঐ যুবতী মহারাণী শরৎসুন্দরী!

আজন্ম-দুঃখিনী অন্যের দুঃখ নিবারণ করিতেই জন্মিয়াছিলেন। অন্যের দুঃখ দূর করিতে আর নিজে দুঃখ ভোগ করিতেই আজন্ম-দুঃখিনী জন্মিয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখ কেমন করে দূর করিতে হয়, মা তুমিই কেবল জানিতে! অন্নপূর্ণা ঐ অন্নদানে,

* আধুনিক ত্রিহুত।

† প্রাচীন কালে প্রদেশের এক একটী অংশকে বিষয় বলিত। মুসলমান শাসনকাল হইতে বিষয়ের পরিবর্ত্তে পরগণা ব্যবহার হইতেছে।

ক্ষুধার্থের ক্ষুধা-শান্তি করিতেছেন। রাজরাণী ঐ দরিদ্রের শিশুকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন। দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারী নিজের দুরাচারে দণ্ডিত, রাজ-সংসার হইতে দূরীকৃত। মা আমার, গোপনে, পিতার অগোচরে,—নিজের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অগোচরে, যত লোককে লুকাইয়া, ঋণ করিয়া দুর্বৃত্ত কর্ম্মচ্যুত ভৃত্যকে অর্থ প্রেরণ করিতেছেন। 'আহা তার কষ্ট হবে, পূজার সময় তার ছেলেপিলে কাপড় পাবে না?' মা আমার কেমন করে তা দেখিবেন! ঋণ করিয়া দাসীর হাতে তাকে টাকা পাঠাইলেন, আর বলিয়া দিলেন যে,'দেখিস,ইহা যেন কেহ জানিতে না পায়'। কেননা যাকে টাকা পাঠান হলো,সে তাঁহার নিজেরই অনেক টাকা অপহরণ করিয়াছিল।

ব্রহ্ম-চারিণী স্বহস্তে অর্থ স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইত,কেবল লোককে দিতে। আহা, সে দানের জন্যও মায়ের কত সঙ্কোচ, কত লজ্জাশীলতা। মা যখন রাজ্যেশ্বরী, তখনও তাঁহার পিতার নিকট মুখ ফুটিয়া কোন অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেন না। সময়ে সময়ে রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকটেও নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। অথচ দান যে করিতেই হইবে। যাহাকে যাহা দিবেন ভাবিয়াছেন, তাহা যে দিতেই হইবে, না দিলে যে চলিবেই না; নহিলে যে জগদ্ধাত্রী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আহা,এই অর্থ সংগ্রহের জন্যও সময়ে সময়ে মায়ের কতই না কষ্ট, কতই না উৎকণ্ঠা হইত।

আর সে কি কেবল অর্থদান! যে দ্রব্য অর্থের অতীত, সংসারে সুদুর্লভ,—স্বর্গে আছে কি না কেহ জানে না, সেই অমূল্য অতি পবিত্র অশ্রু তিনি অজস্র দান করিতেন। দুঃখিনীর নিজের দুঃখাশ্রু দিনেকের তরে শুকায় নাই, তার উপর পরদুঃখ-কাতরতায় অভিভূত হইয়া, কতই না অশ্রুপাত করিতেন। আজি অমুকের অমুক পীড়িত, মা আমার কেঁদেই অস্থির! কেহ একটু সামান্য কষ্টে ক্লীষ্ট হইলে মায়ের চোখে জল ধরিত না। অভাগিনী কাঁদিতে আসিয়াছিলেন, কাঁদিয়াই গেলেন। পবিত্র অশ্রুপাত দ্বারা পৃথিবীর পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্যই যেন মা আমার জন্মিয়াছিলেন।

হায় হায়, ঐ দেখ আর এক সাংঘাতিক দৃশ্য! যতীন্দ্র শ্মশানে শায়িত! অভাগিনী বিধবার দত্তক সন্তান,—পালিত পুত্র যতীন্দ্র,—শুষ্ক মরুভূমিতে একটী সুকুমার পল্লব, চির অন্ধকারে আবৃত রাজভবনে একবিন্দু জ্যোৎস্না-জ্যোতি, হায়, ঐ নিবিয়া গেল! বিধবা, সযত্নে ও অতি সন্তর্পণে পালিত যতীন্দ্রের জীবন-ছায়ায় দগ্ধহৃদয় ক্ষণেকের জন্য স্থাপিত করিয়া একটু জুড়াইবেন, হায়, সে আশাতেও ছাই পড়িল! যম যতীন্দ্রকে লইলেন। আশার ক্ষুদ্র কণিকা,—অতি ক্ষুদ্র কণিকা,—আহা, যাহা শত গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়াছিলেন,—অভাগীর অঞ্চল হইতে খসিয়া পড়িল!!! মা কাশী হইতে ফিরিলেন—পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে!!!

অহো অশ্রুজল, তোমার সীমা কোথায়! অহো নারায়ণ! তোমার লীলা কে বুঝিবে!!

পরের অশ্রু মোচন করা যাঁহার জীবনের ব্রত, এক মাত্র অবলম্বন,—তিনি নিজের

বুনিয়া থাকে। কাঁকড়াবিছা,অসহ্য আলোক, উত্তাপ, বা অন্য কোন বিপদে পড়িলে, কাপুরুষের ন্যায় না মরিয়া, মাথায় হুল ফুটাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করে। সামান্য গোবরপোকাগুলিও একের অসাধ্য কর্ম্ম দশ জনে মিলিয়া করিয়া থাকে; এবং ভাণ্ডারে আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া, ইট বা পাথর চাপিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। মৎস্যের অনুসন্ধিৎসা বিখ্যাত। এক জাতীয় মৎস্য,জল ঘোলা করিয়া বসিয়া থাকে; নিকটে কিছু আসিলেই ধরিয়া ভক্ষণ করে। জলের উপর কোন পতঙ্গ উড়িতে দেখিলে, আর এক জাতি, মুখ হইতে এমনি জল ছুড়িয়া মারে যে, সে তখনি জলে পড়িয়া যায়। জলাশয়ের জল শুকাইতে আরম্ভ করিলে, বাণমাছেরা রাত্রি যোগে মাটীর উপর দিয়া, অন্য জলাশয়ে পলাইয়া যায়। অনেক জলাশয়ের মৎস্যকে এমনি শিখান যায় যে, ঘণ্টা বাজাইলে বা কথা কহিলে নিকটে আসে। খাবার দিলে, জলের অল্পতা প্রযুক্ত যদি ধরিতে না পারে, ডানা দিয়া জলে আঘাত করিয়া, ভাসাইয়া লইয়া যায়। রাশি রাশি ছোট মাছ একত্র হইয়া, বড় তিমি মাছ মারিবার কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন ভেক জাতীয় পুরুষেরা, প্রসবের পর নাড়ি কাটার কাজ সমাধা করে। আবার কোন কোন জাতি, মাছের মাথায় বসিয়া, আঙ্গুল দিয়া চক্ষু বিঁধিয়া, মাছমারে। একজন ছত্রিশ বৎসর একটী ভেক পুষিয়াছিলেন, সে তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলকে চিনিত। একটী বিবি একটী ভেকের নাম "টমি" রাখিয়াছিলেন। 'টমি' বলিয়া ডাকিলেই, সে সাঁতার দিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি যখন কিছু খাবার দিতেন, তখন তাঁহার হাতে চড়িয়া বসিয়া খাইত। ভেকগণের ঋতু পরিবর্ত্তন বুঝিবার ক্ষমতা জগদ্বিখ্যাত।

পশু-বাটীকায় দেখা গিয়াছে যে, ভল্লুকদিগকে কিছু খাইতে দিলে, তাহা যদি জলে পড়িয়া যায়, তবে উহারা জলে না নামিয়া ধারে বসিয়াই জল নাড়িতে থাকে; জল নাড়া পাইয়া খাদ্য দ্রব্য ভাসিতে ভাসিতে নিকটে পৌঁছিলে, ধরিয়া খায়। কুকুরেরা ঘ্রাণ-শক্তি দ্বারা শশকদিগকে অনুসরণ করে। উহাদিগকে দিশাহারা করিবার জন্য শশকেরা বিভিন্নদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পলায়ন করে; এবং মাঝে মাঝে লাফ দেয়। বিবরেরা এক সঙ্গে অনেক গুলি পরিবার বাস করে। মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে, বৃদ্ধেরা নদীর উৎস মুখে এবং যুবকেরা প্রান্তমুখে প্রস্থান করে। নদীর উৎসে সাহায্য অধিকতর মিলে, এজন্য যুবকেরা সেদিকে দুর্ব্বল বৃদ্ধদিগের প্রতিদ্বন্দী হয় না। বিবরদিগের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল সকলেই জানেন। বায়ু সঞ্চালনের জন্য ইহারা গৃহ প্রাচীরে গবাক্ষ রাখিয়া থাকে। বাসস্থানের গুণাগুণ অনুসারে ইহারা বাস গৃহ বিভিন্নরূপে নির্ম্মাণ করে। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইহারা যখন গাছ কাটে, তখন এমনি ভাবে কাটিয়া থাকে যে, গাছটী যেন মাটীতে না পড়িয়া জলে পড়ে; কেননা, জলে পড়িলে বহিয়া লইবার অনেকটা সুবিধা হয়। গাছ কাটিতে ও বহিয়া লইতে ইহারা খুব কৌশল দেখায়। ইহারা কখন কখন বাস-গৃহের চারিদিকে গড়খাই কাটিয়া থাকে; এক একটী থাম কাটিতে পুরুষ পরম্পরায় শতাধিক বর্ষ অতিবাহিত করে। হস্তীগণ বহুদিনের পুরাতন ঘটনা স্মরণ রাখে। এক

জন একটী হস্তীর সহিত তামাসা করিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাঁহাকে নিকটে পাইয়া, হস্তীটী তাঁহার সমস্ত শরীর,পচাজলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। একটী বলবান হস্তী একদিন একটী দুর্ব্বল হস্তীর পান পাত্র কাড়িয়া লইয়াছিল, আর এক দিন সুবিধা পাইয়া দুর্ব্বলটী বলবানকে একটী কূপের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। কূপমধ্যে কাঠ ফেলিয়া দিলে, হস্তিটী আপনা আপনি মাচা সাজাইয়া, কূপ হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। হস্তীরা বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করে। সেতু পার হইবার সময় হস্তীরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের গুরুভার সেতুটী সহ্য করিতে পারিবে কি না। হাতীকে তাড়া করিলে গাছে চড়িয়া দেখা গিয়াছে, গাছটী উৎপাটিত করিতে না পারিলে ইহারা পাথর বা কাঠ জড় করিয়া স্তূপাকার করে, এবং তাহার উপর চড়িয়া পলায়িতকে শুঁড় দিয়া ধরিবার চেষ্টা করে। যদি খাদ্য দ্রব্য শুঁড় দিয়া ধরিতে না পারে, তবে ইহারা এমন জোরে ফুঁ দেয় যে, দ্রব্যটী ছুটিয়া গিয়া বিপরীত প্রস্তরখণ্ড বা প্রাচীরে লাগিয়া ফিরিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। একটী হাতীর পীড়া হইয়াছিল,সে কোন প্রলোভনেও ডাক্তারকে চিকিৎসা করিতে দেয় নাই, শেষে তাহার মা আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া,তাহাকে এমন করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, ডাক্তার নির্ভয়ে তাহার চিকিৎসা করিতে পারিয়াছিলনে। হাতীদিগকে কোন জিনিষ ধরিতে দিলে, সেটী ভারি কি লঘু, শক্ত কি ভঙ্গুর,তাহা তাহারা বুঝিতে পারে। যাহারা হাতী ধরে, তাহারা বলে যে, পোষা হাতীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্যদিগকে ধরাইয়া দেয়; এবং আপন দাসত্বে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে আনন্দ অনুভব করে। ঘোড়ারা হাতী দেখিলে ভয় পায়, তাহাদিগকে সাহস দিবার জন্য, হাতিরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পথ ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়; কখন বা অভয়সূচক শব্দও করে। বোঝা তুলিবার সময় হাতীরা অসামান্য এঞ্জিনিয়ারি-বুদ্ধি প্রকাশ করে। রৌদ্রের উত্তাপ অধিক লাগিলে,ইহারা কাঁদা বা খড় দিয়া দেহ ঢাকিয়া ফেলে। শুঁড়দিয়া ইহারা দেহের কোন স্থান স্পর্শ করিতে না পারিলে, কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া সে স্থানটী চুলকাইয়া লয়। কখন বা ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস খায়। পায়ের শিকল খুলিয়া, ঢাকা খুলিয়া আহার্য্য চুরি করিয়া খাইয়া, আবার ঢাকা দিয়া স্বস্থানে যাইয়া, শিকল পায়ে বাঁধিয়া, কোন কোন হাতীকে নিরীহ ভদ্রলোকের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

একজন, বিড়ালীর সন্তানেরা কোন দোষ করিলে,বিড়ালীর কাণ মলিয়া দিতেন। কাণমলা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, বিড়ালী তাহার পর হইতে, সন্তানেরা দোষ করিলেই আপনি তাহাদিগকে কাণ মলিয়া দিত এবং অন্য শাস্তি দিয়া ভদ্র ব্যবহার করিতে শিখাইত। চিৎকার করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারিলে,বিড়ালেরা গৃহস্বামীর কাপড় টানিয়া মনোভাব বিদিত করে। স্তনের দুগ্ধ হঠাৎ শুখাইয়া গেলে, ইহারা সন্তানদিগকে অন্য খাদ্য খাওয়াইতে শিখায়। একজনের একটী পোষা পাখী, দুধের কড়ায় পড়িয়া মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। একটী বিড়াল তাহার দুরবস্থা দেখিয়া, কাপড় টানিয়া গৃহস্বামিনীকে আনিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। একটী বিড়াল খাবার ছড়াইয়া দিয়া গোপনে বসিয়া থাকিত, পাখীরা খাবার খাইতে আসিলে,তাহাদিগকে

ধরিয়া উদর পূর্ণ করিত। বিড়ালেরা হস্ত-দিয়া হুড়কা ঠেলিয়া টানিয়া দরজা খোলে। দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বিলাতের কোন কোন বিড়ালকে ঘণ্টা বাজাইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তাহারা দেখিয়া দেখিয়া শিখিয়াছে; কেহই চেষ্টা করিয়া শিখায় নাই। বিড়াল ও কুকুরেরা ঘণ্টা বাজাইয়া চাকরদিগকে ডাকে। এক জন তাহার কুকুরকে ইহা শিখাইয়াছিলেন। ঘণ্টা বাজাইবার উদ্দেশ্য কুকুরটী শিখিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য, তিনি কুকুরটীকে ঘণ্টা বাজাইতে বলেন, কিন্তু তখন সে বাড়ীর একমাত্র চাকর সেই ঘরেই উপস্থিত ছিল। প্রভুর আজ্ঞার অর্থ কি? বাবু কি খেপিয়াছেন? কুকুরটী—এ নিরর্থক আজ্ঞার অর্থ না বুঝিয়া বাবুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বারম্বার আদেশ করিলেও আজ্ঞা পালন করিল না। কিছু পরে চাকরটী যখন চলিয়া গেল, তখন একবার আদেশ করিবা মাত্র কুকুর ঘণ্টাটী বাজাইল। একটী বিড়াল হস্ত দিয়া তালা নাড়িয়া খুলিয়া ফেলিয়া, দ্বার ঠেলিয়া, দুধ চুরি করিত। মৎস্য-জীবীরা রাত্রিতে হ্রদ বা সমুদ্রে জাল ফেলিয়া আসে। দেখা গিয়াছে, শৃগালে ও নেকড়ে বাঘে রাত্রিযোগে জাল টানিয়া, ডাঙ্গায় তুলিয়া, মাছগুলি উদরসাৎ করিয়া পলায়ন করে। যে দড়ির সহিত ফাঁদের সংযোগ থাকে, ইহারা সে দড়িটী কাটিয়া বা ফাঁদের নীচে গর্ত্ত করিয়া, ফাঁদের আহার্য্য অবাধে ভক্ষণ করে। গর্ত্তের ভিতর লাঙ্গুল দিয়া, শৃগালের কাঁকড়া ধরিয়া খাইবার কথা সকলেই অবগত আছেন। আহার্য্য সংগ্রহ করিলে, শৃগালেরা কোন স্থানে লুকাইয়া দেখিতে আসে যে, তাহাদের খাদ্য লইয়া যাইবার পথে কোন বিপদ আছে কি না। সে পথে কোন মানুষ দেখিলে একটী যাহা কিছু মুখে লইয়া পলায়ন করে; মানুষটী তাহাতে প্রতারিত হইয়া প্রস্থান করিলে, লুক্কায়িত আহার্য্য, ফিরিয়া আসিয়া নিরাপদে গৃহে লইয়া যায়। শৃগাল ও কুকুরেরা দলবদ্ধ হইয়া, একের অজেয় বড় বড় জন্তু কিরূপে বধ করে, সকলেই শুনিয়াছেন। এক জনের একটী ছোট, বিশেষ ঘ্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন কুকুর ছিল, কিন্তু সে বড় দৌড়াইতে পারিত না; আর একটী খুব দৌড়াইতে পারিত, কিন্তু তাহার ঘ্রাণশক্তি তত প্রবল ছিল না। বড় কুকুরটী, মাথা গলাইয়া শিকল খুলিয়া, রাত্রিতে চুপে চুপে ছোট কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া শিকারে যাইত। ছোটটী ঘ্রাণবলে দেখাইয়া দিত, বড়টী দৌড়িয়া জন্তুদিগকে বধ করিত। দুজনে উদর পূর্ণ করিয়া রাতারাতি গৃহে ফিরিত, এবং বড়টী আবার শিকলে মাথা গলাইয়া পড়িয়া থাকিত—ভিতরের এত কথা গৃহ স্বামী জানিতে পারিতেন না।

কুকুরদিগের স্মৃতি-শক্তি অতিশয় প্রবল। দেখা গিয়াছে, ইহারা পাঁচ বৎসরের কথা মনে রাখিতে পারে। ইহাদিগের অহঙ্কার আছে, মান অপমান বুঝে। ভাল কুকুরকে একটু কঠোর ভাবে দৃষ্টি করিলে, কি একটু ধমক দিলে, দুঃখে সমস্ত দিন ম্রিয়মান থাকে। রোমানিজ সাহেবের একটী কুকুরকে, তাঁহার ভাই, সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিল; এক দিন তিনি হাতের দস্তানা ফেলিয়া কুকুরটীকে মারিয়াছিলেন; মার খাইয়া সে সাহেবের দিকে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল; এবং তদবধি আর কখনও তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে যায় নাই। অন্য কোন কুকুরকে, কেহ মারিতেছে দেখিলে, সে কামড়াইয়া নিবৃত্ত

করিত। রোমানিজ সাহেব গাড়ী হাঁকাইবার সময় ঘোড়াকে মারিতে উদ্যত হইলে, সে কাপড় টানিয়া নিবৃত্ত করিত। খুব প্রহার করিয়া যে কার্য্য করাইতে না পারা যায়, দেখা গিয়াছে যে, দুই চারি দিন আদর করিয়া না কথা কহিলে, ইহারা আপনা হইতে সে কার্য্য করিয়া থাকে। ভাল জাতীয় কুকুর, নীচ জাতীয় কুকুরদের সহিত আলাপ করিতেও ঘৃণা করে। কুকুর পুত্রের নিকটও পরাস্ত হইতে অপমান বোধ করে, এবং প্রতিদ্বন্দীকে আদর করিতে দেখিলে মনোদুঃখে কাতর হয়।

আমি একটী ময়না পুষিয়াছি; আগে সে একাকী ছিল; অবসরকালে কেবল তাহাকেই আদর করিতাম। যে অবধি আর একটী কাকাতুয়া পুষিয়াছি, সেই অবধি ময়না আমাকে দেখিয়া আর তেমন আনন্দ প্রকাশ করেনা। আগে কত কথাই বলিত; এখন একেবারে নীরব হইয়াছে বলিলেও হয়। কুকুরে ঠকাইতে জানে; পীড়িত অবস্থায় অধিক আদর পাইলে, পীড়া আরোগ্য হইলেও দেখায়, যেন পীড়া সারে নাই। একজনের একটী কুকুর, শার্ষির উপর যে সকল মাছী বসিত, তাহাদিগকে মারিত, যখন সে ধরিতে পারিত না, প্রভু হাসিয়া উঠিতেন, তাহাতে সে বড় বিরক্ত হইত। একদিন বারম্বার এইরূপে উপহসিত হইয়া সে এমনি করিতে লাগিল যেন ধরিয়াছে, এবং গর্ব্বিতভাবে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু সাহেব প্রতারিত হন নাই, মাছিটী তখনও শার্ষির উপর বসিয়াছিল; তিনি কুকুরটীকে তাহা দেখাইলে সে লজ্জায় এক কোণে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। কুকুরেরা শব্দ করিয়া বা অঙ্গভঙ্গিকরিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে। একজন জলে ডুবিয়া গিয়াছিল; তাঁহার কুকুর কোনরূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিকটস্থ গ্রামের এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া প্রভুকে বাঁচাইয়াছিল। কোন কোন কুকুর সাহেবদের মত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া থাকে। একজনের দুইটী কুকুর ছিল, প্রভুর সম্মুখে বিবাদ করিলে তিনি উভয়কেই প্রহার করিতেন। অগত্যা মনান্তর হইলে, তাহারা বাড়ীতে কিছু না করিয়া সাঁতার দিয়া একটী বড় নদী পার হইয়া, অপর পারে গিয়া লড়াই করিত। দুইটী কুকুরে ঝগড়া হইলে একজন ক্ষমা চাহিয়া, কখন কখন ঝগড়া মিটায়। একজনের দুইটী কুকুরের মনান্তর হইলে, সমস্ত দিন একটী কাহার সহিত আলাপ করিল না, পরদিন একাকী একখানি বিস্কিট অন্যটীকে উপহার দিয়া ঝগড়া মিটাইয়া ছিল। এইরূপে কোন দ্রব্য প্রভুকে উপহার দিয়া, প্রভুর কোপ শান্তি করিবার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। কুকুরে পয়সা লইয়া দোকানে গিয়া খাবার কিনে; মূল্যের উপযুক্ত দ্রব্য পাইল কি না, তাহাও বুঝে। ইহারা ছবি দেখিয়া চিনিতে পারে, বাড়ীর কাহার সে ছবি। প্রভুর অনুপস্থিতি কালে, প্রভুর ছবির পার্শ্বে বসিয়া কত কুকুরকে সাধ মিটাইতে দেখা গিয়াছে। ঘ্রাণদ্বারা কোন পদার্থের অনুসরণ ক্রমে, তেমাথা পথে উপস্থিত হইলে দেখা যায়, দুইটী পথে সে দ্রব্যের ঘ্রাণ না পাইলে, পরীক্ষা না করিয়াই কুকুরেরা তৃতীয় পথে ধাবমান হয়। ইহা সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম নহে। প্রভুর সহিত কোথাও যাইতে হইলে, ইহারা মাঝে মাঝে প্রভুর মত ঘুরিয়া না গিয়া সোজা পথে চলিয়া যায় (two sides of a triangle are

BLEED THROUGH.

greater than the third, or a chord is shorter than its base) তাহাতে দূরত্বের কম হয়,ইহা তাহারা বুঝিতে পারে। ইঁদুরেরা কুকুরের অপেক্ষা দ্রুত সাঁতার দিতে পারে; কিন্তু স্থল পথে কুকুরের গতি অধিক দ্রুত। স্রোতে ইঁদুর সাঁতার দিয়া পালাইতেছে দেখিলে, কুকুরেরা তখনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে না, কারণ সাঁতারে পরাস্ত হইবে; এজন্য স্থল পথে স্রোত-মুখে দৌড়িয়া গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ইঁদুর সাঁতার দিয়া নিকটে উপস্থিত হইলে তখন তাহাকে ধরে। জীবন্ত খাইতে গেলে কাঁকড়ায় কামড়াইয়া দেয়. এজন্য কোন কোন কুকুর, পাথরে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিয়া, উহাদিগকে ভক্ষণ করে। এই রূপে আছাড় মারিয়া কোন কোন কুকুর সাপ মারে। বরাবর উপর দিয়া দল বাঁধিয়া যাইতে যাইতে কুকুরেরা বুঝিতে পারে, কোথায় বরফ পতন হইয়াছে; অমনি ছত্র ভঙ্গ হইয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ না করিলে, সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে ডুবিয়া মরিতে পারে। প্রভু বাহিরে গিয়াছেন কি না, জানিতে না পারিলে, কুকুরেরা খুজিয়া দেখে, যেখানে তাঁহার চাদর থাকে সেখানে চাদর আছে কি না এবং চাদর দেখিতে পাইলে শুঁকিয়া দেখে যে, তাঁহার চাদর কি না। এক জনের দুইটী বিড়াল ও একটী কুকুর ছিল। বিড়াল দুইটীকে কুকুরটী কখনও বিরক্ত করিত না। এক দিন একটী বিড়াল মারিয়া ফেলিবার জন্য প্রভু হাতে পিস্তল লইলে, কুকুরটী বিড়ালটীকে লইয়া প্রস্থান করে, এবং কিছু পরে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর পায়ের নিকট মারিয়া দেয়। প্রভু দেখিলেন, সে মরিয়া গিয়াছে। নদীর এক পার হইতে গুলি করিয়া অপর পারে পাখী মারিলে, শিকারি কুকুর আগে আহত-টীকে আনে, তার পরবারে হতটীকে আনিয়া থাকে। দুইটী আহত হইলে একটী হত্যা-করিয়া রাখিয়া আসে। নদী পার হইবার সময় ইহারা জোয়ার ভাঁটা বুঝিয়া এমনি কোণ কাটিয়া চলে যে, ঠিক প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়। যে সকল কুকুর মাঠে চৌকি দেয়, বরফ পড়িতে দেখিয়া তাহারা বাড়ী হইতে আপনা আপনি মাদুর বা অন্য কোন আচ্ছাদন আনিয়া দেহ ঢাকিয়া রাখে। একটী কুকুর, একজন সাহেবকে, বারবার চেষ্টা করিয়া, আপন অভিপ্রেত স্থানে লইয়া যাইতে পারে নাই। তখন সে সাহেবের টুপি লইয়া সেই খানে গিয়া রাখিয়াছিল; টুপির লোভে সাহেব সেখানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে, কুকুরেরা কখন কখন ট্রেনে চড়ে এবং গন্তব্য ষ্টেশনে নামিয়া যায়, যদি কোন কারণে সে ষ্টেশনে নামিতে না পারিয়া, দূরের ষ্টেশনে নামিতে বাধ্য হয়, তবে ফিরত গাড়ীর জন্য সেখানে অপেক্ষা করিয়া থাকে এবং ফিরত গাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

বানরদিগের সন্তান-স্নেহ ও সহানুভূতি মনুষ্যের অপেক্ষা ন্যূন নহে। বানরী সন্তানের মুখ ধুয়াইয়া দেয় এবং সন্তানের গায়ে মাছিটী পর্য্যন্ত বসিতে দেয় না। সন্তান-শোকে,কোন কোন বানরীকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখা গিয়াছে। কাহারও মার মৃত্যু হইলে,অনাথ অপালিত শিশুকে অন্যেরা প্রতি-পালন করে। বানরেরা আহতদিগকে লইয়া পলায়ন করে, কোন কোন সম্প্রদায় (Hylobatis agilis) হতদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায়,বানরেরা আহতের সেবা করে এবং কিছু খাইতে পাইলে আগে তাহাকে খাইতে দেয়।

জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া গেলে অন্যেরা, মানুষের মত দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া, তাহার উদ্ধার করে। বানরেরা তামাসা করিতে জানে এবং কখন কখন মনুষ্যদিগকে দুর্ব্বৃত্ততার জন্য লজ্জা দেয়; যাঁহারা কোন বানরকে গুলি মারিয়াছেন, তাহারা একথা বেশ জানেন। শিম্পাঞ্জিরা দল বাঁধিয়া বাজনা বাজায় বা খেলা করে। বানরদিগের অনুসন্ধিৎসা বড় প্রবল। ইহারা সাপকে ভয় করে, তথাপি একটী থলির মধ্যে সাপ পুরিয়া রাখিলে সকলে একএকবার আসিয়া উকি মারিয়া দেখিয়া যায়। ইহারা অনুকরণ করিতে বড় ভালবাসে। একটী সাহেব একটী হনুমানকে বড় বিরক্ত করিয়াছিলেন। এক দিন সাহেবকে পথে পাইয়া হনুমানটী, জল আনিয়া কাদা গুলিয়া, বৃক্ষের ডাল হইতে সাহেবের সর্ব্বত্র কাদা ঢালিয়া দিয়াছিল। তার পর সে সাহেবকে দেখিলেই আনন্দ ও অহঙ্কার প্রকাশ করিত। বানরেরা আয়নাতে মুখ দেখিতে পাইলে কি কাণ্ড করে, অনেকেই জানেন। একটী বানরকে কয়েকটী ডিম দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম ডিমটী জোরে ভাঙ্গাতে অনেকাংশ নষ্ট হয়, তারপর আর সব ডিম গুলির একাংশ প্রস্তরে আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া খাইত। কোন অস্ত্রে একবার হাত কাটিলে তারপর সে অস্ত্র যত বারই ধরুক না কেন, আর হাত কাটিবে না। কাগজে পুরিয়া একজন একটী বানরকে চিনি খাইতে দিয়াছিলেন। একটা কাগজের ভিতর একটা বোল্‌তা ছিল, তাড়াতাড়ি যেমন খাইতে গিয়াছে, অমনি বোল্‌তা তাহাকে কামড়াইয়াছিল। তারপর সে আর সব গুলি পুরিয়া আগে কাণের কাছে ধরিত, কোন শব্দ না পাইলে, তবে খুলিয়া দেখিত। একটা পোষা বানর রুটীর লোভ দেখাইয়া মুর্গী ডাকিত, কেহ কাছে আসিলে তাহাকে ধরিয়া আহার করিত। কোন জিনিষ স্পর্শ করিতে না পারিলে, ইহারা লাঠী দিয়া সেটীকে কাছে টানিয়া আনে। কেহবা চেয়ার টানিয়া তাহার উপর চড়িয়া দ্বারের অর্গল খুলে। আপনি না পারিলে, একটা বানর লাঠির সাহায্য লইয়া বড় বড় বোঝা তুলিত। ইহারা পাথর দিয়া হাতুড়ির কাজ করে। মানুষের মত বানরেরা সন্তানদিগকে প্রহার করিয়া শাসন করে, এবং দ্বার বন্ধ হইয়া না যায়, এজন্য আপনা আপনি বুদ্ধি করিয়া দ্বারে ঠেক দিয়া রাখে। কোন কোন জাতীয় বানর সাপ ধরে এবং না কামড়াইতে পারে এজন্য পাথর দিয়া উহাদের বিষদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। বারাক হইতে কাপড় লইয়া পলায়ন করায়, একদল সাহেব হনুমানদের আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, ইহারাও দল বাঁধিয়া একজন সেনাপতির আদেশ মত, পাথর ছুড়িয়া সাহেবদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইহারা অব্যর্থ লক্ষ করিতে পারে। বানরেরা দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে না পারিলে, পাথর বা অন্য কোন ভারি দ্রব্য দিয়া বাদাম প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খায়; হাতুড়ি পাইলে বিনা শিক্ষায় হাতুড়ি ব্যবহার করিতে পারে; লাঠি ভাঙ্গিতে হইলে দুইটা ভারি দ্রব্যের মধ্যে রাখিয়া মাঝখানে ধরিয়া টানে। ইহারা আপনি চেষ্টা করিয়া স্ক্রু খুলিতে ও আঁটিতে পারে।

মনুষ্য যতই নিকৃষ্ট হউক, পশু পক্ষী ও বানরের ঊর্দ্ধতন। তবে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট মনুষ্যে যত প্রভেদ, বর্ব্বর ও বানরের প্রভেদ তত নহে। এবং যে বিভিন্নতা নিকৃষ্ট ও উৎ-

BLEED THROUGH.

কৃষ্ট মনুষ্যের মধ্যে, সেই বিভিন্নতা মনুষ্যও ইতর প্রাণীর মধ্যে পরিমাণগত, প্রকার গত নহে। নবকালিডোনীয় বা তাসমেনীয়দিগকে ব্রাইট বা গ্লাড্‌ষ্টোনের স্বজাতীয় বলিতে হইলে, কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করিতে হয়; অথচ উভয়েই মনুষ্য। যে কিছু প্রভেদ আছে, সে মস্তিষ্কের ব্যাবৃত্তির প্রকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা সঞ্জাত। বানর ও শিম্পাঞ্জি,সেইরূপ তাসমেনীয় বা অষ্ট্রেলিয় অপেক্ষা অল্পতর ব্যাবৃত্তি সম্পন্ন, প্রকৃতিগত আর কোন বিভিন্নতা নাই।

বানরের অস্ত্র, লাঠী ও প্রস্তর; তাসমেনীয়ের অস্ত্র লাঠী, লাঠী সূচন করিয়া বর্ষা, কেহ কেহ লাঠীতে আঠাদিয়া পাথর বসাইয়া লয়। নবকালিডোনিয়ার লোকে ধনুক প্রস্তুত করিতে জানে না। বস্তুত লাঠী ও বর্ষা সকল জাতীয় বর্ব্বরদিগের প্রথম অস্ত্র। কোন কোন দেশে, লতায় বাঁধিয়া এদেশীয় ফিঙ্গার মত ছুঁড়িতে পারে। পশু পক্ষীরা আগুনের ব্যবহার জানে না। আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি, নানা দেশীয় বর্ব্বরেরাও তাহা জানেনা, এবং এক সময় কোন দেশীয় লোকেই তাহা জানিত না। খ্রী ১৫২১ অব্দে, মেরিয়ানা দ্বীপবাসীরা আগুনের ব্যবহার জানিত না। অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা কিরূপে অগ্নি রক্ষা করিতে হয়, অদ্যাপি জানেনা, একবার আগুন নিবিয়া গেলে আবার বহু দূর হইতে চাহিয়া আনে। পশুপক্ষীরা হাঁড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে না, যাহারা অগ্নি ব্যবহার জানিত না বা অল্প পরিমাণে জানিয়াছিল, তাহারাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। ইতরপ্রাণী কৃষিকার্য্য জানেনা, তাসমেনীয় ও অষ্ট্রেলিয়েরাও কৃষিকার্য্য জানেনা। বনজাত ফল মূলে বা মৃগ মাংসে ইতর প্রাণীর ন্যায়, নানা দেশীয় অসভ্য উদর পূর্ণ করে। গৃহনির্ম্মাণ ক্ষমতায়, অনেক জাতি মনুষ্য অপেক্ষা, পশু পক্ষী শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য ও বানরের কণ্ঠনালী একই ভাবে গঠিত। মানুষ ইঙ্গিত দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, কুকুর বানর প্রভৃতি ইতর জন্তুরাও ইঙ্গিতের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে। মানুষ স্বর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, ইহারাও স্বর দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করে। মানুষ অনুকরণ করিয়া শব্দ শিক্ষা করে। পক্ষীর কণ্ঠনালী এত সুন্দর ভাবে গঠিত যে, সভ্য মানুষের কঠিন কঠিন বাক্য উহারা উচ্চারণ করিতে পারে। শব্দের অর্থ পক্ষী, কুকুর বা বানরের অনধিগম্য নহে। কুকুর বা বানরের শব্দ সংখ্যা অপেক্ষা, বর্ব্বর ভাষার শব্দ সংখ্যা বড় অধিক নহে। হেকেল বলেন, প্রাচীনতম মনুষ্যের, এক্ষণকার মনুষ্যের ন্যায়, বাকশক্তি আদৌ ছিল না; ইতর প্রাণীর ন্যায় তাহারা কেবল ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিত। কোন কোন পশুর অল্প পরিমাণে গণনাশক্তি আছে; সিংহলের ব্যাধদিগের আদৌ গণনাশক্তি নাই। তাসমেনীয় ও অষ্ট্রেলিয়ার ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ দুইটী মাত্র, নবকালিডোনিয় ভাষায় চারিটী। একটী সাহেবের নিকট বসিয়া একজন আফ্রিকাবাসী কোন দ্রব্য গণিতেছিল। সেখানে তাঁহার কুকুরও তাহার সন্তানগুলি গণিতেছিল, সাহেবটী লিখিয়াছেন, এই দুই জনের মধ্যে গণনা শক্তিতে কে শ্রেষ্ঠ,নির্ণয় করিতে পারি নাই। কুকুরের দূরত্ব পরিমাণ ক্ষমতা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

অশরীরী দেবতায় মনুষ্যের বিশ্বাস আছে, ইতর প্রাণীর নাই। কিন্তু প্রাচীনতম

সময় এ বিশ্বাস মানব সমাজে ছিল, এমন বোধ হয় না। ধর্ম্ম বিশ্বাস মস্তিষ্কের প্রকৃষ্ট ব্যাবৃত্তির ফল। যে সময় ব্যাবৃত্তি তত হয় নাই, সে সময় সে বিশ্বাস ছিল না। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিৎ বলেন, এখনও অনেক জাতীয় বর্ব্বরের কিছু মাত্র ধর্ম্ম বিশ্বাস নাই। অন্যেরা একথা স্বীকার করেন না। ফলত মনুষ্য যে ইতরপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্টতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীববৃক্ষের মূলে, ইতর প্রাণী শাখায়, মনুষ্য কালক্রমে শীর্ষদেশে কি জন্মিবে, কে অনুমান করিতে পারে?

অতীত গৌরবজনক না হইলেও, মানব সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সত্যযুগ অতীত হয় নাই; ভবিষ্যতে আসিতেছে। ইদন উদ্যান হারাই নাই, পাইব। পুরাণ কাহিনী হৃদয়কে বিষণ্ণ করে, অতীতের উজ্জ্বল রেখায় ভবিষ্যৎ অন্ধতর করিয়া ভয় দেখায়। মানব বিজ্ঞান মানব সন্তানকে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করে; ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমানের দুর্ব্বহ ভার লঘুতর হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

জাতীয় পতন।

(কিঞ্চিৎ অনুধাবন)

আমরা এখন হিন্দু জাতির অধঃপতনের বিষয় ভাবিতেছি, ও কি উপায়ে এই অধঃপাত নিবারিত হইয়া উন্নতির সূচনা হয়, তাহার কল্পনা করিতেছি, ইহা বাস্তবিক জাতীয় সুলক্ষণ। রোগের অস্তিত্ব না জানিলে, প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। অধঃপাত না বুঝিলেও উন্নতির জন্য ব্যাকুল হওয়া যায় না। সেই জন্য এখন এ সম্বন্ধে যিনি যাহা লেখেন, তাহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, প্রতিপন্ন হয়। যে রোগ ব্যক্তি বিশেষের গাত্রে নহে, সমস্ত হিন্দু জাতিকেই স্পর্শ করিয়া অপবিত্র ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব নির্ণয় ও প্রতীকার বিধান অবশ্যই দেশহিতমূলক, সন্দেহ নাই। সাধারণের এতৎ সম্বন্ধীয় চিন্তাতে রোগের অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছে, কিন্তু হিতৈষীগণের চেষ্টায় এখনও প্রতীকার সুবিহিত হয় নাই। তজ্জন্য বহু সমালোচনা আবশ্যক।

উত্থান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম। ব্যক্তি বিশেষের হউক, অথবা জাতি বিশেষের হউক,উভয়েরই সম্বন্ধে ঐ এক কথা। মানবকৃত কার্য্য, প্রকৃতির কার্য্যেরই অন্তর্গত। সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম বলিলে, যে নিয়মে মনুষ্যের কার্য্য পরম্পরার উৎপত্তি হয়, তাহাও বুঝায়। অতএব অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মানবের উত্থান পতন কেবল জড় প্রকৃতির নিয়মে নহে, মানব প্রকৃতির নিয়মেও বিহিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত উভয় প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অনন্যথায় ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, কালি বড় ছিলাম, আজি ছোট হইয়াছি; আবার আজি ছোট আছি, কালি বড় হইব। বালক যুবা হইতেছে, যুবা বৃদ্ধ হইতেছে, বৃদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে, আবার অনাদি হইতে শিশু আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। এই রূপে উঠিতে পড়িতে, জনস্রোত আবহমান কাল হইতে

অনন্তের দিকে ধাবিত হইতেছে। জাতীয় উত্থান ও পতন, সেই একই প্রণালীর অন্তর্গত। সুতরাং নব্যভারতে, ২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যার সুলেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় মহাশয় প্রবন্ধ শেষে যে আশা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সুসঙ্গত আশা। ভরসা করি, সকলেরই ঐ আশার সহিত সাহানুভূতি আছে, ও থাকিবে।

কিন্তু ঐ আশানুযায়ী কার্য্য হওয়ার জন্য উক্ত লেখক মহাশয় প্রবন্ধ মধ্যে যে সকল উপায়ের বর্ণনা ও বিধান করিয়াছেন, তাহার সকল গুলির সহিত সাধারণের ঐক্য হইবে কি না, সন্দেহ স্থল। সাধারণের কথা বলিতে পারি বা না পারি, আমার নিজের কথা বলিতেছি যে, আমি একমত হইতে পারি নাই। হইতে পারে, আমিই ভ্রান্ত। কিন্তু ভ্রান্তি যাহারই হউক, তাহা দূর হওয়া উচিত। এ জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

মনুষ্যমাত্রেই, স্বভাববশত, ন্যূনাধিক পরিমাণে ভ্রান্তির দাস। এ দাসত্ব আমরা সহজে ঘুচাইতে পারি না। ইহাতে অনেক স্বার্থত্যাগ, কষ্টস্বীকার ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। যতই কেন ন্যায়-শিক্ষিত হইয়া যুক্তি অবলম্বন করা যাউক না, ভ্রান্তি আমাগদিকে ছাড়িবার নহে। সেই জন্য ভ্রম ধরিবার নিমিত্ত সকলেরই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। ইহাতে ন্যূনতা বোধ জন্য আত্মক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।

সিদ্ধেশ্বর বাবু প্রবন্ধারম্ভেই স্বাধীনতার গুণগান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা বস্তুটী কি, তাহা বুঝাইবার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পান নাই। বোধ হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারে, এই ধারণার বশেই তিনি ব্যাখ্যা দ্বারা এই বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই ত্রুটী প্রযুক্তই তাঁহার যুক্তি ভ্রমমার্গে উপনীত হইয়াছে। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন, "মনুষ্য স্বাধীনতা-প্রিয় জীব; সে প্রতি কার্য্যে ও চিন্তায় স্বাধীনভাবে কার্য্য ও চিন্তা করিতে যত্নশীল।" তাঁহার মতে, মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তির রোধ হওয়াই দূষনীয় ও উন্নতির বাধক। "সুতরাং (তিনি বলেন) যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার পথ কোন মতে রুদ্ধ না হয়, মনুষ্য মাত্রেরই এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" আবার এইরূপ তর্ক করিতে করিতে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "শাসন স্বাধীনতার পরম শত্রু। কিন্তু অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা স্বাধীন, তাহারাই অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছে।"

এখন কথা এই যে, মনুষ্য স্বাধীনতা প্রিয় জীব, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য বটে। আর সেই জন্যই আদিম অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের কোন শাসনই ছিল না। সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা, অবাধে তাহা সম্পন্ন করিতে যাইয়া, অপরের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া, পরস্পর মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া, যে পর্য্যন্ত না একপক্ষ অপর পক্ষের কর্ত্তৃক নিহত বা ক্ষমতা-রহিত ভাবে আহত হইত, তাবৎ পরস্পরের প্রতি পশুবৎ আচরণ করিতে ক্ষান্ত হইত না। এই রূপে অধিকাংশ মনুষ্যের সংহার সাধিত হইত, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। পরে এই স্বাধীনতার ফলে 'জোর যার মুলুক তার' হইয়া উঠিল।

সুতরাং শাসনের আরম্ভ হইল। অন্য কথায়, এক পক্ষের স্বাধীনতা দ্বারা অপর পক্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে এক এক সময়ে সকল দেশেই একাধিপত্যের মূল সংস্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে মনুষ্যের অপরাপর সদ্বৃত্তির স্ফূরণারম্ভ হইয়া মনুষ্যকে নিয়মতন্ত্র করিয়া তুলিল। সুতরাং ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, সকল স্থানেই স্বাধীনতার স্ফূরণ রহিত হইয়া অপরাপর সদ্বৃত্তির স্ফূরণ ও তৎসূত্রে গার্হস্থ্য নিয়মাবলী, সামাজিক নিয়মাবলী, ও রাজবিধি, শাসনবিধি ইত্যাদির বিকাশ হইয়াছে। মনুষ্যের স্বভাব যেরূপ দোষ-প্রবণ, তাহাতে এই সকল বিধি রহিত হইলে, মনুষ্য এক দিনেই আবার সেই আদিম বর্ব্বর অবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে। বস্তুত স্বভাবশাসন ও আত্মশাসন দ্বারাই মনুষ্যের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে, স্বাধীনতা দ্বারা নহে। অন্তত সিদ্ধেশ্বর বাবুর কল্পনায় স্বাধীনতা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দ্বারা নহে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাসন স্বাধীনতার পরম শত্রু হইলেও সর্ব্বসাধারণের পরম মিত্র। যাহা সকলেরই পরম মিত্র, তাহা সকলেরই আদরণীয় হওয়া উচিত। স্বাধীনতা উচ্ছিন্ন হইয়া যাউক, ক্ষতি নাই; সুশাসন থাকুক, তাহা হইলে কোন স্থলেই অত্যাচার হইতে পারিবে না। অত্যাচার না হইলেই মনুষ্য সুখী হইতে পারিবে, এরূপ ভরসা করা যায়। উদ্দাম স্বাধীনতার সুখ বড় মিষ্ট ও বড়ই উন্মাদক, কিন্তু শান্তি ও নিরাপদ যে সুখ প্রদান করে, তাহা তত সুমিষ্ট না হইলেও প্রীতিপ্রদ, সন্দেহ নাই। অন্তত ইহাকে প্রীতিপ্রদ জ্ঞান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মনুষ্য শিক্ষা করিবার ও সংযত-শাসিত হইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, স্বেচ্ছাচার দ্বারা জগৎ উচ্ছিন্ন করিবার জন্য নহে।

সিদ্ধেশ্বর বাবু মনুষ্যজাতির এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার উপর জাতীয় উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। আবার কিছু দূর যাইয়াই বলিতেছেন যে, "একতাই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ। সমস্ত জাতীয় একতার কথা দূরে রাখিয়া দেখিবে যে, কোন একটী ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্গত দুই তিন জনেরও মতের ঐক্য হয় না এবং কোন একটী কার্য্যে সকলের সাহায্যের আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ পথে প্রস্থান করে।" এক স্থানে প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, স্থিতিশীলতাই আসিয়ার সমস্ত দেশের অনুন্নতির প্রধান কারণ; আর অন্য স্থলে স্থিতিশীলতা বিনাশের উপায়-স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইল যে, "কেহ কাহারও অধীন না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে, আপন আপন জীবন গতি চালিত করিলে, কোন জাতিই স্থিতিশীল থাকে না। এক পথে না চলিয়া সকলেরই স্বতন্ত্র পথে চলা আবশ্যক, এবং এই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার জন্য সকলেরই স্বাধীনতার প্রয়োজন।" বেশ কথা। মোটের উপরে আমরা উন্নতির উপায় স্বরূপ দুইটী বিষয় পাইলাম, ১। স্বাধীনতা, ২। একতা। এ দুই উপায় কিরূপে অবলম্বন করিতে হইবে? সিদ্ধেশ্বর বাবু বলেন, সকলেই আপন আপন ইচ্ছা মত চলুন, কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারিবে না, বাধা দিলেই স্বাধীনতার হানি হইবে। সকলেরই স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ উন্নত হওয়া ঘটিবে না। আবার ইহাও মনে

রাখিতে হইবে যে, একতাই উন্নতির প্রধান কারণ, সুতরাং একতা ছাড়া হইবে না। "ব্যক্তিগত কার্য্যে সকলেরই যে একমত হইবে, সকলেই এক কার্য্য করিবে, তাহা আমরা বলি না, কিন্তু কোন একটী সাধারণ কার্য্যে যে সাধারণের সাহায্যের ও যোগ দানের আশুকতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা বলা বাহুল্য।" বস্তুত সিদ্ধেশ্বর বাবু স্বাধীনতার স্বতন্ত্রতাও ছাড়িবেন না, একতার মিলনও পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহেন, তিনি সোণার পিত্তলের কলসী নির্ম্মাণ করিবেন, অন্তত স্বাধীনতা শব্দটীর যথেচ্ছা ব্যবহারে আমাদিগকে এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইতেছে।

স্থির ভাবে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, যাহা হয় একটা লিখিয়া ফেলিলেই, এই রূপ প্রমাদ ও অদ্ভুত আত্মবিরোধ ঘটনা হয়। সিদ্ধেশ্বর বাবু স্বাধীনতার গুণ গাইতে যাইয়া একবার বলিতেছেন, সকলেই পৃথক পৃথক পথে ইচ্ছামত চল, নহিলে স্থিতিশীল হইয়া মারা যাইবে, আবার একতার মাহাত্ম্য মনে করিয়া বলিতেছেন, প্রত্যেকে পৃথক পৃথক পথে প্রস্থান করে এ বড় দোষ, ইহাতে একতা হয় না। আমরা কোন্ উপদেশ ধরিয়া চলিব, বুঝিতে পারি নাই।

যাহা হউক, একতা ও স্বাধীনতা, যখন দুইটীই জাতীয় উন্নতির উপায় বলিয়া স্থির হইল, তখন অন্তত যাহাতে এ দুইয়ের সামঞ্জস্য হয়, তাহা করা উচিত। আমরা জানি, সমস্ত সুনীতিই উন্নতির যথার্থ উপায়। সুনীতি ব্যতীত দুর্নীতি দ্বারা কখনই মনুষ্যের উন্নতিশিক্ষা হইতে পারে না। এখন মানব-ব্যবহারের কোন্‌গুলি সুনীতি ও কোনগুলি দুর্নীতি, তাহা অগ্রে স্থির করিয়া তবে উন্নতির উপায় স্বরূপ বিশেষ বিশেষ গুণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেই, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে এবং গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয়। মনুষ্যের একপ্রকার ব্যবহারকে স্বাধীনতা * বলা গিয়া থাকে। সেই ব্যবহার সুনীতি কি না, বুঝিতে হইলে, তাহার মূল ও লক্ষ্য বিবেচনা করা উচিত। সিদ্ধেশ্বর বাবু যে ভাবে স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে স্বেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না। এই জন্যই অবস্থাকে স্বাধীনতা না বলিয়া ব্যবহারকেই স্বাধীনতা বলিতে হইল। বস্তুত মনুষ্যের কোন ব্যবহারকে স্বাধীনতা উপাধি প্রদান করিলে, স্বাধীনতা শব্দটীর অপব্যবহার হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার অর্থে মনুষ্যের সেই অবস্থা প্রতিপন্ন হয়, যাহাতে বহির্জগতের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ ও তজ্জনিত সমস্ত ক্রিয়ার ও অন্তর্জগতের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য সিদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের প্রচারিত নির্ব্বাণমুক্তি ও হিন্দুধর্ম্মের মোক্ষপদ ব্যতীত, এই স্বাধীনতা সম্যক রূপে কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ মনুষ্যের সাধনার বিষয়, স্বভাবতই মনুষ্যের তাহা নাই। স্বভাবত মনুষ্যের যাহা আছে, যাহাকে অনেকেরই স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা মনুষ্যের সে নির্ম্মুক্ত অবস্থা নহে, পরন্তু সেই ব্যবহারের প্রবৃত্তি, যাহাকে স্বেচ্ছাচার বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

* স্বাধীনতা অবস্থার নাম, ক্রিয়ার নাম নহে বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু এখানে মূল প্রবন্ধ লেখকের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট করিবার জন্য অবস্থা-জনিত কার্য্যও ধর্ত্তব্য বোধ হইল।

নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচার অথবা স্বভাবানুবর্ত্তীতা যে গুণ নহে, ইহা ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিলও স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এ সত্য সহজেই সকলের অনুভূত হইতে পারে। সিদ্ধেশ্বর বাবু কি বিবেচনায় যে এরূপ নিরঙ্কুশ স্বভাবানুবর্ত্তীতাকেই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি সাব্যস্ত করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। প্রকৃত স্বাধীনতায় মনুষ্যের যে আত্মিক শক্তি ও তেজ প্রকাশ পায়, সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন স্থলেই তাহার বর্ণনা করেন নাই। এই আত্মিক শক্তি দ্বারাই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে প্রবৃত্তি ও সাহসের দ্বারা চালিত হইয়া নেপোলিয়ান ও আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীর পুরুষগণ, বিস্তৃত ভূখণ্ড ও বহুসংখ্যক স্বজাতীয় প্রাণীর উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাকে আমরা কোন মতেই স্বাধীনতা উপাধি দান করিতে পারি না। স্বাধীনতা দ্বারা অপরের স্বাধীনতা লোপ হওয়া দূরে থাকুক, ইহা কোন প্রকার অধীনতাই গ্রাহ্য করে না। প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তির কোন প্রকার অধীনতাতেই কষ্ট নাই। সক্রেটিসকে বিষপানে নিহত করার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়া থাকিলেও, এবং ঐ আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইতে হইলেও তিনি স্বাধীন। যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশে নিহত হইতে আদিষ্ট হইয়া থাকিলেও, তিনি স্বাধীন! প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারক গ্যালিলিও ও ডনকুইক্সেটের ন্যায় সরস অখ্যায়িকা প্রণেতা সারভেণ্টিস্, কারারুদ্ধ হইয়াও, স্বাধীন। স্বাধীন মনুষ্য, মনুষ্য কৃত অত্যাচার ও অবিচার তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপন আপন মহত্ত্ব ও তেজ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জ্বলন্ত ও প্রদীপ্ত তেজ-বহ্নিতে শুদ্ধ মানব কৃত নহে, জড় জগতের অত্যাচারও তৃণবৎ পুড়িতে থাকে। হোমর ও মিল্টন অন্ধ হইয়াও প্রকৃতির ঘোর তমসাচ্ছন্ন প্রদেশ সকল অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করিয়া, অন্ধতার পরিবর্ত্তে যে ভীক্ষ্ণ দর্শন শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কোন্ চক্ষুষ্মান মানবের তাঁহাদের তুল্য দর্শন শক্তি আছে? অতএব স্বাধীনতা বস্তুটী কি, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। আবার ইহাও ভাবিয়া দেখুন যে, মনুষ্যের অত্যাচার দ্বারাই প্রকৃত অন্তরের তেজ (যাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়), জাগরিত হইয়া থাকে। সেক্সটসের পশুবৎ আচরণেই লুক্রিসিয়ার স্বাধীনতা বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া, তৎকর্ত্তৃক কলুষিত দেহকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। জগতে কত সতী নারীই না এই প্রকারে অত্যাচার-গ্রস্ত হইয়া, অক্লেশে আত্মবিসর্জ্জন ও শরীরপাত করিয়াছেন; কে তাঁহাদের সংখ্যা করিতে পারে? রাজপুতনার রাজলক্ষী স্বরূপা স্বাধ্বী রমণীগণ, কি অমিত তেজে জ্বলন্ত বহ্নিতে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহা কি পাঠকের অবিদিত আছে? যবনের তুচ্ছ অত্যাচার ও পরাক্রম কোথায় রহিল? তাঁহারা মৃতা হইয়াও আজ জীবিতা! তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্তও মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারে। তবে সিদ্ধেশ্বর বাবু কেমন করিয়া বলিলেন যে, 'যাহারা স্বাধীন, তাহারাই অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছে।" এ উক্তি কি সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে?

বস্তুত স্বাধীনতা বস্তুটী কি, ইহা বুঝিবার

পক্ষে কেবল সিদ্ধেশ্বর বাবুর নহে, অনেক লেখকেরই অনেক ভ্রম আছে। অনেক লেখকই অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, পশুবৎ সংস্কার বিশেষকেই স্বাধীনতা ভাবিয়া থাকেন। ফলত নিরঙ্কুশ স্বভাবানুবর্ত্তীতা যদি স্বাধীনতা হয়, তবে প্রার্থনা করি, ইহা অচিরাৎ দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া যাউক। তাহাতে আমরা ভাল বই কোন অংশেই মন্দ হইব না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের যত প্রকার অত্যাচার কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমস্তেরই মুল নিরঙ্কুশ স্বভাবানুবর্ত্তীতা। শানন স্বাধীনতার শত্রু নহে, শাসন স্বাধীনতার সহায়। কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কি জাতীয় স্বাধীনতা, সকল স্বাধীনতাতেই শাসন আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে। যখন পরের দ্রব্যে অযথা লোভ হয়, তখন শাসনই আমাদিগকে সংযত করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্যাদি সকলই স্বভাবের ক্রিয়া—এ সকলই শাসনাধীন থাকা উচিত। জাতীয় স্বাধীনতাতে ঐক্যই আমাদের প্রধান চালক; কিন্তু শাসন ভিন্ন ঐ ঐক্য বা একতা দ্বারা কোন ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। একতা দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের মিলন প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু বৈধ অর্থাৎ কোন নিয়মাধীন লক্ষ্য না থাকিলে উহা স্পষ্টতই সমাজের ও মনুষ্যের অহিত উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জন্যই দণ্ডবিধিতে উহা অপরাধ বলিয়া দণ্ডার্হ হইয়াছে। রুসো ভল্টেয়ার প্রভৃতি দ্বারা ফ্রান্সে সাম্যনীতির প্রচার হইয়া থাকিলেও, যেখানে উহা বৈধ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেখানেই উহা অসংখ্য অনিষ্ট উৎপন্ন করিয়াছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব কেবলই অবৈধ সাম্যনীতির ফল। যিনি এলিসন কৃত তদ্বিষয়ক ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহা বুঝাইবার জন্য অধিক বাক্য ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত সচরাচার মনুষ্যের যে স্বাধীন প্রবৃত্তি ও সাম্যানুরাগ দেখা যায়, তাহা কোন অংশেই সুনীতি নহে। বিধি-বিহীন হইয়া মনুষ্য-জাতি এক দিনও নিরাপদ থাকিতে পারে না। বিধি বলিলেই শাসন বুঝায়। সে শাসন কি? লোক বিশেষের একাধিপত্য বা স্বেচ্ছাচার নহে। সে শাসন প্রকৃত প্রস্তাবেই আত্মশাসন ও জাতি সম্বন্ধে সাধারণ মত ও নীতির শাসন। সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের শাসন। এ সকল শাসন অগ্রাহ্য করিলে, মানুষ আর মানুষ থাকিতে পারে না। বিধিহীন মনুষ্য যথার্থই পশু বিশেষ। শাসন বিহীন মনুষ্যও তাই। অতএব শাসন কি প্রকারে স্বাধীনতার শত্রু হইল, বুঝিতে পারিলাম না।

স্বাধীনতা বলিলেই লোকে যেমন সকলের আগে স্বেচ্ছাচার বুঝে, একতা বলিলেই তেমনি সকলের আগে বিধিহীন একতাই প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীনতাতে যেমন স্বার্থই সর্ব্বস্ব, একতাতে তেমনি স্বার্থনাশই সর্ব্বস্ব। স্বার্থ না ভুলিলে অথবা স্বার্থের মিলন না করিলে, মনুষ্য কখনই অন্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। সম্পূর্ণ মিলন ব্যতীত একতাও উৎপন্ন হয় না। এখন স্বাধীনতার বলে তুমি স্ব স্বভাবানুসারে স্বতন্ত্র পথে চল, একতার বলে, স্বতন্ত্রতার সুখ ও একাধিপত্য ত্যাগ করিয়া আইস, আমরা মিলিয়া যাই। পাঠক, এই বিরোধের উপরেই কি জাতীয় উন্নতির মূল পত্তন করিতে চাও? তাহা কখনই হইবে না। সমাজ গড়িতে হইলে, সকলেরই

কিছু কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, স্বাধীনতার সঙ্কোচ করা আবশ্যক। জাতি গড়িতে হইলে, তদপেক্ষা অধিক, সমস্ত জাতিকে একতায় বাঁধিতে হইলে, আরও অধিক। স্বাধীনতার নাম মুক্তি। একতার নাম বন্ধন। মুক্ত বন্ধনের অর্থ কি? পাঠক, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। পরে স্বীকার করুন, নির্ম্মুক্ত ভাব ও একতা, উভয়ই শিক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে নিয়মাধীন হইতে হয়। সেই জন্যই নীতি ও সেই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই জন্যই দলাদলী, ও সেই জন্যই আইন কানুন। নীতি, নিয়মমালা ব্যতীত আর কিছুই নহে; ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতির জনক জননী। ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভাবে এই ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছেন। মনু, সক্রেটিস, যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি ঈশ্বরের বরপুত্র রূপে এই ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যকে শিখাইয়া গিয়াছেন। আজও শিখাইতেছেন, কালও শিখাইবেন, এ শিক্ষার শেষ নাই। পাঠক এখন জাতীয় উন্নতি কোন্ ভিত্তির উপর স্থাপন করা উচিত, বিবেচনা করুন।

কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিলেও, সিদ্ধেশ্বর বাবু ধর্ম্মের দোহাই দিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগ পাঠ করিলে, তিনি যে নিয়ম ও শাসন-বিরোধী নহেন, তাহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয়। দুঃখের বিষয়, কেবল অগ্রপশ্চাৎ ঠিক রাখিতে পারেন নাই। 'একতা' শীর্ষক প্রবন্ধে, নব্য ভারতের ১মখণ্ড, ১১শ সংখ্যায়, ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মনুষ্যের শিক্ষা জন্য যিনি যতই কেন ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকুন না কেন, কাহারই উদ্ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালী সকলেরই একবাক্যে গ্রহণীয় হয় নাই; জ্ঞান গরিমা ইহাতে বাধা জন্মাইয়াছে। মনুষ্যপ্রকৃতি যেমন সকল স্থানেই, দেশ নির্ব্বিশেষে, একই প্রকার বৃত্তি প্রবৃত্তি ইত্যাদি মানবীয় ধর্ম্ম দ্বারা পরিচিত, প্রকৃতির স্বামীও তেমনি সকল স্থানেই এক অভিন্ন সর্ব্বেশ্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু মানসিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, কি মানব প্রকৃতি ও ঈশ্বরের জ্ঞান, কিছুরই অভিন্নতা স্থির থাকিতে পারে নাই। জগৎ ক্রিয়ার এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহা ন্যূনাধিক রূপে সকলেরই প্রতীতির বিষয়। কিন্তু কর্ত্তা, যথার্থই হস্তপদাদি-বিশিষ্টরূপে, আমাদিগকে দর্শন দেন নাই। সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব লইয়া জ্ঞানীগণের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। আবার অজ্ঞানেরা এতই বিশ্বাসী যে, গাছ পাথর, নদনদী, সচেতন অচেতন, কোন পদার্থেই তাঁহার অস্তিত্বের অভাব বোধ করে নাই। কাহার নিকট মনুষ্যই ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, কাহারও নিকট শিলাখণ্ডই নারায়ণ রূপে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। কিন্তু যাহাই হউক, ঈশ্বর মানিলেই নিয়ম মানা হইল। প্রথম স্বীকারই ঈশ্বর স্বীকার। আর এই স্বীকারের উপরেই আমাদের সমস্ত ক্রিয়া, কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কি জাতীয়, কি সার্ব্বভৌম, সকল প্রকার সম্বন্ধ ও সম্বন্ধপাত ক্রিয়াই এই স্বীকারের উপর সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন বিন্দু ও রেখার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়াই জ্যামিতির সত্য প্রচার, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়াই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র। সুতরাং জ্যামিতির সত্যের ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যও সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউক্লিডের জ্যামিতি শাস্ত্র

প্রচারের ন্যায়, যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা এই ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রচারক। সত্য সকল স্থলেই এক ও অভিন্ন, ঈশ্বরও সকল স্থানেই এক ও অভিন্ন। মহম্মদের ঈশ্বরও ঈশ্বর, যিশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরও সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আবার হিন্দুর কালী দুর্গা, নারায়ণ ইত্যাদি তেত্রিশকোটী নামও সেই ঈশ্বরের নাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ঈশ্বর যদি তাঁহার এই সকল বর পুত্রের দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন, তবে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য নাই কেন, এবং তজ্জাত নীতি সকল স্থানেই এক হয় না কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জ্ঞানের ন্যূনাতিরেকেই এরূপ ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং জ্ঞানের ন্যূনাতিরেক বশত চিরকাল এই ভেদ বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া ঈশ্বর কখনই ভিন্ন হইবেন না, এবং শাস্ত্র মানাও কখনও বিফল হইবে না। এই জন্যই কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না হওয়া অপেক্ষা, ভ্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তী থাকাও কর্ত্তব্য। ভ্রান্তি প্রকাশ হইলেই মানব আর সে নিয়ম মানিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। সুতরাং ভ্রান্তির সংশোধন চিরকালই হইয়া আসিতেছে। আর যাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া আমার বিশ্বাস, তাহার ভ্রান্তি অপনোদন জন্য স্বভাবতঃই আমার চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহাতেই তর্কজাল বিস্তার এবং এই নিমিত্তই জ্ঞানের ক্রমোন্নতি চিরদিনই সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, অথচ কোন কালেই এ উন্নতির শেষ নাই।

কিন্তু একতা সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভিন্নতা সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তবে জ্ঞান চিরদিনই উন্নতিশীল থাকিলে, ধর্ম্ম বিশ্বাস কি প্রকারে এক অবস্থায় থাকিতে পারে? সকলের দ্বারা এক নিয়ম প্রতিপালিত হওয়ারই বা আশা কোথায়? এই জন্যই জ্ঞান যাহাতে উন্নতিশীল না হইয়া স্থিতিশীল হয়, ক্রমাগতই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এই চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র সকল, যুগে যুগে রূপান্তরিত না হইয়া, যাইতে এক ভাবেই থাকে, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতাদিগের সেই চেষ্টা। সে চেষ্টা না থাকিলে, সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু জ্ঞানোন্নতিও অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ অবশ্যই অসাধ্য ব্যাপার।

অতএব, একতাসাধনের অন্তরায় স্বরূপ ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, ভাষাভেদ ইত্যাদি যে সকল ভিন্নতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মভেদ দূর হওয়া যে অসাধ্য ব্যাপার, তাহা প্রতিপন্ন করা গেল। জাতিভেদ ও ভাষাভেদও দূর হওয়া যে সুকঠিন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুত সমস্ত প্রভেদ দূর করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতি যে কোন সময়ে এক হইবে, ইহা এক প্রকার আশাতীত বিষয়। পৃথিবীর সমস্ত জাতির কথা দূরে থাকুক, এক দেশের এক জাতি সম্বন্ধেও সে আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার নহে। কিন্তু অসাধ্য সাধনোদ্দেশেই মনুষ্যের উৎকৃষ্ট শক্তি চিরদিনই পরিচালিত হইতেছে, দেখিয়া, একতাসাধনের এক প্রকার প্রণালী স্থির করা যাইতে পারে। পৃথিবীর অখণ্ড একতা যদি কখনও সুসাধ্য হয়, তবে তাহা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সুসময় উপস্থিত না হওয়া

পর্য্যন্ত আমরা নিয়ম অবহেলা করিতে পারি না। সাধারণের সচ্ছন্দতা ও উন্নতি অব্যাহত রাখিবার জন্য, আমাদের সকলেরই, এক বাক্যে, কোন না কোন নিয়মাধীন থাকা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রত্যেক দেশে যে [illegible] নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া মনুষ্য কর্ত্তৃক আচরিত হইতেছে, তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। ঐ নিয়ম যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, দেশ কাল পাত্রানুসারে, [illegible] তাহা দ্বারাই জগৎকর্ত্তার নৈতিক শাসন [illegible], প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। নৈতিক শাসনের ফল অবশ্যই শুভ। সত্য, জ্ঞান দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু হৃদয় না থাকিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কোন্ ধর্ম্মমত সত্য ও কোন্ মত অসত্য, জ্ঞান চিরদিনই তাহার বিচার করিতে নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু হৃদয়ের ধন ঈশ্বর একদিনও মনুষ্যকে ছাড়িয়া দূরে যান নাই। তিনি কি জ্ঞানবান্ ও কি অজ্ঞান, সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এ বিশ্বাস যাহার নাই, তাহার হৃদয় থাকাই বিফল। অসভ্য হিন্দু সন্তান, প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানে, মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করিতেছে। সুসভ্য খ্রীষ্টান, শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানকে তাহা দেখাইয়া, খল খল হাসিতেছেন। কাহাকে অধিক ভ্রান্ত বলিব? এ সকলই মনুষ্যের অদৃষ্টের দোষ! নতুবা ঈশ্বরভক্তিতেই যে ঈশ্বর মিলে, এ সত্যকথা, এ সরলভাব ভুলিয়া গিয়া, মদগর্ব্বিত মানব কেমনে ভক্তিকে উপহাস করিয়া সুখ পায়? বস্তুত আমি যে টুকু বুঝি, তাহাতে ভগবান ভক্তাধীন, সে ভক্ত মুসলমানই হউক, হিন্দুই হউক, আর খ্রীষ্টানই হউক। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধর্ম্ম মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? ভক্ত হইলেই হইল। ভক্ত ব্যক্তি আশু সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম। ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে, ভক্তি পাইবার জন্য, অনেক ঘুরিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, একে-[illegible]বাদই হউক, আর পৌত্তলিকতাই হউক, মাত্র [illegible]বাদই হউক, ঈশ্বর সর্ব্বমতেই ভক্তা-আপনা[illegible] এই জন্য, ভক্ত আর্য্যসন্তান নিয়ম প[illegible]তেও কৃতার্থ হইতে পারি-দেশের উ[illegible]রি সে দিনও পৌত্তলিক আরা-স্খলিত [illegible]ধনাতে রামপ্রসাদ মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন?

তাই বলিতেছি, ধর্ম্মভেদ অনিবার্য্য ভাবিয়া, যাঁহারা একতায় অনাশ্বস্ত হন, তাঁহাদের ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পৃথিবীতে বাস্তবিক ধর্ম্মভেদ অতি অল্প। প্রকৃত ধর্ম্মই ঈশ্বরভক্তি, ও ঈশ্বরভক্তি হেতু মানবপ্রেম ও সমস্ত সুনীতির প্রতি আনুরক্তি। যাহার এ গুলি আছে, সে যে কোন প্রকারেই ঈশ্বরের পূজা করুক না কেন, সে খ্রীষ্টান হউক, বা বৌদ্ধ হউক, মুসলমান হউক, অথবা হিন্দু হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তবে একতা সাধন জন্য ভাবনা কি? বস্তুত যে একতা মনুষ্য মাত্রেরই হিতজনক, ও সচ্ছন্দতা বিধায়ক, তাহা কেবল ধর্ম্ম থাকিলেই অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। পৃথিবীতে অখণ্ড একতার সিদ্ধির উপায়ও এই। ধর্ম্মের এই মৌলিক সমতল ক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকিতেও, মনুষ্যকে কেবল স্বভাব বানুবর্ত্তিতার নিমিত্ত (অর্থাৎ, বিশেষরূপে বলিতে হইলে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদির জন্য) পরস্পর উচ্চ ও নীচা-

সনে উপবেশন করিতে হয়। মানুষ সকলেই সমান, কিন্তু সকলেই কি সমান মানুষ? সকল মনুষ্যেরই অধিকার পরস্পর সমান, কিন্তু সকল মনুষ্যেরই কি সমান অধিকার বর্ত্তমান আছে? কেন নাই? কেন মানুষ সকলেই সমান না, উত্তর কি দিব, ঈশ্বরেচ্ছা। আমরা সেই ভুক্তভোগী, আমরা সকলেই ইহা পারে আমি আজি দরিদ্রের সন্তান পুত্রের আমার উপচিকীর্ষা বৃত্তির স্ফূরণ হবে ঐ পারিতেছি না; স্বভাবত বুদ্ধিহীন এলয়া, বুদ্ধির খেলায় চমক লাগাইতে না পারিয়া আমি মানব-সমাজে গণনার মধ্যেই নহি; আর এক ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত। এ অনৈক্য কি পৃথিবী হইতে কোন কালে তিরোহিত হইয়া, সকল মানুষ সমান হইবে না? ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুতেই নির্ভর করিতে পারি না। ঈশ্বরেচ্ছা একটী অদৃষ্ট বস্তু। কিন্তু এই অদৃষ্ট বস্তুই আমাদের অদৃষ্টের পরিচালক। এই অদৃষ্ট বস্তু হইতেই, অতি অভাবনীয় রূপে, এক দল রাখালের মধ্যে যিশুখীষ্ট, আর ঘোর পৌত্তলিকতার মধ্যে বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্য। যে জাতি হইতে খ্রীষ্টের উৎপত্তি, সে জাতিতে তাঁহার নীতি নাই, যে জাতি হইতে বুদ্ধ চৈতন্যের উৎপত্তি, সে জাতিতেও তাঁহাদের নীতি নাই। কিন্তু সেই আদিম কালের জড়োপাসনা ও পৌত্তলিকতা আজিও অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের কি ইচ্ছা প্রতিপন্ন হয়? বিজ্ঞান-প্রিয় মানব হইার কি কারণ স্থির করিবেন? আমরা বলি, আমরা কেবল আকার বুঝিতে যাইয়াই, সর্ব্বমূলাধারকে কখনও সাকার, কখনও নিরাকার করিয়া এই গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছি। নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে, যে যাহাতে ভক্তিমান ও একপ্রাণ হয়, তাহাতেই তাহার মুক্তি। তজ্জন্য তাহাকে সাকার নিরাকারের কোন গোলযোগে পড়িতে হয় না।

ধর্ম্ম যদি এই ভাবে সরল হয়, (প্রকৃত ধর্ম্ম চিরদিনই এইরূপ সরল ও সুখবোধ্য) তাহা হইলে, সাধনার উপায় যতই বিভিন্ন হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

তবে সিদ্ধেশ্বর বাবু যে বলিতেছেন, "ভারতীয় ধর্ম্ম বা আদি ধর্ম্ম নামে এই সকল পুরাতন ধর্ম্মের নূতন নামকরণ করিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না?" তাহার প্রয়োজন কি? হিন্দু ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম কেন বলে, তাহাই কি বুঝিয়া দেখিলে হইতে পারে না? যে মত, সাধারণ মত বলিয়া স্মৃতি-পথাতীত সময় হইতে এই ভারতবর্ষের সর্ব্ব সাধারণের গ্রহণীয় হইয়া আসিতেছে, তাহার সংস্করণ করা হইতেছে এই কথা রাষ্ট্র না করিয়া, একটী নূতন নাম প্রদান করিয়া লোকের লক্ষ্যভ্রষ্ট করায় কি ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে? আমি বলি, কোন ইষ্টই নহে। বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, কোন ইষ্টই নহে। ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম নামের অতিরিক্ত যাহা কিছু প্রদান করিবে, তাহাতেই তাহার সরলতা ও সুখবোধ্যভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হইবে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন যে, সকল ধর্ম্মেরই এক নীতি ও এক উপদেশ। ঈশ্বর যখন দেশ বা জাতিভেদে ভিন্ন নহেন, তখন ধর্ম্মও কুত্রাপি ভিন্ন নহে। কেবল আমাদের বাখ্যানুষ্ঠানের দোষেই সকল দেশেই, ধর্ম্মনামে কলঙ্কপাত হইয়া আসিতেছে; কোন স্থানেই সনাতন ধর্ম্ম স্থির থাকিতে পারিতেছে না; কেবল সেই ভক্তের হৃদয়ে। ভক্তের হৃদয়াকাশে ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতি চিরদিনই সমান সমুজ্জ্বল। কোন অনুষ্ঠানই তাহা অপবিত্র করিতে পারে না।

আমরা আর কিছু বলিতে চাহি না, পৃথিবীতে যাহা পূর্ব্বে জাগুক, নিয়ম সকল আপনিই বিধিবদ্ধ ও প্রতিপালিত হইতে থাকিবে, কেহই বাধা দিয়া তাহার কিছু করিতে পারিবে না। জাতিভেদে তাহার কিছুই হইবে না। ভাষাভেদেও কোন ক্ষতি নাই। ভারতে হিন্দু ধর্ম্ম জাগুক, জ্ঞানবান ও হৃদয়বান ব্যক্তি, ধর্ম্ম কি পদার্থ, আপনিই বুঝিয়া লইতে পারিবে। যে সমাজ, ধর্ম্ম নিয়মে গঠিত হয় নাই, সে সমাজ সমাজই নহে, সে কেবল অবৈধ জনতা মাত্র। যে উন্নতি, ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপিত না হইয়াছে, সে উন্নতি, উন্নতি নহে, সে কেবল বিকৃতি মাত্র। তাই বলি, দেশ হিতৈষী মহোদয়গণ! আপনারা সর্ব্বাগ্রে দেশকে ধর্ম্ম ভাবের দ্বারা নিয়ম পালনে অবহিত করুন, দেখিবেন, দেশের উন্নতির কণ্টক আপনিই অতি সহজে স্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। দেখিবেন, ভারতভূমি আবার অল্পকাল মধ্যেই পুণ্যভূমি ও স্বর্গাদপি গরীয়সী স্থান হইয়া উঠিবে।

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সারস্বত-উৎসব।

সঙ্গীত।*

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

আজি কিবা শুভ দিন! হেরিলাম পুণ্যফলে,
মিলিয়াছ ভাই ভাই আবার অমর দলে!
বল দুঃখ পরস্পরে, যা আছে আপন ঘরে,
কর হাস্য বিনিময় পরস্পর অশ্রুজলে!
দ্বেষ হিংসা সবে ভুলি, দেখাও হৃদয় খুলি
লুকায়ে রেখেছ হায়, কি বিষ কণ্ঠের তলে!
ভাবহ উপায় তার, যাতনা সহেনা আর,
রাখহে দেবের মান দানবের পশুবলে!
বল ভাই বল শুনি, কে আছ দধিচীমুনি,
দিতে পার বক্ষ-অস্থি উপাড়িয়া সভাস্থলে!

সরস্বতী।

মা! কেন অভিমান?
শতদোষে হই যদি, ও চরণে অপরাধী,
ভারতি, ভারত তোর তথাপি সন্তান!

কে কোথা কোলের ছেলে, তোর মত ঠেলে ফেলে,
কে কোথা দেখেছে হেন জননী পাষাণ?
এমন রাক্ষসী মা, কোথা কারো দেখি না,
দয়া নাই মায়া নাই, তোর মত প্রাণ!
আহা হা কোলের ছেলে, কে অমন ঠেলে ফেলে,
দেখিনি পাষাণি, কারো এত অভিমান,
দেখিনি কঠিন এত মায়ের পরাণ!

১

মা!
এত কষ্ট—এত ক্লেশ—এত দুর্দ্দশায়
মরে যে সন্তান গুলি, চাস্‌না নয়ন তুলি,
এতই গভীর ক্রোধ—ঘৃণায় লজ্জায়?
এত কি কঠিন প্রাণ, এতই কি অভিমান,
ভুলিলি জননী ধর্ম্ম এতই হেলায়?
পড়িয়া চরণ তলে, ভাসে দেখ অশ্রুজলে,
মুমূর্ষু সন্তান গুলি, মর্ম্ম বেদনায়!

* ময়মনসিংহ সারস্বত উৎসবে এই সঙ্গীত ও কবিতাটী গীত ও পঠিত হইয়াছিল।

ও পাষাণি রাক্ষসিরে, দেখ্ একবার ফিরে,
কি যে দুঃখ কি যে কষ্ট, কি যে দুর্দ্দশায়,
তোর মত মা থাকিতে, প্রবোধ মানেনা চিতে,
নরকে পচিয়া মরি হায় হায় হায়!
দেখ রে মা চক্ষু খেয়ে, ও পোড়া পাষাণী মেয়ে,
অসহ্য হয়েছে আজ যায় যে রে প্রাণ,
শতদোষে হই যদি, ও চরণে অপরাধী,
তথাপি—তথাপি তোর কোলের সন্তান!
দেবতো দূরের কথা, জানি না দানব মাতা,
ভোলে যে জননী ধর্ম্ম নির্ম্মম পাষাণ!
দয়ার অমৃত ভরা, বিপ্লবিয়া বসুন্ধরা,
জননী জাহ্নবী করে জীবন প্রদান,
নতুবা হইত বিশ্ব বিকট শ্মশান!
মা!
তুই কি সেই মা—সেই স্নেহ-স্বরূপিনী,
মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তি অমর জননী?
করুণা মমতা স্নেহ, ছোঁয় নাকি দেবদেহ,
দেবের হৃদয়ে রক্ত বহে না ধমনী?
নির্ম্মম নির্দ্দয় নেত্র, ধূ ধূ করে মরুক্ষেত্র,
বহে না কি অশ্রু রূপে সুরতরঙ্গিনী!
শ্মশানের ভস্ম ছাই, বাঁচেনাকি কোন ঠাঁই,
পরশি অমৃত গঙ্গা শক্তি সঞ্জীবনী?
তুইকি সেই মা—সেই স্নেহ-স্বরূপিনী?
মা!
তুই কি সেই মা? তবে মরি যে সন্তান?
চক্ষের উপরে তোর, ভুগি এ নরক ঘোর,
দেখিয়া দেখিস্ না যে, কাঁদে নাকি প্রাণ?
উদরে নাহিক অন্ন, ক্ষীণ দেহ অবসন্ন,
দুরন্ত দানবে করে নিত্য অপমান!
কাঁদিব কাহার কাছে, কোথায় বিচার আছে?
ধর্ম্মালয়ে নাহি ধর্ম্ম—অধর্ম্মের স্থান!
রাক্ষসের অত্যাচারে, যায় রাজ্য ছারখারে,
কাঁদে রাজা কাঁদে প্রজা বণিক্ কৃষাণ!
কেহ নহে সুস্থ চিত্ত, সকলে সশঙ্ক নিত্য
একাকী চলিতে পথে সতী ম্রিয়মান!
কত পদাঘাত সহি, মরমে মরিয়া রহি,
ফুটিয়া বলিতে পারি যদি যায় প্রাণ,
তুই কি সেই মা?—তবে মরি যে সন্তান?
মা!
এ লাঞ্ছনা—এ গঞ্জনা তোরি অকৃপায়,
নিত্য এ নরক ভোগ, প্রাণে যা মহারোগ,
মণ্ডূক লুঠিছে মণি ভুজঙ্গ মাথায়!
পতঙ্গে মাতঙ্গ মারে, এ দুঃখ কহিব কারে,
শৃগাল শৃঙ্খল দিছে সিংহের গলায়।
এ হইতে আছে কি মা, দুর্দ্দশা দুঃখের সীমা,
দেবতা করুণা মাগে দানবের পায়?
মা!
আমরা ত সেই পূজ্য আর্য্যের সন্তান,
আমাদেরি পিতামহ, যুঝিয়া শত্রুর সহ,
করেছিল শরশয্যা শর উপাধান,
আমাদেরি পিতামহ শান্তনু সন্তান!
আমাদেরি পার্থবীর, ভেদি বক্ষ মেদিনীর
তৃষাতুরে গঙ্গাজল করেছিল দান,
আমাদেরি আর্য্যবংশ ক্ষত্রিয় সন্তান!
ভীমসেন ভীমবাহু, প্রচণ্ড জ্বলন্ত রাহু
শত্রুর শোনিত উষ্ণ করেছিল পান,
শোধিতে জায়ার সেই উগ্র অপমান।
আমাদেরি রঘুপতি, উদ্ধারিলা সীতা সতী,
অপার সাগরে সেতু করিয়া নির্ম্মাণ,
সবংশে বধিলা দুষ্ট রাক্ষস প্রধান!
মা!
আমরা ত সেই পূজ্য আর্য্যবংশধর?
তবে যে ভীষ্মের মত, সাহস নাহিক তত,
পারি না ঢালিতে অঙ্গ শরশয্যাপর?
রাক্ষসের বক্ষ ভেদি, বহায়ে শোণিত নদী,
পারি না তুষিতে ঋভু পিপাসা কাতর?
তবে যে শকতি নাই, বুক চিরে রক্ত খাই?
হরে দ্রৌপদীর বস্ত্র চক্ষের উপর!

কনক কুরঙ্গ ছলে, রাক্ষসী মায়ার বলে,
সামান্য শিশুর মত ভুলায়ে পামর,
জানিতপস্বীর বেশে, প্রবেশি ত্রিদিবদেশে,
হরে কত গৃহলক্ষ্মী—দুষ্ট নিশাচর,
তবে যে পারি না মাত বাঁধিতে সাগর?
ঘুচায়ে ত্রিলোক শঙ্কা, পারি না নাশিতে লঙ্কা,
আমরা ত সেই পূজ্য আর্য্যবংশধর,
তবে যে দেবতা আজ দৈত্যের নফর?
মা!
এ লাঞ্ছনা এ গঞ্জনা তোরি অকৃপায়,
নহে সে এমন বীর, বীরগর্ব্ব পৃথিবীর
লঙ্ঘিত হিমাদ্রি শির গৌরব প্রভায়?
প্রমত্ত মাতঙ্গ বলে, এত স্ফীত বক্ষস্থলে,
তিষ্ঠিত গোমুখীতলে এত গরিমায়?
কার এত ভূজেশক্তি, বীরধর্ম্মে আনুরক্তি,
নুইয়ে পড়েছে বিন্ধ্য ভয়ে যার পায়?
কোথা সে রজত দ্বীপ, কোথা কন্যা অন্তরীপ,
কোথা সেই উত্তমাশা, রাক্ষসী ভাষায়
কি সাধ্য বলিতে পারে, আছে পঞ্চনদ পারে,
মহামণি কহিনুর—প্রদীপ্ত প্রভায়,
"পাদুকা আঘাত পঞ্চ" পণে পাওয়া যায়?
মা!
কেন সন্তানের প্রতি এত অভিমান?
পাইলে সহস্র দোষ, জননী করে না রোষ,
করুণার কল্পলতা মায়ের পরাণ!
স্নেহ মমতার সীমা, দেবতার আছে কি মা,
আছে করুণার ক্লান্তি প্রেম পরিমাণ?
মরুর বালুকা মাখি, ধূ ধূ করে চিত্ত নাকি,
ক্রোধের কালাগ্নি শিখা জ্বালায় সন্তান?
দেব জননীর নাকি এত অভিমান?
মা!
ক্ষমা কর্ সন্তানেরে সহেনা যে আর,
করুণা নয়নে ফিরে দেখ একবার!
দেখ একবার ফিরে, ও পাষাণি রাক্ষসিরে,
সহে দেব দানবের কত অত্যাচার,
করুণা নয়নে ফিরে দেখ্ একবার!
একবার পাষাণিরে, ডাক্ পুত্র বলি,

১১

একবার ও কঠিনা, বাজা সঞ্জীবনী বীণা,
এখনি বাঁচিবে তোর সন্তান সকলি!
যতদূর যাবে গান, বাঁচিবে শবের প্রাণ,
হইবে অমৃতসিক্ত রক্ত-রণস্থলী,
সসৈন্যে রাঘববীর, আন্দোলিয়া সিন্ধুতীর,
বক্ষে নিবে শক্তিশেল রক্ষ পদে দলি!
ভীমার্জ্জুন কর্ণ ভীষ্ম, কাঁপায়ে বিপুল বিশ্ব,
জ্বলন্ত সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
সে ভীম ভৈরব রাগে, এ গভীর নিশাভাগে,
জাগিবে সে বীরবর্গ নব বলে বলী,
এখনি বাঁচিবে তোর সন্তান সকলি!
মা!
এখনি হবে সে দূর দৈত্য অত্যাচার,
দেবতার সুখ-সূর্য্য হাসিবে আবার!
খেয়েছে কলিজা খুলি, যে প্রেত পিশাচগুলি,
এখনি পালাবে প্রাণ নিয়ে যে যাহার!
দেবতার মহোৎসবে, বিজয় দুন্দুভি রবে,
উছলিবে, উচ্ছ্বসিবে ভৈরবে সংসার!
ধনরত্নে হবে ভরা, ভারতের বসুন্ধরা
মুকুটে সে কহিনুর হাসিবে আবার!
সুখ শান্তি স্বাধীনতা, পুণ্য পারিজাত লতা,
আবার করিবে সেবা সুরঅঙ্গনার,
মাতায়ে বীরের প্রাণ, দেবকবি গাবে গান,
অতুল অনন্ত বিশ্বে কীর্ত্তি দেবতার,
গাইবে ভৈবব রাগে "ত্রিদিব উদ্ধার!"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দা
হও,
কারে
করিয়া,

TORN PAGE(S).

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার।

আমরা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন কি না, সে স্বতন্ত্র কথা, তবে আমরা অনিয়ন্ত্রিত হইয়া যখন কোন কার্য্য করি, তখন "আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছি" এইরূপ একটী সংস্কার বা বিশ্বাস থাকে। এ বিশ্বাসটী মানবের বড় আদরের জিনিষ, এমন কি, সংসারে এমন আর কোন জিনিষই নাই, যাহা আমাদের নিকট এতাদৃশ প্রিয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এই সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ আমরা সুখী, ততক্ষণ আমাদের মানব জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমাদের এই সংস্কার বা স্বাধীনতার গায় হাত পড়ে, যে মুহূর্ত্তে আমাদের গতি প্রতিহত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সমস্ত সুখ তিরোহিত হয়, আমরা রাজভোগের মধ্যে থাকিয়াও, রাজ্যেশ্বর হইয়াও, পথের কাঙ্গাল হই। মানব হৃদয়ের এই পরম প্রিয়বস্তু, সুখের এই অদ্বিতীয় অবলম্বন—স্বাধীনতা। ইহা সদ্যজাত, অপোগণ্ড শিশু হইতে জরাজীর্ণ স্থবিরের হৃদয়ে একাধিপত্য করিতেছে; ইহার শাসনে জগত শাসিত হইতেছে। শুদ্ধ যে মানাব হৃদয়েই স্বাধীনতার এই মোহিনী শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা নহে, সমস্ত পশু পক্ষীর অন্তরেও এ শক্তি অত্যন্ত প্রবলা। একটী ক্ষুদ্র পক্ষীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ কর দেখিবে, তাহার প্রাণ কিরূপ ছটফট করিতেছে! ইহা কবির কল্পনা নহে, জীবন্ত সত্য।

রাজ্য এইত গেল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ফাঁদে সঙ্গে আর একটী কথা সচরাচর কেহ না হইয়া থাকে; সেটী স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতার মধ্যে নিন্দার কিছুই নাই, কিন্তু স্বেচ্ছাচার কথাটী নিন্দা-পূর্ণ। একজন স্বাধীনচেতা লোক সর্ব্বদাই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারীর প্রতি ঘৃণা ভিন্ন অন্য কোন ভাব আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হয় না। মূলত স্বেচ্ছাচার কথাটীতে দোষের কিছুই ছিল না, এটী স্বাধীনতার একটী প্রতিশব্দ মাত্র, তবে ব্যবহার দোষে একথাটীতে দোষ সংক্রামিত হইয়াছে। স্বাধীনতাই অবস্থাভেদে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। এখন আমাদের স্থির করা কর্ত্তব্য, কোন্ অবস্থায় মানব হৃদয়ের এই স্বাধীনতা-রত্ন স্বেচ্ছাচার রূপ বিষে পরিণত হয়।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, একজন অপর হইতে স্বতন্ত্র মতাবলম্বন করিলেন, অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, অমনই তিনি, স্বেচ্ছাচারী, সুমধুর নামে অভিহিত হইলেন। যদি কেহ গুরুজন বা সমাজের অধিকাংশ লোকের মত উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই, তাহার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী, দুরাচার, পাষণ্ড জগতে অতুলনীয়। এমন কি, যদি তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তাহার নিস্তার নাই। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন যুবক শিক্ষার বিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া দেশের চিরপ্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতির প্রতি অনাস্থাপূর্ণ হইলেন, বিশুদ্ধতর ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইলেন, কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, পিতা দেখিলেন, মহাবিপদ—পুত্র বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। পিতা অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, শেষে বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু সব গোপনে গোপনে, যেন সমাজে কেহ টের না পায়। পুত্র এ কপটাচরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং তাহাকে পিতার অমতে কার্য্য করিতে হইল। ইহাতে প্রমাণ হইল, তিনি ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী, অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড। কোন পিতা অর্থের লোভেই হউক, বা পদমর্য্যাদার লোভেই হউক (এরূপ ঘটনা বিরল নহে) কোন অযোগ্য পাত্রীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ স্থির করিলেন। পুত্র নিজের ভাবী জীবনের সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদের দিকে নয়নক্ষেপ করিয়া, নিজের সুখ দুঃখের দিকে একবার চাহিয়া, পিতার প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতেও মত দিলেন না। পিতা ভাবিলেন, তাঁহার পুত্র ভয়ানক স্বার্থপর, ভয়ানক স্বেচ্ছাচরী। যদি কন্যা সন্তান হইয়া কেহ এরূপ মত-স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে এবং তাহা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই, সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাহা হইলে তাহার ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়, দুর্নীতির একশেষ হয়। যদি কোন ধর্ম্মানুরক্ত, সদাচারী, পরদুঃখকাতর যুবা, স্বীয় বাল-বিধবা ভগিনীর তাপদগ্ধ জীবনে সুখশান্তি আনয়ন করিতে গিয়া, তাহাকে পাপের মৃত্যুময় পথ হইতে উদ্ধার করিয়া, স্বর্গরাজ্যের পথিক করিতে গিয়া, বৃদ্ধ পিতার কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে দুঃখভার আনয়ন করেন, তবে সমাজ তাঁহার নামে কলঙ্কের অগ্নিময় রেখা অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না,—তিনি কুলাঙ্গাররূপে পরিগণিত হইবেন। এরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে।

পাঠক, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, কোন্ পক্ষ স্বেচ্ছাচারী—অভিযোক্তা না অভিযুক্ত? বোধ হয়, পাঠককে আমার মত আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, অভিযোক্তাই প্রকৃতরূপে স্বেচ্ছাচারী পদ-বাচ্য। এখন দেখা যাউক, স্বেচ্ছাচারের প্রকৃত লক্ষণ কি? কোন্ অবস্থায় স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়।

মানব সমাজে মানবের ইচ্ছা অপ্রতিহত নহে, একের ইচ্ছা অন্যের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, সুতরাং একের স্বাধীনতাও অন্যের স্বধীনতা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। যখন মানুষ অন্যের ইচ্ছার প্রতি পক্ষপাত-শূন্য দৃষ্টি রাখিয়া, স্বীয় অভীষ্টের অনুসরণ করে, তখন সংসারে কোনও গোল হইবার সম্ভাবসা থাকেনা। এই বিষয়টী একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, স্বাধীনতার একটী সুস্পষ্ট সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই পদে পদে মনুষ্যের অমঙ্গল। এটী এই, অপরাপর সকলের তুল্য রূপ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজ অভীষ্টের অনুসরণ করাই স্বাধীনতা; যখন অপরাপরের এই তুল্য স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয়, তখনই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। এ স্বেচ্ছাচার অনন্ত অমঙ্গলের, অনন্ত অসুখের প্রসূতি, সুতরাং সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

কারে
করিয়া,

আমি সংক্ষেপ স্বাধীনতাও সেচ্ছাচারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলাম। এখন সমাজে ইহার কিরূপ ফলাফল হয়, তৎ সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতেছি।

কোন সমাজেই অদ্যাপি এ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, সর্ব্বত্র দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সমস্ত জাতি সভ্যতার উচ্চতম স্থানে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই স্বাধীনতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্থাপিত হইতেছে—বহুর প্রতি অল্পের অত্যাচার নিরাকৃত হইয়া, অল্পের প্রতি বহুর অত্যাচার তৎস্থান অধিকার করিতেছে। এই রূপে সাম্যের রাজ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অন্যান্য সমাজে সাম্য আজিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সমাজের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্য কোনও সমাজ আছে কিনা, সন্দেহ। আমাদের দেশে বহুর প্রতি অল্পের অত্যাচার, ভীষণ প্রতাপে আধিপত্য করিতেছে। মুষ্টিমেয় বৈদেশিক বিংশতি কোটী ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করিতেছে, মুষ্টিমেয় জমীদার অসংখ্য প্রজার অস্থিমজ্জা চর্ব্বণ করিতেছে; অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ বহুসংখ্যক অপরাপর জাতির উপর একাধিপত্য করিতেছে;—অত্যাচারিত, ক্রীত দাসের ন্যায়, অত্যাচারীর পদ লেহন করিতেছে। অতি পুরাকালে, গৃহস্বামী পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের জীবন-মৃত্যুর এক মাত্র ধর্ম্মধাতা ছিলেন। আজ কাল যদিও ব্রাহ্মণ সেরূপ ক্ষমতা নাই, তথাপি যে ফাঁদে টুকু আছে, তদ্দ্বারা যে কত শত কেহ নোর হইতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিবে? গৃহস্বামী ইচ্ছা করিলেই আর কাহারও জীবন নষ্ট করিতে পারেন না বটে; কিন্তু পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। পাঠক, একবার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া সমাজের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলেই ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকের অবস্থা যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয়, তাহা বর্ণনাতীত। মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীজাতি পুরুষের দাসী,—ভাল পক্ষে, ভোগ বিলাসের উপকরণ ভিন্ন আর বিছুই নহে। তাহার কোনও বিষয়েই অধিকার নাই, এমন কি, নিজের শরীর মনের উপর পর্য্যন্ত নহে। স্বামী, স্ত্রী দ্বারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। মানব হৃদয়, স্বভাবত, কৃতজ্ঞ ও দয়-প্রবণ, তাই সাধারণত স্ত্রী জাতির জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি, অনেকের জীবন কথঞ্চিৎ সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হইয়া যায়, কিন্তু যদি স্বামী নিষ্ঠুর ও দুরাচারী হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর আর দুর্গতির শেষ থাকে না। বাহুল্য ভয়ে, আমি একটী মাত্র উদাহরণ দিয়াই স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশার বিষয় শেষ করিব। পাঠক, তদ্দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন, স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ভয়ানক শোচনীয়। সন্তানের প্রতি মাতার অধিকার কতটুকু, পাঠক, জানেন কি? অশেষ কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে সন্তানের দেহ তিনি দিবারাত্রি পোষণ করিতেছেন, সে সন্তানের উপর মাতার অধিকার কতটুকু? পাঠক! বিশ্বাস করিবেন কি?—সন্তানের লালন পালন পর্য্যন্ত, তাহাই বা কত দিনের

জন্য?—যতদিন পর্য্যন্ত সন্তানের জীবন মাতৃ স্তনের উপর নির্ভর করে। তাহার পর ইচ্ছা করিলেই পিতা, মাতার গণ্ডদেশে চপটাঘাত করিয়া, তাঁহার সেই হৃদয়ের রত্ন, জীবনের এক মাত্র অবলম্বন সন্তানকে কাড়িয়া লইতে পারেন। যদি মাতা সন্তানকে না দেন, তবে সেই দুরাচারী পিতা, যিনি এক দিনের জন্যও সন্তানের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন নাই, সেই পিতা আইনের সাহায্যে সন্তানকে অধিকার করিতে পারিবেন, ইচ্ছা করিলে সন্তান চুরির দাবিতে মাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন!! ইহা কল্পনা নহে, ইহা আইন! ইহা ন্যায়!! যে সমাজে এরূপ ভীষণ নৃশংস অত্যাচার আইন-সঙ্গত, যেখানে ইহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয়, সে সমাজ ঘোর অত্যাচারে পীড়িত,—ঘোর অধর্ম্মে অধঃপতিত নয় ত কি? যদি কেহ এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করেন, ইহার প্রতিবাদ করেন, তবে যে এক দল ভণ্ড দেশহিতৈষী আজ কাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা "হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজ" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাদের নখর দ্বারা সেই স্বেচ্ছাচারীর রক্তপাত করিতে চেষ্টা করেন।

এই সারমেয় প্রকৃতি-সম্পন্ন দলের বিষদণ্ডোৎপাটনের জন্য আমি অদ্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। আমি জানি, সংসারে চিরকালই এরূপ লোক থাকিবে, তাহারা কাহারও বিশেষ কোনও অপকার করিতে পারেনা, কিন্তু তাহাদের নৈশ চিৎকারে অপরাপরের সুষুপ্তির ব্যাঘাত হয়, এই মাত্র। সমাজের আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা রক্ষণশীল নামে পরিচিত। ইঁহারা অনেকেই নিঃস্বার্থ ভাবে দশের কল্যাণের জন্য চিন্তিত, ইহাদের দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সংশাধিত হইতেছে। ইহাঁরা মনে করেন যে, সাম্যনীতি সর্ব্বত্র সমভাবে বিধিবদ্ধ হইলে, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অধঃপাতে যাইবে। ইহাঁরা মনে করেন যে, অত্যাচার দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায়, মানবের ক্ষুদ্র শক্তি জোর করিয়া, প্রকৃতির অপ্রতিহত গতিকে নিয়মিত করিতে পারে, জোর করিয়া মানব হৃদয়ের কোমল ভাবগুলিকে বিকশিত করা যাইতে পারে। যাহারা কার্য্যত এই সমস্ত মত পোষণ করেন, তাঁহারা হয়ত এরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় দেখিলেই, ইহার সত্যতা অস্বীকার করিবেন। পাঠক, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন, কার্য্যত তাঁহারা এরূপ মত পোষণ করেন কি না। তাহা যদি না হইবে, তবে আমাদের সমাজে আজ্ঞানুবর্ত্তিতার এত আদর কেন? বহুর ইচ্ছা একের ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় কেন? ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া হয় কেন? গুরুজনের অন্যায় আদেশও উল্লঙ্ঘন করিলে এত নিন্দা হয় কেন? বাল্য-বিবাহ কেন? বিবাহে বর কন্যার মত লওয়া হয় না কেন? পিতা পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে এত অত্যাচার কেন? ফল কথা, স্বেচ্ছাচারী কথাটা এত সস্তা কেন?

প্রকৃতি, সর্ব্বদা নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। মানব! তুমি তোমার ক্ষুদ্র শক্তির প্রভাবে অন্ধ হইয়া প্রকৃতির অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে দণ্ডায়মান হও, প্রকৃতি, তোমাকে ব্যঙ্গ করিয়া ফুৎকারে ধূলিকণার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া,

TORN PAGE(S).

নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে। তুমি প্রকৃতির একটী নীতি, একটী বিধি উল্লঙ্ঘন কর, তাহার প্রতিফল হাতে হাতে পাইবে। প্রকৃতির নিকট পাপের ক্ষমা নাই, ত্রুটির প্রতিকার নাই। প্রকৃতিতে যে কেবল জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মের কঠিন শাসন বিরাজমান, তাহা নহে, প্রকৃতির মধ্যে নীতির চরমোৎকর্ষও বিদ্যমান। তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম কর, প্রকৃতি সহস্র মুখে তোমাকে তিরস্কার করিয়া, রোষ-কষায়িত লোচনে তোমার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তোমার শান্তি অপহরণ করিবে। দেখিবে, তুমি কি পর্য্যন্ত অপদস্থ হইয়াছ। তুমি একটী নিতান্ত শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর, দেখিবে সে তোমার প্রতি হাসিমাখা মুখে না চাহিয়া, তোমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া, তোমার অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি বিধান করিয়াছে। জীবের প্রাণে, এই স্বাধীন ভাব প্রকৃতি-প্রদত্ত স্নেহোপহার। যে কেহ জীবের এই প্রিয় বস্তু স্বাধীনতা ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করে, সেই প্রকৃতির বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া যায়। ফলও হাতে হাতে। পিতা সন্তানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু পিতৃভক্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, প্রজা রাজভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণা প্রদর্শন করিল। বন্ধু বন্ধুর স্বাধীনতার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন না, লাভ হইল, অমূল্য রত্ন বন্ধুর প্রাণের গভীর প্রেমরাশি চিরদিনের জন্য হারাইলেন। ইহা কি সামান্য শাস্তি? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, মানবের সমস্ত সুখ দুঃখের অন্তরালে এই স্বাধীনতা— এই স্বাধীনতা এক অতি সূক্ষ্ম সূত্ররূপে মানবের সমস্ত জীবনকে অনুস্যূত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতার এই সূক্ষ্ম সূত্র ছিন্ন হইলে সমস্ত জীবন, সমস্ত সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অধঃপাতে যাইবে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতি পবিত্র, কোমল জিনিষ। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই স্বাধীনতা সমান পবিত্র। আর সমান ভাবে পবিত্র কেনইবা না হইবে? যখন সকলের সুখ দুঃখ স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন কেনই বা এক জনের স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় না হইবে? আরও একটী কথা—ব্যক্তি বিশেষের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি বিশেষ নহে। তাহা হইলেও কেনই বা সমাজের সুশৃঙ্খলার জন্য ব্যক্তি বিশেষের সুখ শক্তি নষ্ট করা হইবে? যদিই বা বিচারের জন্য স্বীকার করা যায় যে, সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তি বিশেষের (ইচ্ছার বিরুদ্ধে) সুখ শান্তি বলি দেওয়া আবশ্যক। প্রকৃত সাম্যবাদীর চক্ষে এরূপ হিতবাদ দূষণীয়, কারণ-এস্থলে অল্পের প্রতি বহুর অত্যাচার।

তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা বিশ্বাস করি না যে, সমাজের কল্যাণের জন্য, ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার একমাত্র আদর্শ—প্রকৃতির আদেশানুযায়ী কার্য্য করাই জ্ঞানের চরম উপদেশ। এস্থলেও প্রকৃতিই আমাদের উপদেষ্টা। প্রকৃতি পদে পদে আমাদের চক্ষুতে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছেন, যেখানে স্বাধীনতার অবমাননা, সেখানেই তাহার

বিষময় ফল। এত রাষ্ট বিপ্লব, এত সমাজ বিপ্লব, এত পরিবারিক বিচ্ছেদ, এত বিবাদ বিসম্বাদের মূল কি? যাঁহারা দার্শনিকের চক্ষে ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা উন্মিলিত নেত্রে সমাজের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, এ সমস্ত দুর্ঘটনার মূলে এই স্বাধীনতার প্রতি অত্যাচার—স্বাধীনতার কোমল অঙ্গে কঠিন করস্পর্শ।

যাঁহারা প্রকৃতির অভ্যন্তরে একটী অনন্ত জ্ঞানময়ী, ইচ্ছাময়ী শক্তির কার্য্য দেখিতে পান নাই, এরূপ নাস্তিক্যবাদী বা সন্দেহবাদী পণ্ডিতগণও প্রকৃতিতে একটী অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখিয়া অবাক হইয়াছেন, যে শক্তি মনুষ্যের জ্ঞান শক্তিকে উপহাস করিয়া তাহার ইচ্ছাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া করিয়া, বিষয়কে এক নূতন ভাবে গঠন করিতেছে। আমরা কোনও একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, ফল তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ ঘটনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘটিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া, এই প্রকৃতিবাদী দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যাহা ভাল বুঝিব, অপরের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা-বিধায়িনী শক্তি, সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবেন। এই আশ্চর্য্য শক্তির ক্রীড়া দেখিয়াই কোন ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়াছেন—"মানব! তুমি তোমার নিজের বিষয় ভাব, ভগবান জগতের বিষয় ভাবিবেন (Man take care of thyself, God will take care of the world.)

যাঁহারা অপরের শিক্ষা বিধান করিতে চান, যাঁহারা অপরের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে বাসনা করেন, তাহাদিগকে বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। ব্যক্তিমাত্রের স্বাধীনতাই অত্যন্ত পবিত্র, অত্যন্ত কোমল জিনিস। যিনি এই স্বাধীনতাকে নিয়মিত করিবেন, তাঁহাকে অত্যন্ত পবিত্র উদ্দেশ্যে, অত্যন্ত কোমলতা ও সতর্কতার সহিত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতি সামান্য মাত্র কাঠিন্যও স্বাধীনতার কোমল অঙ্গে বিষম বেদনা উপস্থিত করিলে, তোমার অভীষ্ট বিফল হইবে। তুমি যাহার ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে চাও, সাবধান, সে যেন তোমার উদ্দেশ্য জানিতে না পারে—তাহার বিশ্বাস যেন অক্ষুণ্ণ থাকে যে, সে স্বাধীন ভাবেই সমস্ত কার্য্য করিতেছে। ইহাই সাফল্যের প্রকৃত বীজ মন্ত্র। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক জন অধীশ্বর আছেন,—যাঁহার জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে, যাঁহার নিকট দেশ কালের প্রভেদ নাই, যিনি এক মাত্র কর্ত্তা ও একমাত্র সত্য, যাঁহার বিনানুমতিতে একটী পরমাণুও স্থানান্তরিত হইতে পারেনা, যৎকর্ত্তৃক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত রহিয়াছে, তাঁহাদের জন্য জগজ্জননীর আবরণ-স্বরূপা প্রকৃতি একটী নূতন শিক্ষা দিতেছেন। প্রেমময়ী জননীর মঙ্গল ইচ্ছা নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, আমাদিগকে সেই অনন্ত মঙ্গল রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত করিতেছে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইতেছি। "We are destined to be saved." আমাদের ইচ্ছা অনুক্ষণ সেই মহতী ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, অথচ আমরা

কিছুই জানিতে পারিতেছি না যে, আমাদের ইচ্ছার পশ্চাতে আর কোনও ইচ্ছা আছে। কার্য্যকালীন আমরা মনে করি, আমরা স্বাধীন, আমাদের ইচ্ছারই জয় হইতেছে, কিন্তু পরে দেখিতে পাই যে, সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রীর মহতী ইচ্ছারই জয় হইতেছে। মানবের স্বাধীনতার সহিত সেই সর্ব্বশক্তিমতী সর্ব্বনিয়ন্ত্রী শক্তির যেরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেইরূপ আমাদের ইচ্ছার সহিত অপরের স্বাধীন ইচ্ছার সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতাই মঙ্গলময়ের রাজ্যে উঠিবার সিঁড়ি। যাঁহারা এই স্বাধীনতার গায় হাত দেন, তাঁহারা প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য স্থাপনের দিন দূরপরাহত করেন। তাঁহারাই মানব জাতির প্রকৃত শত্রু।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

ভবভূতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বড় আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা ভবভূতির জীবনচরিত পাঠকগণের সমক্ষে অর্পণ করিতে পারিলাম না। যাঁহারা অন্যের জীবনচরিত নিপুণতার সহিত বর্ণন করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিজের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইতে লোকের স্বভাবতঃই কুতূহল জন্মে; কিন্তু কল্পনা ক্ষেত্র ভারতবর্ষে, সে কুতূহল চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দেশের ইতিবৃত্ত কল্পনা ও কিম্বদন্তীতে পরিপূর্ণ, সেখানে প্রকৃত তত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভবভূতির ইতিবৃত্ত, স্থানে স্থানে কল্পনাজড়িত হইলেও, কালিদাস অথবা বররুচির জীবন-বৃত্তান্তের ন্যায় কেবলই নিরবচ্ছিন্ন লোক প্রবাদে পরিপূর্ণ নয়। তাঁহার জীবনচরিতের যে অংশটুকু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত, এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও বস্তু নাই। কিন্তু ইহা এত ক্ষুদ্র, এবং ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় এত স্বল্প যে, পাঠকের হৃদয় তাহাতে কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। উপায়ান্তরের অসদ্ভাবে ভবভূতির জীবনের এই সামান্য অংশ মাত্রেই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই মাত্র পাঠকগণের সমক্ষে ক্রমশ বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। যদিও ভবভূতির গ্রন্থ সমূহে তাঁহার জন্মভূমি ও পিতৃ পিতামহগণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তিনি কোন, সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়ছিলেন, এবং তাঁহার জীবনকাল কিরূপ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা সম্যক রূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এবিষয়ে আমাদিগকে অনেক সময়েই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া আমরা ভবভূতির নিজের ও তাঁহার উত্তরকালবর্ত্তী কবিগণের গ্রন্থ হইতে তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে (যতদূর সম্ভব,) তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি।

এস্থলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, আমরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্তআনন্দ রাম বড়ুয়া প্রনীত বীরচরিত ও ভবভূতি নামক প্রস্তাব হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবের অংশ বিশেষ তাঁহারই প্রগাঢ় চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার ফল।

রামচন্দ্রের ইতিবৃত্ত লইয়া যে সমস্ত নাটক প্রণীত হইয়াছে, ভবভূতি প্রণীত বীরচরিত, ও উত্তরচরিত তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন সংস্কৃত কবিই রামচরিত অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার প্রয়াস করেন নাই। সুতরাং রামচরিত মূলক এই সকল নাটকের কাল নির্ণয় করিতে পারিলে, অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত জানা যাইবে যে, ভবভূতি এই সকল নাটককারগণের পূর্ব্বকালবর্ত্তী। এবং যে সমস্ত অলঙ্কার গ্রন্থে ভবভূতির রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের কাল নির্ণয় করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, ভবভূতি এই সকল আলঙ্কারিকগণের অনেক পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে আবিভূত হইয়াছিলেন; কারণ তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিদ্বানমণ্ডলীর নিকট সমাদৃত না হইলে, আলঙ্কারিকগণ তাহার দোষ গুণ সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু আমাদিগের প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভবভূতিপ্রণীত বীরচরিত ও উত্তরচিত যে রাম চরিতাখ্যায়ক নাটক সমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম, তাহার প্রমাণ কি? আমরা নিম্নে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিব।

সংস্কৃত ভাষার কবিগণের মধ্যে পূর্ব্ব পরই এইরূপ একটী রীতি বর্ত্তমান আছে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখন কোন একটি বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে, যদি তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেই বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তিনি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে বাল্মীকির প্রতি এই রূপ প্রথানুযায়িনী ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটী করেন নাই।

ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ
তীর্ত্বা দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
অথবা কৃতবাগ্দারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তিমে গতিঃ॥

প্রভৃতি শ্লোক তাঁহার আত্মাভিমান-শূন্যতা ও বাল্মীকির প্রতি আন্তরিক ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ। সুতরাং ভবভূতির পূর্ব্বে অপর কোন কবি যদি রামচরিত লইয়া নাটক প্রণয়ন করিতেন, ভবভূতি কখন তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু তিনি বীর চরিতের প্রারম্ভে কেবল মাত্র বাল্মীকির প্রতিই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, রামচরিত লেখক অপর কোন কবির নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।* যদি সে সময়ে এরূপ কোন কবির গ্রন্থ সমাদৃত ও প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে ভবভূতি কখনও তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে উপেক্ষা করিতেন না। "অপূর্ব্বত্বাৎ প্রবন্ধস্য" নটের এই রূপ বাক্যদ্বারাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, বীরচরিতের পূর্ব্বে, রামচন্দ্রের ইতিবৃত্ত আর কখনও নাটক রূপে বর্ণিত হয় নাই। কারণ তাহা হইলে নটের "অপূর্ব্ব" এই কথার কোনও সার্থকতা থাকেনা। ভবভূতির পরবর্ত্তী কবিগণ এই সকল স্থলে যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের

---

* প্রাচেতসো মুণিবৃষা প্রথম কবিনাং
যৎপাবনং রঘুপতেঃ প্রণিনায় বৃত্তম।
ভক্তস্য তত্র সমরংসত মেঽপি বাচঃ
তৎ সুপ্রসন্ন মনসঃ কৃতিনো ভজন্তাম॥
বীরচরিত ৭ম পৃ।

BLEED THROUGH.

যুক্তি আরও নিঃসংশয়িতরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে। প্রাচীন কবিগণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া, বালরামায়ণপ্রণেতা রাজশেখর, যথাক্রমে রামায়ণপ্রণেতা বাল্মীকি, ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ভর্ত্তৃহরি, এবং উত্তরচরিতপ্রণেতা ভবভূতি, এই তিন জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বভূব বল্মীক ভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃপ্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃ মেণ্ঠতাম।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতি রেখয়া
স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকটীর দ্বিতীয় চরণ যদিও লিপিকরপ্রমাদদূষিত, কিন্তু তথাপিও তাহা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজশেখর ভবভূতির উত্তরকালবর্ত্তী; এবং তাঁহার সময়ে ভবভূতির গ্রন্থ সমূহ বিলক্ষণ সমাদৃত ও সাধারণের নিকট পরিচিত।

রামচরিতাখ্যায়ক নাটক সমূহের মধ্যে বীরচরিত যে সর্ব্ব প্রথম, সে বিষয়ে আরও একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থারম্ভে নট বলিতেছেন যে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপ অপূর্ব্ব অর্থাৎ নবীন; কিন্তু অনর্ঘ রাঘব অথবা প্রসন্নরাঘব প্রণেতা কোন ক্রমেই একথা বলিতে সাহস করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে রামচরিত লইয়া অনেক গ্রন্থই বিরচিত হইয়া গিয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। *

রামচরিতাখ্যায়ক নাটককারগণের মধ্যে ভবভূতির প্রাচীনত্বের আরও একটী বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে স্বপ্রণীত গ্রন্থে কেবলই রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণেরই সমাবেশ করিয়াছেন; যাঁহারা বাল্মীকির গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগেরই কার্য্য কলাপ স্বপ্রণীত গ্রন্থে বর্ণিত করিয়াছেন, তমসা মুরলা এবং দণ্ডকারণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসন্তী প্রভৃতি সর্ব্বজন পরিচিত দুই একটী ব্যক্তি ভিন্ন, তিনি কোথাও সম্পূর্ণ নূতন চরিত্রের সমাবেশ করেন নাই। কিন্তু ভবভূতির পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থের নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব রক্ষা করিবার জন্য মাথুর, নূপুরক, সঞ্জীবক, প্রভৃতি সম্পূর্ণ নূতন নাম ও নূতন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এইরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য কি এবং ইহা হইতেই বা কি অনুমান করা যাইতে পারে, আমরা নিম্নে তাহা আরও বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

রামচরিতমূলক নাটকসমূহে এই সকল নূতন নাম ও নূতন চরিত্রের উল্লেখ দেখিয়া আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, এ সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গ্রন্থের নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব রক্ষা করা গ্রন্থকার মাত্রেরই অভিপ্রেত। যাহাতে পাঠকের হৃদয় গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ে সমাকৃষ্ট থাকে, এবং একই কথা এবং একই প্রকার ভাব বারম্বার পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের বিরক্তি বোধ না হয়, তদ্বিষয়ে সকল গ্রন্থকারই সাধ্যানুরূপ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ভবভূতির

* অয়ন্তু প্রাচেতসীয়ং কথা বস্তু বহুভিঃ প্রণীতমপি প্রযুঞ্জানো নাপরাধ্যতি শ্রোত্রিয় পুত্রঃ। পশ্য—

যদি ক্ষুণ্ণং পূর্ব্বৈরিতি জহতি রামস্য চরিতং
গুণৈরেতাবদ্ভি র্জগতি পুনরতো জয়তি কঃ।
স্বমাত্মানং তত্তদ্গুণগরিম গম্ভীর মধুরা
স্ফুরদ্বাগ্ব্রহ্মাণঃ কথমুপকরিষ্যন্তি কবয়ঃ॥

অনর্ঘরাঘব ১ম অঙ্ক।

কথং পুনরমী কবয়ঃ সর্ব্বে রামচন্দ্রমেব বর্ণয়ন্তি। সূত্র। নায়ং কবীনাং দোষঃ। যতঃ ইত্যাদি

প্রসন্নরাঘব ১ম অঙ্ক ১২ পৃষ্ঠা।

সময়ে রামচরিত তখনও পর্য্যন্ত লোকের নিকট অপরিচিত; তাহার নূতনত্ব বারম্বার বর্ণনে তখনও পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। যে মাধুর্য্য ও কমনীয়তা গুণে রামচরিতের এত সমাদর, তাহা তখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। লোকে সে কথা শুনিতে ক্লান্তি বোধ করিতনা, শুনিলে পরিতৃপ্ত হইত না, আবার শুনিতে চাহিত। ভবভূতিকে এই সকল কারণে নূতন চরিত্রেরও নূতন ঘটনার সমাবেশ করিতে হয় নাই। সেই নিত্য নূতন পদার্থের মনোহারিত্ব ও আকর্ষিনী শক্তি বর্ত্তমান রাখিবার জন্য তাঁহাকে বাল্মীকির অজ্ঞাত রামায়ণের অবতারণা করিতে হয় নাই। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী কবিগণ দেখিলেন যে, রামচরিত অনেক কবিই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক অংশই কাহারও না কাহারও দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এক্ষণে নূতনত্বের অসম্ভাব; সুতরাং প্রতিপাদ্য বিষয়ের নূতনত্ব রক্ষা করিবার জন্য, এবং আপনাদিগের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্য, তাঁহাদিগকে অগত্যাই অনেক নূতন নাম ও নূতন চরিত্রের সমাবেশ করিতে হইয়াছে। নতুবা বাল্মীকির অপরিচিত কোহল, পশুমেদ্র প্রভৃতি নামের উল্লেখ কেন? কেবলই যে সংস্কৃতকবিগণ এরূপ করিয়াছেন, তাহা নয়। গ্রীক, লাটিন ও ইংরাজী কবিগণের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম্প্রদায় এই নূতনত্ব রক্ষার জন্য ঐতিহাসিক নাঠকে এবং উপন্যাস গ্রন্থে অনেক কল্পনা সৃষ্ট চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তি ও প্রমান প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে একরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভবভূতি রামচরিতাখ্যায়ক গ্রন্থকারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এবং তাঁহার বীরচরিত ও উত্তরচরিতের পূর্ব্বে রামচরিত অবলম্বন করিয়া কোনও নাটক প্রণীত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সকল রামচরিতমূলক নাটকের কাল নির্ণয় করিতে পারিলে ভবভূতির আবির্ভাব কাল স্থিরীকৃত হইবে। সুতরাং আমরা এক্ষণে সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সাহিত্যদর্পণকার রামচরিতাখ্যায়ক যে সকল নাটকের নামোল্লেখ করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় "বালরামায়ণ" 'তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার রচনা যেমনই প্রাঞ্জল, ভাষা তেমনই মধুর, পাঠমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার প্রাচীনত্বের আরও একটী প্রমাণ এই যে, ইহা হইতে সমুদ্ধৃত-শ্লোক সমূহ প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ দশরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বালরামায়ণ হইতে 'বভূববল্মীকভবঃ' ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে গ্রন্থ কর্ত্তা রাজশেখর ভবভূতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা হইতে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজশেখরের সময়ে ভবভূতি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সম্মানার্হ গ্রন্থকার। লোকে প্রাচীন কবিগণের নামোল্লেখ করিতে হইলে বাল্মীকির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম করিত। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বালরামায়ণ প্রণেতা রাজশেখর শঙ্করাচার্য্যের সম কালবর্ত্তী। মাধবাচার্য্য নিজে দাক্ষিণাত্যবাসী, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় হওয়া

BLEED THROUGH.

সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমরা অনায়াসেই স্থির করিতে পারি যে, বালরামায়ণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বালরামায়ণ প্রণেতার সময়ে ভবভূতি বিলক্ষণ সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এই গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ ভবভূতির জীবন কালে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহা হইলে মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় তাঁহার লেখনী হইতে এরূপ তেজোগর্ব্বমিশ্রিত বাক্য নির্গত হইত না।

যে নাম কেচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তিতে কিমপিতান্ প্রতিনৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী॥

ইহার প্রত্যেক শব্দই যেন অপমানিত মহত্ত্বের হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তাহাতে গর্ব্বের চিহ্ন নাই, তাহা নয়; কিন্তু সে গর্ব্ব আত্মাভিমানের পরিচায়ক নয়; তাহা দণ্ডাহত সিংহের তীব্র কটাক্ষের প্রতিরূপ। শুদ্ধ ভবভূতি কেন, প্রতিভার অনাদর কবে কে সহ্য করিতে পারে? বাইরণের "ইংরাজীকবি ও স্কট্ সমালোচক" এইরূপ অনাদৃত মহত্ত্বেরই ফল। কিন্তু সে সকল কথা বলিবার স্থান, এ প্রস্তাব নয়।

আমরা বলিয়াছি যে, ভবভূতি তাঁহার জীবনকালে সেরূপ সমাদৃত হন নাই। লোক সমাজে পরিচিত হইতে ও সম্মানলাভ করিতে তাহার পক্ষে বহুদিন লাগিয়াছিল। মুদ্রাঙ্কনের অভাবে, হস্তলিখিত পুস্তক লোক সমাজে পরিচিত হইতে বহুদিন লাগিত। সুতরাং অন্তত দুই শত বৎসরের ন্যূনে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভবভূতির নাম বিস্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে, অর্থাৎ রাজশেখরের সময়ে, তিনি বিলক্ষণ সুপরিচিত; আমরা ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে, ভবভূতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাব্যপ্রকাশ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ এবং দশরূপ প্রভৃতি প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থেও ভবভূতির রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, এই সকল অলঙ্কার গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ইহাদিগের দ্বারাও ভবভূতির আবির্ভাবকাল অনেক পরিমাণে নির্ণীত হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পণ্ডিতসমাজে ভবভূতির গ্রন্থের সমাদর না হইলে আর আলঙ্কারিকগণ তাহা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতে, অথবা তাহার দোষগুণ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এবিষয়ে আরও অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে যাইলে প্রবন্ধটী ক্রমশই নীরস হইবার সম্ভাবনা। আমরা সেই জন্য ভবভূতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আর অধিক যুক্তি প্রদর্শন অনাবশ্যক বিবেচনা করি।

কালনির্ণয় সম্বন্ধে যেমন আমাদিগকে অনেক স্থলেই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, ভবভূতির জন্মভূমি ও পিতৃ পিতামহগণ সম্বন্ধে আমাদিগকে সেরূপ করিতে হইবেনা। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় তিনি নিজেই সূত্রধার মুখে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন; তাহার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার নাই। কিন্তু একজন সংস্কৃতভাষার কবি সম্বন্ধে আমাদিগের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁহারও জীবন সম্বন্ধে দুই একটী জন প্রবাদ বর্ত্তমান আছে। কেহ তাঁহাকে কালিদাসের সমসাময়িক,

কেহবা তাঁহাকে ভোজরাজার সভাসদ্ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে আমরা তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না; তাঁহার সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; তদতিরিক্ত প্রবাদ, কল্পনা ও অনুমান সম্ভূত। তবে ভোজরাজার সভাসদ্ হওয়া অসম্ভব নয়; কারণ ভোজ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, বংশবিশেষের নামমাত্র।

ভবভূতি বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন যে, বিদর্ভদেশের অন্তঃপাতী পদ্মপুর নগর তাঁহার জন্মভূমি। তাঁহার পিতামহের নাম গোপাল, পিতার নাম নীলকণ্ঠ এবং মাতার নাম জাতুকর্ণী। তিনি কাশ্যপগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সকলেই বেদবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; এবং বেদোদিত ক্রিয়া কলাপের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার পঞ্চম পুত্র; অসাধারণ প্রতিভাও অধ্যবসায়বলে তিনি সংস্কৃত রচনায় এরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন, যে অনন্যসাধারণ শ্রীকণ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্য কালে সার্থক নামা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিধি নামক উপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষিত হন (১) তাহার পিতামহও কবিত্ব শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সুশিক্ষা গুণে এবং স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভাবলে তিনি ভাষা জ্ঞানে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে ভগবতী বাগ্‌দেবী বাগ্‌বশ্যা রমণীর ন্যায় তাহার উপাসনা করিতেন (২)। বিদর্ভ দেশ পণ্ডিতমণ্ডলীর আবাসস্থান (৩); ভবভূতি সেই পণ্ডিতসমাজের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।

ভবভূতির বাল্যকাল কোথায় কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনেকে অনুমান করেন, যে ভবভূতি ভোজরাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। এরূপ অনুমান নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে। ভোজবংশের একটি শাখা অনেক দিন পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং ভবভূতি যে উজ্জয়িনীতে যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজেরই কথা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার নাটকসমূহ উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাকালের উৎসব বিশেষে অভিনীত হইয়াছিল। (১) সুতরাং তাঁহার পক্ষে উজ্জয়িনীর রাজসভাসদ্ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষাংশ যে

(১) অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্রকেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তি পাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উড্ডম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয় যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্র কীর্ত্তেঃ নীলকণ্ঠস্যাত্ম সম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠ পদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিঃ। বীরচরিত ১ম অঙ্ক।

(২) বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং সাচ রামাশ্রয়া কথা
ইত্যাদি বীরচরিত ১ম অঙ্ক।
যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্বশ্যেবাভিবর্ত্ততে উত্তর চরিত ১ম অঙ্ক।

(৩) সোহয়ং সুক্ত পুরো বিদর্ভ বিষয়ঃ সারস্বতী জন্মভূঃ বাল রামায়ণ ১০ম অঙ্ক।

(১) অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়া মার্য্যমিশ্রাঃ সমাদি চণ্ডী।
অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয় নাথস্য যাত্রায়ামার্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। উত্তরচরিত।

কিরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা বিদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বড় ক্ষোভের বিষয় যে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখিতে পাইলাম না; ভারতশ্রেষ্ঠগণের জীবন চরিত জানিতে পারিলাম না। অথবা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখিতে বা ভারত সন্তনের জীবনচরিতই পড়িতে পাইব, তবে সপ্ত দশ অশ্বারোহীকর্ত্তৃক বঙ্গদেশবিজয় বিশ্বাস করিতে হইবে কেন?

ভবভূতি বীরচরিত, উত্তর চরিত, ও মালতীমাধব ভিন্ন অপর কোন নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই; কিন্তু এই তিন খানি নাটকই যে একই লেখনী নির্গত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

"সিংহল যাত্রা"—প্রতিবাদ।

"নবজীবন" পত্রিকায়, ধারাবাহিক রূপে, সিংহল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-মূলক একটী উপাদেয়-সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। প্রবন্ধ লেখক বিজ্ঞ। তিনি বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক লেখনী ধারণ করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মাঘ মাসের পত্রিকায় এই প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—

"বঙ্গের একজন রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, একথা মনে করিতে পারিলে আমরা লক্ষ্মণ্য সেনের * কাপুরুষতা ভুলিতে পারি এবং আমাদের আত্মাদরের বৃদ্ধি হয়। অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর বিশ্বাস এই যে, সিংহল জেতা বিজয়বাহু বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু মগধের অন্তর্গত লাল নামক বন্য প্রদেশের রাজা ছিলেন। লাল প্রদেশের রাজধানী সিংহপুরে বিজয়ের জন্ম হয়। সিংহবাহু বঙ্গরাজের দৌহিত্র ছিলেন; তাহার মাতামহী কলিঙ্গ রাজের কন্যা ছিলেন। বিজয়ের পিতামহী সুরূপাদেবীকে বাঙ্গালি-কন্যা বলিলে বলা যাইতে পারে; কারণ সুরূপার পিতা বঙ্গের রাজা ছিলেন। তবে কিনা বঙ্গরাজ আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে যে ক্ষত্রিয় মহাশয়েরা বঙ্গে ১৪ পুরুষ বাস করিতেছেন, তাহারাও বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দেন না। বঙ্গ রাজের কন্যার পৌত্র বিজয়কে বাঙ্গালিরা স্বজাতীয় করিয়া লইতে চাহেন লউন। সত্যানুরোধে আমি তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মানিতে পারিলাম না। মানিতে পারিলে বাঙ্গালিদের গৌরবের কথা বটে। "লাল" প্রদেশ কোথায় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। আমরা এক্ষণে যাহাকে ছোটনাগপুর † বিভাগ বলি, তাহার কতকাংশ মগধের অন্তর্গত ছিল। আমার অনুমান হয়, বর্ত্তমান সিংহভূম পূর্ব্বে লাল প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল।"

* "লক্ষ্মণ্য সেন" নহে। ইহারও নাম লক্ষ্মণসেন।

† চুটীয়া নাগপুর হইবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সিংহল-বিজয়ী "বিজয়সিংহ" খাটী বাঙ্গালী, সুতরাং উক্ত প্রবন্ধের লেখক মহাশয়ের সহিত একটুকু তর্কের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার লিখিত বাক্যের প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে পালি ভাষায় লিখিত ইতিহাস "মহাবংশ" হইতে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রকাশ করা গেল।

"বঙ্গের রাজধানী বঙ্গনগরে বঙ্গ নামে এক রাজা বাস করিতেন। কলিঙ্গের রাজ কন্যা তাহার মহিষী ছিলেন। এই মহিষীর গর্ভে বঙ্গরাজের এক কন্যা জন্মে। পালি ভাষায় তাহার নাম "সুপ্প দেবী" আমাদের মতে সুর্পদেবী। "সুরূপা" নহে। জনৈক অদৃষ্ট বক্তা এই কন্যার অদৃষ্ট গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে তিনি মৃগরাজের পাণিগ্রহণ করিবেন।

কুমারী বয়প্রাপ্ত হইলে তিনি মগধযাত্রী একজন বণিকের সহিত গোপনে গমন করিতে ছিলেন। তাঁহারা "লাঢ়" অর্থাৎ রাঢ় প্রদেশে অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইলে, এক সিংহ বণিকের প্রাণবধ করিয়া কুমারীকে লইয়া স্বীয় গুহায় গমন করিল। * সিংহ সহবাসে গর্ভধারণ করিয়া সুপ্পদেবী জমজ পুত্র কন্যা প্রসব করিলেন। শিশুদ্বয়ের হস্তপদ কিয়ৎপরিমাণে সিংহের ন্যায় ছিল বলিয়া তাহাদের নাম "সিংহবাহু" ও "সিংহবলী" রাখা হইয়াছিল। পুত্রকন্যা বয়প্রাপ্ত হইলে সুপ্পদেবী পুত্রের সাহায্যে পলায়ন করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। বঙ্গরাজ তাহাদিগকে পাইয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

এদিকে সিংহ স্ত্রী, পুত্র, কন্যার অদর্শনে উন্মত্ত হইয়া লোকালয়ে প্রবেশ করত অত্যাচার আরম্ভ করিল। প্রজাগণ সিংহ কর্ত্তৃক উৎপাতিত হইয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইল। রাজা সিংহ বধ জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন। কেহই অগ্রসর হইল না। কুমার সিংহবাহু তাঁহার মাতার অজ্ঞাতসারে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি সিংহ বধ করিতে প্রস্তুত আছি। বঙ্গরাজ তৎশ্রবণে বলিলেন, বৎস! তুমি সিংহ বধ করিতে পারিলে আমি সেই প্রদেশ (অর্থাৎ "লাঢ়" (রাঢ় প্রদেশ) তোমাকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। বঙ্গরাজ স্বীয় অধীনস্থ প্রদেশই দৌহিত্রকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। যদি সেই সময় "লাঢ়" প্রদেশ মগধের অন্তর্গত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গরাজ কিরূপে সেই প্রদেশ তাহার দৌহিত্রকে দান করিতে পারিতেন। আর সিংহের দ্বারা অত্যাচার গ্রস্ত হইয়া, প্রজাগণই বা কেন মগধেশ্বরের নিকট না গিয়া বঙ্গরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

কুমার সিংহবাহু লাঢ় প্রদেশে যাইয়া সিংহ বধ করিলেন। তিনি যথা কালে বঙ্গ নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার মাতামহ পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রজাগণ তাহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহার মাতার স্বামী অনুর*কে

* আমাদের বিবেচনায়, এস্থলে "সিংহ' কোন অরণ্যবাসী দস্যু। পশুরাজ নহে।

* মাতুল ও পিসতুতা ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত থাকার প্রমাণ তাম্র শাসনেও

সেই সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তাহার মাতামহ তাহাকে যে লাঢ় প্রদেশ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সিংহবাহু তাঁহার অনুজাকে লইয়া সেই প্রদেশ গমন করিলেন। তথায় তিনি সিংহপুর নগরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজপাঠ স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় অনুজা সিংহবলীকে বিবাহ করিলেন।†

সিংহবলীর গর্ভে সিংহবাহুর ১৬ বার ৩২টী পুত্র হইয়াছিল, তাহারই জ্যেষ্ঠকুমার-বিজয় সিংহ। বিজয়ের ৩৯৯জন সমবয়স্ক সহচর ছিল। বিজয়ও তাঁহার সহচরগণ বয়প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সিংহবাহু তাহার পুত্রকে দুইবার ক্ষমা করিয়াছিলেন, তৃতীয় বার ক্ষমা করা অনুচিত বিবেচনায় বিজয় ও তাহার ৬৯৯ জন সহচরকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাহারা পোতারোহনে লঙ্কায় যাইয়া সেইদেশ অধিকার করেন। ইত্যাদি—।

এই প্রতিবাদ প্রবন্ধে মহাবংশে লিখিত মূল বৃত্তান্ত আর উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সিংহবাহুর রাজ্য "লাঢ়"-প্রদেশ লইয়াই নবজীবনের লেখকের সহিত আমাদের প্রধান বিরোধ।

টর্ণার সাহেব পালির পরিবর্ত্তে রোমান অক্ষরে পালিভাষায় লিখিত মহাবংশ ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পালি "লাঢ়" কে Lal লিখিয়াছেন। প্রথমোক্ত অক্ষরটী 'লা' শেষোক্ত অক্ষর 'ল' 'র' 'ড়' ও 'ঢ়' এর মাঝামাঝি একটী বর্ণ এইরূপ অক্ষর বঙ্গীয় বর্ণমালায় নাই। কেবল উড়িয়া বর্ণমালায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ও 'র' 'ড়' "ঢ়" এই তিনটী অক্ষরের পরিবর্ত্তে "ল" ব্যবহার হইত। এরূপ ব্যবহার সংস্কৃতে কোন কোন সময় ও পালিতে অধিকাংশ স্থলে হইত। "ড়লয়োরভেদঃ।" মল্লিনাথধৃত এই প্রাচীন সূত্রটী বোধ হয় প্রবন্ধ লেখক জ্ঞাত আছেন। কালিদাস রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের—২৮ শ্লোকে রঘুর চূড়া কর্ম্মকে "চুল" কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক স্থলে "র" এর পরিবর্ত্তে "ল" ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, যথা "হিন্দুরেখা"—হিন্দুলেখা। "মৃগলেখা"—মৃগরেখা ইত্যাদি। মহারাজ অশোকের খোদিত লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "দেবানাম্‌পিয় পিয়দশী লাজা—" এস্থলে ও আমরা দেখিতে পাই যে 'র' এর পরিবর্ত্তে পালিভাষায় 'ল' ব্যবহার হইয়াছে। তদ্রূপ আমাদের রাঢ় প্রদেশে ও পালিতে 'লাঢ়' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 'রা' পরিবর্ত্তে "লা" টর্ণার La লিখিয়াছেন। শেষোক্ত অক্ষর যে ঠিক ল (La) নহে তাহা টর্ণার বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক যদি ইহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি টর্ণার প্রকাশিত মহাবংশের উপক্রমণিকার ৯৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন যে "l" এলের নিচে একটী বিন্দু রহিয়াছে। এই বিন্দুযুক্ত এল, তিনি মূলগ্রন্থের ৪৩পৃষ্ঠায় দশম পংক্তির প্রারম্ভে দেখিতে পাইবেন।

সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহ বঙ্গীয় রাজছত্রের অধীন "লাঢ়" অর্থাৎ "রাঢ়" প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খাটী বাঙ্গালী। যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন, আমরা তাঁহাকে আবার তর্ক করিবার জন্য প্রতিদন্দ্বীভাবে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমাদিগকে পরাস্ত করুন, নচেৎ আমাদের মতাবলম্বন করুন।

আর একটী কথা, যদি সেই প্রাচীন বঙ্গরাজ বাঙ্গালী নহেন, তাহা হইলে তুমি আমি কিরূপে বাঙ্গালী হইব। আমরাও যে বঙ্গদেশের আদিম বাসী নহি।

সিংহল দেশীয় ইতিহাস মহাবংশ অবলম্বন করিয়া আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব যে, বঙ্গেশ্বরের দৌহিত্র পুত্র—রাঢ় প্রদেশ নিবাসী খাটী বাঙ্গালী বিজয় সিংহ দ্বারা সিংহল বক্ষে বিজয় পতাকা সংরোপিত হইয়াছিল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্যাপি এ প্রথা মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে। এস্থলেও দেখা যায় যে, সুপ্রদেবীর সহিত তাহার মাতুল পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইয়াছিল।

† আমাদের দেশে সহোদরা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে।

তুষার-প্রবাহ।

বাল্যকালে কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কোন ভারতবর্ষীয় রাজাকে একজন পরিব্রাজক বলিয়াছিলেন "মহারাজ আমি এমন সকল দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, যেখানে জল জমিয়া কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়া যায়; তাহাতে রাজা এতাদৃশ বিস্ময়াপন্ন হন যে, সে কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া সেই লোকের প্রাণ দণ্ড করেন। এ গল্পে বিশেষ কিছু অসম্ভব নাই। সে যাহা হউক, এখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের নিকট, অদ্য আমরা যদি বলি যে, এমন দেশ আছে যেখানে বরফ-প্রবাহ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, জল স্রোতের ন্যায় নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, শেষে সাগরে গিয়া পতিত হয়,—তাহা হইলে তাঁহারাও হয়ত আমাদের কথা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া আমাদেরও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বিধান করিতে প্রস্তুত হইবেন। বাস্তবিক জন কতক ইংরাজীবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতীত Glacier বা হিম নদীর কথা অবগত আছেন, এমন লোক অতীব বিরল। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করণাভিলাষে, আমরা সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে বরফ-প্রবাহের কিছু বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এমন কোন বিষয় নাই, প্রকৃতির এমন ছবিই নাই, যাহা অবিকল বর্ণনা করা যায়, বিশেষত এতাদৃশ চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা এরূপ ছোট একটী প্রবন্ধে কিছুই হয় না, তথাপি ইহার দ্বারা বরফপ্রবাহ যে কিরূপ পদার্থ তাহার একটু আভাস মাত্র পাইলেও অনেকের প্রাকৃতিক আশ্চর্য্যবস্তুসমূহ সন্দর্শনের কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে পারে।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এজন্য এখানে বরফপ্রবাহের কথা কেহ জানেনা। কিন্তু হিমালয়ের অতি উচ্চ উচ্চ স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিমস্রোত আছে, তেমন আর কোথাও নাই। উচ্চে অবস্থিত বলিয়া সে গুলি সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত। হিমাদ্রির উত্তরদিকে এইরূপ উচ্চস্থানস্থিত হিমানি-স্রোত হইতে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নামক দিগন্তব্যাপি প্রকাণ্ড নদদ্বয় নির্গত হইয়া দুই দিক হইতে ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে। প্রায় তিন চারি মাইল উপরে না উঠিলে সে গুলি দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিনা বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। কিন্তু ইউরোপের অন্তঃপাতী আল্পস্

পর্ব্বতশ্রেণীর প্রসিদ্ধ হিমস্রোত সকল অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত; সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় একমাইল দেড় মাইল উপরে উঠিলেই তাহারা দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হয়। এই উচ্চ শীতল প্রদেশ-সমূহে গমন করিয়া, এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করা বড় সহজ নহে! তথাপি শত সহস্র বিপদ ও প্রাণহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও প্রকৃতির উপাসকগণ, এই সকল বিপদসঙ্কুল পথে পরিভ্রমণ করিয়া, এবং কখন কখন সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া, নানা কষ্ট ও যন্ত্রনার পর যে সকল প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা চির দিন নিজনিজ আবিষ্কর্ত্তাগণের দৃঢ়ব্রত অধ্যবসায় ও যত্নের সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই।

ইউরোপের রোন্,এবং আর্ভীরণ অন্যান্য আল্পস্ প্রদেশীয় নদীর উৎপত্তিস্থানে যাইলে দেখা যায় কত ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড রাশিকৃত পড়িয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ গুলিই কোন বিশেষ ভাবে সারিবন্ধ-রূপে অবস্থিত, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের সাধারণ প্রস্তর রাশি হইতে ইহাদিগকে সহজেই বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। আবার তাহাদের মধ্যে অনেক গুলির এমন বিশেষ বিশেষ চিহ্ন অনেক আছে, যাহাদ্বারা চারিদিগের সাধারণ প্রস্তর রাশি হইতে তাহাদের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। তাহাদের কতকগুলি হয়ত এমন পরিষ্কার ঘসামাজা যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন নদী স্রোতে বাহিত হইয়া আসিয়াছে। অনেক গুলির গায়ে এমন সব সারবন্দী ডোরা ডোরা দাগ আছে যে, বেশ বোঝা যায়, তাহারা কোন কঠিন বস্তুর সহিত ঘর্ষিত হইয়াছিল। কোন কোনটা আবার ঠিক কচ্ছপের পিঠের মত গোল। স্থানে স্থানে পাথর এমন চোস্ত করিয়া কাটা যে, তাহার কোণ গুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আবার ইহাও অনেক স্থলে দেখা যাইবে যে, এক খণ্ড প্রকাণ্ড পাথর একটী সরু অগ্রভাগের উপর এমন ভাবে দণ্ডায়মান আছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, বুঝি এখনই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু সেই ভাবে উহা কত বৎসর অতিবাহিত করিতেছে, পড়েনা, নড়েনা পর্য্যন্ত। যেই এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইবে, অমনি বুঝিতে হইবে যে, সেখান হইতে তুষার-প্রবাহ দূরে নাই। বাস্তবিকই আর কিয়ৎক্ষণ চলিলেই দেখা যাইবে যে, ঐ সকল প্রস্তরের সংখ্যা ও বন্ধুরতা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে; ক্রমে এমন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, সেখানে কেবলই ভয়ানক ভয়ানক প্রস্তরখণ্ড সকল আকা বাঁকা ভাবে ইতস্তত কোন বন্দোবস্ত-শূন্য হইয়া ছড়ান রহিয়াছে। কোনটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা, কোনটা বা উত্তর দক্ষিণে, কোনটা উর্দ্ধদিকে লম্বা, কোনটা বক্রভাবে। চারিদিকে কেবলই ছোট বড় পাথর, কেবলই পাথরের কাঁড়ি, তাহার মধ্যদিয়া জল স্রোত বহিতেছে।

এই প্রস্তররাশি অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইলে সুন্দর বরফময় উৎপত্তিস্থান দেখা যায়। রাশি রাশি বরফ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ! দেখিলে বড় ভয় হয়, বিস্ময়ে মন পূর্ণ হয়, যত দূর দৃষ্টি চলে কেবলই প্রস্তরাচ্ছাদিত স্তূপাকৃতি বরক! হয়ত ঐ বরফরাশির মধ্যভাগে একপ্রকার খিলানের মত দেখিতে পাইবে, উহার ভিতর হইতে অবি

রল জলধারাবিনিঃসৃত হইয়া (যেমন আর্ভিরণ নামক নদী হইতেছে।) বহিতেছে; এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ধবলকায় প্রশান্তমূর্ত্তি মহাদেব যেন বসিয়া আছেন, আর তাহার জটার মধ্য হইতে মন্দাকিনী মৃদু মৃদু বহিয়া পড়িতেছেন। সেই নির্জ্জন স্থানে সুদূরব্যাপী বরফরাশি হইতে নদী! সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের কঠিন দেহাভ্যন্তর হইতে প্রস্রবন! সেইদৃষ্টি-পথরোধী সুনীল গগনমণ্ডলের তলে বসিয়া, পাঠক! সেই মৃদুকলনাদী দরবিগলিত জলধারার স্বর্গীয় কবিত্বময় সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে কি বাসনা হয়? সেই দৃশ্য যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য! আর কখনও তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে এ চিত্র উঠিয়া যাইবার নহে। আর যাহারা দেখেন নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই মনে করেন, তাঁহারা আসুন, আমাদের সঙ্গে এ কল্পনার চক্ষু বিস্তার করিয়া একবার মনোরম পট অবলোকন করিয়া জীবনে ক্ষণকাল পবিত্র সুখ ভোগ করুন। ঐ দেখুন, শুভ্র গহ্বরের মধ্যদিয়া জলধারা বহিতেছে, বিরাম নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ক্রমাগতই সমভাবে প্রকৃতির জল চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে কি ভীষণ শব্দে পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহা কি? উপরিস্থ তুষার প্রবাহের পৃষ্ঠবর্ত্তী প্রকাণ্ড প্রস্তরপিণ্ড সকল স্থানচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছে,তাহারই শব্দ। গ্রীষ্মকালে এই স্থান বড়ই ভয়াবহ হইয়া থাকে, তখন আর এখানে আসা যায় না। কখন যে উপরিস্থ বরফরাশি গলিয়া ভারবশত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কেহ জানে না। এজন্য এস্থানে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ও সাবধানে পদসঞ্চার করিতে হয়। ইহার উভয় পার্শ্বে অনেক দূর অবধি ব্যাপিয়া এইরূপ প্রস্তরের রাশি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত আছে। তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান সময়ের হিমনদীর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এবং ইহাও বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ততদূর পর্য্যন্তও হিমনদী বিস্তৃত ছিল। ঠিক যেমন সাধারণত নদ-নদীর চারিপার্শ্বস্থ দেশ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে উক্ত স্থান সমূহ অনেক স্থলেই নদীগর্ভে নিমগ্ন ছিল, ভৌতিক কারণ বশত এক্ষণে নদীর পার্শ্বে পড়িয়া গিয়াছে; তদ্রূপ এই সকল বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড দেখিলেও বোধ হয় যে, ইহারা পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হিমনদীর অংশ ছিল, ও তাহারই দ্বারা দূরদেশ হইতে আনীত হইয়া তথায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহারা কিরূপে কোথা হইতে আসিল, তাহা ক্রমশ বিশেষ রূপে আলোচনা করা যাইবে।

এই স্থান অতিক্রম করিয়া আরও কিয়দ্দূর উপরে উঠিলেই হয়ত এক চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। যদি সেখানে ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল না হয়, তবে ঐ বন্ধুর স্থান দিয়া আসার জন্য হয়ত দেখিতে পাইবেন যে, বরফ রাশি, আর সমান সমতল বরফের ময়দানের মত না হইয়া, ছত্রভঙ্গ, উচ্চনীচ ও খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ভীষনতাময় বেশ ধারণ করিয়াছে। সুদূরবিস্তীর্ণ বরফপ্রান্তর এখানে শতধা বিচ্ছিন্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কেমন এক আশ্চর্য্য আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। কোথাও খানিকটা বরফ ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপম হইয়া স্তূপাকারে রক্ষিত। কোথাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছোট ছোট রাশিগুলি প্রস্তর শয্যায় শায়িত, কোথাও বা অত্যুচ্চ মনুমেণ্ট, টাউ-

য়ার, (tower) বা মন্দিরের চূড়ার মত বরফ চূড়া শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে পাহাড়, উপরে আকাশ, মধ্যে বিস্তীর্ণ বরফপ্রান্তর; তাহার উপর এইরূপ উচ্চ বরফ প্রাচীর, মধ্যে মধ্যে স্তূপের পর স্তূপ, তার পর অবার এই সকল চূড়া। নির্জ্জন, নিঃশব্দ স্থান, দর্শক! তুমি একাকী বরফ ভ্রমণের প্রধান সহায় ধারাল যষ্টি অবলম্বনে দেখিতেছ! কি মহান গম্ভীরভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়! কি অদ্ভুত বিস্ময়ে প্রাণ আপ্লুত হয়! মাঝে মাঝে আবার বজ্রের মত ভীষণ ধ্বনিতে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া, দর্শকের আপাদ মস্তক বিকম্পিত করিয়া, স্থানে স্থানে বরফ স্তূপের পতনধ্বনি! যেন প্রলয়কাল উপস্থিত! কার সাধ্য সেই দিকে আর এক পদ অগ্রসর হয়?

এইবার আর বরফের উপর দিয়া চলিবার উপায় নাই। কাজেই আমাদিগকে হয় ফিরিয়া আসিতে হইবে, নাহয় মহাকষ্টে পার্শ্বস্থ পর্ব্বত পৃষ্ঠ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহাদের সাহস অমানুষিক, তাঁহারাই এপথে অগ্রসর হন। এস পাঠক! আমরা কল্পনার চক্ষে দেখি, কিরূপে সাহসী দর্শক এই ঘোর ভয়ানক পথে চলিতেছেন। এস নির্ভয়ে তাঁহার সঙ্গে যাই। কিয়দ্দূর উঠিলেই আর সে ভয়ানক বেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এখানে বরফ বেশ শান্তভাব ধারণ করিয়া একটী নদীর আকারে প্রকাশ পাইতেছে। বিস্তারের বিশেষত্ব আছে। কোন কোন নদী অর্দ্ধমাইল অর্থাৎ এক পোয়া পথ বিস্তৃত, কোনটা বা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক চওড়া হইতে পারে। এই স্থানে তুষারপ্রবাহ নামের ঠিকউপযুক্ত দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হয়। দুধারে পর্ব্বত পার্শ্ব, মধ্যে নদী, সম্মুখে বরফ, পশ্চাতেও যতদূর দৃষ্টিচলে ততদূর বরফ। তবে বরফের উপরটা প্রায় সমস্তই ধূলা, কাঁকর, ছোট ও বড় বড় পাথরের খণ্ডে আচ্ছন্ন! এমন কি, অনেক নদীর উপরিভাগ দেখিলে হঠাৎ বরফ দেখাই যায় না, কেবল পাথরের কাঁড়ী দেখিয়াই নিশ্চিত করিতে হয় যে, এখান দিয়া এক সময়ে কোন স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত! এক্ষণে তাহার স্থানে কেবল পর্ব্বত পার্শ্বভ্রষ্ট প্রস্তরমালা বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোন অস্ত্র দ্বারা খানিকটা পাথরও ধূলা সরাইয়া ফেলিলেই শুভ্রবর্ণ পরিষ্কার বরফ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ছোট ছোট নদীর উপরি ভাগ কিন্তু এত অধিক প্রস্তরাবৃত হয় না; যাহারা খুব বড়, যাহাদের সঙ্গে উপতুষারপ্রবাহ (Tributary glaciers) সকল অনেক মিলিত হয়, তাহাদেরই মুখের নিকট এই রূপ ধূলিও কাঁকরে আচ্ছন্ন হয়। মাঝে মাঝে ফাটল দেখা যায়; ঐ সকল ফাটলের মধ্যদিয়া সুন্দর এক প্রকার নীলিম আভা বাহির হইতে দেখা যায়। এই সকল ফাটলের নাম (crevasses) ক্রেভাস্। ইহাদের কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে, পরে আমরা বিশেষ করিয়া লিখিব। উপরে যে ধূলি, কাঁকর ও প্রস্তর খণ্ডের রাশির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের ইংরাজী নাম (Moraine) যত উপরে উঠা যায়, ততই উহাদের বেশ বন্দোবস্ত দেখিতেপাওয়া যায়। সাধারণত ছোট নদীতে দুইপার্শ্বে দুই সারি সুব্যবস্থামত সাজান দেখা যায়, তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া ঐ রূপে

নদীর উভয় পার্শ্বে সাজাইয়া রাখিয়াছে; ইহাদিগের নাম (lateral moraines) অর্থাৎ পার্শ্বস্থ প্রস্তররাশি। অধিকাংশ হিমনদীর ঠিক মধ্য স্থল দিয়া পার্শ্বস্থ প্রস্তররাশির সমান্তর আর এক সারি প্রস্তর দেখা যায়, তাহাদিগকে (medial moraines) অর্থাৎ মধ্যস্থ প্রস্তররাশি বলে। আর পূর্ব্বোল্লিখিত হিমনদীর শেষে, প্রান্তভাগে যে রাশীকৃত উপল স্তূপ, তাহার নাম (terminal moraines) অর্থাৎ প্রান্তরস্থ প্রস্তররাশি। বড় বড় হিমনদীর মধ্যে ২।৩ বা আরও অধিক সংখ্যক মধ্যস্থ প্রস্তর রাশি শ্রেনীবদ্ধ দেখা যায়।

আর্ভীরণ নদীর উৎপত্তি স্থলের অন্বেষণে আসিয়া যে হিমনদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম "মার ডি গ্লেস্" (Mer de glace)। অনেক দূর পর্য্যন্ত, উপরে যেরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে, সেইরূপে মার ডি গ্লেস্ বিস্তৃত দেখা যাইবে। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বরফ, কেবল মধ্যে ৩।৪ টী মধ্যস্থ প্রস্তররাশির শ্রেণী, ও দুই পার্শ্বে দুটী। মাঝে মাঝে বাঁকের মাথায় ধারের দিকে ছোট বড় সব ফাটলের ভিতর দিয়া তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্য হইতে বর্ণ-বিহীন স্বচ্ছ বরফ কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। কিন্তু পড়িলে আর রক্ষা নাই। খুব সাবধানে চলা উচিত। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত পার্শ্ব হইতে প্রস্তরখণ্ড সকল স্খলিত হইয়া আকস্মিক ভীতিসঞ্চার করিতেছে। অনেক দূর এই রূপ। তাহারও পরে দৃষ্টিপ্রসারণ করিলে দেখা যাইবে যে, উক্ত তুষার স্রোত তিনটীতে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনটী স্বতন্ত্র নদী মিলিত হইয়া "মার ডি গ্লেস" হইয়াছে। ঐ তিনের মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বেরটীর নাম গ্লেসীয়ার ডু জীণ্ট; এইজিণ্ট নামক হিমনদীর বিস্তার মার ডি গ্লেস অপেক্ষাও অধিক। এখন ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়া, অবশেষে যে একটী সুন্দর পদার্থ নয়নগোচর হয়, তাহা বরফপ্রপাত। কি আশ্চর্য্য! যেমন নদীর মধ্যে জলপ্রপাত দেখা যায়, এখানেও ঠিক তাই। বরফ প্রপাত,—অর্থাৎ উচ্চ স্থান হইতে ভয়ানকরূপে রাশি রাশি বরফ নামিতেছে! উক্ত প্রপাতের যত নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়, ততই বরফের কঠিন জমাটভাবের হ্রাস হইতে দেখা যায়। অবশেষে প্রপাতের নিম্ন প্রদেশ প্রায় কোমল। তথাপি উহাকে বরফ বৈ আর কিছুই বলা যায় না। এই স্থানে অধিক সংখ্যক ফাটল দেখা দেয় ও অত্যন্ত উচ্চনীচ গোলমাল ভাবে বরফ রাশি স্তূপে স্তূপে রক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর আর অগ্রসর হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

যাহা হউক, কোন প্রকারে বরফ তোরণে কীলকের সাহায্যে বা পর্ব্বতের গা বাহিয়া যদি প্রপাতের উপরিভাগে উপস্থিত হইতে পারা যায়, তবে দেখিতে পাইব যে, তদুপরিস্থ নদী পৃষ্ঠে ফাটলের সংখ্যা অনেক ও ঐ সকল ফাটল বড় ভয়াবহ। আর ইহা সম্ভবপরও বটে; কেন না, তাহার ঠিক পরেই বরফ ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই উপর হইতে ঐরূপে ফাটিয়া গিয়া অবশেষে প্রপাতের উৎপাদন করিবে, ইহাই বুঝা যায়। এই স্থান বড়ই বিপদাকীর্ণ। বামে অতি অল্প ক্ষণ অন্তরে অন্তরেই ভীষণাকার প্রস্তর খণ্ড সকল, স্থানভ্রষ্ট হইয়া প্রপাতের সঙ্গে নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে,—সর্ব্ব-

দাই পড়িতেছে। তাহাদের সম্মুখে পতিত হইলে যে কি দশা হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। এদিকে দক্ষিণে মহা বিস্তীর্ণ তুষার প্রান্তর হইতে বায়ু চালিত প্রকাণ্ড আভালাঁশ্ (Avalanche) বা তুষারপিণ্ড যখন গড়াইয়া আসে, তখন তাহার সম্মুখে পড়িলেই যে কোন দ্রব্য চূর্ণীকৃত ও ভূতলে পতিত হইবে; মানুষের ত কথাই নাই। নদীর মধ্যভাগও নিরাপদ নয়। তত্রত্য অসংখ্য ফাটল সমুহের মধ্যে যদি অসাবধানে একবার পড়, তবে আর জীবনের আশা নাই। এই সকল ফাটলের উপর দিয়া তুষার (Snow) সেতু নির্ম্মাণ করা হয়, কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে না করিয়া, এখানকার বিশেষ ব্যবহার্য্য Alpine rope আল্‌পীয় রজ্জুর সাহায্যে অতীব সাবধানে চলা উচিত। অনেক স্থলে ফাটলগুলি তুষারে এরূপ আবৃত থাকে যে, চলিতে পারা যায় না, এই স্থানে পা দিবামাত্র মৃত্যু নিশ্চয়। এই ভয়াবহ স্থানে যে কত লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তাহার ঠিকানা হয় না। অতি সাবধানে এই ভয়ানক স্থান পার হইয়া, আবার সমতল ক্ষেত্রে পড়িতে পারিলে, আর বড় ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু এখানে আবার দৃশ্য নূতন। এখানকার অবস্থা আর এক প্রকার। আর সে হিমনদী নাই, আর সে বরফ নাই, এখন কেবল বিস্তীর্ণ তুষারময় প্রান্তর (Snow field)।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

উপন্যাসের চরিত্র-চিত্র।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নভেলের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থির করিতে হইলে, অগ্রে নভেলের মূলসূত্র কি, তাহা বুঝিতে হইবে। আমরা আরও দেখাইয়াছি যে, চরিত্র চিত্রই নভেলের প্রধান অঙ্গ, এবং তাহার উপরই নভেলের উৎকর্ষাপকর্ষ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এই চরিত্র চিত্র, সাধারণত চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চারি প্রকার চরিত্র চিত্রের মধ্যে, আমরা প্রধানত, দুই প্রকার চরিত্র চিত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে অন্য দুই প্রকার চরিত্র চিত্রের বিষয় বলা আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বতন দার্শনিক মত পরিবর্ত্তন জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, মানব চরিত্র সম্বন্ধে এক্ষণে পুরাতন মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লোক আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কথা বড় স্বীকার করে না। বর্ত্তমান বিবর্ত্তনবাদ মতে, জগতের ক্ষুদ্রতম তৃণ হইতে বৃহত্তম সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত, সমস্তই কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ, সকলই পরমাণু ও শক্তি বা প্রকৃতি ও চৈতন্যের পরস্পরের সংঘর্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, পরিবর্ত্তন, ক্রমোন্নতি ও ধ্বংশের অধীন হইয়া আছে। জড়জগতের ন্যায় জীব জগত, সুতরাং মানুষও এই নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। মানুষের বুদ্ধিই বল, আর মনই বল, কি স্বাধীন ইচ্ছাই বল, সমস্তই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কার্য্য মাত্র। সুতরাং আমাদের মন, বুদ্ধি বা কার্য্য যে

নিয়মাবলীর বশে চালিত, তাহা যতদূর স্থির করিতে পারা যায়—ততই আমরা মনুষ্য চরিত্র বুঝিতে ও আয়ত্ব করিতে পারি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের যে পরিমাণে সেই জ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানাদি শিক্ষার দ্বারা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে আমরা সে নিয়ম গুলিকে আয়ত্ব করিতে পারিয়া, মানুষ ও মনুষ্যচরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব অধিক বুঝিতে পারিতেছি।

নভেলের তৃতীয় প্রকার চরিত্র চিত্র, এই জ্ঞান বৃদ্ধির ফল। এইপ্রকার চরিত্র চিত্রে, মনুষ্য-চরিত্র সংগঠনকারী শক্তি-গুলির স্ফূর্ত্তি করা ও তাহাদের ক্রিয়া বুঝাইয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রকার চরিত্র চিত্রের ন্যায়, ইহাতে কোন একটী বিশেষ চরিত্র লইয়া ঘটনাবলীর সম্মুখে সেই চরিত্র ধরিয়া সুধু তাহার কার্য্য দেখান ও তাহাতেই চরিত্র স্ফূর্ত্তি করা হয় না। ইহাতে কোনরূপ ঘটনা দ্বারা কোন্ প্রকারের চরিত্র সংগঠিত হয়, কোন্ ঘটনা দ্বারা কোন্ প্রকারের চরিত্র কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, আর কিরূপে চরিত্র সংগঠিত হইলেই বা কোন্ কোন্ ঘটনার দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, এই প্রকার চরিত্র চিত্রে তাহাই দেখান হইয়া থাকে। কোন বিশেষ চরিত্রের উপর ঘটনা বা অন্যরূপ চরিত্রের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে যে ফল উৎপন্ন হয়, এবং এই চরিত্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়াই এইরূপ চরিত্র চিত্রের উদ্দেশ্য। ইহাকে আমরা এক কথায় চরিত্রের বিশ্লেষণ বা (Analysis) বলিতে পারি। আমরা এ কথা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। মনে কর, একজন লোক বড় অসৎ, বড় মিথ্যাবাদী ও বড় স্বার্থপর। সে লোক কি কি কারণে এরূপ চরিত্রের হইয়াছে, তাহা অগ্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এগুলি অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির হইলে, তবে আমরা সে চরিত্রের উপর অন্য ঘটনার ফল কি, তাহাদের দ্বারা সে চরিত্র কিরূপে এবং কোন্‌দিকে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ঘটনা ও অন্য চরিত্রের সহিত ঘাত প্রতিঘাতে তাহার কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিব। কোন্ ঘটনায় সে চরিত্র সৎপথে পরিচালিত হয়, কোন্ ঘটনাদ্বারা তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক অসৎ হইয়া পড়ে, তাহা দেখিব। এইরূপে চরিত্র সংগঠন এবং সংগঠিত চরিত্রের উপর ঘটনাবলীর প্রভাব দেখাইয়া দেওয়াই তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্র করিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

গতিবিজ্ঞান (Dynamics) হইতে একটী উপমা দিলে, বোধ হয় এ কথাটী বিশদ রূপে বুঝা যাইবে। যখন কোন শিলা খণ্ডকে বেগে নিক্ষেপ করা যায়, তখন যদি তাহার উপর আর কোন শক্তির আকর্ষণ না থাকে, তবে তাহা বরাবর সমভাবেই সেই শক্তি-প্রদত্ত গতিবলে চলিতে থাকিবে। তখন যদি তাহার উপর অন্য কোন শক্তি কার্য্য করে, তবে তাহার পূর্ব্ব গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া, উভয় শক্তির সম্মিলনে তাহার নূতন গতি হইবে, নূতন নূতন শক্তির প্রভাবে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। মানুষের পক্ষেও এই নিয়ম। প্রথম অবস্থায় নানাবিধ কারণে তাহার যে চরিত্র সংগঠিত হয়—তাহা বিভিন্ন ঘটনা বশে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যখন অল্প ভারযুক্ত শিলাখণ্ড অধিক বেগবতী হয়, অথবা নানা শক্তি প্রভাবে তাহার গতি অত্যন্ত

তির্য্যক হইয়া পড়ে, (বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা, কোন পদার্থের উপরে দুই অপেক্ষা অধিক শক্তির আকর্ষণ থাকিলে তাহার গতি এত তির্য্যক হয় যে, তাহা নিদ্ধারিত করিতে পারেন না) তখন সামান্য শক্তি তাহার গতি অধিক পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সেই রূপ, কোন গুরুভার পদার্থ, অল্প বেগবতী হইলেও, তাহার প্রভাব ও শক্তি এত অধিক হয় যে, সামান্য শক্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। পৃথিবীর ভার অত্যন্ত অধিক, সুতরাং সূর্য্যের আকর্ষণ এবং তাহার কেন্দ্র-বহির্মুখী শক্তিবলে যে গতি ও যে পথ স্থির হইয়াছে, সামান্য গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু একটী উল্কাপিণ্ড যখন যে গ্রহ বা উপগ্রহের নিকটবর্ত্তী হয়—তখনই তাহার আকর্ষণে অভিভূত হইয়া পড়ে। মানুষের অবস্থাও প্রায় এইরূপ। যখন তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি অধিক থাকে, অর্থাৎ যখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তি স্বভাবতই অধিক তেজস্বিনী থাকে, তখন সামান্য ঘটনা তাহাকে অধিক বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু তাহার মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি অল্প তেজস্বিনী থাকিলে, সে অতি সহজেই বিচলিত হয়।

সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রে, প্রথমে চরিত্রের অন্তর্ভূত শক্তির পরিমাণ করা হয়, তাহার অন্তর্ভূত শক্তির কারণগুলি অনুসন্ধান করা হয় এবং সেগুলি দেখাইতে পারিলেই সে পরিত্রের উপর ঘটনাবলীর প্রভাব সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। জড় বিজ্ঞানে, যেমন কোন গতিশীল পদার্থের শক্তি স্থির করিতে হইলে, অগ্রে তাহার ভারের পরিমাণ করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার গতির পরিমাণ করিতে হয়—চরিত্র-বিজ্ঞানেও সেইরূপ অগ্রে চরিত্রের অন্তর্ভূত শক্তির পরিমাণ করিতে হয়, পরে তাহার উপর ঘটনারাশির প্রভাব দেখাইতে হয়। এই জন্য আমরা এরূপ চরিত্র চিত্রকে চরিত্রের বিশ্লেষণ বা(analysis) বলিতে পারি।

এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্র আবার সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর চরিত্র চিত্রে সাধারণ অর্থাৎ সংসারে সচরাচর যেরূপ পাওয়া যায়, এরূপ চরিত্র চিত্র করা হয়—সেইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রে কাল্পনিক চরিত্র এবং ঘটনাবলীর দ্বারা তাহারই স্ফূর্ত্তি করা হয়। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর চরিত্রকে সাধারণ বা (realistic) চরিত্র, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রকে কাল্পনিক বা (idealistic চরিত্র চিত্র বলা যাইতে পারে। সেইরূপ তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রকেও আমরা দুই ভাগে বিভাগ করিতে পারি,—একপ্রকার চরিত্র চিত্রে সাধারণ চরিত্র লইয়া, অর্থাৎ সচরাচর সমাজে যেরূপ লোক পাওয়া যায়, সেরূপ চরিত্র লইয়া তাহার সংগঠন বা (development) এবং তাহার কার্য্য দেখান হয়। ইহাকেও আমরা (realistic) বা প্রকৃত চরিত্র চিত্র বলিতে পারি। ইহাই বাস্তবিক চরিত্রের বিশ্লেষণ বা (analysis)। সংসারে সচরাচর যেরূপ লোক পাওয়া যায়, তাহারা কিরূপ অবস্থাবশে সেরূপ হইয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করা, তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইরূপ প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা কোন্ প্রকার অবস্থার দ্বারা কিরূপ চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহা স্থির করিয়া অথবা (analysis) দ্বারা চরিত্র সংগঠনকারী শক্তিগুলি জানিতে পারিয়া, সেই শক্তি গুলির সাহায্যে, কাল্পনিক বা idealistic চরিত্র সংগঠন করা আর এক শ্রেণীর নভেলের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক ইহা চরিত্রের (synthesis) সংগঠন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ন্যায়শাস্ত্রে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে যেমন বিশেষ সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা সাধারণের সত্য নির্ণয় induction করা হয়, তাহার পর আবার যেমন অন্য বিশেষ সত্য স্থির করিতে হইলে সেই সাধারণ সত্য অনুসরণ করিয়া অনুমান দ্বারা সে বিশেষ সত্যের সত্ত্ব স্থির করিতে হয় deduction, সেইরূপ এশ্রেণীর চরিত্র চিত্রেও সাধারণ চরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা চরিত্র সংগঠনোপযোগী শক্তিগুলি নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে আবার কাল্পনিক চরিত্র চিত্র করা হয়। সুতরাং এ শ্রেণীর চরিত্র চিত্রে প্রথমে সাধারণ বা realistic চরিত্র চিত্রিত হইবার পর, দ্বিতীয় প্রকারের অথবা কাল্পনিক চরিত্র চিত্রিত হওয়াই অধিক যুক্তি সঙ্গত।

আজ কাল বিলাতী নভেল এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্র লইয়াই সচরাচর লিখিত হইতেছে। সাহিত্য জগতে নভেল সম্বন্ধে যদি বিবর্ত্তবাদ বা ক্রমোন্নতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে যে নভেলে এরূপ চরিত্র চিত্রই অধিকতর আদৃত হইবে, তাহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। বাস্তবিক উৎকৃষ্ট নভেলে এক্ষণে এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রেরই আধিক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডে থেকারি ও ডিকেন্স প্রথমে এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করেন ও সাধারণ চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে—তাহাদের কার্য্য-প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে আরম্ভ করেন, বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের পূর্ব্বে এরূপ চরিত্র দেখাইতে কোন নভেল-রচয়িতাই বিশেষ রূপে চেষ্টা করেন নাই। স্কট, লিটন, স্যাণ্ড বা ডুমা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র আঁকিয়া তাহাদের কবিত্ব ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। থেকরি ও ডিকেন্স সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, একেবারে নূতন পথের অনুসরণ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা জর্জ্জ ইলিয়টই এ পথে অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কোন প্রসিদ্ধ বিলাতী সমালোচক বলিয়াছেন, সেক্ষপীয়রকে বাদ দিলে, জর্জ্জ ইলিয়টের ন্যায় কেহই চরিত্র চিত্রে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করেন নাই। তিনিই এই শ্রেণীর কাল্পনিক চরিত্র চিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার লিখিত ডেরোণ্ডা ও মিড্‌লমার্চ চিরকালই সাহিত্য জগতে প্রধান নভেল ও উৎকৃষ্ট চরিত্র-বিজ্ঞান কলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

নবলীলা।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরলধারিণী—বিপদের কোলে।

সন্ন্যাসী বিনোদ শান্তিপাহাড়ে শান্তি-রাজ্য-শাসনের ভার পাইলেন। উদাসীনতায়—আসক্তি,প্রেমে—কর্ম্ম মিশিল। প্রথমে জ্ঞান, পরে উদাসীনতাময় প্রেমের অঙ্কুর, পরে কর্ম্মশীলতার প্রবল স্রোত, দৈব বিড়ম্বনায়, বিনোদের হৃদয়কে অধিকার করিল। ক্ষেত্র পাইয়াছি, কার্য্য করিব;—ভগবতীর রাজ্যে খাটিয়া মায়ের চরণ-পূজার সাধ মিটাইব, এই ইচ্ছা জন্মিল। জ্ঞান, প্রেম, ও কর্ম্ম, এই তিন যখন জোট বাঁধিয়া বিনোদকে ধরিল, তখন উনাসীনতা—অলসতা ভয়ে জড়সড় হইয়া পলায়ন করিল;—কর্ত্তব্যের প্রবল স্রোত সর্ব্বশরীরে বহিতে লাগিল। ঘটনা-পীড়নে, সন্ন্যাসী সংসারী হইলেন, উদাসীন কর্ম্মশীল হইলেন। সাধু-ইচ্ছার রাজ্য বুঝি এমন করিয়াই বিস্তৃত হয়। এণ্ডারসনের ঐকান্তিক ইচ্ছার রাজ্য, বিনোদের প্রাণে, সহজ ও সরলভাবে বিস্তৃত হইল। মঙ্গলময়ের রাজ্যে কেবল ইচ্ছারই জয়। ইচ্ছার সহিত সংগ্রামে পৃথিবীর সকল শক্তি পরাস্ত। ইচ্ছার সাধনা করিয়া দেখ, মানুষ, তোমার সকল অসাধ্য সাধিত হইবে। ইচ্ছাকে অসৎবৃত্তির সহিত, মানুষের কূট-বুদ্ধি-প্রসূত বাসনার সহিত মিলাইও না। ইচ্ছা, মঙ্গলময়ের মঙ্গল-দূত, মানুষের নহে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা মানুষের প্রাণে অবতীর্ণ হইলে, ইচ্ছার কার্য্য জগতে অপ্রতিহত হইল। অসংখ্য মানব-সন্তানের ভার গ্রহণ প্রভাবে হইবেই হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল ইচ্ছারই জয়। ইচ্ছাতেই সৃষ্টি—ইচ্ছাতেই স্থিতি। স্বর্গের ইচ্ছা স্বর্গ ছাড়িয়া মানুষের প্রাণে যখনই উদিত হইতেছে,—তখনই পৃথিবীতে তাহার কার্য্য অপরাজিত প্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে। ইচ্ছাতে অমঙ্গল নাই, দুর্নীতি নাই, অসৎভাব নাই—পৃথিবীর দূষিত বায়ু নাই। এণ্ডারসনের সৎ ইচ্ছার কার্য্য, অলক্ষিত ভাবে, বিনোদের জীবনে সম্পন্ন হইতে লাগিল যখন, তখন বিনোদ বুঝিলেন, তাহার পূর্ব্বের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল; কিন্তু চেষ্টা করিয়া আর সে স্বভাবের গতিকে প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা হইল না। যাহা হইবার, তাহা হইতে লাগিল;—সাধু-ইচ্ছার মঙ্গলময় রাজ্য বিস্তৃত করিয়া,বিনোদ বিষম ভাবনার মধ্যে পড়িলেন। ভাবনাতে কার্য্যের প্রবল স্রোত থামিবার নহে—দ্বারে অসংখ্য ভিক্ষুক, দান করিতেই হইবে; নিকটে অসংখ্য রোগী, ঔষধ দিতেই হইবে। ভাবনার পরেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। চেষ্টার সহায়,জিতন ও ফেলাই সিংহ। উভয়ে, দাসানুদাসের ন্যায়, বিনোদের সাহায্য করিতে লাগিল। অতি গোপনে, বিনোদের চেষ্টার ফল প্রসূত হইতে লাগিল। প্রেমের অবতার, শান্তির অবতার হইলেন। প্রেম আর শান্তির লীলা, একত্রে বিস্তৃত হইতে লাগিল;—পশু সদৃশ অগণ্য, অসংখ্য পাহাড়ীদের রক্ত-পিপাসা একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতে লাগিল। বিনোদের চেষ্টায়, সাহেব-ঘৃণা, সাহেব-বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। পরস্পরের উন্নতির জন্য, সকল পাহাড়ীর প্রাণে কেমন একটা টান জন্মিল। তীর ধনুক রাখিয়া, অনেকে লাঙ্গল ধরিয়া

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বিনোদের ভাবনা-মেঘাবৃত চেষ্টায় প্রভূত ফল ফলিল। ভাঙ্গা-জীবনে শুভ ইচ্ছার ফল ফলিল। বিনোদ খাটিয়া সুখী হইলেন, পরিশ্রম করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমেতে ও শান্তিতে পাহাড়কে শাসনে রাখিতে লাগিলেন।

সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর পর হইতে, পাহাড়ীরা আর অত্যাচার করিতে প্রান্তরে নামিল না। এমন নিভৃত অরণ্য-বেষ্টিত পাহাড়ের মধ্যে তাহারা বাস করিতে লাগিল যে, অল্প সংখ্যক ইংরাজেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিল না। বৃক্ষের উরে বৃক্ষ, পাহাড়ের উপরে পাহাড়,—অসংখ্য বৃক্ষশ্রেণী, অসংখ্য পাহাড়শ্রেণী। সংক্ষিপ্ত পথ ইংরাজেরা জানে না, পাহাড়ের গায়ে উঠিতে তাহারা তত অভ্যস্ত নহে। একে অনভ্যস্ত,তাতে সাহেবদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প,—তাতে পথশূন্য পাহাড়ের গায়ে উঠিতে সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়; কারণ পদস্খলন হইলেও মৃত্যু, উর্দ্ধ হইতে পর্ব্বত-খণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইলেও মৃত্যু। মৃত্যুর ভয়ে, অল্পসংখ্যক সাহেবেরা, প্রাণ মনে অত্যাচারীদের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। কিয়দ্দিবস পরে, সংবাদ পাইয়া, স্থানান্তর হইতে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য, দর্পে মেদিনীকে কাঁপাইয়া, দলে দলে পৌঁছিল। অশিক্ষিত পাহাড়ীদের অত্যাচার প্রশমিত করিতে, অনেক দুর্দ্দম্য সুশিক্ষিত সৈন্য পৌঁছিয়া ছাউনি পুতিল। ইরাজ প্রতাপে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল।

সেই রাত্রে বিনোদ যখন ফেলাই সিংহের সহিত চলিলেন, তখন জেলী বিনোদের অকৃতজ্ঞ চরিত্রের কথা ভাবিলেন, ভাবিয়া মনে মনে বিনোদকে অনেক গালিগালাজ দিলেন। ঘটনার সূক্ষ্ম কারণ না জানিতে পারিলে যাহা হয়, তাহা হইল। অভিপ্রায়ের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিলে যাহা হয়, তাহা হইল। বিনোদ যে উদ্দেশ্য-কল্পনায় আঁকিয়া ফেলাই সিংহের সহিত চলিলেন, জেলী তাহা বুঝিল না,মানব সমাজের অসংখ্য একদেশদর্শী লোকের ন্যায়, জেলী সেই ঘটনা হইতে,আপন প্রবৃত্তি ও চিন্তা অনুসারে, কূট ভাব বাহির করিলেন। হিংসার দুর্দ্দম্য তাড়নায়, মানুষ আর মানুষের ভালভাব গ্রহণ করিতে পারে না। এ দেশী লোকেরা ভাল, ইহা জেলীর প্রাণে কখনই সহিত না। স্বামীর ভালবাসা যখন বিনোদের হৃদয়কে স্পর্শ করিল, তখন জেলীর হিংসা হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে গুপ্ত ভাবে আসন গাড়িল,—বাহির হইল না। জেলী, অতি কষ্টে কোন প্রকারে স্বামীর মন যোগাইয়া চলিতেন। এণ্ডারসন জেলীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু কি করিবেন, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে, অন্যান্য সাহেবদের ন্যায়,তাঁহার ইচ্ছা হইল না। হিন্দু-দেব ভাব, পাশ্চাত্য পশুভাবকে পরাস্থ করিয়াছে,—এণ্ডারসন দুর্ব্যবহারে মগ্নপীড়িত হইয়াও জেলীকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই ভাবে এক প্রকারে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। এ দেশের সকল লোকের প্রতিই জেলীর যে আন্তরিক ঘৃণা,—সে ঘৃণা বিনোদের প্রতিও ছিল। বিনোদের প্রতি যে ঘৃণার ভাব ছিল, তাহা অতি গুপ্ত স্থানে পোষিত হইতেছিল। এত দিন পরে, তাহা বাহির হইয়া পড়িল। বাঙ্গালী নরাধম জাতি—চরিত্র-হীন,অকৃতজ্ঞ, পশু;—জেলী আজ বিনোদের কৃতকার্য্যের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া, এমনি করিয়া মনে মনে গালি দিল। যে বিষ এত দিন হৃদয়ে পোরা ছিল, তাহা এই ঘটনায় বাহির হইল। বিষে

সর্ব্বশরীর জর্জ্জর হইল—এমন অকৃতজ্ঞ নরাধম বাঙ্গালীকে স্বামী, বন্ধুত্বে বরণ করিয়া, বিল সেঁচিয়া পচাজল পুকুরে আনিয়া ইংরাজকুলে কলঙ্ক লেপিয়াছেন, মনে হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল সিদ্ধান্ত হইল। এমন কৃতঘ্নের প্রতিশোধ না লইলে ইংরাজকুলে কলঙ্ক পড়িবে, ইহাও মনে জাগিল। জেলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটী বন্দুক লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দস্যুরা অনেকদূরে গিয়াছে। দেখিয়া হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। আর অবসর দেওয়া উচিত নহে, নিমেষের মধ্যে ইহা ভাবিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া জেলী দস্যুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

ফেলাই সিংহের দল পাহাড়ের পদতলে উপস্থিত হইতে না হইতে, জেলীর ঘোড়া তাহাদিগের অতি নিকটে উপস্থিত হইল। অতি নিকটে আসিয়া, জেলী ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন, ঘোড়ার পদশব্দে দস্যুরা জানিতে পারিবে ভাবিয়া, জেলী মাটীতে অবতরণ করিয়া, ঘোড়াকে বাঁধিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন ফেলাই সিংহের লোকেরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিল, তখন, জেলী বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন। কি করিবেন, যাইতেই হইবে, প্রতিহিংসার তাড়নে জেলী অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দস্যুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তভাবে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের ক্রম-উচ্চ স্থানে উঠিতে তত কষ্ট হইল না; ক্রম-উচ্চ স্থান ধরিয়া, বহু বহু অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া জেলী অনেক দূর উঠিলেন। ক্রমে পাহাড়ের অংশে ঘনীভূত জঙ্গল, সেই অংশে উপস্থিত হইলেন; সে অংশে পাহাড় ঊর্দ্ধদিকে লম্বভাবে অনন্ত আকাশকে ভেদ করিয়া উঠিয়াছে—চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অরণ্য—আকাশের চন্দ্রের আলোক অতি কষ্টে স্থানে স্থানে প্রবেশ করিতেছে;—ভীষণ দৃশ্য। পাহাড়ীরা অক্লেশে উঠিতে লাগিল;—বিনোদকে তাহারা ধরাধরি করিয়া তুলিতে লাগিল। জেলীর পা আর উঠিতে চায় না—হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—সর্ব্ব শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে; ক্লান্ত কলেবর লইয়া জেলীর চলিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ক্লান্তিমাখা কলেবর লইয়া, প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, তবুও উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টার ফল ভাল হইল না—হতভাগিনী লম্বস্থানে উঠিতে না পারিয়া, পদস্খলিত হইয়া, নিম্নে পড়িয়া গেল। পাহাড় হইতে পড়িলে কি দুর্দ্দশা হয়, যাঁহারা কখনও পাহাড় দেখেন নাই, তাঁহারা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। হতভাগিনী, ঊর্দ্ধ হইতে বৃক্ষে ঠেকিতে ঠেকিতে, শব্দ উৎপন্ন করিয়া নিম্নে পড়িতে লাগিল। সে শব্দ, বৃক্ষের পত্র ভেদ করিয়া, নৈশগগনে বিস্তৃত হইতে লাগিল। সে শব্দতে প্রথমে হতভাগিনীর আর্ত্তনাদের শব্দ মিশ্রিত ছিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই হতভাগিনীর বাকশক্তি রুদ্ধ হইল—চেতনা বিলুপ্ত হইল। সেই ভাবে পড়িতে পড়িতে, সর্ব্ব শরীর দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল,—আঘাত লাগিতে লাগিতে অনেক স্থানের চর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হইল—পড়িতে পড়িতে, হতভাগিনী অবশেষে এক বিস্তৃত জঙ্গলে ঠেকিয়া রহিলেন। ফেলাই সিংহের দলের লোকেরা ইহার কিছুই সংবাদ পাইল না।

ক্রমশঃ।

মানুষের স্বাধীনতা ও অধীনতা।

"I know no wisdom but that which reveals man to himself, and which teaches him to regard all social institutions, and his whole life, as the means of unfolding and exalting the spirit within him."

W. E. Channing, D. D.

বড় সুসময়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভারতের অতীত সভ্যতার নির্ব্বাপিত স্মৃতিচিহ্ন আমাদের পশ্চাতে, বর্ত্তমান সভ্যতার চরমোৎকর্ষের উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে। এক, পশ্চাৎ হইতে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া দিতেছে,—অন্য, সম্মুখ হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা অতীতের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া, সম্মুখের টানে আকৃষ্ট হইয়া, কেবলই অবিরত চলিতেছি। স্মৃতিতে জাগিতেছি, সম্মুখের চিত্র ধরিয়া চলিতেছি। এই যে আমরা, জাগিয়া অবিরত অনন্ত উন্নতির দিকে ছুটিয়াছি, আমরা অধীন না স্বাধীন? এই বিষয় সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও অনেক কথা বলিয়াছেন; আমরা উভয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই কূটপ্রশ্ন সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি; সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

স্বাধীনতা শব্দটা, এত বাহুল্যরূপে, এত সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার মূল কি, মূল কোথায়, ইহা নির্দ্ধারণ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক মানুষ স্বাধীন কি না?—স্বাধীনতা বাহিরের কোন পদার্থ, না ভিতরের জিনিস?—এ তত্ত্বের গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, অনেকেই "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া অধীর হইতেছেন, এবং অধীনতাকে স্বাধীনতা, স্বাধীনতাকে অধীনতা বলিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিতেছেন। গভীর চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ আজ পর্য্যন্ত যে তত্ত্বের সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন নাই, বাহুল্যরূপে সেই তত্ত্ব লইয়া চিন্তাশূন্য আন্দোলন করা কি বিধেয়?

উন্নতির এই চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াও "মানুষ কি", এ তত্ত্বের পরিষ্কার মীমাংসা হইল না। আমি কি, তুমি কি?—বল ত ভাই, তুমি কি?—তুমি যতই চিন্তাশীল হও না কেন, এ অতলস্পর্শ গভীর মানুষ-সাগরকে মন্থন করিবে, তোমার সে সাধ্য নাই। এ সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিতে পার, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মানুষের আদি কোথায়?—মানুষের শেষ কোথায়?—কে জানে, কে বলিতে পারে? সৃষ্টি-প্রকরণের আদিতে কি, শেষে বা কি, কে স্থিররূপে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে? আমার তত্ত্ব আমি যদি কিছু জানিয়া থাকি, তবে তাহা এই—আমি আছি। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোন্ অনন্তে যাইব, জানি না। জোর করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া যাহা নির্ণয় করি, সে সকলই কল্পনার ছায়ায় চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়। আমি আছি—আমি উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি,—ইহা বই আত্ম-তত্ত্ব আর কিছুই জানি না। কেন আছি, কেন চলিয়াছি, জানি না। আমি কে, তাহাও জানি না। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া

কত সময়ে ভাবিয়াছি—আমি কি? আমার গুরু যিনি, তাঁহাকে আঁধারে পাইয়া ব্যাকুল প্রাণে কত বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বল দেব, —আমি কি? কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল না। শরীর প্রভৃতি যে আমি নই, তাহা বুঝিয়াছি, কারণ শরীর যখন মাটীতে মিশাইয়া যায়, তখন শরীর হইতে আমি পৃথক হই। যদি পৃথক না হইব, তবে শবে ও আমাতে এত প্রভেদ কেন? জীবিত ও মৃত, একই রূপ হইল না কেন? শরীর হইতে আমি পৃথক, তাহা জানিয়াছি; কিন্তু বুঝিতে পারি না, আমি কে, আমি শরীরের কোন্ স্থানে আছি। আমি কে, তাহাই যদি না জানিলাম, তবে আমার স্বাধীনতা কোথায়, কেমনে জানিব? পাঠক বলিতে পার, আমি কি?

পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষ, অনন্তের বিন্দু। অনন্তে মানুষের আরম্ভ, অনন্তে মানুষের শেষ। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম,—অনন্ত শক্তির বিন্দু—ক্ষুদ্র মানুষ। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও, এ সংজ্ঞা অপেক্ষা তাহার আর উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা পাইবে না। আত্মা বল, মন বল, যাহা বল, সে সকলই শক্তির বিন্দু মাত্র। আত্মাকে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই ভাবিবার বা বুঝিবার সাধ্য নাই। শরীর কিছুই নহে—কেবল জড়ের খেলা। জড় কিছুই নহে, কেবল শক্তির ক্রীড়া। জড় কিছুই নহে—কেবল মায়ার লীলা। জড় ও আত্মা, উভয়ই শক্তি। শক্তি অনন্ত; এই দুই অনন্ত শক্তির বিন্দুর মিলনই মানুষ। কেবল জড়-শরীর মানুষ নহে, কেবল আত্মাও মানুষ নহে। এই যে শরীর, আত্মাশূন্য হইলে আর ইহা টিকে না। জড়-শরীরের সহিত জগতের যোগ, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ। মানুষ জড়ের ভিতর দিয়াও শক্তি পাইতেছে, আত্মার ভিতর দিয়াও পাইতেছে। জড়-শরীরের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, ভোগ-বিলাস—এ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জড়-রূপ ধরিয়াছে। সুখ, সুখ নয়; এই দুঃখও দুঃখ নয়। একের দুঃখ অপরের নিকট সুখ; একের বিপদ, অপরের সম্পদ। তুমি গোলাপ ফুলের যে বর্ণ দেখিয়া মোহিত হইতেছ, যে ঘ্রাণ-সুখে উন্মত্ত হইতেছ,—ইন্দ্রিয়ের একটু তারতম্যে, ঐ বর্ণ, আর ঐ ঘ্রাণ-সুখ, অপরের হৃদয়ে দুঃখের ঘোরতর কালিমা ঢালিতেছে। এই জন্য কেবল ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধান্ত পৃথিবীতে কখনই ঠিক হইল না। এক জন যাহাকে ভাল বলিতেছে, অপরে তাহাকেই মন্দ বলিতেছে। জিনিস এক—অথচ লোকে ভাবে, পৃথক পৃথক। শক্তি এক,—রূপ পৃথক—ভাব পৃথক। একতায় যেন স্বাতন্ত্র্য মিশিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান নির্ণয় করিতেছেন—মানব-শরীরের অস্থি মাংস স্নায়ু ও শিরার সংখ্যা সর্ব্বত্রই সমান,—অথচ মানুষের রূপ দেখিতে কত বিভিন্ন প্রকারের—এক অখণ্ড উপকরণে প্রস্তুত হইয়াও, মানুষ কত পৃথক পৃথক। মানুষের ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার সিদ্ধান্তও এমনি করিয়া পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে। তুমি এক জনের মধ্যে যে গুণ দেখিয়া তাহাকে স্বর্গের উপযোগী ভাবিতেছ, আমি তাহার সেই গুণের পরিবর্ত্তে আর একটী দোষের অঙ্কুর দেখিয়া তাহাকে নরকে ফেলিতেছি। একজন সুধা হইতে গরল বাহির করিয়া পান করিয়া মজিতেছে, আর একজন গরলকে সুধা করিয়া ধরিয়া স্বর্গে উঠিতেছে। একই পদার্থ, একই জিনিস হইতে ভিন্ন ভিন্ন

ফল বাহির হইতেছে। এতই স্বাতন্ত্র্য, এই জগতের শিরায় শিরায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ, একতার ভিতরে থাকিয়াই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন, প্রলোভন নামক কোন জিনিস পৃথিবীর বাজারে নাই। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর কোন দ্রব্যই মানবের অপকারী নহে। বাস্তবিকও তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। সকলই মানুষের উপকারী—সকলই মঙ্গল। বাহিরের সকলই মঙ্গলজনক, মানুষের ভিতরেই যত কিছু গলদ। ভিতরের ভাব-তারতম্যে—একজনের পাপ, অপরের পুণ্য; একের পুণ্য, অপরের নিকট পাপ বলিয়া বোধ হইতেছে। মানুষের ভিতরে যেমন চশমা লাগান রহিয়াছে, মানুষ তেমনই দেখিতেছে। ভিতরের তারতম্যানুসারে—এক বস্তু, এক জীবনের উন্নতির সহায় হইতেছে, আর একের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। পাপবীজ মানুষের ভিতরে—বাহিরে নহে। ইচ্ছাতেই পাপ—নচেৎ পাপ নামে আর কোন পদার্থ এই পৃথিবীতে নাই। বাহিরে যাহা কিছু রহিয়াছে, সকলই মঙ্গল সাধনের জন্য। মঙ্গলময়ের রাজ্যে, অমঙ্গল সাধনের জন্য কোন দ্রব্যই সৃষ্ট হয় নাই। সকল সৃষ্ট বস্তু, অবিরত, কেবল মঙ্গলই সাধন করিতেছে। মানুষই, মঙ্গলকে সময়ে সময়ে অমঙ্গল করিয়া তুলিতেছে। কেহ, আমার মঙ্গল করিতেছে; কেহ, তোমার মঙ্গল করিতেছে। শিক্ষা, অবস্থা, ও দেশ কালানুসারে, কেহ আমারই মঙ্গল করে, আর কেহ তোমারই মঙ্গল করে। আমরা অবিরত মঙ্গলের মধ্যে বাস করিতেছি।

প্রকৃতি, স্বাতন্ত্র্যে বিভূষিত হইয়া, স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ মানুষকে কেবলই দিতেছে। আমরা অবিরত পাইতেছি। দিবার জন্যই জগতের সৃষ্টি, নিবার জন্যই যেন আমার সৃষ্টি। প্রকৃতি দিতেছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃতির অধীনতায় কাতর হইয়া আমি আপন প্রকৃতি অনুসারে, আপন পথে চলিতেছি। অথবা প্রকৃতি যখনই আমার স্বাতন্ত্র্যকে ডুবাইতে চাহিতেছে, তখনই আমার পথে আমি চলিতেছি। মানুষের তবে দুইটী অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির দান, অবনত মস্তকে, মানুষ, কখনও গ্রহণ করিতেছে, আবার কখনও উন্নত মস্তকে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য-নিমগ্নকারী উপহারকে তুচ্ছ করিতেছে। মানুষ, একবার প্রকৃতির অধীন, আর একবার স্বাধীন। প্রকৃতির দান গ্রহণে, মানুষের বশ্যতা বা অধীনতা;—প্রকৃতিকে বিকৃতিতে পরিণত করা বা মানুষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাতে, মানুষের স্বাধীনতা। খুব নিগূঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাই বোধ হইবে—মানুষ অধীন, আবার মানুষ স্বাধীন। মানুষ প্রকৃতির দান চায়, মানুষ আপন পথও চায়। মানুষ—একতাও চায়, স্বাতন্ত্র্যও চায়। সৃষ্টি-সিন্ধুতে ডুবিয়া মিলিয়া, তবে মানুষ স্বাতন্ত্র্য পাইতেছে। অধীনতা না থাকিলে অন্যের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, স্বাধীনতা না থাকিলে আপন ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অধীনতা—একতার মূল; স্বাধীনতা—স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বের মূল। অধীনতা—প্রেম; স্বাধীনতা—জ্ঞান। প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বিদূরিত হইলেই উন্নতির স্রোত বন্ধ হয়। মানুষ, তাহা সহিতে পারে না। আবার একতা না থাকিলেও স্বাতন্ত্র্যে সৌন্দর্য্য থাকে না; মানুষ, সে অবস্থায় প্রকৃতির নিকট কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারে না। প্রকৃতির স্বাত-

স্ত্র্যেরও পূজা করিব, আপন স্বাতন্ত্র্যকেও রাখিব। প্রকৃতির অধীনতাও স্বীকার করিব, আপন স্বাধীন ভাবকেও রাখিব। প্রেমের সেবাও করিব, জ্ঞানের আদরও করিব। জ্ঞান ভুলিয়া, স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, প্রেমের বা একতার সেবা, কুসংস্কারের সেবা,—জগতে অভ্রান্ত মহাপুরুষের পূজা—নরকভোগ। আবার প্রেম ভুলিয়া, একতা ভুলিয়া—স্বষ্ট জগতকে ভুলিয়া,জ্ঞানেব পথে চলিলে—অহঙ্কার—স্বেচ্ছাচার—নরক ভোগ। উভয়ের পরিণাম একই প্রকার। অধীনতা স্বীকার করিলেই যে অমঙ্গল আসিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে, এ কথার মূলে গভীর চিন্তা নাই। আবার স্বাধীন হইলেই যে সকল সময়ে স্বর্গ-সুখ পাওয়া যায়,তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে। অধীনতা-বিহীন স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচার; আবার স্বাধীনতা-বিহীন একতা—নরক। ঈশ্বরের দান, সকলই সমান। আমি আপন ব্যক্তিত্ব রাখিতে যাইয়া অন্যকে ভুলিব না; আবার অন্যের সম্মান করিতে যাইয়াও আপনাকে বিস্মৃত হইব না। অদৃশ্য রাজ্য হইতে, গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, যখন মায়ের কোলে, শক্তির বিন্দু—আমি, অবতীর্ণ হইলাম, তখন আমি অধীন হইয়া আসিলাম। জগদীশ্বর আমাকে স্বাধীন করিয়া শূন্যে কেন ছাড়িয়া দিলেন না, তাহা জানি না। জন্ম গ্রহণ করিয়া যে প্রকৃতির ভাণ্ডারপূর্ণ বাজারে আসিলাম,সেত ঘোরতর অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য। দেখিলাম, সেখানে কেবলই বিনিময় চলিতেছে। সেখানে অম্লান চিত্তে একে, অন্যের দান গ্রহণ করিতেছে। মাতার ক্রোড়ে শিশু মানব হাসিল, কাঁদিল, নাচিল, গাইল, উঠিল, বসিল,—সকলই অন্যের ইঙ্গিতে। তুমি বল, শিশু স্বাধীন;—আমি বলি, শিশু অধীন এবং স্বাধীন—এ দুই। মা, কেন শিশুর নিকট আসিলেন, কেন শিশুকে কোলে তুলিলেন? শিশুই বা মায়ের উপর নির্ভর না করিয়া, কেন আপনার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিল না? তুমি একদেশদর্শী স্বাধীনতার পক্ষপাতী জীব, বলিতে পার? শিশুর মাথায় বিচার-শক্তি নাই, পায়ে বল নাই,—সে তোমার মত ভাবিয়া চিন্তিয়া, তোমার ন্যায় জীবন পথে চলিতে পারিল না। সে অবোধ, কেবলই মায়ের কোলে পড়িয়া রহিল, আর মায়ের ইঙ্গিত মত কার্য্য করিল; কেন বল ত এ বিড়ম্বনা? শিশু বিষ ধরিয়া মুখে দেয়, মাতার নিষেধে ক্ষান্ত হয়; বিপদের পথে হাটে, জ্ঞানী, উন্নত, শিক্ষিত জননী তাহাকে রক্ষা করেন। আমি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না—মায়ের ঋণ এজন্মে পরিশোধ করিতে পারি নাই। আমার জননী এবং স্বাতন্ত্র্য-পূর্ণ পৃথিবীর প্রত্যেকের অধীন হইয়াই আমি এত বড় হইয়াছি। মায়ের নিকট পাইয়াছি, আত্মীয় পরিজনের নিকট পাইয়াছি, সমাজের নিকট পাইয়াছি,তবেত এতবড় হইয়াছি। সকলেই যেন আমার মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর বাজারকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আমারই উন্নতির জন্য; আমার স্বাতন্ত্র্য তোমারই জন্য। নচেৎ সংসারে এত বৈচিত্র্য থাকিতনা। স্বষ্ট বস্তুর প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ উপকারের কথা, কোন মানুষই অস্বীকার করিতে পারিল না বলিয়া, আজও মানুষ সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। অধীনতায় কত কষ্ট, তবু মানুষ, মানুষের

উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আমি যাহা বুঝি না, তুমি তাহা বুঝ; আমাতে যাহা পাই না, তাহা তোমাতে পাইয়া উপকৃত হই। এই প্রকারে, পৃথিবীর জল বায়ু, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, লতাবৃক্ষ, চন্দ্র সূর্য্য, নরনারী, পণ্ডিত মূর্খ, শিশু বৃদ্ধ—সমস্ত স্বষ্ট বস্তু, ঘোট বাঁধিয়া অকৃত্রিম বন্ধুর বেশে মানুষের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া, কেবলই উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। মানুষ, দাসানুদাস হইয়া, সকলের দান, সকলের সাহায্য ধরিয়া চলিতেছে। যখনই কষ্ট হইতেছে—যখনই সকলের বিশেষ বিশেষ উপদেশ—পরামর্শ—উপকারকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে মানুষ যাইতেছে,—অন্যের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বকে অবহেলা করিতেছে, তখনই পাপ-গরল উৎপন্ন হইয়া তাহাকে ঘোর অন্ধকারে ডুবাইতেছে। সমাজকে তুচ্ছ করিয়া কোন্ মানুষ বড় হইয়াছে? প্রকৃতির সাহায্য না গ্রহণ করিয়া, কে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে? মানুষের সে সাধ্য নাই, কারণ স্বষ্টির সে বিধান নহে। আমি আছি বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র—নরনারী সকলেই আমার নিকটে রহিয়াছে। নচেৎ আমি এসকলের অস্তিত্বকে কল্পনা বলিয়া মনে করিতাম। আমার উপকারের জন্যই, ভাই ভগ্নী—আমার চতুর্দ্দিকে, তোমরা। তোমাদিগকে ধরিয়াই ক্রমে ক্রমে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। নচেৎ অনন্ত, আমার নিকট কেবল স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইত। তোমরা ধন্য, স্বষ্ট সকল বস্তুই ধন্য। আমি তোমাদের গোলাম, দাসানুদাস—ভৃত্য। কত উপকার পাইয়াছি, আরো কত উপকার পাইতেছি;—কেমনে তাহা বিস্মৃত হইবে?—কেমনে অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা ঠেলিয়া ফেলিব! স্বর্গের কেশব, স্বর্গের শ্রীগৌরাঙ্গ, স্বর্গের যিশুখ্রীষ্ট—আমার চতুর্দ্দিকে—আমি পদানত ভৃত্য, দাসানুদাস। মানুষ স্বষ্টি-সিন্ধুর কণা—সকলের দাসানুদাস। অহঙ্কারী মানুষ, অধীনতাতে গরল দেখিয়াছ, সুধা দেখিতেছ না? মানুষ, মানুষকে কেমন অধীন করিয়া, আপনার বস্তু দিতেছে, একবার দেখ। অধীনতাই যে স্বাতন্ত্র্যের পথ পরিষ্কার করিতেছে,—তাহা একবার দেখ। অধীনতা না থাকিলে, আমি আমিত্বে আসিতে পারিতাম না, তুমিও তুমিত্ব পাইতে না। অধীনতাই স্বর্গের প্রশস্ত পথ। সকলেই সকলের অধীন। আদান প্রদান চলিতেছে—সকলে ঘুরিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে, পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিয়া সুখী হইতেছে। স্ত্রী, স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিতেছেন; স্বামী,অম্লান-চিত্তে স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিতেছেন। রাজা প্রজার অধীন, প্রজা রাজার অধীন। প্রজাশক্তির অভাবে রাজশক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকে না। স্বামীর অভাবে স্ত্রীত্ব থাকে না, স্ত্রীর অভাবে স্বামীত্ব নাই। আমার অভাবে তুমিত্ব নাই, তোমার অভাবে আমিত্ব কেবলই কল্পনা। চতুর্দ্দিকে, কেবলই অধীনতার লীলাখেলা দেখিতেছি। পরস্পরের মঙ্গল সাধনই, পরস্পরের লক্ষ্য। তুমি বল, সন্তানের উপকারের জন্য মাতার কোন চেষ্টা করা উচিত নহে, অথবা সন্তানের মতের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত নহে। আমি বলি, বাধ্যবাধকতা না থাকিলে, আদান প্রদান না চলিলে, উন্নতি লাভ করা যায় না,—মাতার উপদেশ ভিন্ন,অবোধ সন্তান

মানুষই হইতে পারে না। অজ্ঞ, বিজ্ঞের কথা শুনিবেই শুনিবে, মূর্খ, জ্ঞানীর কথা শুনিবেই শুনিবে; বোকা, বুদ্ধিমানের কথা মত চলিবেই চলিবে। যাহার যাহা নাই, সে অন্যের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেই করিবে। মানুষ, আপনার ধন অপরকে না দিয়া, এবং অপরের ভালটুকু আপনি গ্রহণ না করিয়া, কখনই সুখী হইতে পারিবে না। এমনই অধীনতার স্রোত চলিয়াছে। রাজার অধীন সমাজ, সমাজের অধীন নরনারী। আবার নরনারীর অধীন সমাজ—সমাজের অধীন রাজা। ব্রত বল, অনুষ্ঠান বল, ঘটনা বল, আর কার্য্য বল, মানুষ সকলেরই অধীন। অধীনতার বিশ্বব্যাপী রূপ, তবে মানুষ, একবার ভাল করিয়া দেখ।

এই যে পরম উপকারী অধীনতা, ইহা তখনই বিষতুল্য হয়, যখন ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করে। স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলেই, অধীনতা, নরক-তুল্য হয়। তোমাদের প্রদত্ত উপকার লইতে লইতে, যখন আমাকে আমি একেবারে ভুলিয়া যাইতেছি—আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতেছি; তখনই অধীনতা আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে। এরূপ স্থলেই মানুষ, একের ভাল ভাবের সহিত মন্দ ভাবও লইতেছে;—গুরু পুরোহিতের সৃষ্টি হইতেছে;—অবতারবাদ ঘোষিত হইতেছে;—স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব হইতেছে; পুরুষত্ব,স্ত্রীত্বে মিশিতেছে;—দিন রাত্রি হইতেছে, রাত্রি দিন হইতেছে। স্বর্গ—নরক হইয়া যাইতেছে! অধীনতা, এই প্রকারে এক এক সময়ে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট করিতেছে। প্রভুত্ব—সকলের ব্যক্তিত্ব নাশ করিতেছে,—অত্যাচারে দেশ পূর্ণ হইতেছে—অশান্তি ও অধর্ম্ম,মানবকে গ্রাস করিতেছে। অতএব অধীনতাই কেবল লক্ষ্য নহে। অধীনতার মূলে স্বাধীনতার অঙ্কুর লুক্কায়িত। মানুষ অধীন হইয়াও স্বাধীন। অধীন হইয়াও, আপনার পথে চলিতে, মানুষ লালায়িত। পদে পদে সাহায্য পাইতেছি বটে, কিন্তু পাইতেছি যে আমি, আমি, পৃথক। সকলের পরামর্শমতে চলিয়া,সকলের উপদেশ শুনিয়া আমি আমিই হইতেছি,—আমি আমারই পথে চলিতেছি। তুমি ও আমি পৃথক। তোমারও স্বাতন্ত্র্য আছে, আমারও আছে। পৃথিবীতে তোমারও কার্য্য আছে, আমারও আছে। তোমার নিকট উপকার পাইয়া,আমাকে যদি তোমার সহিত এক করিয়া দিই, তবেই ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে। যাহা আমাতে নাই, তাহাই তোমার নিকট চাহিব; যাহা তোমার নাই, তাহাই তুমি আমার নিকট লইবে। বিনিময় করিয়া, তুমি তুমিত্বে যাইবে, আমি আমিত্বে ফিরিব। তুমি আমার স্বাতন্ত্র্যকে মান্য করিবে, আমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিয়া চলিব। নচেৎ ভয়ানক বিপদ ঘটিবে,—সৃষ্টির বৈচিত্র্য ঘুচিয়া যাইবে—পৃথিবীর আদান প্রদান-স্রোত থামিয়া যাইবে;—সমাজ উঠিয়া যাইবে। তোমাতে আমিত্ব ডুবাইব না; আমিত্বেও তোমাকে ডুবিতে দিব না। তোমার ভাল লইব বলিয়া, তোমার মন্দ লইব না। অথবা আমার যে বস্তুর অভাব নাই, তাহা তোমার নিকট লইব না। ভাল মন্দ বিচার করিবে, আমার স্বাধীনতার রাজা—বিবেক। আমার রাজা—বিবেককে ভুলিয়া, তোমাতে মজিব না। তুমি শ্রীগৌরাঙ্গই হও, আর তুমি যিশু-খ্রীষ্টই হও, তোমরা পৃথিবীর সুধাপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে যে গরল উৎপন্ন করিয়া আপন বুকে রাখিয়াছ, আমি তাহা লইব না। ভাল বই

তোমাদের মন্দ লইব না। এই খানেই মানুষের স্বাধীনতা। আত্মার যে শক্তি মানুষকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, তাহাই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বাহিরের কোন অবস্থা নহে, ইহা ভিতরের জিনিস। অধীনতা—আসক্তি,—বাহিরের জিনিস; কারণ এই জড়-শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। স্বাধীনতা—মুক্তি, ভিতরের জিনিস,একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা—শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প। আসক্তি আসিলেই মুক্তির প্রয়োজন। আসক্তিতে মানুষকে ডুবায়, স্বাধীনতা মুক্তির পথে লইয়া যায়। আমি স্বাধীন, সেই স্থানে, যেখানে হিতাহিত লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি। অধীন হইয়াও আমি ততক্ষণ স্বাধীন, যতক্ষণ বিবেকের কথা মত চলিতে পারি। তোমার বিবেক ও আমার বিবেক একই প্রকার, কিন্তু অবস্থার তারতম্যে, শিক্ষার তারতম্যে, তুমি হয়ত জ্ঞানের পথে যাইতেছ, আমি হয়ত প্রেমের পথে হাটিতেছি, এরূপ স্থলেই বিবেকের গতি পৃথক পথাবলম্বী দৃষ্ট হয়। মানুষ ভাবিয়া দেখ—এই হিসাবে সকল মানুষই স্বাধীন। তোমার নিকট উপকার পাইয়া,আমি বিবেকের কথামতে কেবল আমিত্বে আসিতেছি। বিবেককে বিসর্জ্জন দিলেই পাপ—আমিত্বকে ডুবাইলেই পাপ। যেখানে বিসর্জ্জন, সেই খানেই পাপ। অধীনতা মঙ্গল—কিন্তু বিসর্জ্জন মঙ্গল নহে। প্রেম—স্বর্গের জিনিস, কিন্তু আসক্তি নহে। কোন কিছুতে আসক্তি হইলেই মজিতে হয়। আত্মবোধ না থাকিলে,মন্দ ভিন্ন ভাল ধরা যায় না। আত্ম বিসর্জ্জনই পাপ। আমি প্রকৃতির অধীন হইয়া,যখন সৃষ্ট বস্তুর মধ্য হইতে সৎ ও মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারিতেছি, তখনই আমি স্বাধীন। অধীনতা ও স্বাধীনতা, একত্রে এক স্থানে বাস করিতেছে। এক বাহিরে, অন্য ভিতরে, এক শরীরকে ধরিয়া আছে, অন্য আত্মাকে ধরিয়া রহিয়াছে। অধীনতা সেই শক্তি, যে শক্তি মানুষকে টানিয়া সংসারে লইয়া শিক্ষা দিতেছে; স্বাধীনতা সেই শক্তি, যে শক্তি মানুষকে সংসার হইতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টানিতেছে। আবার দেখ, স্বর্গের পথেই সংসার; অধীনতা সেই সংসারে রাখিয়া মানুষকে মানুষ করিতেছে, স্বাধীনতা,সংসার-শিক্ষিত মানুষকে ধরিয়া স্বর্গে তুলিতেছে। একত্রে দুইয়ের কার্য্য হইতেছে। সংসার ও স্বর্গ, একত্রে মানুষের প্রাণে অবতীর্ণ হইতেছে। আসক্তির পশ্চাতেই মুক্তি বিরাজমান। যখন এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে,—তখন হয়, মানুষ স্বাধীনতাকে হারাইয়া, সংসারের পূতিগন্ধময় নরকে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া মরিতেছে; না হয়—অধীনতাকে ভুলিয়া সংসার-বিচ্যুত মানুষ, স্বেচ্ছাচারী ও অহঙ্কারস্ফীত হইয়া, স্বর্গের পরিবর্ত্তে কল্পনার পূজা করিয়া বৃথা জীবন ক্ষয় করিতেছে,—উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির সেবা করিতেছে। অধীনতা যখনই বিসর্জ্জন ও আসক্তির পথে মানুষকে লইয়া যায়, তখনই আধ্যাত্মিক শক্তি-স্বাধীনতা,বাধা দিয়া আপন পথে লইয়া আইসে। আবার স্বাধীনতা যখন পথ ভুলাইয়া মানুষকে বাহিরে লইয়া অহঙ্কারে স্ফীত করিয়া তুলে,—এমনই করিয়া তুলে যে, মানুষ আর অন্য মানুষের স্বাতন্ত্র্যজাত মহত্ত্ব দেখিতে পায় না; তখনই মানুষ,স্বেচ্ছাচারী হয়। এই সময়ে অলক্ষিত শক্তির অনন্ত ঢেউ বা ঘটনা, বস্তু বিশেষের ভিতর দিয়া আসিয়া, মানুষের অহঙ্কারকে চূর্ণ করে এবং দাসানুদাস করিয়া

শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতা যখন মানুষকে এতদূর লইয়া যায় যে, মানুষ, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হয়, তখনই স্বাধীনতার স্বর্গীয় ভাব লোপ পায়—তখন বাজারে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বিক্রীত হয়। মানুষ তখন এতই ভুলিয়া যায় যে, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিচার করিবারও আর জ্ঞান থাকে না। বাস্তবিক নিগূঢ় রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাই স্পষ্ট বোধ হয়, অধীনতা ও স্বাধীনতা, উভয়ই মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট। অধীনতা মানুষকে সংসারের পথে লইয়া যাইয়া শিক্ষা দিতেছে; একের ভাল আনিয়া অন্যকে দিতেছে—আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি করিতেছে—সমাজ গড়িতেছে—নিয়মের সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে বাঁধিতেছে; স্বাধীনতা মানুষকে সংসার-আসক্তির পথ হইতে টানিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, সংসার-মুক্ত করিতেছে। মানুষ যখনই বাহিরের সংসার-তরঙ্গে ডুবিতে যাইতেছে, স্বাধীনতা তখনই ভিতরে টানিতেছে। অধীনতা, একতার সৃষ্টি করিতেছে; স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। একতা ও স্বাতন্ত্র্য, উভয়ে মিলিয়া মানবের মঙ্গলসাধন করিতেছে। কেবল একতা, পাপ; কেবল স্বাতন্ত্র্য, মহাপাপ। স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গে একত্ব বোধ থাকা চাই। কেবল অধীনতা, নরক; কেবল স্বাধীনতা, বিষ। শরীর-বিচ্যুত মানবাত্মার বিষয় কল্পনাও করিতে পারি না। সংসার-বিচ্যুত মানবাত্মার উন্নতিও চিন্তার অতীত। স্বাধীনতাকে ভুলিলে, অধীনতা মানুষকে পাপ-আসক্তির পথে লইয়া গিয়া ডুবায়; অধীনতাকে ভুলিলে, স্বাধীনতা, মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে লইয়া বিষ-গরলে দগ্ধ করে। দুই পাশাপাশি থাকিলেই মঙ্গল। শরীরের ভিতরে আত্মা,—শরীরের ভূষণ অধীনতার ভিতরে আত্মার ভূষণ স্বাধীনতা। শরীর ভিন্ন মানুষকে ভাবা যায় না, অধীনতা ভিন্ন স্বাধীনতা যে কি, বুঝাই কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে পৃথিবীতে মানুষের উন্নতি হইত না, স্বাতন্ত্র্য থাকিত না,—সকল একাকার হইয়া যাইত;—আবার অধীনতা না থাকিলে মানুষ, স্বাতন্ত্র্যে যাইয়া অহং জ্ঞানের পূজা করিত—মঙ্গলকে অমঙ্গল করিয়া তাহাতে পুড়িয়া মরিত। অধীনতাকে ভুলিয়া, স্বাধীন মানুষ, পৃথিবীতে কত পাপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কে না দেখিতে পাইতেছেন? আবার স্বাধীনতাকে ভুলিয়া, কত মানুষ, মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া মজিতেছে, তাহাই বা কাহার অবিদিত আছে? অধীনতাকে ভুলিলে, স্বাধীনতা পাপ উৎপন্ন করে; স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিলে, মানুষের অনন্ত উন্নতির স্রোত থামিয়া যায়। এই দুই চাই—দুইকেই রাখিবে। রাখিতেই হইবে। ঈশ্বরের বিধানই এই। আদান প্রদান চলিবে। ক্ষুদ্র মহত্বে মিলন হইবে,—রাজা প্রজা থাকিবে। বাহিরে—অনন্ত সৃষ্ট জগৎ রাজত্ব করিতেছে; ভিতরে ঈশ্বরবাণী বিবেক রাজত্ব করিতেছে। বাহিরে যতক্ষণ আছি, অধীন হইয়া আছি—ভিতরে যখনই আছি, স্বাধীন হইয়া আছি। বাহিরে অধীনতা টানিতেছে;—ভিতরে স্বাধীনতা আলো জ্বালিয়া বিশেষত্বের পথ দেখাইতেছে। অধীনতা যখনই ডুবাইতে চাহিতেছে, তখনই স্বাধীনতা, মানব সন্তানকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেছে,—তখনই মানুষ, অধীনতাকে বিষের ন্যায় মনে করিতেছে। স্বাধীনতাকে ভুলিয়া অধীন হইলেই ব্যক্তিত্ব লোপ পায় ও মানুষের মৃত্যু ঘটে। অধীন-স্বাধীন মানুষ আবাহমান কাল বাস করিতেছে, অনন্তকাল বাস করিবে। কেহ শত সহস্র চেষ্টাতেও এককে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, মানুষকে উন্নতির রাজ্যে লইয়া যাইতে পারিবে না। আমার তত্ত্ব যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে ইহাই বুঝিয়াছি, আমি অধীন ও আমি স্বাধীন;—তোমার তত্ত্ব যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা এই,—তুমিও অধীন এবং স্বাধীন। দুটী বিসদৃশ চিত্র হইলেও, দুইয়ের মিলনেই মানবের মঙ্গল হইতেছে। মানুষ, এ তত্ত্ব না বুঝিয়া বৃথা চিৎকার করিয়া ফিরিতেছ কেন? একদেশদর্শী মানুষ, তুমি স্বাধীনতার ভাণ করিয়া, আমাকে সংসারের উপকার বিস্মৃত হইয়া, সংসারের পথে না চলিয়া,—সংসারের পরামর্শ ও উপদেশ না শুনিয়া,—একতাকে আলিঙ্গন না করিয়া, কেবলই স্বাতন্ত্র্যের—কেবলই স্বেচ্ছাচারের পথে হাটিতে বলিতেছ, তুমি দূর হও। আর তুমি হে মানব সমাজের গুরু, উপদেষ্টা, বা অত্যাচারী রাজা, তুমি আপন স্বাধীনতাকে অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিয়া, আমার স্বাধীনতাকে,—স্বাতন্ত্র্যকে ডুবাইয়া—জীবনের মূলমন্ত্রকে বিসর্জ্জন করিয়া, আমার অস্তিত্ব বিলীন করিয়া, আপন ক্রোড় পরিপূর্ণ করিতে বা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিতে যে চেষ্টা করিতেছ, তুমিও দূর হও। কেবল একতা স্বর্গের পথ নহে,—কেবল স্বাতন্ত্র্যও স্বর্গ-সোপান নহে। অধীনতার পরিণাম—একতা বা প্রেম; স্বাধীনতার পরিণাম—মুক্তি বা জ্ঞান। একতা, সংসারের দুর্লভ পদার্থ। স্বাতন্ত্র্যও স্বর্গের অমূল্য জিনিস। কিন্তু একের বিহনে, অপর, অসার—ধূলির জিনিষ—নরকের যোগ্য। তাই বলি, একতার জন্যই স্বাতন্ত্র্য চাই। মূল কথা—সংসারের অধীনতাও চাই, স্বর্গের স্বাধীনতাও চাই। জড়-শরীরও চাই, নিরাকার আত্মাও চাই—তবে ত মানুষ, মানুষ। স্বাধীনতা যাহার আছে,—স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে, সে মহা পরাক্রমশালী রাজার অধীন হইয়াও স্বাধীন; একতা বোধ যাহার হইয়াছে—প্রেম যে পাইয়াছে—স্বাধীন হইয়াও সে অধীন। ভিতরে স্বাধীনতা থাকিলে, রাজা বল বা সমাজ বল, কেহই আমাকে একেবারে বাঁধিতে পারিবে না। আবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া কাহাকেও মানিব না, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব না, ইহাও ঠিক নহে। ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করেন নাই—কেবল অধীনও করেন নাই। মানুষ অধীন হইয়াও স্বাধীন; আবার স্বাধীন হইয়াও অধীন। অধীনতা যেখানে, স্বাধীনতাও সেইখানে। মানুষ চিরকাল অধীন-স্বাধীন হইয়া উন্নতি লাভ করিতেছে, চিরকাল করিবে।

তুষার-প্রবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতাদৃশ ভয়ানক স্থানে, এত ভয়ানক কষ্ট ও বিপদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া, বঙ্গবাসী হয়ত কল্পনা পথেও অগ্রসর হইতে চাহিবে না। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদেশের লো-

কেরা, স্বাস্থ্যলাভের জন্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য অনেক কারণে, আজ কাল এই স্থানে পর্য্যটন করিতে যান। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা এই স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আজি কালি ত কোন অসুবিধা নাই বলিলেই হয়, কিন্তু তখন কোন প্রকার সুবিধা ছিল না। অথচ কত কত আবিষ্কারক, কত শত ক্লেশ সহ্য করিয়া, এই সব ভীষণ স্থানে গিয়া, অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াও মানবজাতির উপকার সাধনে ও জ্ঞান ভাণ্ডার পরিবর্দ্ধনে ত্রুটী করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডি সসিয়োর (De Sanssure), বৈজ্ঞানিক নানা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, এই ভয়াবহ স্থানে একাকী ক্রমে সপ্তদশ দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইত চাই। এরূপ জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকিলে আর পণ্ডিত কি? ঘরে বসিয়া লোকের লিখিত ২। ৪ খানা বই পড়িয়া যদি পণ্ডিত হওয়া যাইত, তবে পণ্ডিতের ছড়াছড়ি হইত। প্রকৃতিকে যে ভালবাসে, সে তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করিবে নাত কি? আর বাস্তবিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এ বিষয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহ দেখিয়া অবাক হইতে হয় কবে আমাদের দেশের যুবকগণ, এইরূপ অধ্যবসায় ও উৎসাহ লইয়া, জ্ঞানোন্নতির জন্য, ধন মান প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইতে শিক্ষা করিবেন?

যেমন একটী তুষার-প্রবাহের বিবরণ দেওয়া গেল, প্রায় সমস্ত গুলিরই সাধারণ বিবরণ ঐ একই রূপ; তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ প্রভেদ জন্মিতে পারে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, হিমনদীর মূলে তুষারময় স্থান, সর্ব্বত্রই উহার পার্শ্বে ও মধ্যে (উপনদী মিশিলে) ঐ প্রকার (Moraines) প্রস্তর শ্রেণী দেখা যায়। এবং যেখানে উত্তাপে বরফ দ্রবীভূত হয়, সেখানে ঐ সমস্ত প্রস্তরাদি স্তূপে স্তূপে গিয়া পতিত হয় (Terminal Moraines)। খুব উত্তরে, যেখানে ভয়ানক শীত, অর্থাৎ উত্তর মহাসাগরীয় প্রদেশ সমূহে, বিশেষত আইস্‌ল্যাণ্ডে, হিমনদীর একটু নূতনত্ব দৃষ্ট হয়। তথায় উহারা একেবারে ধরা-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় এবং স্বতন্ত্র নদী উৎপাদন না করিয়া আপনারাই গিয়া সাগরে পতিত হইতে থাকে। এ বড় সুন্দর। এখানেই বাস্তবিক বরফের নদী, পর্ব্বত পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া, দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক সাগরে উপস্থিত হয়। এখানেই হিমনদী নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়। পাঠক! দৃশ্যটী কল্পনা করিয়া দেখ! সুদূরে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, উপরে অনন্ত আকাশে গাঢ় নীলিমা, সম্মুখে অসীম সাগরের নীল জলরাশি, নিঃশব্দে, নির্জ্জনে, বরফের প্রকাণ্ড এক নদী, বক্ষ স্থল স্ফীত করিয়া, সহস্র ভীষণকায় প্রকাণ্ড প্রস্তররাশি বহন করিয়া, সাগরকে যেন উপহার দিতে আসিতেছে, গভীর-হৃদয় বারিধিও যেন সে স্নেহ-উপহার, পর্ব্বতের সে বন্ধুতার চিহ্ন পর্ব্বত-নন্দিনীর হস্ত হইতে সাদরে গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন। সহস্র সহস্র হস্ত ছুটিয়া ছুটিয়া পুন পুন আহ্বান করিতেছে, বরফরাশির বক্ষোপরি পতিত হইয়া যেন অভ্যর্থনা করত তাহাকে গ্রহণ করিতেছে। ধীরে ধীরে কিন্তু স্থির-ভাবে, কঠিনাবরণী পর্ব্বত দুহিতা অল্পে অল্পে সাগরের বক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। উভয়ের ঘন সম্মিলন আরম্ভ হইল, মানবদৃষ্টি কিন্তু আর কিছু দেখিতে পায় না। এই রূপে ক্রমে যখন পর্ব্বতের প্রকাণ্ড জিহ্বা সদৃশ জমাট নদীমুখ সাগর-জলের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইল, তখন উপরে জল, নিম্নেও জল, মধ্যে বরফ নদী, নিজের ভারে ক্রমে অবনত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে আরও, আরও, আরও। অবশেষে প্রলয়কালীন ভীষণ গম্ভীর গগন-বিকম্পী মহানির্ঘোষে জলমধ্যস্থ সুদূর-ব্যাপী বরফভাগ, স্থলবিহারী মূলদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাত হবেই। জলের ভিতর হিমনদীর যে অংশ ছিল, তাহা ভাসিতে চাহে, জলের অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে উঠিতে চাহে, কিন্তু তদুপরিস্থ অসংখ্য প্রস্তররাশির ভার বশত এবং মূলে স্থলস্থ বরফ-দেশের সহিত সুদৃঢ় সংযোগ থাকাতে ভাঙ্গিয়া ভাসমান হইতে পারিতেছে না। ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল যে, তাহার মূলস্থ বরফ আর ধারণে সক্ষম হয় না। ওদিকে বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি সহকারে তদুপরিস্থ প্রস্তর-রাশির ভারের পরিমাণের অনুপাতক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই অবশেষে, সেই মহা বিস্তীর্ণ প্রান্তরসম সাগর-গর্ভস্থ বরফনদীর মুখভাগ সাগরকে তোলপাড় করিয়া ভাসিয়া উঠে! আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন, সে সময়ে কি ভয়ানক ব্যাপারই হয়! তাহা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনায় ভাল বুঝা যায়। বরফের একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ,—কোথাও কিছু নাই, হটাৎ—ভূষ্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল! চারিদিকে মহা তুফান আরম্ভ হইল, কত দূরই না জল ছিটিয়া গেল? কি মহাব্যাপার!

তাহার পর এ প্রকাণ্ড বরফ-শৈল (অক্ষয় কুমার বাবুর প্রসিদ্ধ 'হিমশিলা') সাগর পৃষ্ঠে ভাসমান হইল। উহার যে সকল প্রস্তর অসংলগ্নভাবে ছিল, সে গুলি পড়িয়া গেল। আর সবগুলি গায়ে লাগিয়াই রহিল। হিমশিলা ভাসিলে, ইহাকেই ইংরাজিতে iceberg কহে। এই হিমশিলা প্রায়ই বায়ুতে বা স্রোতে চালিত হইয়া, গলিতে গলিতে, অনেক দূরস্থিত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পার্শ্বেও ভাসিয়া যায়। কোন জাহাজ ইহার সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই। অনেক জাহাজ এইরূপে মারা গিয়াছে। ইহার চারিদিকে এমন কুয়াসা হয় যে, প্রায় দূর হইতে ইহাকে একখণ্ড মেঘ বলিয়া মনে হয়। হিমশিলা সাগরবক্ষের একটী অদ্ভুত পদার্থ, কিন্তু ইহার উদ্ভব কোথায়, তাহা ভাবিলে আরও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। জলের উপরে যতটা থাকে, তাহাই হিমশিলার প্রকৃত পরিমাণ নহে। অনেকেই জানেন, যাহারা জানেন না তাঁহারা আরও আশ্চর্য্য হইবেন যে,—যে প্রকাণ্ড পর্ব্বত শৃঙ্গের মত বরফ স্তূপ জলের উপরে ভাসিতে থাকে, জলের ভিতরে তাহার আট গুণ পরিমাণ বরফ ডুবিয়া থাকে! বুঝুন, উহা কত বড়! প্রকৃতির সকলই অদ্ভুত!

গ্রীন্‌লাণ্ডের উত্তরে এইরূপ চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। তথায় প্রায় সমস্ত স্থানই বরফে আবৃত, হিমনদী বা বরফ দেখিবার জন্য পর্ব্বতে উঠিতে হয় না, কেন না সে সকল দেশ উত্তরমহাসাগরের ঘোর শীত-প্রধান অংশে আছে। কাজেই সেখানে সাগর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বরফরাশি নামিয়া আসিয়াছে, গলিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফ নদী নামিয়া একেবারে

সশরীরে সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি, জলের উপরিভাগে ৩০০। ৪০০ ফীট অর্থাৎ ২০০। ২৫০ হাত উচ্চ দেয়ালের মত, উপকূলের ধারে ধারে প্রায় ৬০ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া, এই সকল বরফ নদী সাগর-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভীষণদেহ সিন্ধুঘোঠক সকল বসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। এই বিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তরের কিয়দংশ, মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভাসমান হিমশিলা সমুৎপন্ন হইতেছে।

হিমনদী ও হিমশিলার বিবরণ অতি সংক্ষেপে আমরা এইটুকু দিলাম। যদি কাহারও কৌতূহল উদ্দীপন করিয়া দিতে পারিয়া থাকি, তবে সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আরও বড় বড় বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাস্তবিক এ বিষয়টী এতই আশ্চর্য্য ও আমোদজনক যে, যদি প্রকৃতির যেকোনও শোভা দেখা আবশ্যক ও উপকারী হয়, তবে আমরা খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হিমনদী যদিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য নাও হয়, তথাপি সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের ভাবে, ইহা অন্য কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যূন নহে। ইহার মধ্যে আকাশ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য ও বরফের সমবেত সৌন্দর্য্য ও গম্ভীর মহান্ ভাব একত্র সন্দর্শন করিয়া, মনপ্রাণ পুলকিত ও বিমোহিত হয়। যাঁহাদের অদৃষ্টে এ দৃশ্য দেখিবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা অন্তত পক্ষে, ইহার ছবি ও যথাযথ বিবরণ কেন না দেখিবেন?

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

উৎসব-গীতি।

প্রভাতে—লতা-গৃহে।

বিমল প্রভাতে আজি
ওইগো বহিছে হোথা
আনন্দের মৃদুল পবন ;—
কত হৃদি জাগিয়াছে
কত প্রাণ মাতিয়াছে—
কত সুখে হতেছে মগ্নন !
ঊষার রজত হাসি-রেখা
ফুটিছে রবির কর ছুঁয়ে,
রাশি রাশি শিশিরের অশ্রু
হাসি হাসি পড়িছে ঝরিয়ে !

প্রভাতের কত কবি,
কেন গো হাসন্ত মুখে
এমন হরষে মাতোয়ারা ?
কেন গো ললিত রাগে
ভরিয়া জগত-প্রাণ
উৎসবের গান গায় তারা ?—
সুখময়ী শান্তি-বালা
মনের হরষে আজি
নামিয়াছে স্বরগ হইতে,
সুবিমল জ্যোতির্ম্ময়
প্রশান্ত ললাট এক
স্নেহভরে সাদরে চুমিতে !
তাই বুঝি মোর আঁধার হৃদয়ে
জোছনার আলো ভাতিছে ?
তাই বুঝি মোর জ্বলন্ত পরাণে
অমৃত-লহরী ছুটিছে ?
তবে আমি ছুটে যাই,

জগতেরে ভুলে যাই,
দুঃখ শোক ফেলে যাই আঁধার এপুরে !
শৈশবের সহচরী
প্রাণের কবিতা সনে,
ডুবে যাই ডুবে যাই প্রাণের সাগরে !

শোক ! তুমি আজ এ বিজন বনে
এসো না গো এসোনা !
দুঃখ ! তুমি আজ হৃদয় মাঝারে
পশোনা গো পশোনা !
নিরাশা ! আজিকে হেথা মোরে ফেলে
সুদূরে চলিয়া যা !
অশ্রু ! তুই তোর জননীর কোলে
আজিরে সুখে ঘুমা !
তোদেরি তরে গো হৃদয় মাঝারে
পাতিয়াছি এক চারু সিংহাসন,
চিরদিন সেথা রবি বড় সুখে
হৃদয়-শোণিত সদা করি পান !

একাকী বসিয়া আজি হেথা
জুড়াই গো মরমের ব্যথা !
বড় সাধ গেছে মনে
ওই কবিদের সনে
প্রাণে প্রাণে মিশে যাই, আর গান গাই—
সংসারের ধূলা-খেলা আজ ভুলে যাই !
বড় সাধ গেছে মনে
মিশে সমীরের প্রাণে
চুপি চুপি দেখে আসি একটী হৃদয়—
কি আনন্দ উথলিছে আজিকে সেথায় !

এস রবি, নেমে এস,
আমি তব ছোট ভাই,
তোমার কিরণ-মালা পরাও আমায় ;
যেই প্রেমে তুমি দেব,
ভালবাস জগতেরে,
এস ভাই—সেই প্রেম শিখাও আমায় !

ওই গো তোমার গান শুনে,
কচি কচি টুকটুকে মুখে,
ফুলবালা সবে কিবা প্রাণ ভোরে হাসিছে,
প্রফুল্ল সমীরে সবে
খুলিয়া দিয়াছে প্রাণ,
প্রাণের ভাষায় আজি কত গান গাইছে !
প্রভাত বিহগ সবে
কল-কণ্ঠ ঝঙ্কারিয়া
জগতে সুধার ধারা দিতেছে ঢালিয়া ;
তরু-শিশু দলে দলে
হাসিছে অধীর হ'য়ে,
হরষের অশ্রু ধারা পড়িছে ঝরিয়া !
সোণার লতিকা-বালা
চঞ্চল মেয়েটী যেন
হেসে হেসে দুলে দুলে ওকি কথা কহিছে !
স্বচ্ছ সরসীর বুকে
দুলিছে তরঙ্গ-মালা
কিরণে কিরণ মিশি কিমধুর শোভিছে !
শ্যাম দুর্ব্বাদল-শিরে
শিশির বালিকা গুলি
জগতের পানে চেয়ে কি যেন কি ভাবিছে ;
মরমের গান গেয়ে
কিরণের কোলে গিয়ে
একে একে কত সুখে ঘুমাইয়া পড়িছে !

হায় ! আমি যদি হোতাম শিশির—
প্রভাত বাতাসে হাসিয়া হাসিয়া,
সোণার কিরণে জীবন আমার,
মরমের সাধে যাইত মিশিয়া !
হায় ! যদি আমি হোতাম কুসুম—
সমীর-পরশে কিরণ-চুম্বনে
মনের হরষে কত হাসিতাম,
চেয়ে চেয়ে থাকি প্রকৃতির পানে !

প্রকৃতি গো !—জননি গো !
কত সাধ যায় মনে

কেন মা পূরে না মোর প্রাণের পিপাসা ?
কেন মা মিটে না মোর হৃদয়ের আশা ?
কতদিন হে জননি !
বসিয়া তোমার কোলে,
চুপি চুপি কত কথা বলেছি তোমায়,
হাসিতে হাসিতে তুমি
চুমিয়া মু'খানি মোর,
মনে আছে, কত আশা দিয়াছ আমায় ?
শুনিয়া তোমার কথা
হাসিত কানন-বালা,
সুধা কত উজলিয়া বিহগ গাইত !
সমস্ত জগৎ যেন
বোধ হ'ত মধুময়,
হৃদি মাঝে শত ফুল ফুটিয়া উঠিত !
তেমনি তেমনি তুমি,
আছগো প্রকৃতি দেবি !
আমি কিন্তু সেই-আমি কই ?
কি-যেন কি হয়ে গেছি,
ভেঙ্গে চূরে গেছে প্রাণ—
আমি আর সেই-আমি নই !
তুমিও গিয়েছ মোরে ভুলে,
আর ভালবাসনা তেমন—
তোমার কোলের কাছে এলে,
আর মোরে করনা যতন !
এরে কি মায়ের স্নেহ বলে ?
এই কি মায়ের ভালবাসা—
না জননি !—ভুলোনা আমারে—
পূরাও পূরাও মোর আশা !

আবার তেমনি কোরে,
মধুর আশ্বাস মোরে,
দাও গো করুণাময়ী জননী আমার ;
নয়নের জলধারা
দাও দাও মুছাইয়া,
ঢাল গো অমৃত-ধারা হৃদয়ে আমার !
কতকাল জননি গো,
করেছি তোমার পূজা,
তবু কি আঁধারে মোরে ফেলিয়া রাখিবে ?
প্রাণের বেদনা মোর তবু না জুড়া'বে ?
সুখ শান্তি হারা হ'য়ে
ভগন হৃদয়ে দেখ,
কোন্ নিরাশার পুরে যেতেছি ছুটিয়া ?
বুঝি মরণের মুখে চলেছি ভাসিয়া !
ফিরাও ফিরাও মোরে,
নিবাও প্রাণের জ্বালা,
হৃদয়ের ফুল গুলি দাও ফুটাইয়া—
জীবনের আশা মোর দাও পুরাইয়া !

জীবনের মহাব্রত,
দাও গো সাধিতে মোরে,
দাও গো বিলা'তে প্রেম জগত মাঝারে ;
ভালবাসা মহামন্ত্র শিখাও আমারে !
প্রকৃতি গো ! তা' যদি না পার তুমি,
ভেঙ্গে দাও তবে সংসারের মায়া ;—
হাসিতে হাসিতে এই দণ্ডে আমি
মরণের কোলে পড়ি ঘুমাইয়া !

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

আমাদের নিম্নশ্রেণী ও দুর্ভিক্ষ।

অনেক গভীর চিন্তশীল পণ্ডিতের বিশ্বাস, সমাজের ঊর্দ্ধতন অংশ উন্নত হইলে, ক্রমে সেই উন্নতি, আপামর-সাধারণের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া

পড়ে। কেবল উন্নতি নহে. তাঁহাদের অর্জ্জিত অবনতিও সময়ে নিম্নশ্রেণীকে আক্রমণ করে। ঊর্দ্ধতন শ্রেণী শিক্ষিত হইলে, তাঁহাদেরই প্রসাদে, নিম্ন-শ্রেণী শিক্ষিত হইয়া উঠে। ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর ধর্ম্ম, নিম্নশ্রেণীকে অধিকার করে। আবার পক্ষান্তরে, দেশের ঊর্দ্ধতন শ্রেণী বিলাসপ্রিয় হইলে,—রিপু-পরায়ণ হইলে, নিম্নশ্রেণীও বিলাসপ্রিয় ও রিপু-পরায়ণ হইয়া উঠে। এই সাধারণ বিশ্বাসের বলেই, আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট, প্রথমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যাহাতে ঊর্দ্ধতন ও মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারে, পূর্ব্বে এই চেষ্টাই ছিল ; ধারণা ছিল, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা কালে নিম্নশ্রেণীকে তুলিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইতে না হইতে দেখা গেল, মানবসমাজের এ সাধারণ সত্য, হতভাগ্য বাঙ্গলায় সুফল প্রসব করিল না। উচ্চশিক্ষা পাইয়া কোথায় মধ্যশ্রেণীর লোকেরা, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে তুলিতে চেষ্টা করিবে, না, দেখা গেল, শিক্ষার জোরে সভ্যতা ও উন্নতি লাভ করিয়া, তাহারা ক্রমে নিম্নশ্রেণীকে আরো ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলে, দেখা গেল, শিক্ষিতশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, ভয়ানক ঘৃণা বিদ্বেষের যুদ্ধ চলিতেছে। শিক্ষিত শ্রেণী, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে দারুণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এই প্রকার ভাব দেখিয়া, সহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বলিতে-ছিলেন,—"বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর আবার উন্নতি হইবে ? যাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় জ্ঞান করি,—স্বার্থ সাধনের উপায় সরূপ মনে করি, তাহাদিগের আবার গতি ফিরিবে ? সাহেবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি !! হায়, শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান ; দেশের শক্তি যাহারা, আশা ভরসা স্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন। হায়, এই নগণ্য পশুদের আবার উন্নতি হইবে ?" বলিতে বলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িল, বাক-শক্তি রুদ্ধ হইল। বাস্তবিকই দেশের অবস্থা এইরূপ। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাক্যের প্রতি শব্দে সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই যে আমরা, নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য আজ কাল আন্দোলন করিয়া ফিরিতেছি, আমরা কি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিয়া থাকি ? মনে করি কি যে, ইহাদের মধ্যেও আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল রত্ন লুক্কায়িত আছে ? মনে করি কি যে, তাহাদের মধ্যেও এমন বিশেষ বিশেষ ভাব আছে, যাহা আমা-দিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করি কি যে, সমাজে আমাদের যেমন প্রয়োজন, তাহাদেরও তেমনি প্রয়োজন। মনে করি কি যে, তাঁহাদের প্রদত্ত সাহায্য ভিন্ন আমরা জীবন ধারণে অসমর্থ। কেবল দিবার জন্য নহে, পাইবার জন্যও নিম্নশ্রেণীর সহিত মিশিতে হইবে, ইহা মনে করি কি ? যদি মনে না করি, তবে ইহা নিশ্চয়, তাহা-দিগকে ঘৃণার চক্ষে আমরা দেখিয়া

থাকি, পেট্রিয়ট নাম লাভের জন্য, তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকি। হায়, মানুষের সংকীর্ণতা দেখিলে চক্ষের জল সম্বরণ হয় না। যে শিক্ষার শেষ নাই, সে শিক্ষার আবার অভিমান? সৃষ্ট বস্তুর অনন্তত্ব যখন ভাবি, তখন মনে হয়, মানুষ জীবনকালে কি ছাই শিক্ষা করিতে পারে!! অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ সান্ধ্য গগনের পানে যখন চাহিয়া দেখি, তখন মানুষের শিক্ষাকে নিতান্তই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষ, সৃষ্ট জগতের অতি অল্পই শিক্ষা করিতে সক্ষম। মূর্খ ও অজ্ঞানীর নিকটে কি শিক্ষার কিছুই নাই? সমাজে আমার প্রয়োজন, কৃষকের কি প্রয়োজন নাই? আমার নিকট শিক্ষার জিনিস আছে, কৃষকের নিকটে কি নাই? তবে তাহাদিগকে কেন ঘৃণা করিতেছি? তবে তাহাদিগকে কেন আমার ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না? চিন্তা করিয়া বুঝিলাম,—বস্তুবিক কি যেন একটা অব্যক্ত অন্তরায় রহিয়াছে, যাহাতে নিম্নশ্রেণীর প্রতি একটা ঘৃণার ভাব, একটা বিদ্বেষের ভার, আমার শিরায় শিরায় জড়িত রহিয়াছে। আমাদের ঘৃণামূলক স্বার্থপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হইল,—হইবারই কথা। এই প্রকারে, চেষ্টা ও অচেষ্টার সমান ফল, ফলিল। অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গেল, তবুও হতভাগ্য, পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিল না। মাথায় তৈল নাই, উদরে অন্ন নাই, শরীরে বস্ত্র নাই—অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণী একই ভাবে রহিল। শিক্ষিত যুবকদের উন্নতির জন্য দেশে দেশে সভা হইল, বৃদ্ধদের পরিণামে যশলাভের জন্য সভা হইল, রাজনীতির অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য সভা হইল—জমীদার ও রাজাদের উন্নতির জন্য সভা হইল; এমন কি, হতভাগিনী বাঙ্গলার বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্য পর্য্যন্ত সভা হইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত, নিরক্ষর, পরসুখাপেক্ষী, পরপদদলিত কৃষকশ্রেণীর উন্নতির জন্য বাঙ্গলায় কোন সভা হইল না! যে সকল সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল—তাহাতে সমাজের উন্নতির কথা, রাজ্যের উন্নতির কথা উঠিল,—বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহের সপক্ষে এবং কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইল,—চিন্তার স্রোতে বাঙ্গলা একেবারে প্লাবিত হইল। কিন্তু ঐ যে দুঃখী, মলিন—নিরক্ষর কৃষক, সমস্ত দিন শরীরের রক্ত জল করিয়া, সূর্য্যের প্রখর কিরণ মস্তকে ধারণ করিয়া, মাঠে পড়িয়া হলচালনা করিতেছে,—উহার উন্নতির কোন কথা কোন পত্রিকায় উঠিল না। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নশ্রেণী যে সমাজ রক্ষার প্রধান সহায়, তাহা আজও শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিলেন না। গবর্ণমেণ্ট ইহা বুঝিলেন। বুঝিয়া, সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তাহার আয়োজন করিলেন। স্বার্থান্ধ আমাদের তাহাও সহ্য হইল না। সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে কত কথা বলিলাম, কত কথা লিখিলাম। আমরা এমনই স্বার্থপর—লবনের শুল্ক (Salt duty) আপামর-সাধরণের মঙ্গলের জন্য কমিল,—দুঃখী দরিদ্রের একটু গতি হইল, আমরা তাহার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া চিৎকার করিলাম। তুলার শুল্ক (Import duty) উঠিয়া গেল, আমরা তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলাম। এ সকল কর (Indirect tax) সাধারণত আপামর-সাধারণকে দিতে হয়;

তুলার শুল্ক উঠিয়া গেলে ॥৶০ আনার কাপড় ।৶০ আনায় পাইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সুখী হইবে, ইহাও আমাদের সহ্য হইল না। নিম্নশ্রেণীর সুখ, আমাদের দুঃখের কারণ! অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সময় সময় আক্ষেপ করিয়া বলেন,—সাধারণ লোকের উন্নতি হইতে চলিল, আর দেশে থাকা ভার। এমনই স্বার্থপর আমরা। এ সকল দুঃখের কথা আর বলিব না। দুঃখীদের কথা কে শুনিবে, কাহার কর্ণে এ সকল কথা ভাল লাগিবে? শুনিবার লোক পরপদলাঞ্ছিত বাঙ্গালায় নাই। থাকিলে বাঙ্গালার গতিমতি ফিরিত। আজ কয়েক বৎসর, দুঃখী প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, গবর্ণমেণ্ট কর-আইন সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—তাহার বিরুদ্ধে না লাগিয়াছে, বাঙ্গলার এমন লোক অতি অল্প! শিক্ষিত জমীদারদিগের সভাই বল, আর শিক্ষিত মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর সভার নামই কর, সকল সভাই স্বত কিম্বা পরত প্রজাদের যাহাতে মঙ্গল না হয়, তাহারই সহায়তা করিয়াছেন। কোন সভা নীরবে থাকিয়া সাহায়তা করিয়াছেন, কোন সভা চেষ্টা করিয়া করিয়াছেন। যাহা হইবার, অবশেষে তাহা হইয়া গিয়াছে। প্রজাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া অতঃপর বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মামলা মকদ্দমায় বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণী যে উচ্ছন্ন যাইবে, এত দিনে তাহার পথ পরিষ্কার হইল। বিধাতা যাহাদের প্রতি বিমুখ,—তাহাদের সহায় মানুষ হইবে না, তাহা জানি। হতভাগ্যদের গতি ফিরিবার আর উপায় রহিল না। নিরাশ্রয়ের সহায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ অন্তরে সংসারের নিকট এক প্রকার বিদায় লইয়াছেন,—আর কে বা আছে, কে বা ভাবিবে? আর কার চক্ষু-ভরা বা নিঃস্বর্থ প্রেমাশ্রু আছে, কে বা দুঃখীদের দুর্দ্দশা দেখিবে? আজ দুর্ভিক্ষ, কাল মহামারি, সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া, অসহায়দিগের চির-সুহৃদের কার্য্য সাধন করিতেছে। দুর্ভিক্ষ দেশে একদিনে হয় না। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হইতে পারে না—অনুন্নতিই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ—অর্থাভাবই দুর্ভিক্ষের মূল মন্ত্র। মনুষ্য যখন উন্নত হয়, তখন নানা প্রকার উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। অনেক সভ্য দেশে তাহাই হইতেছে। শিল্পের সেবা করিয়া, কত দেশের কত লোক বাঁচিয়া যাইতেছে। অনুন্নত বাঙ্গলার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়—কৃষি। দুই এক বৎসর স্থান বিশেষে ধান্য উৎপন্ন না হইলেই, সর্ব্বনাশ ও হাহাকার উপস্থিত হয়। ১৷৷০ টাকার স্থলে ৩ টাকা মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ অর্থাভাব,—অর্থাভাবের মূল কারণ—অনুন্নতি। নিম্নশ্রেণীর সাময়িক অভাব দূর করিবার জন্য অনেকে ভাবিতে পারেন, কেহ কেহ ভাবিয়াও থাকেন, কিন্তু কি করিল হতভাগ্যদের স্থায়ী উন্নতি হইবে, তাহা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করেন। দেখিয়া শুনিয়া, অনেকে মনে করিয়া থাকেন, বাঁচিয়া যাহারা কেবলই কষ্ট পাইবে, তাহাদের জীবন ধারণ বৃথা। মৃত্যুই যেন ইহাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও সুখ শান্তির স্থান; মৃত্যু ভিন্ন যেন আর ইহাদের বন্ধু নাই। সেই মৃত্যু আনিতেছে—দুর্ভিক্ষ ও মহামারি,—অনাবৃষ্টি, ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা। "দুঃখীর আশা, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন অনাবৃষ্টি, তবে তুই আয়, তোরই সঙ্গে তোর চির-সঙ্গী দুর্ভিক্ষ

আসুক; মহামারি তাহারই পরিণামে ঘটুক, বাঙ্গলার বিপন্ন দুঃখী কৃষকশ্রেণী শান্তিময়ীর ক্রোড়ে চির-বিশ্রাম লাভ করুক, দুঃখীদের হাড় জুড়াক! জমীদারের অত্যাচার, শিক্ষিত শ্রেণীর ঘৃণা বিদ্বেষ, ও রাজার অত্যাচার-কাতর দুঃখী কৃষকদের চক্ষের জল শোষণ করিতে বিধাতার আদেশে, তোরা আসিয়া সহায় হ"—এমনই করিয়া দিন রাত্রি কৃষকেরা আকাশের তলে বসিয়া মৃত্যুকে ডাকিতেছে। বিধাতার কর্ণে বুঝি বা এতদিনে তাহাদের দুঃখের কথা উঠিয়াছে,—তাই আজ—বিরভূমে দুর্ভিক্ষ ও মারিভয় উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যু, করাল মুখ ব্যাদান করিয়া আকাশের তলে ঘুরিতেছে! কত লোক, এই চৈত্র মাসের প্রখর সূর্য্যতাপ-দগ্ধ, অনাহার-ক্লান্ত অসহায় স্ত্রীপরিবারদিগকে অক্লেশে মৃত্যুর কল্যাণময় হস্তে সঁপিয়া দিয়া, আপনারাও চলিয়া যাইতেছে। দিনে দিনে—কত লোকের হাহাকার উঠিতেছে। তোমরা বল, কেবল আজ, কেবল কাল দুর্ভিক্ষের কষাঘাত,—আমরা দেখিতেছি—বার বাস অহর্নিশি বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ ফিরিতেছে,—বারবাস দরিদ্রের পেটের অন্নের জন্য কষ্ট ও চিন্তা;—বারমাস, রোগীর ঔষধের জন্য তাহাদের দারুণ মনের বেদনা। ঔষধাভাবে বাঙ্গালায় বৎসর কত লোক মরিতেছে, কেহ কি আজ পর্য্যন্ত তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছে?—পথ্য এবং শুশ্রূষার অভাবে কত লোক মৃত্যুর মুখে পড়িয়াছে, কেহ কি চক্ষের জলে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছে? লোক কোথায় যে, এ সকল গণিবে? বাঙ্গালার হিতৈষীগণ, দেশের কোনই অভাব দেখিতে পান না;—জাতীয় ধনভাণ্ডার কি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে,ভাবিয়াই অস্থির!! আর সহায় সম্বল না পাইয়া অত্যাচারিত, অম্লক্লিষ্ট, দুঃখী বাঙ্গালার প্রজাবর্গ, মৃত্যুকেই সুখ ও শান্তির স্থান বলিয়া বুঝিয়াছে,—মৃত্যুই যেন আরাম স্থল, মৃত্যুই যেন সুখ-স্থান। এ বিষাদ-মাখা চিত্র সমদুঃখী বাঙ্গালীর প্রাণে সহিতেছে না, তাহারা দুঃখীদের জন্য কি যেন করিবেন, ভাবিতেছেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত-শ্রেণী আজ ব্যথিত অন্তরে ইহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। সহৃদয়তার কি মধুর চিত্র! দেখিলেও প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু এই সুখের চিত্র দেখিয়াও, আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ভাই পাঠক, অর্থ দিতেছ,—দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছ, ভাল কথা,—কিন্তু ইহাদের পরিণাম কি একবার এই সময়ে চিন্তা করিবে না? গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, ইহাদিগকে বাঁচাইলেই সকল কর্ত্তব্য শেষ হয় কি না? দশ টাকা, বা পঞ্চাশ টাকা দান করিয়া আজ ইহাদিগকে যেন তোমরা রক্ষা করিলে, কিন্তু কল্যকার কথা কি এই সময়ে ভাবিবে না? আমরা ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস দেখিয়া তোমাদের প্রশংসা করিবনা। পশুজীবন ধারণ অপেক্ষা, মৃত্যু, সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। হতভাগ্য, লাঞ্ছিত, পশুসমান কৃষকেরা কত সাধে আজ শান্তির ধামে চলিয়াছে!! যদি ইহাদের পরিণামের উন্নতির কথা না ভাবিয়া তুমি সাহায্য করিতে আসিয়া থাক, তবে ভাই, তুমি দূর হও। তোমার একটী পয়সাও দান করিবার অধিকার নাই,—যদি তুমি ইহাদের পরিণামের উন্নতিসাধনকে তোমার জীবনের একটী কর্ত্তব্য বলিয়া এই মুহূর্ত্তে না বুঝিয়া

থাক। দুর্ভিক্ষ আজ আসিয়াছে!—কাল আবার আসিবে। যদি ইহাদের অবস্থা উন্নত করিতে না পার, চিরকাল এমনই করিয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে,—এমনই করিয়া দুঃখীদের অস্থি মাংস পোড়াইবে। হইবে, কেন বলিতেছি? চাহিয়া দেখ, ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ চির-আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব শরীরের রক্ত যাহার বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল বাহ্য প্রলেপে তাহাকে নীরোগী করিবে, এ বাসনা তোমার পূর্ণ হইবে না। শরীরের রক্ত পরিষ্কারের উপায় যদি ভাবিয়া থাক, তবে বাহ্য-প্রলেপ দিতেছ, দেও; নচেৎ ভণ্ড, একদেশদর্শী, তুমি অসহায়দিগকে বাঁচাইতে বৃথা যত্ন করিও না। আজ বাদে, কাল যে পুন মৃত্যু-গ্রাসে পড়িবে, এক দিনের জন্য পশু জীবন ধারণে তাহার কি হইবে? অত্যন্ত কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়-শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে,—আজ বাঙ্গালীর দয়ার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। জগৎ দেখিতেছে,—আর আশার চক্ষে, সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। হয় এই সময়ে, নচেৎ কখনই নহে। শিক্ষিত-শ্রেণীর ঘৃণা বিদ্বেষ ঘুচিয়া গিয়াছে, মনে করিব, যদি দেখি, আজই বাঙ্গালার কৃষকদের শিক্ষার জন্য, গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,যদি দেখি,আজই সহস্র সহস্র লোক, দুঃখীদের উন্নতির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের সহানুভূতিতে আমরা ভুলিব না। একদিনের এক মুহূর্ত্তের চেষ্টাকে আমরা অন্যভাবে গ্রহণ করিব,—যদি দেখি, স্থায়ী উন্নতির কামনা কাহারও ভিতরে নাই। শিক্ষিত শ্রেণী—ভাই বঙ্গবাসী, যদি বুঝিয়া থাক—দেশের শক্তি যাহারা, তাহাদিগকে ভাই বলিয়া কোলে তুলিয়া না লইলে তোমার শরীর অঙ্গহীন হয়;—যদি বুঝিয়া থাক, নিরক্ষর কৃষকদিগের উন্নতি না হইলে সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা;—যদি বুঝিয়া থাক,পাড়াপ্রতিবেশীর হৃদয় মন ভাল না হইলে, তোমার পরিবারের হৃদয় মন কখনই চিরকাল ভাল থাকিবে না;—সংসর্গ-দোষে সকল মাটী হইবে,—যদি বুঝিয়া থাক, শরীরের এক অঙ্গের ব্যাধি কালে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইবে;—যদি বুঝিয়া থাক, তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে,যদি দেশের আপামর-সাধারণের নিকট হইতে শিক্ষিতব্য বিষয় গ্রহণ না কর;—যদি বুঝিয়া থাক, তাহাদের সাহায্য-গ্রহণ ভিন্ন সমাজ চলা দুষ্কর;—তবে এস,সমদুঃখী বঙ্গবাসী,তবে এস। যাহার অর্থ থাকে, অর্থ লইয়া এস; যাহার শরীর থাকে, শরীর লইয়া এস। যাহার ভাষা থাকে, সে ভাষা লইয়া এস; যাহার স্বর থাকে, সে স্বর লইয়া এস। যাহার জ্ঞান থাকে, সে জ্ঞান লইয়া এস; যাহার যুদ্ধি থাকে, সে বুদ্ধি লইয়া এস। এস, সকলে আজ প্রাণে প্রাণে মিলি। কৃষকদিগকে আজ বাঁচাইব—কাল মানুষ করিব,—বাঙ্গলার চির দুর্ভিক্ষ-কলঙ্ক ঘুচাইব, এই প্রতিজ্ঞা অন্তরে পূরিয়া, এস, সকলে মিলি। পরস্পরের প্রতি যদি কোন ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে, তবে এই শক্তি-পরীক্ষার শুভদিনে, সেসকল পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক। গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন,না করিবেন,তাহার দিকে চাহিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের ভ্রাতাদিগকে বাঁচাইব,আমরাই মানুষ করিব। কর্ত্তব্য আমাদের,—ব্রত আমাদের। ভাই, ভায়ের কষ্ট বুঝিবে না,তবে কে বুঝিবে? ভাই,ভায়ের অশ্রু মুছাইবে না,তবে কে মুছাইবে? ভাই,ভায়ের

উন্নতির চেষ্টা করিবে না, তবে কে করিবে? হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, যে যেখানে থাক, আজ ঘৃণা বিদ্বেষ ছাড়িয়া এস, সকলে একবার মিলিত হই। পরীক্ষার দিনে যে দূরে থাকিবে, তাহাকে অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ মনে করিব। অনেক দিন অহঙ্কারের সেবা করিতে—ঘৃণা বিদ্বেষের মন যোগাইয়া চলিতেই কাটিয়া গিয়াছে, আর না। আজ কৃষক-বন্ধু শিক্ষিত শ্রেণী এস, আজ প্রজা-প্রন্ধু রাজা এস। সকলে একত্রে মিলিয়া—প্রতিজ্ঞা করি,—ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধন না করিয়া ক্ষান্ত হইব না,—যত দিন ইহারা আপনাদের পায়ের উপর আপনারা দাঁড়াইতে না পারিবে, তত দিন শরীরকে বিশ্রাম দিব না। জীবনের মমতা ভাসাইয়া পরিশ্রম করিলে কি অসাধ্য থাকে? শুভ ইচ্ছাকে সম্বল করিলে কিসের অভাব থাকে? চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"—প্রতিজ্ঞা কর। যাহার যাহা আছে, ঢালিয়া দেও। নচেৎ এক মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া, আপনার নাম জাগাইবার জন্য, আজ কৃষকদিগকে বাঁচাইতে যদি আসিয়া থাক;—পরিণামের উন্নতি সাধনের ব্রত যদি না গ্রহণ করিয়া থাক, তবে মনে করিব,—হতভাগ্যদিগের উপকারের পরিবর্ত্তে তোমরা অপকারই করিতেছ; কারণ, পশু-জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। যে দুর্ভিক্ষ বাঙ্গলায় বার মাস বিদ্যমান, তাহার যদি কোন উপায় করিতে না পার, তবে বুঝিব, বৃথা হুজুগ করাই তোমাদের ব্রত। দেশকে উদ্ধার করা,—কঠিন কার্য্য—কঠিন ব্রত। দেশের উন্নতির কথা লইয়া যাহারা কেবলই আন্দোলন করিতেছেন, কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখস্তের উপর দরখস্ত দিতেছেন;—তাঁহারা একবার যদি এদিকে চাহিয়া দেখিতেন, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ভিক্ষা না চাহিয়াও, দেশের অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অবস্থা যদি বুঝিতেন, তবে ইংরাজ নিন্দা নীতি অবলম্বন না করিয়াও, অনেক মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেন। দেশের শক্তি যাহারা, বল যাহারা, তাহাদের উন্নতির কথা ভুলিয়া জাতীয়-আন্দোলন, অসার কল্পনার ক্রীড়া বই আর কি? যদি জাতির উন্নতি চাও—দেশের উন্নতি চাও; তবে সাধারণ লোকের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা কর। এই গুরুতর পবিত্র ব্রত যিনি গ্রহণ করিবেন, তাহার জীবনই ধন্য হইবে। জগন্নাথের রথ, সাধারণ লোকেরা না টানিলে কখনই চলিতে পারে না। সাধারণ লোকদিগকে উদ্ধার করিতে যাও—সাধারণ লোকদিগের উন্নতির জন্য প্রাণকে ভাসাও—জীবনকে উৎসর্গ কর। দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে—মহামারি পলায়ন করিবে—দেশ স্বর্গ হইবে;—ভারত পুণ্যক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হইবে; ধর্ম্মের নাম জগতে মহীর্য্যমান হইবে।

সিদ্ধার্থের শেষ কথা।

অশীতি বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের মৃত্যু হয়। অস্তমিত সূর্য্যের কমনীয় কান্তি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ উজ্জ্বলিত করিয়াছে। যখন তথাগত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন নূতন সত্যের নূতন প্রচার শ্রবণ করিতে সকলে যেমন ব্যগ্র হইয়াছিল, তেমনি যত্ন সহকারে সে আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছে; প্রচার কার্য্যের মধ্যক্ষেত্রে সিদ্ধার্থের কিছু নূতন কথা বলিবার ছিল না। চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর তাঁহার প্রচার কাল। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধেই উদ্ভাবনা, সংবিধান, বা সন্নিবেশ চূড়ান্ত হইয়াছিল; অপরার্দ্ধ কেবল নূতন শিষ্য সংগ্রহে অতিপাত হয়। প্রচারক্ষেত্রের প্রান্তভাগ স্বতই পুনরাবৃত্তি পরিপূরিত, যে একবার তাহা দেখিয়াছিল, নূতনত্ব তাহার নিকট বিলুপ্ত হয়—সকলেই জানিত, তিনি কি করেন, কি বলেন,—এজন্য এই অংশের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু জীবনের প্রান্ত ভাগে অবস্থান্তর ঘটিল—বাল-সূর্য্য তমসাবৃত জগৎকে সহসা যেমন চমকিত করিয়া সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল—অস্তগামী সূর্য্যের অন্তলীলা পর্য্যবেক্ষণে সকলের তেমনি হৃদয় আকৃষ্ট হয়;—আর কিছুকাল পরে সে কমনীয় কান্তি অন্তর্হিত হইবে, আর দেখা যাইবে না—সে সুললিত পদাবলি-জড়িত হিতোপদেশ আর শুনা যাইবে না—সিদ্ধার্থ বৃদ্ধ হইয়াছেন—বয়স অশীতি বৎসর; শেষ দেখা দেখিয়া লইতে সকলেই উৎসুক হইল; শেষ কথা শুনিয়া লইতে সকলেই কর্ণ পাতিয়া দিল। তখন আশাও জন্মিয়াছিল, যদি কিছু বলিবার অবশিষ্ট থাকে, যাত্রা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, শেষ কথাগুলি মন খুলিয়া বলিয়া যাইবেন; শ্রীবৃদ্ধিশীল ধর্ম্ম মতের প্রচারে যেখানে যাহা বিসম্বাদী হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা করিয়া যাইবেন, তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার ধর্ম্ম সমাজ কিরূপে চলিবে, তাহারও উপদেশ দিবেন। পালিভাষায় রচিত মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র তাঁহার অন্তকালের আখ্যায়িকা। এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন—ইহা হইতেই তথাগতের শেষ কয়েক দিনের ইতিবৃত্ত আমরা সংগ্রহ করিলাম। আচার্য্য রিস ডেভিস বলেন, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বা তৃতীয় শতাব্দীর আরম্ভে, মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র বর্ত্তমান আকারে গঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ, রাজগৃহ হইতে কুশীনগর মুখে চলিয়াছেন। কুশীনগর হিরণ্যবতী তটে, বর্ত্তমান নাম কাশিয়া, তাঁহার জন্মভূমি কপিলবস্তু হইতে অনতিদূরে; রাজগৃহ হইতে উত্তর মুখে যাইতে হয়। তথাগত যেখানে জাহ্নবী উত্তীর্ণ হইলেন, এখন সেখানে পাটলিপুত্র অবস্থিত। তখন পাটলিপুত্র একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। জাহ্নবী উত্তীর্ণ হইবার সময়, পাটলিগ্রামের অবস্থান নিরীক্ষণ করিয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, একদিন পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিশালী প্রধান নগরীর পদবী বৈশালী নগরে লাভ করিবে। পাটলিপুত্র হইতে তিনি প্রস্থান করেন। পথে বেলুবগ্রামে তিনি শিষ্যদিগের নিকট বিদায়গ্রহণ করেন; বাসনা ছিল, বর্ষার তিন মাস বৈশালী নগরে নির্জ্জন-বাস ভোগ করিবেন। বেলুব গ্রামে তাঁহার বড় পীড়া হয়। সেই পীড়ায় জীবন সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু তখন শিষ্যগণ সঙ্গে ছিল না—তাহাদিগকে কিছু বলিতে তখনও অবশিষ্ট ছিল—সুতরাং তখন মরা হইল না। মানসিক বলে, বুদ্ধ শারীরিক ব্যাধিকে পরাস্ত করিলেন। প্রভুকে পীড়িত দেখিয়া, আনন্দ সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন—ব্যাধিপরাহত দেখিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন,—"প্রভু, আপনাকে পীড়িত দেখিয়া আমি সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, আমার দেহ বলশূন্য হইয়াছিল—সেই কষ্টের সময় আমার একমাত্র ভরসা ছিল, সংঘ সম্বন্ধে তথাগতের

অভিপ্রায় কি, ব্যক্ত না করিয়া তথাগত কখন নির্ব্বাণ প্রবেশ করিবেন না—এখন আপনাকে সুস্থ দেখিতেছি, এখন আপনি অনেক ভাল হইয়াছেন।" তথাগত বলিলেন—"আনন্দ, এখন সংঘ পক্ষে আমার আর প্রয়োজনীয়তা কি? আমার ধর্ম্মমত সর্ব্ব-সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছি, কখন বিশিষ্ট (Esoteric) বা সাধারণ (Exoteric) বলিয়া বিভিন্ন করি নাই। আনন্দ, উপদেশ দিতে বুদ্ধ কখন বিস্মৃত হন নাই। সংঘ শাসনে বা সংঘকে আপন অধীনস্থ করিতে যাহার বাসনা থাকে, ভবিষ্যতে সংঘ কিরূপে চলিবে, তিনি বলিয়া যাইতে পারেন। সংঘ শাসনে বা সংঘকে আপন অধীন করিতে বুদ্ধের বাসনা নাই—তবে তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি বলিয়া যাইবেন? আমি বৃদ্ধ ও জীর্ণ হইয়াছি, বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছে, —আমার তীর্থ ভ্রমণ শেষ হইল। আনন্দ, আপনি আপনার আদর্শ হও, আপনাতে আপনি আশ্রয় লও, অন্য আশ্রয়ের প্রার্থী হইও না। সত্যই তোমার আদর্শ, সত্যই তোমার আশ্রয় হউক, অন্য আশ্রয়ের প্রার্থী হইও না। আমার অবস্থান কালে বা প্রয়াণ-অন্তে যে আপনি আপনার আদর্শ ও আশ্রয় হইবে,—অন্য আশ্রয়ের প্রার্থী হইবে না, আনন্দ, সেই আমার অগ্রতম শিষ্য সম্মার্গগামী।"

অনন্তর ভিক্ষাভাজন হস্তে বৈশালী প্রবেশ করিয়া, তথাগত নিয়মিত প্রথামত ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে মারপিশুন তাঁহাকে নির্ব্বাণ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহাকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন,—আমার নির্ব্বাণ জন্য, মার, তুমি চিন্তিত হইও না—আর অল্প দিন পরে সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাস অন্তে তথাগত নির্ব্বাণ প্রবেশ করিবেন। সেই দিন অপরাহ্নে বৈশালীর নিকটস্থ জনপদবাসী ভিক্ষুদিগকে সমবেত করিয়া বুদ্ধ এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"শিষ্যগণ, যে সম্যক সম্বোধি আমি লাভ করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিতরণ করিয়াছি, উহার তাৎপর্য্য সম্যক অনুভব কর, উহাকে অবলম্বন কর, উহার উন্নতি সাধন কর এবং উহার আদেশানুযায়ী আচরণ কর, সর্ব্বদা শিক্ষা-কাম হও, তাহা হইলে এই বিশুদ্ধিমার্গ বহু দিন অক্ষুণ্ণ রহিবে, অনেকের সুখ সম্পদ শান্তি ও সৌভাগ্য বিধান হইবে। সে সম্যক সম্বোধি কি?—চতুরেকাগ্র প্রণিধান, (স্মৃত্যুপস্থান) চতুর সমপ্রধান, চতুর ঋদ্ধিপদ, পঞ্চ বল, পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়, সপ্তবুদ্ধি-অঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ। চতুর সত্যপন্থা (স্মৃত্যুপস্থান) সমপ্রধান ও ঋদ্ধিপদ, পঞ্চ মনোবল ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, সপ্ত বদ্ধ্যঙ্গ ও অষ্ট আর্য্যমার্গ। ভিক্ষুগণ, এই সম্বোধি আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, এই সম্বোধি তোমাদিগকে শিখাইয়াছি—তোমরা ইহা অভ্যাস কর, প্রণিধান কর, প্রচার কর। জগতের প্রতি করুণা করিয়া, সদ্ধর্ম্মের বিলয় নিবারণ করিতে, দেবনরের মঙ্গল হেতু, তোমরা এই সম্বোধি-সম্মত সদাচরণ করিবে। পদার্থ মাত্রের জরা বার্দ্ধক্য অপ্রতিবিধেয় প্রযত্নে নির্ব্বাণ সাধন কর, তথাগতের পরিনির্ব্বাণ আশু সম্ভাবী, তিন মাস পরে আমার জীবিত লীলার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। আর এক দিন বৈশালী বাস করিয়া, তথাগত, এ জন্মের মত বৈশালী হইতে বিদায় লইলেন। হিরণ্যবতী পাদ-ধৌত কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছিলেন। বৈশালী হইতে তিনি কুশীনগর মুখে প্রস্থান করিলেন। পাবানগরে স্বর্ণকার চণ্ডের গৃহে আতিথ্য গ্রহণকালে বরাহ মাংস ভক্ষণ করিয়া যে নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পাবানগর হইতে জীর্ণপ্রাপ্ত ব্যাধিযুক্ত দেহে কাকুৎস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি কুশীনগরে প্রবেশ করেন।

হিরণ্যবতী তটে, যমজ শালমূলে, আনন্দ শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, শ্রান্ত দেহে বুদ্ধদেব তদুপরি উত্তর-শিরে শয়ন করিলেন। আনন্দ নিকটে বসিলেন—তখনও তথাগত তাঁহাকে কত সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। সে উপদেশ আর শুনিতে পাইবেন না—স্নেহ পূর্ব্বক তেমন মিষ্ট কথা আর কেহ বলিবে না, এই কথা হৃদয়ে জাগিবামাত্র শান্ত সন্ন্যাসী বিচলিত হইয়া উঠিলেন, আনন্দ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। এমন শিষ্য দুর্ঘট, এমন আচার্য্য ত মিলেই না।

তথাগত, আর এক জন শিষ্য দ্বারা আনন্দকে ডাকাইয়া আনিলেন। আনন্দ, চক্ষু মুছিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক, অবনত মস্তকে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—"আনন্দ, রোদন করা, দুঃখ করা উচিত নহে। আমি কি বলি নাই, যাহা ভালবাসা যায়, যাহা সম্ভোগ করা যায়, তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে, বলপূর্ব্বক তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। যাহা কৃত, জন্মে বা বৃদ্ধি পায়, তাহাই বিলয়-শীল, এক দিন চলিয়া যাইবে। যত্ন কর, ক্লেশ-শূন্য হইবে।"

তদনন্তর রজনী সমাগত হইলে, কুশীনগরবাসী মল্লগণ সপরিবারে মুমূর্ষু গুরুদেবের নিকট বিদায় লইবার জন্য, দলে দলে, শালকুঞ্জে আসিতে লাগিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, হয়ত আমার মরণান্তে তোমরা বলিবে, আমাদের আর গুরু নাই। এরূপ বিবেচনা করিও না, যে ধর্ম্মবিনয় আমি শিখাইয়াছি ও প্রচার করিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহারাই তোমাদের সম্মাননীয়। অনন্তর সমবেত শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যাহা জন্মে, তাহারই লয় হয়, অবিরত সাধন কর। এই কয়েকটী শ্রীমুখের শেষ কথা। পরক্ষণেই তিনি সমাধি নিমগ্ন হইলেন—বিভিন্ন পর্য্যায় পর্য্যটন করিয়া, সেই মহান্ আত্মা অন্তিমে নির্ব্বাণ প্রবেশ করিল। রজনী প্রভাত হইলে, কুশীনগরবাসী মল্লগণ তাঁহার মৃতদেহ ভস্মসাৎ করিল।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

উপন্যাসের চরিত্র-চিত্র।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা পূর্ব্বে, ক্রমে ক্রমে নভেলের চরিত্র-চিত্রের আবশ্যকতা দেখাইয়া দিয়াছি, এবং চরিত্র-চিত্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার চরিত্র-চিত্রের কথা বলিয়াছি। উক্ত তিন প্রকার চরিত্র-চিত্র ব্যতীত, এক্ষণে কোন কোন নভেলে আর এক প্রকার চরিত্র-চিত্র দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত কবিত্ব-পূর্ণ ও শিল্প-চাতুর্য্য-পূর্ণ বোধ হয়। পূর্ব্বকার চরিত্র-চিত্রে চরিত্রের স্ফূর্ত্তি ও বর্ণনা করা, অথবা চরিত্র গঠনের উপযোগী উপকরণ গুলি দেখাইয়া দেওয়া যেরূপ উদ্দেশ্য, এ শ্রেণীর চরিত্র-

চিত্রে সে রূপ উদ্দেশ্য নাই। ইহাতে চরিত্র স্বাভাবিক হইল কি না, সাধারণ সংসারে যেরূপ পাওয়ার সম্ভব, এরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইল কি না, তাহা দেখিবার তত আবশ্যক নাই। ইহাতে আমাদের মনের এক একটী বৃত্তিকেই মনুষ্যকারে দেখাইয়া, তাহাদেরই গতি, শক্তি ও কার্য্য প্রণালী দেখান হয়। এক একটী বৃত্তি যেন এক একটী প্রকৃত ব্যক্তি, অথবা এক একটী চরিত্রে যেন একটী মাত্র বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি নাই, এরূপে অঙ্কিত করা হয়। মনে কর, স্ত্রীলোকের সন্তান-স্নেহ বৃত্তিটীর কার্য্য প্রণালী দেখাইতে হইবে। নভেল-লেখক, সে চরিত্রে যেন আর কোন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, অথবা থাকিলেও তাহা এই বৃত্তির দ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়াছে, এই রূপে দেখাইয়া তাহার উপর সংসারিক অন্যান্য ঘটনার কার্য্য দেখাইয়া দেন। কত বিপদে পড়িয়া, কত অত্যাচার সহ্য করিয়া, কত যন্ত্রণা পাইয়া, সে বৃত্তি নারী-হৃদয়ে কিরূপ কার্য্য করিল, তাহা কবি দেখাইলেন, —আমাদের মনে তাহার চিত্র দৃঢ়তর রূপে অঙ্কিত হইল। এইরূপে এই শ্রেণীর নভেলে, আমাদের মনোবৃত্তি গুলি একে একে লইয়া, তামাদের এক একটীতে এক একটী চরিত্র চিত্রিত করিয়া, কৌশলে আমাদিগকে এই বৃত্তি গুলির স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দেন। বাস্তবিক এরূপ চরিত্র চিত্র করা অতি গুরুতর কাজ; এই জন্যই বোধ হয়, ইহাতে অল্প লোকেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়া ও মনের বৃত্তিগুলির কার্য্য দেখাইয়া দেওয়া, দার্শনিকদিগেরই কার্য্য। সে বৃত্তি গুলির শক্তি এবং বাহ্য জগতের সহিত, বিশেষ বিশেষ ঘটনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেওয়া, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের কাজ। সে বৃত্তি গুলিকে আবার জীবিত করিয়া, তাহাদিগকে মনুষ্য রূপে পরিণত করিয়া, স্বাভাবিক মনুষ্যের মত তাহাদের কার্য্য প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া, অত্যন্ত উচ্চ দরের কবি শিল্পীর কার্য্য। সুতরাং একাধারে যিনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, উচ্চ দরের কবি ও শিল্পী এবং সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিই কেবল চেষ্টা করিলে এরূপ অসাধারণ চরিত্র চিত্রিত করিতে পারেন। সেই জন্য এরূপ চরিত্র চিত্র করিতে অল্প লোকেই সাহসী হইয়াছে—এবং অতি অল্প লোকেই তাহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

এইরূপ চরিত্র-চিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নভেল-লেখক ভিক্টর হুগো। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার ন্যায় উচ্চ দরের কবি ও দার্শনিক ফ্রান্স দেশে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার Les miserabilis নামক নভেলের প্রায় অধিকাংশ প্রধান চরিত্র চিত্রই এই শ্রেণীর। যিনি এই নভেল পড়িয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, ফেন্‌টাইন্ অথবা সন্তান বাৎসল্য, জেভার্ট অথবা কর্ত্তব্য জ্ঞান, কত সুন্দররূপে এবং প্রকৃত চরিত্রের ন্যায় কেমন শিল্পাচাতুর্য্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। হিউগোর Hanchback or Notre Dame of Paris নামক অন্য একখানি নভেলের প্রায় সমস্ত চরিত্রই এই প্রকার। প্রত্যেক চরিত্রেই বর্ণনীয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি, পরিণতি, তাহার অদম্যগতি ও অপরিসীম শক্তি এবং অবশেষে সেই বৃত্তির চরম পরিণতিতে জীবনের আহুতি ও বিনাশ, কত আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যে যেমন Personification,

আর্য্যদের সংগীতের রাগিণী প্রভৃতির যেরূপ রূপ-কল্পনা, আর চিত্রকরের যেরূপ মনোবৃত্তি বা শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিচিত্র-কল্পনা, নভেলের এই শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রেও সেইরূপ মনোবৃত্তিগুলির চরিত্র ও কার্য্য কল্পনা হইয়া থাকে। এরূপ চরিত্র-চিত্র, বাস্তবিক মনোবৃত্তি গুলির বিশ্লেষণ (Analysis) মাত্র। পূর্ব্বে যেমন তৃতীয় প্রকার চরিত্র-চিত্রে, চরিত্রের এবং তাহার সংগঠনকারী শক্তিগুলির বিশ্লেষণের (Analysis) কথা বলা হইয়াছে—এশ্রেণীর চরিত্রে তেমন বিশ্লেষণ হয় না। ইহাতে চরিত্রগঠনকারী শক্তিগুলির পরিবর্ত্তে, কেবল মনোবৃত্তিগুলির বিশ্লেষণ করা হয় মাত্র। যাহারা ইংরাজী ন্যায়-শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অনুমান প্রমাণের মধ্যে বিয়োজক প্রণালী (Method of difference) দ্বারাই অভ্রান্ত সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিয়োজক প্রণালীর দ্বারা যেমন কোন একটী কারণের প্রকৃত কার্য্য দেখাইবার জন্য, পরীক্ষা দ্বারা একে একে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কারণ ও তাহার কার্য্যগুলি, কার্য্য ও কারণ পরম্পরা হইতে বাছিয়া লইয়া পরিত্যাগ করা হয়, অথবা কতকগুলি কারণ ও তাহার কার্য্য সমষ্টির উপর আর একটী কারণ মিলাইয়া কার্য্যের পরিবর্ত্তন বা নূতন কার্য্যের আবির্ভাব দেখান হয়,—এইরূপে সুস্পষ্ট করিয়া কার্য্য কারণ বুঝাইয়া দেওয়া হয়; সেইরূপ, নভেলে এই শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে মনোবৃত্তিগুলি ও তাহার কার্য্যগুলি, একে একে একটী একটী বৃত্তি লইয়া ও তাহার কার্য্য ও শক্তি পরীক্ষা করিয়া, সমস্ত বৃত্তিগুলিরই স্বাধীন কার্য্য ও তাহার শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হয়। সুতরাং এরূপ চরিত্র-চিত্রে সম্পূর্ণ মনুষ্য অঙ্কিত না করিয়া, তাহার সমুদায় বৃত্তিগুলি ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অঙ্কিত না করিয়া—কেবল একটী মাত্র বৃত্তিসম্পন্ন মানুষের চরিত্র অঙ্কিত করা হয়—অথবা আমাদের মনের অন্যান্য বৃত্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাতে, বা সংযোগ ও বিয়োগে যে সমষ্টি বা Compound বৃত্তির কার্য্য স্বভাবতই হইয়া থাকে, এবং যাহাতে কোন বিশেষ বৃত্তির গতি ও কার্য্য প্রণালী সহজে উপলব্ধি হয় না, সেরূপ বৃত্তিগুলির পরস্পর সংশ্লিষ্ট কার্য্য না দেখাইয়া, কেবল কোন একটী মাত্র চরিত্রের স্বাধীন কার্য্য দেখাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের মনের নানারূপ বৃত্তি আছে। সকল মনে সকল বৃত্তি প্রবল থাকে না—চরিত্র বিশেষে তাহার কতকগুলি বৃত্তি অথবা সম্ভবত কোন এক বৃত্তিই প্রবল থাকে—সুতরাং সেরূপ চরিত্রের কার্য্য-মূলে সেই বৃত্তিগুলি অথবা সেই একমাত্র বৃত্তিই মূলকারণ স্বরূপ থাকে। সমস্ত বৃত্তি গুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব নহে। অথবা সেরূপ অবস্থা হইলেও, এক বৃত্তির কার্য্য অন্য বৃত্তির দ্বারা প্রায়ই প্রতিহত হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখাইয়া, কোন নভেল-লেখক কোন চরিত্র কল্পনা করিয়া তাহার কার্য্য দেখাইয়াছেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু সচরাচর নভেল-লেখকগণ কতকগুলি বিশেষ বৃত্তি-সম্পন্ন চরিত্র লইয়া তাহাই অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। আর যাঁহারা এই শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহারা প্রধানত একটী মাত্র বৃত্তি-সম্পন্ন চরিত্র দেখাইয়া থাকেন। এরূপ চরিত্র সংসারে মিলে না—তবে কখন কখন একটী

মাত্র বৃত্তির প্রাধান্য মনুষ্যে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা অবস্থা বা সময় বিশেষে কোন বিশেষ বৃত্তির প্রাবল্য মাত্র হইয়া থাকে। অতএব এরূপ চরিত্র কখন স্বাভাবিক (Realistic) হইতে পারে না—কাল্পনিকই (Idealistic) হইয়া থাকে। কিন্তু কবি সেই চরিত্র ও তাহার কার্য্যপ্রণালী, এবং সে বর্ণিত চরিত্রের বৃত্তির কার্য্য এবং পরিণতি এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত বর্ণনা করেন যে, তাহা কখনই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা একে একে, সচরাচর যে চারি প্রকার চরিত্র নভেলে চিত্রিত হয়, তাহার বিষয় বর্ণনা করিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই চরিত্র চিত্রই নভেলের প্রাণ স্বরূপ। চরিত্র-চিত্রের যতদূর স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা যে পরিমাণে স্বাভাবিক, অথবা স্বাভাবিক নিয়মের অধীন ভাবে বর্ণিত হয়, সেই পরিমাণে নভেলের শ্রেষ্টত্ব রক্ষা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার চরিত্র-চিত্রে যে স্বাভাবিক ও কাল্পনিক আদর্শ চরিত্রের বর্ণনা হয়, এবং ঘটনা ও অবস্থা বিশেষের দ্বারা সেরূপ চরিত্রের যে স্ফূর্ত্তি হয়; তাহা যতদূর বিশদ, যতদূর স্বাভাবিক ও সচরাচর সংসারে যেরূপ দেখা যায়, তাহার অনুরূপ হয়—ততই সেরূপ চরিত্র-চিত্রের শিল্প-কৌশল প্রশংসিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, তৃতীয় প্রকার চরিত্র-চিত্রে যে সকল কারণ পরম্পরার দ্বারা চরিত্রের সংগঠন ও তাহার স্ফূর্ত্তি হয়, এবং যে যে কারণে তাহার যেরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিণতি হয়, সেই সকল কারণ ও ঘটনা যতদূর স্বাভাবিক ও যতদূর বৈজ্ঞানিক সত্যানুযায়ী হয়, ততই তাহা অধিক আদরণীয় হইয়া থাকে।

আমরা চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। য়ুরোপীয় নভেল হইতে সে সকল চরিত্রের দৃষ্টান্তের বিশেষরূপ অবতারণা করিয়া, তাহা অধিকতর পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করি নাই। আজ কাল বাঙ্গালায় যে দুই একজন উচ্চদরের নভেল-লেখক আছেন, তাহাদের নভেল হইতে দুই একটী চরিত্র মাত্র লইয়া চরিত্র-চিত্রের বিজ্ঞান ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইয়া, বঙ্কিম বাবুর নভেল গুলির সংক্ষেপ সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। নভেল সম্বন্ধে যে যে বিষয় পূর্ব্বে বলা উচিত, তাহা না বলিয়া, আমরা এস্থলে বঙ্কিম বাবুর নভেল গুলির উপর কোন কথা বলিব না। কেবল বাঙ্গালী নভেল-লেখকদের চরিত্র-চিত্র ও এবিষয়ে তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য, এস্থলে বঙ্কিম বাবুর নভেলের কথা উল্লিখিত হইল মাত্র।

চরিত্র-চিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার পূর্ব্বে, আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এক্ষণে আমাদের দেশে নভেল-যুগ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগান্তর (Transitional) অবস্থায় কোন বিষয়েরই বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সুতরাং নভেলের চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে যে অধিক শিল্প-নৈপুণ্য আমরা দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করা দূরাশা মাত্র। বঙ্কিম বাবু যখন প্রথমে নভেল লিখিতে আরম্ভ করেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই সময়ই বাঙ্গালা নভেলের প্রথম আরম্ভ মাত্র। সুতরাং বঙ্কিম বাবুর প্রথম নভেলগুলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার চরিত্র-চিত্র ব্যতীত, অন্য কিছু পাইবার আশা করা যায় না। তাঁহার প্রথম অবস্থার নভেল, দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে অধিকাংশই প্রথম শ্রেণীর চরিত্র এবং কোন

কোন স্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনীতে যে কোন কোন ইংরাজী নভেলের আভাস আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলেও, তাঁহার জগৎসিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ, ওস্মান—এবং হেমচন্দ্র বা মৃণালিনী সমস্তই যে প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রের অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু সেই সময়েই বঙ্কিম বাবু দুই একটী অতি উচ্চ দরের দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া যে আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তি ও শিল্পকৌশলের আভাস দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার চিত্রিত বিমলা বা আয়েষা, মনোরমা বা পশুপতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাল্পনিক চরিত্র-চিত্রের অতি সুন্দর উদাহরণ। বঙ্কিম বাবু, অতি অল্প সংখ্যক ঘটনা দ্বারা চরিত্রগুলির যেরূপ সুন্দর স্ফূর্ত্তি করিয়াছেন, অতি সামান্য ঘটনার দ্বারা তাহাদের মনের ঘাত প্রতিঘাত, গতি ও কার্য্য যেরূপ চমৎকার কৌশলের সহিত দেখাইয়াছেন, অতি অল্প কথায় যেমন তিনি চরিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন, অনেক য়ুরোপীয় খ্যাত-নামা নভেল-লেখক সেরূপ পারেন নাই।

সে যাহা হউক, আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে মানুষের ইচ্ছা (free will) সাংসারিক ঘটনার দ্বারা কোন রূপ বিচলিত হয় না, প্রায় কোন ঘটনাই তাঁহাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না—এই রূপ ভাবেই বর্ণিত হয়। এই গুলিই তাহাদের মতে উচ্চদরের চরিত্র, ইঁহারা মানুষের মানুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া, সকল প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া, নির্ব্বিঘ্নে সংসার অতিক্রম করে, কিছুতে বিচলিত হয় না। তবে কতকগুলি চরিত্র আছে, ঘটনাবলির দ্বারা অভিভূত হওয়া বা অবস্থা মাত্রে বিচলিত হওয়াই তাহাদের প্রকৃতি। সেরূপ চরিত্রকেও এই প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বঙ্কিম বাবুর বিদ্যা দিগ্‌গজ এইরূপ চরিত্র। এই শ্রেণীর মধ্যে যে উচ্চদরের চরিত্রের কথা উল্লেখ করিলাম, বঙ্কিম বাবু সে গুলি অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

এই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র ভিন্ন, বঙ্কিম বাবু তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্রও চিত্রিত করিয়াছেন। এই সময় বঙ্কিম বাবুর নভেল রচনার দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু কপালকুণ্ডলায় আশ্চর্য্য চরিত্র-চিত্র এ সময়ে না হইলেও, ইহাতে তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রের অতি সুন্দর আদর্শ দেখান হইয়াছে। একটী কপালকুণ্ডলা ও একটী পদ্মাবতী হইতে যে সকল ঘটনা ও অবস্থার আবশ্যক, বঙ্কিম বাবু একে একে তাহা প্রায় সমুদায়ই দেখাইয়াছেন। ইহাদের চরিত্র সংগঠনকারী শক্তিগুলির ক্রিয়া এরূপ সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে যে, সকলেই অতি সহজে বুঝিতে পারে যে, সে শক্তিগুলির প্রভাবে এরূপ চরিত্র ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রই সংগঠিত হইতে পারে না। বিষবৃক্ষ ত চরিত্র-চিত্রের এক খানি ক্ষুদ্র কোষ (Encyclopædia)। ইহাতে সকল শ্রেণীর চরিত্রই কতক কতক চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীশ ও কমলমণি যেমন প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রের অতি উচ্চ আদর্শ, সেইরূপ সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার এই উভয় চরিত্রেই তৃতীয় প্রকার

চরিত্র-চিত্রের বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, দেবেন্দ্র ও হীরার চরিত্র-স্ফূর্ত্তি সম্বন্ধে, বঙ্কিম বাবু যেরূপ দক্ষতার সহিত ঘটনা গুলির সন্নিবেশ ও তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার শিল্প-কৌশল সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন; ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র। নগেন্দ্রের চরিত্র, কতকটা তৃতীয় শ্রেণীর হইলেও,আমরা ইহাকে চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্রই বলিতে পারি। তবে সাধারণ চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্র হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, নগেন্দ্রের প্রায় সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হইলেও পরিণামে তাহার উৎকট আকাঙ্ক্ষা, মোহজ বাসনার স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তাহার দ্বারা নগেন্দ্রের অন্যান্য সমস্ত বৃত্তিগুলি অভিভূত হইয়াছিল, এবং শেষে এইবৃত্তির স্বাধীন কার্য্য ও সময় বিশেষে অন্যান্য উচ্চতর বৃত্তির উপর তাহার প্রভাব দেখাইয়া, গ্রন্থকার নভেলের চরিত্রে উৎকট বাসনা বৃত্তির কার্য্য প্রণালী অঙ্কিত করিয়াছেন। তথাপি নগেন্দ্রের চরিত্র-চিত্রকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্র চিত্র বলিতে পারি না। প্রকৃত চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র বঙ্কিম বাবুর নভেলে আজিও দেখা যায় নাই।

বঙ্কিম বাবু তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, কপালকুণ্ডলা বা পদ্মাবতীর কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি! কিন্তু বঙ্কিম বাবুর আধুনিক নভেল গুলিতে এই শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিরূপে নগেন্দ্রের মত চরিত্র সংগঠিত হয়, কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহা গোবিন্দলাল হইয়া যায়; কিরূপ ঘটনা বলে কুন্দ, রোহিণীতে পরিণত হয়, বঙ্কিম বাবু তাহা বিশদ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; আবার কিরূপ ঘটনার পরিবর্ত্তনে প্রতাপ, অমরনাথ হইতে পারে; কিরূপ শৈবলিনী, লবঙ্গলতা হইয়া যায়, বঙ্কিম বাবু তাহা পরিস্ফুট করিতে গিয়া সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

সে যাহা হউক, অন্যান্য চরিত্র-চিত্রের উদাহরণ দিবার এ স্থলে আবশ্যক নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ স্থলে কেবল বঙ্কিম বাবুর নভেলগুলির চরিত্র চিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে—অন্যান্য নভেল-লেখকদের চরিত্র চিত্রের কথা বলা হইল না। বঙ্কিম বাবুর কবিত্ব ও তাঁহার নভেলের নভেলত্বের আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—এই জন্যই নভেলের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি—এবং দৃষ্টান্তও বঙ্কিম বাবুর নভেল হইতেই দেওয়া হইল। অন্যান্য নভেললেখকগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

যাহা হউক, নানা কথায় আমরা আলোচ্য বিষয়ের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা যে চারি প্রকার চরিত্র-চিত্রের কথা বলিলাম, তাহার প্রভেদ কার্য্য-ক্ষেত্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র কখন একত্রেই বর্ণিত হয়, কখন প্রথম ও তৃতীয়, বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রের চিত্র একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর নভেলে, প্রথম বা দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শ্রেণীর স্পষ্ট চিত্র সচরাচর পাওয়া যায় না।

যে সকল নভেল-লেখকগণ গার্হস্থ্য চিত্র আঁকিয়াছেন,তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রিত করিতে অত্যন্ত শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। স্বর্ণলতা বা কল্পতরু নভেলের আর কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে প্রথম শ্রেণীর চরিত্র এরূপ

সুন্দর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে,—সাধারণ চরিত্রের প্রতিচিত্র এত সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে যে, সাধারণত আর কোন বাঙ্গলা নভেলেই এ শ্রেণীর চরিত্র এত অধিক সুন্দর রূপে অঙ্কিত হয় নাই।

আমরা চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া ইহার উপসংহার করিব। আজ কাল বাঙ্গালায় অনেক পাঠক ও সমালোচক আছেন, যাঁহারা নভেল পড়িতে গিয়া, তাহার মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্র —নিজের ঘরের চরিত্র অঙ্কিত না দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হন—বোধ হয় নভেল পড়া বন্ধ করেন। ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর চরিত্র চিত্রেরই আদর করেন—অন্য শ্রেণীর চরিত্র চিত্র দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করেন। প্রমদার কি বামদাসের মত সাধারণ চরিত্র চিত্রকেই তাঁহারা ভালবাসেন, অন্য রূপ চরিত্রকে,অস্বাভাবিক বা অবাঙ্গালী বলিয়া উপেক্ষা করেন। ইহারা নভেলকে স্থানীয় (বা দেশীয় localise) করিতে চান, সাধারণ চরিত্রের (universal) সৌন্দর্য্য বুঝেন না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বালক প্রথমে ঠাকুরদাদার গল্প গুলিতে ভালবাসে। সেই ঠাকুরদাদার গল্পই ক্রমে (সংসারের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তনবাদ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয়) ঐতিহাসিক নভেলের আকার ধারণ করিয়া, অস্পষ্ট (crude) দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রে পরিণত হয়। পাঠকগণও বাল্যকাল ত্যাগ করিয়া উদ্দাম পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন, এই শ্রেণীর নভেলও তাহার স্ফুটনোন্মুখ মনের উপযুক্ত ও উপাদেয় পদার্থ হয়। নভেলেও যেমন কল্পনা-পূর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র পরিত্যক্ত হইয়া তাহার দ্বিতীয় অবস্থায় অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক চরিত্র চিত্রিত হইতে আরম্ভ হয়, পাঠকও সেইরূপ যৌবনের কল্পনা-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, কঠোর সংসার মধ্যে পতিত হইতে আরম্ভ হইয়া, এই দ্বিতীয় স্তরের নভেলের উপর আকৃষ্ট হন। সুতরাং যে সকল পাঠক এই স্তরের লোক, অথবা যাঁহাদের মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া এই অবস্থায় আসিতে সমর্থ হইয়াছে—তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রের উপর সমধিক পক্ষপাতী। অতএব যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র (কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্র) ব্যতীত অন্য কোনরূপ চরিত্র-চিত্র ভালবাসেন না, তাঁহাদের মনের স্ফূর্ত্তি অধিক হয় নাই, বলিতে হইবে। তৎপরে, যখন নভেলে এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত হয়, এবং স্বাভাবিক চরিত্রের বহুতর দৃষ্টান্তের অভিনিবেশ দ্বারা, যখন ক্রমে আমরা তাহার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারি,—যখন চরিত্রের গঠন ও পরিবর্ত্তনের নিয়মাবলী আমরা বুঝিতে পারি; তখনই নভেল দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হয়। এবং সংসারে বহু দর্শন দ্বারা, যে সকল প্রতিভাশালী পাঠকের চরিত্র-বিশ্লেষণে কিছু ক্ষমতা জন্মিয়াছে, অথবা সেদিকে মনের গতি, ফিরিয়াছে, সেই সকল পাঠকই এরূপ চরিত্র-চিত্রে অধিক সন্তুষ্ট হইবেন, এবং তাহা হইতে উপকার বা আমোদ, উভয়ই প্রাপ্ত হইবেন। সে যাহা হউক, তৎপরে ভূয়োদর্শণ দ্বারা যখন সংসারের সাধারণ চরিত্রগুলির চরিত্র সংগঠনী বা পরিবর্ত্তনীয় শক্তিগুলি স্থির হইয়া, সেই শক্তির পরিমাণ স্থির করিবার সময় আইসে,—যখন সেই সকল শক্তির

qualitative analysis করিবার পর quantitative analysis করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই চরিত্র-চিত্রের এই তৃতীয় স্তর শেষ হইয়া চতুর্থ স্তর আরম্ভ হয়—এবং তখনই, নভেলে এক একটী মনোবৃত্তির চিত্র অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়।

আমরা পূর্ব্বে, চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকগণ সচরাচর বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালা নভেলে চিত্রিত চরিত্রগুলি যদি সাধারণ বাঙ্গালীর ন্যায় না হয়—তবে তোমার সমস্তই অস্বাভাবিক হইল;—ওরূপ চরিত্রের কোন সারবত্তা নাই। —বাঙ্গালায় কি শৈবলিনী বা শান্তি জন্মিতে পারে? এরূপ অস্বাভাবিক চরিত্র চিত্রের মত জঘন্য কার্য্য আর কি হইতে পারে? প্রমদা কি সরলার মত চরিত্র-চিত্রই ত প্রকৃত চরিত্র—তাহাই স্বাভাবিক। যাহা হউক, এই শ্রেণীর পাঠক সমালোচকের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের কথার মধ্যে কিন্তু কতক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। সকল জাতিরই জাতীয় চরিত্র আছে, এই জাতীয় চরিত্র বা national character সাধারণত, সে জাতির সকল লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভীরুতা, চাকুরিপ্রিয়তা, পরার্থভোজীতা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি যে কতকগুলি জাতীয় গুণ আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? (পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বিরক্ত হইবেন না--আমি মেকলে নহি) সেই রূপ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের আত্মত্যাগ, পতিভক্তি, সতীত্ব, সহিষ্ণুতা, ভীরুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি যে সাধারণ গুণ আছে, তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? উপরে যে দুই জাতীয় গুণের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার কোন কোনটী সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যে না থাকিতে পারে। সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রও এ স্থলে দেখাইবার আবশ্যক নাই; কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী মাত্রেরই কতকগুলি গুণ, অভ্যাস বা প্রকৃতির এরূপ আশ্চর্য্য সমাবেশ লক্ষিত হয় যে, অসংখ্য চরিত্র হইতেও বাঙ্গালী চরিত্র বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা, বাঙ্গালা নভেলে এরূপ সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্র না দেখিলে চরিত্র-চিত্রকে অস্বাভাবিক বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত নহেন।

বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ আমাদের আয়ত্বাধীন হইতেছে। শ্রেণীবিভাগই, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, কি রাসায়ণ বিদ্যাকে আমাদের আয়ত্বাধীন করিতেছে। এই রূপ শ্রেণীবিভাগের দ্বারাই, আমরা, সমস্ত মনুষ্যাদিগকে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ব করিতে পারি। আবশ্যক মত নানা প্রকারে, এই শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। তবে জাতি হিসাবে শ্রেণী বিভাগই, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ। উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার এই শ্রেণীবিভাগ দ্বারাই, তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছে। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, আমাদের কতকগুলি আদর্শ (বা type) বাছিয়া লইতে হয়। এবং যত গুলি সেই আদর্শের ন্যায় হয়, সমস্তই সেই টাইপের অন্তর্গত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই টাইপ গুলিই কেন্দ্র স্বরূপ, এবং ইহার অন্তর্গত সমস্তগুলিই ইহার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। যতই কেন্দ্র হইতে

দূরে যায়, ততই, সে টাইপ হইতে ভিন্ন হইতে আরম্ভ হয়, এবং শেষে অন্য টাইপ ভুক্ত হইয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা এই টাইপ বুঝাইতে গিয়া, অনেক অনাবশ্যকীয় কথা বলিলাম। মনুষ্যসমাজকেও এই রূপ type অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়, এবং সমস্ত বাঙ্গালী বা সমস্ত ইংরাজকে, এইরূপে এক এক টাইপ অন্তর্গত করিয়া, আমরা তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করি। সুতরাং বাঙ্গালী চরিত্র বলিলে, বাঙ্গালীর একটী আদর্শ আমাদের মনে উদয় হয়। যিনি যত দূর এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী, তিনি তত দূর বাঙ্গালী; আর যিনি যতদূর সেই টাইপ হইতে দূরবর্ত্তী, তিনি ততদূর অবাঙ্গালী। অতএব কোন চরিত্র-চিত্র দেখিলে, তাহা কতদূর সেই বাঙ্গালী টাইপের মত হইল, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এই জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। চরিত্র সংগঠিত হইতে যে সকল শক্তির অধিক প্রভাব দেখা যায়, তাহার মধ্যে সমাজ, দেশের অবস্থা সম্পর্কীয় লোকের দৃষ্টান্ত, পিতা মাতার, (এবং নূন্যাধিক পরিমাণে বংশের) গুণ প্রভৃতি কতকগুলি শক্তিই প্রধান। এমন কি, সাধারণত এই সকল শক্তিগুলিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং একজন বাঙ্গালী, জন্ম হইতে উল্লিখিত শক্তিগুলির প্রভাব সহ্য করিয়া বয়োবৃদ্ধি হইয়া বাঙ্গালীই হইবে। এই জন্যই প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীই—অধিক পরিমাণে—তাহার জাতীয় স্বভাবপ্রাপ্ত হইবে—ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী আদর্শের (টাইপ) নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে, বাঙ্গালীর আদর্শ স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক লোক, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশকাল পাত্র অনুসারে 'টাইপ' পরিবর্ত্তিত হইলেও, এক দেশে এক সময়ে ও এক জাতিতে, তাহা এক রূপই হইবে। বোধ হয়, এই কারণেই বাঙ্গালা-নভেলে যে চরিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা বাঙ্গালী টাইপের না হইলেই, অনেকে তাহাকে হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু উল্লিখিত শক্তিগুলিই চরিত্র সংগঠনের একমাত্র কারণ নহে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক কারণ আছে—যাহাতে চরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে,—এমন কি, চরিত্রকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিতে পারে। আমাদের পিতামহের সময়ে বাঙ্গালীর যে জাতীয় চরিত্র ছিল—এক্ষণে তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—অন্তত শিক্ষিতদলের মধ্যে তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে শিক্ষা, এবং বিদেশীয়দিগের সহিত আমাদিগের নানা বিষয়ে সংঘর্ষ, তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। অতএব জাতীয় চরিত্র—সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রও, কারণ বিশেষে, নূতন শক্তির বলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায়, ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র যে আরও অধিক পরিবর্ত্তন-প্রবণ, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। অতএব খাঁটি বাঙ্গালী আদর্শের চরিত্র-চিত্র না করিলে যে নভেল-লেখক অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম করেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ।

কিন্তু তাই বলিয়া, সাধারণ নভেল-লেখকগণ যদি চরিত্র-চিত্র করিতে গিয়া, এইরূপ টাইপানুসারে চরিত্র চিত্রিত না করেন, তবে তাঁহারপক্ষে ইহা বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া

পড়ে। প্রথম শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করিতে হইলে, এইরূপ টাইপ চরিত্রই অবলম্বন করিয়া চরিত্র চিত্র করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচরাচর যেরূপ চরিত্র পাওয়া যায়, এরূপ চরিত্রের তাহাই দর্পণ স্বরূপ, সুতরাং তাহাতে এই সাধারণ চরিত্র, এই type চরিত্র চিত্রিত করাই বিশেষ উচিত। এইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রেও এই টাইপ যতদূর সম্ভব, রক্ষা করা উচিত।

চরিত্র চিত্রের মূল তত্ত্ব এই যে, চিত্রিত চরিত্র, এই সাধারণ টাইপ হইতে যত বিভিন্ন হইবে, ততই তাহার সেইরূপ বিভিন্ন হইবার উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে হইবে। তখনই চরিত্র পরিবর্ত্তনকারী শক্তিগুলির বিশেষ পরিস্ফুট করিতে হইবে। তাহা না করিলেই চরিত্র, পাঠকের বোধগম্য হয় না; এবং সে চরিত্র চিত্রও স্বাভাবিক হয় না। সুতরাং এরূপ স্থলে চরিত্র পরিবর্ত্তনের কারণ গুলির বিশদ রূপে উল্লেখ করার আবশ্যক হয়। যাঁহারা গার্হস্থ্য নভেল লিখেন—এবং প্রথম শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই—ঘটনার দ্বারা সে চরিত্র স্ফুটিত করিলেই যথেষ্ট হইল।

তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্র চিত্রে যখন চরিত্র সংগঠনী ঘটনাগুলি বিশেষ রূপে উল্লিখিত থাকে—এবং যখন ঘটনাগুলির বর্ণনা দ্বারা চরিত্রের পরিবর্ত্তন বিশেষ রূপে বিবৃত হয়, তখন তাহাতে টাইপ চরিত্রের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক থাকে না। অতএব যাঁহারা বাঙ্গালা নভেলে, বাঙ্গালা চরিত্র চিত্রিত হয় নাই বলিয়া বিরক্ত হন, তাঁহাদের অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ না হইলেও, সকল অবস্থায় তাহা সঙ্গত নহে।

আমরা এ স্থলে চরিত্র চিত্র সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই চরিত্র চিত্রের বিষয় উপসংহার করিব। আর্য্যেরা, মনুষ্যদিগকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করেন;—সাত্বিক মনুষ্য, রাজসিক মনুষ্য, এবং তামসিক মনুষ্য। সাত্বিক মনুষ্য সংসারের কোন অবস্থাতেই, কোন ঘটনাতেই বিচলিত হয়েন না। ইহাদের free will বা মন সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকে। কিন্তু এ চরিত্র সাধারণ চরিত্র নহে—ইহা সংসারে কদাচিত দেখা যায়। লক্ষের মধ্যে একটী মাধবাচার্য্য, কি একটী রমানন্দ স্বামী দেখা যায় কি না, সন্দেহ। এগুলি প্রথম শ্রেণীর চরিত্র হইলেও অসাধারণ, এবং কোন অবস্থাতেই ইহাদের চরিত্র সংগঠনী শক্তি গুলির বর্ণনা করা বড় আবশ্যক করে না। রাজসিক চরিত্রই সংসারে সচরাচর পাওয়া যায়। এই চরিত্র গুলি, ঘটনা বিশেষের দ্বারা সংগঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারাই তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র চিত্রের বিশেষ উপযোগী। তামসিক চরিত্রের লোক, অথবা যে সকল নীচ লোক সংসারের ঘটনা জালে পড়িয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, এবং অকর্ম্মণ্য ও জড়বৎ হইয়া আছে,—তাহাদের চরিত্র চিত্র নভেলের তত উপযোগী নহে। কেবল চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করিতে ইহাদের আবশ্যক হয় মাত্র। যাহা হউক, আর্য্য ঋষিদের এইরূপ মনুষ্য শ্রেণী বিভাগ এখনও সাধারণে আদৃত হয় নাই, সুতরাং সে বিষয়ে এ স্থলে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

কেশবচরিত।*

এতদিন পরে, কেশব-জীবন কল্পনা বা স্বপ্ন-ক্রীড়ার সামগ্রী হইতে চলিল। চর্ম্ম-চক্ষে যাঁহার জ্যোতি-ভাঙ্গা রূপ দেখিয়াছি,—কর্ণে যাহার অমৃতবর্ষী মধুর কণ্ঠের মধুর কথা শুনিয়াছি, সেই মহাত্মা আজ কোন্ অদৃশ্য, অননুভূত রাজ্যে,—কি অবস্থায় রহিয়াছেন, ভাবিতে কে পারে? কেশবের শরীর আজ মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে,—কল্পনায় ভিন্ন আর তাহা দেখিবার সাধ্য নাই; সে স্বর বায়ুতে চিরকালের তরে মিলাইয়া গিয়াছে,—কল্পনা ভিন্ন তাহা আর ধারণা হয় না;—কেশবের সে গভীর চিন্তাপূর্ণ আত্মা কোন্ অচিন্ত্য অধরধামে প্রয়াণ করিয়াছে, অবোধ, অজ্ঞান মানুষ তাহা কি ভাবিবে? সকলই যেন আজ কল্পনা, সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। কোথা হইতে সোণার পাখী আসিল, কি স্বর্গীয় ভাব ঢালিল—আবার চখের পলক পড়িতে না পড়িতে কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে পলায়ন করিল। এ সকল ভাবিতে বসিলে—প্রাণ অস্থির হয়—মানবজীবনকে কেবলই মায়ার ক্রীড়া বলিয়া মনে হয়। মানবজীবন মায়াময়—স্বপ্নময়—প্রহেলিকাময়। এই ছিল, এই নাই। দেখিতে না দেখিতে আগমন, নয়ন ভরিয়া দেখিতে না দেখিতে—প্রাণ জুড়াইতে না জুড়াইতে, তিরোধান। সুখ, দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, বিপদ সম্পদ—সকল নিমেষের মধ্যে একাকার হইয়া গেল। এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার অস্তিত্বে দেশ কাঁপিত,—যাঁহার মহত্ত্ব-স্মরণে লোকের মন হিংসা পীড়নে মলিন হইত, অথবা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইত,—আজ তাঁহার জীবন স্বপ্ন কাহিনী—শুধুই মায়ার খেলা বলিয়া বোধ হইতেছে। কেশবের সহিত, কেশবের সকলই চলিয়া গিয়াছে,—শরীর গিয়াছে, আত্মা গিয়াছে,—বুদ্ধি গিয়াছে, বিদ্যা গিয়াছে,—প্রতিভা গিয়াছে, জ্ঞান গিয়াছে;—রূপ গিয়াছে, তেজ গিয়াছে—কেশবের সকলই চলিয়া গিয়াছে; রহিয়াছে,—মানুষের মোহময় মন ভুলাইতে, কেবল তাঁহার অমূল্য জীবনী। সকল মহাত্মার জীবনীই এক আশ্চর্য্য মহাকাব্য বিশেষ,—কবিত্বময়, স্মৃতিময়, ভাবময়—কার্য্যময়। কেশব-জীবনী এক অপরূপ শাস্ত্র,—ইহাতে গদ্য আছে, পদ্য আছে,—ভাব আছে, লীলা আছে;—জ্ঞান আছে, কর্ম্ম আছে;—প্রেম আছে, ভক্তি আছে,—বল আছে, বীর্য্য আছে। বাস্তবিকই কেশবজীবন এক অপরূপ শাস্ত্র বিশেষ। যে শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এক জন মনুষ্যও স্বর্গরাজ্যে অগ্রসর হইতে সক্ষম, সে শাস্ত্র অমূল্য শাস্ত্র। যে জীবন, ব্রাহ্মসমাজকে এক পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, দ্বেষ হিংসা এবং অহঙ্কার-পীড়িত মনুষ্য-সন্তানেরা যাহাই বলুক না কেন, সে জীবন বাস্তবিকই এক আশ্চর্য্য শাস্ত্র। বেদ বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ গীতা ভাগবৎ, সকলই এ শাস্ত্রে সংমিলিত হইয়াছে। কেশবের তিরোধানে—পৃথিবী আজ এই অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়াছে। এই অমূল্য ধন বিনিময়ে পাইয়াই, আজ কেশব-বিয়োগ পৃথিবীর লোকেরা

* শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ এক টাকা।

সহ্য করিতে পারিতেছে; নচেৎ যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত, কল্পনাও করা যায় না। কেশবের অমূল্য জীবন কাহিনী এখন প্রতি গৃহে গৃহে ফিরিতেছে;—কত জনের নিকট কত বিভিন্ন রূপ ধরিতেছে। কেহ তাঁহাকে চতুর-শিরোমণি ভাবিতেছে,—কেহ বা ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিতেছে। যাহার ভাণ্ডারে যেমন জিনিস, সে তেমন উপকরণের ভাণ্ডার বলিয়াই কেশবজীবনকে ভাবিতেছে। ভাবিতেছে, আরো কত জনে কত রূপ ভাবিবে। ভাবনা এবং কল্পনার পথ, এতদিনে পরিষ্কার হইয়াছে। কল্পনার প্রশস্ত রাজ্য—এতদিনে কেশবজীবনে খুলিয়া গিয়াছে। কত ব্যাখাই হইবে,—কত কল্পনাময় লেখনীই চলিবে— কত চিন্তার সাগরই খেলিবে,—ঐ ক্ষুদ্র জীবনচরিতে। কেশব, কল্পনার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া, আজ কত জনের হৃদয়েই আনন্দলহরী খেলিতেছে। আজ কেশবের কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, আর কত ধর্ম্মবীরই আসরে নামিয়া কত গলাবাজি করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বাহাবা লইতেছে।—কত লেখকই কলম ধরিয়া বড় মানুষ হইবার চেষ্টা করিতেছে। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, নীরবে গত এক বৎসরের ঘটনা ভাবিলাম। যাহার শরীর মন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও ধর্ম্ম বা নীতি, সাধুতা বা পুণ্য, এক বিন্দুও পাওয়া যায় না, সেই লোকই ধর্ম্মান্দোলনের প্রধান নেতা হইয়া আসরে নামিল। যে দেশে বৃক্ষ নাই, এরণ্ডই সে দেশে বৃক্ষ। যে দেশে মানুষ নাই, পশুই সে দেশে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। কেশবের অভাবে গত বৎসর, সোণার বাঙ্গলায় কত বালকের মস্তিষ্ক-শূন্য আনন্দ-ক্রীড়া দেখিলাম। হায়, তবুও কেহ কেশবের স্থানে উপবিষ্ট হইতে সক্ষম হইল না;—এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম করিয়াও ঐ স্বর্ণ মুকুট কেহ আপন মস্তকে তুলিতে পারিল না। সুতরাং আনন্দ এবং উল্লাস—আজ নীরব। অন্য দিকে, কেশব-শোক-কাতর বন্ধুদিগের গভীর দুঃখও আজ তিল তিল করিয়া তিরোহিত হইতেছে। কেশব-জীবনীর উত্তরাধিকারী হইয়া, সকল শোক, বন্ধু বান্ধবেরা ভুলিতে পারিতেছেন। কেশব-জীবনী-ব্যাখা প্রথম যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র, কারণ এই দুঃখ পরিতাপের দিনে—এই অমূল্য জিনিস সকলের হাতে দিয়া তিনি পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে;—এই কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে।

এই গভীর শাস্ত্র—এক বৎসরে সম্যক্ আবিষ্কৃত হইবার নহে;—এই মহাকাব্য—এক বৎসরের অবসরে লিপিবদ্ধ হইবার নহে। তবুও শর্ম্মাজী আমাদের হস্তে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। কারণ তিনিই প্রথম এ অভাব পূরণ করিলেন। ইহার পর, সুযোগ্য লেখকের হস্তে এ শাস্ত্র আরো পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু পদ-প্রদর্শক—চিরঞ্জীব শর্ম্মা। ভট্ট মোক্ষমূলর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এ শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কিছুই হয় নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, তাঁহাকে আমরা পদ-প্রদর্শক বলিতে পারি না। পদ-প্রদর্শক হইলেন,—চিরঞ্জীব শর্ম্মা। কেশব-জীবন মহাকাব্যের প্রথম আবিষ্কারক যে উপযুক্ত লোক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ

তিনি কেশব-সঙ্গী,—কেশব-শিষ্য,—কেশব-ভক্ত, কেশব-জ্ঞানী। কেবল এ সকল তাঁহার উপযুক্ততার লক্ষণ নহে;—তিনি কবি, তিনি নীতিপরায়ণ;—তিনি ভক্ত, তিনি সাধক। কবি ভিন্ন মহাকাব্য লিখিতে কে পারে? নীতিজ্ঞ ভিন্ন—নীতি-পরায়ণ লোকের তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে? ভক্ত সাধক না হইলে, কে ভক্তের জীবন-মহত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে? কেশবচরিত আবিষ্কারকের যে যে গুণ থাকার প্রয়োজন, তাহা চিরঞ্জীব শর্ম্মার প্রায় সকলই আছে। কেশব চন্দ্র যদি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পণ্ডিত হইতেন, তবে চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার জীবনী লিখিবার উপযুক্ত পাত্র হইতেন না। কেশব-চরিত—উপযুক্ত লোকের হস্ত হইতেই প্রথম আবিষ্কার হইয়াছে। এই জন্য, আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে একথা না লিখিয়া পারি না—শর্ম্মাজী উদারতা ও ন্যায়ের তুলিকায় আঁকিয়া কেশব-চরিতকে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন নাই;—স্থানে স্থানে তিনি ঘটনা রূপান্তরিত করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাঁহার লেখনী আঁকা-বাঁকা হইয়া গিয়াছে; এই জন্য আমরা একটু মর্ম্মাহত হইয়াছি। মানুষ, চিরকাল মানুষ। মানুষের দোষ ত্রুটি—অসম্পূর্ণতা, চিরকাল থাকিবে। মানুষ, কখনই অভাব-শূন্য হইতে পারে না—কখনই সম্পূর্ণ দোষ-শূন্য হইতে পারিবে না। কেশবচন্দ্র—মানুষ ছিলেন, তাঁহার মধ্যে দোষ ত্রুটি, এ সকল থাকা সম্ভবপর। কিন্তু দোষ ত্রুটি থাকিলেও, কেশব, বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ। যাঁহারা কেশবকে দোষ-শূন্য করিয়া সাধারণে প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কেশবের বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করেন না, কারণ প্রকৃত কেশবচরিতকে তাহারা ঢাকিয়া রাখেন। কমলে কণ্টক না থাকিলে, চন্দ্রে কলঙ্ক না থাকিলে, —দিবস, রজনীর কালিমায় ঢাকা না পড়িলে,—সুখ, দুঃখের রেখায় চিত্রিত না হইলে, এ সকল কিছুই মনোহর হইত না। আত্মাতে শরীর না থাকিলে, শরীরে রিপু না থাকিলে, রিপুতে কলঙ্ক না থাকিলে, মানব-জীবন এত আদরের হইত না। শরীর আছে, কলঙ্ক আছে, রিপু আছে বলিয়াই জগতে সাধুতার এত আদর হইয়াছে, নচেৎ তুমি আমি সকলেই যদি রিপু-শূন্য সমান সাধু হইতাম, তবে ঐ নামের এত মাহাত্ম্য থাকিত না। রিপু না থাকিলে, রিপু জয়ে কি সুখ, মানুষ বুঝিত না। অধর্ম্ম না থাকিলে, ধর্ম্মের এত আদর থাকিত না। পাপী না থাকিলে পুণ্যাত্মাদের এত সম্মান হইত না। মানুষের মধ্যেও যদি কলঙ্ক বা দোষ না থাকিত, তবে মানব-জীবন এত মধুর হইত না। দুঃখের কোলে সুখ, বিপদের কোলে শান্তি,—পাপের কোলে পুণ্য পাইলে কে না সুখী হয়? কেবলই যে সুখ পায়, সে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী নয়; কারণ সুখ যে কি, তাহাই সে বুঝিতে পারে না। এই জন্যই মনে হয়, মানুষে দোষ ছিল বলিয়াই বুঝি মানব-জীবন এত আদরের হইয়াছে,—আপনার নিকট আদরের—এবং অন্যের নিকট আরো আদরের। লেখক বলুন আর নাই বলুন,—কেশব যখন রক্তমাংসধারী মানুষ ছিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে কলঙ্ক ছিল, পাপ ছিল, অপবিত্রতা ছিল। আমরা তাহা জানি,—দেশের সকলেই তাহা জানে। ঢাকিতে যাইয়া,—দোষ ত্রুটিকে পোষকতার

পোষাকে ঢাকিতে যাইয়া, গ্রন্থকার, কেশবের জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়াছেন। কেশব আপনি কতবার বলিয়াছেন—"আমি পাপী, আমাকে সকলে পাপী বলিয়া জানিও।" সেই কেশবের জীবনী লিখিতে যাইয়া, গ্রন্থকারের উদারতা এবং ন্যায়ের পথকে অতিক্রম করা ভাল হয় নাই,—ইহাতে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, এবং কেশবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিতে না পারিয়া গালি দিবে। সত্য যাহা, তাহা চিরকাল সত্য থাকিবে;—ঢাকিয়া তাহাকে কে চাপা দিতে পারে? কেশব জীবনে যে অন্যায় করিয়াছেন, সে অন্যায়কে চাপা দিতে যাইয়া গ্রন্থকার যে অনুদারতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি; কারণ তাঁহাকে আমরা ন্যায়-পরায়ণ সরল বিশ্বাসী বলিয়া জানি। আমরা কেশবচন্দ্রের ঐ সকল দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াও, কেশবকে বাঙ্গালীর আদর্শ বলিয়া মনে করি,—কারণ কেশবের দোষ যদি এক গুণ থাকে, তবে মহত্ত্ব দশগুণ ছিল। কেশবের চিন্তাশক্তি, কেশবের প্রতিভা ও বুদ্ধি,—বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেম, এ সকল বাঙ্গালীর আদর্শ। যতদিন পৃথিবীতে এ সকলের আদর থাকিবে, শত সহস্র দোষযুক্ত হইলেও, কেশব ততদিন পৃথিবীর পূজা পাইবেন। যতদিন পৃথিবীতে মহত্ত্বের আদর থাকিবে, ততদিন কেশবচন্দ্র সেন, একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া সম্মান পাইবেন; কোন লোকের সাধ্য নাই, কেশবের সে উজ্জ্বল মহত্ত্বকে ঢাকিয়া রাখে। কিসের ভয়?—গুণীর আদর জগৎ করিবে না? ভক্তের আদর করিবে না?—হিতৈষীর আদর করিবে না?—প্রেমিকের আদর করিবে না?—বীরের সম্মান করিবে না?—কিসের ভয়,—এ অমূল্য জীবনে সহস্র দোষ থাকিলেও, ইহা এক আশ্চর্য্য শাস্ত্র—বেদ বেদান্ত অপেক্ষাও মহৎ। কেশবজীবনী চিরকাল মানবকে শিখাইবে এবং সৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিবে। করিবে কেন?—করিতেছে। বঙ্গপ্রদেশে আজ যে এত আন্দোলন দেখিতেছি,—ইহার সকলের মূলেই ঐ মহাত্মার শক্তি লুক্কায়িত। সমাজ-সংস্কার, বা নীতি, ধর্ম্ম ও রাজনীতির আন্দোলন, এ সকলের মূলে—মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। তুমি কাতরই হও, আর দুঃখিতই হও,—সত্য গোপনে থাকিবে না। তোমরা যিনি যে কিছু আন্দোলন করিতেছ—সকলের মূলে কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র দেশহিতকর ব্রতের মূল শিক্ষক,—পথ প্রদর্শক—নেতা।

চিরঞ্জীব শর্ম্মার একমাত্র ত্রুটি,—অনুদারতা বা অন্ধতা বাদ দিলে, তাঁহার আর অল্পই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন-চরিত লিখিবার আর সকল গুণ তাঁহার আছে; বিশেষত কেশবচরিত লিখিবার তিনি উপযুক্ত পাত্র। অনেক দিন কেশবের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার হৃদয়জাত অনেক তত্ত্ব তিনি জানিতে পারিয়াছেন। ভিতরের সমস্ত কাহিনী জানিয়াও, কেশবের প্রতি চিরঞ্জীব শর্ম্মা এবং তাঁহার অন্যান্য সহযোগীদিগের অবিচলিত ভক্তি, বড়ই সুখপ্রদ। কেশবচন্দ্রের জীবনের ইহা এক আশ্চর্য্য শক্তির পরীক্ষা। যাঁহারা কেশবের নিকটস্থ বন্ধু, তাঁহারাই কেশবের প্রতি অধিক অনুরক্ত, ইহা কেশব জীবনের এক অপরূপ শক্তি—আশ্চর্য্য মহত্ত্ব—আশ্চর্য্য গুণের পরিচয়। যাঁহারা একবার কেশবের নিকটে গিয়াছেন,—তাঁহারাই মোহিত হইয়া গিয়াছেন!—তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় মোহিনী শক্তি ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রতি গ্রন্থকারের অবিচলিত ভক্তি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই গভীরপ্রেমই স্থানে স্থানে তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছি। শর্ম্মার কাহিনী পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে চক্ষের জল সম্বরণ হয় না। যেমন প্রাঞ্জল ভাষার আবেগ, তেমনি ভাবেরলহরী—তেমনি ঘটনার মোহিনী-শক্তি;—তেমনি কেশবের আশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী; সকল মিলিয়া পুস্তক খানিকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা এক আশ্চর্য্য জিনিস হইয়াছে। সে দিন যাহা চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক আমাদিগকে এত মোহিত করিতে পারিবেন, পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। ইহার পরে আর কে এ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, জানি না; কিন্তু যিনিই হউন, চিরঞ্জীব শর্ম্মার কেশবচরিতের নিকট তিনি অনেক শিক্ষার জিনিস পাইবেন, সন্দেহ নাই। এ গভীর শাস্ত্রের একখানি নিরপেক্ষ ছবি দেখিতে আমাদের বাসনা রহিল। যিনি এ অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন, তিনি সকলের সম্মান পাইবেন। যতদিন তাহা জগতে প্রচারিত না হইতেছে, ততদিন চিরঞ্জীব শর্ম্মার কেশবচরিত সর্ব্বস্থানে যে আদৃত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেশবচরিত্রের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় এত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে, আমরা আর দেখি নাই। কেশবভক্ত নরনারী কেশবচরিত পড়িয়া গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইহাই প্রার্থনা। কেশবচরিত শাস্ত্রের ন্যায় গৃহে গৃহে অধীত হউক, ইহাই আমাদের প্রাণগত বাসনা।

নবলীলা।

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের কোলে—শান্তিকুটীর।

দুঃখের রজনী বসিয়া থাকে, শুনিয়াছ কেহ? বা সুখের দিন চিরস্থায়ী হয়, দেখিয়াছ কেহ? জেলীর দুঃখে পাঠকের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে না, তাহা বুঝিয়াছি। একে জেলী বাঙ্গালী-বিদ্বেষী, তাতে আবার বিদেশী, বাঙ্গালী-পাঠকের ঘৃণার পরিসীমা নাই। পাঠক মনে করিতেছেন, হতভাগিনী পাহাড় হইতে পড়িল ত, অস্থি চূর্ণ হইল না কেন?—পড়িল ত, মরিল না কেন?—বিপদ আসিল ত, চিরকালের জন্য জেলীকে ডুবাইয়া রাখিল না কেন? মানুষের সকল বাসনাই পূর্ণ হয় না,—কোন্‌টী ফুটিয়া শুকায়, কোনটী না ফুটিয়াই বিলীন হয়, কোনটীতে অঙ্কুর জন্মে। পাঠক, তোমার সকল বাসনা পূর্ণ না হইলে দুঃখ করিও না,—পৃথিবীতে কোন লোকেরই সকল বাসনা পূর্ণ হয় না।

জেলীর দুঃখের রাত্রি বসিয়া থাকিল না,—প্রত্যুষে যখন শীতল বায়ু বৃক্ষের ভিতর দিয়া বহিল, তখন জেলীর চেতনা হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া জেলী বুঝিল, সর্ব্ব শরীরে বেদনা হইয়াছে—শরীরের অনেক স্থান চিরিয়া রক্ত পড়িয়াছে—জল-পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। প্রত্যুষের শীতল বায়ু

বহিয়া কত পাখীকে মধুর স্বরে ডাকাইল,—কত পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিল;—কত নবপল্লবিত শাখাকে আনন্দে দোলাইল। কিন্তু যে বৃক্ষপত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে উলটি পালটি কত রঙ্গ দেখিল;—যে ফুলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পাহাড়ের গায়ে পড়িয়াছিল,—তাহাদিগকে ধরিয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিল—তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে উড়াইয়া, প্রস্তরে প্রস্তরে আঘাত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিল। পৃথিবীর সকলের অস্তিত্বই কি, এই প্রকার একের দুঃখ ও অপরের সুখের জন্য? বৃষ্টি পড়ে, বায়ু বয়, সূর্য্য উঠে, চন্দ্র হাসে, কোকিল ডাকে, ফুল ফুটে,—কেবল কি একজনকে হাঁসাইয়া একজনকে কাঁদাইতে? বাস্তবিকই যেন তাই। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে, সকল মনুষ্যই সমান ভাবে সুখী নয়। তোমার অস্তিত্বে যে মুহূর্ত্তে দশজনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই মূহূর্ত্তেই স্থানান্তরে হয়ত আর দশজনের নিরানন্দ বাড়িতেছে। স্থানবিশেষে তোমার হাসি আমার দুঃখের কারণ; আমার দুঃখ, তোমার হাসির কারণ হইতেছে। একের দুঃখ, অপরের সুখের হেতু; একের সুখ, অপরের দুঃখের কারণ। বৈচিত্র্যে আনন্দ থাকেত, নিরানন্দও আছে। সেই ঊষার স্নিগ্ধ আলোকে মাতিয়া বায়ু বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল ফুটাইল,—আঘাতে ২ বৃন্তচ্যুত ফুলের অস্তিত্ব বিলীন করিল। হতভাগিনী জেলীর শরীরে শীতল বায়ু বহিয়া, জেলীকে চেতনা দিল। চেতনা দিল—জেলীকে কষ্টের দুর্ব্বহ জ্বালায় দগ্ধ করিতে! অচেতন অবস্থায় জেলীর সুখবোধও ছিল না, দুঃখবোধও ছিল না। বায়ু বহিয়া জেলীকে জাগাইয়া, জ্বালা যন্ত্রণা কি, তাহা বুঝাইল। সর্ব্ব শরীরে বেদনা—সর্ব্বাঙ্গে রক্তময় ক্ষত—সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা,—তায় কণ্ঠ শুষ্ক। নিষ্ঠুর বায়ু, তৃণ পত্র, ফলফুল উড়াইয়া জেলীর গায়ে ঢালিতে লাগিল;—পরিধানের বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গিয়াছে, কে জানে? অনাবৃত শরীরকে, বায়ু, পত্র ও ফুল দিয়া ঢাকিল। তাহাতে জেলীর যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষত স্থানে অল্প অল্প আঘাতেও বিশেষ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। বেলা চড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে বায়ুও চড়িল। পাঠকের মন-তুষ্টার্থ, পবন, উপর হইতে ধূলি, বালি, তৃণ পত্র, আবর্জ্জনা উড়াইয়া জেলীর গায়ে ঢালিয়া জ্বালা বৃদ্ধি করিল। হতভাগিনী কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া, বিনোদের প্রতি আরো বিরক্ত হইল। বিনোদ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক সময়ে এমনই হয়। তুমি যাহাকে প্রাণ মন সঁপে দিয়া ভালবাসিতেছ, সে হয়ত এমনই করিয়া তোমার জন্য কেবল গরল পুষিতেছে। পরদিন জেলীর সংবাদ লইতে বিনোদ লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া সংবাদ বলিল, মেম সাহেব, সেই রজনীতেই, দস্যুদের পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইয়াছেন। পাহাড়ের নিম্নে জেলীর অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে, অনুসন্ধানে সে সংবাদও বিনোদ পাইলেন। এই দুটী সংবাদ পাইয়া বিনোদ বুঝিলেন, জেলী হয়ত দস্যুদিগের অনুসরণে পাহাড়ে উঠিতে চেষ্টা করিয়া, পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া মারা পড়িয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া, বিনোদ পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু লোকেরা আর কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। সংবাদ না পাইয়া বিনোদ একটু চিন্তান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যের ভিড়ে ৪।৫ দিনের মধ্যে সে চিন্তা হৃদয় হইতে অবসর লইল;

তিনি নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন।

জেলী পাহাড়ের যে স্থানে উত্থানশক্তি রহিতভাবে পড়িয়াছিলেন, তাহার নিকটেই কোন যোগীর একটী ক্ষুদ্র আশ্রম। লতাকুঞ্জে পরিবেষ্টিত একখানি ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার পশ্চাতে একটী ক্ষীণ-প্রবাহিনী ঝরণা, কুল কুল করিয়া বহিতেছে;—চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড২ বৃক্ষ পরিশোভিত পাহাড় আকাশে উঠিয়াছে। এই প্রকার আশ্রম, পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার-গঞ্জনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মাগণ, এমনি করিয়া, নির্জ্জন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন। যোগী প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে যখন কুটীরের উন্মুক্ত বারাণ্ডায় বসিয়া পর্ব্বতের শোভা দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে, জেলীর অবসন্ন শরীর তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। যোগীগণ সাধারণত সংসার-বিরাগী.—কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে, কোথায় কাহার কি অভাব হইয়াছে, এসকল বিষয়ে সাধারণত তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় না। সংসার-নিরপেক্ষ,—সুখ দুঃখ-নিরপেক্ষ, ভোগবিলাস-বিরহিত যোগীদিগের এ সকল সামান্য বিষয়ে মন যায় না। ধ্যানই তাঁহাদের ব্রত, ধ্যানই কর্ম্ম, ধ্যানই জ্ঞান, ধ্যানই মুক্তি। পার্ব্বত্য-শোভা দেখিতে দেখিতে চক্ষু নিমীলিত হয়,—বাহ্যদৃষ্টি বিলুপ্ত হয়,—চিদাকাশে অনন্তস্বরূপের অনন্ত ভাব-লীলার বিকাশে মন নিমগ্ন হয়। বাহ্য-দৃষ্টি, ভিতর দৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। আজ আর তাহা হইল না;—বাহ্যদৃষ্টি যোগীকে বাহিরে লইয়া চলিল। কে যেন টানিয়া, মত-বিরুদ্ধ পথে, যোগ ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার সময়ে, যোগীকে লইয়া চলিল। যোগী, জেলীর সন্নিকট হইয়া বলিলেন,—তুমি এরূপ অবস্থায় কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছ?—তুমি কে? জেলী ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না, অতিকষ্টে, অপষ্টভাষায় বলিলেন,—পিপাসায় প্রাণ যায়, একটু জল দিন। যোগী, ঝরণা হইতে জল আনিয়া জেলীর মুখে দিলেন। জেলী একটু সুস্থ হইলেন। যোগী যথাসাধ্য যত্ন করিয়া জেলীর শুশ্রূষা করিলেন। জেলী একটু সুস্থ হইলে, যোগীর আশ্রমে আশ্রয় পাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধে—আহুতি।

কিছুদিন পরেই সাহেবদের দৌরাত্ম্য ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিশোধ তুলিতে সাহেবেরা যেমন মজবুত, পৃথিবীতে আর কোন জাতিই তেমন নহে। মধুমক্ষিকার চাকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া পথিকের নিরাপদে গমন করাও সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু উষ্ণরক্ত, বীর্য্যশালী সাহেবের শরীরে আঘাত করিয়া, নিরাপদ-শান্তিতে গমন করা, কোন লোকেরই স্বাধ্যায়ত্ত নহে। একের শরীরের আঘাতে, এই জাতির অপরের শরীরে আঘাত লাগে,—একের দুঃখে অপরের হৃদয় ব্যথিত হয়;—ভ্রাতায় ভ্রাতায় এমনই ঘনিষ্ট যোগ। সাহেব কুঠিয়ালদের প্রতি অসভ্য পাহাড়ীদের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, দূর দূরান্তরের সাহেবেরা মর্ম্মপীড়িত হইয়া, পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া পাহাড়কে বেষ্টন করিল। দর্পে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রেম দাস বিনোদের ইচ্ছা ছিল না, কাহারও সহিত কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হন।

বিশেষত, যে জাতির রক্ত অভিন্ন-হৃদয় এণ্ডারসনের শরীরে প্রবাহিত, সে জাতির সহিত শত্রুতা করিতে, কৃতজ্ঞতা-বিহ্বল বিনোদের প্রাণ অগ্রসর হইল না। কিন্তু বিনোদ যত পশ্চৎবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই সাহেবদের অহঙ্কারস্ফীত প্রাণ আরো উৎসাহিত হইতে লাগিল—ক্রমেই তাহাদের অত্যাচার ভীষণাকার ধারণ করিল। ইংরাজেরা প্রতিশোধ তুলিবার জন্য, বুদ্ধি বিবেচনা ভুলিল, এবং সকলের উপর, প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিল। শেষে সাহেবদের অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইল যে, ফেলাই সিংহ একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। জিতনের ইচ্ছা ছিল, বিনোদকে লইয়া শান্তিতে থাকিবে; কিন্তু বিধাতার যেন সে ইচ্ছা হইল না। অবশেষে ইচ্ছায় ইচ্ছায় বিবাদ উপস্থিত হইল,—প্রেমের রাজ্যে অপ্রেমের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। জিতনের সহিত বিনোদের একটু মতের অনৈক্য হইল। বিনোদ বলিলেন, অত্যাচার সহ্য করিব,—মানুষের হৃদয় কত দূর অগ্রসর হইতে পারে, দেখিব;—অত্যাচারীকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিব। জিতন বলিল,—আমরা অত্যাচার করিব না,—পূর্ব্বে আমরা যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহার জন্যও ক্ষমা চাহিব, কিন্তু যদি সাহেবেরা অত্যাচার করে, তবে ক্ষমা করিব না,—তাহা হইলে তুমুল কাণ্ড বাধাইব। আরো বলিল,—আমি বিশ্বাস করি, মানুষ বিশেষের মধ্যে এমন এক স্বর্গীয় জিনিস থাকিতে পারে, যাহার গুণে প্রেমের বাহু বিস্তার করিয়া, শত্রুর সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিলে, শত্রু আপনি মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যাহার মধ্যে সে স্বর্গীয় অমূল্য পদার্থ নাই, সে কেমন করিয়া, প্রাণে হিংসা ক্রোধকে পোষণ করিয়া, হস্তকে থামাইয়া রাখিবে? যাহার ভিতরে গরল রহিল, সে বাহিরে প্রহার না করিলেই কি তাঁহার পরিণাম সুখের হইবে? কখনই নহে। ভিতরে যদি হিংসা বা ক্রোধের উদয় না হইত, তবে অবশ্য স্বীকার করি, অত্যাচারীকে বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিলে স্বর্গসুখ লাভ হইত। পৃথিবীর পাপবিষ দেখিয়া, পৃথিবীর অত্যাচার সহ্য করিয়া, যাঁহার ভিতরে কোন প্রকার মলিনভাব—হিংসা বা ঘৃণা, ক্রোধ বা উদ্দীপনা উপস্থিত না হয়, তিনি মহৎ ব্যক্তি; সকলের পূজ্য। কিন্তু হায়, পৃথিবীতে সে প্রকার পূজ্য ব্যক্তি একটীও আছে কি না, সন্দেহ। আপনার মনের ভিতরে, হৃদয়ের সেই নিগূঢ়তম প্রদেশে কি ভাব হইতেছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমার প্রার্থনা এই, আপনার ভিতরেও যাহা, বাহিরেও তাহাই হউক। কিন্তু আমি হতভাগ্য-নরাধম—আমার হৃদয়, দুঃখী দরিদ্রদের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, তাহাতে অস্থির হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে, আমার প্রাণতুল্য ভ্রাতাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, ইংরাজগণ রক্ত-পিপাসা নিবৃত্তি-করিতেছে;—আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্রী, ভগ্নী সকলের সতীত্ব, পশুর ন্যায়, দলে দলে, অপহরণ করিয়া হিংসা-প্রদীপ্ত কামরিপুকে চরিতার্থ করিতেছে, ইহা আমি কেমনে সহিব?—দলের লোকেরা আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না,—ফেলাই পারিতেছে না, আমি পারিতেছি না। ধর্ম্মই বা কোথায়, শান্তিই বা কোথায়?—অসহায় মেষপালকে একেবারে ধ্বংশ করিয়া ফেলিল,—মেষপালক আপনি, কি কেবলই চাহিয়া দেখিবেন? আপনার একতার উপদেশ—প্রেমের উপদেশ, সকলই কি ব্যর্থ হইতেছে না? যাহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহার প্রাণ, আপনার সম্মুখে, অনায়াসে ম্লেচ্ছগণ লইতেছে, আর আপনি চাহিয়া দেখিতেছেন, এই কি একতা ও প্রেমের ধর্ম্ম? হায়, দেবতা কি আপনার মধ্যে তেজ, বীর্য্য, ও পুরুষত্ব কিছুই প্রদান করেন নাই? বলিতে বলিতে জিতনের চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। বাকরোধ হইল। জিতন নীরব হইল।

বিনোদ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া জিতনের জ্বলন্ত উপদেশ শুনিলেন। জিতনের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। ঊর্দ্ধদিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, সূর্য্য প্রখর মূর্ত্তিতে কটাক্ষপাত করিতেছে। প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করাই কি বিবেকানুমোদিত কার্য্য?—আত্মরক্ষার জন্য মানুষ কি চেষ্টা করিতে অধিকারী নয়? যখন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকে না, তখনও কি অস্ত্রাঘাত অবৈধ?—আত্মরক্ষার জন্য কোন অবস্থায় যদি অস্ত্রঘাত বৈধ হয়, তবে আত্মতুল্য ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য কি অস্ত্রাঘাত বৈধ নয়?—আমার ভ্রাতা—আর আমি, ইহাতে কি বিভিন্নতা?—যেখানে পৃথকত্ব আছে, সেখানে আত্মীয়তা—একতা—মিলন নাই। আমি আর জিতন,—একই; হৃদয় এক, প্রাণ এক, জীবন এক। জিতনের জন্য, আমি আমার প্রাণ দিতে পারি; আমার জন্য জিতন প্রাণ দিতে পারে। সেই জিতনের দল, অত্যাচারে, উৎপীড়নে ভাসিয়া যায়! জিতন সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ভাসাইতে চায়! আমার কি নীরবে থাকা বিধেয়? গম্ভীরভাবে, স্থির চিত্তে, বিনোদ এই প্রশ্ন বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহ্বল-চিত্তে, গম্ভীর ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া, ইষ্টদেবতার নিকট এই কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্ম ভিন্ন সংসার নাই—ধর্ম্ম ভিন্ন সংসারের কল্যাণ নাই; বিনোদ ইহা বিশ্বাস করিতেন। সংসারের কল্যাণের জন্য যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, তাহাও অবশ্য ধর্ম্মানুমোদিত হইবে, এই বিশ্বাসে বিনোদ ইষ্ট দেবতাকে, এই সঙ্কটের সময়ে, এই গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে বিনোদ স্থির হইয়া দেখিলেন, সমস্ত পাহাড়ীরা সুসজ্জিত হইয়া নিকটে দণ্ডায়মান,—ফেলাই সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে নিষ্কোষিত অসি হস্তে উপবিষ্ট। বিনোদের এ চিত্র দেখিয়া ভয় ভাবনা তিরোহিত হইল। পতঙ্গ সংসার জ্বালা ঘুচাইতে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে, ইহাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে আমরাও পাপ অত্যাচার ঘুচাইতে যুদ্ধাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন দিব, ইহাও তাঁহারই ইচ্ছা;—নিমেষের মধ্যে বিনোদের মনে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। এ সিদ্ধান্ত ভাল হইল কি মন্দ হইল, পৃথিবীর সমালোচনার ভয়ে বিনোদ তাহা চিন্তাকরিলেন না; তিনি নিরপেক্ষ ভাবে তখনই যুদ্ধযাত্রা করিতে অনুমতি দিলেন, এবং আপনি অধিনায়ক রূপে জিতনের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। ভাই পাঠক; বল ত বিনোদ ধর্ম্মের উচ্চ সোপান হইতে অবতরণ করিলেন কি না?

ভবভূতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে ভাষানৈপুণ্য এবং গাম্ভীর্য্যের জন্য ভবভূতির রচনা সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত, তাহা বীরচরিত, উত্তরচরিত এবং মালতী-মাধব, এই তিন খানিতেই সমভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সমাসপ্রিয়তা এবং জটিলতার জন্য অনেকে ভবভূতির নিন্দা করিয়া থাকেন; এবং যে মাধুর্য্য এবং প্রশান্তভাব তাঁহার রচনার নিত্য সহচর, তাহা এই তিন খানিতেই বর্ত্তমান আছে। কেবল তাহাই নয়, সংস্কৃত কবিগণের অনুসৃত প্রথা অনুসারে তিনি একই শ্লোক অথবা শ্লোকাংশ, এবং একই প্রকার ভাব, স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমূহের নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক মাত্র, যিনিই এই তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, এই তিন খানিই একই লেখনীপ্রসূত। বিভিন্ন-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের রচনায় এরূপ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব। আমরা উদাহরণস্বরূপ এই তিন খানি গ্রন্থ হইতে এই কতিপয় শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

ত্রাতুংলোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রোধর্ম্মঃ শ্রিতইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য
গুপ্ত্যৈ।"

"সামর্থ্যানামিবসমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বাগুণানাম্।
আবির্ভূয় স্থিতইব জগৎ পুণ্য নির্ম্মাণ রাশিঃ॥"
(বী চ, উ চ)

"পুত্রসংক্রান্ত লক্ষ্মীকৈর্যদ্বৃদ্ধেক্ষাকুভিধৃতম্।
ধৃতং বাল্যে তদার্য্যেনপুণ্যমারণ্যকং ব্রতম্॥"
উ চ

"পুত্রসংক্রান্তলক্ষ্মীকৈর্যদ্বৃদ্ধেক্ষাকুভির্ধৃতম্।
ত্বয়াতৎক্ষীর কণ্ঠেন প্রাপ্ত মারণ্যকংব্রতম্॥
ইহ সমদশকুন্তক্রান্ত বানীরমুক্ত (বীরুৎউচ)
প্রসব সুরভি শীত স্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভর পরিণাম শ্যাম জম্বু নিকুঞ্জ
স্খলন মুখর ভূরি স্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥
দধতিকুহর ভাজামত্র ভল্লুক যণা
মনুরসিত গুরূণি স্ত্যান মম্বুকৃতানি।
শিশির কটু কষায় স্ত্যায়তে শল্লকীনা
মিভদলিত বিকীর্ণ গ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ।"
(বীচ, উচ)

"দলতিহৃদয়ং গাড়োদ্বেগং দ্বিধাতুন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়োমোহং নমুঞ্চতি
চেতনাং।"

"জ্বলয়তি তনুমন্তর্দ্দাহ্য করোতিন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদো ন কৃন্ততি জীবিতং"
(উচ, মা মা)

"এতস্মিন্ মদফল মল্লিকাক্ষ পক্ষ,
ব্যাধূত স্ফুরদুরু দণ্ড পুণ্ডরীকঃ।
বাষ্পাম্ভঃ পরিপতনোদ্গমান্ত রালে
দৃহ্যন্তামবিরহিতপ্রিয়োবিভাগাঃ॥" মা মা।

"সন্দৃষ্টাঃ কুবলয়িনো ভুবোবিভাগাঃ॥
ম্লানস্য জীব কুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয় মোহনানি।
আনন্দনানি হৃদয়ৈকরসায়নানি
দিষ্ট্যা ময়াপ্যধিগতানি বচোমৃতানি (মা মা)
ম্লানস্য জীব কুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পনানি সকলেন্দ্রিয় মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরু হাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ র[illegible]

এই সকল স্থলে ভবভূতি একই শ্লোক স্বপ্রণীত গ্রন্থসমূহের বিভিন্নস্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কত স্থানে যে একই প্রকার ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার শেষ নাই। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

অক্তস্ত্বাং প্রতি কোপনস্য তরল শাপোদকং
দক্ষিণঃ
প্রাক্‌সংস্কার বশেন চাপমিতরঃ পাণির্মমা-
ন্বিষ্যতি
(বীরচরিত ৩য় অঙ্ক)

এতদ্বৈশস ঘোর বজ্রপতনং সম্বন্ধ মোৎ
পশ্যতঃ।
ত্রোধস্য জ্বলিতুং ধগিত্যবসরশ্চাপন
শাপেন বা॥ (উত্তরচরিত ৪র্থ অঙ্ক।

"প্রাণাঃপতন্তি, পরিতস্তমসা বৃতোস্মি
মর্ম্মচ্ছিদোমমরুজঃ প্রসরন্ত্যপূর্ব্বা।
অক্ষ্ণোর্মুখেন্দু মুপধেহি, গিরং চ দেহি
হা পুত্র ময্যকরুণঃ সহসৈব মা ভূঃ॥
বীরচরিত ৪র্থ অঃ

"প্রয়ান্তীব প্রাণাঃ সুতনু হৃদয়ং ধ্বংসত ইব
জ্বলন্তীবাদ্দানি প্রসরতি সমন্তাদিব তমঃ।
ত্বরা প্রস্তাবোয় ন খলু পরিহাসস্য বিষয়ঃ
তদক্ষ্ণো রানন্দং বিতর ময়ি মাভূরকরুণা॥
নিসর্গতঃ পবিত্রস্য কিমন্যৎ পাবনং তব।"
বীরচরিত

"উৎপত্তি পরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ
উত্তরচরিত

"যদ্দর্শনাৎ কিমপ্যেবং দ্রবী ভবতি মেমনঃ।"
বীরচরিত

ভবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ।
বীর চরিত।

এ সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। ভাষা এবং ছন্দের সৌসাদৃশ্য, প্রবন্ধের অতি দীর্ঘতাশঙ্কায় আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক তাহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বীরচরিত, উত্তরচরিত এবং মালতী-মাধব, এই তিন খানির মধ্যে কোন্ খানি সর্ব্ব প্রথমে প্রণীত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে, ভবভূতির গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বীরচরিত সর্ব্ব প্রথম, উত্তরচরিত তৎপরবর্ত্তী, এবং মালতীমাধব সর্ব্ব শেষ। উত্তরচরিত যে বীরচরিতের পরেই প্রণীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। রচনার বিশেষত্ব, এবং ভাবের তুল্যতা সম্বন্ধে এই দুই গ্রন্থ পরস্পরের যেরূপ অনুরূপ, মালতীমাধব সেরূপ নয়। কিন্তু বীরচরিতের পর, উত্তরচরিত এই নামই এবিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ভবভূতি যে বীরচরিতই সর্ব্ব প্রথমে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যেরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, উত্তরচরিতে সেরূপ করেন নাই। সাধারণের নিকট পরিচিত হইলে, আর পরিচয় প্রদানের আবশ্যক করে না। এই জন্যই তিনি উত্তরচরিতের আরম্ভে কেবল মাত্র দুই একটী কথায় আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মালতী-মাধব যে সর্ব্বশেষেই প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, গ্রন্থকার যে স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই, তাহা ইহার প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ রচনা করিয়া জীবন কালের মধ্যে যশোলাভ সকল সময়ে সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহাকবি

PARTIALLY DAMAGED.

সেক্সপিয়ারের অদৃষ্টেও এ সুখ ঘটে নাই।* সুতরাং ভবভূতি যে জীবিত কালে অনাদৃত হইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই অনাদরের ফল—

"যে নাম কেচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তিতে কিমপি তান্‌প্রতিনৈষযত্নঃ।
উৎপৎস্যতেৎস্তি মম কোৎপি সমান ধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী॥"

সমাদর পাইলে কেহ কোনদিন বলে না "যে, আমার এই উদ্যম তোমাদিগের জন্য নয়; তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিবে না, জগতে এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিবার লোক পাইব।" অপমানিত হৃদয় ভিন্ন এমন উচ্ছাস আর কোথাও হইতে বিনির্গত হয় না। কিন্তু এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা এ বিষয়ের সবিস্তর আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে আবার তাহার অবতারণা পুনরুক্তি মাত্র।

ভবভূতির কাল নির্ণয়, পরিচয় এবং গ্রন্থ সমূহ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য ছিল, আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিলাম, এক্ষণে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভবভূতির বীরচরিত এবং উত্তরচরিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এই গ্রন্থদ্বয় রামচরিত অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইলেও, রামায়ণ হইতে কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্র; সেই অস্থিমাংসে নির্ম্মিত হইলেও, ইহার আকৃতি ও গঠন প্রণালী বিভিন্ন। যদিও এই দুইগ্রন্থের প্রত্যেক স্থলেই সেই বাল্মীকি-কল্পিত মহাপুরুষগণের সন্দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা এরূপ নবভাবে পাঠকের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন যে, তাঁহাদিগকে অভিনব ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। বাল্মীকির গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও নূতন, তাহার নিত্যনূতনত্বের কখনও অসদ্ভাব হয় না। ভবভূতির হস্তে সেই নিত্যনূতন মহারত্ন সমূহ, কারু কার্য্য গুণে আরও অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। লোকে এক কথা শতবার শুনিতে ভাল বাসে না, কেবল একটী মাত্র কথা কখনও পুরাতন হয় না, ইহা বাল্মীকির কবিতা; এবং এই জন্যই ভবভূতি সেই মহাকবির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি কোথাও আপনার মৌলিকতা ও স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন করেন নাই। যে সকল স্থলে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছেন, তথায় তিনি আপনার নৈপুণ্য প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাল্মীকির সৃষ্টি উৎকর্ষতার শেষ সীমা, সুতরাং তাহাকে অতিক্রম করা সহজ কথা নহে। কিন্তু যেখানে তিনি বাল্মীকির সঙ্গে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে তিনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এক হইলেও, ভবভূতি এবং বাল্মীকি উভয়ের পার্থক্য এই যে, বাল্মীকি রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই বর্ণন

* It is certain that Green in his Groat's Worth of Witt—a pamphlet published in 1592, alludes to Shakespeare in the following words. "There is an upstart crow, beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a player's hyde supposes, he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you; and being an absolute *Johanes Factotum* is in his own conceit the only Shake-scene in a country."

করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার গ্রন্থের নায়ক দেবতা এবং তিনিও তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানেই হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের নায়ক যে মনুষ্য, একথা তিনি নিজেও কোন দিন ভাবিয়া দেখেন নাই, এবং তাঁহার পাঠকগণকেও তাহা ভাবিবার অবসর দেন নাই। কিন্তু ভবভূতির রামচন্দ্র মনুষ্য; মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারও হৃদয়ে স্নেহ, ভক্তি, করুণা, ক্রোধ, মোহ সকলই বর্ত্তমান। হৃদয়ে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বুঝিলেও তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে তাঁহার দেবত্বের সমাবেশ করেন নাই। কিন্তু মনুষ্য হইলেও ভবভূতির রামচন্দ্র মর্ত্ত্যলোকে দেবতা। স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে, মানবে এবং দেবতায় যে বৈষম্য, তাহা তাঁহাতে ছিল না। উভয় কবিরই উদ্দেশ্য এক—মানবের সমক্ষে, পাপময় জগতে, আদর্শ চরিত্রের সমাবেশ—কিন্তু এবিষয়ে ভবভূতির প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি মানবপ্রকৃতিতে দেবোচিত গুণের সমাবেশ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। দুই ভাই—আশ্চর্য্য উপাখ্যান; হিতোপাখ্যান সংখ্যা ১, মূল্য ৵১০। গল্পটী আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ না হইলেও হিতোপাখ্যান বটে। সরল ভাষায়, মিষ্ট কথায় দুটী ভ্রাতার জীবনের কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অল্পবয়স্ক স্কুলের ছাত্রদিগের ইহাতে প্রভূত উপকার হইবে।

২। চাঁদের বিয়ে। শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত বিরচিত, মূল্য ১০। এই সরল কবিত্বময় ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। ১০ ব্যয় করিয়া যাঁহারা এই পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন না।

৩। প্রতিভা—একটী বালিকার কথা; শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত বিরচিত, মূল্য ।০। প্রতিভার চরিত্র মোটের উপর সুন্দর হইয়াছে; দুই একস্থানে কেবল একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল। প্রতিভার মাতার মৃত্যু বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। জগদম্বার চিত্রটী পুস্তকে না দিলেই ভাল হইত,—উহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিবার জন্য অনেক বাহিরের কথা বলিয়াছেন, সে গুলি অনেক স্থলে আমাদের ভাল লাগে নাই। ব্যক্তিগত কুৎসা রচনা করিতে গ্রন্থকারের অনিচ্ছা স্বত্বেও, জগদম্বার চিত্র কেন পুস্তকে স্থান পাইল, বুঝিলাম না। "প্রতিভার"—রুচি পরিমার্জ্জিত, ভাষা সুন্দর—সরল, মধুমাখা, স্বাভাবিক। এই ক্ষুদ্র দুই খানি পুস্তকেই গ্রন্থকারের শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

৪। হিন্দুসমাজ; পদ্যময় গ্রন্থ।—শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র নাগ প্রণীত, মূল্য ।০। হিন্দুসমাজ নাম দিয়া, গ্রন্থকার, কেবলই হিন্দুসমাজের দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে দোষ আছে;—গুণ কি নাই?—তবে যে পুস্তকে কেবল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম "হিন্দুসমাজ" হইল কেন? আমরা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, হিন্দু-সমাজ-বিদ্বেষী কোন কোন পত্রিকায় এই পুস্তকের আবার প্রশংসা ঘোষিত হইয়াছে। পুস্তকের লেখা সর্ব্বত্রই একরূপ,—কবিত্বশূন্য—ভাষাশূন্য—ভাবশূন্য। পূর্ব্বে এরূপ অসার কুৎসাপূর্ণ পুস্তক বটতলার

ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইত ; এই উন্নতির দিনে, আজ কাল এরূপ পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে দেখিয়া, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

৫। সৌভাগ্য-সোপান।—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি, এ, প্রণীত ;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১॥০। প্রসন্ন বাবু যে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আর কোন বাঙ্গলা পুস্তকে আমরা আজ পর্য্যন্ত এত অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির পরিচয় পাই নাই। এই পুস্তকে গ্রন্থকার এতগুলি লোকের নীতিবাক্য ও সদুপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সৌভাগ্য-সোপান বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পুস্তকের ছাপা অতি পরিষ্কার হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রকার নীতিপূর্ণ গ্রন্থের নিতান্ত অভাব আছে। এরূপ পুস্তক প্রচার করিয়া, গ্রন্থকার সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এরূপ অসংলগ্ন নীতিপূর্ণ গ্রন্থ, সাহিত্য বলিয়া বিদ্যালয়ে অধীত হইবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে ; তবে একথা নিশ্চয় বলিতে পারি, যাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা এ পুস্তক পড়িয়া অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে কি কি প্রণালীতে চলিতে হয়, তাহা অতি সুন্দর রূপে, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৬। গীতরত্নাবলী—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত ও সঙ্কলিত, মূল্য ১৲, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ কবি এবং গায়ক,—তাঁহার মধুর কণ্ঠে তাঁহার রচিত সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছেন। সঙ্গীতজগতে তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকার,—যতদিন ভাব থাকিবে, ভক্তি থাকিবে—সঙ্গীতের আদর থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম সর্ব্বত্র আদৃত থাকিবে। গীতরত্নাবলীর অধিকাংশ সঙ্গীতই তাঁহার নিজের রচিত, অল্প কয়েকটী মাত্র সঙ্গীত সঙ্কলিত হইয়াছে। ভক্তি বিশ্বাসপূর্ণ গভীর ভাব তাঁহার সঙ্গীতের প্রতি কথায় সুচিত্রিত। গ্রন্থকার কিছু ভাবপ্রধান লোক, ভাবের অনুরোধ বজায় রাখিতে গিয়া, তিনি স্থানে স্থানে কিছু কিছু কুসংস্কারের অন্যায় প্রশ্রয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে দোষ দিই না, তাঁহার শিক্ষাকে দোষ দিই। শিক্ষা-ঘটিত দোষ থাকিলেও, গীতরত্নাবলী প্রকৃতই এক আশ্চর্য্য রত্ন বিশেষ। গ্রন্থকারের বিশ্বাস ভক্তির সহিত কবিত্বের বিকাশ দেখিয়া, আমরা মোহিত হইয়াছি। এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব। পুস্তকের ছাপা পরিপাটী হইয়াছে।

৭। ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী—শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১॥০। নানা বিষয়ক সঙ্গীতে পুস্তকখানির ৫৪৬ পৃষ্ঠা পূর্ণ। আমরা এই পুস্তক খানি পাইয়া বিশেষরূপ উপকৃত হইয়াছি। আমাদের দেশে যত ভাল ভাল সঙ্গীত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত বাবু পুস্তক খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সূচীপত্রে সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একত্রে সকল শ্রেণী পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত পাওয়া, বড়ই অ[illegible]

[illegible] কথা। নবকান্ত বাবু সর্ব্বসাধারণের অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ব্যক্তিগত কুৎসাপূর্ণ দুই একটী সঙ্গীত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এই উপাদেয় সঙ্গীত পুস্তক খানি যে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সঙ্গীতের আদর যে দেশে হয় না, সে দেশ শ্মশান-তুল্য।

৮। রিপনবিদায়(পদ্য)।—শ্রীমতিলাল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, মূল্য ৴০। মহাত্মা রিপনের ন্যায় সহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক রাজপ্রতিনিধি ভারতে আর কখনও পদার্পণ করেন নাই। এমন উদার দয়ারনিধি রিপনের স্বদেশ গমনকালে চক্ষের জল পড়ে নাই, এমন লোক এদেশে অতি অল্প দেখা যায়। রিপনবিদায় পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ,—রিপনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য ইহা লি[illegible]ত। গ্রন্থকারের উচ্ছ্বসিত হৃদয়-কাহিনী পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। ইহাতে কবিত্ব না থাকিলেও,—ভাব আছে, সহৃদয়তা আছে।

৯। প্রকৃতিবিজ্ঞান। শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী, বি, এ, প্রণীত, মূল্য ॥০। এই পুস্তকখানি আমরা অনেক দিন হইল সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু জনৈক বন্ধু পাঠ করিবার জন্য পুস্তকখানিকে অনেক দিন আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন বলিয়া, যথা সময়ে ইহার সমালোচনা করা হয় নাই ; গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন। প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়,—এসম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যিনি যাহা প্রকাশ করেন তিনিই কৃতজ্ঞতার পাত্র। প্রকৃতি[illegible] আধুনিক সভ্য[illegible] [illegible]গণের মত, ইহাতে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সহজ করিবার জন্য গ্রন্থকার যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, বোধ হইল না। সে দোষ গ্রন্থকারের নহে। বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পুস্তক লিখিতে হইলে, স্থানে স্থানে নূতন ভাবের উপযোগী করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, কোথাও বা নূতন শব্দ রচনা করিতে হয়। সেই জন্য, অনেক অপ্রচলিত দুর্ব্বোধ্য শব্দের বাহুল্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যবহৃত হইতে হইতে শব্দের দুর্ব্বোধ্যতা বিদূরিত হইবে, আমাদের বিশ্বাস আছে। পদার্থদর্শন প্রভৃতি যে কয়েকখানি পুস্তক আমরা দেখিয়াছি, তাহাদের অপেক্ষা প্রকৃতি-বিজ্ঞান ভাল বলিয়া বোধ হইল। এ পুস্তকখানি স্কুলে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

১০। মহারাণা প্রতাপসিংহ—মূল্য ৴০। অতীত কাহিনী স্মরণে কাহার হৃদয়ে না আশার উদ্দীপনা উপস্থিত হয়? অতীত স্মৃতি ভিন্ন মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই অতীত কাহিনী শুনিতে মানুষ লালায়িত। প্রতাপসিংহের জীবন, স্মৃতিসাগরের এক অমূল্য রত্ন। এই রত্ন লইয়া যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়াসী হন, তাঁহাদের একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত ;—বীর ভিন্ন বীরের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে কেহই সক্ষম নহে। বুঝিতে পারুন বা না পারুন, এরূপ লেখকদিগের উদ্দেশ্য যে মহৎ, তৎপক্ষে কিছুই সংশয় নাই।

১১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়,—(পদ্য) এই অমূল্য জীবনের কয়েকটী অমূল্য [illegible] করিয়া [illegible]

মোহন সান্যাল প্রণীত, মূল্য ॥০। এই পুস্তক খানি পূর্ব্বেই মনোযোগের সহিত পড়িয়া অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম। হরিমোহন বাবু অনেক দিন যাবত পাহাড়ে বাস করিয়া যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহা সুন্দররূপে, বিশদভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ পুস্তক পড়িয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

১৩। পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৵০। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা আশাতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। পরমহংসের উক্তিগুলি সকল শ্রেণীর ধর্ম্ম সাধকদিগেরই উপযোগী;—সকলেই ইহা পড়িয়া উপকার লাভ করিতে পারিবেন। এই সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য সুরেশ বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১৪। শ্রীপুর হিতসাধিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ। সভার কার্য্য ভালভাবে চলিতেছে, রিপোর্ট পাঠে আনন্দিত হইয়া আমরা সুখী হইলাম।

১৫। মাণিকদহ হিতসাধিনী সভার চতুর্থ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ।—দেশহিতৈষী সহৃদয় জমীদার বাবু বিপিনবিহারী রায়ের যত্নে, এই সভার কার্য্য বেশ চলিতেছে।

১৬। যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী সভার পঞ্চম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। আমাদের [illegible] বঙ্গের সকল সভা অপেক্ষা এই [illegible] কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে। এই [illegible] ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বাবু সীতানাথ [illegible] এবং কমিটীর উৎসাহশীল [illegible] প্রমদাচরণ সেনের স [illegible] আমরা বড়ই দুঃখিত [illegible] ঈশ্বর তাঁহার দেশের প্রিয় সন্তা [illegible] করুন।

১৭। সোণার কাটি রূপার [illegible] সাবিত্রী লাইব্রেরিতে শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ ঠাকুরের পঠিত বক্তৃতা। আমরা অতি মনোযোগের সহিত বক্তার হৃদয়ের গভীর কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। পণ্ডিত-প্রবর দ্বিজেন্দ্র বাবুর অন্তরে যে এত সহৃদয়তা ছিল, প্রাণে যে এত স্বজাতি-প্রিয়তার অঙ্কুর ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ইংরাজি-ভাবাপন্ন, ইংরাজি-আচার-ব্যবহার-প্লাবিত আজনা মলিন পোষাক পরিধান করিয়া, মলিন মত ভাষার চর্চ্চা করিয়া আমরা কত লোকের যে ঘৃণা-বিদ্বেষের চক্ষের কোণে পড়িয়াছি, তাহা ঈশ্বরই জানেন। সঙ্গী ছিল না, সমদুঃখী অল্পই ছিল। দ্বিজেন্দ্র বাবুকে আজ সমদুঃখী সঙ্গী পাইলাম—আমাদের মতের পোষক পাইলাম। আমাদের আশা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। বিদেশী পোষাক-প্রিয় বাবুরা এখন এই পুস্তক খানি একবার পড়িয়া দেখিলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়। তাঁহাদের রোগ আরোগ্য হইবে না, তাহা জানি। তবু একবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিনা চেষ্টায়, স্বদেশী ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে কেমনে 'আত্মবলকে' বিসর্জ্জন দিতে দেখিব? ইচ্ছা হয়, সকলে একবার এই পুস্তক খানি পড়িয়া [illegible]। বিকারগ্রস্ত রোগীকেও ঔষধ দিতে ইচ্ছা হইতেছে, ইহা বাতুলতা বই আর কি?—দ্বিজেন্দ্র বাবু, এসম্বন্ধে আপন মনোভাব অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ করিয়া, [illegible] আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন।

স্বদেশীভাব প্রযুক্ত অন্যান্য পুস্ত [illegible] আলোচনা এবার গেল না, বারান্তরে